ঝড়

সাহিত্য পত্র

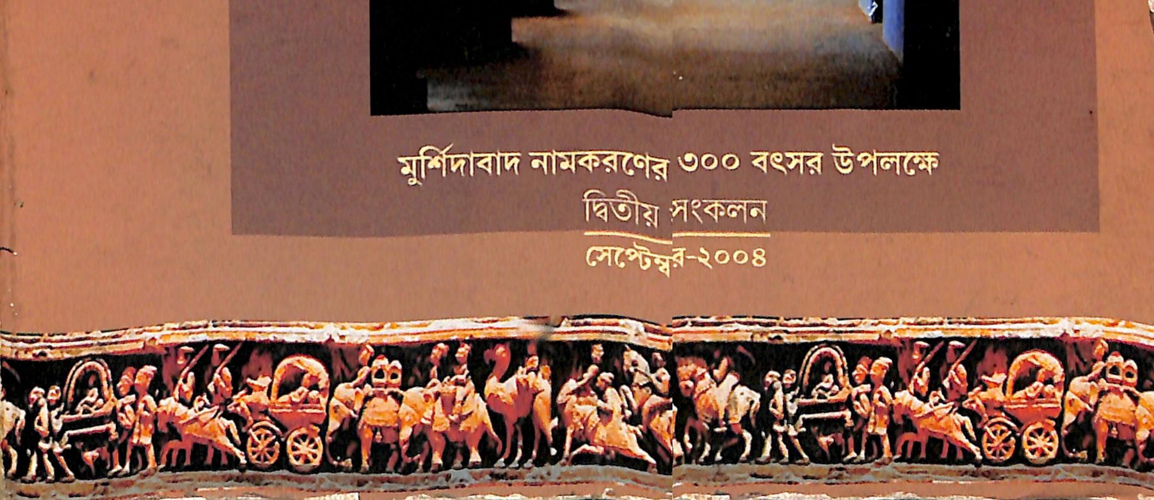
বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদ



মুর্শিদাবাদ নামকরণের ৩০০ বৎসর উপলক্ষে

দ্বিতীয় সংকলন

সেপ্টেম্বর-২০০৪




সবার চেয়ে সাদা ও উজ্জ্বল করে
হাই পাওয়ার
তাইতো রিষভ সবার ঘরে !
HIGH POWER
RISHAV®
DETERGENT POWDER
MICRO WHITENER
রিষভ®
ডিটারজেন্ট পাউডার
Copyright Registration No-A54646/98
রিষভ®
ডিটারজেন্ট পাউডার
মাইক্রো হোয়াইটনার
हाई पावर
रिषभ®
डिटरजेन्ट पाउडर
माइक्रो वाइटनर
লে যাও সাথমে ইনাম পাও ফ্রী মে
এছাড়া প্যাকেট খুললেই আরও অনেক আকর্ষণীয় উপহারের কুপন আছে
Manufacturer :-
Jhalak Chemicals
Po. Lalgola-742148
Sole Selling Agent :-
M/s. M.R. Enterprise.
Station Road, Po. Lalgola-742148
Ph.No. 03483-274373/274267

ঝড়

সাহিত্যপত্র

(ঝড় সংবাদ সাহিত্য সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র)

মুর্শিদাবাদ নামকরণের ৩০০ বৎসর উপলক্ষে

বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদ - দ্বিতীয় সংকলন

সেপ্টেম্বর ২০০৪ ❑ শকাব্দ ১৯২৬ ❑ সন ১৪১১, ভাদ্র-আশ্বিন



এই সংখ্যার সম্পাদনা
রবীন বিশ্বাস
চন্দ্রপ্রকাশ সরকার
নুরুল আমিন বিশ্বাস
বিশ্বনাথ মণ্ডল
এমদাদ উল হক
অমর মণ্ডল
দেবাশিস সাহা
অংশুমান রায়

অফিস পরিচালনা
আব্দুর রউফ

সহায়তা
মৃণাল ব্যানার্জী সুগত বিশ্বাস চন্দ্রমাধব বোস আশীষ হালদার
জগন্নাথ বিশ্বাস আহ্সান আলি ইন্দ্রজিৎ কর্মকার চন্দ্রজিৎ মজুমদার
জয়নাল আবেদিন আনিসুল আম্বিয়া শাহাজাদ হোসেন অরিন্দম চক্রবর্তী
রুস্তম চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস রমাপদ কর

মুখ্য আলোকচিত্রী
সঞ্জীব প্রামাণিক

অন্যান্য আলোকচিত্রী
বিকাশ দাস গৌতম প্রামাণিক

বিভিন্ন স্থাপত্যের স্কেচ
গৌরগোপাল ভৌমিক

ঝড়

সাহিত্য পত্র

বিষয় ঃ মর্শিদাবাদ. সেপ্টেম্বর. ২০০৪

সূচিপত্র

হারানো দিনের পুঁথির পৃষ্ঠা থেকে ১৭১

লোক জীবন-সাহিত্য-সঙ্গীত এবং কারু শিল্প ২৫৫

নানা প্রসঙ্গ ৩৬৩

ঝড়
সাহিত্য পত্র
সেপ্টেম্বর, ২০০৪

সম্পাদকীয়

মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের কৌতুহল অন্তহীন। ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পালাবদল এবং সামাজিক পট পরিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সূচনা হয়েছে এই মুর্শিদাবাদেই। রাজধানী হিসেবে কলকাতার অভ্যুত্থানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিকাশ ও বিস্তৃতির বীজও নিহিত ছিল 'মুর্শিদাবাদ'-এর জন্ম, বিকাশ ও ধ্বংসের মধ্যেই। যদিও মুর্শিদাবাদ চর্চায় অনেকাংশে একমুখী প্রবণতা বিপত্তি সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ কলকাতার জন্ম ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে অনেক অনুসন্ধানী মুর্শিদাবাদের নবাবী মহলেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। মধ্যযুগের ইতিহাস রচয়িতাদের অধিকাংশই যেমন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনার উপর বড় বেশি নির্ভরশীল ছিলেন, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস অনুসন্ধানেও তেমনি কলকাতা কেন্দ্রিক চর্চাই সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাই ঊনিশ শতকের নব্যচিন্তায় শুধু কলকাতা নয়, আলোড়িত হয়েছিল প্রত্যন্ত জেলাগুলির তৎকালীন সমাজ, যা তাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গিয়েছে। ছিটে-ফোঁটা যেটুকু তাঁরা কলকাতায় বসে সংগ্রহ করেছিলেন তা দিয়ে বঙ্গদেশব্যাপী নব্যচিন্তার প্রবাহ ও তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তত্ত্বগত ভ্রান্তিও কলকাতা কেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চার খণ্ডিত জ্ঞানই তাঁদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে যে 'নবজাগৃতি কলকাতা কেন্দ্রিক'। জন্ম হয়েছে বহু ভ্রান্তির। বিভিন্ন জেলায় জেলার ইতিহাস সন্ধানের কিছু প্রচেষ্টা সম্প্রতি চোখে পড়লেও তা মুখ্যত সাল তারিখ, ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও ঘটনাবলীর ক্রমিক বিবরণে পূর্ণ।

ইতিহাস বলতে শুধু সাল তারিখ সহ বিবৃতি নয়। প্রাপ্ত তথ্যের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে না দেখা অতীতের সত্যটুকু তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমাদের চেষ্টা এমনটাই। যদিও এই সংকলনের সমস্ত লেখকই সেই বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করার প্রশ্নে সফল তেমন বলা যাবে না। তবে সমস্ত লেখকই যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে তথ্যনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছেন তা অবশ্যই বলা যেতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইতিহাস চর্চাটিও প্রাচীন। এ জেলারই কিছু বিদ্যোৎসাহী মানুষের প্রচেষ্টায় ১৮৫০-৬০ সালেই এর সূচনা। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে আজও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত। আমরা চেয়েছি অনালোচিত বা অল্প আলোচিত বিষয়কে তুলে ধরতে। 'বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদ'-এর ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ প্রকাশিত সংকলনের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের সূচনা। বর্তমান সংকলনটি দ্বিতীয়। পূর্বতন সংকলনের, কোনো বিষয়েরই যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে দিকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি।

এ জেলায় বসে কাজ করার অসুবিধা প্রচুর। এখানে নেই লেখ্যাগার, সংগ্রহশালা ও উন্নতমানের গ্রন্থাগার। যে গ্রন্থাগারগুলি আছে, সেগুলিও নিয়ম মেনে প্রাচীন বা শতবর্ষ আগে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকাই প্রস্তুত করতে পারেনি। সংরক্ষণের পরিকাঠামো নেই। এই নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যেও যে সমস্ত গ্রন্থাগারের আন্তরিক সহায়তা এই সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে তার মধ্যে জেলার প্রত্যন্তে লালগোলার এম এন এ্যাকাডেমী (পাবলিক) টাউন লাইব্রেরী অন্যতম। কৃষ্ণনাথ কলেজ এবং কালেক্টরেট গ্রন্থাগারও সমৃদ্ধ। তাদের সহায়তা আমরা নিয়েছি, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রূপায়ণেও এদের সহায়তা আবশ্যিক বলে মনে হয়েছে। এই সংকলন প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার-এর প্রাক্তন অধিকর্তা প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় সহায়তা দিয়ে আন্তরিক ভাবে উৎসাহিত করেছেন।

বর্তমান সংকলনটির যখন প্রস্তুতি চলছে তখনই রাজ্য লেখ্যাগারের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি (১৯০৩-২০০৪) উৎসব। ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, সারা দেশ জুড়ে দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ ও ইতিহাসের সত্য উদঘাটনে আমৃত্যু এই প্রচার বিমুখ অধ্যাপক কি অসাধারণ উদ্যমে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল West Bengal Regional Records Survey Committee.। বাংলায় ইতিহাস চর্চাকে প্রসারিত করতে উদ্যোগী এন কে সিংহ ছিলেন 'ইতিহাস' পত্রিকার সম্পাদক। পাশাপাশি সুবিখ্যাত Bengal : Past and Present-পত্রিকারও তিনি সম্পাদক ছিলেন। শতবর্ষে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

প্রথম সংখ্যার মত এ সংখ্যাটিও আমজনতার হাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই সংকলনটির গ্রাহক মূল্য করা হয়েছিল মাত্র ৫০ টাকা। সর্বস্তরের বিজ্ঞাপন দাতাদের অকৃপণ এবং সোৎসাহ সহায়তা ব্যতিরেকে এত সুলভ মূল্যে এই সংকলন সর্বস্তরের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবই ছিল না। ১ম ও ২য় দুটি সংখ্যাতেই বিজ্ঞাপনদাতাদের সহায়তায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আগামীতেও আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

❑ সম্পাদকমণ্ডলী, ঝড়

মুর্শিদাবাদের মানচিত্র



গেজেটিয়ারের জন্ম কথা

জহর সেন

মুখবন্ধ

প্রশ্ন জাগতেই পারে, এই প্রবন্ধ-সংকলন পত্রিকায় গেজেটিয়ারের জন্মকথা কেন? কেনই বা উইলিয়াম উইলসন হান্টারকে মুর্শিদাবাদের নামকরণের ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন? যে কোনও মহৎ কাজে মঙ্গলাচরণ অবশ্যবিধেয়। হান্টারের সাধনা ও সিদ্ধির গুণগান মঙ্গলাচরণের মন্ত্রোচ্চারণ।

একটা ঘটনা মনে পড়ল। বহরমপুর বার লাইব্রেরিতে *ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার*-এর সব ক'টি খণ্ড ছিল। এখনও আছে কিনা জানি না। ওখান থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে আমি আমার সারস্বতচর্চায় ব্যবহার করেছি। সে সময় একদিন বহরমপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় যশস্বী আইনজীবী শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের নয়, আশেপাশের বিভিন্ন জেলার বড়ো বড়ো জমিদারদের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনার সময় প্রভূত প্রাসংঙ্গিক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার থেকে। আমি বলেছিলাম, যোগ্য মানুষের বোধিস্পর্শে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার-এর মতো গ্রন্থমালা অর্থময় কথা বলে।

এই প্রবন্ধে যেসব গেজেটিয়ারের নাম উল্লেখ করেছি, সবগুলিতেই মুর্শিদাবাদ-প্রসঙ্গ আছে। এখন পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে। নতুন পরিস্থিতি। নতুন প্রশ্ন। তথ্যসংগ্রহের মডেল হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কিন্তু পথিকৃৎ সততই বন্দনীয়। এটাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সারকথা।

১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেওয়া হয় স্বাধীন ভারতে প্রকাশিত '*গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া*'র প্রথম খণ্ড। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল প্রকাশিত হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উৎসর্গীকৃত *ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়ার* প্রথম খণ্ড। ওই তারিখটি ভারতে গেজেটিয়ার পরম্পরার জন্মলগ্ন। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার গ্রন্থমালার স্রষ্টা ও রূপকার হিসাবে উইলিয়াম উইলসন হান্টার চিরস্মরণীয় চিরঞ্জীব।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টার্স-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম শুরু হয় এই বঙ্গদেশেই সুবিন্যস্ত সুচারু পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সমীক্ষা। ১৮০৭ সালে পুণরায় কোর্ট অফ ডাইরেক্টার্স গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র দেশের ভৌগোলিক ও পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত সমীক্ষার উপর। কয়েকজন বিদ্বান বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হয় এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে। ক্রমশ প্রকাশিত হয় ওয়াল্টার হ্যামিলটনের সম্পাদনায় *ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার* (১৮৮২), থর্নটনের (Thornton) সম্পাদিত *গেজেটিয়ার* এবং সার্জেন-মেজর বালফুরের (Surgeon-Mojor Balfour) সম্পাদনায় *দি সাইক্লোপেডিয়া অফ ইণ্ডিয়া* (১৮৫৬)। শেষোক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় ২৯,৭৭০ শিরোনামে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তথ্য ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ। ওয়াল্টার হ্যামিলটন, থর্নটন, সার্জেন-মেজর বালফুর ভারতবর্ষে আসেন নি। ব্রিটেনের গ্রন্থাগার থেকেই তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সুদূর ব্রিটেন থেকে তাঁরা ভারতবর্ষকে দেখেছেন। এদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বহুবচন

এবং বিপুল আঞ্চলিক বৈচিত্র তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। এইসব প্রচেষ্টা ছিল ক্লান্তিকর একঘেয়ে অস্পষ্টতায় মলিন। ফ্রান্সিস বুকানন (Francis Buchanan) সাত বছর পরিশ্রম করে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেন। মোট ৩০,০০০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হয় সংগ্রহের কাজে। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত তাঁর পাণ্ডুলিপি কয়েকটি ট্রাঙ্কে বন্দি ছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাঙ্কগুলি ব্রিটেনে পাঠান হয়। ট্রাঙ্কবন্দি তথ্যাদির ভিত্তিতে মনটোগোমারি মার্টিনের (Montogomery Martin) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *দি হিস্টরি, অ্যানটিকুইটিজ, টপোগ্রাফি অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিক্স অফ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া*। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। মুদ্রিত পৃষ্ঠার সংখ্যা আড়াই হাজার।

২

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ভারতবর্ষ। ভারতশাসনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত। ভারতবর্ষ তখন ১২টি প্রদেশে বিভক্ত। ১৮৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ভাইসরয় প্রত্যেকটি প্রদেশে বিশদ বিবরণ চেয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করেন। এই আদেশপত্র ছিল একটি মামুলি দলিল। কোনও সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ ছিল না এই দলিলে। খেয়ালখুশি মতো প্রত্যেকটি প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠাল ভাইসরয়ের আদেশপত্রের উত্তরে। এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল জানান, ওইসব প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়।

উইলিয়াম উইলসন হান্টার ১৮৬২ সালের নভেম্বর ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বয়স ২২ বছর। আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। জুনিয়ার সিভিল সারভেন্ট হিসাবে ভারত সরকারের কাজে তিনি যোগ দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রণয়নের উপযোগী নীতি-নির্ধারণের জন্য ভাইসরয় হান্টারকে নির্দেশ দেন। ভাইসরয়ের নির্দেশপত্রে তিনটি বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। ১. সংগৃহীত উপকরণ সম্ভার ব্যবহার করতে হবে। ২. পরবর্তী স্তরের কাজ সম্পর্কে নীতিনির্ণয় অবশ্যকর্তব্য। ৩. যাবতীয় প্রাপ্ত উপকরণ সম্ভার সুবিন্যস্ত করতে হবে এক খণ্ডের গ্রন্থে।

পূর্বের পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগী হলেন হান্টার। তিনি দেখলেন, তিনটি স্তরে তথ্যচয়ণ প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। প্রথমস্তরে ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। দ্বিতীয়স্তরে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারি আমলাতন্ত্রের কর্মকুশলতা। স্বক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহে নিপুণ। কিন্তু আঞ্চলিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তাঁরা পাননি। তৃতীয় স্তরে ছিল জেলায় জেলায় রাজকর্মচারী। আপন খেয়ালখুশি মতো তাঁরা তথ্য-সংগ্রহ করেছেন। একাজে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি তাঁরা আদৌ মানেন নি। প্রথম স্তরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তাঁদের কাছে তথ্য-চয়ণের কোনো নমুনা ছিল না। দ্বিতীয় স্তরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তাঁদের মনোযোগ ছিল একমুখী, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কর্মধারা ছিল বিভিন্নমুখী, বিচ্ছিন্নতা দোষে আক্রান্ত।

তৃতীয় স্তরের ব্যর্থতার কারণ হল, নানামুখী প্রচেষ্টা যথেচ্ছাচারে পর্যবসিত হয়েছে। মনোযোগ ছিল অসংলগ্ন।

৩

১৮৬৯ সালে হান্টার দু'টি পরিকল্পনা পেশ করেন ঃ ১. *স্টাটিসটিক্যাল সার্ভে*, ২. *ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া*। দুঃসাধ্য কর্মে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের ভূ-পরিসর তখন, ১,৫৫৬,৮৩৬ বর্গমাইল। এই বিস্তীর্ণ ভূ-পরিসরে ২৯০,৪২৪,০৭২ ছিল

জনসংখ্যা। অসংখ্য পরিসংখ্যানের সঙ্গে আঞ্চলিক অনুসন্ধানের সমন্বয়সাধন অবশ্যকর্তব্য। ভারতবর্ষ বহুবর্ণময়, বহুবিচিত্র। এদেশের নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রস্তুত করতে গেলে প্রয়োজন দার্শনিক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আঞ্চলিক গবেষণার সমন্বয় (হান্টারের ভাষায় "a combination of philosppyical reflection with minute local research")।

সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে হান্টার কাজ শুরু করলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য চল্লিশটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তথ্যাদির বিশ্লেষণাত্মক তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন। জেমস লং (James Long) ১৭৮২ সাল পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের একটি নির্বাচিত তালিকা তৈরি করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে হান্টার প্রস্তুত করেন ১৭৮২ থেকে ১৮৩২ কালপর্বের গ্রন্থাদির বিষয়সূচি। প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদির বিশ্লেষণাত্মক তালিকা ও বিষয়সূচি সহজলভ্য হবার ফলে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীবৃন্দ ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় অনায়াসে পেয়ে গেলেন।


উইলিয়াম উইলসন হান্টার

নতুন তথ্য সংগ্রহের কাজেও তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী। এজন্য তিনি নির্ভর করেছিলেন সরকারি টেকনিকাল বিভাগীয় কর্তাব্যক্তি এবং প্রতি জেলার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উপর। তাঁদের তিনি নির্দেশ দিলেন ছয়টি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য ঃ ভূ-সংস্থান, জাতিসত্তা, কৃষি, শিল্প, প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য। প্রতি জেলা থেকে এই ছয় বিষয়ে তিনি তথ্য চেয়ে পাঠালেন। শুধুমাত্র জেলা প্রশাসনের বিভাগীয় প্রধানদের উপর তিনি নির্ভর করেন নি। অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন জেলার গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গের সহযোগিতার উপর। ভারতবর্ষকে চিনতে হবে, চেনাতে হবে। হান্টার জানতেন, একাজ মহাব্রত, মহাসাধনা, মহাযজ্ঞ। তিনি ছিলেন প্রস্তাবিত গেজেটিয়ারের কেন্দ্রীয় সম্পাদক। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত।

নামবাচক বিশেষ্য, অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নামের সঠিক বানান নির্ণয় অতি কঠিন সমস্যা। একই নাম নানাধরণের বানানে লিখিত হয়েছে সরকারি দলিলে বা বিভিন্ন গ্রন্থে। বিভ্রান্তিকর বানানের যুক্তিগ্রাহ্য সঠিক রূপ দিয়ে একটি তালিকা তৈরি করলেন হান্টার। তাঁর তালিকাভুক্ত বানান প্রসঙ্গে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্ক চলেছিল। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার হান্টারকৃত বাংলা বানানের ইংরেজি রূপান্তর মেনে নেন। সরকারি গেজেটে সংশোধিত বানানের ব্যবহার শুরু হল। যথাযথ আদেশ জারি হল পরিকল্পিত গেজেটিয়ারে এই বানান ব্যবহারের

জন্য। নতুন বানান প্রচলনের জন্য হান্টার অনুরোধ করলেন ভারতীয় পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদের। পোস্ট অফিস নির্দেশিকা, রেলওয়ে টাইমটেবিল ও রেলস্টেশনে বিজ্ঞাপনেও নতুন বানান চালু করা হল।

কাজের প্রথমস্তরে তিনি জেলাগুলিকে বেছে নিলেন ভৌগোলিক একক হিসাবে। প্রাদেশিক গেজেটিয়ার তৈরি হল দ্বিতীয় স্তরের কাজ। তৃতীয় স্তরে কাজের ভিত্তি হল জেলা নয়, প্রদেশও নয়। সংগৃহীত যাবতীয় উপকরণ সাজানো হল বর্ণমালা অনুসারে অর্থাৎ অভিধানের মতো এ বি সি ডি ইত্যাদি অনুক্রমে।

কেন্দ্রীয় সম্পাদনার উপযোগিতা হান্টার মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। নিরলস যোগ্য তত্ত্বাবধান ছাড়া একাজ সম্ভব নয়, বঙ্গদেশের লেফটেনান্ট গভর্ণরও তা সম্যক বুঝেছিলেন। কেন্দ্রীয় সম্পাদনার দায়িত্ব পেলেন হান্টার স্বয়ং। প্রধান সম্পাদক হিসাবে তাঁর বেতন ছিল মাসিক এক হাজার টাকা। ভ্রমণ-ভাতাও তিনি পেতেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন সহযোগী নিয়োগ করা হয়েছিল চারশত টাকা বেতনে। এই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করতে সরকারি নির্দেশ মতো তাঁর সময় লেগেছিল ঠিক বারো বছর। আঞ্চলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে তিনি ছিলেন সদাই আক্রান্ত। সুলভ-দুর্লভ যানবাহনে বা পায়ে হেঁটে তিনি ভ্রমণ করেছেন ৫০,০০০ মাইল ব্যাপ্ত অঞ্চল। বারো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি জেলা ও প্রদেশের বিবরণ সম্পাদনা করেছেন মুদ্রিত ১০০ খণ্ডে। মোট ৩৬,০০০ পৃষ্ঠা সংখ্যা। এই গ্রন্থমালায় বিধৃত আছে ১৯০ মিলিয়ন জনসংখ্যার বিবরণ। এসব বিপুল তথ্যসম্ভার থেকে জন্ম নিয়েছে *ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া*। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এই মহাগ্রন্থমালায় বিধৃত আছে ৮,০০০ স্থান নামের বিবরণ। ভারত সরকারের হাতে সম্পূর্ণ গেজেটিয়ার সমর্পণ-উৎসব উপলক্ষ্যে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল হান্টার তাঁর আত্মতুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন হৃদয়গ্রাহী ভাষায়ঃ

> I have ever borne in mind that the work has been paid for by the Indian people and that it was primarily designed as an aid to better government of their country. Nothing, I wrote in my original plan submitted to the Viceroy in 1869, is more costly to a government than ignorance. I believe inspite of all its defects, this work will prove a memorable episode in the long battle against ignorance and a foundation for a truer and wider Knowledge of India in time to come. Its aim has been, not literary graces, nor scientific discovery, nor antiquarian research, but an earnest endeavour to render India better government, because better understood.

তাঁর প্রধান লক্ষ্যের মহামূল্য অভিব্যক্তির সার কথা বাংলা ভাষায় এখানে উপস্থাপিত করছিঃ

সততই আমি মনে রেখেছি, ভারতীয় জনগণের অর্থে একাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের দেশের আরও সুশাসনের জন্য মূলত একাজের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয়ের কাছে আমি যে মূল পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম তাতে আমি লিখেছিলাম, অজ্ঞতা হেতু সরকারকে যে মূল্য দিতে হয়, এমনতরো আর কিছুতেই হয় না। আমি বিশ্বাস করি যাবতীয় বিচ্যুতি সত্ত্বেও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে একাজ স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে প্রমাণিত হবে। ভাবীকালেও একাজ বিবেচিত হবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরও সত্য সমৃদ্ধ আরও ব্যাপক জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে। একাজের লক্ষ্য সাহিত্যিক মাধুর্য নয়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, প্রাচীন নির্দশন-সংক্রান্ত গবেষণা নয়। ভারতকে অধিক সুশাসিত করার লক্ষ্যে এটা আন্তরিক প্রচেষ্টা। কারণ ভারতবর্ষকে আরও ভালোভাবে জানতে হবে।

মুর্শিদাবাদে নগরায়ণ

ড. কিশোর কুমার রায়চৌধুরী

নগর কাকে বলে এই বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানে কোনও স্থায়ী সংজ্ঞা নেই। এল এস এস ও'মালি ১৯১১ সালে যে সেন্সাস প্রস্তুত করেন,[১] তাতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার বসবাস অনুসারে শহর এবং গ্রামের পার্থক্যকরণের চেষ্টা করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে যে অঞ্চলে ১ লক্ষ বা তার বেশি লোকসংখ্যার বসবাস সেই অঞ্চল প্রথম শ্রেণীর শহর। একইভাবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরের লোকসংখ্যা হবে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষের মধ্যে। তৃতীয় শ্রেণীর শহরের লোকসংখ্যা হবে ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে। আবার ১০ হাজার থেকে ২০ হাজারের মধ্যে লোকসংখ্যা বিশিষ্ট অঞ্চল হবে চতুর্থ শ্রেণীর শহর। বিংশ শতাব্দীতে শহর বিবেচিত হওয়ার জন্য যে মাপকাঠি ঠিক করা হয় তাতে দেখানো হয় নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্ত পরিপূরিত হলে সেই অঞ্চল শহর হিসেবে বিবেচিত হবে।[২] শর্তগুলি হল ঃ (১) সেই অঞ্চল হবে, পৌর এলাকাভুক্ত, অথবা করপোরেশন এলাকাভুক্ত, অথবা ক্যানটনমেণ্ট এলাকাভুক্ত, অথবা বিশেষ প্রজ্ঞাপিত (notified) এলাকা (২) এছাড়াও সেই অঞ্চলগুলিই শহর হিসেবে বিবেচিত হবে যেখানে (ক) পাঁচ হাজার বেশি জনসংখ্যা বসবাস করবে; (খ) ওই অঞ্চলে ৭৫ শতাংশ অ-কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত হবে (গ) প্রতি বর্গ কিলোমিটারের জনঘনত্ব হবে অন্তত চারশ জন।

এই সব সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই মুর্শিদাবাদের নগরায়ণ প্রক্রিয়া আলোচনা করা যায়। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে শহর বিবেচিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনও মাপকাঠি ছিল না। তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করে মুর্শিদাবাদের কয়েকটি অঞ্চলকে শহর হিসেবে সহজেই বিবেচিত করা চলে। এ নিবন্ধে সেই বিষয়টি আমি নির্দেশ করার চেষ্টা করব। আবার বর্তমানে এই জেলায় যে অবনগরায়ণ (deurbanisation) প্রক্রিয়া চলছে সে বিষয়টিও এখানে

১। Census India : 1911 : Bengal, Bihar, Orissa and Sikkim, L.S.S.O' Malley : Table IV. ২। Ruddar Datt and K.P.M. Sundharam : Indian Economy : S. Chand and Company Ltd. Twenty-Third edition : New Delhi, P-59.

আলোচনার সুযোগ আছে। এই আলোচনা ব্যাখ্যায় সাম্প্রতিককালের প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index or HDI) এর সাহায্য নেওয়া যায়।

আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক দিক থেকে বিশেষ সুবিধা থাকার জন্যই এই ভূখণ্ডের কয়েকটি অঞ্চলকে রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সময়কাল থেকেই শহর হিসেবে গণ্য করা যেত। সপ্তম শতাব্দীতে এই ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীকে কেন্দ্র করে একটি এলাকা (বর্তমানে কর্ণসুবর্ণ) নগরের চরিত্র পায়। ওই শতাব্দীতে রাজাকে কেন্দ্র করে শাসনভিত্তিক অঞ্চল হিসেবে গুরুত্বলাভ করে কর্ণসুবর্ণ এলাকা। সে সময়ে এই অঞ্চলটি অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এতদ এলাকায় জন সমাবেশ ঘটে। কয়েকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে গৌড়েশ্বর ছিলেন রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত। রাঙামাটি অঞ্চলে (অধুনা কর্ণসুবর্ণ) তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর রাজধানী। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলে জানা যায়, সেকালে বাংলাদেশে বিশেষ করে অধুনা মুর্শিদাবাদের একটি বড় অংশে বৌদ্ধ প্রভাব সম্প্রসারিত হয় এবং বৌদ্ধ বিহার গড়ে ওঠে। জেলার রাঙামাটি চাঁদপাড়া অঞ্চলে যদুপুর গ্রামে কয়েকটি ডাঙ্গা খনন করে পাঁচটি পৃথক নগর স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩] ওই অঞ্চলে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ আবিস্কৃত হয়। বিহার শব্দের অর্থ বৌদ্ধমঠ। বলা যায়, সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল এই অঞ্চল। হিউ এন সাং-এর[৪] বর্ণনায় পাওয়া যায়, কর্ণসুবর্ণ এলাকা ছিল তৎকালীন উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। অনেক মঠ ছিল সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ধর্ম অনুশীলন করতেন। দশ জনেরও বেশি সন্ন্যাসী দু-হাজারেরও বেশি শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থী আসত। এই সময়েই এই ভূখণ্ডে জনসমাবেশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। যে যে কারণে জনসমাবেশ ঘটেছিল তার অন্যতম কারণগুলি ছিল (১) রাজধানীকে কেন্দ্র করে (২) স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে (৩) বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে (৪) শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে (৫) নদী পথের যোগাযোগের সুবিধা থাকার জন্য।

এই সকল কারণই জনসমাবেশ এবং তৎকালীন প্রক্রিয়া অনুসারে নগরায়ণ প্রক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলাঞ্চলে নগরায়ণের সূচনা হয় ১৬৫০ সালের পর থেকে, বলা বাহুল্য রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর রাজধানী বা প্রভাবশালী রাজন্যবর্গের রাজ্যপাট এই জেলাঞ্চল থেকে সরে যায়। গৌড় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কর্ণসুবর্ণ বন্দর গরিমা হারায়, ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়। ওই সময়ে এই ভূখণ্ডে জেলার জনসমাগম ঘটে নিম্নরূপ[৫] ঃ

সাল	জেলায় (তৎকালীন ভূখণ্ডে)	শহরাঞ্চলে
১৬৫০	৮ লক্ষ ১৬ হাজার	৫০ হাজার
১৭০০	৯ লক্ষ	৮০ হাজার
১৮০১	১০ লক্ষ ২০ হাজার ৫৭২	—
১৮০৪	—	৩ লক্ষ

৩। Das Sudhir Ranjan : Archaeological Discoveries from Murshidabad : The Asiatic Society : Park Street, Calcutte-16. Preface.

৪। Census 1961 : West Bangal District Census Hand Book : Murshidabad P. 28.

৫। সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত ঃ প্রবন্ধ, মুর্শিদাবাদ চর্চা ঃ প্রকাশক ঃ প্রতিভারঞ্জন মৈত্র ঃ প্রথম প্রকাশ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পৃ: ৪৮। ৬। পূর্বোক্ত

১৭৫৯ সালে ক্লাইভের উল্লেখে পাওয়া যায়, মুর্শিদাবাদ শহর লণ্ডন শহরের মতই সুবিস্তৃত,※ জনবহুল এবং সম্পদশালী ছিল। আর একটি হিসেবে দেখা যায়[৬] ঃ

সাল	মোট	মুর্শিদাবাদ শহরে	লণ্ডন শহরে
১৭৫৯	—	৭,৫০,০০০	৭,৫০,০০০
১৭৬০	—	"	—
১৭৬৫	—	৪,৫০,০০০ এর বেশি	—
কিন্তু ১৭৫৭ ছিল	১৪ লক্ষ	৬ লক্ষ	

১৬৫০ সাল থেকে এই ভূখণ্ডে বাণিজ্যের গতিশীলতা বাড়তে থাকলেও ১৭০০ সালের পর থেকে ভারতের মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ওই বছর মুর্শিদ-কুলি-খাঁকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে কার্যভার দেওয়া হয়। ওই সময় থেকেই বাংলার প্রশাসনে এবং সরকারি নীতিতে একটি পরিবর্তনের ধারার সূচনা হয়। একটি বড় মাপের রাজস্ব মুর্শিদ-কুলি-খাঁর মাধ্যমে মোঘল রাজের কাছে যাওয়ার ফলে ভারতের রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে মুর্শিদ-কুলি-খাঁর গুরুত্ব বাড়ে।[৭] মুর্শিদাবাদও ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। মুর্শিদকুলি খাঁকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের প্রশাসনিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নগরায়ণের অন্যান্য উপাদানগুলির কেন্দ্রীভবন। এই ভূখণ্ড বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। এজন্য বন্দর কাশিমবাজারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। জলপথকে কেন্দ্র করে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি হতে থাকে। এই জেলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হতে শুরু করে। এর সঙ্গে শুরু হয় অর্থের বাজারের সম্প্রসারণ। সেই সময়, বিশেষ করে ১৭২২ সাল থেকে ১৭৪৪ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে আর্থিক লেনদেনের বাজারের দ্রুত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন মানিকচাঁদ থেকে ফতেচাঁদ পর্যন্ত জগৎ শেঠ সম্প্রদায় বা জগৎশেঠ পরিবার। ১৭১১ সালে মোঘল শাসকের দ্বারা মানিকচাঁদ 'জগৎ শেঠ' (Banker of the world) উপাধি লাভ করেন। ওই সময় থেকে আর এক জগৎশেঠ ফতেচাঁদ (১৭৪৪) এর সময় পর্যন্ত এই অঞ্চল বিশেষ মর্যাদা পেতে থাকে। বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এঁদের ক্ষমতা চরম পর্যায়ে ওঠে। উইলিয়াম ওয়াট্ এর সমীক্ষা অনুসারে "Jagat Seth was the greatest Banker in the Empire of Indostan and the Second power in Bengal" জিন ল' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন "Seth as the bankers of the Mogul."[৮] আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ধরণের ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবার এবং তাদের কেন্দ্র করে অন্যান্য ব্যবসায়ী মহলের উত্থান স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলকে তৎকালীন নগর সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুরু হয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জনসমাগম। ১৭০৮ সালে মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল আনা হয়। বাংলার টাঁকশালে ওই সময়ে তিন রকমের মুদ্রা তৈরি হত— সোনা, রূপো ও তামা। প্রায় বত্রিশ রকমের মুদ্রা ওই সময় বাংলায় আসত। এই সব মুদ্রার বিনিময় হার ঠিক করতেন জগৎশেঠ পরিবার। জগৎশেঠ পরিবার ছাড়াও আরো অনেক ব্যবসায়ী এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অন্যতম

※ "The city of Murshidabad is as extensive, populous and rich as the city of London with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater pnoperty than in the cast city."

৬। সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত — পূর্বোক্ত।

৭। Chaudhury Sushil : The Prelude to Empire : Plassey Revolution of 1757, First Published 2000. MANOHAR-New Delhi. P. 14. ৮। Ibid : p. 118-119.

বড় ব্যবসায়ীরূপে পরিণত হন। এদের মধ্যে হুজুরিমল, জনার্দ্দন শেঠ, বানারসী শেঠ, আনন্দিরাম অন্যতম। এই পরিবার সুদে টাকা ধার দেওয়া, টাকার বিনিময় ও হুন্ডি কাটার ব্যবসা করতেন।[৯] একটি হিসেবে দেখা যায় পলাশী-যুদ্ধ-পূর্ব বাংলায় বছরে ৭৮,০০,০০০ টাকার সোনারুপো আসত। কিন্তু পলাশী যুদ্ধ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে কোম্পানির শাসনকালে সোনা-রুপো আনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[১০]

আর্থিক বিষয় ছাড়াও পলাশী-যুদ্ধের আগে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। ভগবানগোলায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি ছিল। বাণিজ্য পণ্যগুলি ছিল সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, কাঁচা রেশম, সোরা, আফিম, নীল ইত্যাদি।[১১] দেশি বিদেশি অনেক ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে। এই জেলা অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে। বন্দর কাশিমবাজার এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়কাল থেকেই এই ভূখণ্ডে নগরায়ণের উপাদানগুলি ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। মুর্শিদকুলি খাঁ এই অঞ্চলে এক ধরণের ভূমি সংস্কার করেন। এর ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রও উৎপাদনশীল হয়। এই ভূমি সংস্কারের দুটি রূপ পাওয়া যায়— (১) জাগির খালসা প্রথা ঃ এই প্রথায় সব জাগির অফিসারদের খালসায় পরিণত করেন (২) উড়িষ্যার দরিদ্র অঞ্চলে জাগিরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।[১২] এর ফলে মুর্শিদকুলি খাঁ-এর রাজস্ব থেকে আয় বাড়ে দশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো পনেরো টাকা।[১৩]

আর্থিক ক্ষেত্র ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের এই চরম উন্নতি এই ভূখণ্ডে লক্ষ্য করা গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে। স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে জনসমাগম। বিভিন্ন ধর্মের লোকজন এসে তৈরি করেন তাঁদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছিল তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

সপ্তম শতাব্দী থেকেই এই বিষয়টি শুরু করা যায়। এই ভূখণ্ডের কর্ণসুবর্ণ রাজা শশাঙ্কের সময়ে ছিল অন্যতম প্রধান নৌবন্দর। ভাগীরথীর প্রবাহ ধরে এই নৌবন্দর থেকে সহজেই সমুদ্রে যাওয়া সম্ভব ছিল। কর্ণসুবর্ণ থেকে প্রশাসনকেন্দ্র গৌড়ে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের নদী-বন্দরের গুরুত্ব হারায়।[১৪] এছাড়াও রাজা শশাঙ্কের আকস্মিক মৃত্যুতে কর্ণসুবর্ণ ও বঙ্গদেশ বড় সমস্যার মধ্যে পড়ে। শশাঙ্কের পরে কোনও সক্ষম উত্তরাধিকারী ছিলেন না।[১৫] স্বাভাবিকভাবে ওই সময়ে পতন হয় একটি নগরায়ণ প্রক্রিয়ার দীর্ঘকালীন সম্ভাবনা।

যে কোনও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা থাকে রাস্তা-ঘাটের। এই বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও বলা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে এই জেলাঞ্চলের সঙ্গে নদীপথ ছাড়াও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালই ছিল। হয়ত বর্তমানের সাপেক্ষে এই পথগুলি কাম্যস্তরের চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় সড়কপথের যোগাযোগ

৯। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার ঃ প্রাক পলাশী বাংলা — কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী ঃ কলকাতা-১৯৮২, পৃ: ৯৯। ১০। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার ঃ বাংলার আর্থিক ইতিহাস — কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী ঃ কলকাতা-১৯৮২, পৃ: ১৫৩।

১১। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার ঃ বাংলার আর্থিক ইতিহাস — কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী ঃ কলকাতা-১৯৮২, পৃ: ৮০-৮১। ১২। Census 1961 : op.Cit. p. 29.

১৩। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার ঃ বাংলার আর্থিক ইতিহাস — কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী ঃ কলকাতা-১৯৮২, পৃ: ২। ১৪। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার ঃ ২০০৩, পৃ: ৩৯১।

১৫। দাস সুধীর রঞ্জন ঃ কর্ণসুবর্ণ মহানগরী — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ: ৫।

ছিল এবং তৎকালীন সময়ের তুলনায় ভালই ছিল। ১৭৯৩ সালে লেখা রেনেলের গ্রন্থে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। ব্রিটিশ মাইলের ভিত্তিতে তিনি এই যোগাযোগের বিষয়টি উল্লেখ করেন।[১৬] একটি উল্লেখে দেখা যায় কাশিমবাজার থেকে রাজমহল-ভাগলপুর হয়ে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ২৮৫ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা ছিল। ওই রাস্তা দিয়ে দিল্লী যাওয়া যেত। এছাড়াও ১৭১৮ সালে কাশিমবাজারে তৈরি হয় পাকাপোক্ত জাহাজ ঘাট।[১৭] এই জাহাজ ঘাট থেকে ছোট নৌকো এবং বড় নৌকোর সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হত।

ওই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় অঙ্গ হিসেবে যে দুটি অঞ্চলে (কাশিমবাজার ও লালবাগ) শহর জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল তার অন্যতম উপাদান ছিল ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রকৃতি ও ধর্মীয় কার্যকলাপ ও আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি। জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগমন ও বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় কার্যকলাপ ও আচার অনুষ্ঠান সম্প্রসারিত হয়। জেলায় ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। পাশাপাশি খ্রীষ্টান ধর্ম ও জৈন ধর্মের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। জিয়াগঞ্জে বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে গোবিন্দবাড়ি, বড়নগরে হিন্দুদের প্রায় সব দেবদেবীর মন্দির, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে জৈন মন্দির, লালবাগে বিভিন্ন মসজিদ একদিকে বড় স্থাপত্য অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত লাভ করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও জনসমাবেশ উল্লেখযোগ্য রূপ ধারণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের এই উত্থান যা নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছিল, পলাশীযুদ্ধের পর এই প্রক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া শুরু হয়। অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় নেতিবাচক গুণক প্রভাব কাজ করতে শুরু করে।

পলাশী যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদে নবাবের বসবাস থাকলেও তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকে না। পলাশী যুদ্ধের পর জেলায় শুরু হয় প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে চলে কলকাতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা। মুর্শিদাবাদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। আদালত, টাঁকশাল, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত অফিস কলকাতায় স্থাপিত হয়। জেলায় রাজন্যবর্গ ও নবাব পরিবারের অনেকেই চলে যেতে থাকেন কলকাতায়। পুরাতন রাজা ও জমিদারের রাজস্ব সংগ্রহ করে কোম্পানি শাসকদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থায় চাপ বাড়ে। মুন্নিবেগম, রানী ভবানী, জগৎশেঠ পরিবার এবং আরো অনেক বিত্তবান পরিবার ক্রমশ কোম্পানি-প্রশাসনের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। কলকাতার পাশে হুগলী নদীর ধারে শিল্পস্থাপনে প্রচেষ্টা, কলকাতায় স্কুল-কলেজ ইত্যাদি সেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ফলে মুর্শিদাবাদ থেকে অভিজাতশ্রেণীর একটি বড় অংশ কলকাতায় চলে যেতে থাকেন।

পলাশীযুদ্ধের কয়েক দশক পরে অবনগরায়ণের গতির আরও একটি অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১৭৬৯ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে পরপর দুবার দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারি জেলার আর্থ-সামাজিক চিত্র পাল্টিয়ে দেয়। জেলায় কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু এবং প্রতিকূল পরিবেশের ভয়ে অনেকের স্থানত্যাগ — এই দুটি কারণ অনেক গ্রামের ও শহরের জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়।

১৬। Rennel, James : Memoir of a Map of Hindoostan or the Mogul Empir : Third edition : Londan-179?. 1976 : Editions Indian : Calcutta. P. 367-379.

১৭। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার ঃ ২০০৩, পৃ: ৩৯১, ৩৯৫।

মানবিক মূলধনের ক্রমহ্রাসমানতা জেলার উৎপাদন খুবই কমিয়ে দেয়। যে সব অঞ্চল কয়েক দশক আগে অন্যতম উন্নতকেন্দ্র ছিল, সেই সব অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হয়ে দরিদ্রতম অঞ্চলে পরিণত হয়। গ্রেটবৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সূচনা এবং তাদের কৃষিজাতদ্রব্যের যোগানের তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি এবং তার ফলে এই সব অঞ্চল থেকে চাল সংগ্রহের তাগিদ ও এই সব কারণে ইংরেজ শাসকগণ কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে বিশেষ করে চাল সংগ্রহ করতে থাকে, এই সময় চালের রপ্তানী করে একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণী উচ্চবিত্তে পরিণত হয়। নতুন শহর কলকাতায় তাঁরা বসবাস শুরু করেন। এই জেলা ক্রমশ নিম্ন কৃষিনির্ভর অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে।

এছাড়াও ১৭৭০ সালের পর জেলার দীর্ঘদিনের বাণিজ্যক্ষেত্র ক্রম সংকুচিত হতে থাকে। লার্ড কর্ণওয়ালিশ মুর্শিদাবাদ থেকে রাজস্ব, সিভিল ও ক্রিমিনাল কোর্টের সমস্ত কর্মচারীদের কলকাতায় যেতে সাহায্য করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে টাঁকশাল সংক্রান্ত সমস্ত অফিস কলকাতায় চলে যায়। প্রমাণ করা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ সাল) সমস্ত সুফল কলকাতার নব্য ব্যবসায়ী জমিদারগণ পেতে থাকেন। বলা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদ ভূখণ্ডে যে উপাদানগুলি এই অঞ্চলকে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম নগর হিসেবে পরিচিত করেছিল, পলাশীযুদ্ধের পরের তিন দশকে সেই সব উপাদানগুলি প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতের মানচিত্রে এই অঞ্চল একটি পিছিয়ে থাকা অঞ্চল হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

অতি সাম্প্রতিক কাল ঃ

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রামের সংখ্যা ২২১০ টি, পৌরসভা ৭টি এবং শহর ২২ টি।[১৮] কিন্তু সুক্ষ বিচারে জেলায় কোনও অঞ্চল শহরের সব বৈশিষ্ট্য পরিপূরিত করেছে কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক থেকে যায়। একটি সাধারণ মানের শহরে অকৃষি ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কর্মীর প্রাধান্য থাকবে। সে দিক থেকে বহরমপুর ছাড়া অন্য কোনও অঞ্চলকে শহর বলা যাবে কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের যে মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্বাস্থ্যসূচক, আয় সূচক, শিক্ষাসূচক এর ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ জেলার পেছনে রয়েছে পুরুলিয়া ও মালদা জেলা। মানব উন্নয়ন মানের সূচকের মান কলকাতায় যেখানে ১, মুর্শিদাবাদ সেখানে ১৫। ২০০১ সালের হিসেব অনুযায়ী রাজ্যে হাসপাতালে শয্যা পিছু জন সংখ্যা ১২৫৭ জন, সেখানে মুর্শিদাবাদে এই সংখ্যা ২১৫৬ জন। জেলায় ২৬টি ব্লকের মধ্যে ১৮টি ব্লকের জলে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব ধরা পড়েছে। জেলায় মোট জনসংখ্যা যেখানে ৫৮,৬৩,৭১৭ জন সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩১৭০ টি। এখনও সাক্ষরতার হার ৫৫.০৭ শতাংশ। ১৯৮১ সালের একটি হিসেবে দেখা যায় জেলার ১৯২৩ টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ৬৯১ টি গ্রামে সব মরশুমে চলার মতো রাস্তা রয়েছে।[১৯] কোন অঞ্চলে যদি এই ধরণের প্রতিকূল প্রভাব থাকে তাহলে নগরায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। জেলায় কাম্য-নগর আছে কিনা এই বিতর্ক এই জন্য ওঠা স্বাভাবিক। সক্ষমতার বিচারে মানুষের প্রকৃত ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে প্রাথমিকভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।[২০] তবেই পারিবারিক ভিত্তিতে বা অঞ্চল ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে মুর্শিদাবাদে এই বিষয়টি করা হয়নি। নগরায়ণ প্রক্রিয়া

১৮। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার ঃ ২০০৩, পৃ: ১৫৯। ১৯। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার ঃ ২০০৩, পৃ: ৩৯৮, ৪১২, ৫১২, ৫৩২। ২০। সেন, অমর্ত্য ঃ উন্নয়ন ও স্বাক্ষরতা। প্রথম সংস্করণ-২০০৪। আনন্দ পাবলিশার্স— কলকাতা-৯। পৃ: ১৩৩।

উন্নয়নের মান নির্ধারণ করে। মুর্শিদাবাদে এই মান কমেছে। অর্থনৈতিক স্লোগানের সঙ্গে রাজনৈতিক স্লোগানের যদি মিল না থাকে, তবে উন্নয়ন ব্যহত হবেই। জেলায় এই ঘটনাটিই ঘটেছে। এই কারণে ইতিহাস থেকে আমাদের উৎসাহ নিতে হয়।

পরিশেষ ঃ

ধরে নেওয়া যাক যে নগরায়ণ (U) নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর ১) একটি সর্বনিম্ন জনসংখ্যার পরিমাণ (P), (২) অঞ্চলটিতে জনসমাগমের ধারা বর্তমান রয়েছে (M); ৩) শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্র ক্রমসম্প্রসারিত, (Ic); ৪) বিনিয়োগকারীগণের বিনিয়োগ করার মানসিকতা রয়েছে (Ip); ৫) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ রয়েছে (W); ৬) মহিলাদের কাজে অংশগ্রণের হার ক্রমসম্প্রসারিত (G); ৭) গণতান্ত্রিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ণের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে (D)।

তাহলে, সহজেই একটি ক্রিয়াগত সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এই সম্পর্কটি হল ঃ

$$U = f(P, M, Ic, Ip, W, G, D)$$

অর্থাৎ Uকমবেশি নির্ভর করে ডানদিকের নির্ধারকগুলির ওপর।

রাজা শশাঙ্কের সময়ে ভূমির উর্বরতা ও কৃষিসম্পদ যথেষ্ট ছিল বলে জানা যায়। সর্বত্রই শস্য ও ফল উৎপাদনের প্রাচুর্য ছিল। ঘন লোকবসতি ছিল। অধিবাসীরাও নির্ভীক ছিল। ভারতের জ্ঞানার্জনের পীঠস্থান ছিল এই রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহার। এছাড়াও এই অঞ্চল সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক ব্যবসায়িক সূত্রে যুক্ত ছিল।[২১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ওই সময়ে 'U'কে পরিপূরিত করার ক্ষেত্রে সবকটি নির্ধারকই ক্রিয়াশীল ছিল। ওই সময়ে নগরায়ণ হয়েছিল তা এই সমীকরণের সাহায্যে বলা যায়।

এরপরেই এসে যায় অষ্টাদশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে অঞ্চলে জন সমাবেশ যথেষ্ট ঘটেছিল। কাশিমবাজার বন্দরকে কেন্দ্র করে শহরাঞ্চলে ৫০ থেকে ৮০ হাজার জনসংখ্যার বসবাস ছিল। জেলাতেও ৪ লক্ষের বেশি লোকের বসবাস ছিল। এছাড়াও এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন সময় সাপেক্ষে ব্যাঙ্কিং ও অর্থ লেনদেন ব্যবস্থাও উন্নত ছিল। আর্থিক কাজকর্ম ছিল অবাধ মুক্ত ও স্বাধীন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় খালসা খাতে আসল জমা ৮৭,৬৭,০১৫ টাকা, বাড়তি বাজস্ব ১১,৭২,২৭৯ টাকা ও জাগির অধিগ্রহণের ফলে বর্ধিত আয় ১০,২১,৪১৫ টাকা সব মিলিয়ে ১০,৯৬,৭০৯ টাকা ছিল ভূমি রাজস্বের আয়। এছাড়াও মুর্শিদাবাদে সেই সময় বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি ছিল।[২২] ওই সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাঁদের স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ এই অঞ্চলে এখনও রয়েছে। বলা যায় 'U' এর জন্য নির্ধারকগুলি যথেষ্ট পরিমাণেই ওই সময়ে ছিল। সুতরাং নগরায়ণ ঘটেছিল।

কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর এই জেলায় নগরায়ণ প্রক্রিয়া অতি ধীরগতি সম্পন্ন। জনসংখ্যা বাড়লেও 'U'-এর অন্যান্য নির্ধারকগুলি বাড়েনি। বরং সাম্প্রতিককালে বহরমপুর শহরকে

২১। দাস সুধীররঞ্জন ঃ কর্ণসুবর্ণ মহানগরী — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃ: ১৬৩।

২২। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার ঃ বাংলার আর্থিক ইতিহাস — কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী ঃ কলকাতা-১৯৮২, পৃ: ৩, ৯৪।

কেন্দ্র করে যে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাও অতি ধীরগতি সম্পন্ন। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে মহৎ শক্তির পাশে যদি পশুশক্তি ক্রিয়াশীল হয় তবে মহৎ শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। জেলায় সে বিষয়টি ঘটেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জেলায় একটি বড় অংশে কাজ করছে পরিবেশ বিপর্যয় প্রক্রিয়া। নারীদের জীবনযাত্রার সূচক বর্তমানে ২৮.৯৯। জেলায় মহিলাদের কর্মে অংশগ্রহণের শতকরা হার ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে ১০.৩৩ শতাংশ।[২৩] এছাড়াও রয়েছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নদী-প্রবাহকে কেন্দ্র করে ভূমিক্ষয়। প্রয়োজন দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার। এই দিক পর্যালোচনা করলে বলা যায়, জেলায় বর্তমানে নগরায়ণ প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে না। কারণ নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পদের বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত উপার্জন বৃদ্ধি, শিল্পায়ণ সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও পরিবেশের উপাদানের ভারসাম্য রক্ষা করার বিষয়গুলি জড়িত।



আর্সেনিক দূষণ ঃ জেলার নগরায়ণের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক।
বহরমপুর শহরের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আর্সেনিক দূষণে আক্রান্তদের অনশন অবস্থান।

২৩। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার ঃ ২০০৩, পৃঃ ১৯৮।

মুর্শিদাবাদ জেলার নদীপথ ও নদীবন্দর যুগে যুগে

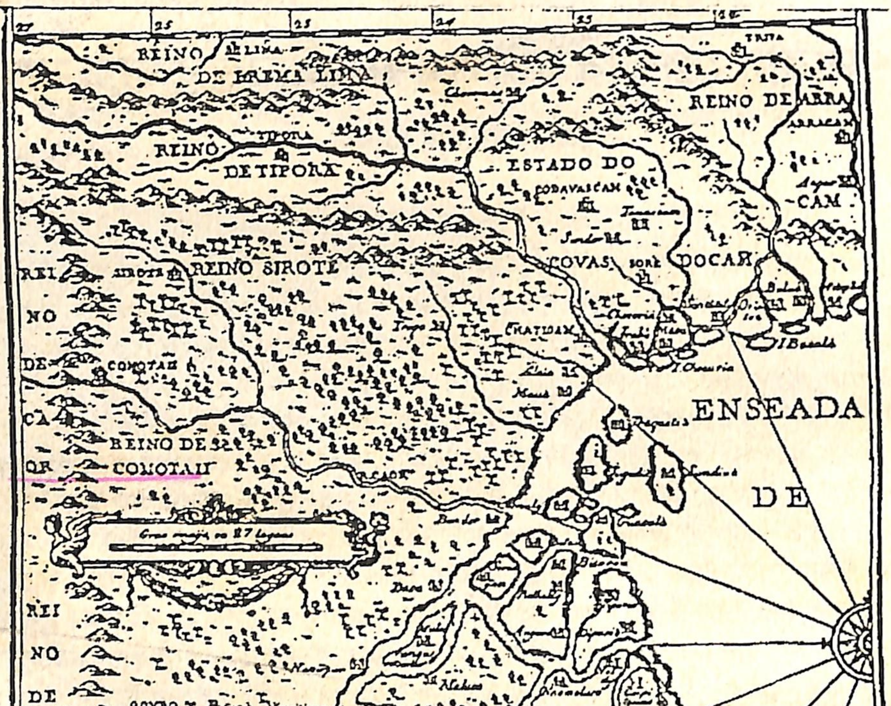
জ্যোতির্ময় রায় চৌধুরী

বর্তমান রাজমহলের দক্ষিণে একদা (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশো অব্দ থেকে শুরু করে খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত) বিরাজ করত সুপ্রাচীন 'কজঙ্গল' নগরী। সম্ভবত ঃ এর খুব কাছেই (বর্তমান ফরাক্কার অনতিদূরে) ছিল 'মহাশালা' এবং বুদ্ধদেবের সমসাময়িক 'পৌড্রকক্ষ' জনপদ। আর সামান্য দক্ষিণে (বর্তমান রঘুনাথগঞ্জের পূর্বে) অবস্থান ছিল মৌর্য-গুপ্ত-পাল যুগের বর্ধিষ্ণু নগরী প্রাচীকোট এর (পাইকোড়)। বর্তমান বহরমপুর শহরের সামান্য দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল বৃহত্তর কর্নসুবর্ণ মহানগরী। এ'নগরী সম্রাট অশোক হর্ষবর্ধন এবং শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক'। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলের উত্তরাংশেই কোনও এক স্থানে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন 'রাঢ়াপুরী' নগরী। (কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে রাঢ়াপুরী বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।) বিভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে কজঙ্গল নগরীর উল্লেখ আছে। স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কজঙ্গলে এসেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য তথা শাস্ত্র গ্রন্থ দিব্যাবদানের অন্তর্গত 'কোটিকর্ণাবদানে' পুণ্ড্রবর্ধন এবং তার অনতিদূরে অবস্থিত পুণ্ড্রকক্ষ বা পৌড্রকক্ষ নগর ও ওই একই নামের একটি পর্বতের উল্লেখ আছে। পাইকোড় বা প্রাচীন প্রাচ্যরাজ্যের রাজধানী 'প্রাচীকোট' দশম শতাব্দীতেও অর্থাৎ পাল রাজত্বের শেষদিকেও দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মচর্চাকেন্দ্র ছিল। ''মহাশালা' নগরীর কথা বৌদ্ধসাহিত্যে আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তীকালে বরিন্দ ভূমির দক্ষিণে এক সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর গৌড়। উপরোক্ত জনপদগুলির বেশিরভাগই গড়ে উঠেছিল রাঢ় ভূমি এবং মালভূমি সংলগ্ন অঞ্চলে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল যখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠে জনবসতি স্থাপনের উপযুক্ততা অর্জন করছিল, তখনও পাবনা, ফরিদপুর, কুষ্ঠিয়া, খুলনা, যশোহর, বরিশাল এবং বৃহত্তর সুন্দরবন অঞ্চল সহ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল ভূখণ্ড পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি। ওইসব জায়গায় বিস্তীর্ণ জলাভূমির মধ্যে মধ্যে পলি জমে ঈষৎ উচ্চ বহু দ্বীপের উৎপত্তি হয়ে চলেছিল। পরবর্তকালে ওইসব উচ্চভূমিতে জনবসতি সম্প্রসারিত তথা স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রাচীন গঙ্গাহৃদি এবং সমতট রাজ্যের বৃহত্তর ও সম্প্রসারিত অংশটি ছিল সাগরতট সংলগ্ন এলাকা।

রাঢ়বঙ্গে গঙ্গার প্রাচীনতম ধারা সম্পর্কে নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন— ''মৎস্য পুরাণে আছে কৌশিক (উত্তর বিহার) ও মগধ (দক্ষিণ বিহার) পার হইয়া গঙ্গা বিন্ধ্য পর্বতের গাত্রে (রাজমহল—সাঁওতালভূম— ছোটনাগপুর— মানভূম— ধলভূম

শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ মোটামুটি উত্তর-রাঢ়, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত।'' তিনি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আরও লিখেছেন— ''রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা খুব সম্ভবত খানিকটা উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া গৌড়কে পশ্চিমে বা ডাইনে রাখিয়া রাঢ় দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণবাহিনী হইত। ... কিন্তু সপ্তদশ শতকেই গঙ্গা-



১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে জাও দ্যা ব্যারোস-কৃত বাংলার ভূমি ও নদনদীর মানচিত্র।

ভাগীরথী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান পথ প্রবর্তন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেরও আগে গঙ্গা-ভাগীরথীর উত্তর প্রবাহের প্রাচীনতর পথ বোধহয় ছিল এবং এ পথটি বর্তমান প্রবাহের পশ্চিমে। পূর্ণিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর- মানভূম-ধলভূমের নিম্নভূমি ঘেঁসিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ঝিল ও নিম্নজলাভূমিময় এক সুদীর্ঘ দক্ষিণবাহী রেখা চলিয়া গিয়াছে। এই রেখা এখনও বর্তমান। এই রেখাই গঙ্গা-ভাগিরথীরপ্রাচীনতম প্রবাহপথের নির্দেশক বলিয়া আমার ধারণা।'' — শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের এই ধারণার প্রত্যক্ষ প্রমান রূপে আজও বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর পশ্চিমে লম্বভাবে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিরাজ করছে সুবিস্তৃত ঝিল অথবা বিল অঞ্চল। প্রাচীন যুগের বণিকরা এই পথেই কজঙ্গল ও কর্ণসুবর্ণ হয়ে তাম্রলিপ্ত নগরীতে পৌঁছতেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চল থেকে সমুদ্রের দূরত্ব তখন খুব একটা বেশি ছিল না। তাই এই নগরীগুলি থেকে অবাধে সমুদ্রে বানিজ্য চলত।

বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ব বিশারদ জে. ফার্গুসনের মতে, মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে রাজমহল গিরিশ্রেণীর পাদপীঠে সামুদ্রিক জলরাশি বিরাজ করত। একদা বর্তমান শ্রীহট্ট জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রাচীন সমুদ্র অবস্থান করত। ওই অঞ্চল থেকে সমুদ্র সরে গেলে বড় বড় হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার বেশিরভাগ অংশ তখনও জলমগ্ন ছিল। ফার্গুসনের মতে, বর্তমান সময় থেকে মোটামুটিভাবে হাজার বছর আগে নিম্নবঙ্গে সমভূমির গঠন শুরু হয়। তারপর দক্ষিণবঙ্গের ভূভাগ ক্রমশ মানুষ্য বসবাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ব্রহ্মপুত্র নদ-জাত পলিগঠিত ভূভাগ এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণমুখী ক্রম-অগ্রাসনের ফলেও সমভূমি গড়ে উঠেছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ প্রান্তে সুদূর অতীতে অবস্থান করত সমুদ্র থেকে উত্থিত ''নেইসিক'' গিরিশ্রেণী। পরবর্তীকালে (সম্ভবত ঃ 'টারসিয়ারি' যুগে) এই গিরিশ্রেণী নিচে বসে গিয়েছিল এবং রাজমহলের গিরিশ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত একটি জোঁয়ার-ভাঁটা সমন্বিত বিস্তৃত জলাভূমির সৃষ্টি হয়। উত্তরের নদীগুলির দ্বারা পরিবাহিত পলিমৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়ার ফলে এক সময়ে জলাভূমি অপসারিত হয়ে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা তথা ব-দ্বীপ অঞ্চল সমূহ গড়ে উঠতে শুরু করে। উপযুক্তরূপে পলি সঞ্চয়ের ফলে ও মোটামুটি উচ্চতা প্রাপ্তির পর নিম্ন-জলাভূমির অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে বসতিস্থাপন, পশুচারণ এবং চাষবাসের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল।

এর আগে গড়ে উঠেছিল ছোটনাগপুরের মালভূমি সংলগ্ন, উত্তর-দক্ষিণে লম্বভাবে বিরাজমান পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল। প্রবল বর্ষণে প্লাবন ও ভূমিক্ষয়ের কারণে, একদিকে শিলাচূর্ন ও মৃত্তিকার স্থানান্তরণ এবং অন্যদিকে জলস্রোতে কাঁকুরে মাটি পরিবাহিত হওয়ার ফলে ছোটনাগপুরের মালভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। ছোটনাগপুরের গিরিশ্রেণীর ল্যাটেরাইটযুক্ত লালমাটি এই ভাবে নেমে এসে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সঞ্চিত হওয়ার কারণে বাংলার প্রাচীনতর 'রাঢ়-ভূমি' গঠিত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে কয়েক হাজার বছরের পুরাতন। এই কারণেই বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলে পলিমাটির আস্তরণের নিচে লাল কঙ্করময় মৃত্তিকাস্তর লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে নেমে আসা মৃত্তিকায় প্রাথমিকভাবে পরিপুষ্ট হবার পর, তার ওপরে এসে সঞ্চিত হয়েছিল হিমালয় পর্বত থেকে উৎসারিত নদীগুলির দ্বারা পরিবাহিত পলি। এইভাবে এই অঞ্চলের ভূ-ত্বকের উপরিপৃষ্ঠ গড়ে ওঠে। বিস্তৃত উত্তরবঙ্গের এবং বর্তমান বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার ওপর দিয়ে বয়ে আসা কোনও বিশাল নদীর স্রোতের ধাক্কায় গঙ্গার প্রাচীণতম ধারা আরও বলবতী হয়ে রাজমহল গিরিশ্রেণী এবং

ছোটনাগপুরের মালভূমি-সংলগ্ন রাঢ়ভূমির উত্তরাঞ্চল বিদীর্ণ করে দক্ষিণদিকে সমুদ্র অভিমুখী হয়েছিল বলে মনে হয়। গঙ্গা-ভাগীরথীর এই প্রাচীন ধারাটির কথাই নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন। যা আজ স্থানে স্থানে গতিরুদ্ধ হয়ে স্রোত হারিয়ে (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলে) কতগুলি সুবিস্তৃত জলাভূমি ও বিলে রূপান্তরিত হয়েছে।

যাইহোক, খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-অঞ্চল রূপে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন গৌড় রাজ্য। মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার হরাহা লিপিতে (বা 'লেখ'তে) মৌখরীদের সাথে গৌড়ীয়দের সংঘর্ষের কথা উল্লেখের সময় বলা হয়েছে— "গৌড়ান সমুদ্রাশয়ান"। 'সমুদ্রাশয়' কথাটির অর্থ হল— সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চল। ওই সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতকে, গৌড় রাজ্যের সীমানা যে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এই উল্লেখে তাই-ই প্রমাণিত হয়। ভূ-তত্ত্বগতদিক দিয়ে এ অনুমান যে কতখানি সত্য তা আগেই প্রমাণ সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমুদ্র নিকটবর্তী হওয়ার কারণে গৌড়ের অধিবাসীরা নৌ-বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়। রক্তমৃত্তিকা বিহারের (বর্তমান কর্ণসুবর্ণ) সুদক্ষ মহানাবিক (ক্যাপ্টেন) বুধগুপ্ত যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জলপথে (রওনা হয়ে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার অন্তে) মালয়দেশে (মালয়েশিয়ায়) গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে তথ্য সেদেশে প্রাপ্ত একটি শিলালেখে উল্লিখিত আছে। এছাড়া অন্যত্রপ্রাপ্ত আরও দুটি পৃথক তাম্র শাসনে গৌড়-জাতিকে নৌশক্তিতে বলীয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সময়ে বৃহত্তর গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

প্রাচীনতম ভাগীরথীর অবশেষ রূপে বিরাজমান মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বিল এবং ঝিলগুলির কয়েকটি অবস্থান করছে বর্তমান ভাগীরথীর পশি মে এবং কতকগুলি দেখতে পাওয়া যায় নদীর পূর্বদিকে। সমসেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, গোকর্ণ, কান্দি, বড়ঞা, ভরতপুর অঞ্চলের বিলগুলি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। অঞ্চল অনুসারে বিলগুলিকে (উত্তর থেকে দক্ষিণে) সাজালে যে তালিকাটি তৈরি হয়, তা এইরকম ঃ—

১. সমসেরগঞ্জ এলাকা ঃ নেসিন্দারবিল (উত্তর ফরাক্কা অবধি বিস্তৃত)
২. রঘুনাথগঞ্জ অঞ্চল ঃ আজাঙ, জামি ওর, পারুলিয়া, পাথর, একুম্বা, জেটিয়া বিল।
৩. নবগ্রাম অঞ্চল ঃ তেলকর, বসিয়ার বিল ও বেলুন বিল।
৪. খড়গ্রাম অঞ্চল ঃ সাঁকোড়া, নড়ুয়া ও পাটনবিল।
৫. গোকর্ণ অঞ্চল ঃ বেলুন, গোরা, আমালবান্ধা, চাপদা, জুলদা, কালিদহ, চৌটি, লাল এবং হিজল বিল।
৬. কান্দি অঞ্চল ঃ চরখা, গোবরা, যুগলতলি, আসকা, গাঙ্গলা, বাসরা, সেমিয়া, পেমরিকুঠি, হিজল বিল ও তেলকর বিল।
৭. বড়ঞা অঞ্চল ঃ মালদা, জাউহাঁড়ি, ভরোঞার বিল, লাঙ্গলহাটা বিল।
৮. ভরতপুর অঞ্চল ঃ লোহাদহ, কারুই, বিধুপাড়া, সেরপুর ও হিজল বিল।

বলা বাহুল্য বিলগুলি একটি অন্যটির খুব কাছাকাছি অবস্থিত। বিলগুলিকে একটি সরলরেখার দ্বারা যুক্ত করলে অনায়াসে সেই হারিয়ে যাওয়া নদীপথের আভাস পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। জেলার বাদবাকি বিল বর্তমান ভাগীরথীর পূর্বদিকে অবস্থিত। প্রাচীন ভাগীরথীর অবশেষ রূপে বিদ্যমান এই সব বিলের কয়েকটি স্রোতধারা হারিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের আকৃতি ধারণ করেছে। গতিপথ পরিবর্তন করে যখন নদী ক্রমশ পশ্চিমপ্রান্তের তখন এইসব অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ এবং স্রোতহীন খণ্ডিত নদী পথের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাগীরথীর পূর্বদিকে সব ক'টি বিলই এ'ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মা এবং ভাগীরথীর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী কতগুলি উপধারা এবং মজে যাওয়া

নদী-নালা (শিয়ালমারি নদী এবং ভৈরবের দুই একটি মজা শাখা) এবং ওইসব বিল ও জলাভূমি নিঃসন্দেহে নদী গতিপথ পরিবর্তন করায় সৃষ্টি হয়েছিল। নওদা, হরিহরপাড়া ও ডোমকলের বিলগুলি ভৈরব নদ কিছুটা সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয়। কারও কারও মতে, শিয়ালমারি, ভৈরব এবং জলঙ্গি ভাগীরথীর শাখা-প্রশাখা এমনকি পরিত্যক্ত ধারা হলেও হ্যতে পারে। ভাগীরথী এবং এই সব প্রবাহের দ্বারা পরিবাহিত পলিসঞ্চিত হয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ি অঞ্চল। এতে কোনও সন্দেহ নেই! এইসব নদী পুষ্ট হয়ে ছিল উত্তরবঙ্গের নদীগুলির দ্বারা। আসলে এক সময়ে হিমালয় থেকে উৎসারিত কতকগুলি বড় বড় নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সোজাসুজি নেমে এসে পশ্চিমদিকে রাজমহল গিরিশ্রেণীর পাদদেশ থেকে শুরু করে বর্তমান জলঙ্গি-পদ্মার মোহনা পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তৃত অঞ্চলের ঠিক উত্তর দিকে সমস্ত জল ঢেলে দিত গঙ্গায়। নেপাল, ভূটান ও কামরূপ থেকে নেমে আসা এইসব নদীর মধ্যে মহানন্দা, টাঙ্গন, আত্রেয়ী, করতোয়া, পুনর্ভবা ও ব্রহ্মপুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

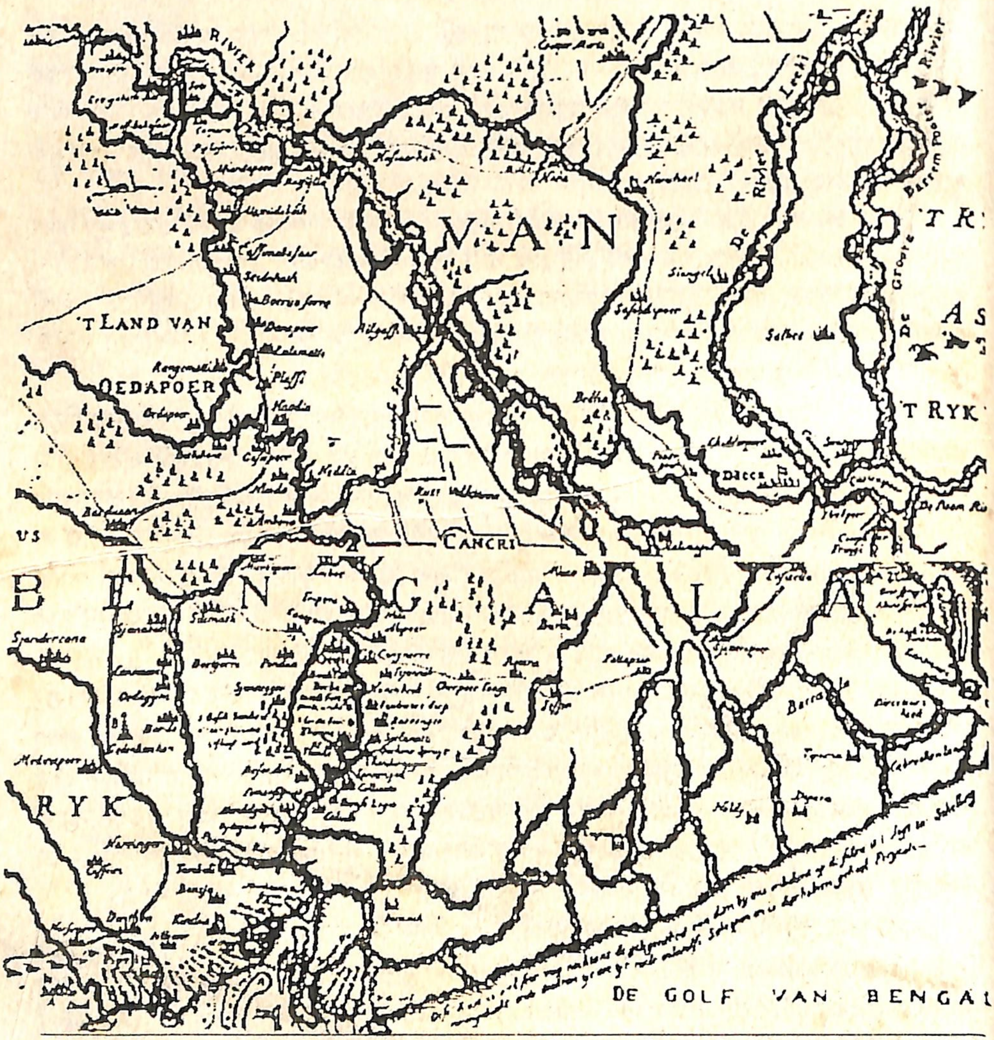
যাইহোক একসময় গঙ্গার পশ্চিমপ্রান্তের প্রবাহটি অত্যধিক পলি জমে অবরুদ্ধ হয়ে গেলে ভাগীরথী রাজমহল থেকে আপন পথ তৈরি করে বর্তমান কালিন্দী নদীর খাতে বইতে শুরু করেছিল। তারপর মহানন্দার সাথে মিলিত হয়ে আরও বলবতী হয়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বয়ে আসা কোনও একটি বিশাল নদীর (হয় কোশী, নয়তো করতোয়া) জলে গা ভাসিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে কোশী নদী সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দান করেছেন। তিনি লিখেছেন "এই নদী এক সময় ছিল পূর্ববাহী এবং ব্রহ্মপুত্রগামী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমস্ত উত্তরবঙ্গ জুড়িয়া ধীরে ধীরে খাত পরিবর্তন করিতে করিতে কোশী আজ পূর্ব হইতে একেবারে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।" (বর্তমানে কোশী উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়ে সোজা দক্ষিণগামী হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়)।

তিস্তা বা ত্রিস্রোতা তিনটি ধারায় ত্রিধা বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। পূর্বতম দিকে প্রবাহিত ধারার নাম করতোয়া, মধ্যবর্তী ধারাটির নাম আত্রেয়ী এবং পশ্চিমতম ধারার নাম পুণর্ভবা। সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৬০-এ) ফান ডেন ব্রোকের তৈরি নকশায় আত্রেয়ী এবং করতোয়া এই নদীরই আকৃতি বেশ প্রশস্ত দেখান হয়েছে। জাও ডি ব্যারোস (১৫৫০) এবং কান্তেল্লি দ্য ভিনোলা (১৬৬০) এই দুইজনই তাঁদের মানচিত্রে উত্তর থেকে দক্ষিণে সোজাসুজি সমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান একটি নদীর অবস্থান দেখিয়েছেন। এর নাম caor; মনে হয় তাঁরা প্রাচীনতর করতোয়ার কথা বলেছেন। জাও ডি ব্যারোস তাঁর নকশায় দেখিয়েছেন caor নামে নদীটি 'Reino de comotah' অর্থাৎ কামতা (বর্তমান কোচবিহার-রঙপুর অঞ্চল) রাজ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। লোক মুখে বা লোকস্মৃতিতে করতোয়াকে সাগরগামিনী নদীরূপে বর্ণনা করা হত সে কথা নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বিপুলা করতোয়ার জলধারা পদ্মায় মিলিত হয়ে সাগরমুখী হত —একথা অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না। পলি জমে গিয়ে পরবর্তীকালে ভাগীরথী ক্ষীণ কায়া হতে শুরু করে এবং সমস্ত জল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাগীরথী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ্মার উৎপত্তি হয়। পদ্মা আসলে গঙ্গারই একটি শাখা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন W.W. Hunter. তিনি লিখেছেন— "According to Dr. Bnchanan Hamilton, it is not unlikely that the great chain of lake and marshes north and east of Maldah are the remains of a great river bed formed by the united Kusi and Mahananda." কুশী এবং মহানন্দার মিলিত স্রোতই হয়তো একদা ভাগীরথীকে

পুষ্ট করার পর পরস্পর পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। কুশী অনেকটা পশ্চিমে সরে যায় এবং মহানন্দা অন্য কোনও একটি বড় নদীর সাথে যুক্ত হয়ে পূর্বদিকে সরে যায় এবং ওই দুই নদীর মিলিত জলধারায় পুষ্ট হয়ে পদ্মার সৃষ্টি হয়। হান্টার সাহেব লিখেছেন— "He (Dr. Bnchanan) also Suggests that it may have been the great increase in it's waters caused by a subsequent union of these rivers with the Ganges, that caused this latter river (the Ganges) to desert the narrow channel of Bhagirathi and break for itself the new and wider bed of the Padma, Within which it is still contained." সম্ভবত এই ঘটনার কিছুকাল আগে গঙ্গার একটি শাখা বর্তমান জলঙ্গির খাতে বইতে শুরু



ফন ভ্যান ডেন ব্রোকের বাংলার ভূমি ও নদ-নদীর মানচিত্র।

করে। পদ্মানদী সৃষ্টির পশ্চাতে ব্রহ্মপুত্র নদের ভূমিকাও অপরিসীম। কেননা একসময় ব্রহ্মপুত্র নদ বর্তমান খাতের বেশ খানিকটা পশ্চিম দিয়ে বয়ে করতোয়ার সাথে মিলিত হত। হান্টার সাহেব লিখেছেন— "The course of Brahamaputra appears in early days to have run for to the east of the district of Maiman Singh." বলা বাহুল্য ওই জলাধারা পদ্মাকে আরও বলবতী করে তুলেছিল। পদ্মা (পদ্মাবতী বা পদুমা বা পঁউআ) নদীর কোনও স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল না। (তবে এটি গঙ্গারই একটি অপ্রধান শাখা হিসাবে গণ্য হত)। মেজর হার্স্টের প্রতিবেদন অনুসারে, (Rivers of Nadia–1915) ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে এক দারুণ ভূমিকম্পের ফলে গঙ্গা গৌড়-মালদহের পাশের গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দক্ষিণদিকে অপসৃত হয়। মালদা জেলার প্রাচীন পাললিক ভূভাগ ও ছোটনাগপুরের মধ্যে প্রবল ভূমি আন্দোলনের ফলে গঙ্গার গতিপথের এই বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। এর ফলে প্রভূত জলরাশি মিলিতভাবে পদ্মার খাতে প্রবাহিত হয়ে পদ্মাকে আরও শক্তিশালী এবং স্ফীতকায়া করে তুলেছিল। একদা মহানন্দা, টাঙ্গন ও গঙ্গার মিলিত জলধারা ছাপঘাটি থেকে সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হত।

একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায় শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুর্শিদাবাদ কথা' নামক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন— 'জনপ্রবাদ, পুরাকালে ছাপঘাটির মোহনা সীসা ধাতুর দ্বারা মণ্ডিত ছিল। নবাব-নাজিমদিগের শাসনাধীনে তা' স্থানান্তরিত হওয়ায় গঙ্গামুখে ও গঙ্গার স্থানে স্থানে পলি ও বালু জমে চড়া পড়ে জলধারা রুদ্ধ হয়ে যায়।"— এ থেকে বোঝা যায়, পূর্ববর্তী সময়ে (এখানে পাঠক পড়ুন, ষোড়শ শতাব্দীতে) গঙ্গা-ভাগীরথীর জলতলদেশে একটি ধাতু নির্মিত বাঁধ তৈরি করে পলিপ্রবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়েছিল। ধাতু নির্মিত বাঁধটি নবাবী আমলে স্থানচ্যুত হওয়ায় ক্রমশ পলি জমে ভাগীরথীর মোহনা রুদ্ধ হতে শুরু করে। এর ফলে, নিশ্চিতভাবে ভাগীরথী বারংবার গতিপথ পাল্টান শুরু করে। বর্ষায় বন্যা ও শীতে নদীতে জলাভাব দেখা দিত। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বার্ণিয়ের (বিশিষ্ট পরিব্রাজক) সূতীতে এসে পৌঁছাবার পর জলপথের অসুবিধার জন্য স্থলপথে কাশিমবাজারে গিয়ে পৌঁছান। হেজেস ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বাংলার চৈত্র-বৈশাখ মাস) মহুলা পর্যন্ত এসে স্থলপথে কাশিমবাজার আসেন।

নবম-দশম শতাব্দীতে ভাগীরথী যখন রাজমহল ও ছোটনাগপুরের মালভূমি বরাবর দক্ষিণমুখে ধাবিত হত তখন ওই জলপথে বাণিজ্যযাত্রা করতেন অঙ্গ-বঙ্গ-তথা উত্তরাপথের বণিকরা। সওদাগরের দল সপ্তডিঙায় চড়ে চলতে চলতে পৌঁছে যেতেন সাগরসঙ্গমে। তারপর তাঁরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করতেন। পথে তাঁরা একে একে অতিক্রম করতেন কজঙ্গল, প্রাচীকোট, রাঙামাটি, গোলাহাট, মঙ্গলকোট, উজানিনগর ইত্যাদি জনপদ। বর্তমান বর্ধমান জেলার প্রান্ত ঘেঁষে তাঁরা এগিয়ে গিয়ে উপনীত হতেন তাম্রলিপ্ত নগরীতে।

প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা নগরী (বর্তমান ভাগলপুরের সামান্য পশ্চিমে এর অবস্থান ছিল) থেকে জলপথে বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে চাঁদ সওদাগর যেসব জায়গা অতিক্রম করে দক্ষিণে সাগর-সঙ্গমের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতেন তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় নলু পঞ্চাননের কায়স্থ কারিকায়। পঞ্চানন লিখেছেন —

"গোলাহাট ডিহিগঞ্জ সুরম্য নগরী।
যাহা চাঁদ সদাগরের ব্যবসা নগরী॥
জয়া দেবী নামে এক দেবী আরাধয়।
মনসা দেবীর সহ বিবাদ করয়॥
তিন্তিড়ী বৃক্ষের মূলে দেবীর দেউল।

বহু বণিক পূজে দেবীকে মানে বণিককূল॥
সেই চাঁদ সদাগর রাজার সমীপে।
দেবী পূজা লাগি ভূমি মাঙ্গে ভূপে॥
এক শত ষাটী বিঘা দেবীর কারণ।
ভূ-সম্পত্তি মহারাজ করিলেন দান॥
সে ভূমির কর না লইবেন আপনি।
ডিহির অন্তর্গত বিংশতি গ্রাম গণি॥
নবদুর্গা রাঙ্গাবলী করলা যসুরী।
চৌকী কাটনাদী উহাঁনি ভিতরি॥

বর্তমান কান্দির নিকটবর্তী নবদুর্গা-গোলাহাট গ্রামে 'জয়-মঙ্গলা' দেবী পূজিতা হয়ে থাকেন। শোনা যায় গোলা-হাটের জয়াদেবীর এবং জয়মঙ্গলা দেবীর উভয়ের মূর্তিই সদাগরেরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জয়মঙ্গলা দেবীর মুর্তিটি আনুমানিক খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবাদ এই যে, এক সময় এই নগরী শুধুমাত্র ডিহিগঞ্জ কিম্বা বিশাল জনপদই ছিল না, তার পাশাপাশি চাঁদ সদাগর সহ অন্যান্য সদাগরদেরও ব্যবসায়ের স্থান ছিল। শোনা যায়, মনসাদেবীর সঙ্গে বিবাদের পর চাঁদ সদাগর জয়াদেবীর আরাধনা আরম্ভ করে ছিলেন। একটি প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে কান্দির পূর্বদিকে অবস্থিত রাঙামাটি চাঁদপাড়া অঞ্চলে চাঁদসদাগর বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন। তাই চাঁদপাড়া নামের উৎপত্তি। মহারাজ আদিশূর জয়াদেবীর সেবার জন্য চাঁদ সদাগরকে যেসব গ্রাম দেবোত্তর রূপে দান করেছিলেন সেইসব গ্রামের কর গ্রহণে বিরত থাকার জন্য তাঁর মন্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নবদুর্গা, রাঙ্গাবালি, করলা, যশোহরী, চৌকী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান এবং গঙ্গার প্রাচীন খাতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গ্রামগুলি অবস্থিত। গঙ্গার সেই প্রাচীন খাত বলা বাহুল্য, এখন নিম্ন জলাভূমি ও বিল অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগে কিম্বা তারও আগে যেসময় এ অঞ্চলে জল বাণিজ্যের সুবিধা ছিল, তখন অনেক সদাগরই এসব জায়গায় নানা স্থানে দেবমূর্ত্তি, মন্দির ও বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলে জনশ্রুতি। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলে যে কয়েকটা বড় বানিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তা' সহজেই অনুমান করা যায়। বিশিষ্ট গবেষক কমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ''মুর্শিদাবাদের রাঢ়'' গ্রন্থে লিখেছেন- ''অজয় নদের দুই তীরে ছিল পনীয় বা পন্যভূমি। .... অজয় তীরের পণ্যভূমি থেকে বনিকেরা জলপথে বানিজা যাত্রা করতেন। .... অজয় নদের তীরে ছিল কেকরী, ভদ্দিয়, উজ্জয়িনী (বর্তমান উজানি নগর), কটদুপ প্রভৃতি গ্রাম। .... সেকালের বহু গ্রাম এখন অন্য নামে পরিচিত হচ্ছে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার রাঢ় এলাকায়। ..... অজয় ময়ূরাক্ষী, গঙ্গা, ভাগীরথী ও দামোদরের তীরে বহু জৈন্য বসবাস করতেন। জৈনেরা যেখানে বসবাস বা বানিজ্য করতেন সেখানেই তারা মন্দির স্থাপন করতেন।'' আজিমগঞ্জের কাছে জিনেশ্বরে জৈন্যদের মন্দির ছিল। সেখানে বিরাজ করত পার্শ্বনাথের মরকত-মনি-নির্মিত মূর্তি। আজিমগঞ্জের চিন্তামনি পার্শ্বনাথের মন্দিরে ধাতু নির্মিত এমন কিছু প্রাচীন মূর্তি আছে যেগুলির পীঠভূমির লিপিপাঠে জানা যায় মূর্তি গুলি ন'শো থেকে এগারো শো' বছরের প্রাচীন। মূর্তি গুলি রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন পরিত্যক্ত জৈন মন্দির থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলে অনুমান হয়। সুতরাং বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমভারত ও উত্তর ভারত থেকে আগত জৈন শ্রেষ্ঠীরা যে বানিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন এমন প্রমাণাদি অদ্যাপি জাজ্জ্বল্যমান। জৈন ধর্মাবলম্বীরা যে মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে বৃহত্তর মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিলেন

আর বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। এ' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, জেলার বিভিন্ন স্থানে পূজিতা দেবীদের মধ্যে মনসা দেবী, জয়া দেবী, জয়মঙ্গলা দেবী ও লৌকিক চণ্ডী সম্ভবত জৈন দেবী ছিলেন। মুর্শিদাবাদের বহু গ্রামে দিগম্বর সম্প্রদায়ের তীর্থঙ্করদের মূর্তি অজ্ঞ গ্রামবাসীরা ন্যাংটেশ্বর শিব জ্ঞানে পূজা করে থাকেন। প্রাচীন কাল থেকে বৌদ্ধ বণিকরাও এ অঞ্চলে আসতেন। তন্ত্র মিশ্রিত বৌদ্ধ ধর্মের সহজ যান, মহাযান, কালচক্রযান এবং বজ্রযানের ব্যাপক অনুশীলন চলত মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। বৌদ্ধ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাই নানা জায়গায় গড়ে ওঠে মঠ মন্দির। বহু বৌদ্ধ দেবী বিভিন্ন গ্রামে 'মহাকালি' জ্ঞানে পূজিতা হয়ে থাকেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধকদের মূর্তিগুলি স্থানে স্থানে ভৈরব নামে পরিচিত। এতদ অঞ্চলে মূলত ঃ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের পরিপুষ্ট সাধিত হয়েছিল।

পাঠান-মুঘল আমলে গঙ্গা ধীরে ধীরে মুর্শিদাধাদের পূর্বদিকে সরে যায়। পাঠান আমলের অব্যবহিত আগেই অর্থাৎ সেন আমলে বর্তমান ফরাক্কা অঞ্চলের বিপরীতে (উত্তর দিক থেকে) সোজাসুজিভাবে বয়ে আসা একটি বড় নদীর মোহনা (সম্ভবত ঃ কোশী নদী) রাজমহলের দিকে সরে যায়। তারপর গঙ্গার একটি বড় ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমশ উত্তর পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে বর্তমান মালদহ শহরের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে এবং একটি বড় বাঁক সম্পূর্ণ করে দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ মুখী হয়। এই সময়ে পশ্চিমতম প্রান্তের সাগরমুখী প্রাচীন ধারাটি পরিত্যক্ত হয়। সম্ভবতঃ পলি জমে প্রবেশ পথটি বুজে গিয়েছিল। প্রাচীন ধারাটি স্থানে স্থানে স্রোতহীন হয়ে মজেও গিয়েছিল। সেন আমলের গৌড় নগরটি গঙ্গার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। পাঠান আমলে কোশী আরও পশ্চিমে সরে যায় এবং মহানন্দাও ভাগীরথীকে ত্যাগ করে নূতন খাতে বইতে শুরু করলে ভাগীরথীর একক ধারাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নয়া-গৌড়ের দক্ষিণ দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করে। মুঘল আমলে মহানন্দার জলধারায় পুষ্ট হয়ে ওঠে পদ্মা। এই সময়ে কোশী ও গঙ্গার মিলিত জলধারা কালিনন্দির খাত ধরে প্রবাহিত না হয়ে অর্থাৎ গৌড়নগরীর দক্ষিণের খাতটি পরিত্যাগ করে রাজমহল থেকে সামান্য ডানদিকে বাঁকনিয়ে বইতে শুরু করে এবং ফারাক্কা হয়ে ছাপ ঘাটির কাছাকাছি এসে মহানন্দার মোহনায় মিলিত হয়। মহানন্দার মোহনার ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে নির্গত হয়ে (ছাপঘাটি অঞ্চল) ভাগিরথীর নবতর ধারাটি জঙ্গীপুর হয়ে দক্ষিণমুখী হয়। তবে মহানন্দা পরবর্তি কালে কিছুটা পূর্ব দিকে সরে গেলে পুনরায় ভাগিরথীর দুর্দশা শুরু হয়। ফলে মুঘল আমলে ছাপঘাটি থেকে জঙ্গীপুর হয়ে কাশিমবাজার পর্যন্ত যে ধারাটি ছিল তার দুরাবস্থা চরমে পৌঁছয়। নবাবী আমলে শীতকালে তথা শুখা মরশুমে স্থানে স্থানে নদী খাতে জল কমে যেত। নদীতে অসংখ্য বড় বড় বাঁকের সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ, পরিবর্তন যোগাযোগ ব্যবস্থারূপে নির্মান করতে হয়েছিল বিকল্প স্থলপথ। তবে কিছু স্থলপথ আগে থেকেই চালু ছিল। নবাবী আমলে খাল কেটে বিভিন্ন অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, মজে যাওয়া নদীর খণ্ডিতাংশ, ভৈরব-জলঙ্গী এবং গঙ্গা তথা পদ্মার মূল ধারার সংযোগসাধনের মহৎ কর্মযজ্ঞসাধিত হয়েছিল। যারফলে গঙ্গা-ভাগীরথীর বিভিন্ন পরিত্যক্ত খাতে অবস্থিত এবং বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা জনপদ, বানিজ্যকেন্দ্র ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি রাজধানী মুর্শিদাবাদের সাথে জলপথে যুক্ত হয়েছিল। এইভাবে অসংখ্য জলপথ বেষ্টিত সুরক্ষিত রাজধানী মুর্শিদাবাদ ঢাকার থেকেও নবাব-নাজিমদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঢাকায় সোজাসুজি উত্তর ভারত, কামরূপ ও ব্রহ্মের দিক থেকে বহিঃ শত্রুর আক্রমনের সম্ভাবনা থাকলেও মুর্শিদাবাদ শহর জলপথে আক্রান্ত হবার সম্ভবনা কম ছিল।

কাশিমবাজার বন্দরের উত্থান হয় ১৬৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার

দিকে দেশের নানা প্রান্ত থেকে বণিকরা এসে এই অঞ্চলে উপস্থিত হন। পশ্চিম ভারতের গুজরাটি, সরাফ ও মাড়োয়ারিরা কাশিমবাজারের যে অংশে বসবাস করতে শুরু করেন, সেখানে গড়ে ওঠে গুজরাটি টুলি ও মহাজনটুলি। ক্রমে ক্রমে বিদেশী বণিকরাও এসে উপস্থিত হলেন। একে একে এসে উপস্থিত হলেন পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরা। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, আগে এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল 'মাসুমা বাজার' জনপদ। বাঙলায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায় ''সতীর বাজার''। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর বর্বর পর্তুগীজদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য মুঘল বাদশাহ শাহজাহান তাঁর সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট যোদ্ধা কাশিম খাঁকে সৈন্যবাহিনী সহ প্রেরণ করেন। কাশিম খাঁ মাসুমা বাজারে ঘাঁটি গেড়েছিলেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন জায়গাটির নামকরণ হয়েছিল মুঘল সেনাপতি কাশিম খাঁ-এর নামে।

বাঙলার রফতানি বানিজ্য বাদশাহী আমলে কাশিমবাজার (বা মাসুমা বাজার) বন্দর কে কেন্দ্র করে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। বঙ্গদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের চাল, ঘি, লঙ্কা, মোম, নানা ধরনের বস্ত্র, রেশম, মসলিন, চিনি, গুড়, পাট, নীল, লাক্ষা, তুলা ও আফিম ছিল মুখ্য রফতানি যোগ্য দ্রব্য। পূর্বভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নানান জায়গায় তা প্রেরণ করা হত। বাঙলার বানিজ্য সেসময় পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিকে প্রসারিত হয়েছিল। পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছিল রেঙ্গুন, পেগু, পেনাং, বাটাভিয়া, মালাক্কা হয়ে চীনের ক্যানটন পর্যন্ত। পশ্চিমে মাসকাট, বসরা, জেড্ডা, মোম্বাসা হয়ে আফ্রিকা উপকূল ঘুরে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত। মুখসুদাবাদে রাজধানী শহর স্থাপিত হবার অনেক আগেই কাশিমবাজার এবং আজিমগঞ্জ বন্দর-নগরী রূপে খ্যাতি এবং সুনাম অর্জন করেছিল। ১৬৩২-এ কাশিম খাঁ-এর হাতে পর্তুগীজরা পরাস্ত হলে বানিজ্যক্ষেত্রে যে শূণ্যস্থান সৃষ্টি হয় তা পূরণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানীর চিকিৎসক মি. বুটন বাদশাহ শাহজাহানের কন্যার সুচিকিৎসা করে বাদশাহের চিত্ত জয় করেন। এই সূত্রে ইংরেজদের বাণিজ্য করার অধিকারপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়। বাদশাহের দেওয়া শর্ত মেনে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে ''Bay council'' স্থাপিত হয়। তারপর দ্রুত গতিতে হুগলীর প্রধান কার্যালয়ের অধীনে বালেশ্বর, কাশিমবাজার, পাটনা ও ঢাকাতে স্থাপন করা হয় রেশমের ফ্যাক্টরী। সপ্তদশ শতাব্দীতে কামান- বন্দুকের গোলাগুলি তৈরীর মুখ্য উপাদান ছিল সোরা। পাটনা ছিল সোরার ব্যাবসার মূল কেন্দ্র। বড় বড় নৌকায় করে সোরা নিয়ে এসে কাশিমবাজারের গুদাম জাত করা হত। তারপর সেখান থেকে ছোট ছোট নৌকায় তা' বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হত। এর প্রধান কারণ ছিল,- কাশিমবাজার থেকে হুগলি পর্যন্ত ভাগীরথীতে নাব্যতার অভাব। ১৬৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসীয় বুদ্ধিজীবী নিকালো মানুচি কাশিমবাজারে এসেছিলেন। তিনি এখানে ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের তিনটি পৃথক পৃথক রেশমকুঠী দেখেছিলেন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মা-গঙ্গার মিলিত জলধারা থেকে শুরু করে জলঙ্গী নদীর মোহনা (নবদ্বীপের সন্নিকটে) পর্যন্ত প্রলম্বিত ভাগীরথীর অংশ বিশেষকে ইউরোপীয়রা ''কাশিমবাজার নদী'' নামে অভিহিত করেছেন। কালক্রমে 'কাশিমবাজার নদী' বা ভাগীরথীর ওই অংশবিশেষ, পদ্মা এবং জলঙ্গী— এই তিন নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ ''কাশিমবাজার-দ্বীপ'' নামে পরিচিত হয়।* সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁর ''বন্দর কাশিমবাজার'' গ্রন্থে লিখেছেন— ''কাশিমবাজার নদী মুর্শিদাবাদ নগরীর সন্নিকটে খোসবাগের কাছে এসে দক্ষিণপূর্ব দিকে দিকে

* রেনেলকৃত 'কাশিমবাজার দীপ'-এর মানচিত্রটির অংশ বিশেষ-এর ফটোকপি এখানে দেওয়া হল। ঝড়-বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সংকলনে সম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে।

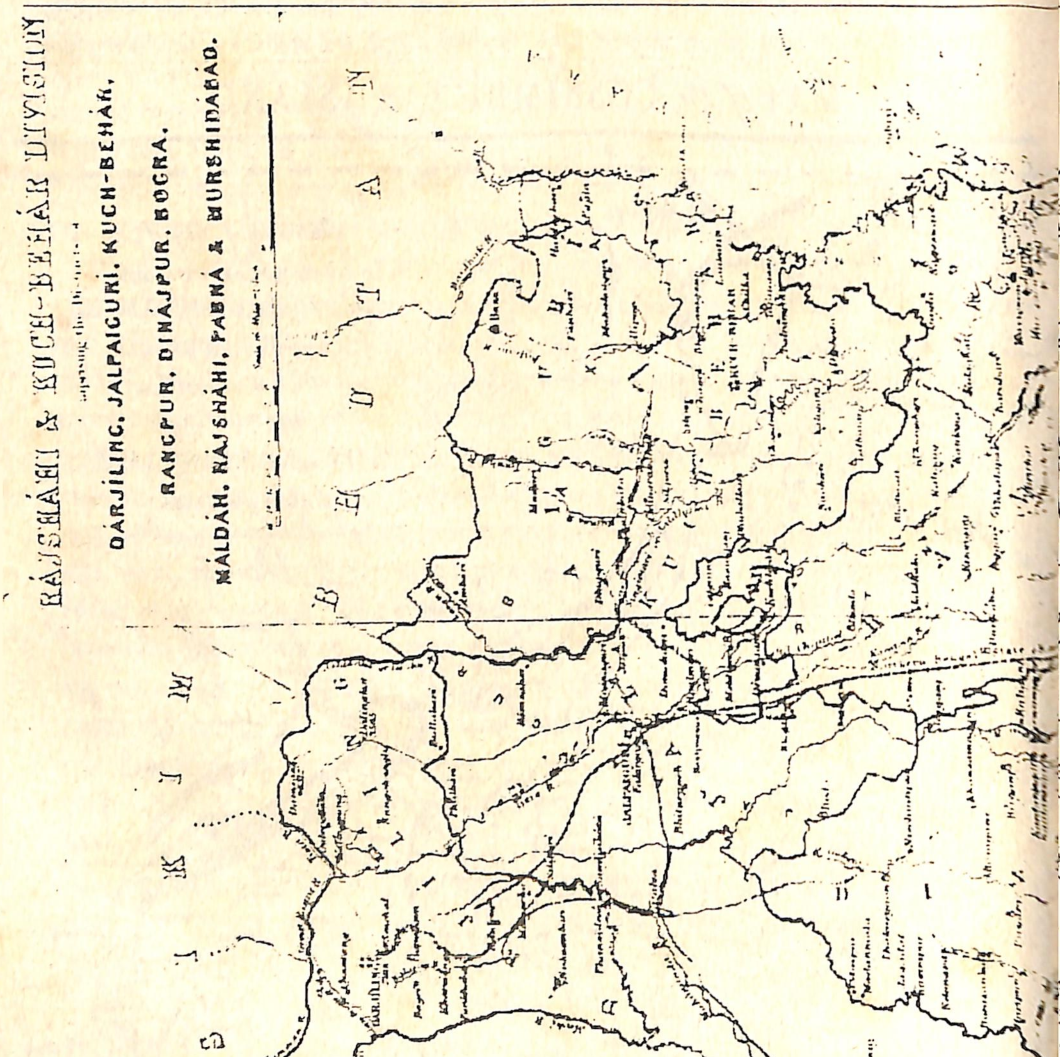
মোড় নিয়ে বইতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে অশ্বক্ষুরের আকৃতি ধারণ করে অবশেষে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেত। এই প্রবাহের উত্তরবাহিনী অংশে গড়ে উঠেছিল কাশিমবাজার বন্দর।" গঙ্গার এই উত্তরবাহিনী প্রবাহ বারানসী নগরীর মত পূর্বভারতে আর একটি নগরী গড়ে তুলতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই শত শত মন্দির নির্মিত হয়েছিল



রেনেল-কৃত কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রের অংশবিশেষ।

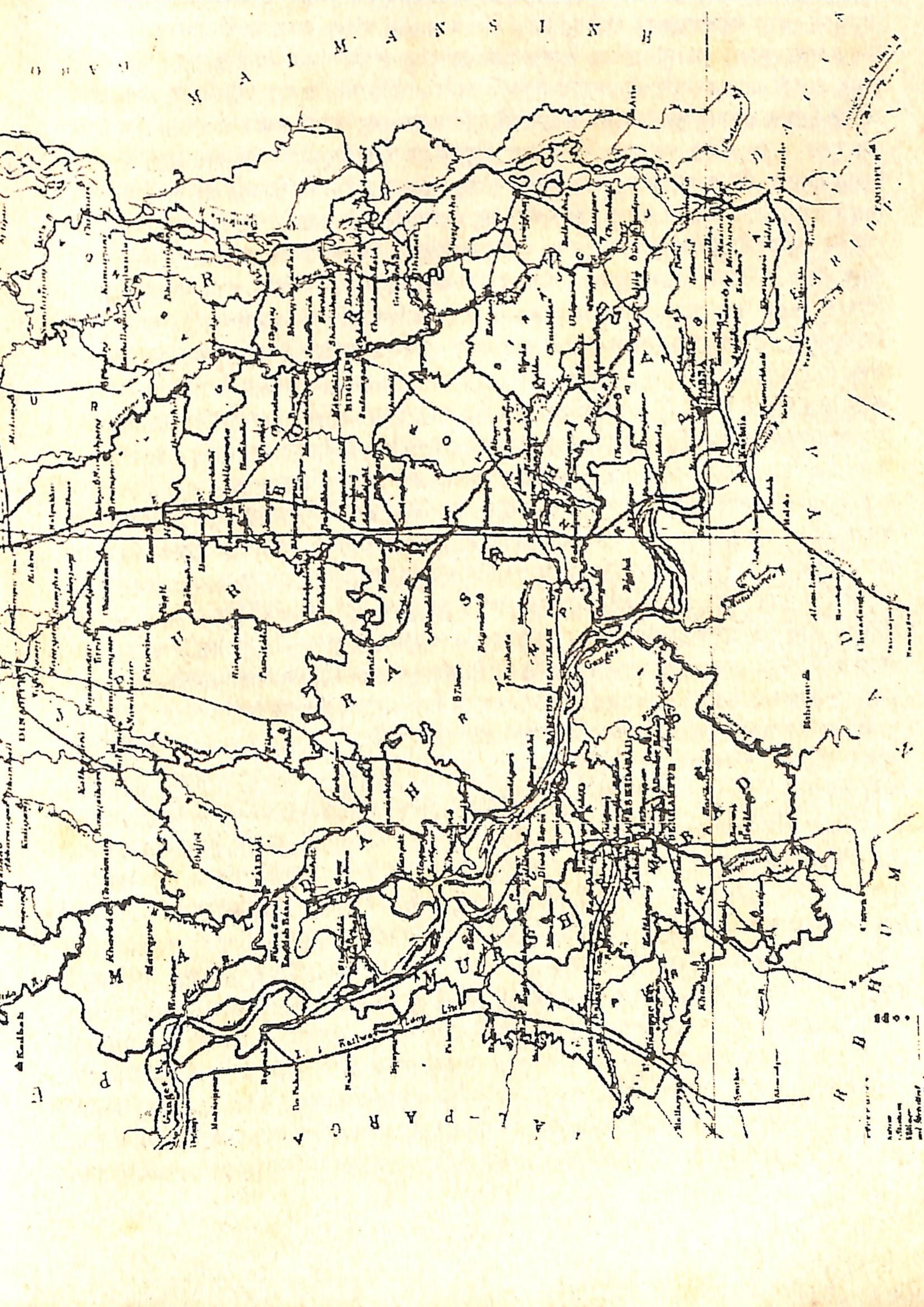
এখানে।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাঁর অধীনস্থ বিশ্বস্ত দেওয়ান করতলব খাঁকে ''মুর্শিদকুলি খান'' উপাধি



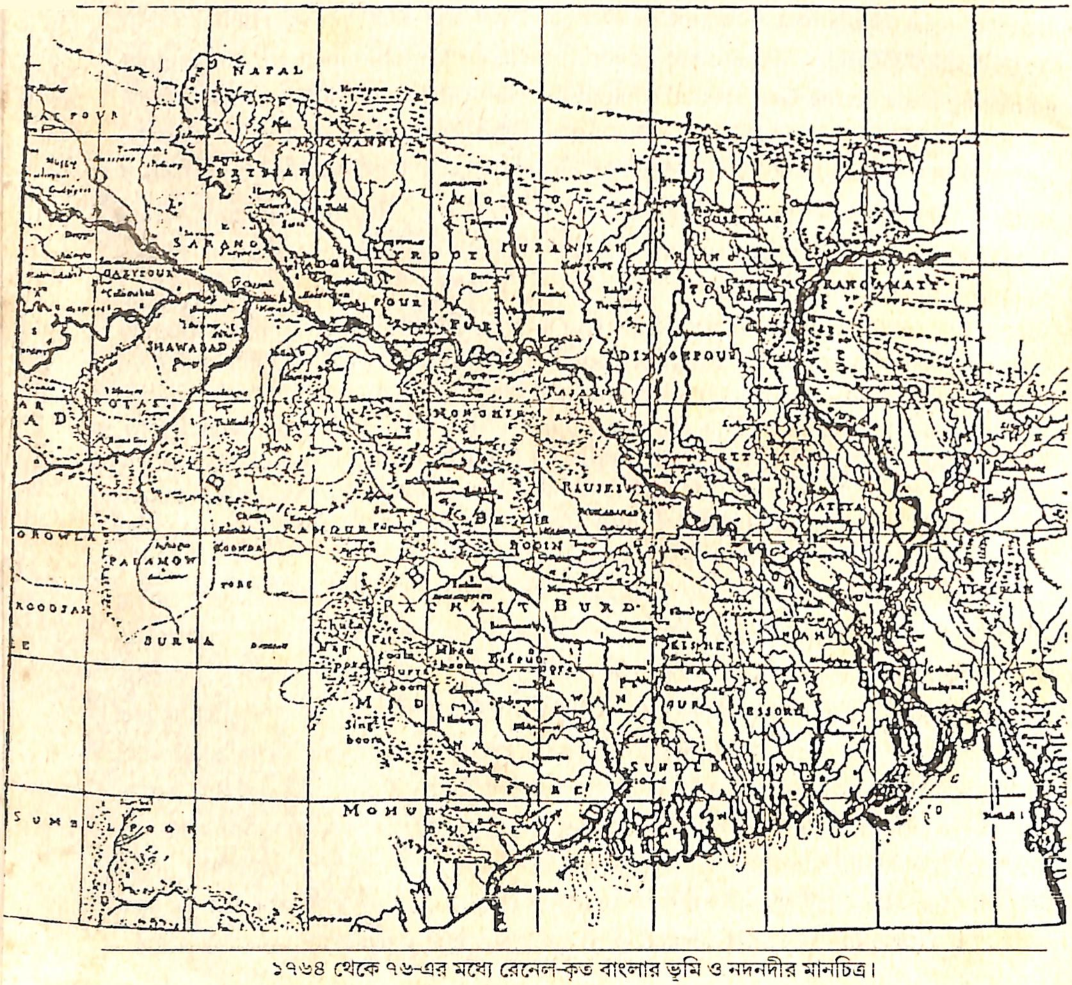
১৮৭৯ সালের ম্যাপ। হান্টারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রদান করার পর সুবা-এ বাঙলার দায় দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পন করেন। মুর্শিদকুলি রাজধানী ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে



১৮৭২ সালের সরকারি গণনা অনুসারে জেলায় দেশীয় নৌকার সংখ্যা ছিল ১৫৯২। এরমধ্যে পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি নৌকা জঙ্গিপুর মহকুমায়।

জঙ্গিপুর শহরের নামটি এসেছে জাহান্‌গীরপুর থেকে। মুঘল সম্রাটের নামানুসারেই প্রতিষ্ঠিত বলেই নগরীর এই নামকরণ। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেন্টিনা জঙ্গিপুরকে— "The greatest silk station of East India company, with 600 furnaces and giving employment to 3000 persons" বলে বর্ণনা করেছেন। জঙ্গিপুরের নিকটবর্তী বালুচর রেশমবস্ত্র প্রস্তুতের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। এখানকার তাঁতিরা নবাবী আমলে রেশমী শাড়ির চারিধারে নবাব নাজিমদের ছবি তুলে বহুমূল্য শাড়ি তৈরি করতেন। এই অঞ্চলে অবস্থিত মীর্জাপুরের বয়নশিল্প মনমুগ্ধকর ছিল। এখান থেকে গাউনপিস তথা গাদাথান বিলাতেও রপ্তানী করা হতো। বালুচরের গুজরাটি ব্যবসায়ী নাহাট্টারা একদা পাটের ব্যবসায় প্রচুর উপার্জন করেছিলেন। ইন্দ্রচাঁদ নাহাট্টার পুত্র পুরণচাঁদের জুয়েলারির কারবার ফ্রান্সের বাজার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জঙ্গিপুর নদীপথে যাতায়াতকারী নৌযানগুলির চুঙ্গিকর আদায়ের এবং পঞ্জীকরণের বড় কেন্দ্র হয়ে উঠে।



১৭৬৪ থেকে ৭৬-এর মধ্যে রেনেল-কৃত বাংলার ভূমি ও নদনদীর মানচিত্র।

এইসময়ে বছরে প্রায় ১০ হাজার করে নৌকা পঞ্জীকৃত হত এখানে। বৃটিশ রাজত্বের শুরুর দিকে জিয়াগঞ্জ রেশম বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কোম্পানি এখানে একটি বড় ধরণের বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। মুর্শিদাবাদ নগরীর তিন মাইল উত্তরে অবস্থান করতো জিয়াগঞ্জ। ১৮৫৭তে কোম্পানির রেভিনিউ সার্ভেয়ার লিখেছেন— "জিয়াগঞ্জ অসংখ্য মহাজন বা দেশীয় বণিক, সর্ফ বা মুদ্রা বিনিময়কারী বণিক (মূলত এরা বেসরকারি ব্যাঙ্কার ছিলেন) এবং দেশীয় দালাল (এরা কোলকাতা, উত্তরভারত এবং পূর্ববঙ্গের সাথে বাণিজ্যিক যোগসূত্র রক্ষা করতেন) বসবাস করতেন। দালালেরা মূলত সূতি বস্ত্র, পাট, লবণ, চিনি, বিভিন্ন ধরণের চাল এবং রেশমকেন্দ্রীক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রতিবছর গড়ে ৫৪৯০ টন করে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী উত্তরভারতের নানা প্রান্ত থেকে জিয়াগঞ্জে এসে পৌঁছাতো। ভাগীরথীর অপর তীরে অবস্থিত আজিমগঞ্জ শহর একদা মুর্শিদাবাদ নগরী সংলগ্ন ছিল ও ক্রমবর্ধমান শহরতলীর বিশেষ অংশও ছিল। এখানে বাস করতেন যথাক্রমে পঞ্জাব ও রাজস্থান থেকে আগত অসওয়াল এবং মাড়োয়ারীরা। মাড়োয়ারীরা মূলত জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নদীর তীর বরাবর এরা অপূর্ব সব মন্দির তৈরি করেছিলেন। এ শহরে ধনী জৈন্য ব্যবসায়ীরা হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ সহ বিভিন্ন জৈন তীর্থস্থানে মন্দিরগুলির সমস্ত রকমের খরচ খরচা বহন করতেন। ধুলিয়ানও গঙ্গারতীরে একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। একদা বৎসরান্তে একটি বিশাল মেলা বসতো। ধুলিয়ানকে সে সময়কার মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যিক জগতের প্রবেশদ্বার বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। ছাপঘাটিতে ছিল গাছের গুড়ির জমজমাট কারবার। (শোনা যায়, নবাবী আমলে এখানে নৌযানে চুঙ্গি নেওয়া হতো, পঞ্জীকরণ হত এবং শীল মহরের ছাড়পত্র দেওয়া হতো। কেউ কেউ একে ছাপঘাটি সাফ ঘাটিও বলে থাকেন। কেন বা কিসের জন্য সাফঘাটি— তার সদুত্তর মিলে না!) বহরমপুর শহরের ব্যস্ততম বন্দর হয়ে উঠেছিল খাগড়া। সৈদাবাদের উত্তরতম প্রান্তে ফরাসডাঙ্গা অঞ্চলে ছিল ফরাসীদের রেশম কারখানা এবং কুঠি। সৈদাবাদে আর্মেনীয়ান বণিকরা কুঠি তৈরি করেছিলেন। ১৭৫৮তে পিটার আরাটুন কুঠির পাশে চার্চও নির্মাণ করেন। কাশিমবাজারের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটু পশ্চিমে বিরাজ করতো কালকাপুরের ডাচ ফ্যাক্টরি। রবার্ট, ওয়ারেন হেস্টিংস, জোব চার্ণক, ফরাসী রাজপুরুষ ডুপ্লে, পিটার আরাটুন প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্বদের ভিড় জমেছিল বৃহত্তর কাশিমবাজার তথা সৈদাবাদ অঞ্চলের মাটিতে। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক ট্রাভার নিয়ারের লেখা একটি পত্রে কাশিমবাজারকে স্বাস্থ্যকর স্থানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এক সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৃটিশ কর্মচারীরা নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় কাশিমবাজারে বদলি হয়ে আসার জন্য দরখাস্ত করতেন। বৃহত্তর কাশিমবাজার নগরীর আয়তন চতুর্দ্দিকে প্রায় ৬ মাইল বিস্তৃত ছিল। শহরের অসংখ্য অলি-গলি ছিল। লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ। শহর এত ঘিঞ্জি ছিল যে ছাদ থেকে ছাদে লাফিয়ে গোটা শহর ঘুরে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। ১৬১০-এ বৃটিশ কোম্পানির কুঠিয়াল কাশিমবাজারে আগমন করেছিলেন। ১৬৫৮-র মধ্যেই গড় বেষ্ঠিত কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৫৮তে জোব চার্ণক কুঠির সহকারী অধ্যক্ষ রূপে কাজে যোগ দেন। ১৬৮০তে তিনি অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। ১৬৮৩তে শায়েস্তা খাঁর নির্দেশে কুঠি উঠে গেলেও পরে আবার নির্মিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস এখানেই ফার্সী শিখেছিলেন। ১৬৭৪ এ কুঠির অধ্যক্ষ মার্শেল সংস্কৃত ও বাংলা শিখে শ্রীমদ্‌ভগবতের কিয়দংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এখানকার সমাধিক্ষেত্রেই শায়িতা আছেন হেস্টিংসের পত্নী মেরী ও কন্যা এলিজাবেথ। সিরাজ কুঠি আক্রমণ করে এখান থেকেই হেস্টিংকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। কুটির ধ্বংসাবশেষ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা বর্তমানে খুবই কষ্টকর। কালকাপুরের ওলন্দাজ কুঠি সয়দা খাঁ বা শেতাখাঁর বাজারে (সৈদাবাদে) আর্মেনীয়ান কুঠি ও চার্চের অবশেষ যা' টিকে আছে, তা প্রায় না থাকারই মতো। কাশিমবাজারে বদ্ধ জলাভূমি দেখেও অনুমান করা শক্ত একদা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বড়

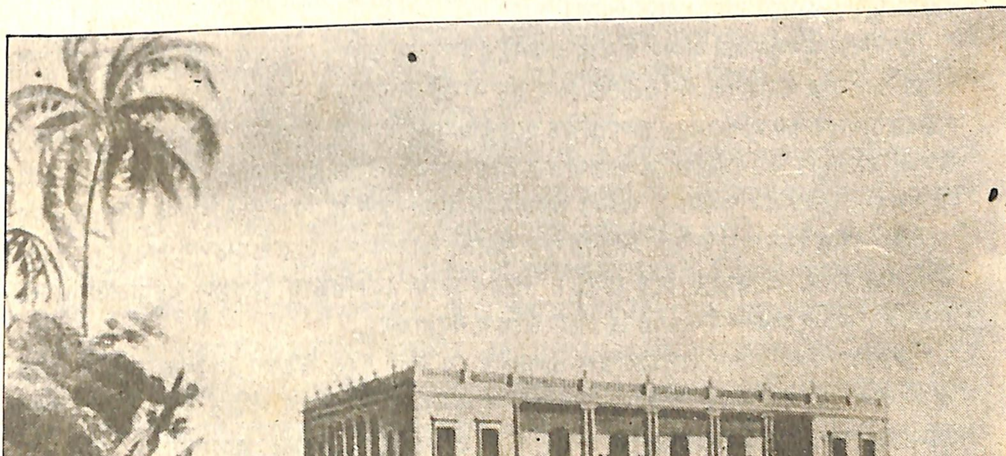
যাতায়াত। আর সন্ধ্যে বেলায় করতাল শ্রীখোলে মহাপ্রভুর নাম উঠতো। অবিশ্বাসী ছেলেরা বলে, 'ও বুড়ি, তুমি সব দেখেছো?' বুড়ি বলে, আমি দেখবো কোথায়, আমার গুরুদেব বলেছেন, তাকে বলেছেন তার গুরু, আমাদের সব গুরুর মুখেই শিক্ষা।' ছেলেরা প্রশ্ন করে, ও বুড়ি তোমার বাড়ী কোথায়?' বুড়ি বলে, ' পাগল ছেলে, বৈষ্ণবীর আবার ঘর বাড়ী কি।' বুড়ি চলে যায়। ছেলেরা তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধা পাগলিনীর দিকে। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কথা মিথ্যা নয়। আজকের রাস্তার ধারে নীচু ঘাসের অস্পষ্ট জলরেখাকে পণ্যবাহী জাহাজ বুকে নিয়ে পূর্ণ যৌবনা নদীর কষ্ট কল্পনা যত দুরূহই হোক না কেন, অনৈতিহাসিক নয়। একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসের তৎকালীন সময়ের এই এলাকার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"... নানা দিগ্‌দেশাগত অংসখ্য অংসখ্য বণিক বাণিজ্যার্থে এখানে সমবেত হইতেছে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আরমানিয়ান বণিকদিগের সৌধ অট্টালিকা, ভাগীরথীবক্ষে ভাসমান অসংখ্য অর্নবপোত, স্থানে স্থানে রাশিকৃত স্তূপাকার পণ্যদ্রব্য নদী পার্শ্বস্থ মালের গুদাম, বহু সংখ্যক রেশমের গৃহ, দেশীয় তন্তুকার দিগের সারি সারি দোকান, দোকানের সম্মুখস্থিত দোলায়মান চিত্র বিচিত্র রেশমী বস্ত্র সর্বদাই এই স্থানটিকে অপূর্ব শোভায় পরিশোভিত করিতেছে। লোকারণ্যের কোলাহল, দালালগণের দ্রুতপদে গমনাগমন, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বিলাসপ্রিয় লোক দিগের সুচারু পরিচ্ছদ ও বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য, অর্থলোলুপ বণিকণিগের অর্থোপার্জনার্থ বিবিধ চেষ্টা এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার, মানব মনের ঘোর বিষয়াসক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। ... নিশীথে নদী পার্শ্বস্থ অট্টালিকাস্থিত দীপালোক দূরস্থিত দর্শকের নিকট অগন্য তারকারাশির ন্যায় বোধ হইতেছে। সন্ধ্যার পর ইংরাজদিগের ক্যান্টনমেন্টেইংরাজী বাদ্য, পাশ্ববর্তী গ্রামস্থ তন্তুবায় ও অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকদিগের গৃহের খোল করতালের ধ্বনি, ভাগীরথীর কলকল শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব সুমধূর সঙ্গীতে সর্বস্থান পরিপূর্ণ করিতেছে, শ্রোতার কর্ণে অজস্র সুধাবর্ষণ করিতেছে।"[১] সে এক বৈপরীত্যের অপূর্ব সহাবস্থান। একদিকে যেন ইউরোপের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়ান, ফরাসী, ইংরাজ। তাদের গমনাগমন, ব্যবসাবাণিজ্য, সামাজিক জীবন, ধর্মাচরণ। অন্যদিকে দেশীয় রেশম চাষি ও তন্তুবায়। যারা পরম স্নেহে পালন করে রেশম কীট। অন্যেরা শ্রম আর হৃদয়ের অপূর্ব বুননে বুনে চলে মসৃণ রেশম, স্পর্শকাতর আঁচলে ফুটিয়ে তোলে কারুকার্য। যে রেশমী বস্ত্র দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়, বিশ্বের দেশে দেশে বেড়ে চলে তার চাহিদা। একদিকে ফরাসডাঙ্গা কুঠিতে স্বনামখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক ডুপ্লে, কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠিতে কোলকাতার স্থপতি জব চার্নক, সৈদাবাদের আর্মেনিয়ান বসতি যেখানে থাকেন নবাব মীরকাশিমের প্রধান সেনাপতি খোজা গ্রেগারী গুরগিন খাঁ, তাঁর ভাই কূটনীতিক ও ব্যবসায়ী খোজা প্রেত্রোস অ্যারাটুন। কালিকাপুরে দেড় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত ডাচদের অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ। অন্যদিকে এদেশের হস্তশিল্পীদের তৈরি রেশমী রুমাল শিল্পরসিক ফরাসীদেশের সম্রাট চতুর্দশ লুইকে অভিভূত করে।

তারপর কালের নিয়মে হারিয়ে যায় সবই। হারিয়ে যায় স্মৃতি চিহ্নটুকুও। এক ক্রমবিলীয়মান অস্পষ্ট জলরেখা বেগবতী নদীর স্মৃতি বুকে নিয়ে নিঃশব্দে পড়ে থাকে। এই বিয়োগবেদনা বেজে ওঠে পুরাতন কোলকাতা জার্নালের পাতায়, "... The places where they lived are levelled to the ground, and down in Saidabad, where their residences were, one only finds grass and moss-grown ruins. The very roads over which they walked

have disappeared, and all that remains of this ancient colony is an occasional walled-in-plot of land. To the question, 'what place was this?' the guide invariably replies– 'A rich merchant lived here, He was ruined, and the house fell.''[২] নিখিল নাথ রায় লিখলেন কাশিমবাজারের স্মৃতিকথা, 'ইহার পরস্পর সংলগ্ন গগনস্পর্শী অট্টালিকারাজির জন্য রাজপথে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারিত না, দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিনী সৌধ মালার অগ্রভাগ দিয়া লোকে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত, তাহা এক্ষণে আরবের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়।''[৩]

হরিয়ে যাওয়া নগর অথবা পরস্পর সংলগ্ন নগরগুলি প্রসঙ্গে মহরাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ভাষ্য, ''Ichabad! Ichabod! for the glory has indeed departed from this once large and wealhy town ... Calcapur, the site of the Dutch factory and old Dutch cemetery, is now a jungly waste, dotted here and there with the ruins of what must have been handsome dewellings. Even before Murshidabad reached its greatest Prosperity, Kasimbazar was the home of trade and commerce in these parts. Portugues, French, Dutch and Armenians, all in turn have had their day and disappeared. British trade amidst many ups and downs and change of hands, remained and prospered.''[৪] হারিয়ে গেল বন্দর কাশিমবাজার, বাণিজ্যকেন্দ্র কাশিমবাজার, হারিয়ে গেল সৈদাবাদের আর্মেনিয়ান শ্বেতা খাঁর বাজার, কালিকাপুরের ওলন্দাজ। নদীর গতিপরিবর্তনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ফরাসডাঙ্গার ফরাসীদের শেষ অবশেষ। থেকে গেল ইংরেজ এ দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের সাথে যুক্ত হয়ে অনেকদিন।



কাশিমবাজারে কাশিমবাজার নদীর তীরে ইংরেজদের কুঠি। বহু অত্যাচারের সাক্ষী বর্তমানে কুঠিতির অস্তিত্ব নেই।

২

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৮৭ থেকে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার সিপাহ সালার তথা শাসক সৈয়দ খাঁ এবং তাঁর বণিক ভ্রাতা মুখসুস খাঁ সৈদাবাদ ও মুখসুদাবাদ এই দুই পরস্পর সংলগ্ন শহর পত্তন করেছিলেন এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স— মুর্শিদাবাদ (১৯৭৯) অনুযায়ী "১৫৭৫ থেকে ১৬১২ সালের মধ্যে পরস্পর সংলগ্ন সৈদাবাদ মুখসুদাবাদ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এক নাগরিক বসতি এলাকা এবং বাংলাদেশে সমাগত মোগল-বাহিনী শাসকবৃন্দ ও তাদের উপর নির্ভরশীল লোকজনদের এক প্রধান আবাসকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই এলাকাটি।"[৫]

সৈয়দ খাঁর নাম অনুসারে সৈদাবাদের প্রকৃত নাম সৈয়দাবাদ। এখনও একটি পুরাতন বাড়ির শ্বেতপাথরের ফলকে উৎকীর্ণ আছে 'সৈয়দাবাদ হাউস'। যদিও কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বাজার ছিল, লোকে 'সওদা' করতে আসতো। তার থেকে সৈদাবাদ নাম হয়েছে। এ কথাটার জোরালো ভিত্তি নেই।

সৈদাবাদ সংলগ্ন মাসুমা বাজার এলাকাটির পরিবর্তিত নাম কাশিমবাজার। নিকোলো মানুচীর* বক্তব্য অনুযায়ী সম্রাট সাজাহান বাদশাহ হবার আগে বেগম মমতাজকে নিয়ে হুগলি পরিভ্রমণে এসে পর্তুগীজদের হাতে লাঞ্ছিত হন। বাদশাহ্ হবার পর তিনি পর্তুগীজদের দমন করার জন্য সেনাপতি কাশিম খাঁকে পাঠান। ১৬৩২ সালে কাশিম খাঁ পর্তুগীজদের পরাজিত করেন। তারপর কয়েকজন পর্তুগীজ মহিলাকে অপহরণ করে মাসুমা বাজারে নিয়ে আসেন। "উপরের ঘটনাকে উপন্যাস মনে করলেও হুগলি বিজয়ী কাশিম খাঁ যে মাসুমাবাজারে এসেছিলেন তা প্রামান্য এবং কাশিম খাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যই মাসুমাবাজারের নাম কাশিমবাজারে রূপান্তরিত হওয়া যুক্তিপূর্ণ মনে করা যেতে পারে।"[৬]

সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদ-মাসুমাবাজার একসাথে ইতহাসে উল্লিখিত হলেও এবং তার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও গুরুত্ব থাকলেও পরবর্তীতে সৈদাবাদ নামটি ইতিহাসের উল্লেখ থেকে হারিয়ে গেছে। সম্ভবত মুখসুদাবাদ মুর্শিদাবাদে রূপান্তরিত হয়ে রাজধানী হিসেবে পাদপ্রদীপের আলোয় থেকেছে। মাসুমা বাজারও কাশিমবাজারে পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তীকালে ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র এবং হেস্টিংসের বেনিয়ন কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আবাস ও ব্যবসাস্থল হিসেবে ইতিহাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সৈদাবাদ ও তার সংশ্লিষ্ট ফরাসডাঙ্গা, কালিকাপুর তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ভূমিকা থাকলেও দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। পরের দিকে বেশিরভাগ ইতিহাস রচয়িতাই এদের একসাথে মিলিয়ে কাশিমবাজার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সৈদাবাদ মুখসুদাবাদ মাসুমাবাজার এলাকায় যে নগর গড়ে উঠলো তা শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেল। ইতিমধ্যে সামন্তী শাসনের গর্ভে বণিকী পুঁজির জন্ম ও বিকাশের সূচনা হয়েছে। এই অঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণ প্রথমত, ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা মোগল শাসকবৃন্দের অনুগামী হতো। তাই বাংলাদেশে মোগল বাহিনী ও শাসকবৃন্দের আবাসকেন্দ্র হিসেবে ব্যবসায়ী মহাজনদেরও আশ্রয়স্থল ছিল এই এলাকা। দ্বিতীয়ত, মোগল শাসনকর্তা ও সেনাপতিরাও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করতেন। মোগল রাজকর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বা সওদা-ই-খাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তৃতীয়ত, বাণিজ্যের উপাদান হিসেবে

---

* নিকোলো মানুচী— ভেনিসের এই মানুষটি ১৬৫৫ সালে সতেরো বছর বয়সে ভারতে আসেন এবং বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করে ও বিভিন্ন ব্যক্তির অধীনে কাজ করে ১৭১৭ সালে মারা যান। তাঁর লেখা মোগল ইতিহাস (storia de Mogor) একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ।)

সংলগ্ন এলাকার তুঁতচাষ ও রেশম শিল্প যা সে সময়ে অত্যন্ত লাভজনক পণ্য হিসেবে স্বীকৃত। ''ফলে ১৬১২ সালের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সৈদাবাদ, মুখসুদাবাদ শিল্প বাণিজ্যে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করে। এই জন্যেই ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দেই দেখা যাচ্ছে যে পাটনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপনের জন্য প্রেরিত রবার্ট হিউজেস এবং জন পার্কার কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছেন যে মাকসৌদ এবং সারদীবাদ-এ (অর্থাৎ মুকসুদাবাদ ও সৈদাবাদে) সবচাইতে ভালো 'সেরবন্দী সিল্ক' পাওয়া যায়।''[৭] ১৬৩২ সালে দিল্লীর মোগল বাদশাহ শাজাহান প্রেরিত বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পর্তুগীজদের হুগলি বন্দর দখল করে ও পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে হুগলিকে বাদশাহী বন্দরে পরিণত করে। এ ঘটনার পরই বেসরকারি বন্দর হিসেবে হুগলি বিজয়ী কাশিম খাঁর নামাঙ্কিত কাশিমবাজার বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। কাশিমবাজার বেসরকারি নদী বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় হুগলির বাদশাহী বন্দরের শুল্ক এড়ানোর জন্য দেশি বিদেশি বণিকেরা সেখানে সমবেত হয়। ''সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেই ব্যবসায়ী বাঙালি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে সমবেত হলেন। সমবেত হলেন পশ্চিম ভারতীয় গুজরাটি বণিককুল। মারোয়ারী মহাজন ও স্রফগণ অচিরেই নিজেদের বাসা বাধলেন। ... বিদেশী বণিকগণ কাশিমবাজারে বসতে দেরি করলেন না।''[৮]

১৫৭৫ সালের পর থেকেই বাংলার অর্থনীতিতে পর্তুগীজদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৬৩২ সালের আগে পর্যন্ত সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের মিত্রতা ছিল। ফলে মুর্শিদাবাদ সহ সারা বাংলাদেশেই পর্তুগীজদের প্রভাব ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ''পর্তুগীজ বাণিজ্যই যে অনেকাংশে এ জেলাঞ্চলের রেশম শিল্পের খ্যাতি তাদের বাণিজ্যের মাধ্যমে ১৬১৫ সালের মধ্যে সর্বভারতীয় বাজারে এবং ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। পর্তুগীজরা বাংলা থেকে যে সব জিনিসপত্র ক্রয় করত সুনিশ্চিতভাবে তার মধ্যে সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদের রেশমীকাপড় ও কাঁচা রেশম। এই জন্য পর্তুগীজ বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এই জেলাঞ্চলের কাঁচা রেশম ও রেশমী কাপড়ের উৎপাদন ও বিনিময় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।''[৯]

সম্রাট শাহ্জাহানের আমলে মোগল বাহিনীর হাতে পর্তুগীজদের পরাজয় বাণিজ্যক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। এই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসে অন্যান্য বিদেশি বণিকরা। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই সৈদাবাদ মুখসুদাবাদ এলাকা সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং বিদেশেও এখনকার উৎপাদিত পণ্য গুরুত্বপূর্ণ লাভজনক সামগ্রী হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু সৈদাবাদ ও তার সংলগ্ন এলাকার এই বিশেষ অবস্থান ইতিহাসে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়নি। বরং পরবর্তীতে আমদানী রপ্তানীর কেন্দ্র হিসেবে কাশিমবাজার বন্দরের আত্মপ্রকাশের পর সমগ্র এলাকাটিকেই কাশিমবাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ সৈদাবাদ ও সংলগ্ন কালিকাপুর, ফরাসডাঙ্গা এলাকাগুলিকে কাশিমবাজারের উপনগরী বলে উল্লেখ করেছেন।

সৈদাবাদের পূর্বদিকে অবস্থিত কালিকাপুর সে সময়ের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কালিকাপুরকে ইংরেজ লেখকরা কাল্কাপুর বলেছেন। কালিকাপুর নামকরণ নিয়ে কোনো আলোচনা ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে না। এই কালিকাপুরে ডাচ্ বা ওলন্দাজদের ব্যবসায়ী কুঠি ছিল এবং সে সময় ওলন্দাজদের বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রসার ও ব্যাপ্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে একটা উদাহরণ প্রায় সমস্ত ইতিহাস রচয়িতাই উল্লেখ করেছেন যে, বার্নিয়ে **(Bernier)** লিখেছেন ১৬৬৬ সালে কালিকাপুরে ওলন্দাজদের ফ্যাক্টরিতে সাতশো থেকে আটশোজন এদেশীয় কর্মচারি কাজ করত, তখন ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশি বণিকদের ফ্যাক্টরিতে এই

সংখ্যা ছিল অনেক কম। টিফেনথেলার (Teiffenthaler) ও ডাচদের প্রয়াসকে বিশাল ও অনন্যসাধারণ (magnificent) বলে উল্লেখ করেছেন।"[১০] "তাদের (ডাচ) রেশম ব্যবসা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা ১৭৩৯ সালে ১,৫৩,০০০ টাকা ব্যয়ে এক অনন্যসাধারণ প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন।"[১১] ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজার (কালিকাপুর) কুঠির রেশম সুতো উৎপাদন কেন্দ্রটি যখন পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে কাজ করতো তখন ৩০০০ জন কারিগর কাজে নিযুক্ত থাকতো। পরে ১৭১৫ সালে ৪০০০ কারিগরের কাজ করার মতো জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ওলন্দাজদের রেশম উৎপাদন ও রপ্তানীর ব্যাপকতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হিসাব দেখানো হয়েছে। "কাশিমবাজারে (কালিকাপুরে) সে সময় (১৬৬৩) বছরে বাইশ হাজার গাঁট কাটাসুতো তৈরি হতো। প্রতি গাঁটের ওজন ১০০ লিভার (এক লিভার এক পাউণ্ডের থেকে কিছু বেশি)। সমগ্র ওজন প্রায় ৩০,০৭৮ মণ। এই উৎপাদিত সুতোর ৬০০০ থেকে ৭০০০ গাঁট নিত ডাচরা জাপান ও হল্যাণ্ডে রপ্তানির জন্য। প্রায় সমপরিমান সুতো গ্রহণ করতো তাতারি বণিক এবং মোগল সাম্রাজ্য। বাকি (প্রায় ৯০০০ গাঁট) থাকতো দেশীয় মানুষের ব্যবহারের জন্য।"[১২] যা ওলন্দাজ ব্যবসায়ীগণ দেশের ভেতরে বিক্রি করতো। এখন ওলন্দাজদের একটি সমাধিস্থল ছাড়া আর কোনো চিহ্নই নেই। বর্তমানে কাশিমবাজার রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই সমাধিস্থল অবস্থিত। সবচেয়ে পুরনো সমাধিটি ড্যানিয়েল ভ্যানডার মুয়েল-এর। যিনি ১৭২১ সালে মারা গিয়েছিলেন।

সৈদাবাদের উত্তর দিকে নদীর বহিঃপ্রবাহের মুখে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জায়গায় ছিল ফরাসীদের কুঠি। যে জায়গা ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত। ফরাসডাঙ্গার অবস্থান ছিল বর্তমান কুঞ্জঘাটার কাছে। ফরাসীরা প্রথম দিকে ব্যবসায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু পরে ডুপ্লে সাহেব ফরাসী কুঠির কর্মকর্তা হয়ে আসার পর কুঠির সংস্কার করে নতুন করে ব্যবসা শুরু করেন (১৭৩৪ সাল)। ডুপ্লের আমলে ফরাসী ব্যবসার প্রভূত উন্নতি হয়। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "Under Dupleix's fore through and driving power, French trade in Qasimbazar made a wonderful progress. The French E.I company proposed to buy for export every year sixty thousand hanks of first-class silk yarn (called tani) and a large quantity of other merchandise made there, such as silk piece goods and white gara of coarse cotton fabrics."[১৩] শুধু তাই নয় ডুপ্লে ফরাসডাঙ্গায় এক বিরাট বাজার বসালেন। সেখানে আসতো চীন থেকে ফটকিরি, কর্পূর, দস্তার তৈরি জিনিস, পারদ, চীনামাটির জিনিস, সিঁদুর এবং কৃত্রিম মুক্তো। "ডুপ্লে ফরাসডাঙ্গায় রাজ্যের সেরা তাঁতিদের সমাবেশ করলেন। ফরাসডাঙ্গায় তাঁতের জিনিস পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেল। ফরাসডাঙ্গার নাম শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনের মতো লোকের মুখে মুখে ঘুরে বিখ্যাত হয়ে গেল। ... ফরাসী ব্যবসা প্রসারের ফলে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ইন্দ্রনারায়ণ পুত্র বার্ষিক বহুটাকা উপায় করতেন। এই ভদ্রলোক নবাব দরবারেও ফরাসী কুঠির প্রতিনিধিত্ব করতেন। ... কলকাতার ইংরেজ কাউন্সিল লাভনের পরিচালিত সমিতিকে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি জানালেন যে ফরাসীরা পাঁচখানা জাহাজ সরাসরি ইউরোপে পাঠাচ্ছে। ফরাসীদের লা ওরিয়েন্ট বন্দরে যে সব জিনিস বাংলা থেকে পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে দেখা যায় কাশিমবাজারের সূতিকাটা কাপড়ের থান ৩,৮৭,৮২০ খানি, ৭১ টি সিল্কের রুমাল ছাড়া ৩৯টি সিল্কের ছাপান রুমাল ছিল।"[১৪] ফরাসডাঙ্গার কুঠি প্রতিবছর বন্যায় ডুবে যেত। একে প্রতিরোধ করতে ডুপ্লে পণ্ডিচেরী থেকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে

এলেন। বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধের জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে জালিকা তৈরি করা হলো। কুঠির চারিদিকে প্রাকার তৈরি হল। ক্রমে কুঠি পরিণত হল দুর্গে। এ অঞ্চলে গঙ্গার বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধে বোধ হয় এইটিই প্রথম পরিকল্পিত উদ্যোগ।

সৈদাবাদে বসবাসকারী আর এক বিদেশী গোষ্ঠী হল আর্মেনিয়ানরা। ১৬০৪ সালে আর্মেনিয়ানরা তাদের জাতীয়তা ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হারিয়ে ইহুদী জাতির মতো হয়ে পড়ে। এরা স্থায়ীভাবে আশ্রয় নেয় ইস্পাহান ও নিউজুলফায়। কিছু সংখ্যক আর্মেনীয়ান ইহুদীদের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার আর্মেনিয়ানরা অধিকাংশই এসেছিলেন নিউজুলফা থেকে।[১৫]

১৬৬৫ সালে আর্মেনিয়ানরা বসবাস এবং চার্চ নির্মাণের জন্য দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে একখণ্ড জমি সনদ পান। তৎকালীন শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর্মেনীয়ানরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। "১৭৮২ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল, considerations on Indian Affairs. এই দলিলে Bolts নিম্নলিখিত ভাবে সৈদাবাদের আর্মেনীয়ান কুঠির উল্লেখ করেছেন— 'আর্মেনিয়ানরা তামাম হিন্দুস্তানের বৃহত্তম বণিক গোষ্ঠী। বাংলাদেশে বহুদিন যাবৎ তাদের বড় বড় কুঠি রয়েছে, বিশেষভাবে সৈদাবাদে। মোগল সম্রাটের আদেশের বলে তাদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার ওই একই আদেশ বলে তাদের দুটি প্রধান পণ্যের উপর শুল্ক নির্ধারিত হয়েছে, প্রথমটি থান বস্ত্র এবং দ্বিতীয়তটি কাঁচা রেশম।"[১৬] আর্মেনিয়ানদের শিল্প ও বাণিজ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া না গেলেও সে সময়ে বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, "... অপর বিদেশী গোষ্ঠী আর্মেনিয়ান যারা পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসী ব্যবসার মিড্‌ল ম্যান হিসেবে কাজ করতো। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আর্মেনিয়ানদের ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ছিল।"[১৭] এই একই কথার পুনরাবৃত্তি, "আর্মেনীয়রা ২৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই উদীয়মান নগরকেন্দ্রে সৈদাবাদ অঞ্চলে তাদের কুঠি ও বসতি গড়ে তোলে এবং ক্রমশ আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে।"[১৮]

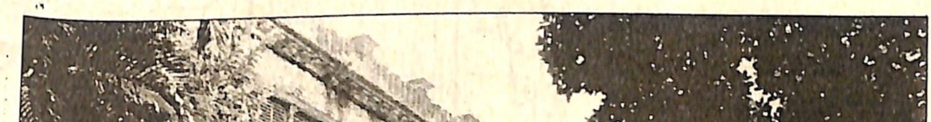
আর্মেনিয়ানরা অন্যান্য বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর থেকে ভিন্ন রকমের ছিলেন। তারা এ দেশের জল-মাটির সাথে মিশে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ তথ্য না পেলেও অনুমান নির্ভর আলোচনায় দেখা যায় তারা এ দেশিয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। নবাব আলীবর্দীর সময় খ্যাতিমান আর্মেনিয়ান বণিকের নাম আগাপেত্রো। তিনি নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সৈদাবাদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আর্মানী বণিক হলেন খোজা পেত্রোস অ্যারাটুন। নবাব সিরাজদৌল্লার আমলে ঘটনাবহুল দিনগুলিতে বণিক-বৃত্তি ছাড়াও কূটনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অ্যারাটুন সিরাজদৌল্লার বিরোধী ছিলেন এবং সিরাজের কোলকাতা আক্রমণকালে দুর্দশাগ্রস্ত ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজরা তাঁর প্রতি সুবিচার করেনি বরং সিরাজ থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত নবাবদের গুপ্তচর হিসেবেই অ্যারাটুনকে অভিযুক্ত করা হয়। পেত্রোস অ্যারাটুনের কনিষ্ঠভ্রাতা খোজা গ্রেগরি ওরফে গুরগিন খাঁ নবাব মীরকাশিমের সেনাপতি ছিলেন। সৈদাবাদে গুরগীন খাঁর বসত বাড়ি, বাগানবাড়ি ও ব্যবসা ছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর তিনি বিদ্রোহী সেনাদের হাতে আক্রান্ত হন। পরে মারা যান (১৭৬৩) কেউ কেউ মনে করেন তিনি সে সময় নিহত না হলে মীরকাশিম দ্বারা জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারতো না। পেত্রোস অ্যারাটুনের আর এক ভাই বারসো অ্যারাটুন সফল ও স্বাধীন বণিক ছিলেন। ব্যবসাগত কারণেই তিনি গভর্ণর হ্যারি ভেরেলস্টের

বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আর্মেনীয়রা দীর্ঘদিন সৈদাবাদে বসবাস করেন। ইতিহাসে চর্চিত এবং উল্লিখিত না হলেও পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমানে দেখা যায় সে সময় সৈদাবাদ নগরীর প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের লেখক নিখিলনাথ রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, আর্মেনীয়রা শ্বেতকায় ছিলেন বলে তাদের শ্বেতা খাঁ বলা হতো। সৈদাবাদে আর্মেনীয়দের প্রতিষ্ঠিত বাজার শ্বেতা খাঁর বাজার হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৭৫৮ সালে পেত্রোস অ্যারাটুন সৈদাবাদে একটি সুদৃশ্য গীর্জা নির্মাণ করান। এই গীর্জার বর্ণনা বিভিন্ন গেজেটিয়ার ও রচনায় স্থান পেয়েছে। এই গীর্জার ভগ্নাবশেষ যে জায়গায় আছে তা আজও গীর্জাপাড়া হিসেবে পরিচিত।

১৬১২ সালের পর থেকে শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সৈদাবাদ নগরীর উত্থান ও দীর্ঘদিন তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ইতিহাসে অনালোচিত হলেও রেনেলের একটি হাত নক্সায় তার ব্যপ্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পরিকল্পিত, বিন্যস্ত জমজমাট একটি প্রাচীন নগরীর চিত্র এই স্কেচটিতে ধরা আছে (৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায়)।

বণিক হিসেবে এদেশে ইংরেজদের আগমণ যেমন নাটকীয়, প্রায় দুই শতাধিক বছর ধরে তাদের অবস্থান এদেশের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজজীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। প্রথমেই একটি তথ্য ভ্রূ কুঁচকালেও সত্য বলে মানতে হবে তা হলো, 'ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম যখন বাংলায় পদার্পণ করে তখন তিন প্রধান বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে তারা ছিল নিকৃষ্টতম। ইংরেজ কুঠির ক্রমবিবর্তন তাই অতীব বৈশিষ্টপূর্ণ। লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলী হুগলীর প্রতিনিধিকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে কাশিমবাজারের কুঠিস্থাপন অনুমোদন করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে চোদ্দ লক্ষ পাউণ্ড কেবল কাশিমজাবারে লগ্নী করবার আদেশ দেওয়া হয়। সোরা এবং রেশমের জন্য এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়।''[১৯] ইংরেজ কোম্পানির ডাক্তার বুটন সাহেব বাদশাহ শাহজাহানের কন্যার চিকিৎসা করে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য করার অধিকার আদায় করলেন। ১৬৫৮ সালে জন কীন ফ্যাক্টর এবং জব চার্নক তার সহকারি নিযুক্ত হলেন। ১৬৮০ সালে জব চার্নক কাশিমবাজার কুঠির প্রধান হলেন। জব চার্নক বহু আলোচিত এক আকর্ষণীয় চরিত্র। তিনি প্রায় রূপকথার মতো শায়েস্তা খাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে বিশাল মোগল ফৌজকে হারিয়ে দিয়ে ১৬৯০ সালে কোলকাতা নগরীর পত্তন করলেন। ইংরাজ কুঠির কুঠিয়াল থেকে কোলকাতার স্থপতি জব চার্নকের ইতিহাস তাই রোমাঞ্চকর। কোলকাতার প্রতিষ্ঠা দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবকে রুষ্ট করে। তার ফল স্বরূপ নবাব শায়েস্তা খাঁ ইংরেজ ও ফরাসী কুঠি দখল করে নিলেন। তারপর সম্রাট আওরঙ্গজেব বিদেশী বণিকদের ক্ষমা করলেন। শায়েস্তা খাঁ পদত্যাগ করলে নতুন সুবেদার হলেন ইব্রাহীম খাঁ। তিনি বিদেশিদের বাণিজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে বাংলায় দেখা দিল শোভা সিংহের বিদ্রোহ। তার সহকারি মহাসিংহ কাশিমবাজারে হানা দিল। ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা টাকা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে রক্ষা পেলেন। পরে তারা আবার মুখসুদাবাদে হানা দিল। সৈদাবাদের ফরাসী ও ওলন্দাজকুঠি অবরোধ করল। ফরাসীকুঠির অধ্যক্ষ সৈদাবাদ থেকে চন্দননগর পালিয়ে গেলেন। ওলন্দাজরা কোনোক্রমে দুর্গ রক্ষা করল। শেষে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হল বটে কিন্তু ১৭০২ সালে স্থানীয় ফৌজদার হঠাৎ করে এক ফরমান জারি করে বিদেশী বণিকদের কুঠি দখল করে নিলেন। এভাবে ব্যবসা চলে না। ইংরেজরা পথ খুঁজতে শুরু করল। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর ধুরন্ধর ইংরেজরা দিল্লীর সম্রাটকে উপঢৌকন দিয়ে ১৭১৭ সালে বার্ষিক সামান্য টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি আদায় করল। ইতিমধ্যে বাংলার সুবেদার হয়েছেন মুর্শিদকুলি খাঁ। বাংলার রাজধানী উঠে এল মুখসুদাবাদে। নতুন নাম হল মুর্শিদাবাদ।

নতুন রাজধানীর আলো সৈদাবাদ কাশিমবাজার বাণিজ্য নগরীকে আলোকিত করল। মুর্শিদকুলি খাঁর সাথে মুর্শিদাবাদে উঠে এলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সুহৃদ এদেশীয় বণিক শেঠ মানিকচাঁদ। প্রকৃতপক্ষে শেঠ মানিকচাঁদের তদারকিতেই মুর্শিদকুলি খাঁ সুবেদার হন। শেঠ মানিক চাঁদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র তথা দত্তকপুত্র শেঠ ফতেচাঁদ মানিকচাঁদের বাণিজ্যের উত্তরাধিকারী হন। শেঠ ফতেচাঁদকে ১৭২২ সালে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ 'জগৎশেঠ' অর্থাৎ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বণিক এই উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর থেকে এই বংশের বংশধরগণ 'জগৎশেঠ' নামে পরিচিত হন। এই জগৎশেঠরা নতুন বাড়ি করলেন কাশিমবাজারে। জগৎশেঠের তখন সর্বভারতীয় ব্যবসা। জগৎশেঠের হুন্ডি আফগানিস্তানের কাবুল থেকে পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ সুমাত্রা পর্যন্ত যাতায়াত করতো। দিল্লীতে সে সময় বাদশাহ বদল চলছে। কে যে কখন দিল্লীর তখ্‌তে বসবে তার ঠিক নেই। নতুন বাদশাহ হুকুম দিত, নজরানা দাও। সুবেদারের পেয়াদা ছুটত ব্যবসায়ীদের কাছে। মুর্শিদকুলি খাঁর কর্মচারীরা ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ বণিকদের কাছে টাকা দাবি করতো। তাদের সে অর্থ দিতে হতো জগৎশেঠের গদীতে। হাতে টাকা না থাকলে জগৎশেঠই টাকা ধার দিত চড়া সুদে। এইভাবে জগৎশেঠ সেসময়ের 'ব্যাঙ্ক ও সরকারী ট্রেজারি'। ইংরেজরা দিল্লীতে তদ্‌বির করে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি নিয়ে এলো, মুর্শিদকুলি খাঁ এটা ভালো চোখে দেখে নি। তাই ১৭২১ সালে তাদের কাছে মোটা নজরানা চাওয়া হল। ইংরাজরা এই টাকা দিতে অস্বীকার করায় সুবেদারের সৈন্য ইংরেজ কুঠি অবরোধ করে গোমস্তা উকিলদের গ্রেপ্তার করলো। ইংরেজের বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় সমস্যা মিটল। ইংরেজ কোম্পানি নজরানা দিয়ে নবাবকে খুশি করল। এই ঘটনা ইংরেজ কোম্পানির সাথে জগৎশেঠের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করল। বিদেশি বণিকী পুঁজির সাথে

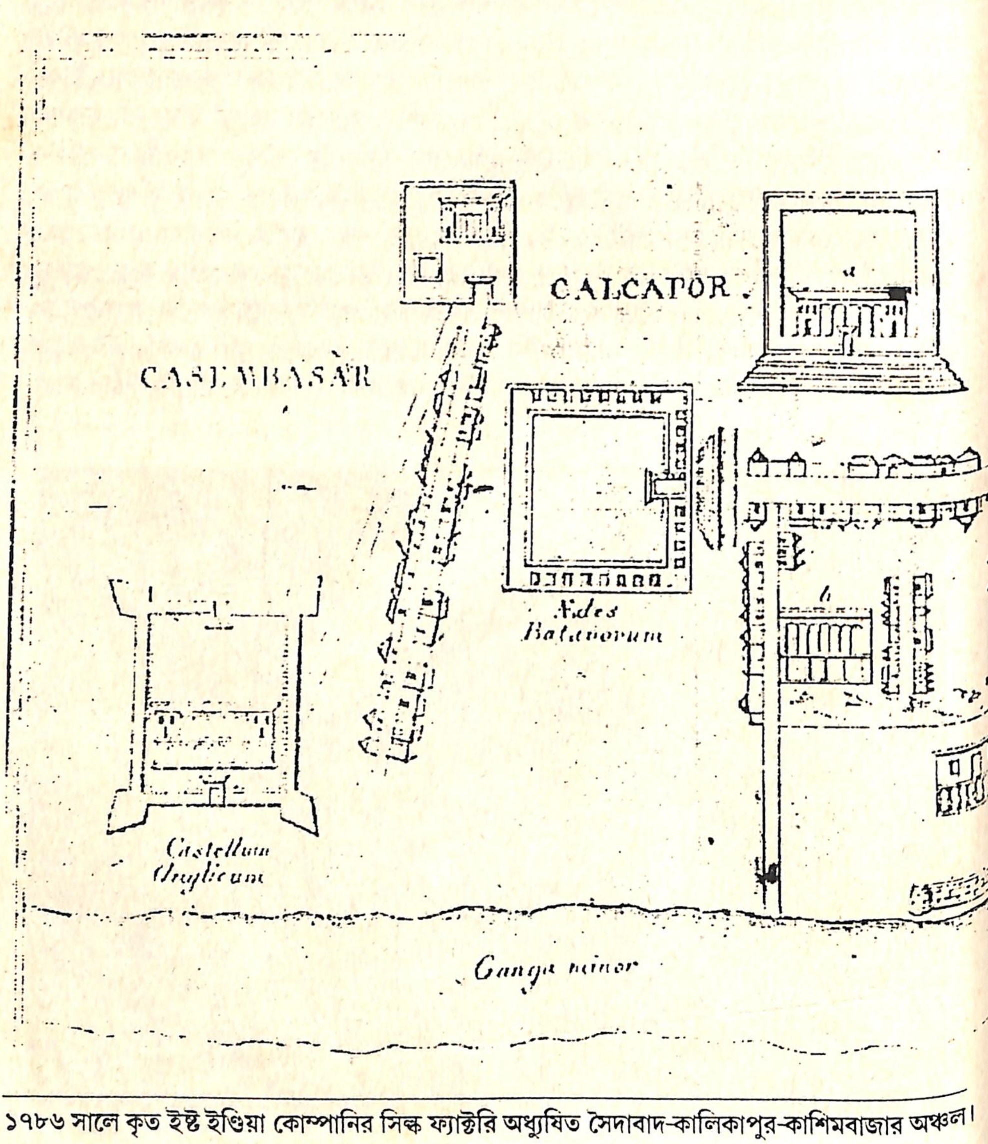


ঐতিহ্যমণ্ডিত কাশিমবাজার রাজ প্রাসাদ এখন জঙ্গলাকীর্ণ (ভিতরের দালান)।

দেশিয় বণিকী পুঁজির সখ্যতা গড়ে উঠলো। দেশের পরবর্তী কালের অর্থনীতি রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ঘটনা প্রভূত ইঙ্গিতবাহী।

৩

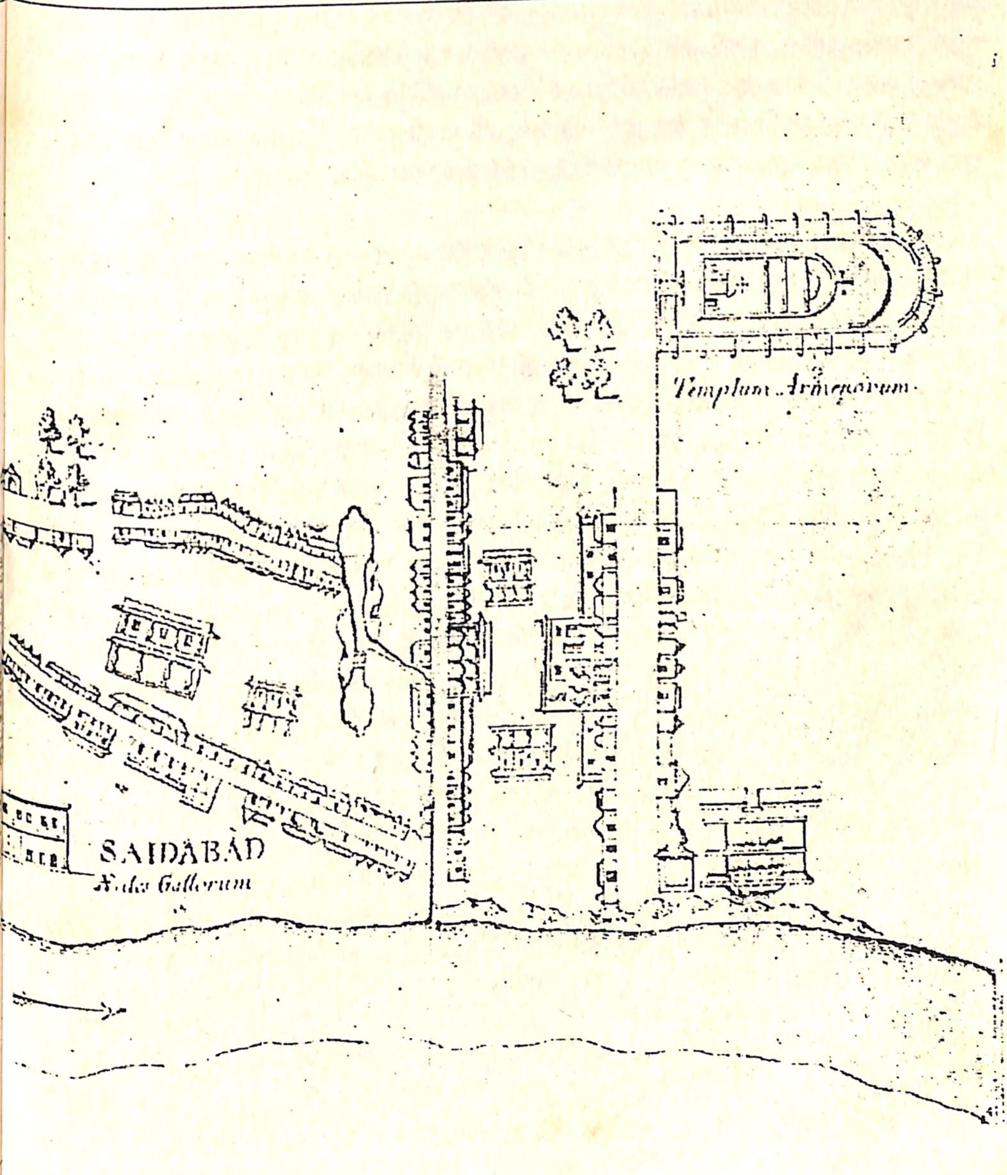
অনেকেই আক্ষেপ করেন যে আমাদের দেশের ইতিহাস জানতে হয় বিদেশীদের চোখ দিয়ে। বিদেশী বা নবাব বাদশাহ নিযুক্ত লেখকদের রচনা যেমন আমাদের দেশের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপাদান তেমনি রচনাগুলির একদেশদর্শীতার আশংকাও অসঙ্গত নয়। মুর্শিদাবাদের জেলার ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাদের রচনাও মূলত নবাব রাজা জমিদারদের মধ্যেই ঘুরপাক



১৭৮৬ সালে কৃত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিল্ক ফ্যাক্টরি অধ্যুষিত সৈদাবাদ-কালিকাপুর-কাশিমবাজার অঞ্চল।

খেয়েছে, সাধারণ মানুষের জীবনের খোঁজ পাওয়া যায়নি — এ প্রশ্নও জেলার বিদগ্ধ মানুষরা তুলেছেন। ''ঊনিশ শতকের সত্তরের দশকে একদিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে বসেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'— মাধ্যমে সকল বাঙালিকে ডাক দিয়েছিলেন বাংলার ইতিহাস লেখার জন্য এগিয়ে আসতে। কিন্তু এই 'ইতিহাস' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র রাজারাজড়াদের নাম ও যুদ্ধের তালিকা বোঝাননি, বুঝেছিলেন বাংলার প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।''[২০]

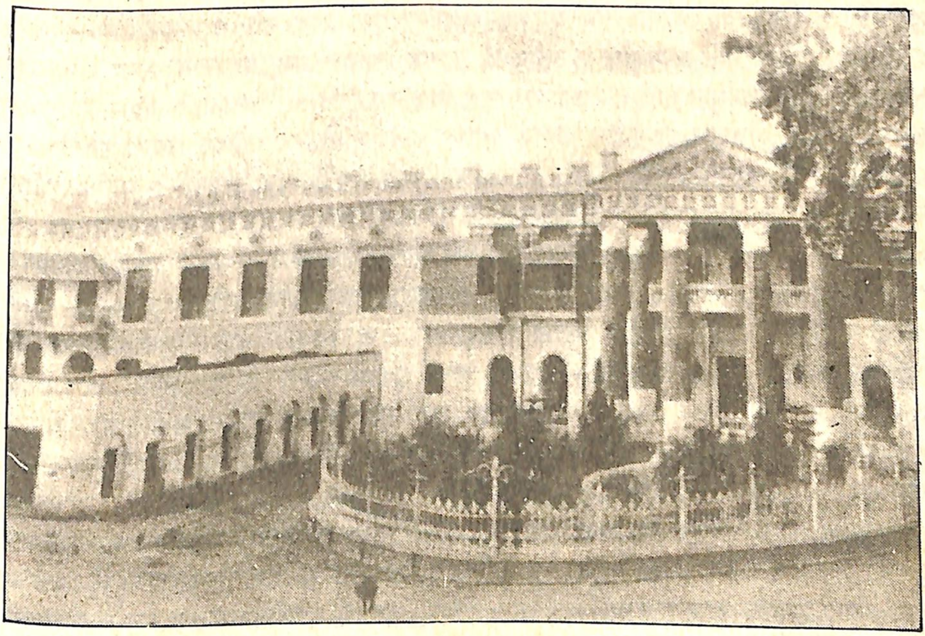
আমাদের দেশে পরবর্তীকালে বৃটিশ ও সামন্তপ্রভাবমুক্ত আধুনিক ইতিহাস চর্চা শুরু হয়েছে। বহু প্রথিতযশা বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি এই কাজে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের চেষ্টায় অনেক



অনালোচিত বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ইতিহাস কেবলমাত্র ঘটনা ও তথ্যাবলীর সন্নিবেশ নয়, ঘটনার ব্যাখ্যাও ইতিহাসের কাজ। মার্ক্সবাদের আলোকে মানব সমাজের বিকাশের ধারা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকৃত। এই দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এদেশের মাটিতে মার্ক্সবাদের নামে যে প্রতিষ্ঠিত ধারাটি স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই বহমান পরবর্তীতে তা বহুধাবিভক্ত হলেও দেশের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের মত মোটামুটি অভিন্ন। এদেশে মার্ক্সবাদের নামে এই পরিচিত ধারাটি বাণিকী পুঁজির বিকাশ ও তার ধারাবাহিকতায় উপরিকাঠামো হিসেবে সমাজ মননে যে পরিবর্তন যাকে 'রেঁনেশাঁস' বলা হয় এই বিষয়টি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। ইয়োরোপীয় সর্বব্যাপক নবজাগরণের হুবহু কপি এদেশে খুঁজতে গিয়ে এদেশের পুঁজিবিকাশের জটিল রূপটি এই ইতিহাস ব্যাখ্যাতাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। ফলে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সততা নিষ্ঠা সত্বেও পরবর্তীকালে এই বিশেষ ধারাটি কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি সমাজকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। এই কথাকটি অনধিকারীর সীমাহীন ধৃষ্টতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একথাটুকু না বললে সত্যেরপ্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা যায় না।

সুদূর ষোড়ষ শতাব্দীতেই ভারতীয় বণিকী পুঁজি যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। "... কোম্পানি (ইষ্ট ইণ্ডিয়া) আসার আগেই ভারতবর্ষের বণিকী পুঁজিবাদের অত্যন্ত ব্যাপক এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। সামন্তী ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের লেনদেন ভোগের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতির চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এদেশে তখন পণ্য সামন্তী বাজারের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর বাজারে এমনকি সওদাগরী রপ্তানীর পথে সাগরপারে বিদেশের বাজারেও পৌঁছেছে। মানের উৎকৃষ্টতা ভারতীয় পণ্যকে অন্যান্য দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের উপরে স্থান দিয়েছে। বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতে ভারতীয় পণ্য বিশ্ববাজারে বহুক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফলে বিদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক অনিবার্য বিরোধিতাও দেখা দিয়েছে। এবং এই পণ্য সরবরাহ যখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে তখনই সাধারণ অর্থনীতির নিয়মে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে rudiments of banking industry— ব্যাঙ্কিং প্রথারও অংকুর দেখা দিয়েছে।"[২১] মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানীর কিছু তথ্য এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত হয়েছে ওলন্দাজরা কি পরিমান রেশমী সুতো জাপান ও হল্যাণ্ডে রপ্তানি করতো। এদেশের উৎপাদিত রেশমী বস্ত্র ফরাসী দেশেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি 'ফরাসী রাজ চতুর্দশ লুই-এর দরবারে কাশিমবাজারের তৈরি সিল্কের বন্ধনী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রতিদিন নূতন নূতন রং-এর বন্ধনী নিয়ে রাজাদরবারে আসা ফরাসী রাজপুরুষ এবং মহিলাদের অন্যতম ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং চতুর্দশ লুইও এই ফ্যাসানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"[২২] উপরোক্ত তথ্যগুলির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে, "...a muslim merchant from Bengal sent as early as the middle of the 16th century three Ships with a cargo of silk to Russia ... India merchants played an active role in the trade along the volga and were frequent guests not in Nizhni Novgorod and Yaroslav but also in Moscow during 17th and early 18th centuries"[২৩] ভারতের সূতী এবং রেশমী বস্ত্র সওদাগরী পথে যেভাবে খোদ ইউরোপের বাজার দখল করেছিল। জানা যায় লণ্ডনের বাজারে ভারতীয় পণ্যের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য লণ্ডনের বণিকেরা সেদিন বারবার বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে দরবার করেছে। বলপূর্বক ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করার

চেষ্টাও চালিয়েছে। কার্লমার্ক্সও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে মোগল শাসিত বাংলায় তথা আলোচ্য সৈদাবাদ মুখসুদাবাদ মাসুমবাজার এলাকায় হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত রেশমী পণ্য ফ্রান্স, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড সহ ইউরোপের বাজারে, অপরদিকে জাপান সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল ষোড়শ শতাব্দী থেকেই। গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের কাছ থেকে পণ্য কিনে দেশ ও বিদেশের বাজারে বিক্রি করার মধ্য দিয়ে বণিকী পুঁজিও ক্রমাগত পরিমান ও শক্তিবৃদ্ধি করছিল এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম। "(এইভাবে) ... গ্রামীণ হস্তশিল্প উৎপাদনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্রশিল্পে, এই জেলাঞ্চলে দুই দিক দিয়ে পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথমত, পর্তুগীজ বণিকদের দ্বারা এবং মোগল রাজকর্মচারি ও তাদের অনুগামী ব্যবসায়ীদের দ্বারা কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে যজমানী প্রথা বহির্ভূত ভাবে এই বিশেষ শিল্প উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলে টাকাকড়ির অনুপ্রবেশ বাড়তে থাকে। ... জেলাঞ্চলের গ্রামীণ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৫৭৫-১৬৩২ কালপর্বে দ্বিতীয় যে পদ্ধতিতে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তা হচ্ছে উদীয়মান শহর কেন্দ্রটিতে রাজকর্মচারিদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'কারখানা' মাধ্যমে কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন।"[২৪] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এর পরপরই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত তাঁর গবেষণাধর্মী পুস্তিকা, 'চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত'তে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করেছেন, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও যা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, "... কাশিমবাজারে ডাচ, ইংরেজ ও আর্মেনিয়ান বণিকেরা যে সকল কুঠি নির্মাণ করে কাঁচা রেশম ও রেশমী কাপড় উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছিল তার ফলে মোগল বাংলায় সর্বপ্রথম ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছিল বলে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন। এ বিষয়ে



ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবু প্রতিষ্ঠিত কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদ। প্রায় ১০০ বছর আগে তোলা চিত্র।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওমপ্রকাশের দীর্ঘ মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ কাশিমবাজার (কালিকাপুর) কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাকে **মোগল বাংলায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাবের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায়।** কেন্দ্রটির আয়তনের জন্যই একথা বলা হচ্ছে না, যদিও নিশ্চিতভাবেই এটিও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মোগল ভারতে একই ছাদের নীচে নিয়মিত মজুরী ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে এই আয়তনের শিল্পোৎপাদন ছিল বিরল ঘটনা। দুটি কারণে ডাচ কেন্দ্রটির সঙ্গে বাদশাহী ও অন্যান্য কারখানাগুলি পুরোপুরি তুলনীয় ছিল না। প্রথমত, ওই সকল কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কেবলমাত্র রাজপরিবার, অভিজাত বর্গ ধনীব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের এবং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ব্যবহৃত হত, বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদিত হত না। দ্বিতীয়ত, অন্তত বেশ কিছু বড় কারখানা যে স্বাধীন চুক্তিবদ্ধ শ্রমের বদলে স্বল্প পারিশ্রমিকের বাধ্যতামূলক শ্রমের ভিত্তিতেই চালিত হত এরকম মনে হয়। মোগল বাংলায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের ক্ষেত্রে ডাচ রেশম উৎপাদন কেন্দ্রটিকে এই দুটি উপাদানই কারখানাগুলি থেকে ভিন্নতা দিয়েছিল।"[২৫] বণিকী পুঁজির অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের লক্ষণগুলি, যেমন, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং শ্রমবিভাজন ধীরে ধীরে স্পষ্ট চেহারা পাচ্ছিল এই সময়। বাংলা তথা জেলার বস্ত্রশিল্পেও এর নিদর্শন ছিল। সামন্তী রাজা বাদশা আমীর ওমরাহের কেবলমাত্র ভোগের জন্য উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থোপার্জন তথা লাভের জন্য উৎপাদন তখন ব্যাপকভাবেই শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে শ্রমবিভাজন। "Capitalist Co-operation and rudiments of capitalist manufacture existed in the weaving industry. ... well-to-do weavers employing hired workers often served merely as middlemen between the latter and the traders. Such relations retarded the advance towards higher forms of capitalist organisation of Production."[২৬] বাংলার বস্ত্রশিল্প প্রসঙ্গেই এই মন্তব্যটি করা হয়েছে। যার প্রমাণ মেলে আমাদের জেলা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্তের আলোচনাতেও। "গ্রাম সমাজে কৃষিশিল্পে নিযুক্ত যে দুটি শ্রেণীর পরিচয় পূর্ববর্তী পর্বে আমরা পেয়েছিলাম আলোচ্য পর্বে তাদের মধ্যে বড় ও মাঝারি কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তুঁতচাষ ও রেশম শিল্পের প্রসারের জন্য এবং উদীয়মান শহরাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তাগিদে বেশ কিছুটা ঘটেছিল। স্বভাবতই এই সবের ফলে গ্রাম সমাজের নিম্নতম শ্রেণীটির উপর শোষণ এবং দারিদ্রের বোঝা আরো বেশী করে চেপেছিল।"[২৭] এই সময় হস্তশিল্পী তাঁতিদের মধ্য থেকে একটি নতুন বাঙালি ব্যবসায়ী গোষ্ঠির উদ্ভব হয় এবং ১৭০৪ সালের পর এই গোষ্ঠীটি ব্যবসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করে। এই গোষ্ঠীটির নাম 'কাঠমা'। আজও সৈদাবাদের 'কাঠমাপাড়া'— কাঠমা ব্যবসায়ীদের বাসস্থানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কাঠমা' ব্যবসায়ীরা ছাড়াও ব্রাহ্মণ সহ অন্যান্য জাতি থেকে আগত অপর একটি বাঙালি ব্যবসায়ী গোষ্ঠির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের নাম শর্মা। বংশানুক্রমিক তাঁত শিল্পীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন যারা তারাই 'কাঠমা' ব্যবসায়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন তাঁত রেশম ব্যবসার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্য থেকে আসেন শর্মারা। এই দুই বাঙালি ব্যবসায়ী গোষ্ঠির দাপট সে সময় এমন ছিল যে গুজরাটি, মারোয়ারি বণিকরা সে সময় তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল।

বর্ধমান থেকে কাশিমবাজারে এসেছিলেন কালিন্দীচরণ। তার ছেলে সীতারাম নন্দীর রেশম সুপারি, দাদনের ব্যবসা। ব্যবসা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও সীতারাম বেশিদিন বাঁচেন নি। এরপর তার একমাত্র সন্তান রাধাকৃষ্ণ নন্দী ব্যবসায়ে এলেন। রেশম, সুপারি, নারকেল, সুতোর ব্যবসা।

আবার চাল ডাল ঘি নুনও পাওয়া যেত। যাকে বলে মুদিখানা। তা এই রাধাকৃষ্ণ ভাবলেন প্রতিবেশী ইংরাজ কোম্পানির সাথে ব্যবসা করলে মন্দ হয় না। শুরু হল কোম্পানির সাথে ব্যবসা। "যখন কাঠমারা একসের কাঁচা রেশমের দাম চাইল পাঁচটাকা আট আনা আর শর্মারা সেই রেশম দিতে রাজী হলেন তিনটাকা পনের আনায়, তখন রাধাকৃষ্ণ সবাইকে টেক্কা দিয়ে তিনটাকা বার আনা দরে কাঁচা রেশমের যোগান দিলেন। একাই বিক্রি করলেন ত্রিশ মণ রেশম।"[২৮] এই রাধাকৃষ্ণ নন্দীর ছেলে কৃষ্ণকান্ত নন্দী হেস্টিংসের বেণিয়ন কান্তবাবু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এ প্রশ্ন বারবারই উঠেছে যে, এদেশের বণিকীপুঁজি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছিল। তার বিকাশও ছিল অব্যাহত, তবে কেন তা শক্তিশালী শিল্প পুঁজির জন্ম দিতে পারলো না। কেন সর্বদিকব্যাপি নবজাগরণ বা রেনেশাঁস দুকূল প্লাবিত করে জড়তা, কূপমণ্ডুকতা ধূয়ে মুছে সাফ করে দিতে পারলো না। প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ভেঙে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি কেন সর্বত্র জায়গা করে নিতে পারলো না। কোথায় ছিল বাধা বা দুর্বলতা। নাকি বণিকী পুঁজির বিকাশ, স্বাধীন জাতীয় পুঁজির উদ্ভবের ঊষাকাল অলীক কষ্টকল্পনা ছিল। এইখানেই আমাদের দেশের পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সবাদীরা আটকে গেছেন। ইউরোপের পুঁজির বিকাশ ও নবজাগরণের কপি এদেশে খুঁজতে গিয়ে বিফল হয়েছেন। স্বাভাবতই এদেশের পুঁজির জন্ম ও বিকাশকে কৃত্রিম ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রয়োজনে সৃষ্ট এই অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তবে এ দেশের দেশি ও বিদেশি পুঁজির বিরোধ ও আপোষের জটিল রূপটিকে তারা ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। এদেশের মাটিতে শক্তিশালী বণিকী পুঁজির বিকাশের ধারাবাহিকতায় স্বাধীন জাতীয় পুঁজির জন্মের সম্ভাবনা এবং তার উপারিকাঠামো হিসেবে সমাজমননে খণ্ডিত ও স্বল্প পরিসরের হলেও রেনেশাঁসের উদয়কেও তারা অস্বীকার করেছেন। রেনেশাঁসের মীনীষীদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল আখ্যা দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই অচল তত্ব চালাতে চালাতে বাস্তবে তা পার্লামেণ্টারি ক্ষমতা দখলের সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়েছে। এই বিষয়টিকেই মার্ক্সবাদের আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিক শিবদাস ঘোষ। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করার পরেও সিরাজদ্দৌল্লার পতনের পূর্ব পর্যন্ত দেশের কুটির শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভার নিয়ে ভারতীয় মার্কেনটাইল পুঁজির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, ইষ্ট এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এমনকি খোদ গ্রেট বৃটেনের বাজারেও ভারতীয় বণিকরা ভাল ব্যবসাবাণিজ্য করত। সিরাজদ্দৌল্লার আমলে তাঁর সাথে এই মার্কেন্টাইল পুঁজিপতিদের সম্পর্কের অবণতি ঘটতে থাকে। এরই পরিণতিতে ভারতীয় এই মার্কেন্টাইল পুঁজিপতিদের একটা অংশ বিশেষ করে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখরা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগসুবিধা লাভের আশায় নবাবের শত্রুদের সাথে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। ফলে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌল্লার পতন ঘটল এবং সম্পূর্ণরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তাঁবেদার মীরজাফরের নবাবী কায়েম হল। অথচ যে আশায় মার্কেন্টাইল পুঁজিপতিরা সর্বরকম মদত দিয়ে মীরজাফরকে গদীতে বসাল, ফল হল ঠিক তার উল্টো। সিরাজদ্দৌল্লার আমলে ইংরেজ বণিকদের চাইতে ভারতীয় বণিকদের যতটুকু বেশি সুযোগসুবিধা ও প্রাধান্য ছিল, মীরজারের আমলে তাও চলে গেল। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে disparity (বৈষম্য) এল। ইংরেজ বণিকদের ট্যাক্স free (মকুব) করে দেওয়া হল, অথচ ভারতীয় বণিকদের ওপর ট্যাক্স বৃদ্ধি হল। মীরকাশিমের নবাবীর আমলে ভারতীয় মার্কেন্টাইল পুঁজিপতিরা

ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের পূর্বে যে অধিকতর সুযোগসুবিধা ভোগ করত, তা ফিরিয়ে আনার জন্য, আর যদি তা নাও হয় তাহলে অন্তত ন্যূনতম পক্ষে ইংরেজ বণিকদের সাথে তাদের অবস্থা at par (সমান) করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো। এরই ফলে মীরকাশিম ইংরেজ বণিকদের অনুরূপ ভারতীয় বণিকদের ট্যাক্স free (মকুব) করে দিলেন, যার ফলে মীরকাশিমের সাথে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আবার যুদ্ধ লাগলো। এই যুদ্ধে মীরকাশিমকে পরাস্ত করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে শুধু যে ইংরেজ রাজত্বের ভিত পাকাপোক্ত হল তাই নয়, এদেশের মার্কেন্টাইল পুঁজিও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পুরোপুর Subjugated (কুক্ষিগত) হয়ে পড়ল। ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে ঢাকার তাঁত শিল্পকে মেরে দেবার জন্য ঢাকার তাঁতিদের আঙুল কেটে দেওয়া হল এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য ভারতীয় কুটির শিল্পগুলিরও ধ্বংস সাধন করা হল। এইভাবে ভারতীয় বণিকদের, যারা এতদিন দেশের কুটির শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী trade and commerce system (বাণিজ্য ব্যবস্থা) গড়ে তুলেছিল এবং বিদেশের বাজারেও যাদের খুব আধিপত্য ছিল, তাদের সেই আধিপত্য ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেল। ফলে, ভারতীয় মার্কেন্টাইল পুঁজিপতিরা যাদের স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পপুঁজি এবং জাতীয় পুঁজির জন্ম দেওয়ার করা, তারা পুরোপুরি 'কম্প্রাডর বুর্জোয়া'য় পর্যবসিত হয়ে গেল— অর্থাৎ বিদেশের উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে বৃটিশ ফার্মগুলির 'এজেন্ট' হিসেবে এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করতে শুরু করল।

এই 'কম্প্রাডর বুর্জোয়া'দের একটা অংশ দীর্ঘদিন ধরে চলার মধ্যদিয়ে পুঁজিসঞ্চয় করতে করতে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে বা সমসাময়িক কালে এসে জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে জাতীয় পুঁজির জন্মদিতে শুরু করল। কালমার্ক্স-এর সিপাহী বিদ্রোহের নোটেও এই তথ্যের সন্ধান মেলে। যখন এই কম্প্রাডর বুর্জোয়ারা শিল্প পুঁজির জন্ম দেওয়ার সূচনা করেছে, তাকে ভিত্তি করেই দেশের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নবচেতনার সৃষ্টি হল।"[২৯] অর্থাৎ এদেশের বণিকী পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশের ধারায় শিল্প পুঁজি বা স্বাধীন জাতীয় পুঁজির উন্মেষ ছিল বাস্তব কিন্তু তার পরিবর্তে বিশেষ পরিস্থিতিতে পাথরচাপা গাছের মতো নানা প্রতিকূলতার সাথে যুঝতে যুঝতে দীর্ঘ প্রায় একশো বছর পর তার দুর্বল ক্ষীণ দেহ সূর্যালোকের সন্ধান পেল। এদেশের পুঁজিবিকাশের এই জটিল বক্রগতি ইওরোপের মত সরল লেখচিত্রে চলতে পারেনি, এই বাঁক ও জটিলতাই তার বৈশিষ্ট। তাই এই পুঁজিবিকাশের উপরিকাঠামো হিসেবে সমাজ মননে রেনেশাঁসের দীপ্ত সূর্যালোকে এদেশে দেখা যায়নি। তাছিল খণ্ডিত মেঘাচ্ছন্ন, কখনো মেঘের ফাঁকে আলোকের ঝলক দেখা দিলেও মূলত নিষ্প্রভ আপোষকামী। আলোচ্য রচনার নির্দিষ্ট এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে এই এলাকার উৎপাদিত পণ্যের সওদাগরী পথে দেশে বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বণিকী পুঁজির বিকাশের ধারায় একটি বিশেষ কালপর্বে শ্রম বিভাজন, স্বল্প পরিসরে হলেও মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদি লক্ষণগুলিও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিদেশি বণিকদের পাশাপাশি গুজরাটি, মারোয়ারী, কাঠমা, শর্মা ইত্যাদি দেশি বণিকগোষ্ঠী এবং জগৎশেঠ, রাধাকৃষ্ণ নন্দীর মতো বণিকদেরও সামান্য পরিচয় পাওয়া গেছে। ১৭৪৫ সালে এই এলাকার বড় ব্যবসায়ীরা হলেন বাবুন কাঠমা, রঘুনাথ বিশ্বাস, দুলাল শর্মা, কেবলরাম শর্মা ও হরিবল্লভ দাস। ১৭৭০ সাল নাগাদ কাশিমবাজারে দশজন বড় গুজরাটি ব্যবসায়ী থাকতেন। গোবিন্দ দাস, লগন দাস, গোলাপচাঁদ দাস প্রমুখ। রেশম ছাড়াও তারা তুলোর ব্যবসা করতেন। বাংলার কার্পাস থেকে

দেশি তুলো শান্তিপুর মুর্শিদাবাদ, মৈমনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় হতো। গুজরাটি বণিকরা প্রতিবছর বিশ হাজার মণ রেশম রপ্তানি করত।[৩০]

৪

পা দুটো থাকলেই বেড়ানো যায়, কিন্তু হাত দুটো থাকলেই তো লেখা যায় না। সে ভারী শক্ত কাজ-এরকমই একটা কথা শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসের শুরুতে লিখেছেন। বস্তুত পক্ষে এই বিশেষ এলাকার অতীতকে খুঁজতে গিয়ে অনেক জিনিসই দৃষ্টিগোচর হয়েছে, অনেক অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সমগ্র বিষয়টিকে সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপনা করা কঠিন কাজ। বিশেষ করে এই কাজ করতে আসা এক অপরিণামদর্শী আনাড়ির পক্ষে তো বটেই।

এ দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর (Transition)কে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে আলোচ্য এলাকাটি একটি অসাধারণ নমুনা (sample) হতেপারে। যে ক্ষুদ্রনমুনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি সামগ্রিক বিষয়ের ধারণা করা যায়। আবার এই অঞ্চলটিকে ঘিরেই রাজনৈতিক ঘটনাবলী, পতন উত্থান ও তার পরিণাম দেশের পরবর্তী প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এ তথ্যও কম চমকপ্রদ নয়।

"... বাণিজ্য এবং শিল্পোৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধির ফলে মুখসুদাবাদ সৈদাবাদ কাশিমবাজার এলাকার নগরায়ণ (Urbanization) অনেক ব্যপকভাবে ও দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। মানরিকের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে এখানের বাজারে খাদ্য সামগ্রী এবং গৃহকর্মের দ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমানে লভ্য। ... এছাড়া পণ্যদ্রব্যের মধ্যে সুতি বস্ত্রাদি, ওষুধ, তামাক, আফিম ইত্যাদির তালিকা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই উদীয়মান শহরাঞ্চল ইতিমধ্যেই পশ্চিমভারত, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, কেননা এইসকল দ্রব্যাদি প্রধানত উপরোক্ত এলাকাগুলিতেই উৎপন্ন হত। এই অঞ্চলের নগরায়ণ আরো তীব্র হয়ে ওঠে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী ও আর্মেনীয়ানদের কুঠি এখানে গড়ে ওঠায়।"[৩১] ১৭০৪ সালে সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলা সুবার রাজধানী ঢাকা থেকে তারই নামাঙ্কিত মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করলেন। ক্ষমতা ও বাণিজ্যের ভারকেন্দ্রটিও ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। ডাচ ব্যবসায়ীদের সাথে প্রথমে পেরে না উঠলেও ধীরে ধীরে ইংরেজরা বাণিজ্যে উন্নতি করতে শুরু করল। "কাশিমবাজার কুঠি থেকে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০,০০০ খানা ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫,০০০ খানা এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০,০০০ খানা সূতি বস্ত্র সরবরাহের অর্ডার থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে কোম্পানির অন্যান্য কুঠির তুলনায়, এমনকি সূতি বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র ঢাকার কুঠির তুলনাতেও, কাশিমবাজার কুঠি অনেক বেশি সূতি কাপড় সরবরাহ করেছিল।"[৩২] ১৭০৭ সালে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনদীপ নিভে গেল। দিল্লীর তখ্‌তে শুরু হল আয়ারামা গয়ারামদের রাজত্ব। যে যখন সিংহাসনে বসছে সেই জাঁক জমক, বিলাস, তোষামোদে ব্যস্ত। তার জন্য যখন তখন হুকুম আসছে তন্‌খা চাই। এই ডামাডোলের বাজারে ধুরন্ধর ইংরেজরা বিপুল সম্পদসমৃদ্ধ এই অঞ্চলে তাদের ব্যবসাকে অবাধ ও নিষ্কন্টক করতে ১৭১৭ সালে বাদশাহ্ ফারুক সীয়ারের কাছে উপঢৌকন, ভেট পাঠিয়ে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার ফরমান আদায় করল। জলপথ ও স্থলপথে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা চালানোর জন্য এই ফরমানকে বাণিজ্যিক মহাসনদ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ফরমানের

সাহায্যেই ইংরেজরা অন্যান্য বিদেশি ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিদের ছাড়িয়ে বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তুলনামূলকভাবে উন্নত ডাচ বণিকরা পিছু হটে। পিছু হটতে হয় ফরাসীদেরও। যদিও এসবই ইংরেজদের করতে হয় বাংলার স্বঘোষিত নবাবদের তীব্র বিরোধীতার মধ্যেই। ১৭৪০ সালে মারাঠা আক্রমণে নবাবী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার এই সময়েই দেশীয় ব্যবসায়ীদের নেতৃস্থানীয় জগৎশেঠেরা অভিজাত রাজপুরুষদের ছেড়ে ধীরে ধীরে ইংরেজদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। অন্যান্য দেশিয় ব্যবসায়ী মহাজনেরাও বিদেশি বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক ছাড়াও এক সমস্বার্থবোধের বন্ধনে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই বিশেষ সময়ে ভারতীয় বণিকী পুঁজির এক বিশেষ চরিত্র দেখা যায়। ব্যবসার প্রশ্নে বিদেশি বণিক তথা ইংরেজদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব, আবার সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে পুঁজির অবাধ বিকাশের প্রশ্নে বিদেশি বণিকদের সাথে সমস্বার্থবোধের ঐক্য; এই বিরোধ ও ঐক্যের বৈপরীত্যের অদ্ভুত সহাবস্থানই সে সময় এদেশিয় বণিকী পুঁজির বৈশিষ্ট। এই ভাবেই পলাশী যুদ্ধের মঞ্চসজ্জা শুরু হয়।

এবার অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ নবাব হলেন। কিন্তু অপদার্থ সরফরাজের চরিত্রদোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা সকলকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলল। শেষ পর্যন্ত আলিবর্দী খাঁ সম্মুখ সমরে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার মসনদ দখল করেন। এই সময় ফতেচাঁদ জগৎশেঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তার মৃত্যুর পর পৌত্র মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি নিয়ে সেই পরিবারের ব্যবসার উত্তরাধিকারী হন। আলিবর্দী খাঁ ইংরেজ কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করলে কোম্পানি মহাতাপচাঁদের কাছ থেকে বারো লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নবাবের ক্ষতিপূরণ দেয়। এই পথেই মহাতাপ চাঁদ জগৎশেঠের সাথে ইংরেজ কোম্পানির সখ্যতা গড়ে ওঠে। আবার ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করলে কুঠির কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস সহ অন্যান্য কর্মচারীরা গ্রেপ্তার হন। পরে ছাড়া পেয়ে হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে কাশিমবাজারের ব্যবসায়ী রাধাকৃষ্ণ নন্দীর পুত্র কৃষ্ণকান্ত নন্দীর কাছে আশ্রয় নেন। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পতনের মধ্যে দিয়ে বৃটিশ পুঁজির একাধিপত্য শুরু হয় আর নবাব মীরকাশিমের পরাজয়ের পর জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু এদেশে বণিকীপুঁজির বিকাশ ও অগ্রগতির সমাপ্তি সূচনা করে। অন্যদিকে হেস্টিংসের বেনিয়ন কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তবাবু মুৎসুদ্দিপুঁজিপতি অথবা কম্প্রাডর বুর্জোয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

নবাব আলিবর্দীর আমলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন যা সমগ্র বাংলা সহ এই এলাকায় হত্যা ধ্বংস বিভীষিকা এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তা হল মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ। '১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ শুরু হতেই মারাঠা দস্যুদের অশ্বক্ষুরধ্বনী আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করল।' এই মারাঠা বর্গীদের উত্থানের রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। তা এখানে আলোচ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বর্গীরা তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অরাজকতার ফসল বলা যায়। এই দস্যু দলে সিপাইরা যথেচ্ছ লুঠ ও ধর্ষণের অধিকারের বিনিময়ে দলভুক্ত হত। "১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বর্গীদের আগমন সংবাদ দাবাগ্নির মতো কাশিমবাজারে এসে পৌঁছুল। বীরভূম ধ্বংস করে আট হাজার অশ্বারোহী কাশিমবাজারের অভিমুখে ছুটে আসছে, একথা নিমেষে রাষ্ট্র হল যে, মারাঠা দস্যুরা কেবল লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে না সুযোগ পেলে সম্ভ্রান্ত বণিকদের আটক করে অর্থ আদায় করে। স্ত্রীলোক মাত্রেই তাদের উপভোগের সামগ্রী। জাতিকূলমান নির্বিশেষে তাদের উপর দলবদ্ধ ভাবে অত্যাচার করা হয়। যুবতী অথবা বৃদ্ধা কেউ নিষ্কৃতি পায় না।

এমনকি ধর্মস্থান বা দেবালয়কে কলুষিত করেও বর্গীরা তাদের বাসনা চরিতার্থ করে। এক মাসের মধ্যে পলায়ন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।"[৩৩] চাষি পালাল চাষ-বাস ফেলে, তাঁতি তাঁত ফেলে। ব্যবসা ফেলে বণিক পালাল। ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ধ্বংসের বিভীষিকা আকাশা বাতাস ভারী করে তুলল। আমাদের দেশে ইতিহাস রচয়িতাদের অনেকেই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ধ্বংস, লুণ্ঠন, নারীর সম্ভ্রমহানির ক্ষেত্রে মুসলমান সামন্ত ও শাসকদের দায়ী করেছেন। যদিও সামন্তী শাসনে সামন্ত প্রভূ রাজা বাদশাহ্দের মধ্যে যুদ্ধ এবং পরাজিতের সম্পদ লুণ্ঠন স্বাভাবিক ঘটনাই ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র লুঠের জন্য বর্গীদের অত্যাচার তৈমুর লঙ, চেঙ্গিস খাঁদের চেয়ে কম কিছু ছিল না। আবার এই মারাঠা লুঠেরারা ছিল হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী। একথাও প্রচারিত হয়েছিল মারাঠা বর্গীরা মুসলমান রাজ খতম করে হিন্দু রাজত্বের সূচনা করবে। মারাঠা রাজ শাহ কথা দিয়েছেন যে বাঙলার কৃষ্ণচন্দ্রই থাকবেন তার প্রতিনিধি। মহাকবি ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ছত্রে ছত্রে হিন্দুবাঙালির সেই আশা আজও জীবন্ত আছে।[৩৪] যদিও বর্গীদের অত্যাচার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের ওপরেই নেমে এসেছিল। হিন্দু মুসলমান কেউই রেহাই পায়নি। নিরীহ বৈষ্ণব তাঁত রেশম শিল্পী কিংবা শৈব বণিক কেউই বর্গীদের নৃশংসতা বর্বরতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। বর্গীদের বারবার হামলা এই এলাকার রেশম শিল্পের ওপর প্রথম আঘাত হানে। মানুষ দলে দলে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। "... মারাঠা আক্রমণ জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতে, বিশেষত রেশমী বস্ত্র শিল্পের উপর যে আঘাত হানে তা কাটিয়ে ওঠা এই অর্থনীতির পক্ষে পরে আর কখনও সম্ভব হয়নি।"[৩৫] মারাঠা বর্গীদের লুঠতরাজ অত্যাচারের বিবরণ ধরা আছে সমসাময়িক কালে রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ-এ।

"মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগী রাঙ্গামাটি দিয়া॥
গোয়ালজান বুধাইপাড়া আর নেয়ালিশপাড়া।*
সিঘ্রগতি আসিয়া পহচিল দাহাপাড়া॥

....
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীঘ্রগতি আইসা জগৎসেটের বাড়ী লুটে॥**
আড়কট টাকা যত ঘরে ছিল।
ঘোড়ার খুরচি ভইরা সব টাকা নিল॥"[৩৬]

আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর নবাব হলেন সিরাজউদ্দৌলা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশি ও বিদেশি বণিকদের সাথে তার সংঘাতের সূচনা হল। এরই ফলশ্রুতিতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সাথে সম্মুখ সমরে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলেন। সিরাজের পতনের পেছনে ছিল জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, দুর্লভরাম, মীরজাফর সহ দেশি বিদেশি বণিকদের ঐক্য। যদিও ইংরেজ বিরোধিতার কারণে ফরাসীরা নবাবের পক্ষে ছিলেন। সৈদাবাদের উত্তরে অবস্থিত ফরাসডাঙ্গার কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ লা ছিলেন নবাবের সুহৃদ। তিনিই প্রথম সিরাজকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের

---

* নেয়ালিশপাড়া—নিয়াল্লিশপাড়া, সৈদাবাদের পূর্বে ভাগীরথী নদীর অপরপ্রান্তে অবস্থিত।

** জগৎশেঠের বিশাল প্রাসাদ ও টাকশাল ভাগীরথীর তীরে মহিমাপুরে অবস্থিত ছিল। বর্গীরা তার বাড়ি লুঠ করে দুই কোটি টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়।

/5

কথা অবগত করেন। এই জাঁ লা প্রেরিত গোলান্দাজ সাফ্রঁ বা সিনফ্রে পলাশীতে নবাব সৈন্যের সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। জাঁ লা ও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নবাবের পক্ষে যোগ দিতে এগিয়েছিলেন কিন্তু নবাব একাই পলাশীর দিকে অগ্রসর হওয়ায় দুজনের মিলন সম্ভব হয়নি। বলা ভাল, ইংরেজরাই কৌশল করে দুজনের মিলন ঠেকিয়েছিল। তা না হলে ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষের বিশাল বাহিনী ইংরেজদের বিপদের কারণ হতে পারতো। দুর্ভাগ্যের কথা, সিরাজ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন তখন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফরাসী অধ্যক্ষ জাঁ লা মাত্র কয়েকমাইল দূরে অপেক্ষা করছেন।[৩৭]

সৈদাবাদের বিশিষ্ট আর্মানী বণিক খোজা পেত্রোস অ্যারাটুন সিরাজউদ্দৌলার সময়ের ঘটনা বহুল দিনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ কুটনৈতিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্যোগে অ্যারাটুনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ক্লাইভ তাকে 'আর্মানী পেত্রাস' বলে ডাকতেন। সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার কাজে মীরজাফরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ক্লাইভ তাকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। আবার ১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসানোর সময় পোত্রোস অ্যারাটুনকে দ্বৈত কাজে লাগানো হয়েছিল কারণ মীরকাশিমের সাথেও অ্যারাটুনের বন্ধুত্ব ছিল। অ্যারাটুনেরই ভাই গুর্গিন খাঁ ছিলেন মীরকাশিমের প্রধান সেনাপতি। যদিও নিজের জীবন বিপন্ন করেও পেত্রোস অ্যারাটুন ইংরেজদের সহায়তা দিয়েছিলেন, ইংরেজদের কাছ থেকে কোনও প্রত্যুপোকার তিনি পাননি। বরং পরবর্তীকালে সৈদাবাদের আর্মেনীয়ান বণিকদের ওপর ইংরেজরা ভয়ংকর অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল। ক্লাইভ সহ ইংরেজদের কাছ থেকে সুবিচার না পেয়ে অ্যারাটুন ১৭৫৯ সালের ২৫ জানুয়ারি লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের কাছে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন।[৩৮]

কালের নিয়মে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল। কিন্তু যে আশায় বণিকী পুঁজির প্রতিনিধি জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইংরেজদের নবাবকে আপসারণের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন, ফল হল উল্টো। ইংরেজ নিযুক্ত পুতুল নবাব মীরজাফর খোলাখুলি ইংরেজদের পক্ষপাতিত্ব করতে লাগলো। ফলে, "নবাবের পাওনাদার থেকে জগৎশেঠ বংশ ধীরে ধীরে সামান্য জমিদারে পরিণত হল। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কিং হাউস জগৎশেঠ দিল্লীর বাদশাহ থেকে মারাঠা পেশোয়ারকে টাকা ধার দিতেন। তার হুণ্ডি ও হাতচিটা পেশোয়ার থেকে মালয় হয়ে বাটাভিয়া পর্যন্ত সম্মাণিত হয়েছে। অথচ পলাশীর যুদ্ধের কুড়ি বছরের মধ্যে তাদের পতন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে সব থেকে বড় দুঃসংবাদ।"[৩৯] নানা কারণে ইংরেজরা মীরজাফরকে সরিয়ে তার জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করল। এদিকে সারা দেশজুড়ে উথাল পাথাল পালা বদলের পালা চলছে। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পরাজিত করল দিল্লীর বাদশাহ শাহআলমকে (১৭৬১), অন্যদিকে পণ্ডিচেরিতে হারিয়ে দিল ফরাসীদের। আহ্মদ শাহ্ আবদালি ধ্বংস করল মারাঠা বাহিনীকে। মীরকাশিম শক্ত হাতে হাল ধরার চেষ্টা করলেন। তিনি "ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে শুল্ক আদায় করতে না পেরে সবরকমের শুল্ক আদায় তুলে দিলেন। ফলে দেশিয় বণিকরাও ইংরেজ কোম্পানি এবং তাদের দলগত লোকেদের মতো বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অধিকার পেলেন।"[৪০] ইংরেজ কোম্পানির সাথে নবাবের সংঘাত শুরু হল। মীরকাশিম মুঙ্গের দুর্গ সংস্কার করলেন। নবাবের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন সৈদাবাদের আর্মেনীয় বণিক খোজা গ্রেগরি। যাকে গুরগিন খাঁ নামে ডাকা হত। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ১৭৬৩ সালে পাটনা দখল করল। মীরকাশিম পাটনা পুনরুদ্ধার করলেন। সৈদাবাদের অনতিদূরে কাশিমবাজার ও

মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থলে তুমুল যুদ্ধ হল। অস্ত্রের আস্ফালন আর বারুদের আগুনে ভরে গেল চারিদিক। নবাব বাহিনী ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি আক্রমন করল। এদিকে কোম্পানি পুনরায় মীরজাফরকে নবাবের আসনে বসাল। অল্পশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে নবাব মীরকাশিম পিছু হটতে শুরু করলেন। কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর শেষবারের মতো মীরকাশিম ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হলেন বক্সারে। সঙ্গী সুজাউদ্দৌলা, দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ আলম ও তার সেনাপতি বেণীবাহাদুর প্রমুখ। যুদ্ধে হেরে গেলেন মীরাকাশিম। বাদশাহ্ শাহ আলম আত্মসমর্পণ করলেন। এরই মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন মীরকাশিমের প্রধান সেনাপতি গুরগিণ খাঁ। ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার অপরাধে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করা হয়েছে নবাবের নির্দেশেই।

এই অঞ্চলের সেসময়কার বহু আলোচিত এক ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি হলেন মহারাজা নন্দকুমার। সৈদাবাদের উত্তরে কুঞ্জঘাটায় নন্দকুমারের বাড়ি আছে। এখন তা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। নন্দকুমার যথেষ্ট আরবী ফারসী শিক্ষা করে নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে আমিন পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে উমিচাঁদের সাথে জোটবেঁধে ইংরাজ কোম্পানির পক্ষে গিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধতা করায় তার চাকরি যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভের অনুগ্রহে নন্দকুমার নবাব মীরজাফরের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী হলেন। নন্দকুমার উচ্চাভিলাষী ও করিতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন। সে সময়ের ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা আর অস্থিরতার পরিবেশে তিনিও নানারকম কৌশল শুরু করলেন। ইংরাজের অনুগ্রহে নবাবের দেওয়ানীপদে থেকেই তিনি ইংরেজ বিতাড়নের জন্য মারাঠাদের সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন। আবার মীরজাফরকে সরিয়ে অন্য কাউকে



শতবর্ষ আগে সৈদাবাদ কুঞ্জঘাটার একটি পারিবারিক পরিবেশের চিত্র।

সুবেদার করার জন্য দিল্লীর বাদশাহের সাথে পত্রালাপ করলেন। শোনা গেল তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সাথেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস নবাব দরবারে কোম্পানির রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন। হেস্টিংসের সাথে নন্দকুমারের বিবাদ শুরু হল। পরবর্তীকালে ১৭৭১ সালে হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত হলেন। হেস্টিংস অত্যন্ত চতুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। তিনি গভর্ণর হয়ে নন্দকুমারের সাথে বন্ধুত্বের অভিনয় করলেন। ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষে সারা দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এই দুর্ভিক্ষের জন্য কোম্পানি এবং তার বশংবদ গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিংহ, কান্তবাবু প্রমুখ দায়ী। এ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা বহু রচনাতেই উল্লিখিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের ভয়াল ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক চিত্র ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টেও উত্থাপিত হল। অভিযোগের অঙ্গুলি উঠল কোম্পানি ও তার প্রধান হেস্টিংসের দিকে। নন্দকুমার হেস্টিংসের প্ররোচনায় দুর্ভিক্ষের জন্য রেজা খাঁর অত্যাচারকে দায়ী করে অভিযোগ আনলেন। বিচারে রেজা খাঁ পদচ্যুত হলেন। কিন্তু নন্দকুমারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো না। রেজা খাঁ অপসৃত হলেন কিন্তু নন্দকুমার সুবেদারির পদ পেলেন না। ক্ষিপ্ত নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কোম্পানির কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসের কাছে অভিযোগ জানালেন। কিন্তু হেস্টিংসের চতুরতা ও ক্ষমতার কাছে নন্দকুমারকে হার মানতে হল। হেস্টিংস ও তার ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কৃষ্ণকান্ত নন্দী প্রমুখ ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। শেষপর্যন্ত জনৈক বুলাকী দাস শেঠকে প্রতারণার অভিযোগে নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং বিচারের নামে প্রহসন করে ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট অন্যায়ভাবে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হল। ঐতিহাসিক বেভারিজ এই ঘটনাকে 'জুডিশিয়াল মার্ডার' বলে উল্লেখ করেছেন। নন্দকুমার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে হেস্টিংসের বিরোধিতা করেন নি। বরং তিনি নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে অনেক কুকর্মে হেস্টিংকে সহায়তা করেছেন একথা তাঁর অভিযোগপত্রেই উল্লিখিত আছে। তবুও নন্দকুমারকে অন্যায়ভাবে হত্যা বাংলাদেশ সহ এতদাঞ্চলের মানুষের মনে প্রবল বিক্ষোভের সূচনা করে। দুর্ভিক্ষ, অত্যাচার, তাঁতি ও কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর ইংরেজদের দমনমূলক ব্যবহার এই বিক্ষোভের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। নন্দকুমারের জামাতা জগচ্চন্দ্র শ্বশুরের বিরোধিতা করে হেস্টিংসের পক্ষ অবলম্বন করে পুত্র মহানন্দের নামে দেওয়ানী হস্তগত করেন। নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসের মৃত্যুর পর মহানন্দ নন্দকুমারের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে কুঞ্জঘাটা রাজভবনে বসবাস শুরু করেন। নবাব বাবরজঙ্গ ১৭৯৪ সালে মহানন্দকে রাজাবাহাদুর উপাধি দেন। এই সময়ের একটা গল্প শোনা যাক। "মহানন্দের পুত্র বিজয়কৃষ্ণের বিবাহের সময় নবাব বাবরজঙ্গ কুঞ্জঘাটার রাজবাটিতে আগমন করিয়াছিলেন। নবাবের অবস্থিতির জন্য রাজধানীর সম্মুখবর্তী গোলাববাগে একটি অস্থায়ী মণ্ডপ নির্মিত এবং তাহা কিংখাপ মখমল প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রাদির দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল। নবাব বাহাদুর উক্ত মণ্ডপে উপবেশন করিয়াছিলেন। নবাব সাহেব মণ্ডপ ত্যাগের পর উক্ত মণ্ডপ ভস্মসাৎ করা হইলে, মহানন্দের জনৈক শত্রুপক্ষ নবাবকে বলিয়াছিলেন, যে যবন নবাবের পদার্পণে উক্ত মণ্ডপ অপবিত্র হইয়াছে বলিয়াই রাজা মহানন্দ উক্ত মণ্ডপ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই কথা শ্রবণে নবাব মহানন্দকে ডাকিয়া এ বিষয়ে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে, রাজা বলেন, "হুজুর! বাংলা, বিহার ও উড়িয্যার অধিপতি যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, তথায় অপরকে বসাইলে, নবাবের আবমাননা করা হয়, সেই বিবেচনা করিয়াই আমি উক্ত মণ্ডপ অগ্নিতে দগ্ধ করাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি।"[৪১] ইংরাজ কোম্পানির মাসোহারাপ্রাপ্ত অক্ষম নবাব সুরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, বহুৎ খুব, কসুর মাপ।

বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পতনের পর একটা নতুন যুগের সূচনা হলো। সে যুগে হলো

ইংরেজ কোম্পানির একাধিপত্যের। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিযোগী ওলন্দাজ ও ফরাসীদের ব্যবসা একে একে ধ্বংস করলো। তারপর শুরু হলো আর্মেনীয়ান বণিকদের ওপর আক্রমণ। '১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সাত বছরের যুদ্ধ বাধে। দুই দেশের এই সংঘাতটি ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়ে।' ফরাসীরা সিরাজের পক্ষ অবলম্বন করায় শুধু আন্তর্জাতিক কারণে নয়, এদেশের মাটিতেও ফরাসীরা ইংরাজদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত ছিল। তাই "১৭৮৮ সালে পুনরায় ইউরোপে ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধ শুরু হলে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে মুর্শিদাবাদ কাউন্সিলের বহরমপুর ক্যান্টনমেণ্টের সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল জেমস মর্গান ও ক্যাপ্টেন কিলপ্যাট্রিক ওই বছর জুলাই মাসে সৈদাবাদের ফরাসডাঙ্গার ফরাসী কুঠি আক্রমণ করে ফরাসী অধ্যক্ষ চিলিকে বন্দী করে কুঠি অধিকার করে নেন। এই ভাবেই লুপ্ত হয় মুর্শিদাবাদের ফরাসডাঙ্গার ফরাসী উপনিবেশের চিহ্ন।"[৪২] অখ্যাত কুঞ্জঘাটা আর অধুনা বিলুপ্ত বেগবতী গঙ্গার জলধারা আন্তর্জাতিক ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের এক সংক্ষিপ্ত মহড়ার সাক্ষী। ফরাসীদের পর ওলন্দাজদের পালা।

"বাংলার ব্যবসার প্রথম যুগে বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে ওলন্দাজরাই ছিলেন প্রধান। পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত এই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ... ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবনিযুক্ত নবাব মীরজাফর যখন বৃহৎ 'নজরানার' দাবী তুললেন তখন বুঝতে কষ্ট ছিল না যে ইংরেজদের প্ররোচনা পেছনে আছে। ... নানা দিক থেকে ওলন্দাজ ব্যবসায়ে বাধা সৃষ্টি করা হল। তাঁতীদের চুরি করা বা ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গোমস্তাদের হয়রাণি করা, ওলন্দাজ জাহাজ থেকে ব্যক্তি সম্পত্তি ও নাবিক অপহরণ এমনকি ওলন্দাজ মানী ব্যক্তিদের গায়েব বা অপহরণের অভিযোগ নবাবের দরবারে প্রতিদিন আসতে লাগল।"[৪৩] শেষপর্যন্ত ১৭৮৮ সালে ওলন্দাজরা বাংলায় অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ করে দিল। শূন্য হয়ে গেল কালিকাপুরে ওলন্দাজদের 'অনন্যসাধারণ' (magnificient) প্রাসাদ ও কুঠি। কালের নিয়মে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তাও। এদেশে বাণিজ্য বিস্তার ও ক্ষমতাদখলের জন্য এমন কোনো কুকর্ম বা কৌশল নেই যা ইংরেজরা গ্রহণ করেনি। কেবলমাত্র প্রতিযোগী দেশি বা বিদেশি বণিকদের ওপরেই নয়, গরিব সাধারণ তাঁতি ও হস্তশিল্পীদের ওপরও নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর অত্যাচার। এ এলাকার নির্বাক মাটি ছাড়া তার সাক্ষী বুঝি আর কেউ নেই। তাঁতিদের জোর করে অগ্রিম টাকা বা দাদন নিতে বাধ্য করা হতো। তারপর অল্প সময়ে বিশাল পরিমাণ কাপড় বুনতে বলা হতো। না পারলে সেপাই দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। জরিমানা করা হতো এবং কাপড় সূতো সবই বিনা পারিশ্রমিকে বাজেয়াপ্ত করা হতো। "উইলিয়াম বোল্টস্ তদীয় consideration on Indian affairs (1772) নামক গ্রন্থে দাদনের অত্যাচার সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে তৎকালে শিল্পীগণ কিরূপ নিষ্ঠুর ভাবে প্রতারিত হইত। তিনি লিখিয়াছেন, "দেশের যাবতীয় শিল্প দ্রব্যই ইংরেজ কোম্পানির হস্তে একচেটিয়া। কোন্ শিল্পীকে কতমাল, কিরূপ মূল্যে যোগাইতে হইবে তাহারা কোম্পানীর স্বেচ্ছামতোই স্থিরীকৃত হইত। এজন্য দালাল, পাইকার ও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সিপাহীর সাহায্যে হাজির করিয়া মালের পরিমান, মূল্য ও মাল দিবার নির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি একখানা দলিলে আপনাদিগের সুবিধামতো সর্ত উল্লেখে তাহাতে শিল্পীগণের স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হইত। এজন্য শিল্পীগণের সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষা করা হইত না। এই সময় তন্তুবায় প্রভৃতির হস্তে অগ্রিম কিছু টাকা বায়না স্বরূপ প্রদত্ত হইত। শিল্পী ওই টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তাহার বস্ত্রাঞ্চলে উহা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তৎপরে কাঁছারির সিপাহীগণ চাবুক মারিতে মারিতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। অন্য কাহারও কাজ করিতে পারিবে না এই

সর্ত্তে অনেক শিল্পীকে বাধ্য করিয়া তাহাদিগের সহিত কল্পনাতীত চাতুরী করা হইত। যে দরে তন্তুবায় দিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রয় করা হইত তাহা বাজারদর অপেক্ষা অনেক কম। ইহার উপর আবার যাচনদার দিগের সহিত যোগাযোগে উৎকৃষ্ট মালও অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইত। ফলে ইহার জন্য হতভাগ্য তন্তুবায় দিগকে শতকরা ৪০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। আনন্যোপায় হইয়া এই সময়ে বহুশিল্পী স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া কার্য্যে অক্ষমতাজ্ঞাপন পূর্বক আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইত।"[৪৪] ইংরেজ কোম্পানির অত্যাচার ও জুলুমের বিবরণ বোল্টস সাহেব দিয়েছেন, "গরিব তন্তুবায়দের উৎপাদিত পণ্যের দাম কোম্পানির গোমস্তারাই ঠিক করে দিত, যে মূল্য বাজার দরের তুলনায় পনেরো থেকে চল্লিশ শতাংশ কম হতো। স্বাভাবিক ভাবে শিল্পীরা তাদের জিনিস ন্যায্যমূল্যে অন্যত্র বিক্রি করতে চাইত। বিশেষ করে ডাচ ও ফরাসীরা তা কিনতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির গোমস্তারা লক্ষ্য রাখতো যাতে শিল্পীরা অন্যকাউকে বিক্রি করতে না পারে। শিল্পীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য অন্য কাউকে বিক্রি করতে ভয় পেত। যদি কোনও দালাল বা পাইকার শিল্পীদের কাছ থেকে জিনিস ক্রয় করতো তবে ইংরেজ কোম্পানির এজেন্টরা সত্বর সেই মাল বাজেয়াপ্ত করতো এবং সেই ব্যক্তিকে জেল, জরিমানা সহ কঠোর ভাবে দণ্ডিত করা হতো।"[৪৫] শোনা যায় মীরকাশিমের সিংহাসন চ্যুতির পর এই এলাকা থেকে একরাত্রে সাতশো তন্তুবায় পালিয়ে গিয়েছিল। সৈদাবাদে আর্মেনীয়ান বণিকদের ওপরও ইংরেজ কোম্পানি ভয়ানক অত্যাচার করতো। "১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে আর্মেনিয় বণিকরা অভিযোগ করেন যে তাঁদের নিযুক্ত রেশমের তাঁতিদের ইংরেজ কোম্পানি বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে। আর অভিযোগ করা হয় যে ইংরেজ বণিকগণ জোর করে রপ্তানির জন্য রাখা কাঁচা রেশম ও সূতি কাটা কাপড় অপহরণ করে নিজেদের রপ্তানি গুদামে আটকে রেখেছে। কেবল দেশের মধ্যে নয়, বহিঃসমুদ্রেও ইংরেজ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীগণ আর্মেনীয় জাহাজ দখল করে তাদের দ্রব্য সম্ভার লুণ্ঠন করে রপ্তানি করতো।"[৪৬] এতো শোষণ অত্যাচার লুণ্ঠন সত্ত্বেও বাংলার তাঁত ও রেশমী বস্ত্র ইউরোপের মাটিতে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বাংলাদেশের রেশমী বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাংলার রেশমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকেই এই প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ফলে হাতে বোনা উৎকৃষ্ট বস্ত্রের পরিবর্তে ইংরেজরা কাঁচা রেশম খরিদ করা শুরু করল। জনপ্রিয় বালুচরী শাড়ির বাজার ধরতে জোর করে আসল বালুচরীর উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে ইংলণ্ডে সূতী থান বালুচরীর মতো ছাপিয়ে বিক্রি করতে লাগলো। বাংলার কাঁচা রেশম থেকে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের নকল মসলিন তৈরি করে তা এদেশেই বিক্রি করা শুরু করলো। অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা সত্ত্বেও এদেশের তথা সৈদাবাদ কাশিমবাজার এলাকার বহু নামকরা শিল্পীর কাজের অধিকার থাকলো না। থাকলো না রেশমের পেলব মসৃণ তন্তুতে স্নেহের পরশ দিয়ে একটু একটু করে শিল্পের সুষমা ফুটিয়ে তোলার অধিকার। এতদিন যে বিশ্বজয়ী ছিল, তাকে চোরাকুঠুরির অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে দেওয়া হল। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার লিখে পাঠালো, কাশিমবাজারের অপরাপর ব্যবসায়ীর হাত থেকে সিল্কের ব্যবসা তুলে নেওয়ার জন্য বেশি দাম দিয়ে রেশম কিনে নিতে হবে। সর্দারেরা যাতে নিজের বাড়িতে রেশম বুনতে না পারে তার জন্য। আদেশ জারী করতে হবে, আদেশ অমান্য করলে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। ইংরেজ কোম্পানির সিপাইরা গায়ের জোরে সৈদাবাদের আর্মেনীয়ান কুঠির দরজা ভেঙে দলে দলে তাঁত শিল্পী (নাখদ)দের ধরে এনে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠিতে বন্দী করে রাখতো। চলতো অত্যাচার। এমনকি তাঁতবস্ত্র ও সুতো তৈরি বন্ধ করার জন্য

তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া হতো। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত রেশম ছিল লাভজনক পণ্যমাত্র। কিন্তু ১৭৬৯ সাল থেকে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরের ভাষায় রেশম হল গ্রেট বৃটেনের কাছে এক 'মহান জাতীয় লক্ষ্য'। উপরোক্ত বিষয়টি সরাসরি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এন কে সিনহা'র রচনা থেকে উদ্ধৃত করি।

"In the purchase of silk from the first hands we recomended you to give an increased price, if nescessary, so as to take the trade out of the hands of other marchants of Cossimbazar to prefent the Sardars from winding off silk in their houses. Should this practice through in attention have been suffered to take place again it will be proper to put a stop to it which may now be more effectually done by an absolute prohibition under severe penalties by the authority of the Government. In this connection we should consider the Statement of Bolts that the winders of raw Silk Called 'Nakads' has been treated with such injustice that instances were known of that cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind Silk . .... It was a common things for the Company's Sepoys to be sent by force of arms to break open the houses of the Armenian merchants established at Sydabad(who have from time immemorials, been largely conected in the Silk trade) and forcibly take the Nakads from their work and carry them away to the English factory." Raw silk was during the years 1758-68 merely a profitable Investment item. But by 1769 the procuring of raw silk for the manufacture of great Britain become "a Great national object" in the words the Court of Directors." [৪৭]

কথায় বলে মগের মুলুক। কিন্তু বিলেতের কর্তারা তাদের'মহান জাতীয় কর্তব্য' পালনের জন্য যে লুঠেরাদের এদেশে পাঠিয়েছিল তারা আরাকানের অসভ্য জলদস্যু ছিল না, তারা ছিল সুসভ্য ইংরেজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লিখেছেন, "এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত।" পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানী এদেশে যে 'লুঠ' শুরু করে তার মধ্যে কুখ্যাত 'পলাশীর লুঠ'। এই এলাকার রেশম বস্ত্র ব্যবসা এবং সাধারণ মানুষকে তা ভয়ঙ্কর ভবে প্রভাবিত করে। "পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ যে দায়িত্ববর্জিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে তার ফলে শুরু হয় পলাশীর লুঠ (plassey plunder) ১৭৫৭-১৭৬৫ এই আট বছরে ৫, ৯৪০, ৪৯৮ পাউণ্ড সম্পদ কার্যত এদেশ থেকে লুঠ করে ইংল্যাণ্ডে চালান করা হয় আর এই সম্পদের প্রধান অংশই নিষ্কাশিত হয় রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল থেকে।"[৪৮] আর ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত কত টাকা ইংল্যাণ্ডে পাচার হয়েছিল? সঠিক হিসেব না করা গেলেও তা হবে আটত্রিশ মিলিয়ন* পাউণ্ড এর কাছাকাছি। সামান্য কমবেশী হলেও প্রকৃত পক্ষে এ ঘটনা বাংলার মানুষের ওপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে ছিল।

"What then was the total drain to England during the Period 1757-1780? This amount can not be accurately Calculeted. It appears to have been something like thirty eight million pounds sterling. Even if it was a few million pound more or less than the above mentioned sum, it must have meant a very heavy burden on the people of Bengal ... on account of the oppression on the weavers, the monopolistic power of the company and the unfair Competition of the company's

---

* ১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ

servents in the inland trade of Bengal, the native merchants and manufacturers were little benefited..."[৪৭]

সে সময়ের ইংরেজ কোম্পানী প্রসঙ্গে বোল্টস সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন— ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ সকলেই বোল্টসকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এই বোল্টস ছিলেন কোম্পানীর নিযুক্ত অন্যতম দুর্বৃত্ত। তিনি খালি হাতে ভাগ্যানেষণে এদেশে এসেছিলেন। নিয়ে গেছেন নগদ নয় লক্ষ টাকার বেশী। শোনা যায় কয়েকখানি জাহাজ বোঝাই করে তার মালপত্র বিলেত যায়। বোল্টসের অর্থপ্রাপ্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজার সৈদাবাদ এলাকা।

বৃটেনের পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সে এডমণ্ড বার্কের শণিত ও তীক্ষ্ণভাষায় কাতরোক্তি শুনি, "সমুদ্রের তরঙ্গের মতো সাহসী তরুণ ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীর দল ক্রমাগত ওই দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চিরক্ষুধার্ত মাংসাসী পক্ষীর মতো তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত খাচ্ছে আর জীর্ণ করছে। তাদের ক্ষুধার শেষ নাই। স্থানীয় অধিবাসীদের অপলক হতাশ দৃষ্টি, মনের বিভ্রম, আচরণের অসহায়তা, কিছুই এই নবযুগের পশুদের নিবারণ করতে পারছে না।"[৪৮]

রেশম ব্যবসায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একাধিপত্য কায়েম হল। দেশীয় বণিকী পুঁজিপতিদের অবাধ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। তারা পর্যবসিত হল ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্টে বা মুৎসুদ্দিতে। বিদেশের বাজারে সৈদাবাদ কাশিমবাজার এলাকার উৎপাদিত রেশমী বস্ত্রের রমরমা। যদিও ইংল্যাণ্ডের বাজারে দেশের বস্ত্রব্যবসায়ীদের স্বার্থে এদেশে উৎপাদিত বস্ত্র রপ্তানী নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরিবর্তে এদেশের শিল্পকে মেরে দিয়ে এখান থেকে কাঁচা রেশম নিয়ে ইউরোপে যোগান দেওয়াই প্রধান বানিজ্যে পরিণত হয়েছিল। তবুও এই এলাকার উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র রুমাল, বন্ধনী চোরা পথে চলে যেত ইংল্যাণ্ডের বাজারে। চড়া দামে বিক্রি হতো। যদিও সে লাভ এই এলাকার হতভাগ্য শিল্পীরা পেত না। মুনাফা লুঠত ইংরেজ কোম্পানী ও তার অনুবর্তী দেশীয় বণিকরা। "১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের বাজারে বাংলার রেশমী ও সূতী বস্ত্র আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ায় জেলাঞ্চলের রেশমী বস্ত্র শিল্পের পতন শুরু হয়, অবশ্য আলোচ্য পর্বে ইউরোপীয় বাজারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই বস্ত্র রপ্তানী করতে থাকায় কিছু দিনের জন্য এই পতন ঠেকানো গেলেও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর তা তরান্বিত হয়ে ওঠে। মজার কথা জেলাঞ্চলের রেশমী বস্ত্র শিল্পের পতন শুরু হলেও কাঁচা রেশম শিল্পের কিন্তু দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে - ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র শিল্পের কাঁচা মালের চাহিদা পূরনের জন্য। তাঁতী হস্ত শিল্পীদের মধ্যে থেকে উদ্ভূত কাঠমা-ব্যাবসায়িরা তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যকে নিজেদের অভিজ্ঞতা পুষ্ট জেলাঞ্চলের রেশমী বস্ত্র শিল্পকে অধিকতর উন্নত ও সুবিস্তৃত করার কাজে নিয়োজিত করার বদলে এই শিল্পকে বিনষ্ট করার বিদেশী বণিকদের প্রচেষ্ঠার সহযোগী যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে থাকলো।"[৪৯] বিপদকালে হেস্টিংসের আশ্রয়দাতা ও পরবর্তীতে তার বেনিয়া বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী ১৭৭০ সালে ইংরেজ কোম্পানীর সাথে বাণিজ্য শুরু করেন। অত্যন্ত হিসেবী ও স্বার্থসচেতন কৃষ্ণকান্ত এর আগেই পৈত্রিক ব্যবসার উত্তরাধিকার নিয়ে কাশিমবাজারে জমিয়ে বসেছেন। ১৭৬৫ সাল নাগাদ সূতো, কাপড় রেশম ব্যবসায় বিরাট অর্থবান কৃষ্ণকান্ত নন্দী। কোম্পানির ব্যবসায় পুত্র লোকনাথের নামে পত্তনি করে ইংরেজ কোম্পানীর বড় যোগানদারই কান্তবাবু। তিনি এক লক্ষ টাকায় লাভ করতেন চল্লিশ হাজার টাকা। দাদনে লাভ হতো এক লাখে এক লাখ। সূতো কাপড়ের ব্যবসায় এক বছরে লাভ হলো একুশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সিক্কা টাকা। ১৭৯০ এ কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিলেন ১৭৫৬ সালে মাত্র চার হাজার টাকায় প্রথম জমিদারী কিনেছিলেন। হেস্টিংসের অনুগ্রহ ও সহায়তায় রানী ভবানীর

কাছে গচ্ছিত রানী সত্যবতীর লাভজনক জমিদারী বেআইনিভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র লোকনাথের নামে ইজারা বন্দোবস্ত পান। ১৭৭৩ সালে কান্তবাবু নিলামে ১৯ টি পরগনার বন্দোবস্ত করে নেন। দেশ জুড়ে তখন আকাল। মন্বন্তরের হাহাকার। এরই মধ্যে হেস্টিংসের বদান্যতায় নব্য বিত্তশালীদের বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চিত হচ্ছে। এডমণ্ড বার্ক বৃটিশ পার্লামেন্টে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, "কাউকে বর্ষিক এক লক্ষ টাকার বেশি রাজস্বের বন্দোবস্ত দেওয়ার নিয়ম না থাকলেও হেস্টিংস নিয়ম ভেঙে কান্তবাবুকে বার্ষিক তেরো লক্ষ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্তে নানা স্থানে জমিদারী প্রদান করেছেন।" ভগ্নপ্রায় কাশিমবাজার রাজবাড়ী কান্তবাবুর স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই রাজবাড়ীর সাথে আলোচ্য অঞ্চলের গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কাশিমবাজারে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্মৃতিও আছে তার স্ত্রী ও কন্যার সমাধিতে। আর কাশিমবাজারে আছে ছোটো রাজবাড়ী। দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (রায়) কাশিমবাজারের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠির কর্মচারী ছিলেন। তারই উত্তরাধিকারীরা এই রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রাজা নবকৃষ্ণ রায়, আশুতোষ নাথ রায় কমলারঞ্জন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কালের নিয়মে হারিয়ে যায় সব কিছুই। পড়ে থাকে কিছু চিহ্ন, কিছু স্মৃতি। তেমনি করেই সৈদাবাদ কাশিমবাজার এলাকার রেশম শিল্প হারিয়ে গেল। আজ সারা এলাকায় হয়তো এক ঘর তাঁতীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য নিয়ে সূতোর সাথে সূতোর জোর দিচ্ছে, তাঁতের একটানা শব্দে মুখর হয়ে উঠছে ব্যস্ত জনপদ। এখন জেলার কোথাও কোথাও রেশম কীটের চাষ হলেও, সেই চাষিদের বংশধরদের দেখা পাওয়া যাবে না, যারা পরম স্নেহে পালন করতো রেশমপোকা। যে রেশম, শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় অপরূপ হয়ে বারবার বিদেশীদের বিস্মিত করেছে। মুনাফার উগ্র লালসায় ধীরে ধীরে সেই রেশম শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সাতপুরুষের পেশা ছেড়ে তাঁতি গেল কার দরজায় জনমজুর খাটতে। পলু পোকার বাসা ভেঙে চাষী গেল নতুন ফসলের বীজ বুনতে। ম্যাঞ্চেষ্টারের শস্তা কাপড় আর ইটালীর নিম্নমানের সিল্কে বাজার ছেয়ে গেল। যে ইংরেজ বণিক হয়ে এসেছিল, তার চোখে এখন ক্ষমতার নেশা। এক বিপুল সম্পদশালী দেশের কতৃত্ব করার হাতছানি। তাই ইংরেজরা কাশিমবাজার ছেড়ে কোলকাতা অভিমুখী। রেশমের অপার সৌন্দর্য্যকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেল ইংরেজ। ১৮৩৩ সালে পাকাপাকি ভাবে বাংলার রেশমের কারবার বন্ধ করে দেওয়া হলো। যদিও কাশিমবাজার বন্দরের মৃত্যুঘণ্টা বেজেছিল ১৮১৩ সালেই। ভাগীরথী দক্ষিণমুখী হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ পূর্বমুখী হয়ে বেঁকে অশ্বক্ষুরের মতো কাশিমবাজার ছুয়ে ফরাসডাঙ্গায় এসে পুনরায় দক্ষিণমুখী হয়। এই কারণেই ভাগীরথীর তীরে গড়ে উঠেছিল বন্দর কাশিমবাজার। ১৮১৩ সালে ইংরেজরা অশ্বক্ষুরের দুই প্রান্তে সরলরেখা ধরে নদীর প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ দুটো যোগ করে দিল। ফলে নদীর প্রবাহ অশ্বক্ষুরাকৃতি না হয়ে সরলরেখায় বইতে লাগলো। শুকিয়ে গেল বন্দরের নদীর নব্যতা। এরপর নদীতে আরও জল আনতে পদ্মা ও ভাগিরথীর বিভাজন বিন্দু থেকে খাল কেটে তা ভাগিরথীতে যোগ করা হলো। নদীর নতুন প্রবাহ কলকল্লোলে বয়ে চলল। কাশিমবাজার নদী স্রোতহীন অশ্বক্ষুরাকৃতি আবদ্ধজলাশয়ে পরিণত হলো। তারই নাম 'কাটিগঙ্গা'। ১৮১৩ সালে অশ্বক্ষুরের দুই মুখ যোগ করে ইংরেজদের তৈরী ভাগিরথীর কৃত্রিম তরঙ্গ একদিকে কাশিমবাজার সৈদাবাদকে শুকনো মরুভূমিতে পরিণত করল, অন্যদিকে ঐ একই বছরে এদেশে স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে ওঠা সুবিশাল বস্ত্রশিল্প বিলেতের শস্তা কাপড়ের জোয়ারে ভেসে গেল। "Till 1813 India had been chiefly an exporting country, which is now becam an importing one ... India, the great workshop of cotton

manufacture for the world, since immemorial times, became now inundated with English twist and cotton stuffs."[৫০] শত শত বছরের অসখ্য মানুষের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির ওপর গড়ে ওঠা বিশাল শিল্পের পরিকাঠামোকে সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস করা যায় না। তাই ক্রমক্ষীয়মান জীবনীশক্তি নিয়েই এই এলাকার বস্ত্রশিল্প বেশ কিছু দিন টিকেছিল। কাশিমবাজার বন্দর নাব্যতা হারিয়ে নৌকা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় সৈদাবাদে ভাগীরথীর নতুন প্রবাহের ওপর এক নতুন বন্দর গড়ে উঠল। 'ঘাটবন্দর' নামের সাথে এই প্রাচীন পোতাশ্রয়টির স্মৃতি আজও বেঁচে আছে। তবে তা স্মৃতি মাত্রই। ইংরেজদের তৈরী নতুন পথে ভাগীরথীর নতুন প্রবাহ দেশের মানুষের কাছে এক অযাচিত ভবিষ্যতের অশনিসংকেত বহন করে নিয়ে এল। এই নবপ্রবাহের তরঙ্গাভিঘাতে ভেঙে পড়ল প্রাচীন গৌরবের সাতমহলা। "ভেঙে পড়ল কতো নবাবী প্রাসাদ, সিরাজদৌল্লার সাধের হিরাঝিল, মোরাদাবাগের প্রমোদ গৃহ, রমনার হরিণ বাগান।

... ভেঙে পড়ল জগৎশেঠের টাঁকশাল, মহিমাপুরের বিরাট প্রাসাদ, রায়দুর্লভের মন্ত্রনাগৃহ, রাজা রাজবল্লভের বসত বাড়ী, মহারাজা মোহনলাল কাশ্মিরীর প্রমোদকুঞ্জ। ফরাসী কুঠির ওপর দিয়ে হল নদীর গতিপথ। ফরাসী কবরখানায় শায়িত মৃতেরা ভাগীরথীর স্পর্শে মুক্তি পেল।"[৫১]

ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেল কালিকাপুরে ডাচদের বিশাল প্রাসাদ ও কুঠি; কাশিমবাজারে ইংরেজদের রেশম কুঠি ও কারখানা। মহাজনটুলির জৈন ব্যবসায়ীদের সোনা দিয়ে বাঁধানো নেমিনাথের মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত। ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে পড়ে আছে সৈদাবাদের সুদৃশ্য বিশাল আর্মেনীয়ান গীর্জা ও সমাধি, সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে যার উল্লেখ আছে। এরই পাশে ছিল শিব মন্দির। নিকটেই দয়াময়ী কালীবাড়ি। প্রাচীন জীর্ণ দেহ নিয়ে এই মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে। নবাব সরফরাজ খাঁর আমলে রাজ কর্মচারী কৃষ্ণচন্দ্র হোতা এই মন্দির তৈরী করান। তার নামেই আজও আছে সৈদাবাদ কাশিমবাজারের যোগসূত্র হোতা সাঁকো। কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠির পাশে মসজিদ ছিল। আবার সৈদাবাদে ১৭২৬ সালে রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য তৈরী করেন জোড়াশিব মন্দির। মন্দির, মসজিদ, গীর্জার আশ্চর্য্য সহাবস্থান। তন্তুবায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ছিল ব্যপক। তারই স্মৃতি নিয়ে আজও আছে শ্যামদাসের আখড়া, গোপীনাথের আখড়া, রাধাবল্লভের মন্দির; ব্যাসপুরে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব শিল্প মণ্ডিত ব্যাসদেবের মন্দির। সৈদাবাদের রেশম ব্যবসার 'কুঠি বাড়ী' অর্থলালসায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। লোভের নখরাঘাত খুবলে খুবলে নেওয়া হয়েছে সৈদাবাদে অবস্থিত কাশিমবাজারের রানী স্বর্ণময়ীর বাড়ী, জীর্ণ বিবর্ণ দেহ নিয়ে তার একপ্রান্ত কোনও ক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। একই দশা কুঞ্জঘাটার নন্দকুমারের রাজবাড়ির। কুঞ্জঘাটার রেশম কাপড় ছোপানোর 'ছাপাখানা' নামটি আছে, চিহ্ন নেই। কাশিমবাজারে ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু স্মৃতিবিজড়িত কাশিমবাজার বড় রাজবাড়ী। ছোটরাজবাড়ী উত্তরাধিকারীদের উদ্যোগে সংস্কার হয়েছে। সৈদাবাদে পরবর্তী কালে রেশম ব্যবসা করতেন কাশিমবাজার রাজবাড়ির দেওয়ান রাজীব লোচন রায়; রামলাল চৌধূরী প্রমুখ। রামলাল চৌধুরীর ছেলে শশীভূষণ চৌধুরী নামে বাজার ছিল। সে সময় কাশিমবাজারের দুই রাজবাড়ী আর শশীবাবুর বাড়িতেই হাতী বাঁধা থাকতো। সৈদাবাদের নামকরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক গঙ্গাধর কবিরাজ (জন্ম ১৭৯৮)। আরেকজন কবিরাজের নাম সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাধর কবিরাজের নামে সৈদাবাদে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি ছোটো রাস্তা আছে। সৈদাবাদ কাশিমবাজার এলাকায় শৈব ধর্মের প্রভাব ছিল। তার প্রমান মেলে ছোটো বড়ো অসংখ্য শিব মন্দিরের অস্তিত্বে। অপর দিকে এক মুর্শিদাবাদ শহরেই সাতশো মসজিদ ছিল। এই মন্দির

মসজিদ বেশীর ভাগই ধ্বংসপ্রাপ্ত। কোথাও কোথাও জঙ্গলাকীর্ণ বাংলা ইটের কঙ্কাল নিয়ে প্রাচীন সমাজ জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে রক্ষিত রেশমের কাপড়ের ওপর অপূর্ব সুক্ষ কলমে আঁকা সৈদাবাদের একটি মানচিত্র দেখা গেল। মানচিত্রটি ১৮৫৪ সালের। এতে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল সৈদাবাদের মোট জনসংখ্যা ৪০৪০০ জন। এর মধ্যে ৬ আনা হিন্দু; ১০ আনা মুসলমান। এই বিপুল মুসলিম জনসংখ্যা কবে কিভাবে সৈদাবাদ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল তার কোনো তথ্য দৃষ্টিগোচর হয় নি।

কাশিমবাজার বড় রাজবাড়ী আর সৈদাবাদের শশীবাবুর বাড়ীতে রাস উৎসব হতো। আর হতো দোল। আবীরের রঙে মেতে উঠতো সবাই। বৈষ্ণবদের খোল করতালে কীর্তনের সুর উঠতো— 'মারো মারো হে শ্যাম পিচকারী হো'। আজও বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মৃত নদীর বাঁকে বাঁকে সেই কীর্তনের সুর খুঁজে ফেরে।

নবজাগরণের সূর্যালোক এই এলাকাতেও এসে পৌঁছেছিল। নতুন চিন্তা চেতনার তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল সৈদাবাদ কাশিমবাজারের তটভূমিতেও। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি চিন্তা চেতনার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলা, বিশেষ করে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বস্থ এলাকা এবং রাঢ় অঞ্চল এক সুমহান সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এবং সামাজিক আন্দোলন এতদঞ্চলের মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং উন্নত সাহিত্যের জন্ম নিয়েছিল। "Murshidabad district, or to be more Precise, the Rarh and the regions adjoining the bank of the Bhagirathi, can boast of a rich cultural heirtage. The Vaishnava tradition of Murshidabad begans in the 16th century with Srinivasacharya, In the 16th, 17th and 18th Centuries, the Vaishnava movement was one of the powerful influences which moulded the life of the majority of the people and reaped a rich harvest in the field of literature."[৫৪] চৈতন্যযুগের অন্যতম পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সৈদাবাদের কৃষ্ণচরণ ও তাঁর পুত্র রাধারমণের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি 'অলঙ্কার কৌস্তভাদি' গ্রন্থ রচনা করে নিজেকে সৈদাবাদ নিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিক, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, সৈয়দ মূর্ত্তজা, নরহরি দাস, যদুনাথ দাস, রাধামোহন ঠাকুর, বংশী দাস, চৈতন্য দাস, বৈষ্ণব দাস প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবাদন রেখেছেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন রাধারমণ প্রেস (ছাপাখানা) স্থাপন করেন। শোনা যায় এই প্রেস সৈদাবাদের কুঠিবাড়ি (অধূনাবিলুপ্ত) এলাকায় অবস্থিত ছিল। রাধারমণ প্রেসে দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্য ছাপা শুরু হয়। "কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ রায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কাশী থেকে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননকে নিয়ে আসেন। তিনি কাশিমবাজারে অনেকগুলি চতুষ্পাঠি খোলেন এবং নিজে ন্যায় ও স্মৃতি পড়াতেন। কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের চতুষ্পাঠী খুব জনপ্রিয় ছিল।"[৫৫] ইতিমধ্যে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষার বাহন ইংরাজি ভাষা, যা এদেশে ইংরেজরা আসার সুবাদেই পরিচিত হয়েছিল, সেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্য এদেশীয়গণের মধ্যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়। ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অপূর্ব রত্নরাজি এদেশের উদ্যোগী বিদ্যোৎসাহীদের চমৎকৃত করে। যদিও ইংরাজরা এদেশীয়গণের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষায় উৎসাহী ছিলনা। টোল, চতুষ্পাঠি, মক্তবে সংস্কৃত আরবী ফারসী শিক্ষায় তাদের উৎসাহ ছিল বেশি। "সাধারণভাবে এমনকি শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে বৃটিশ সরকার এক কেরাণীকূল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ভাবেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। এর থেকে ভ্রান্ত ধারণা আর হয় না। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন

এদেশে হয়েছিল বৃটিশ সরকার কর্তৃক নয় তাদের ব্যতিরেকেই। নিঃসন্দেহে প্রথমে বৃটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে ছিল। পরে তারা একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয়।"[৫৬] বাংলাদেশের নানা জায়গায় এদেশীয় গণের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখা দেয়। তার একটি চমকপ্রদ উদাহরণ দেখা যাচ্ছে এই সৈদাবাদেই। "সরকারী নির্দেশ অগ্রাহ্য করেও পণ্ডিত মশাই এই স্কুলে (সৈদাবাদ স্কুল) ইংরাজী চালু রাখেন। এজন্য ছাত্রদের আকর্ষণ বাড়ে এই স্কুলের প্রতি।"[৫৭] মুর্শিদাবাদ জেলা তথা আলোচ্য অঞ্চলের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তাই উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলি পরপর সাজালে কেমন লাগে দেখা যাক। ১৮২০ সালে কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ রায় কোলকাতায় হিন্দু কলেজের জন্য ১৫,০০০ টাকা দান করেন। যে হিন্দু কলেজ (১৮১৭) স্থাপনকে বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা তথা আধুনিক চিন্তার 'ল্যাণ্ডমার্ক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৪ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের কিশোর ও যুবাদের শিক্ষার জন্য নিজামত কলেজ স্থাপন করা হয়। কিন্তু সেখানে শিক্ষার সুযোগ নবাব পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার ছাত্ররা সকলের জন্য উন্মুক্ত আধুনিক শিক্ষা ও ইংরাজি শিক্ষার জন্য ১৮৪৪ সালের ২৫ জুলাই এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারিকে গণদরখাস্ত প্রেরণ করেন। ১৮৩৭ সালের ১ নভেম্বর সিভিল জজ লেসলী মেলভিন এবং সেশন জজ এফ ডব্লিউ রাসেল-এর উদ্যোগে সৈদাবাদে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের জন্য স্থানীয় মানুষ চাঁদা দিলেন সাত হাজার টাকা। পনেরো বছরের বালক রাজা কৃষ্ণনাথ রায় সর্বোচ্চ দু'হাজার টাকা দিলেন। কলেজটি এক বছরেই উন্নতি করল। কিন্তু তারপর উদ্যোক্তারা বদলী হয়ে গেলে কলেজও মুখ থুবড়ে পড়ল। কলেজটিকে বাঁচানোর জন্য কলেজ কমিটি আবেদন করলেও সরকার তাতে কর্ণপাত করল না। এরপর ১৮৪৬ সালে গভর্ণর জেনারেল হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনায় মুর্শিদাবাদে দুটি স্কুল স্থাপিত হল। একটি সৈদাবাদে অপরটি জঙ্গিপুরে। দু'বছরে পর ১৮৪৮ সালে কান্দিতে হল আরও একটি স্কুল।

"... সৈদাবাদ স্কুলে সবচেয়ে বেশী ছাত্র পড়াশুনা করতো। সৈদাবাদে ৯০ জনের মধ্যে ৮৬ জন, জঙ্গীপুরে ৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৪ জন এবং কান্দীতে ৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪০ জন বিদ্যালয়ে উপস্থিত। ... হার্ডিঞ্জ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে শিক্ষকের বেতন ছাড়া সরকার আর কোনো দায়ভার বহন করত না। ... এই স্কুলগুলির ছাত্রদের পাঠের অগ্রগতি জানা যায় কমিশনের পাঠানো প্রতিবেদন থেকে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ কমিশনের জে. টেলর সৈদাবাদের স্কুলে ৮৬ জন ছাত্রের পাঠ শিক্ষায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।"[৫৮]

নবচেতনার ঢেউ, নবজাগরণের চিন্তা এ জেলার সমাজমননেও আলোড়ন তুলেছিল। যদিও চরিত্রগত দিক থেকে তা ইউরোপীয়ান নবজাগরণের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল। প্রথমত শক্তিশালী বিদেশী পুঁজির ছত্রছায়ায় এদেশের জাতীয় পুঁজির বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, এদেশের মাটিতে নবজাগরণের বার্তা যখন এসে পৌঁছুল, তখন বিশ্ব পুঁজিবাদ তার আপোষহীন সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে পশ্চাতমুখী। তাই আমাদের দেশের নবজাগরণের পরিধি ও প্রভাবের সীমাবদ্ধতা ছিল। এই বিষয়টি প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ আলোচনা রয়েছে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত কৃষ্ণনাথ কলেজের শতবার্ষিকী সংকলনে। "The middle ages clossed and the modern period began in the history of Bengal. Men like Rammohan Ray, David Hare, Dwarka Nath Tagore and Henry Vivian Derozio started a new movement in Bengal which is Known as the Bengali Renaissance and the foundation of the Hindu college in 1817 is a landmark in its history. But foreign

domination did not give adequate scope for full and unfettered develpoment to the new forces released in the society. New techniqnes of Production could not be developed, industrialism could not make any headway, trade and commerce were controlled in the interest of a foreign nation, feudalism and obseure antism were allowed to thrive, and a colonial agrarian raw-meterial producing economy was foisted upon a helpless people. So the Renaissance was limited in charecter, and confined within narrow stratum of the society. Nonetheless, it was a revolutionary and progressive movement and us'hered in new epoch in the political and social history of Bengal, and indirectly, of India as a whole."[৫৯]

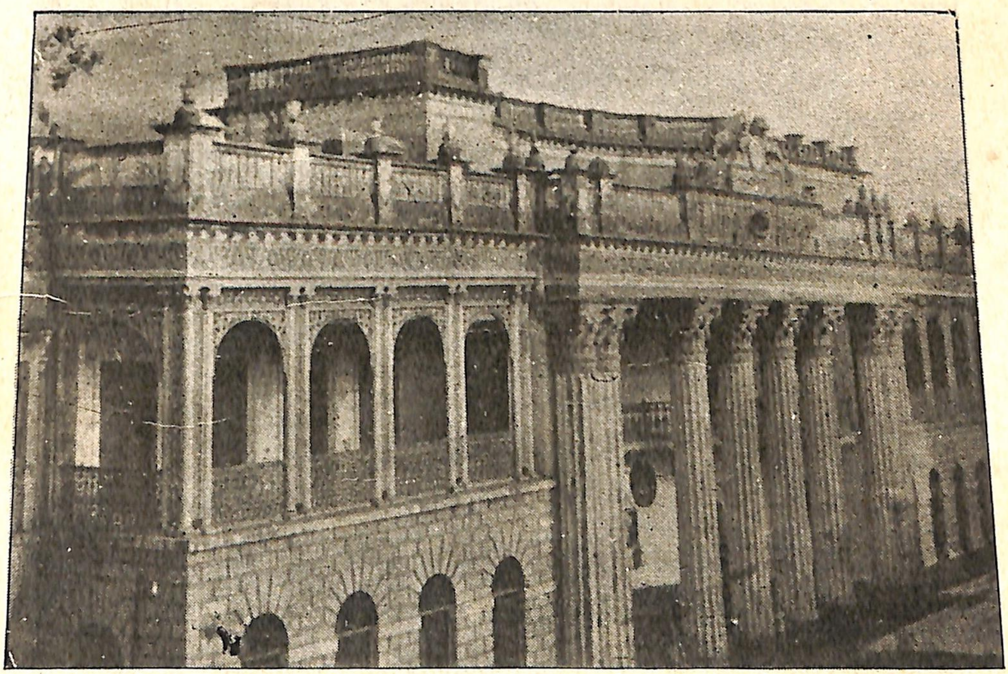
এই নবজাগরণের হীরকদ্যুতি আলোকিত করেছিল এক স্বল্পায়ু মানুষের জীবনকে। মানুষটির নাম রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। কাশিমবাজার রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী বেনিয়ান কৃষ্ণকান্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণনাথ ইতিহাসে তেমন আলোচিত ব্যক্তিত্ব নন। এ জেলার ইতিহাস বা ঘটনা বলতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ তাঁর স্বল্পকালীন জীবনের (১৮২২-৪৪) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, আধুনিক মননশীল মনুষ্যত্বের সাক্ষ্যই দেয়। বিপুল সম্পদের অধিকারী এক পনেরো বছরের কিশোর সে যুগের ভোগ বিলাসের গড্ডলিকায় না ভেসে সৈদাবাদে কলেজ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে, অর্থ দিচ্ছে, এ ঘটনা কি এমনিই তুচ্ছ! মহামতি ডেভিড হেয়ারের জীবনদীপ নিভে গেল। শহর কোলকাতায় ছুটে এলেন কৃষ্ণনাথ। আমোদ, প্রমোদ, বাইজী নাচ, বুলবুলির লড়াই-এর শহর কোলকাতা। বিত্তশালী নব্য বাবুদের দৃষ্টিতে বিনিদ্ররজনী আর সুরার জড়তা। এরই মাঝে মফঃস্বলের এক ধনী তরুণ ডেভিড হেয়ারের স্মরণসভার আয়োজন করলেন, ১৮৪২ সালের ১৭ জুন কোলকাতা মেডিকেল কলেজের থিয়েটার হলে। সেই তরুণ কৃষ্ণনাথ ডেভিড হেয়ারের মর্মরমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ পরিমান অর্থ দান করলেন। এতো তাঁর অসংযত জীবনাচারণের উদাহরণ নয়। কেমন ছিল সময়টা? যুগসন্ধিক্ষণের সে সময়ে একদিকে সাধারণ মানুষের ওপর ইংরেজ কোম্পানি ও তার বশংবদ নব্য বিত্তশালীদের জুলুম অত্যাচার। অন্যদিকে ব্যভিচার, কুরুচির লাম্পট্য। বিলাস ফূর্তি, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাবুদের বিড়ালের বিয়ে। এ জেলার কান্দির রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্যয় করছেন কুড়ি লক্ষ টাকা। কান্তবাবুর পৌত্রের বিবাহে অতিথি নবাব, লাটসাহেব। কাশিমবাজারের আকাশে আলোর রোশনাই। খানাপিনার এলাহি আয়োজন। অপরদিকে ঢাক বাজছে। সহমরণের ঢাক। অসহায় নারীর আর্তস্বর যাতে পবিত্র ধর্মের ঢাকে ঢাকা পড়ে যায়। "১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের চুনাখালিতে (সৈদাবাদ-কাশিমজাবার সংলগ্ন) ৭০ জন সতী স্বামীর সহগামিনী হয়েছিলেন। বয়স ও সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা ছিল তাঁদের মধ্যে। এছাড়া সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায় উইলিয়াম ওয়ার্ডের A view of the History, Literature and Relogion of the Hindus (1817) নামক গ্রন্থে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের চুনাখালিতে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাঁর পঁচিশজন স্ত্রীর মধ্যে ১৩ জন ব্রাহ্মণের জীবদ্দশাতেই গত হন। বাকি ১২ জন তাঁর সহমৃতা হলে ত্রিশজন শিশু অনাথ হয়ে পড়ে।"[৬০] এরই মাঝে সতীদাহের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে রামমোহন রায়ের কণ্ঠ। পুরাতন সংস্কারকে যুক্তির কষাঘাতে ছিঁড়ে ফেলছে ডিরোজিওর 'ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি'। আধুনিক শিক্ষার আলো নিয়ে ডেভিড হেয়ারের পালকি ছুটছে কোলকাতার পথে। মানবতাবাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নিয়ে অসাধারণ পুরুষাকার বিদ্যাসাগরের উদয় হচ্ছে। ঘুমন্ত নির্জীব অন্ধকার সমাজে ঊষার আলো ফুটছে।

কৃষ্ণনাথ উইলিয়াম স্টিফেন ল্যামব্রিক, রাজা দিগম্বর রায় ও হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র শিবপ্রসাদের তত্বাবধানে লেখাপড়া শুরু করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে ইংরাজি ভাষা, ইংল্যাণ্ড ও ভারতের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি, ভূগোল এমনকি কেমিস্ট্রি পর্যন্ত আয়ত্ত করতে শুরু করেন। আধুনিক চিন্তার স্পর্শ তাকে যুক্তিবাদী করে তোলে। শুরু হয় পরিবারের সাথে অনিবার্য বিরোধ। সমস্ত অনিষ্টের মূল দিগম্বর রায়কে তাড়ানোর উদ্যোগ শুরু করেন কৃষ্ণনাথের মা ও ঠাকুরমা। দিগম্বরকে মিথ্যা ক্রিমিনাল কেসে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাথ বুক দিয়ে তাঁর বন্ধু ও শিক্ষক দিগম্বর রায়কে অসম্মান ও শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। কৃষ্ণনাথের ডিরোজিয়ান সুলভ আবেগকেই তাঁর পরিবার ও সনাতনপন্থীরা উচ্ছৃঙ্খলতা বলেছেন। কৃষ্ণনাথ ষোলো বছর বয়সে উইলিয়াম ল্যামব্রিককে ইংরাজি পত্রিকা Murshidabad News প্রকাশনার দায়িত্ব দেন। আঠারো বছরে তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয় কোলকাতার বাইরে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ সংবাদপত্রী'। কৃষ্ণনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ড লর্ড সোসাইটির সদস্য হন। যে সংগঠন বাংলার প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন এবং জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। কোলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম পাঁচজন ছাত্রের জন্য তিনি এক হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেন। ধনীর দুলালের দিগ্বিজয় কিংবা জমিদারী কেনার স্বপ্ন নয়, কৃষ্ণনাথ স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সমস্ত সম্পদ দিয়ে একটি কলেজ হবে যেখানে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানো হবে। এই স্বপ্নের কলেজের নাম হবে রাজা কৃষ্ণনাথ কলেজ। ১৮৪১ সালের ৭ জানুয়ারি তাঁর প্রথম উইলে তিনি এই মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই তারুণ্যের আবেগকে বিষয়ীরা বলবেন পাগলামি। তবে ইতিহাসের পাতায় এই পাগলদের নামই লেখা থাকে। সম্ভবত পারিবারিক সংঘাতের পরিণতিতে মিথ্যা অভিযোগের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আবেগপ্রবণ কৃষ্ণনাথ কোলকাতার নির্জন বাড়িতে মাত্র বাইশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগের দিন তিনি তাঁর বানজেটিয়ার বাড়িতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কাছেই একটি হাসপাতাল তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। রাজা কৃষ্ণনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনের এই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁকে এ জেলার তথা এই এলাকার নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করবে নিঃসন্দেহে। সবশেষে উল্লেখ করা যাক রাজা কৃষ্ণনাথের ঘটনাবহুল স্বল্প জীবনের এক অসমসাহসী উদ্যোগের কথা। "বন্দর কাশিমবাজারকে পুনর্জীবিত করবার শেষ চেষ্টা করলেন কান্তবাবুর প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। কাশিমবাজার ও লণ্ডনের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার পরিকল্পনা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন প্রচারিত হল। বন্দোবস্তও হল সুন্দর। কারিগররা গড়ে তুলল জাহাজ তৈরীর এক আশ্চর্য্য বিরাট কারখানা। সৈদাবাদে গুরগিন খাঁর ... বাগানে জাহাজ তৈরী শুরু হলো বটে কিন্তু শেষ হলো না। পরিকল্পনা ছিল অদৃষ্টদগ্ধ। কৃষ্ণনাথ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর কলকাতায় আত্মঘাতী হলেন।"[৬১] মৃত নদী ও নগরীকে বাঁচিয়ে তোলার শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

অকাল প্রয়াত স্বামীর স্বপ্ন বুকে নিয়ে রাণী স্বর্ণময়ী এগিয়ে এলেন। বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্য এবং পরবর্তীতে এই কলেজকে রক্ষা করতে তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়। বহরমপুর কলেজের নাম পরবর্তীতে কৃষ্ণনাথ কলেজ হয়। রাণী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপনের জন্য ত্রিশ বিঘা জমি দান করেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণে দেড় লক্ষ টাকা, বহরমপুরে কলের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। সৈদাবাদাদে ফরাসী কুঠির ধ্বংসাবশেষের কাছে

জলকল, রাণীর উদ্যোগে কল বলে রাণীকল সুপরিচিত। রাণী স্বর্ণময়ীর অকৃপণ দানের মরমী স্পর্শ পেয়েছে ছাত্রছাত্রী বিদ্যানুরাগী থেকে শুরু করে আর্তপীড়িত সাধারণ মানুষ, গ্রামের অসহায় জননীরা। রাণী স্বর্ণময়ীও তাঁর দেওয়ান রাজীব লোচন রায় সৈদাবাদাদের ভার্ণাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথা প্রতিরোধের জন্য সরকারের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন তাতে ১৮৫৬ সালে স্বাক্ষর করেছিলেন রাণী স্বর্ণময়ী। এই বিধবা রাজবধূর দানের পুষ্পার্ঘ্য পৌঁছেছিল বিদ্যাসাগরের কাছেও। বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন সেই ঋণ, "Words can not express how much I was benifited by her loan. The benifit will remain everfresh in my memory."[৬২]

রাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর রাজা কৃষ্ণনাথের মাতা হরসুন্দরী কাশিমজাবারের সম্পত্তি উত্তরাধিকারিনী হন। কিন্তু বয়স ও অন্যান্য কারণে সাড়ে পঁচানব্বই লক্ষ টাকা নগদ ও মাসিক দশ হাজার টাকা মাসোহারার বিনিময়ে সেই সম্পত্তি নাতি (মেয়ে গোবিন্দ সুন্দরীর ছেলে) মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে লিখে দেন। মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অর্থকষ্ট ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য ধারাবাহিকভাবে লেখাপড়া করতে পারেন নি। কাশিমবাজার রাজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তিনি মাতামহ হরিনাথ মাতুল কৃষ্ণনাথ, মাতুলানী স্বর্ণময়ীর শিক্ষাদরদী জনকল্যাণমুখী ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। নবজাগরণের যে আলো কৃষ্ণনাথকে দীপ্ত করেছিল তার বিভা লেগেছিল মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জীবনেও। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম দানের কাছে কেবল অতীত নয়, বর্তমান সময়ও সমান ঋণী। তিনি কলকাতা বহরমপুর সহ বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতি করে গেছেন। সৈদাবাদের মনীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ তাঁরই নামাঙ্কিত।



মহারাণী স্বর্ণময়ীর সৈদাবাদের প্রাসাদ। কয়েক বছর আগে এখানেই ছিল জেলা গ্রন্থাগার। বাড়িটির বৃহত্তর অংশই প্রমোটারদের হাত ঘুরে ধ্বংস হয়ে গেছে। এর একাংশে এখন বহরমপুর শহর গ্রন্থাগার।

মুর্শিদাবাদের লুপ্ত শিল্প উদ্ধার ও রক্ষার জন্য তিনি উদ্যোগী ছিলেন। সেই সময় শিল্প শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা সরকারকে দিয়ে যান। সে সময়ের জেলা তথা রাজ্যের প্রায় সমস্ত গঠনমূলক ও প্রগতিশীল উদ্যোগে মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থসাহায্য ও সোৎসাহ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কবি সজনীকান্ত দাস অসুস্থ, চিকিৎসার দায়িত্ব মনীন্দ্রচন্দ্রের। কলেজ অব মিউজিক, নাটরের স্কুল-পথিকৃৎ মনীন্দ্রচন্দ্র। ১৯০৭ সালে কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উদ্যোক্তা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের স্বপ্নের বিজ্ঞান কলেজ, মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দান এক লক্ষ টাকা। বানজেটিয়ার শিল্পমেলা— সংগঠক মনীন্দ্রচন্দ্র। মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বললেন, "... লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন, সেই প্রসাদ অজস্র বিতরণ করার দুর্লভ শক্তি তাঁর ছিল।" স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এবং বাংলার বিপ্লববাদী আপোষহীন যোদ্ধাদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। "The Krishnath collega became a prosporous and flourishing institution under the able management of Maharaja Manindra chandra Nandy who became the source of inspiration to the revolutionary and non-violent freedom fighters of India... British Police, Intelligence Branch, Criminal Intellignce Department maintained secret and confidential files against Manindra Chandra Nandy for his alleged involvement in the Swadeshi and nationalist movement."[৬৩] বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কোলকাতার টাউন হলে যে ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তার সভাপতিত্ব করেন মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ১৯২৯ সালের ৯ নভেম্বর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলো, "১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলের যে মহাসভায় বাংলাদেশ যে প্রথম বিলাতী পণ্য বয়কটের ঘোষণা করে, তিনি ছিলেন সেই চিরস্মরণীয় সভার সভাপতি। বঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল একটি ঘটনার জন্যই তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে।" মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মহতী স্মরণসভার শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বাংলার বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনাকালীন নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নাম বিস্মৃত প্রায়, যেমন ক্রমবিলীয়মান তাঁর সৈদাবাদের বিরাট বাড়িখানি। পাঁচ বছর বয়সে সৈদাবাদের হার্ডিঞ্জ ভার্ণাকুলার স্কুলে বৈকুণ্ঠ নাথের শিক্ষা জীবনের শুরু। পরে বহরমপুর কলেজ স্থাপিত হলে তিনি সেখানে প্রথম থেকেই ছাত্র ছিলেন। এরপর অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এফ এ, বি এ এবং বি এল ডিগ্রি অর্জন করেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন নামকরা যশশ্বী ব্যবহারজীবী হিসেবে স্বীকৃত হন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা বহরমপুর সেনা ব্যারাকে। এই মহা বিদ্রোহের অনুরণন সারা দেশের সাথে মুর্শিদাবাদ জেলা তথা এই অঞ্চলেও অনুভূত হয়েছিল। ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী চিন্তার ধারাবাহিকতায় এলেন কেশবচন্দ্র সেন। "কেশবচন্দ্র— ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, সামাজিক সাম্য, এবং গণতন্ত্রের ধারণা তাঁর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-এর মধ্য দিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। এই নতুন ধর্ম চেতনার মধ্যে দিয়ে যার শুরু, নতুন রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে তার সমাপ্তি হল। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের দুই দশকের মধ্যেই ১৮৭৬ সালেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতসভা বা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ দেখা দিলেন এক অসাধারণ বাগ্মী ও রাষ্ট্রনির্মাতা হিসাবে। আর বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী অথবা 'দক্ষিণহস্ত' স্বরূপ দেখা গেল মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষিতজনের নায়ক বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে। গুরুত্বে যিনি ছিলেন ভারতের

রাজনীতির এক স্তম্ভ, বাংলার রাজনীতির এক দক্ষ সংগঠক, মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতির একচ্ছত্র অধিনায়ক।''[৬৪] ১৮৮২ সালে 'ভারত সভার' অংশ হিসেবে বৈকুণ্ঠনাথ, 'মুর্শিদাবাদ সভা' গঠন করেন। পরবর্তীতে ভারতসভা ও তার শাখা সংগঠনগুলি নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে মিশে যায়। ১৮৯৫ সালে বহরমপুরে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আয়োজক ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন। কাশিমবাজারের রাজ পরিবার ও রাণী স্বর্ণময়ীর সাথে বৈকুণ্ঠনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর যৌথভাবে অনেক সামাজিক তথা রাজনৈতিক



বৈকুণ্ঠনাথ সেন
ভারতের রাজনীতিতে রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ও মুর্শিদাবাদের শিক্ষতজনের নায়ক।

দায়িত্ব পালন করেন। বস্তুতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার প্রথম সারির নেতা ছিলেন মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বৈকুণ্ঠ নাথ সেন। বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের জন্য এই দুজনের যৌথ উদ্যোগে ও অর্থে 'বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস' গঠিত হয়। বৈকুণ্ঠনাথ সেনের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত হত সৈদাবাদের 'বাদামতলা দাতব্য ছাত্রাবাস'। এই ছাত্রাবাসে বহু গরিব কৃতি ছাত্র যেমন পড়াশুনার জন্য থাকতেন, তেমনি অনেক বিপ্লবী কর্মী এখানে আশ্রয় নিতেন। শোনা যায় কাকরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বিপ্লবী শচীন সান্যাল দীর্ঘদিন সৈদাবাদের এই এলাকায় আত্মগোপন করে ছিলেন। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরে এসে শচীন সান্যালের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস পথের দাবীর নায়ক সব্যসাচীর চরিত্র চিত্রনের জন্য।

নগর সরে যেতে শুরু করেছে অনেকদিন আগে থেকেই। বৃটিশদের সেনা ব্যারাক, ক্যান্টনমেণ্ট, ইংরেজদের নতুন বসতি। তাকে ঘিরেই অফিস -কাছারি, শহরের আদব কায়দা বহরমপুরে। যার পূর্ব নাম ব্রহ্মপুর। সৈদাবাদ কাশিমবাজার তাই দুয়োরাণী। তবুও শিল্প-সংস্কৃতি-রাজনীতির চর্চা বহমান ছিল। সৈদাবাদে ছিল অনেক ক্লাব, নাট্য সংস্থা। যেমন ড্রামাটিক ক্লাব (১৯১৮), সৈদাবাদ স্বর্ণময়ী ক্লাব (১৯১৮), বি এম ক্লাব (১৯২৩) প্রভৃতি। এখানে ছিল অনেকগুলি ছাপাখানা। সৈদাবাদের কুঠি বাড়িতে হয়েছিল নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপোষহীন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নব চেতনায় বামপন্থী আন্দোলনের বার্তা আসে। গড়ে ওঠে অনেক সংগ্রামী চরিত্র। কিন্তু সংসদীয় আবর্তের মন্ত্রীত্বমুখী রাজনীতি সংগ্রামী বামপন্থার গতিরোধ করে। আসে উগ্র বামপন্থার জোয়ার, রক্তে ভিজে যায় ফুলের মতো জীবন। কিন্তু সমাজ পাল্টায় না। বাড়ে হতাশা আর আর প্রতিক্রিয়ার শক্তি। এরই মাঝে কোলকাতা থেকে আসা একটা খোঁড়া মতো মানুষ ভাঙা সাইকেলে চেপে সৈদাবাদের পথে পথে ঘোরে। একে তাকে ডেকে কথা বলে। ব্যাগে তার বই। বিপ্লবী আদর্শের নতুন আলোকবর্ত্তিকা। এদেশের মাটিতে মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদের বিশেষীকৃত যুগোপযোগী রূপ ও চিন্তা।

যে নদীর তরঙ্গের মুকুরে প্রাচীন সৌধের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতো, সে নদী মৃত, সৌধমালা বিলুপ্ত অথবা জীর্ণ বিবর্ণ। যে সুবিশাল জনপদ এখানে ছিল, তা বর্গীর আক্রমণে বিপন্ন হয়েছে, মন্বন্তরে উজাড় হয়েছে; নবাব সামন্তপ্রভূ এবং ইংরেজ কোম্পানির অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু যে অপূর্ব শিল্প সৃষ্টির গরিমা মানুষের শ্রমকে মহিমান্বিত করেছিল তা আজও হয়তো ভাগীরথী বাঁকে বাঁকে, আকাশের মেঘে কিংবা বনফুলের পাপড়িতে মিশে আছে। আঙুল কাটা তাঁতীর শোণিত ধারা আর গভীর মর্মবেদনা মিশে আছে মাটিতে। মৃত নদীর মরা গাঙে বান আর আসবে না; তবু নতুন সংগ্রামের তরঙ্গের অপেক্ষায় আছে নতুন দিন, নতুন স্বপ্ন।

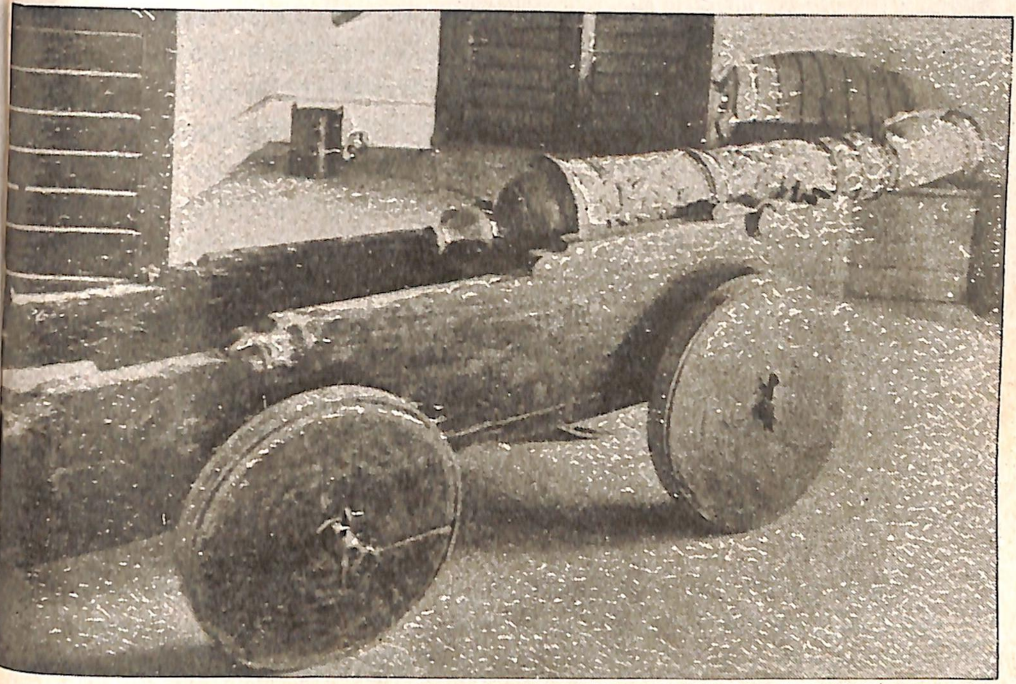
তথ্যসূত্র ঃ

১। মহারাজা নন্দকুমার, চণ্ডীচরণ সেন
২। Bengal District Gazetteers : Murshidabad, L.S.S O'Malley.
৩। মুর্শিদাবাদের কাহিনী— নিখিলনাথ রায়।
৪। A History of Murshidabad District (Bengal), J. H. Tull Walsh.

৫। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত, সূত্র West Bengal District Gazetteers, Murshidabad, (1979)।
৬। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
৭। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
৮। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
৯। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
১০। Bengal District Gazetteers, Msd. O'Malley.
১১। The Economic History of Bengal, N. K. Sinha.
১২। Old Murshidabad, Sir Jadunath Sarkar, Krishnath college centanary volume.
১৩। I bid.
১৪। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
১৫। সৈদাবাদ ঃ একটি প্রাচীন ঐতিহ্যময় জনপদ, শ্যামল দাস। গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৮।
১৬। সৈদাবাদে আরমেনীয়াণ বণিক গোষ্ঠী ও তাদের কার্যকলাপ, আশীষ কুমার মণ্ডল। গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৩।
১৭। Murshidabad District Gazetteers 1979.
১৮। চেনা মুর্শিদাবাদ, অচেনা ইতিবৃত্ত, সূত্র ঃ ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অর্গানিজেশন ইন বেঙ্গল ১৬৫০-১৭২০, সুশীল চৌধুরী।
১৯। বন্দর কাশিমবাজার, সূত্র ঃ The Ecomomic History of Bengal, N. K. Sinha.
২০। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
২১। ভারতীয় রেনেশাঁ ও রামমোহন, মানিক মুখোপাধ্যায়, পথিকৃৎ এপ্রিল, ১৯৮৪।
২২। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ২৩। The Indian capitalist class–volume I, Pavlov
২৪। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
২৫। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত সূত্র ঃ পোটেনশিয়ালিটিস্ অব ক্যাপিটালিস্টিক ডেভেলপমেন্ট ইন দি ইকনমি অব মুঘল ইণ্ডিয়া, ইরফান হাবিব (এনকোয়ারি, উইনটার, ১৯৭১)
২৬। The Indian capitalist class
২৭। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
২৮। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
২৯। কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল— শিবদাস ঘোষ।
৩০। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
৩১। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
৩২। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
৩৩। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ৩৪। বন্দর কাশিমবাজার— সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
৩৫। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
৩৬। মহারাষ্ট্র পূরাণ, কবি গঙ্গারাম, ১১৫৮ বঙ্গাব্দে রচিত।
৩৭। বন্দর কাশিমবাজার।
৩৮। সৈদাবাদের আরমেনীয়ান বণিক গোষ্ঠী ও তাদের কার্যকলাপ
৩৯। বন্দর কাশিমবাজার।
৪০। ঐ।
৪১। মুর্শিদাবাদ কথা, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪২। সৈদাবাদ ঃ একটি প্রাচীন ঐতিহ্যময় জনপদ। ৪৩। বন্দর কাশিমবাজার

৪৪। ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)
৪৫। উইলিয়াম বোল্টস, কনসিডারেশন অন ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স
৪৬। বন্দর কাশিমবাজার।
৪৭। The Economic history of Bengal N. K. Sinha, vol-1
৪৮। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
৪৯। The Plassey Drain, Jogis chandra Sinha, calcutta Reiew 1921.
৫০। বন্দর কাশিমবাজার।
৫১। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত
৫২। On colonialism – পথিকৃৎ, এপ্রিল, ১৯৮৪।
৫৫। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাংস্কৃতিক মুক্ত ধারা ঃ ঐতিহাসিক সমীক্ষা, দেবশ্রী দাস।
৫৬। Renascent India, রমেশচন্দ্র মজুমদার
৫৭। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাংস্কৃতি মুক্তধারা।
৫৮। ঐ
৫৯। Krishnath college centenary volume
৬০। বন্দর কাশিমবাজার
৬২। History of the cossimbazar Raj in the 19th century, vol-I Somendra Chandra Nandy
৬৩। The Role of Krishnath college and Revolutionary Movement in Murshidabad. Dr. Md. Khairul Anam.
৬৪। মুর্শিদাবাদের ব্যক্তিত্ব ঃ বৈকুণ্ঠনাথ সেন— সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত
শ্রী কমল সমাজদার
শ্রী গৌরীশঙ্কর রায়



নবাবী আমলের সমাজ

প্রকাশ দাস বিশ্বাস

(নিবেদন ঃ নবাবী আমল বলতে বোঝায় ১৭০৪ থেকে ১৭৬৪ কালপর্ব পর্যন্ত। তবে খাতায় কলমে মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুনজা মনসুর (১৮৩৮-১৮১৮) পর্যন্ত। প্রত্যক্ষ নবাবী শাসন শেষ হয় মীরকাশিমের সঙ্গে সঙ্গেই। ১৭৬৪র পরবর্তীকালে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এবং 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন' এই দুটি ঘটনা বাংলার সমাজকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। সেই জন্য এই প্রবন্ধে পুরো অষ্টাদশ শতাব্দীকেই ধরার চেষ্টা হয়েছে।)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যখন অরাজকতা মাথা চাড়া দিচ্ছে, পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই যখন বাড়ছে বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন তুঙ্গে, তখন, সেই সার্বিক অবক্ষয়ের হতাশাময় চিত্রের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সুবে বাংলা।[১] বাংলায় তখন দৃঢ় হচ্ছে নবাবী (সুবেদারী) শাসন। সামগ্রিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সেই যুগে বাংলা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নবাবদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় যে সুষ্ঠ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার ফলশ্রুতিতে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিতরতার চিহ্নমাত্র ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় রাজনৈতিক নিশ্চয়তা সকল অশান্তিকে দূরে রেখেছিল। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল

১। সুশীল চৌধুরী— পলাশির অজানা কাহিনী, পৃ: ১৩। কলকাতা, ২০০৪

নিয়ন্ত্রণে, সাধারণ লোকজনের সেই অর্থে কোন কষ্ট ছিল না। সেদিনের সেই সমৃদ্ধ বাংলার ছবি ধরা আছে তৎকালীন ঐতিহাসিকদের রচনায়, পর্যটকদের ভ্রমণবিবরণী বা স্মৃতিকথায় আর অবশ্যই সাহিত্যের পাতায়। সেই সময়ের রাজনৈতিক বিবরণী যেমন সুলভ তেমন সুলভ নয় সামাজিক জীবনের কথা— তবু কিছু কি নেই? এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সমাজজীবনের নানা কথা। বাঙালির নিজের লেখা ইতিহাস নেই বলে যে আক্ষেপ ছিল তা আজ অনেকাংশে দূর হলেও ওই কালপর্বের ইতিহাস রচনার উপাদান তো মূলত বিদেশীদের রচনাই। বিদেশী পর্যটক, এদেশের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান না থাকারই কথা, তাদের বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ইতিহাস লিখতে গেলে পদে পদে ভুল হবারই কথা— তবু এই বিবরণীগুলো কিন্তু হেলাফেলার নয়। অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক সবকিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করেন না। প্রাপ্ত উপাদানের সঙ্গে যৌক্তিক মনন যুক্ত হলে সেই ইতিহাস অনেকাংশেই বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অনেক ঐতিহাসিকই এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা দিক নিয়ে চর্চা করেছেন ও করে চলেছেন। অষ্টাদশ শতকের মুর্শিদাবাদের সামাজিক জীবনের এই ইতিবৃত্ত রচনায় কোনও নতুন তথ্য নেই— নানা আকরগ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে সমস্ত তথ্যাদি ইতিমধ্যেই বলা হয়ে গেছে সেগুলিকেই একসূত্রে গাঁথা হয়েছে এখানে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণীতে যে সমৃদ্ধ বাংলার কথা পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বেশ কিছুটা সময়ও সেই সমৃদ্ধি অটুট ছিল। ইংরেজদের আর্থিক নিষ্কাশন শুরু হবার আগে বাংলা ছিল সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এক অদ্ভুত প্রাচুর্যের দেশ। ফারসী ঐতিহাসিকদের ভাষায় 'জিন্নাত-উল-বিলাদ' বা প্রদেশ সমূহের মধ্যে স্বর্গ।[২] ঔরঙ্গজেব বাংলাকে বলতেন জাতীয় স্বর্গ। মোগল ফরমানেও বাংলাকে 'ভারতবর্ষের স্বর্গ' বলেই আখ্যায়িত করা হ'ত।

প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে বাংলা পরিণত হয়েছিল সমৃদ্ধতম সুবায়। উর্বর জমি, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এর কল্যাণে বাংলায় কৃষিজ পণ্যের কোনও অভাব ছিল না। এর সঙ্গে ছিল নিপুন হস্তশিল্পী ও পর্যাপ্ত মূলধন। বাংলা সুবা যেহেতু প্রায় সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল সেহেতু তার আমদানি করার তেমন দরকার হত না। কাজেই বাংলার সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে যারাই বাংলায় বাণিজ্য করতে আসত তাদের আনতে হত নগদ টাকা বা সোনা রুপা যা প্রায় একচেটিয়াভাবে বাংলাতেই জমা হত— বাংলা থেকে তা বেরিয়ে যেত না। অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে পর্যটক ও ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার ডো লিখেছেন, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দাড়িপাল্লা বাংলার অনুকূলেই ভারী ছিল এবং তখন বাংলাই ছিল একমাত্র পাত্র সেখানে সোনাদানা এসে শুধু জমত, তার কিছু মাত্র কখনো বেরুত না।'[৩]

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক নিশ্চয়তা যে সমাজজীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে তা নতুন করে বলার অবকাশ রাখে না। অষ্টাদশ শতকের অন্তত প্রথম ছটি দশক যেহেতু সুবা বাংলার রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদে সেহেতু অষ্টাদশ শতকের সমৃদ্ধ বাংলার পিছনে মুর্শিদাবাদের নবাবী শাসনের একটা পরোক্ষ ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। যদিও অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া সাধারণ লোকে রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাত বা টানাপোড়েন নিয়ে মাথা ঘামাত না তবুও সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পড়েই— মুর্শিদাবাদের অষ্টাদশ

২। সুশীল চৌধুরী— পলাশির অজানা কাহিনী, পৃঃ ১৭। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক পলাশী বাংলা পৃঃ২, কলকাতা-১৯৮২। ৩। আলেকজাণ্ডার ডো — হিন্দুস্তান, তৃতীয় খণ্ড।

শতকের সামাজিক জীবনও যে তার ব্যতিক্রম নয় তা বলাই বাহুল্যমাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলার আগে জেনে নিতে হবে তৎকালীন সামাজিক কাঠামোর চেহারাটা। মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী সমাজের দুটো শ্রেণী— একদল যারা শ্রম যুগিয়ে উৎপাদন চালু রাখে আর অন্যদল হল যারা অর্থের বিনিময়ে এই শ্রম কেনে অর্থাৎ শ্রমিক আর পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী। মালিক শ্রেণীর অত্যধিক ধনলিপ্সা জন্ম দেয় শোষণের। শুরু হয় ধনবৈষম্য। ধনী নির্ধনের দ্বন্দ্বে গতিশীল হয় সমাজ।

মুর্শিদাবাদের সমাজজীবনের এই রকম শ্রেণীবিন্যাস করা সহজ নয়। মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই উৎপাদক বা শ্রমিক। বৃহৎ পুঁজির আস্ফালন তৎকালে ছিল না। সর্বোপরি সামাজিক বর্ণভেদ চালু থাকায় প্রত্যেকের নিজস্ব জীবিকা স্থিরীকৃত থাকত। এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর মানুষের জীবিকায় হাত দিত না। নাপিত বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষৌরকর্মই করে যেত, কুমোর তৈরি করত মাটির জিনিসপত্র। নাপিত কখনো কুমোরের বৃত্তিতে যেত না অন্যভাবে কুমোর নাপিতের। ফলে জীবিকার নিশ্চয়তা ছিল। পেশাগত প্রতিযোগিতা না থাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে ছিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। ধনের অসম বন্টন ছিল কিন্তু সামাজিক বিধিমতো বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, পূজাআর্চা প্রভৃতিতে সামাজিক ভোজন ও দানধ্যান করা ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। এভাবেই পরোক্ষভাবে ধনের বৈষম্য দূর করার চেষ্টা হত।[৪]

জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের বাইরেও আরেকটি কাঠামোর কথা বলা যেতে পারে। এই কাঠামোতে সবনীচে অবস্থান সাধারণ মানুষের। এর উপরে রয়েছেন অভিজাত সমাজ এবং এদের উপরে ছিলেন স্বয়ং নবাব। এই ত্রিস্তরীয় কাঠামোয় নীচের স্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিলেন নানা জাতির মানুষজন যাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট আছে। সেগুলো না জানলে সামাজিক জীবনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার তৎকালীন হিন্দু সমাজ চতুবর্ণে বিভক্ত ছিল না।[৫] ব্রাহ্মণ ও শুদ্র ছাড়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বাংলার হিন্দু সমাজে ছিল না। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এও দুটি বর্ণের কথা বলা হয়েছে। বৈদ্য এবং কায়স্থরা সৎ শুদ্র এবং উত্তম সঙ্কর বলে অভিহিত হতেন।

দুই বর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজে ছিল ছত্রিশটি জাতি। অন্তত গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ-এর সাক্ষ্য তাই বলছে।[৬] ঘনরাম চক্রবর্তীও নগরে ছত্রিশ জাতের উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে গুটিকয় জাতি সমাজে মর্যাদার অধিষ্ঠিত ছিল। বাকিরা ছিল অবজ্ঞা বা হেলাফেলার পাত্র। ব্যাঙ্গ করে তাদের 'বাহাত্তুরে'[৭] বলা হ'ত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের বিধান অনুযায়ী বৈদ্য ও কায়স্থরা শুদ্র শ্রেণীভুক্ত হলেও সমাজে এদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল— এদের মধ্যে ধনবান লোকের অভাব ছিল না ফলে বর্ণে শুদ্র হলেও এদের জন্য সমাজে আলাদা একটা সম্মানের আসন ছিল। শুদ্র সমাজকে তিনভাগে ভাগ করা হত— উত্তম সঙ্কর বা জলচল শুদ্র, মধ্যম সঙ্কর বা জল অচল শুদ্র এবং অধম সঙ্কর বা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শুদ্র। উত্তম সঙ্কর শুদ্রদের বাড়িতে ব্রাহ্মণেরা যজন যাজনের কাজ করতেন, তাদের

৪। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক-পলাশী বাংলা পৃ:১৫। ৫। অসীম চট্টোপাধ্যায় কৃত ডব্লু ডব্লু হান্টারের 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল' এর অনুবাদ 'গ্রাম বাংলার ইতিকথা', পৃ:৬৮। ৬। গঙ্গারাম— মহারাষ্ট্র পুরাণ। ৭। শ্যামাপ্রসাদ বসু— মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বাংলা পৃ: ১৩৩, কলকাতা-০৪। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জেলায় বসবাসকারী জাতি সম্পর্কে ডব্লু ডব্লু হান্টার তাঁর 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল' বইতে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এ সংক্রান্ত কোনও জেলাভিত্তিক তথ্য মেলে না।

দেওয়া জলও খেতেন সেজন্য এদের জলচল শুদ্র আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল বৈদ্য, কায়স্থ এবং নবশাকরা (গোপ, মালী তাম্বুলী, তাঁতি, শাঁখারী, কাসারী কুমোর, কামার ও নাপিত এই নটি জাত হ'ল নবশাক)। মধ্যম সঙ্কর বা জল অচল শুদ্রদের মধ্যে ছিল কৈবর্ত, মাহিষ্য, আগুরি, সুবর্ণ বণিক, সাহা-শুঁড়ি, গন্ধবণিক, বারুই, ময়রা, তেলি, কলু, জেলে, ধোপা প্রভৃতি জাতি। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা এদের হাতে জল খেত না। অধম সঙ্কর জাতির মধ্যে ছিল যুগী, চন্ডাল, নমঃশুদ্র, পোদ, বাগদি, বাউরি, মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতি সমূহ।

তবে এই ছত্রিশ জাতিই কিন্তু সব নয়। এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক উপজাতি গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে। যাদের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও দুস্তর প্রভেদ রয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী এবং কান্যকুব্জ। কৌলীন্যে ব্রাহ্মণ বর্ণ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত কুলীন, শোত্রীয়, গৌণকুলীন, বংশজ এবং সপ্তশতী। শুধু ব্রাহ্মণরাই নন, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যেও এইরকম শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান ছিল। বৈদ্যদের পাঁচ গোষ্ঠী হ'ল পঞ্চকোটি, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ ও পূর্বকূল। কায়স্থদের ছটি শ্রেণী হল উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, শ্রীহট্টবাসী ও দাসকায়স্থ। ব্রাহ্মণদের মতো বৈদ্য ও কায়স্থরাও কুলীন ও অকুলীন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সাধারণত একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হ'ত না।

কৌলীন্য প্রথার বাড়াবাড়ি তৎকালীন সমাজে নানা অনাচার ডেকে এনেছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কুলীন প্রথার বিশেষ বাড়াবাড়ি ছিল তবে অন্য জাতির মধ্যে যে কুলীন প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল না তা বলা যাবে না। কৌলীন্যপ্রথা প্রসারের ফলে বহুবিবাহ ও যৌতুক প্রথা সমাজে জাঁকিয়ে বসেছিল। কুলীন পাত্রের বিবাহের কোনও হিসাব থাকত না। মৈথেলী ব্রাহ্মণদের সমাজপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার নির্দেশ দেন যে ব্রাহ্মণেরা পাঁচ জনের বেশি ব্রাহ্মণী গ্রহণ করতে পারবে না।[৮] বাংলায় কোনও সমাজপতি এরকম সংখ্যা নির্দিষ্ঠ করে দেননি। ফলে কুলীনেরা মনের সুখে বিবাহ করতেন এবং বিবাহজনিত আয়ের সুবাদে সুখে জীবিকানির্বাহ করতেন। সমসাময়িক কাগজপত্রে শান্তিপুরের জনৈক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি একশোটি বিবাহ করেছিলেন। অনেক সময় কুলীন পাত্র না জোটায় কুলীন ঘরের বহু বিবাহযোগ্যা কন্যাদের দীর্ঘকাল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারাজীবন অনূঢ়া থাকতে হ'ত। উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অভাবে বৃদ্ধের সঙ্গে নিতান্ত নাবালিকা বা শিশুর বিবাহেরও প্রচলন ছিল সেই সময়। কুলীন বংশের শিশু পাত্রের সঙ্গে তাঁর দিদিমা ঠাকুমার বয়সী পাত্রীর বিবাহও হত আকছার। ভারতচন্দ্র কুলীন ঘরের মেয়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'আরে রামা বলো আমি কুলীনের মেয়ে/ যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে / যদিবা হইল বিয়া কতদিন বই/ বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই।' কুলীন পাত্ররাও সুযোগ বুঝে চড়া দাম হাঁকতেন। পর্যাপ্ত যৌতুক না দিলে কুলীন পাত্রকে বিয়েতে রাজী করানো যেতো না।

কুলীন প্রথার আরেক বিষময় প্রভাব ছিল সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সারা বাংলাতেই প্রচুর সতীদাহের খবর পাওয়া যায় তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর লিখিত বিবরণের চেয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর লিখিত বিবরণ অনেক বেশি। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারের একটি সতীদাহের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। ওই বৎসর রামচন্দ্র পণ্ডিত নামে এক মহারাষ্ট্রীয় বণিক মারা গেলে তার ১৮ বৎসর বয়স্কা পূর্ণযুবতী স্ত্রী সহমরণে উদ্যোগী হন। তাদের বাস ছিল কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠীর কাছেই। ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ

৮। শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়— বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা। পৃ:২৩৯।



নবাব নাজিম ওয়ালা জা

তখন ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস রাসেল। রাসেল সাহেব, তাঁর স্ত্রী এবং অন্ধকূপ হত্যার প্রচারক, পরবর্তীকালে সুবিখ্যাত হলওয়েল সাহেব সেই সদ্যবিধবাকে সহমরণ থেকে বিরত হতে নানাভাবে অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি ভয় দেখিয়েও তাকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি। সন্তানেরা অনাথ হয়ে পড়বে একথা তাঁকে জানালে তিনি নাকি বলেছিলেন যে, যিনি এদের প্রাণদান করেছেন তিনিই এদের আহার দেবেন। তাঁকে জোর করে সহমরণ থেকে বিরত রাখা হবে বলে ভয় দেখালে তিনি সেক্ষেত্রে অনশনে প্রাণত্যাগ করার হুমকি দেন। তাকে দহনজনিত ক্লেশের কথা বলে ভয় দেখালে তিনি নিজের হাত আগুনে পুড়িয়ে দেখান যে সেই ক্লেশ তার কাছে তুচ্ছ। অগত্যা উপস্থিত ইংরেজরা ও নবাবের কর্মচারীরা তাকে সহমরণের অনুমতি দেন। বণিক পত্নী নিজে চিতায় উঠে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। কিন্তু বাতাসের গতিমুখ অন্য দিকে থাকায় সেই আগুন অন্যদিকে যেতে লাগল। তখন তিনি পুণরায় উঠে বায়ুর গতির অভিমুখে বসে স্বামীর পাদুটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে পুনরায় চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন ও সহমৃতা হলেন।[৯] বলা বাহুল্য মাত্র সব সহমরণ যে স্বেচ্ছায় ঘটত সত্যের খাতিরেই তা বলা যাবে না। বলপ্রয়োগ সহমরণের ঘটনাই ঘটত বেশি। কাশিমবাজারের একদা সুবিখ্যাত সতীদাহের ঘাট (অধুনা বিলুপ্ত) মুর্শিদাবাদে সতীপ্রথার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

হিন্দু সমাজের অন্তর্গত জাতিগুলির সুনির্দিষ্ট বৃত্তি বা পেশা ছিল। সত্যি বলতে কি কোনও জাতির পেশাই সমাজে তার স্থান নির্ধারণ করত। কতগুলি পেশা যেমন অতীব সম্মানের বলে গণ্য হত তেমনি কতিপয় পেশা কম সম্মানের বলে পরিগণিত হত। খেটে খাওয়া মানুষ বা সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষজন বৃত্তিগত কারণেই নীচুস্তরের অধিবাসী বলে পরিগণিত হত। সমাজতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী 'বৃত্তিমূলক বর্ণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল সমাজে প্রতিযোগিতাহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।' জন্মসূত্রে যারা যে বৃত্তির অধিকারী তারা সেই বৃত্তিই গ্রহণ করত এবং এভাবেই তাদের জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা বজায় থাকত।

ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাচর্চা, দর্শনচর্চা এবং পূজার্চনা নিয়ে থাকতেন। এ গুলিই ছিল তাদের জীবিকা। বৈদ্যদের জাতিগত বৃত্তি ছিল চিকিৎসা করা। তবে তারা কাব্য ব্যাকরণ বা আয়ুর্বেদ চর্চাও করত। কায়স্থরা ছিল মূলত মসীজীবী। মুসলিম রাজত্ব শুরু হতে না হতেই কায়স্থদের মধ্যে আরবী

৯। শিবনাথ শাস্ত্রী— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকলীন বঙ্গসমাজ। পৃ:৬৬। কলকাতা, ১৯৪১

এবং ফার্সী শেখার ধূম পড়ে গিয়েছিল। আরবী ফার্সী শিক্ষিতদের জন্য নবাবের রাজস্ব বিভাগের চাকরি বাঁধা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী বা তার আগের অধিকাংশ উচ্চরাজকর্মচারীই ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। রাজসংসর্গ থাকার কারণে এরা ছিলেন যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। এদের অনেকেই ছোটবড় জমিদারী কিনে জমিদার বনে যেতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নিয়মের ব্যত্যয় ছিল না। অন্য জলচল শুদ্রদের মধ্যে তাম্বুলী এবং গোপরা মূলত ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। নবশাক গোষ্ঠীর অপর সাতটি ছিল কারিগর শ্রেণীর তারা স্ব স্ব জাতিগত বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত। জল অচল শূদ্ররা মূলত চাষাবাদ বা ব্যবসা বাণিজ্য করত। আর অন্ত্যজ শূদ্রেরা চাষাবাদ বা পশুপালন ছাড়াও যোগ দিত সেনাবাহিনীতে।[১০] লাঠিয়াল, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি বৃত্তিতে এদেরই একচেটিয়া প্রাধান্য।

জাতিগতভাবে বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকলেও বৃত্তি পরিবর্তনের ঝোঁক যে একেবারেই ছিল না তা নয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা প্রায়শই বৃত্তি পরিবর্তন করতেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যাচর্চা বা পূজার্চনা ছেড়ে জমিদারী পরিচালনা করছেন এমন দৃষ্টান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কম নেই। বৈদ্যরা টোল খুলে বিদ্যাচর্চা করছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তবে বৃত্তি পরিবর্তন করলেও বর্ণ জাতি বা উপজাতির কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। হাণ্টারের সাক্ষ্য অনুযায়ী ওই সময়ে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ ব্যবস্থায় বেশ খানিকটা কঠোরতা ছিল। ওপরের শ্রেণী সম্পর্কে ভয় এবং নীচের শ্রেণী সম্পর্কে অবজ্ঞা। জাত যাবার ভয় ডোমোক্লিসের তরবারির মত সব সময় মাথার উপর লম্বমান।[১১] তবে বলা বাহুল্যমাত্র ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো বাংলার হিন্দু সমাজের বর্ণ ও জাতিপ্রথা খুব কঠোর ছিল তা বলা যায় না।[১২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু সমাজের অবিসংবাদিত নেতা দু'জন-কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং ঢাকার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বৈদ্য কুলোদ্ভব মহারাজ রাজবল্লভ সেন। সে যুগে তথাকথিত নিম্নবর্ণের কেউ ধনবান হলে সমাজের চোখে নিজের আসন উঁচু করার লক্ষ্যে জাতি থেকে উচ্চতর জাতিতে উত্তরণের চেষ্টা করতেন। পণ্ডিতদের প্রচুর ভেট (ব্রাহ্মণ বিদায়!) দিয়ে তাদের বিধান আনিয়ে (কিনে?) তারা এইসব কাজে প্রয়াসী হতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিধান নিজেদের অনুকূলে না গেলে কাশীর, কাঞ্চির পণ্ডিতদের মত আনতেন—এভাবে তারা বিধান সংগ্রহ করতেন। দু'একজন পণ্ডিত নিজস্ব অবস্থানে দৃঢ় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন বিধান আনানো খুব কঠিন কাজ ছিল না। সেই যুগে এরকম ঘটনার একটি উদাহরণ হ'ল বৈদ্যদের উপবীত ধারণের অধিকার ঘোষণা। রাজবল্লভ যখন বৈদ্যজাতির এই উত্তরণের আয়োজন করছিলেন তখন হিন্দু সমাজের আরেক অবিসংবাদিত নেতা কৃষ্ণচন্দ্র তলে তলে তার বিরোধিতা করেছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বেশিরভাগই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী তাদের উপর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কাজেই রাজবল্লভকে নবদ্বীপের পাশাপাশি কাশী, কাঞ্চির পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। রাজনগরে হওয়া বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ধারণের সেই অনুষ্ঠানে সারা ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিতরা এসেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নবদ্বীপ থেকেও বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদ থেকে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন চিরঞ্জীব পঞ্চানন,

১০। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রাক পলাশী বাংলা পৃ:১৯।
১১। হান্টারকে উদ্ধৃত করেছেন সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে পৃ১৯।
১২। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রাক পলাশী বাংলা পৃ:২০।

হলায়ূধ তর্কপঞ্চানন, গোবিন্দরাম ন্যায়ালঙ্কার ও পীতাম্বর ন্যায়বাগীশ।[১৩]

রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক সমাজসংস্কারে আরেকটি প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের চেষ্টা।[১৪] নিজের নয় বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা অভয়া'র পূণর্বিবাহের জন্যই রাজবল্লভের এই প্রচেষ্টা। মনুর প্রখ্যাত 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে॥' এই সূত্রই ছিল এই উদ্যোগের মূলে। অর্থাৎ কোনো নারীর স্বামী যদি নিরুদ্দিষ্ট হয়, মরে যায়, সংসার ত্যাগ করে, ক্লীব বলে প্রতিপন্ন হয় অথবা তার সমাজচ্যুতি ঘটে তবে তাঁর দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণে বাধা নেই। কৃষ্ণচন্দ্র এই উদ্যোগেরও বিরোধিতা করেন। তাঁরই প্ররোচনায় তাঁর সভাসদ প্রখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের এই প্রচেষ্টা শাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ বলে প্রমাণ করেছিলেন।[১৫] রাজবল্লভ দ্রাবিড়, বারাণসী, মিথিলা থেকে পণ্ডিতদের বিধান এনেও সমাজে তা চালু করতে পারেন নি। একইভাবে নিজের অকালবিধবা কন্যা তারার দুঃখে কাতর হয়ে রানী ভবানী বাংলার বিধবাদের একাদশী ব্রতের কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার পণ্ডিত সমাজ, সমাজ সংস্কারের এই প্রচেষ্টাতেও বাধা দেয় ও রানী ভবানীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[১৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজ সংস্কারের যে কটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার সবকটিই বিফলে যাবার পিছনে ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত। তাঁর রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির জন্য হিন্দু সমাজের অনেক কুপ্রথা রদ করা যায়নি। হিন্দু সমাজের পুরোধা নেতা হিসাবে তিনি একটু উদারতা দেখালে অনেক সহজেই হিন্দু সমাজের অনেক কুপ্রথা যে রদ করা যেত সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে 'ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত'-এ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশের কোন কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে যেরূপ সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর তৎকালীন হিন্দু সমাজের উপর তাঁহার যে প্রকার প্রভূত্ব ছিল, তাহাতে বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহার মূলক অনেক বিগর্হিত রীতি নিরসন ও হিতজনক রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া বরং যাহাতে ওই পূর্ব্ব কুরীতি বলবতী থাকে, তৎপ্রতিই সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছিলেন, এবং অন্য কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বদেশের কোন দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন। একাদশী তিথিতে দুঃখিনী বিধবাদিগের পক্ষে উপবাসের অনুকল্পবিধান, তাহাদের অশেষ ক্লেশকর 'বৈধব্য যন্ত্রণা বিমোচন' অথবা 'সহমরণ', 'বহুবিবাহ' ও 'বাল্য পরিণয়' প্রথা অপনয়ন প্রভৃতি আবশ্যক বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল এই তিথিতে, এই মাসে, এই বারে এই দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ ইত্যাদি যৎসামান্য বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন।'[১৭] বস্তুতপক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন জন এত পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেছেন যে তা সাধারণ পাঠককে যথেষ্ট বিভ্রান্ত করতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকারকালে রাজ্য মধ্যে যতপ্রকার বিপদ

১৩। রসিকলাল গুপ্ত— মহারাজা রাজবল্লভ সেন।
১৪। শ্রী নতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ ২৩৯।
১৫। রজতকান্ত রায়— পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃ: ৭৬। ২য় মুদ্রণ, কলকাতা-১৯৯৮।
১৬। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রাক পলাশী বাংলা পৃ:২১।
১৭। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়— ক্ষিতীশ বংশাবলী রচিত পৃ: ৫৩-৫৪।

ঘটিয়াছিল, এরূপ কোনও এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায় না। অথচ কোনো বিপদ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অসীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে তিনি বিপজ্জাল কাটিয়া বাহির হইতেন, চতুর্দ্দিকে যখন বিপদ ঘিরিয়া আসিত তখনো তিনি পাত্র মিত্র সভাসদ লইয়া আমোদে প্রমোদে কালযাপন করিতেন। গুণগ্রাহিতা ও গুণীগণের উৎসাহদানকার্যে ইনি বিক্রমাদিত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ... ইহা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না, যে, বঙ্গদেশ যে আজিও ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সুরসিকতা প্রভৃতির জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তাহার পত্তন ভূমিস্বরূপ ছিল।[১৮] শাস্ত্রীমশাই-এর এই চরিত্র চিত্রণে কিঞ্চিত অনুযোগের সুর পাওয়া যায় যা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রাহিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।[১৯] অন্যদিকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— 'তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন ও তাহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল, কিন্তু লাম্পট্যদোষে তাহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। ... দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্‌মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া উঠে।'[২০] বাস্তবিকই কৃষ্ণচন্দ্রের মতো শক্তিমান সমাজপতি সমাজসংস্কারে যে প্রগতি আনতে পারতেন সে বিষয়ে তাঁর কণামাত্র উদ্যোগ চোখে পড়ে না— উপরন্তু তিনি বুঁদ হয়ে রইলেন চাটুকার ভাঁড়দের তৃতীয় শ্রেণীর সস্তা অশ্লীল রসিকতায় আর খেউড় কবিগানে। পুঁজিপুথির নাগপাশে দম বন্ধ হওয়া হিন্দু সমাজ যখন তাঁর দিকে চেয়ে আছে তখন তিনি লক্ষ টাকা খরচ করে বানরের বিবাহ দিতে ব্যস্ত।[২১] অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার হিন্দু সমাজের মস্তবড় ট্রাজেডি এটাই।

তবে কৃষ্ণচন্দ্র চান বা না চান সেযুগে কেউ কেউ অর্থকৌলীন্যের জেরে জাতের বেড়া টপকে সমাজে উঁচু স্থান পেয়েছিলেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৈদ্য কুলোদ্ভব রাজা রাজবল্লভ (যজ্ঞোপবীত ধারণ) এবং অবশ্যই কাশিমবাজারের কান্তবাবু। জাতিতে তেলী হওয়ায় শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডারা কান্তবাবুর দান গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি পণ্ডিতদের ভেট দিয়ে বিধান আনিয়েছিলেন যে তেলিরা আসলে সৎ শুদ্র এবং সেজন্য তারা জল আচরণীয়।[২২] অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা লিখেছেন 'অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করে জল অচল বর্ণের একাংশ কর্তৃক নিজেদের অপর দরিদ্র অংশ থেকে উঁচু জাত মনে করার যে প্রবণতা বহুকথিত, তাঁর অনেক ধ্রুপদী উদাহরণ এ জেলায় আছে। যেমন কান্দী অঞ্চলের কৃষিজীবি মালেরা নিজেদের রাজামাল মনে করে এবং মৎস্যজীবি 'দখনে মালেদের' নীচু জাত মনে করে। চাঁইদের একাংশ নিজের উচ্চবর্ণের মনে করে মৎস্যজীবি 'গুড়িমণ্ডল' চাঁইদের নীচু জাত মনে করে। একই ঘটনা ঘটেছে 'হেলে' ও 'জেলে' কৈবর্তদের বেলায়। 'হেলে' (চাষি) গণ নিজেদের স্বতন্ত্র জাতের কৈবর্ত মনে করেন।' অর্থকৌলীন্য (এবং অবশ্যই হেস্টিংসের সুনজরে থাকার জন্য)

১৮। শিবনাথ শাস্ত্রীকে উদ্ধৃত করেছেন রজতকান্ত রায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে, পৃ: ৭৪।

১৯। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, সম্পাদনা ভবতোষ দত্ত। ২০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিজীবনী, সম্পাদনা ভবতোষ দত্ত। পৃ: ৪১৭-১৮। ২১। লঙ'স সিলেকসনস্ উদ্ধৃত করেছেন সত্যচরণ শাস্ত্রী তাঁর 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত' গ্রন্থে। পৃ: ৭৩। প্রথম পুথিপত্র সংস্করণ, কলকাতা-২০০৩

২২। নিখিলনাথ রায়— মুর্শিদাবাদ কাহিনী। পৃ: ৩০৭। পুথি সংস্করণ, কলকাতা ১৯৮৮। ২২ক। শক্তিনাথ ঝা— মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দু সমাজের রূপরেখা, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১৬/১০ ১৫/১০-৮৫

পূর্বোক্ত কান্তবাবু জাতিমালা কাচারীর (Caste tribunal) চেয়ারম্যানের পদও অলংকৃত করেছেন।[২৩] জাতিমালা কাচারীর চেয়ারম্যান হিসাবে কান্তবাবুর ভূমিকা মোটেও উজ্জ্বল নয়। হিন্দুদের অজস্র জাতি ও তাদের আচরণীয় কৃত্যাদি নিয়ে তাঁর অজ্ঞতা ছিল অপরিসীম। জালিয়াতির অপরাধে মহারাজা নন্দকুমার জেলে গেলে তিনি কারাগারে সন্ধ্যা, তর্পণ ও আহারাদি করতে পারবেন কি এ সম্বন্ধে জাতিমালা কাচারীর চেয়ারম্যান হিসাবে কান্তবাবুর মত চাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে হেস্টিংস বলেন, 'কান্তবাবু কেবলই ছোট লোকদিগের জাতিঘটিত গোলযোগের মীমাংসা করিয়া থাকেন এবং জাতিঘটিত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি স্বীয় ধর্মশাস্ত্রে অভ্যস্ত নহেন। ... হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং কিছুই অবগত নহেন।'[২৪] হেস্টিংসের কল্যাণে কপাল খোলার আগে পর্যন্ত কান্তবাবু ছিলেন এক অতিসাধারণ ব্যবসায়ী। তিনি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মাননি। এমনকি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে নিজের জন্য একটি নামও স্থির করতে পারেন নি তিনি। কান্তবাবুর উত্তরপুরুষ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী লিখেছেন পলাশীর আগে কাগজপত্রে কখনও তার নাম কৃষ্ণকান্ত তিলি, কখনও কৃষ্ণকান্ত দাস কখন শ্রী কৃষ্ণকান্ত তিলি কখনও শ্রীকান্ত তিলি। এরপর একদিন সগর্ব স্বাক্ষর— শ্রীকৃষ্ণকান্ত নন্দী। এতেই শেষ নয় এর পর আরো আছে— মহামহিম শ্রীকৃষ্ণকান্ত বাবুজী।[২৫] বলাবাহুল্যমাত্র, অর্থকৌলীন্যই ছিল এই উত্তরণের মূলে।



নবাব নাজিম ফেরাদুন জা

কান্তবাবু যেমন ভেট দিয়ে নিজের অনুকূলে পণ্ডিতদের বিধান আনিয়েছিলেন তেমনি আনিয়েছিলেন নাটোরের রানী ভবানীও। পুত্রহীনা রানী ভবানী ১৭৫৮ সালে রামকৃষ্ণ নামে একটি বালককে দত্তক নিলে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ভ্রাতুষ্পুত্র বর্তমানে এই দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ বলে রায় দেয়। রানী এরপর কাশীর পণ্ডিতদের দারস্থ হন। রানীর বৃত্তিভোগী কাশীর তিরিশজন পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওই দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।[২৬]

ডব্লু ডব্লু হান্টার হিন্দুদের মধ্যে শ্রমবিমুখতার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনে অনীহা ও

২৩। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার ২০০৩, গ্রন্থনা ও পরিমার্জনা বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত, প্রকাশ দাস বিশ্বাস। পৃ: ১১৭। ২৪। সিলেকসনস্ ফ্রম স্টেট পেপারস উদ্ধৃত করেছেন নিখিলনাথ রায় তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে পৃ: ৩০৩। ২৫। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— কান্তবাবু অ্যাণ্ড হিজ টাইমস, ১ম খণ্ড, পৃ:৬৫, কলকাতা, ১৯৭৮ শ্রীপান্থ — সাহেব ধরা, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮৭। পৃ: ৩৫। ২৬। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— পূর্বোক্ত ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪-৫

বর্ণ ও জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতানুযায়ী জাগতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন।[২৭] হিন্দুরা কখনো প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রম করেনি। তাই পুঁজি, অর্থাৎ ভোগের অতিরিক্ত উৎপাদন কখনো ছিল না; এবং পুঁজির অনুপস্থিতিতে বস্তুগত সভ্যতার কোনও উচ্চ বিকাশ অসম্ভব। প্রয়োজনাতিরক্ত শ্রম ও বর্ণ ও জাতিভিত্তিক সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব উন্নয়নের দুয়ার রুদ্ধ করে রেখেছিল।

হান্টারের সুরে সুর মিলিয়ে আরেক বিদেশী রবার্ট ওরমে বাঙালীদের (হিন্দুদের?) অপর এক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। 'বাঙালী তার স্বদেশবাসী অপরিচিত অতিথিকে আশ্রয় দেয় না। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হ'ল জাতধর্ম খোয়ানোর ভয়। তার অতিথিপরায়ণতা, দান ধ্যান সবই তাঁর পরিচিত জন, স্বজন ও স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মারাঠা আক্রমণকালে (১৭৪২-৫১) বাঙালীর এ সামাজিক আচরণ খুব প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল। পশ্চিমবাংলার মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে চলে আসে। অনেকে গঙ্গা পেরিয়ে নিরাপদ স্থান কলকাতায় আশ্রয় নেয়। এ সময় বাসস্থান ও খাদ্যের অভাবে অনেককে প্রাণ দিতে হয়। বাঙালী রাষ্ট্র বিপ্লবে বিধ্বস্ত আগন্তুক স্বদেশবাসীকে আশ্রয় বা আহার দেয়নি।'[২৮]

হান্টার লিখেছেন 'যে অবিচল স্থৈর্যের সাথে বাঙালি বাঁচে, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য তাতে কোনো দাগ কাটতে পারে না। সে সম্পদে মৌন বিপদে অবিচল। তার চারিত্রিক আবেগ প্রবণতা কঠিন সংযমে আবদ্ধ, তার ঘৃণা দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু অব্যক্ত, তার কৃতজ্ঞতা বংশানুক্রমিক। বাস্তবিকই আশ্চর্য করে হান্টারের পর্যবেক্ষণশক্তি।

হিন্দু সমাজ থেকে এবার মুসলমান সমাজের দিকে মুখ ফেরানো যেতে পারে। আজকের মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলমান প্রধান হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদ জেলা কিন্তু মুসলমান প্রধান ছিল না।[২৯] তবে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও তারা ছিল শাসক শ্রেণী তাই তাদের অন্য একটা মর্যাদা ছিল। ১৮৭১ সালে হান্টার সাহেব তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থে লিখছেন '১৭০ বৎসর আগে বাংলায় একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল; আজ ধনী থাকায় তার কাছে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে'।[৩০]

মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার মুসলমানদের সামাজিক জীবনের আলোচনায় প্রথমেই তাদের সামাজিক কাঠামোটা জেনে নেওয়া দরকার। রিজলি, বেভারলি হান্টারের মতো বিদেশী ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা ছিল এই যে বাংলার মুসলমান সমাজ বাংলার হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর থেকে উদ্ভুত। ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়। বিদেশী পণ্ডিতদের এই মতের প্রথম জোরালো প্রতিবাদ আসে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের দেওয়ান সালার নিবাসী খোন্দকার মহম্মদ ফজলে রব্বির কাছ থেকে। রব্বি তাঁর 'হকিকত্-ই-মুসলমান-ই-বাঙ্গালা' নামক ফার্সী গ্রন্থে এর বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইসলামের তলোয়ারের জোর কম ছিল না, কিন্তু সেখানে মুসলমানের সংখ্যা এত কম কেন? তার বক্তব্য সৈনিকরূপে, উচ্চরাজকর্মচারী রূপে সম্ভ্রান্ত মুসলমান রূপে

২৭। অসীম চট্টোপাধ্যায় কৃত হান্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থের অনুবাদ পৃ: ৮১

২৮। রবার্ট ওরমেকে উদ্ধৃত করেছেন সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে পৃ: ১৩৫।

২৯। সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত— চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত, টীকা-৫০ পৃ: ২০১। বহরমপুর, ১৯৯৬

৩০। ডব্লু ডব্লু হান্টার— দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃ ১৫৫, উদ্ধৃত করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'বাংলার মুসলমানের কথা' প্রবন্ধে।

বহু মুসলমান বাংলার বাইরে থেকে বাংলায় এসেছিলেন। পাঠান শাসনকালেও পাঠান বসতি ছিল বাংলায়। এরাও কালক্রমে বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের অনেকেই যে বাংলার বাইরে থেকে এখানে এসেছিলেন রব্বি সাহেবের এমত মেনে নিয়েও বলতে হয় যে নীচু জাতির হিন্দুরা এবং অবশ্যই বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকার এবং নগর মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রান্ত মুসলমান যে বহিরাগত মুসলমান এ বিষয়ে যেমন সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই তেমনি বাগড়ী এলাকার অসম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা যে ধর্মান্তরিত মুসলমান সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের একটা অংশ যে হিন্দু সমাজের ক্রমাগত অবজ্ঞা ও অবহেলায় বাধ্য হয়ে ইসলামের উদার সাম্যবাদী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিল একথা যেমন সত্যি তেমনি একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে এদের একটা অংশ জোর করে ধর্মান্তরিত করা মুসলমান। সুফী প্রভাবেও যে বাংলার জনগণের একটা বড় অংশ প্রভাবিত হয়েছিল সেকথাও অনস্বীকার্য।

মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার মুসলমানদের তিনভাগে ভাগ করা যায়। এরা হল আশরাফ বা উচ্চশ্রেণীর মুসলমান, আতরাফ (বা আজলফ) বা সাধারণ কৃষক, শ্রমিক বৃত্তিধারী মানুষ এবং আরজল বা অন্ত্যজ বা পতিত শ্রেণী।[৩১] আশরাফ হল মূলত বহিরাগত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দল। শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল নামেই এরা অত্যধিক পরিচিত। সৈয়দেরা হ'ল পয়গম্বরের (Prophet) বংশধর। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমান সমাজে এরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। বাংলায় আসার সময় থেকেই এরা মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে সাহায্য ও বৃত্তি পেতেন। গোলাম হোসেনের সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণে আলীবর্দীর কাছ থেকে বৃত্তি পেতেন এমন সৈয়দদের তালিকা আছে।

আফগানরা বাংলায় পাঠান নামে পরিচিত ছিল। এরা ছিল মূলত যুদ্ধব্যবসায়ী। বাংলায় মুঘল শাসনের আগের প্রায় তিনশো বছর এই আফগানরাই ছিল শাসকশ্রেণী ফলে মুসলমান সমাজে তাদের প্রতিপত্তি নেহাৎ কম ছিল না। মধ্য এশিয়ার চুঘতাই তুর্কীরা মোগল নামে পরিচিত। শেখ সৈয়দ পাঠান মোগলদের মধ্যেও নানা গোষ্ঠী বিভাগ আছে, সামাজিক কাঠামোয় কোন কোন গোষ্ঠী বিশেষ সম্মানের অধিকারী কেউ বা তার চেয়ে একটু কম মর্যাদা পায়।

আতরাফ হল কৃষক শ্রমিক বা বৃত্তিজীবি মানুষ। জোলা, তাঁতি, কারিগর শিল্পী ব্যবসায়ীরা মুসলমান সমাজে আতরাফ শ্রেণীভুক্ত। এদের বেশিরভাগটাই হ'ল ধর্মান্তরিত মুসলমান। হিন্দু সমাজের সামাজিক বৈষম্য বা জাতিভেদের কঠোরতার স্বীকার হয়ে (বা অন্য কোনওভাবে) যারা ধর্মান্তরিত হতেন ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তারা এই আতরাফ শ্রেণীভুক্ত হতেন। তাদের সামাজিক অবস্থানের খুব একটা পরিবর্তন হ'ত না। আশরাফদের সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হ'ত না। ইসলামে জাতিভেদের কঠোরতা না থাকলেও এই শ্রেণী সচেতনতা খুবই লক্ষ্যণীয়। আর আরজল হ'ল চামার, বেদে, বাজীকর ইত্যাদি পতিত শ্রেণীর মানুষ। সংখ্যার বিচারে মুসলমান সমাজে আতরাফরাই সংখ্যাগুরু। অষ্টাদশ শতাব্দী নিয়ে গবেষণাকারী অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে মুসলমান সমাজের শতকরা কুড়িভাগ আতরাফ, পঁচাত্তরভাগ আশরাফ এবং পাঁচভাগ আরজল শ্রেণীভুক্ত।[৩৩] ধর্মীয় মতে অবশ্য মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার

৩১। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক-পলাশী বাংলা পৃ:২২।
৩২। গোলাম হোসেন— সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ ২য় খণ্ড। অনুবাদ মঁশিয়ে রেমণ্ড, কলকাতা ১৯০২
৩৩। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রাক পলাশী বাংলা পৃ:২৩।

মুসলমানেরা দু'ভাগে বিভক্ত শিয়া এবং সুন্নী। শিয়াদের প্রধান উৎসব মহরম, সুন্নীদের ঈদ। ভারতবর্ষের প্রথম দিকের মুসলমান শাসকেরা ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় যারা ভারতবর্ষে এসেছেন তাদের অধিকাংশই সুন্নী। বাংলায় প্রথমদিকে আগমনকারীদের মধ্যেও সুন্নীদেরই প্রাধান্য।[৩৪] সত্যি কথা বলতে কি সুলতানী আমলে বাংলায় শিয়ারা এসেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সম্ভবত মোগল রাজত্বকালেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে শিয়াদের বিস্তার ঘটে। শাহ সুজার সময় থেকেই বাংলায় প্রচুর সংখ্যা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমানদের আগমন ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদের নবাবেরা (সুবেদার) ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে নবাবী আমলে প্রচুর সংখ্যক শিয়াদের আগমন ঘটলেও সুন্নী সম্প্রদায়ের তুলনায় তাদের সংখ্যা যথেষ্ট কম ছিল এবং শিয়াদের বসত ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। গোলাম হোসেন লিখেছেন ভারতের মুসলমানদের ছয়ভাগের একভাগ শিয়া বাকীরা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে শিয়ারা সংখ্যায় কম হলেও প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে কম ছিল না। তৎকালীন বাংলার সাহিত্যে শিয়া এবং সুন্নী সম্পর্কিত বিবরণ তেমনভাবে উল্লেখিত হয়নি। আব্দুল করিমের ধারণা যে এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা এত সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করত যে এই শ্রেণী বিভাজন অমুসলিম লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।[৩৫] একথা হয়তো ঠিক তবে একইসঙ্গে একথাও হয়েতো সত্য যে সংখ্যালঘু শিয়ারা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেই সংখ্যাগুরু সুন্নীরা তাদের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলতেন।

বহিরাগত সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা এদেশে প্রথম এসেছিল ভাগ্যান্বেষী হিসাবে। মুসলমানেরা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর রাজকর্মচারী হিসাবে অনেকে বাংলায় আসেন। এদের অনেকে ছিলেন হয় অস্ত্রব্যবসায়ী নতুবা উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। অসি এবং মসীকেই এরা জীবিকার উপায় বলে ভাবতেন। চাষবাস বা ব্যবসা বাণিজ্যকে এরা খুব ভালো চোখে দেখতেন না। অষ্টাদশ শতকের ব্যবসা বাণিজ্যে উচ্চ বংশীয় মুসলমানের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। 'উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা সামরিক ও রাজকাজ ছাড়া অন্য সকল কাজকেই তাদের পদ ও মর্যাদার হানিকর বলে মনে করত। এরা কখনো নিজের হাতে জমি চাষ করত না, যারা ভূসম্পত্তির মালিক ছিল তারা শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নিত। যদি কেউ এ নিয়ম ভঙ্গ করত তাহলে সামাজিকভাবে সে পতিত হ'ত। সমস্ত আশরাফরা তাঁর দিকে ঘৃণার চোখে তাকাত।[৩৬] মোগল আমলে মুসমলানদের ব্যবসায়ে উৎসাহী করার জন্য সরকার আইন করলেন যে মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের দ্বিগুণ শুল্ক দিতে হবে। ... এই আইনকে পাশ কাটানোর জন্য অর্থবান হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রায় প্রত্যেকেই একজন করে ঘুমন্ত মুসলমান অংশীদার রাখতেন।[৩৭] পলাশীর যুদ্ধের পরে নিয়মকানুন পাল্টাতে থাকলে হিন্দু ব্যবসায়ীরাও এই মুসলমান অংশীদারদের ত্যাগ করতে থাকেন।

আতরাফরা অবশ্য তাদের পিতৃপুরুষদের পেশা ধরে রেখেছিল। বংশানুক্রমিক পেশাই ছিল তাদের জীবিকার উৎস। এদের এক অংশ ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। হস্তশিল্পী কারিগরেরা তাদের পিতৃপুরুষের পেশা বা জাত ব্যবসায় নিযুক্ত থাকলেও বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা যে একেবারেই ঘটত না তা কিন্তু নয় তবে সে সব খুবই

৩৪। আব্দুল করিম— মুর্শিদাকুলী খান অ্যাণ্ড হিজ টাইমস, পৃ: ২৪৭। ঢাকা ১৯৬৩

৩৫। আব্দুল করিম— মুর্শিদাকুলী খান অ্যাণ্ড হিজ টাইমস, পৃ: ২৪৭। ঢাকা ১৯৬৩

৩৬। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক পলাশী বাংলা পৃ:২৪-২৫।

৩৭। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— বন্দর কাশিমবাজার, কলকাতা ১৯৭৮। পৃ: ৭১।

নগণ্য। আরজলরা অবশ্য নামমাত্র মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মের বা সমাজের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ। এরা নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিজস্ব গোষ্ঠীভিত্তিক সামাজিক অনুশাসন মেনে চলত।

মুসলমান সমাজেও উদ্ভুত হয়েছিল একটি শক্তিশালী যাজক শ্রেণী। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে এরা ছিল অপরিহার্য। এরা হাজাম, পশুপাখি জবাই এবং বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত। এরা গ্রাম বাংলার মুসলমান সমাজে ডাক্তারি করতেন। ঝাঁড় ফুঁক করা, মাদুলি দিয়ে শয়তান তাড়ানো, টোটকা চিকিৎসা ছিল এদের একচেটিয়া ব্যবসা। অন্যদিকে সুফী, দরবেশ, ফকিরেরা ইসলাম ধর্মের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে বেড়াতেন।[৩৮] ঐশ্লামিক আদর্শ প্রচারের পাশাপাশি এদের সরল সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন যাপন শুধু মুসলমানদের নয় হিন্দুদেরও এদের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তুলত। এরা হলেন এ সময়কার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু।



নবাব বাহাদুর স্যার সৈয়দ হাসান আলি মীর্জা, বা দিকে ওয়াসেফ আলি মীর্জা, নবাব আলি মীর্জা

সমাজের মূল স্রোতের হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি আরেক শ্রেণীর প্রান্তিক মানুষও তৎকালীন সমাজে চোখে পড়ে। এরা হলেন তথাকথিত সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকেরা। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব পন্থা সম্পর্কে নিজে কিছুই লিখে যাননি। তাঁর ভক্তদের যে মৌখিক উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলোই ছিল তাঁর ধর্মমতের মূল কথা। তাঁর জীবদ্দশাতেই বৈষ্ণব সমাজে কিছু কিছু অনাচার প্রবেশ করছিল। তাঁর দেহত্যাগের পর তার গতি হল দ্রুততর। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'যে বৈষ্ণবীশক্তি উদ্বোধন ছিল তাঁর (শ্রীচৈতন্যের) লক্ষ্য আর, যার ঠিক পরিচয় রয়েছে তাঁর সমসাময়িক চরিতকার বৃন্দাবন দাসের রচনায়, তা পরবর্তী চরিতকারদের মনঃপূত হ'ল না। বৈষ্ণবী-শক্তিতত্ত্ব পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে হতে ঠেকল এসে শুধু মাধুর্য-আস্বাদনে। সে মাধুর্যের আধার হ'ল নারী, তাও স্বকীয়া নয়, পরকীয়া। এ পরিবর্তন ঘটল অতি দ্রুত, প্রায় মহাপ্রভুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই। ... বৈষ্ণবপন্থায় জাতিভেদ ফিরে এল এবং এসব আবিলতার ছোঁয়াচও লাগল আনুষ্ঠানিক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে। মহাপ্রভূর প্রবর্তিত নিয়মে বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সঙ্গে কথাবার্তাও নিষিদ্ধ ছিল। এখন নারী শুধু মাধুর্য লীলা সঙ্গিনীই হল না, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে গুরুও হল। ফল যা হবার তা-ই হল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজও গেল রসাতলে।

৩৮। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক-পলাশী বাংলা পৃ:২৬।

'সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না, তা নয়। এদের মধ্যে নানা দলের সৃষ্টি হল, আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, কিশোরীভজা প্রভৃতি। দলগুলি বিভিন্ন হলেও মিল ছিল তিনটি বিষয়ে, গুরুবাদে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে আর পরকীয়া প্রেমে।'[৩৯]

মুর্শিদাবাদও বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে প্লাবিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণব সাধন চর্চা ছিল তিনটি কেন্দ্রভিত্তিক। ভগবানগোলার তেলিয়া বুধুরি, (বালুচর, গাম্ভীলা সহ) বহরমপুরের সৈদাবাদ ও ভরতপুরের মালিহাটি, কাঞ্চনগড়িয়া ছিল এই তিনটি কেন্দ্র।[৪০] সহজিয়া সাধকদের মধ্যে 'স্পষ্টদায়কেরা' সৈদাবাদের রূপরাম কবিরাজের শিষ্য।[৪১] এরা গুরুর দেবত্বে বিশ্বাসী নয়, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে চেলারা সবাই একই আখ্ড়ায় বাস করে।

বৈষ্ণব আখড়াগুলি শুধু যে খোল নিয়ে সংকীর্তণেই মত্ত থাকত এমন নয় সমসাময়িক রাজনীতিতেও এদের প্রভাব কম ছিল না। কতকগুলি আখড়া আবার নিজেদের খরচ চালানোর জন্য ব্যবসা শুরু করে, কেনে জমিদারীও। বিভিন্ন আখড়ার উপাস্য দেবতাও ভিন্ন ভিন্ন। প্রায় সর্বত্রই ছিল নিত্যসেবার ব্যবস্থা। পাঠান আমলে ধর্মান্তরকরণের যে ঝোঁক রাজশক্তির মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল শ্রীচৈতন্যের আমলে তা একটু থমকে গেলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। জেলার বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি নিম্নবর্গের হিন্দুদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়ে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়াকে মন্থর করেছিল।[৪২]

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বেপথু (!) বৈষ্ণব সমাজকে পরকীয়া প্রেমের পথ থেকে সরিয়ে আনবার জন্য জয়পুরের মহারাজা কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিতকে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। জয়পুরের পণ্ডিতেরা ছিলেন স্বকীয় প্রেমে বিশ্বাসী। স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেম নিয়ে দু'দলের মধ্যে তুমুল শাস্ত্রীয় আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় পণ্ডিতেরা জয়পুরের পণ্ডিতদের পরাজিত করে পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরকীয়া প্রেম আধ্যাত্মিক উন্নতি ও যুক্তির পথ বলে পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃতি পেল।[৪৩]

কৃষ্ণভক্তি, জীবে প্রেম, নাম সংকীর্তন, শুদ্ধ পবিত্র অহিংস জীবনযাপন ও নিরামিষ ভোজন এই ছিল চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা। কালক্রমে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমতের প্রভাবে, সহজিয়া মত ও পথ বৈষ্ণব ধর্মের ধর্মাচরণে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় তা বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্লীন প্রবল শক্তিকে নষ্ট করে।

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে এখনো সারা বাঙালী সমাজ আউল, বাউলের গানের কদর দেয়। আমাদের মতে এ সবের সত্যিকার মুল্য যাচাই হয় শুধু সামাজিক কষ্টিপাথরে। সেদিক থেকে বিচার করলে এদের গানে কি থাকে? একটা উদাসী সুর, কর্মবিমুখতা দ্রারিদ্রের প্রশস্তি আর তামসিক ভক্তিবাদ 'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বইতে পারি না ধাঁচের। সমগ্র জাতি ও সমাজের পক্ষে এসব নৈরাশ্যের ও ক্লৈব্যের প্রচার অকল্যাণকর, দুর্বলতাবর্ধক। যা দুর্বল করে তা সবই পাপ, জঞ্জাল মাত্র— সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

৩৯। শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়— পূর্বোক্ত পৃ: ২০৩-৪

৪০। বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুর্শিদাবাদের দান, গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৬। পৃ: ২২৭। ৪১। শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়— পূর্বোক্ত পৃ: ২২৭।

৪২। দেবশ্রী দাশ— মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক মুক্তধারা। ঐতিহাসিক সমীক্ষা পৃ: ৫৫, কলকাতা-২০০2

৪৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস। ২য় খণ্ড পৃ: ২৬৪, কলকাতা ১৩৮৫কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল পৃ: ৪৫। দে'জ সংস্করণ, কলকাতা ২০০৩

'এদের আখড়াগুলি সাধারণত কামকলার লীলাক্ষেত্র, গাঁজা ভাং-এর আড্ডা; এদের আদর্শ কলুষিত, এরা সমাজদেহের দূষিত ফোড়া।'[৪৪] কোন সন্দেহ নেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় সমালোচনায় খুব নির্মম তবে একই সঙ্গে তাঁর সমালোচনা যে একেবারে অমূলক নয় সত্যের খাতিরেই তা বলা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জৈব কবি নিহাল মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের নানা জাতি ও বর্ণের এক মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। 'বঙ্গাল দেশ কী গজল' কবিতায় তিনি লিখেছেন

রহতে লোক গুজরাতীক
টোপীবাল জেতি জাতিক॥
আরব আরমানী অংরেজ
হবসী হুরমজী উলংদেজ॥
সীদী ফরানীস অলেমাঁন
সৌদাগর মুঘল পাঠান॥[৪৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর অন্দরমহলে প্রবেশ করলে মেলে বিচিত্র তথ্যাদি-হিন্দু মুসলমান ভেদে অবশ্য কিছু পার্থক্য দেখা যায়, তবে মিল যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই বাল্যবিবাহ চালু ছিল। বারো তেরো বছর বয়সেই মেয়েরা মা হয়ে যেত। হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ নিয়ে বিধিনিষেধ না থাকলেও কুলীন ও উচ্চবর্ণের অভিজাত মানুষেরা ছাড়া বেশিরভাগ লোকজনই একাধিক দ্বার পরিগ্রহ করতেন না। হিন্দুদের নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। মুসমলান সমাজে অবশ্য বহুবিবাহ চালু ছিল— বিবাহ বিচ্ছেদও হ'ত আকছার, যা হিন্দু সমাজে দেখা যেত না। বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা না থাকায় এবং বাল্য বিবাহ চালু থাকায় হিন্দু সমাজে বিধবাদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। সতীপ্রথা থাকলেও (পূর্বেই এরকম একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে) জোরপূর্বক সতী করার প্রবণতা কমে গেছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুর জননী এবং অন্তঃস্বত্তা নারীর সহমরণ নিষিদ্ধ ছিল। সরকারি কড়াকড়ি এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ কারণে যারা চিতার আগুন থেকে রক্ষা পেত তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকত দুঃসহ জীবন। হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার না থাকায় তাদের জীবনধারণই দায় হয়ে পড়ত। তুলনায় মুসলমান মেয়েদের অবস্থা ভালো ছিল। তাদের পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল। আকছার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও তাদের পুনর্বিবাহের সুযোগ থাকায় বৈধব্যজীবন যাপন করতে হ'ত না। ধর্মান্তরকরণের ভয় অনেকটা কমে যাওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে পর্দাপ্রথার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। তবে সুন্দরী মেয়ে কোনকালেই বা নিরাপদ ছিল! অভিজাত মুসলমানদের মতো অভিজাত হিন্দুরা অন্দরমহলে পর্দাপ্রথা চালু করলেও সাধারণ ঘরের মেয়ে বউরা স্বচ্ছন্দেই বাইরে বেরোত।

উচ্চবিত্ত মহলে পুরুষদের রমণী বিলাস প্রায় একটা ব্যাধির পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল। মুর্শিদাবাদের নবাবদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁ এবং আলীবর্দী খাঁ ছিলেন পত্নীনিষ্ঠ। আইন সম্মত স্ত্রীই ছিল তাঁদের একমাত্র লীলাসঙ্গিনী। বাকীরা, সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌল্লা ছিলেন

৪৪। শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়— পূর্বোক্ত পৃঃ ২২৮
৪৫। উদ্ধৃত করেছেন শক্তিনাথ ঝা তাঁর 'মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দু সমাজের রূপরেখা' প্রবন্ধে, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ,১৬.১০ ও ১৫.১১.৮৫

নারীলোলুপ। আব্দুল করিমের লেখা থেকে জানা যায় যে মুর্শিদকুলী খাঁ শুধু যে পত্নীনিষ্ঠ ছিলেন তাইই নয়— হারেমের সুচিতা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অসম্ভব সংবেদনশীল। হারেমের কোন দাসী যদি ভুল করেও হারেমের বাইরে যেত তবে সে আর হারেমে ফিরতে পারত না।[৪৬]

মুর্শিদকুলির পর নবাব হন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন। সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলীর মতো দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন কিন্তু নারীলালসা ছিল তাঁর প্রধান দোষ। ফরহাবাগ নামে এক সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ তাঁর অতুল কীর্তি। রিয়াজের লেখক লিখেছেন ফরহাবাগের বাগান এত রমনীয় ছিল যে স্বর্গের পরীরাও সেখানে প্রমোদ বিহারে আসত।[৪৭] ইন্দ্রিয় পরায়ন সুজাউদ্দিন ফরহাবাগের প্রমোদভবনে তাঁর ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করতেন। শোনা যায় আলীবর্দীর ভ্রাতা হাজী আহমেদ নবাবের লালসায় ইন্ধন জুগিয়ে অল্প সময়েই নবাবের প্রিয়পাত্র ও বিশেষ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন।

সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। ইনিও ছিলেন বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ন এবং নারীলোলুপ। তাঁর হারমে অতীব সুন্দরী পনেরশ রমণী ছিল বলে জানা যায়।[৪৮] সরফরাজের ইন্দ্রিয়দোষের কারণেই মুর্শিদাবাদের নবাবদের অতি ঘনিষ্ট জগৎশেঠ পরিবার তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠেন বলে কথিত আছে। জগৎশেঠের সঙ্গে সরফরাজের ঝামেলা বাধে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতপ রায়ের সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে। শোনা যায় যে ১১-১২ বছরের ঐ বালিকা বধূর এত রূপের খ্যাতি ছিল যে সরফরাজ তাকে একবার দেখার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। তিনি জগৎশেঠকে তাঁর অভিপ্রায় জানালে জগৎশেঠ তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সরফরাজ জগৎশেঠের বাড়ীর উপর নজর রাখার জন্য ফৌজ পাঠিয়ে দেন। জগৎশেঠ দেখলেন যে যদি তিনি নবাবের প্রস্তাবে রাজী না হন তাহলে হয়তো নবাব জোর করে তাঁর পৌত্রবধূকে নিয়ে যাবেন- যেটা অনেক বেশী লজ্জাকর হবে। শেষ পর্যন্ত জগৎশেঠ নবাবের দর্শনক্ষুধা মেটাতে গোপনে রাত্রে তাঁর পৌত্রবধূকে নবাবের কাছে পাঠান।[৪৯] ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা সবিস্তারে লিখলেও শেঠবংশীয়েরা একথা স্বীকার করতেন না। তবে সরফরাজ যেরকম ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন তাতে এমন ঘটনা খুব আশ্চর্যের নয় তা বলা যেতে পারে।

গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে আলীবর্দী বাংলার মসনদ দখল করেন। তিনি শুধু যে পত্নীনিষ্ঠ ছিলেন তাই-ই নয় তিনি রাজকার্যেও পত্নীর মত নিয়ে চলতেন। ঐতিহাসিকেরা আলীবর্দীর বেগমকে রাষ্ট্রের সুপ্রিম পলিটিকাল অফিসার বলে বর্ণনা করেছেন।[৫০]

পরবর্তী নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার লাম্পট্য ও ইন্দ্রিয় দোষ তো সর্বজনবিদিত। অনেকে বলেছেন পলাশীর যুদ্ধের প্রধান কারণ সিরাজের লাম্পট্য, তাঁর দুর্বিনীত ব্যবহার ও মানীলোকের মানহানির অভ্যাস। সিরাজ সম্পর্কে সমসাময়িক ও তার পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা কি বলেছেন সে বিষয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণে গোলাম হোসেন সিরাজকে 'অজ্ঞ অর্বাচীন যুবক', 'যে পাপপূণ্যের বা ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করে না', 'দয়ামায়াহীন উদ্ধত', 'রূঢ়ভাষী ও হৃদয়হীন' 'অহঙ্কার ও অজ্ঞতায় যার মাথা বিগড়েছে', 'যৌবন ক্ষমতা ও আধিপত্যের নেশায় যে আত্মহারা' ইত্যাদি বাছা বাছা বিশেষণে অভিহিত করেছেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন

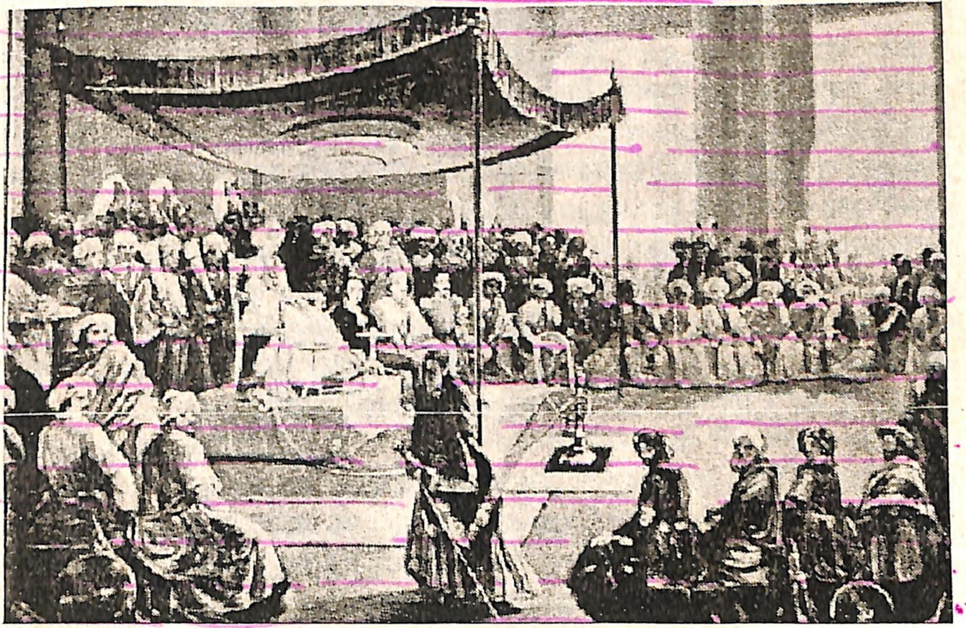
৪৬। আব্দুল করিম— পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৮
৪৭। গোলাম হোসেন সলিম— রিয়াজ-উস-সালাতিন ইং অনুবাদ আবদুস সালাম, কলকাতা-০৪ পৃ: ২৯২
৪৮। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— বন্দর কাশিমবাজার পৃ: ৩৯।
৪৯। নিখিলনাথ রায়— জগৎশেঠ, কলকাতা ১৩৮৯, পৃ: ৩২-৩৩
৫০। গোলাম হোসেন সালম— পূর্বোক্ত পৃ: ৩২৭।

এর লেখক গোলাম হোসেন সলিম জানাচ্ছেন সিরাজ 'সব অভিজাত ব্যক্তি ও সেনাপতিদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ ক[illegible]তেন'। তিনিও সিরাজকে বদমেজাজি ও রূঢ়ভাষী বলেছেন।

সিরাজের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কাশিমবাজারের ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ মঁসিয়ে জাঁ ল সিরাজের জঘন্যতম চরিত্র এবং লম্পট ও নিষ্ঠুর স্বভাবের কথা বলেছেন।[৫১] ইংরেজ কুঠিয়াল লিউক স্ক্রাফটন সিরাজকে মদ্যপায়ী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ইয়ার দোস্তদের নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন। স্ক্রাফটনের মত অনুযায়ী সিরাজের কথাবার্তা, আচরণ বদ মেজাজি ও হিংস্র ধরনের এবং তিনি ছিলেন নির্দয় লোভী ও উচ্চাকাঙ্খী'।[৫২]

'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'এ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন... 'স্রাজেরদৌলা নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেক নদী দিয়া নৌকা যায় সে নৌকা ডুবায় মনুষ্য সকল ডুবে মরে ইহাই দেখে এবং যাহার আলয়েতে শুনে পরমাসুন্দরী কন্যা আছে বলক্রমে সে কন্যা হরণ করে ও গর্ভিণী স্ত্রী আনিয়া উদর চিরিয়া দেখে কোনখানে সন্তান থাকে এইরুপ অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল।[৫৩] শুধু রাজীব লোচনই নন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও তাঁর রাজাবলী গ্রন্থে লিখেছেন 'বিশিষ্ট লোকেদের ভার্যা ও বধূ ও কন্যা প্রভৃতিকে জোর করিয়া আনাইয়া ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত গর্ভিণী স্ত্রীদের উদর বিদারণ করানেতে ও লোকেতে ভরা নৌকা ডুবাইয়া দেওয়ানোতে দিনে দিনে অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে লাগিল।'[৫৪]

বিশিষ্ট লোকেদের কন্যাহরণের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারাসুন্দরী উপাখ্যান।



নবাবী আমলের দরবার।

৫১। জাঁ ল'জ মেমোয়ার, এস সি হিল— বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭ ৩য় খণ্ড পৃ: ১৬২

৫২। লিউক স্ক্র্যাফটন— রিফ্লেকশন পৃ: ৫৩, ৫৫, ১০৩। ৫৩। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়— মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ২, সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ২৫-২৭ ৫৪। মৃত্যুঞ্জয় শর্মা— রাজাবলী, উদ্ধৃত করেছেন রজতকান্ত রায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে।

রানী ভবানী তাঁর শেষজীবনে বিধবা কন্যা তারাকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরস্থ গ্রাম বড়নগরে থাকতেন। সেখানেই গঙ্গায় বজরার ছাদ থেকে অনিন্দ্য সুন্দরী তারাকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে সিরাজ তাকে হরণ করার জন্য সৈন্য পাঠান। রানী ভবানীর এই বিপদে তাঁর বৃত্তিভোগী ও অনুগৃহীত মস্তরাম বাবাজীর নেতৃত্বে একজন ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী সিরাজের অনুচর সৈন্যদের বাধা দেন। তখনকার মতো বিপদ কাটলে ও রানী ভবানী এরপর আর তারাকে নিজের কাছে রাখতে সাহস করেননি। পরিকল্পিত ভাবে তারার মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে রানী ভবানী তাকে মথুরায় জগৎশেঠ ভবনে পাঠিয়ে দেন।[৫৫] সিরাজউদ্দৌল্লার জীবনীকার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও এই ঘটনা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।[৫৬] মঁসিয়ে ল তাঁর স্মৃতিকথায় এবং গোলাম হোসেন তাঁর সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণে কোন কোন বিশিষ্ট লোকের স্ত্রী বা কন্যা সিরাজ কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল তাদের নামোল্লেখ না করেলেও কন্যা ও বধূহরণের কথা উল্লেখ করেছেন। রানী ভবানীর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয়া প্রভাবশালীনি, যিনি জীবৎ কালেই পূন্যশ্লোকা নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁর বিধবা মেয়ের দিকে যদি সিরাজের লুব্ধ হাত প্রসারিত হতে পারে তবে সাধারণ লোকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

সিরাজের রূপলালসার আরেক উদাহরণ ফৈজী উপাখ্যান। নিখিলনাথ রায় মুতাক্ষরীণ অনুসারে ফৈজীর রূপবর্ণনা করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। শ্রীরায় লিখছেন, 'মুর্শিদাবাদে এইরকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তৎকালে ফৈজীর ন্যায় সুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইত না। তাহার উত্তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ কৃশ অঙ্গযষ্টি ও মন্থরগমন অনেককে মোহিত করিয়া ফেলিত, সর্বাপেক্ষা তাহার কৃশাঙ্গের প্রশংসাই অধিক ছিল। ফৈজীর অনুপম রূপরাশির কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, সিরাজ লক্ষ মুদ্রা সমর্পণ করিয়া বহু অনুনয়বিনয়ে তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন এবং নিজ অন্তঃপুরিকাগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।'[৫৭] অর্থ দিয়ে নারী কেনা যায় কিন্তু নারীর মন কেনা যায় না। ফৈজী সিরাজের ভগ্নিপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়ে আবদ্ধ হলে ক্রুদ্ধ সিরাজ তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে সেই ঘরের দরজা জানালা ইঁট গেঁথে বদ্ধ করে দেন। বিশ্বাসভঙ্গের পাশাপাশি ফৈজীর এই গুরুদণ্ডের কারণ সে নাকি সিরাজের মা আমিনা বেগমকেও বারাঙ্গনা বলে ইঙ্গিত করেছিল।

আমিনা বেগমের প্রতি এই কটাক্ষের উৎস খুঁজতে গেলে অভিজাত পরিবারের অন্দরমহলের নারীদের বীভৎস কামলীলা প্রকাশ্যে চলে আসে। সিরাজের মাসি ঘসেটি বেগমের স্বামী নাওয়াজেস মহম্মদ ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা। তাঁর সহকর্মী ছিলেন হোসেন কুলী খাঁ। ঘসেটি বেগম ও হোসেন কুলী খাঁ পরস্পর প্রণয়াসক্ত ছিলেন। পাঠান বিদ্রোহীদের হাতে সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন নিহত হলে সিরাজের মা আমিনা বেগম মুর্শিদাবাদে আসেন এবং হোসেন কুলি খানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। শুরু হল এক মালী দো ফুলের টানাপোড়েন। একজন পুরুষকে ঘিরে দুই বোনের এই দ্বন্দ্বের কথা মুর্শিদাবাদ শহরের ঘরে ঘরে কানাকানি হতে লাগল। সিরাজ মা ও মাসীর এই কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রকাশ্য রাজপথে হোসেন কুলী খাঁকে খুন করলেন।[৫৮]

শুধু ইতিহাস নয় সমসাময়িক সাহিত্যেও এই বীভৎস কামলীলা, ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত প্রচুর।

৫৫। দুর্গাদাস লাহিড়ী— রানী ভবানী, কলকাতা, ১৩১৬।
৫৬। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়— সিরাজউদ্দৌলা পৃ: ৭০
৫৭। নিখিলনাথ রায়— মুর্শিদাবাদ কাহিনী। পৃ: ১১৮।
৫৮। ঐ. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪-৮৫। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— বন্দর কাশিমবাজার। পৃ: ৫০

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল'-এ দেখা যায় তিন সন্তানের জননী নয়ানী স্বামী বর্তমানেও ময়নার যুবরাজ লাউসেনের জন্য ব্যাকুল। 'বিদ্যাসুন্দর'-এও বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যার বিদেশী রাজকুমার সুন্দরের সঙ্গে অবৈধ সহবাসে অন্তঃস্বত্তা হওয়ার বিবরণ পাই। সাহিত্য সমাজের দর্পণ বলে ধরে নিলে এগুলিকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হবে। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'পলাশীর যুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তীকালে বাঙালী সমাজে, উচ্চকোটি শ্রেণীর মধ্যে, ফিরে এসেছিল তার পুরনো দিনের বীভৎসতা, অবাধ কামলীলা ও বিলাসব্যাসন-জাত চরিত্রের দুর্বলতা, চরম স্বার্থপরতা ও দৌর্বল্য-সম্বল ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা। কি হিন্দু, কি মুসলমান দুয়েরই।'[৫৯]

অষ্টাদশ শতকের সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষদের আচরণ যে কোনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই অনুরূপ। তবে ব্যতিক্রমও আছে। আমরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অবাধ কামলীলার কথা বলেছি এর শিকড় কিন্তু লুকিয়ে ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থাতেই। সেই সমাজে যেমন ঘসেটি বেগম আমিনা বেগমের মতো মহিলারা ছিলেন তেমনি ছিলেন মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী, আলীবর্দী খানের স্ত্রী বেগম শরফ্-উন-নিশা, দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর স্ত্রী দরদানা বেগম, রানী ভবানী, রাজা রাজবল্লভের আত্মীয়া বিদুষী আনন্দময়ীর মতো প্রাগ্রসর মহিলারাও। হলওয়েল বেগম শরফ্-উন-নিশা সম্পর্কে লিখেছেন যে নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ ছাড়া রাজকার্যের প্রতিটি প্রধান ও গুরুতর কাজে নবাব তাঁর পরামর্শ নিতেন।[৬০]

তবে সার্বিকভাবে সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনুদার এবং বৈষম্যমূলক। পারিবারিক জীবনে সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও তার বরাদ্দে থাকত অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য। নারীরা ছিল ভোগের সামগ্রী। দাস দাসীর বাজারে তাদের অবাধে বিক্রয় করা হত। নারী ছিল পুরুষদের সম্পত্তি। তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবেই নয় প্রয়োজনে মনিবের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের ভেটও দেওয়া যায়। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণের সাক্ষ্যে জানা যায় যে পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভকে খুশি করার জন্য মীরজাফর তাঁকে সিরাজউদ্দৌলার হারেমের দশজন বাছা বাছা সুন্দরী মহিলা উপহার দিয়েছিলেন।[৬১] উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে মুর্শিদাবাদে কর্মরত এক ইংরেজ পট বন্ধু তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন কিরণ নাম্নী এক মহিলাকে। হিকির ঘরণী হয়েছিল সে। তাঁরও পরে হিকির জীবনে আসে জমাদারণী। শ্রীপান্থ লিখেছেন, 'দুটি মেয়েকেই পেয়েছিলেন তিনি বন্ধুদের কাছ থেকে। অনেকটা উপঢৌকন হিসাবে। কিন্তু কে সংগ্রহ করেছিল তাদের? সাহেবরা নিজেরাই কি? নাকি কোনও সরকার বেনিয়ানের ডালিতে ভেট হয়ে এসেছিল তারা। এমনও তো হতে পারে, এদেশের বিস্তর মানুষ যখন সাহেব ধরার জন্য ব্যস্ত তখন কিছু কিছু এদেশী মেয়েও তখন ফিকির খুঁজছে সাহেব ধরার।'[৬২]

বাস্তবিকই সিরাজউদ্দৌলার পর নবাবী হারেমের বহু মহিলা স্থানচ্যুত ও পেশাচ্যুত হতে থাকে। অভিজাত আমির ওমরাহকুলের হারেমে কেউ কেউ ঠাঁই পেলেও অনেকের কপালেই সে সুযোগ জোটেনি। অন্যদিকে ইংরেজদের পালে তখন সুবাতাস। এইসব মেয়েদের অনেকেই তখন সাহেব ধরতে মনোনিবেশ করে। সাহেবদের অঙ্কশায়িনী হতে তাদের কোন দ্বিধা ছিল না। বস্তুত গোরা সাহেবদের কালো বিবির উপ্যাখ্যানও ভীষণ রোমাঞ্চকর।[৬৩]

৫৯। শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়— পূর্বোক্ত পৃ: ২৩৯

৬০। হলওয়েলস্ ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস পৃ: ১৭০-৭১ ৬১। গোলাম হোসেন তবতাবয়ী— সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ ২য় খণ্ড পৃ: ১৯১। ৬২। শ্রীপান্থ— পূর্বোক্ত।

৬৩। শ্রীপান্থ— গোরা বিবি কালো বিবি, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯০ পৃ: ৫৬

তবে অষ্টাদশ শতকে নারীর প্রতি পুরুষদের অনুদার মনোভাব সত্ত্বেও আলেকজাণ্ডার ডো লিখেছেন, 'ভারতীয়দের নারীজাতি সম্পর্কে একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল যা অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক নারীজাতিকে পবিত্র মনে করত।'[৬৪] সম্ভবত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের অভাবেই বিদেশীর এই তাৎক্ষণিক মন্তব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক। বাংলায় মুসলমানদের রাজত্ব শুরু হবার সময় থেকে দীর্ঘ সময় বাংলার রাজশক্তির তরফ থেকে ধর্মান্তরকরণের যে প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল তা সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই স্তিমিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ধর্মান্তরকরণের তেমন খবর পাওয়া যায় না। আগের কয়েকটি শতাব্দী জুড়ে হিন্দু ধর্ম প্রবলভাবে আক্রান্ত হওয়ায় হিন্দু সমাজে যে অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার আবহ দেখা গিয়েছিল তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। এ বিষয়ে একজন বিদেশী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বহুকাল বিদেশী আক্রমণের সঙ্গে পরিচয় এবং বিদেশী সমাজের সঙ্গে বাস করার ফলে হিন্দুরা পৃথিবীর সবচেয়ে পরমত সহিষ্ণু জাতি। যে কোনো বিদেশীকে সে সহজেই গ্রহণ করে যদি না তার সামাজিক জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে। নিজের বদ্ধ আবেষ্টনীতে সে অন্যের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না; তবে অন্যমত ও ধর্ম সম্পর্কে সহনশীল। আত্মরক্ষামূলক অতিক্ষুদ্র বর্ণে বিভক্ত সমাজে জীবনই তাদের ধর্ম এবং ধর্মই জীবন।'[৬৫]

মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন দৃঢ়চেতা শাসক। তাঁর রাজস্ব সংস্কার ও ভূমি সংস্কার নবাবী কোষাগারের শ্রীবৃদ্ধি বর্দ্ধনে সহায়ক হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর আগে বাংলায় সুবায় যারা মোগল বাদশাহদের প্রতিনিধিত্ব করতেন তাঁরা ছিলেন উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে আগত অভিজাত মুসলমান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা নিযুক্ত হতেন সম্রাট বা তাঁর আমীর ওমরাহদের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এই প্রবণতা কমতে থাকে ও ভূমিপুত্রেরা রাজকর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হতে থাকেন। সলিমুল্লাহ লিখেছেন মুর্শিদকুলী বাঙালী হিন্দু ছাড়া আর কাউকে রাজস্ব বিভাগে চাকরি দিতেন না। সলিমুল্লাহর মতে এর পেছনে দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ হ'ল এক, হিন্দুরা ভীতু সরল ও নিরীহ। রাজস্ব বিভাগে এরা টাকা তছরুপ করলে তা সহজেই বার করা যাবে। দুই, এদের কাছ থেকে তাঁর কতৃত্বের উপর আঘাত আসার সম্ভবনা নেই যা ক্ষমতাশীল মুসলমান অমাত্যদের কাছ থেকে যে কোনও মুহূর্তেই আসতে পারে।[৬৬] মুর্শিদকুলী কর্তৃক হিন্দুদের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ, ব্যাপারটা এমন ভাবলে বিষয়টাকে অতি সরলীকৃত করা হবে। সেদিক থেকে সলিমুল্লাহের বিশ্লেষণ সঠিক বলেই মনে হয় যদিও হিন্দুরা 'সরল' বলে তাঁর মন্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন। আসলে হিন্দুদের রাজস্ববিভাগে নিয়োগ মুর্শিদকুলী খাঁর অন্যতম সফল কূটনৈতিক কৌশল। এত হিন্দু কর্মচারী থাকায় তাঁর পক্ষে হিন্দু প্রজাদের আস্থা অর্জন ও সুবার আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা সহজ হয়েছিল। সর্বোপরি কতিপয় মুসলমান ছাড়া হিন্দু কর্মচারীদের যে কার্যদক্ষতা, কর্মকুশলতা অধিক ছিল তাও স্বীকার করতে হবে।[৬৭] ১৭৮৭ সালে প্রকাশিত কানুনগো রিপোর্টে দেখা যায়

৬৪। আলেকজাণ্ডার ডো— পূর্বোক্ত ২য় খণ্ড পৃ: ৭৫। ৬৫। পি স্পীয়র— দি নাবোবস পৃ: ১২৬, উদ্ধৃত করেছেন সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে পৃ: ১১৬।

৬৬। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়— প্রাক পলাশী বাংলা পৃ: ১৬২

৬৭। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়— বাঙ্গলার ইতিহাস নবাবী আমল, পৃ: ৬০

যে তখন সমস্ত কানুনগোই ছিল হিন্দু যেহেতু এটি তখন পুরুষানুক্রমিকচাকরি ছিল সেহেতু অষ্টাদশ শতকের শুরুতেও সকল কানুনগো হিন্দু ছিলেন ধরে নিলে ভুল হবে না।[৬৮]

মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর ন্যায় বিচারের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে জনৈক হিন্দু রমণীর সতীত্ব নাশের জন্য তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন[৬৯] এবং সেইকারণে তিনি জেন্দাপীর হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। তবে তাঁর অন্য অখ্যাতিও আছে। তাঁর সৃষ্ট 'বৈকুণ্ঠ' ছিল সেকালের জমিদারদের কাছে ত্রাস বিশেষ। রাজস্ব অনাদায়ী থাকলে খেলাপী জমিদারদের মলমূত্র আবর্জনা পূর্ণ গর্তে প্রবিষ্ঠ করানো হত। একেই বিদ্রুপ করে বলা হত বৈকুণ্ঠবাস। তৎকালের অনেক বিখ্যাত জমিদারদের এই বৈকুণ্ঠবাসের অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলে শোনা যায়।

সলিমুল্লাহ তার লেখায় মুর্শিদকুলী খানের কর সংগ্রহ ব্যবস্থার কঠোরতার কথা লিখে গেছেন। রাজস্ব বাকি পড়লে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী, আমিল, জমিদার প্রভৃদিদের বন্দী করে কঠোর নির্যাতন করা হত। প্রয়োজনে খেলাপী জমিদারদের ধর্মনাশ করে তাদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতও করা হত। এইভাবে সুসঙ্গের জমিদার রাজারাম সিংহকে ধর্মান্তরিত করে জনৈক মুসলমান আমিরের মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়।[৭০]

মুর্শিদকুলী এবং তাঁর পরবর্তীকালে বাংলায় বিচার করতেন কাজীরা। হিন্দুদের বিচার হত হিন্দু আইন আর মুসলমানদের বিচার হত মুসলমান আইনে। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মুসলমান আইন জারি হ'ত। হিন্দু আইন ছিল সংশোধনমূলক অন্যদিকে মুসলমান আইন ছিল কঠোর শাস্তিমূলক। ইসলাম অবমাননার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। এ বিষয়ে চুনাখালির হিন্দু তালুকদার বৃন্দাবনের কথা বলা যেতে পারে। একদিন এক মুসমলান ফকির বৃন্দাবনের কাছে এসে ভিক্ষা চায় কিন্তু তাঁর বাজে ব্যবহারের জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রতিশোধস্পৃহায় সেই ভণ্ড ফকির বৃন্দাবনের বাড়ির প্রবেশপথের সামনে কয়েকটি ইঁট জড়ো করে দেওয়াল তোলে। সে সেটিকে মসজিদ বলে দাবি করে এবং আজান দিতে থাকে, বৃন্দাবনকে দেখলেই তাঁর স্বর উচ্চগ্রামে উঠত। বিরক্ত হয়ে বৃন্দাবন একদিন সেই ইঁটগুলো সরিয়ে দেন এবং ফকিরকে তাড়িয়ে দেন। ফকির মসজিদ ভাঙার এই অপরাধের জন্য বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে অভিযোগ আনে। কাজী সরাফ এই গর্হিত (!) অপরাধের জন্য বৃন্দাবনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মুর্শিদকুলি সব বুঝতে পেরে সরাফকে বৃন্দাবনের প্রাণরক্ষার জন্য অন্য কোন উপায় আছে কিনা জানতে চাইলে সরাফ বলেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে শুধু ততটুকুই দেরী হতে পারে যতটুকু সময় লাগে এমন অনুরোধকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে। আজিম-উস-শানও বৃন্দাবনের প্রাণভিক্ষার জন্য মোগল বাদশাহের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই কাজী নিজের হাতে বৃন্দাবনকে খুন করেন। আজিম-উস-শান দিল্লীর বাদশাহকে লিখে পাঠান যে কাজী সরাফ পাগল হয়ে গেছেন। সম্রাট আরঙ্গজেব অবশ্য কাজীর কাজকে অনুমোদন করে বলেন কাজী সরাফ ঈশ্বরের পক্ষে।[৭১] আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কাজী সরাফ পদত্যাগ করেন এবং দিল্লী চলে যান।

৬৮। আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত পৃ: ৭০

৬৯। গোলাম হোসেন সলিম— রিয়াজ-উস-সালাড়িন পৃ: ২৮২

৭০। এন কে সিনহা— ইকোনমিক হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড পৃ: ২১

৭১। গোলাম হোসেন সলিম— পূর্বোক্ত পৃ: ২৮৪, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত পৃ: ৪৩

বৃন্দাবন কাণ্ড থেকে বোঝা যায় কাজীরা কতটা স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মুর্শিদকুলী ও স্বয়ং সম্রাটের নাতির আদেশ (বা অনুরোধ) অমান্য করে কাজী বৃন্দাবনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ সুশাসক ছিলেন। তাঁর আমলে অত্যাচারিত প্রজারা সরাসরি জমিদার বা আমিলদের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ জানাতে পারত। পাছে প্রজারা তাঁর কাছে অভিযোগ জানায় সেজন্য আমিল জমিদারদের উকিল মুর্শিদাবাদ দরবারের আশেপাশে সম্ভাব্য অভিযোগকারীদের খোঁজে থাকত যাতে বিক্ষুব্ধ রায়তকে কোনওমতে সন্তুষ্ট করে অভিযোগ করা বিরত করা যায়।[৭২]

তাঁর আমলে দ্রব্যমূল্যও নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাজারে নিত্য ব্যবহার্য নিজিসপত্র কি দামে বেচাকেনা হচ্ছে সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। ওজনে কম দিলে বা বেশি দাম নিলে তাঁর জন্য কড়া শাস্তির বিধান ছিল।[৭৩] তবে রাজ্যের সর্বত্র একই ওজন চালু ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ওজনে কেনাবেচা চলত।

সপ্তদশ শতাব্দীর ভেঙে পড়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অষ্টাদশ শতাব্দীর দৃঢ় শাসনে অনেক উন্নত হয়। আগে দস্যু তস্করেরা এতই দুঃসাহসী ছিল যে তারা সরকারি রাজস্ব পাঠানোর সময়ও তা লুট করতে পিছপা হ'ত না। আফগান নেতা সুজাত খাঁ এবং নিজাত খাঁ মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ৬০,০০০ টাকা রাজস্ব পথিমধ্যে[৭৪] লুট করলে মুর্শিদকুলী কড়া হাতে অরাজকতা নিবারণে অগ্রসর হন। তিনি বহুস্থানে থানা নির্মাণ করে সেখানে রাজকর্মচারী নিয়োগ করলেন। এদের মধ্যে থানাদার (নায়েব ফৌজদার) মহম্মদ জানের নাম খুবই পরিচিত। ধৃত দস্যুদের শাস্তিবিধানে ইনি বড়ই কঠোর ছিলেন। দস্যুদের শাস্তি হিসাবে তাদের দেহ লম্বালম্বি চিরে পথের পাথে গাছ টাঙিয়ে দিয়ে ইনি 'কুড়ালিয়া' নামে অখ্যাত হয়েছিলেন।[৭৫] এর ফলে চোর ডাকাতের উপদ্রব অনেকটাই কমে যায়। রিয়াজ-উস-সালাতিন এ লেখা হয়েছে যে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বাংলা থেকে দস্যু তস্কর ঠগদের নাম মুছে গিয়েছিল। পরবর্তী নবাবদের আমলেও এই শান্তি বজায় ছিল। আলীবর্দীর সময়ে চোর ডাকাতের নাম শোনা যেত না। করম আলি লিখছেন কারো সম্পত্তি রাস্তায় পড়ে থাকলেও মালিক না আসা পর্যন্ত কেউ সেদিকে ফিরে তাকাত না। ১৭৫৩ সালে পি জে মার্সাল লিখেছেন বাংলার বণিকেরা এক দুই বা তিনজন পিওনের হাত দিয়ে সোনা রুপা একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠতেন। তবে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলার এই চিত্র মারাঠা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয় তবে তা সাময়িক কালের জন্য। মোট কথা নবাবী আমলে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি ছিল ভালোই।

ইংরেজ আমলের শুরু থেকেই বাংলার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। নবাবী সেনা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক কর্মচ্যুত সেনা লুটপাটকেই জাবিকা হিসেবে বেছে নেয়। এল এস এস ওমেলী লিখেছেন পথ চলাচল দস্যুতস্করের জন্য খুবই বিপদজনক ছিল।[৭৫ক] আরো পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ অরাজকতা ও বিপর্যস্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিচায়ক।

মুর্শিদাবাদের নবাবেরা প্রজাদের কল্যাণকামী সরকারের মতো আর্ত অসহায় ও ভবঘুরে মানুষদের সেবায় কাজ করতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে রাজধানীতে নিখরচয় গরিবদের

৭২। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক পলাশী বাংলা পৃ:৩৫।

৭৩। আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত পৃ: ৩৫

৭৪। আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত পৃ: ৭৩

৭৫। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়— বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল পৃ: ৪০, আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত পৃ: ৭৩

৭৫ক। ওমেলী-হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল বিহার অ্যাণ্ড ওড়িষা আন্ডার ব্রিটিশ রুল, কলকাতা ১৯২৫, পৃ: ৪৩

খাওয়ানো হতো। আর্ত ও দুঃখী মানুষজন রাজকোষাগার থেকে পেনশনও পেতেন। আলীবর্দীর জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খান মুর্শিদাবাদের দুঃস্থ বিধবা ও অসহায় বৃদ্ধদের সাহায্য করার জন্য মাসে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করতেন।[৭৫খ]

মুর্শিদকুলির বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ ছিল যে তাঁর কাটরা মসজিদ নির্মাণের সময় প্রচুর হিন্দু মন্দির ও বাড়িঘর ভেঙে উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল। শোনা যায় যে মুর্শিদাবাদ থেকে চারদিনের পথে যে সমস্ত মন্দির বা ইস্টক নির্মিত অট্টালিকা ছিল সবই একই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে মুর্শিদকুলী এক বছরের মধ্যে মোরাদ ফরাসকে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলে সে নবাবের কাছ থেকে অনুমতি নেয় যে নবাব তার কাজে কোনও বাধা দেবেন না ফলত সত্যবদ্ধ নবাব মোরাদ ফরাসকে কোনওরূপ বাধা দেন নাই বলে মনে করা যেতে পারে। রিয়াজ-উস-সালাতিনের অন্যতম প্রধান উৎস তারিখ-ই-বাঙ্গালা হলেও রিয়াজে মন্দির ভঙ্গের উল্লেখ নেই। সলিমুল্লাহ, গ্ল্যাডউইন, স্টুয়ার্ট প্রমুখ মন্দিরভঙ্গের উল্লেখ করেছেন। অনেকের বক্তব্য চারদিনের পথের সমস্ত মন্দির ভাঙা হলে মুর্শিদাবাদ থেকে দেড় ক্রোশ দূরের কিরীটেশ্বরী মন্দির কিভাবে অক্ষত থাকল। মনে রাখতে হবে কিরীটেশ্বরী মন্দিরের সঙ্গে বাংলার রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী বঙ্গাধিকারী কানুনগোদের সম্পর্ক ছিল সেকারণে মোরাদ ফরাসের মতো নিম্নপদস্থ কর্মচারী কিরীটেশ্বরী মন্দির ভাঙতে সাহস পায়নি এটাও হতে পারে। মোরাদ ফরাস যে অত্যাচারী ছিলেন একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীন তাকে তাঁর অত্যাচারের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়। তিনি লিখেছেন, 'মুর্শিদকুলী খাঁ হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত; কিন্তু আমরা সেরূপ মনে করি না; তবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের প্রতি তাঁর অনুরক্তি কিছু অধিক ছিল।' তাঁর মতে 'মন্দিরভঙ্গের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও 'তারিখ বাঙ্গালা'র লিখিত বিষয় যে একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না।'[৭৬] পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিন ছিলেন পরমত সহিষ্ণু। নিখিলনাথ লিখেছিলেন 'তাঁহার ন্যায় পরোপকরিতা, অমায়িক ব্যবহার ও ন্যায়ানুমোদিত শাসন মুর্শিদাবাদের কোনও নবাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে সমভাবে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। ... মুর্শিদকুলী খাঁ যে সমস্ত জমিদারদিগকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া অশেষ কষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন, সুজাউদ্দিন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া এবং মুর্শিদকুলীর হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারী কর্মচারিদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে, সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।'[৭৭] মুতাক্ষরীণ কার তাঁর রাজত্বকালকে পারস্যের ধার্মিক রাজা নওশেরোয়াঁ, রাজত্বকালের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সুজাউদ্দিনের পর বছরখানেক মুর্শিদাবাদের মসনদে আসীন ছিলেন তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ। গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে আলীবর্দী খাঁ বাংলার মসনদ অধিকার করেন। নিখিলনাথ রায় তাঁকে 'বাঙ্গালার আকবর' বলা সমীচিন বলে মনে করতেন। গোলাম হোসেনের মতে আলীবর্দী ছিলেন বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান যৌথ পরিবারের প্রধান। হিন্দুদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি। দীর্ঘ ষোল বছর রাজত্ব করলেও তাঁর রাজত্বকালের বেশিরভাগ সময়টাই তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাতে হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা বাংলায় বর্গী হাঙ্গামা। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে বাংলায় তাদের তাণ্ডব চলেছিল। তাদের তাণ্ডব এত

৭৫খ। গোপাল হোসেন— সিয়ার-উল-সুতাক্ষরীণ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৬-৩৫৭

৭৬। নিখিলনাথ রায়— মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ: ২০-২১। ৭৭। নিখিলনাথ রায়— মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ: ২৫

ভয়ংকর ছিল যে স্বয়ং নবাব পদ্মার পূর্বতীরে রাজশাহীর কাছে রামপুর বোয়ালিয়াতে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরিত করেছিলেন। জগৎশেঠও ধনরত্ন সহ ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৭৯] এর থেকে বোঝা যায় যে মারাঠারা সাধারণ মানুষকে কতটা আতঙ্কিত করেছিল।

বর্গীরা আসত ঘোড়ায় চড়ে। নদী পারাপার তাদের কাছে অসুবিধাজনক ছিল ফলে তাদের তাণ্ডব মূলত গঙ্গার পশ্চিমপাড়েই সীমাবদ্ধ থাকত। বর্ষার আগে তারা দেশে ফিরে যেত। বর্ষা শেষ হলেই আবার তারা হাজির হত। গঙ্গারাম বর্গীর হাঙ্গামার কারণ হিসেবে বলেছেন—

'রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।
রাত্র দিন কৃড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শ্রীঙ্গার কৌতুকে জিব থাকে সর্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে।
এক সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥[৮০]

সেজন্য পাপমতি জনগণকে উদ্ধার করার জন্য বঙ্গে মারাঠা আক্রমণ। বর্গীর হানার যে চিত্র পাওয়া যায় তা বীভৎস। গঙ্গারামের পুঁথি এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক। নির্বিচারে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, খুন ধর্ষণ ছিল এদের নিত্যকর্ম। লোকে এদের ভয়ে বাড়ি ঘর দোর ছেড়ে যেখানে সেখানে পালিয়ে যেত। আবার গঙ্গারামের স্মরণ নেওয়া যেতে পারে —

'চাইর দিগে লোক পলাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
ছর্ত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিত বরগি ঘেরিল আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরান॥
ভাল ২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলা এ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥'

গঙ্গারামের বর্ণনায় বর্গীদের অত্যাচার জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ধরা দেয়। আগেই বলেছি বর্গীদের আক্রমণ মূলত গঙ্গার পশ্চিমপাড়েই সীমাবদ্ধ ছিল। গঙ্গারামের বর্ণনা থেকে মুর্শিদাবাদের

৭৯। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়— প্রাক পলাশী বাংলা, পৃ:১৬৩-৪।
৮০। গঙ্গারাম— মহারাষ্ট্রপুরাণ, সম্পাদনা হারাধন দত্ত, কলকাতা, ১৩৭৩।

কোন কোন গ্রামে বর্গীর হাঙ্গামা হয়েছিল তার একটি প্রাঞ্জল চিত্র পাওয়া যায় —

'বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া সাটই কামনগর আইল॥
মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগা রাঙ্গমাইটা দিয়া॥
গোয়ালজান বধুইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া।
সিঘ্রগতি আসিয়া পহচিল দাহাপাড়া॥
হাজি ছোট নবাব উপারে দিল।
বরগির নাম সুইনা কীল্লাএ সাধাইল॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীঘ্রগতি আইসা জগৎ সেটের বাড়ী লুটে॥'

মুর্শিদাবাদের গ্রামসমূহের এমন নিখুঁত বর্ণনা দেখে গঙ্গারামের বিবরণ বস্তুনিষ্ঠ বলেই মনে হয়। অন্যত্র গঙ্গারাম কাগ্রাম, মৌগ্রাম লুট করার কথাও বলেছেন। মোটের উপর বর্গীদের যাত্রাপথের দুধারে যে গ্রামগুলো ছিল প্রায় সব গুলোই মারাঠা আক্রমণে ছারখার হয়ে গেছিল। শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যা ছেড়ে দেবার এবং বার্ষিক চৌথ দেবার চুক্তিতে বাংলায় বর্গীর আক্রমণ বন্ধ হয়। মুর্শিদাবাদের সামাজিক ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামার তাৎপর্য কম নয়। এই হাঙ্গামার ফলেই বহু উচ্চবর্ণের লোক গঙ্গা পার হয়ে মুর্শিদাবাদের বাগড়ী এলাকায় বসতি স্থাপন করে। বাগড়ী এলাকার বহু লোক আবার আরো নিরাপত্তার জন্য পদ্মা পার হয়ে পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। অনেকে বর্গীর হাঙ্গামা বন্ধ হলে ফিরে এলেও অনেকে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান।

আলীবর্দীর শাসনকালে হিন্দুরা সামরিক বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই বহু উচ্চপদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। সিরাজউদ্দৌল্লার সময়ও এই প্রবণতা বজায় ছিল। তাঁর সময়ে বড় জমিদারদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০ ও অমুসলিম জমিদারের সংখ্যা ছিল ১৭৩। অমুসলিমদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন আর্মেনিয়ানকে বাদ দিলে আর সকলেই হিন্দু। শতকরা বিচারে মুসলিম জমিদরা ১১ শতাংশ ও অমুসলিম জমিদার ৮৯ শতাংশ।[৮১] রিয়াজ-উস-সালাতিন এবং সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণে মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন ও আলীবর্দীকে বিদ্যানুরাগী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন বিদ্বান, পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক ও চিকিৎসকদের পৃষ্ঠপোষক। সে সময় পড়াশোনার জন্য সরকারি পর্যায়ে কোনও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা না থাকলেও বিদ্যার্জনের জন্য অনেক মক্তব, মাদ্রাসা, টোল, পাঠশালা ইত্যাদি ছিল। মক্তব, মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবাব, আমীর ওমরাহ ও মুসলমান অভিজাত ব্যক্তিবর্গরা। অন্যদিকে টোল, চতুস্পাঠী বা পাঠশালার ব্যয় নির্বাহ করতেন হিন্দু জমিদারবর্গ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও নাটোরের রানী ভবানীর নাম। রানী ভবানী তাঁর দানকার্যের জন্য তাঁর জীবদ্দশাতেই পূণ্যশ্লোকা নামে পরিচিত ছিলেন। রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের কাগজপত্র থেকে অধ্যাপিকা দেবশ্রী দাশ রানী ভবানীর বৃত্তিজীবী পণ্ডিত ও বৈষ্ণব আখড়াগুলির তালিকা প্রণয়ন করেছেন। রানী ভবানী শুধু যে হিন্দু পণ্ডিতদেরই বৃত্তি দিয়েছেন এমন নয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য বা বৃত্তি পেয়েছেন। ফকির মজনুসাহের চিঠি থেকে

৮১। ড. ওয়াকিল আহমেদ— উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২

রানী ভবানীর এই ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় যেখানে মজনু সাহ্ রানীকে 'ফকিরদের পরিত্রাতা' হিসাবে বন্দনা করেছেন।[৮২]

আলীবর্দীও হিন্দু পণ্ডিতদের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। পাটনায় থাকাকালন জনৈক জ্যোতিষী তাঁর ভবিষ্যৎ গণনা করে তাঁর সুবা বাংলার অধীশ্বর হবার কথা বলেছিলেন। তা মিলে যাওয়ায় তাঁর এই ভক্তি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। মহারাজা নন্দকুমার তখন নবার সরকারে উচ্চপদে কর্মরত। তাঁর গুরু বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর-এর খ্যাতি শুনে আলীবর্দী খাঁ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক হন। নবাবের আগ্রাহিতশয্যের কথা শিষ্যের মুখে শুনে রাধামোহন নাবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাহচর্যে প্রীত হয়ে নবাব তাঁকে দান গ্রহণের কথা বললে রাধামোহন দানগ্রহণে অস্বীকৃত হন। নবাবের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি নবাবী আদেশ চান যাতে করে কাজীরা আর বৈষ্ণবদের বিচার না করতে পারেন। নবাব হৃষ্টচিত্তে রাধামোহনের প্রার্থনা পূরণ করেন ও তাঁর সম্মানার্থে তাঁর সেবকদের কয়েকটি চাপরাস দেন। রাধামোহন ঠাকুর কোথাও গেলে তাঁর অনুবর্তীরা চাপরাস ধারণ করে তাঁর অনুগমন করত। আলীবর্দীর সেই সনদ নাকি মালিহাটিতে রক্ষিত হয়েছিল পরে তা চুরি হয়ে যায়। এই জনশ্রুতি সত্যি হলে তা আলীবর্দীর চরিত্রের এক নতুন দিক উন্মোচিত করে।[৮৩]

নবাবী আমলের আগে হিন্দুদের প্রকাশ্য ধর্মাচরণ ছিল খুবই কম। বাদশা শাহজাহানের আমলের এক আইন মোতাবেক হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বহিঃপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পুরাতন হিন্দু মন্দির সংস্কারও ছিল নিষিদ্ধ। হিন্দু বিবাহ এমনকি নবান্ন উৎসবের জন্যও দিতে হত রাজকর। চড়ক পূজার জন্য কর ধার্য হয়েছিল। কর ধার্য হয়েছিল শবদাহনের জন্যও।[৮৪] এই গুমোট পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মিলতে থাকে নবাবী আমল থেকে। উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী কুলের সৌজন্যে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব আবার প্রকাশ্যে আসতে থাকে। মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন ধর্মভীরু। তাঁর পরের নবাবেরা কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে অত রক্ষণশীল ছিলেন না। নবাব, তাঁর আত্মীয় পরিজন এবং অভিজাতবর্গের মুসলমানেরা হোলি, বাসন্তী পঞ্চমীর মতো হিন্দু উৎসবে যোগ দিতেন। করম আলি তাঁর 'মুজাফ্ফর নামা'য় শাহামৎ জঙ্গের (নবাব আলীবর্দীর ভ্রাতুস্পুত্র) হোলি খেলার বর্ণনা দিয়েছেন। রঙ (রঙিন জল) আর আবিরের সাথে পাঁচশ সুন্দরীর রমণীয় নৃত্যে হোলির মতিঝিল কেমন ঝিলমিলিয়ে উঠেছিল তার বর্ণনা অতি মনোহর।[৮৫] নবাব সিরাজউদৌল্লাহও কলকাতা জয় করে ফেরার পর হোলি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। খোদ সম্রাটের নাতি আজিম-উস-সানও হোলি খেলায় মেতে উঠতেন। তাঁর হোলি খেলার খবর গুপ্তচর মারফত আরঙ্গজেবের কানে পৌছলে তিনি বিদ্রুপ করে লিখলেন 'মাথায় গেরুয়া টুপি পরণে লাল উত্তরীয়, গোঁফ, দাড়ি রঙে ভর্তি, ছেচল্লিশ বছরে কি চমৎকারই না মানিয়েছে।[৮৬] মীরজাফরও হোলি উৎসবে যোগ দিতেন। শুধু মুসলমানেরাই যে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিতেন তাই নয়। হিন্দুরাও মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে নির্দ্বিধায় যোগ দিতেন। খোজা খিজিরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বেড়া উৎসব বা মহরম-এ হিন্দুদের যোগদান ছিল

৮২। দেবশ্রী দাশ— পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪-৩৭
৮৩। সত্যচরণ শাস্ত্রী— মহারাজা নন্দকুমার চরিত, পৃ: ১১০
৮৪। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— বন্দর কাশিমবাজার, পৃ: ২
৮৫। জে এন সরকার— বেঙ্গল নবাবস, দ্বিতীয় পুনমুদ্রন, কলকাতা, ১৯৭৮ পৃ: ৪৯
৮৬। শ্যামাপ্রসাদ বসু— পূর্বোক্ত পৃ: ১৩৫

স্বতস্ফূর্ত। পীরের দরগায় মানত বা সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হিন্দুদের খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য পীরের দরগা দেখা যায় এই দরগাগুলিও হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি সাধনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মহারাজ নন্দকুমারের জীবনীকার সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান একত্র বাস করাতে উভয়ের মধ্যে অনেক সময় জেতৃবিজেতৃভাব চলিয়া গিয়াছিল হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে ভাই, দাদা চাচা, মামা প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখে সমবেদন প্রকাশ করিয়া নির্বিবাদে সময় যাপন করিতেন। হিন্দুরা মুসলমানদিগের ভয় প্রযুক্ত উপর উপর ভালবাসা দেখাইতেন এরূপ নহে, কিন্তু তাঁহারা মুসলমানদিগের উৎসবে বিশেষরূপে যোগদান দিতেন, ধনবান্ হিন্দুর গৃহে মহরমের সময় অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাজিয়া প্রস্তুত হইত এবং মর্শিয়া গান শুনিবার জন্য অনেক মুসলমানও হিন্দুর গৃহে গমন করিতেন। এ সকল করিয়াও হিন্দু হৃদয় তৃপ্ত হইত না, তাঁহারা মুসলমানদিগের পীর আদি পূজ্য ব্যক্তিদিগের পূজা এবং কখনও বা স্বীয় নামের সহিত কিয়দংশ মুসলমানী নাম ধারণ করিতেন। মুসলমানরাও হিন্দুদিগকে বিজেতা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত দেখিতেন।'[৮৭]

এক মুর্শিদকুলী ছাড়া আর সকলেই হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলাকে অবশ্য সমসাময়িক ঐতিহাসকেরা অন্যভাবে চিত্রিত করেছেন। এমন একটা প্রচার আছে যে সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে তিতিবিরক্ত হয়েই নাকি তৎকালীন হিন্দু অভিজাতবর্গ এবং রাজা জমিদারেরা পলাশীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঐতিহাসিকেরা সিরাজউদ্দৌলাকে যে সব বাছা বাছা বিশেষণে অভিহিত করেছেন তা আগেই বলা হয়েছে। খুব সম্প্রতি অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী সিরাজের প্রতি এইসব বিশ্লেষণ প্রয়োগের পিছনে ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-এর দিকটা সামনে এনেছেন। তাঁর মতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ফারসী ও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সিরাজের চরিত্র কলঙ্কিত করেছেন। অবশ্য সিরাজ যে চপলমতি, নিষ্ঠুর! অত্যাচারী ও বেপরোয়া মানুষ ছিলেন শ্রীচৌধুরী অবশ্য তা অস্বীকার করেন নি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী 'সিরাজ চরিত্রের অন্ধকার দিক' সব বিবরণেই তাঁর নবাব হওয়ার আগেকার ঘটনা সম্বন্ধে। নবাব হওয়ার পর সিরাজ চরিত্রের নিন্দাসূচক কোনও প্রত্যক্ষ তথ্য বা নিদর্শন পাওয়া দুষ্কর।'[৮৮] একদা ভীষণ রকমের পানাসক্ত সিরাজ প্রিয়তম দাদুর মৃত্যুশয্যায় দেওয়া কথা রাখার জন্য জীবনে আর মদ্যপান করেননি একথা মনে রাখলে নবাব হওয়ার পরে তার পরিবর্তিত হওয়ার কথা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।

সিরাজের লাম্পট্য ও হৃদয়হীনতার কথা বহুপ্রচলিত হলেও তাঁর মহানুভবতার কথা সাধারণ্যে তেমনভাবে প্রচারিত নয়। তাঁর লাম্পট্য ও একই সঙ্গে মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায় একটি জনশ্রুতিতে। একবার সিরাজের অনুচরেরা তাঁর জন্য এক পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করে আনে। এর ফলে গ্রামের সমাজপতিরা সেই ব্রাহ্মণকে একঘরে করলে উন্মাদপ্রায় ব্রাহ্মণ মুর্শিদাবাদে এসে উপস্থিত হন। প্রতিদিন তাকে একস্থানে দেখতে পাওয়ায় সিরাজ তাকে তাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণ জানান যে তাঁর কন্যাহরণের জন্য গ্রামের লোকেরা তাকে একঘরে করায় তিনি মুর্শিদাবাদ এসেছেন। সিরাজ ভেবে পেলেন না যে অপহৃতা কন্যাটি অপহরণের

৮৭। সত্যচরণ শাস্ত্রী— পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৫
৮৮। সুশীল চৌধুরী— পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯-২৭

পর একবারও বাপের বাড়ি না যাওয়া সত্বেও তাকে একঘরে করার কারণ কি? তিনি ওই ব্রাহ্মণকে জাতে তোলার জন্য বাংলার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আহ্বান করে তাঁদের মত জানতে চান। ব্রাহ্মণের কোনও দোষ নাই সে জাতে উঠতে পারে এই বিধান দিলে সিরাজ তাদের যথোপযুক্ত পারিতোষিক ও সাম্মানিক দিয়ে বিদায় করেন। এ থেকে সিরাজ চরিত্রের কোমলতর দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।[৮৯]

মুসলমান রাজপুরুষদের হাতে হিন্দুদের অত্যাচারিত হওয়া বা হিন্দু রমণী অপহৃত হওয়া যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কমে এসেছিল তথাপি তা একেবারেই ঘটত না এমনটা বলা যায় না। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী লিখেছেন, 'মহিলা হরণকে চিরকালই 'নবাবী বা আমিরী' অত্যাচার মনে করা হয়েছে। কখনোই হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার বলে মনে করা হয় নাই তেমনই আবার বর্গীর হাঙ্গামার সময় হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণ অত্যাচারিতা হয়েছেন তখনও মুসলমান সমাজ এটাকে হিন্দুর অত্যাচার ভাবেন নাই।[৯০]

অষ্টাদশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একটি প্রতিপত্তিশালী হিন্দু অভিজাত শ্রেণী তথা হিন্দু জমিদারদের উদ্ভব।[৯১] রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এমনটা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব ছিল একথা বলাই বাহুল্যমাত্র। বহু ঐতিহাসিক ও লেখক অষ্টাদশ শতকের মুসলিম সমাজের চূড়ান্ত অধঃপতনের কথা বলেছেন। 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মুর্শিদাবাদের মুসলমান অভিজাতদের অধিকাংশের চরিত্রে সততা বলে কোনো বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল না। নবাব আলিবর্দীর সামরিক কর্মচারী মীর হাবিবের বিশ্বাসঘাতকতা (মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়) মীরজাফর কর্তৃক সেনাবিভাগের অর্থ তছরুপ, আলিবর্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, জার্মান বণিকদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ, ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গকে নিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অবশেষে বেনিয়া ও ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশকে বিক্রি করে দেওয়া ফৌজদার আতাউল্লাহ, মুস্তাফা খান, শামসের খান প্রভৃতি সেনাপতির বেইমানি, জৈনুদ্দিন কে হত্যা প্রভৃতি প্রমাণ করে মুসলমানদের চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতনের কথা।'[৯২] ড. আই এইচ কুরেসী স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'মুসলমান সম্প্রদায়ে বহু আগাছার জন্ম হয়েছিল, ধর্মের স্থান দখল করে কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় আনুগত্য স্বার্থপরতার নিকট আত্মসমর্পণ করে।'[৯৩] বিশিষ্ট পণ্ডিত কাজী আবদুল ওদুদ অষ্টাদশ শতাব্দীকে ভারতীয় মুসলমানের জন্য এক গভীর চেতনাহীনতার শতাব্দী বলে বর্ণনা করেছেন।[৯৪] মুতাক্ষরীণকার দুঃখ করে লিখেছেন ভারতীয় মুসলমানের রাজ্য গেল, ধনৈশ্বর্য গেল, সম্ভ্রম গেল কিন্তু এত বড় সর্বনাশ যে তার হলো সে-চেতনা তার জাগলো বহু দেরীতে— এমন সময়ে যখন কপালে করাঘাত করা ভিন্ন আর কিছু তার করবার নেই।

পলাশীর যুদ্ধে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ায় যে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হ'ল সমসাময়িক কালের সাধারণ মানুষ সেসব বুঝেছিল বলে মনে হয় না। আদার ব্যাপারী যেমন

৮৯। সত্যচরণ শাস্ত্রী— পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১

৯০। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— বন্দর কাশিমবাজার, পৃঃ ৭০

৯১। ড. এম এ রহিম— বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

৯২। খাজিম আহমেদ— নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, শারদ সংখ্যা ১৯৮৮

৯৩। উদ্ধৃত করেছেন খাজিম আহমেদ তাঁর পূর্বোক্ত লেখায়।

জাহাজের খবর রাখে না (ইনফরমেশন টেকনোলজির এই যুগে হয়তো রাখে, তবে আগে রাখত না) তেমনি সাধারণ হিন্দু মুসলমানও রাষ্ট্র বিপ্লবের খোঁজ রাখেনি। পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ী ক্লাইব যখন মুর্শিদাবাদে হাজির হন তখন যে জনতা শুধুমাত্র ইটপাথর ছুঁড়েই তাদের মেরে ফেলতে পারত একথা স্বীকার করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই। রজতকান্ত রায় লিখেছেন 'মোগল শাসক, অবাঙালি বণিক ও হিন্দু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে থেকে উদ্ভুত ষড়যন্ত্রের কলকাঠিতে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে গেল, রাষ্ট্রশক্তির বহির্ভূত সাধারণ লোকে তা নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে তাকিয়ে দেখে আবার নিজের নিজের কাজে মন দিল— চাষা লাঙ্গল ধরতে গেল, ফড়িয়া ফিরি করতে বেরোল, পোতদার কড়ি বিছিয়ে বসল, বোকা জোলাকে নিয়ে হাটের লোকে তাদের অভ্যস্ত রসিকতা করতে লাগল। এ সমস্ত কাজের ভিত্তি যে নড়ে গিয়ে জনজীবনে বিপুল বিপর্যয় দোরে এসে হাজির হয়েছে, সে বোধশক্তি মনসবদার জমিদার সওদাগরের ছিল না, জনতার কোথা থেকে আসবে?'[৯৫] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন 'এ যুগে রাষ্ট্রবিপ্লব সাধারণ মানুষকে একেবারেই স্পর্শ করত না। তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। কে ক্ষমতা পেলেন, কে ক্ষমতাচ্যুত হলেন এসব নিয়ে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কারিগর তাঁতি জোলা মাথা ঘামাত না।'[৯৬] নবাবী-রাজশক্তির প্রতি তাদের খুব আনুগত্য ছিল একথা যেমন সত্য নয় তেমন সত্য নয় যে তারা ফিরিঙ্গিদের পছন্দ করত। ফরাসী কুঠির কর্মচারীর সাক্ষ্য অনুযায়ী দেশীয় লোকেরা ফিরিঙ্গিদের 'বানচোত' বলে অভিহিত করত।[৯৭] অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাঙালিজীবনে দুর্যোগ বাড়তে থাকে। ১৭৩৭ থেকেই বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। মূল্যস্তর সর্বোচ্চসীমায় পৌছায় ১৭৫৩ সালে। এর আগে বাংলার সস্তাগণ্ডার বাজার প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। মুর্শিদকুলীর সময়ে টাকায় চার পাঁচ মন মোটা চাল পাওয়া যেত। একমন চিনির দাম চার টাকা, একমন তেল দু টাকা, ভালো ঘি সাড়ে দশ সের এক টাকা, এক মন মাখন সাড়ে চার টাকা। দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে মজুরির ব্যাপারটা মাথায় রাখলে বিষয়টি আরো প্রাঞ্জল হবে। ওই কালপর্বে দিনমজুরের দৈনিক মজুরী ১ পণ বারো গণ্ডা কড়ি। একজন কেরানীর মাসিক আয় ছিল চার টাকা ছয় আনা। পুলিশের দারোগার আয় চার টাকা, তাঁতির দেড় টাকা। একজন কুশলী কারিগরের দৈনিক আয় ছিল ১০ পয়সা।[৯৮] গোলাম হোসেন সলিমের সাক্ষ্যে জানা যায় যে সেই যুগে একজন লোক এক টাকা ব্যয় করে সারা মাস কালিয়া পোলাও খেতে পারত।[৯৯]

মুর্শিদকুলী নগদ টাকায় দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাতেন। রাজস্ব পাঠানোর পরই বাংলার বাজারে নগদ টাকার নিদারুণ অভাব দেখা দিত। টাকা সাধারণভাবে দুস্প্রাপ্য হলেও টাকার ক্রয়ক্ষমতা ছিল বেশী যদিও বেতন ও মজুরী ছিল খুবই কম। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ' এ ধরনের স্থিতিশীল, গতিহীন অর্থনীতিতে মানুষ খেতে পায় তবে আর্থিক অগ্রগতি ঘটে না। এরকম আর্থিক আবস্থার একটি বড় রকমের অসুবিধা হল অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চয়হীনতার জন্য দলে দলে সাধারণ মানুষ দারিদ্র ও মৃত্যুর

৯৪। কাজী আবদুল ওদুদ— বাংলার মুসলমানের কথা, কলকাতা, ২০০২ পৃঃ ৩১

৯৫। রজতকান্ত রায়— পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬

৯৬। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক-পলাশী বাংলা, পৃঃ১২৭।

৯৭। রজতকান্ত রায়— পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬

৯৮। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় — বাংলার আর্থিক ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী। পৃঃ ১৬০।

৯৯। গোলাম হোসেন সলিম— রিয়াজ-উস-সালাতিন, পৃঃ ২৮০-৮১

সম্মুখীন হয়। এরকমের আর্থিক অবস্থায় উৎপাদক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না। কৃষক ফসলের দাম পায় না এবং কারিগর তার শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না। ফলে উৎসাহের অভাবে অর্থনীতিতে মন্দা আসে।'[১০০]

আলীবর্দীর সময় থেকেই দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাজারে টাকার যোগান অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের ক্রয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে অর্থনীতির এই সূত্র মেনেই বাড়তে থাকে জিনিসপত্রের দাম। মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ল একই সঙ্গে। বর্গীর হামলাও বাংলার জিনিসপত্রের দাম বাড়ার অন্যতম কারণ। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাংলায় শুরু হল আর্থিক নিষ্কাশণ। বাংলার সম্পদ যেমন তেমন ভাবে লুটে তা স্বদেশে চালান করাই হয়ে দাঁড়াল কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের প্রধান লক্ষ্য। যত দ্রুত এবং যত বেশি সম্ভব লাভের আশায় কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির পাশাপাশি নিজেরাও একচেটিয়া ব্যবসা খুলে বসল।

১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করল। ক্লাইভ কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্‌কে লিখলেন 'দেওয়ানীর ফলে কোম্পানির যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির সমস্ত খরচ মিটিয়ে কোম্পানির ব্যবসার পুঁজিও সংগ্রহ করা যাবে।'[১০১] বাস্তবে হ'লও তাই। মাছের তেলে মাছ ভাজার এমন সুযোগ কোম্পানি লুফে নিল। আগে কোম্পানি পুঁজি হিসাবে বাংলায় সোনা রুপো নিয়ে আসত। এখন আর তার প্রয়োজন রইল না পরিবর্তে বাংলা থেকে সম্পদ চালান হতে থাকল ব্রিটেনে— সম্পদের সেই উল্টো স্রোতই বাংলায় বয়ে নিয়ে এল দুঃখ কষ্ট আর অনাহার, ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লোভে কোম্পানি জমিদারীকে নিলামে তুলল। বনেদী জমিদার, যাদের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল আত্মিক, তাদের বদলে জমিদারী পেলেন উঠতি বড়লোক একদল ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক মনোভাব থেকে সর্বোচ্চ দরে নিলামে জমিদারী কিনে এরা প্রথমেই মন দিলেন সুদে আসলে সেই টাকা তুলতে। বনেদী জমিদারেরা প্রজা বা রায়তদের বিপদ আপদে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। এদের সেসবের বালাই ছিল না। আমিলদারী ব্যবস্থা রায়তদের দুঃখ কষ্ট বাড়িয়ে তুলল।

দেশের সাধারণ মানুষের এই দুর্দিনে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের। হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবু একের পর এক জমিদারী কিনে চলেছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছলে বলে কলে কৌশলে দুহাতে উপার্জন করে চলেছেন। সে যুগের সকল জমিদারকে সব সময় কান্তবাবু আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে তুষ্ট রাখতে হত। তাদের সংগৃহীত উৎকোচ-এর সবটা হয়তো তাঁরা ভোগ করতে পারতেন না কিন্তু জমিদারদের কাছে এই সংকেত বার্তা পৌঁছাত যেত তাঁরাই সব। হেস্টিংসের ইমপিচমেণ্টের সময় এডমণ্ড বার্ক গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কে বলেছিলেন যে তাঁর নামে সমগ্র ভারতবর্ষ পাণ্ডুর হয়ে যেত। এর ন্যায় দুর্বৃত্ত, দুর্দান্ত, শঠ ও কুশলী দেশ আর কখনো প্রসব করেনি।[১০২]

অবর্ণনীয় অত্যাচারে সংগৃহীত সেই অর্থ গঙ্গাগোবিন্দ তথাকথিত সৎকার্যে (!) ব্যয় করেছেন। দেশের লোক যখন দু'বেলা দুমুঠো খেতে পারছে না তখন তিনি সেই যুগে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে

১০০। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাক-পলাশী বাংলা পৃ:৯৩।

১০১। ড. কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য— রাজা রামমোহন ঃ বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃ: ১৯

১০২। বার্কস ইমপিচমেণ্ট অব ওয়ারেন হেস্ট্রিংস, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৪, উদ্ধৃত করেছেন নিখিলনাথ তাঁর মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে, পৃ: ১৬৪

মাতৃশ্রাদ্ধ করেছেন।[১০৩] পৌত্রের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন স্বর্ণপত্র খোদাই করে। পুরাণ কথককে দান করছেন লক্ষ টাকা। বাস্তবিকই এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের সমাহার দেখা যায় গঙ্গাগোবিন্দের জীবনে।[১০৪]

১৭৬৯ সালে মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্ট রিচার্ড বীচার লিখছেন, 'ইংরেজ মাত্রেরই এটা মনে করতে কষ্ট হবে যে কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করার পর এই দেশের লোকের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। কিন্তু এটা যে সত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সুন্দর দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের আমলেও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ ছিল কিন্তু যখন এর শাসনভার প্রধানত ইংরেজদের হাতে এল তখন থেকেই এদেশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে।'[১০৪ক]

এই অবর্ণনীয় শোষণ লুণ্ঠনের সঙ্গে যোগ হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলা বিহারের অভূতপূর্ব অনাবৃষ্টি খরা ও শস্যহানি ডেকে আনল ভয়ংকর বিপর্যয়— ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

মুর্শিদাবাদের যে সস্তাগণ্ডার বাজার প্রবাদতুল্য ছিল তাতে মন্বন্তরে আগুনের ছোঁয়া লাগল। চল্লিশের দশক থেকে মূল্যবৃদ্ধির যে ছোঁয়াচ লেগেছিল তা চরমে উঠল দুর্ভিক্ষের সময়। ১৭৭০ সালের জুন মাসে মুর্শিদাবাদে চালের দর ছিল টাকায় ৬-৭ সের। পরের মাসেই চালের দর বেড়ে হয় টাকায় ৩ সের। স্বাভাবিকের সময় ওই সময় (জুলাই মাসে) চাল পাওয়া যেত টাকায় ২৮ সের অন্যান্য খাদ্যশস্য টাকায় ৪২-৪৫ সের।[১০৫] ১৭৭০ সালের প্রথম দিকেই নায়েব নাজিম রেজা খাঁ লিখছেন 'এতদিন শস্যাভাব ছিল কিন্তু এ বছর তা অমিল। এতদিন দৈনিক হাজার হাজার লোক মারা যেত এখন লাখে লাখে লোক মরছে।'

চার্লস গ্রান্ট নামে মন্বন্তরের এক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, 'মুর্শিদাবাদে প্রতিদিন ৭৭ হাজার লোককে খাওয়ানো হ'ত। ... কিন্তু এই সুউদ্যোগ বিনাশের প্রকৃত চিত্র ঢাকতে পারে না। রাজধানীতে রাস্তাঘাট থেকে মৃতদেহ সরানোর জন্য একদল লোককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। শত শত মৃতদেহ ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেবার পর তারা নিজেরাও মরেছে। একটা সময় শিয়াল কুকুর আর শকুনিরাই ছিল একমাত্র রাস্তা পরিষ্কারক। পূতিগন্ধময় বাতাস ও আর্তের কান্না এড়িয়ে চলা ছিল অসম্ভব। মানুষ যে শুধু নিষিদ্ধ পশুর মাংসই খেয়েছে তাই নয় শিশুরা তাদের মৃত পিতামাতাকে খেয়েছে মা খেয়েছে মৃত সন্তানকে।[১০৬] খাদ্যাভাবে মানুষ যে নরখাদক হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ রয়েছে বেঙ্গল সিলেক্ট কমিটির প্রসিডিংসেও।[১০৭]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামীণ কারিগর ও হস্তশিল্পীরা, তাঁতি, জোলা, রেশমশিল্পী, গুটি পোকার পালকেরা এই দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়। ধ্বংস হয় স্বর্ণকার, চুনের মজুর, লবণ উৎপাদকদের মতো পণ্য উৎপাদনকারীরাও। দক্ষ হস্তশিল্পীদের মৃত্যুতে শিল্পসামগ্রীর গুণগত মানের অবনমন ঘটে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বিপুল লোকক্ষয়ের ফলে চাষযোগ্য জমির

১০৪। নিখিলনাথ রায়— মুর্শিদাবাদ কাহিনী। পৃ: ৩৩৭

১০৪ক। ড. কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য— রাজা রামমোহন ঃ বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃ: ২১

১০৫। প্রকাশ দাস বিশ্বাস— ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও মুর্শিদাবাদ, শারদীয় জলসিড়ি ১৪১০, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০০৩।

১০৬। খান মহম্মদ মহসীন— এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশন ঃ মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫-৯৩, পৃ: ২০১। নিখিল সুর— ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, কলকাতা, ১৯৮২ রজতকান্ত রায়— পূর্বোক্ত পৃ: ২৭৬।

১০৭। এন জে চৌধুরী— কার্টিয়ার গভর্ণর অব বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৭০ পৃ: ৩৮

তুলনায় চাষ করার লোক কমে যায়। মন্বন্তরে বিপুল সংখ্যায় মারা যায় গৃহপালিত গবাদি পশুরাও। ফলে চাষিরা অন্যরকম বিপদেরও মুখোমুখি হয়। বহু আবাদী জমি পরিণত হয় জঙ্গলে। মৃত বা পলাতক কৃষকদের বকেয়া কর বা 'নাজাই' চাপানো হয় জীবিত কৃষকদের কাঁধে। ফলে খোদকস্ত বা স্থায়ী রায়তেরা স্বেচ্ছায় নতুন জমি বন্দোবস্ত নিয়ে পাইকস্ত (অস্থায়ী) রায়তে পরিণত হয়। দেখা দেয় অন্য বিপদ বিভিন্ন অঞ্চলের পলাতক কৃষকেরা দস্যুদলে যোগ দিয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করে। শুরু হয় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দলবদ্ধ আক্রমন ও লুটপাটের ঘটনা।

অন্যদিকে দূর্ভিক্ষের সময় পুত্র, কন্যা, স্ত্রী বিক্রয় এমনকি আত্মবিক্রয়ের ঘটনা এমন বেড়ে যায় যে ক্রেতা পাওয়াই দূর্লভ হয়ে ওঠে। এর ফলে পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা শিথিল হয়ে পড়ে। অনুমান করা যায় অনাথ বা জাত খোয়ানো ভদ্রঘরের মেয়েরাও অন্ধকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। দূর্ভিক্ষের প্রবল অভিঘাতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা অভূতপূর্ব তো বটেই একই সাথে আকল্পনীয়ও।

অষ্টাদশ শতকের মুর্শিদাবাদবাসী তথা বাঙালির সমাজজীবনের চারটি বড় ঘটনা হ'ল বর্গীর হাঙ্গামা, পলাশীর যুদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই চারটি ঘটনার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল বাঙালি জীবনে। যে বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়ে ভারতব্যাপী নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাংলায় একটি দৃঢ়তর শাসনব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল চারটি দশকে যেতে না যেতেই তা টাল খায় বর্গী আক্রমণের ঘটনায়। খুন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটতরাজের সেই দশক কাটতে না কাটতেই এসে পড়ল পলাশীর যুদ্ধ। প্রায় নিঃশব্দে শাসনক্ষমতা চলে গেল ইংরেজদের হাতে। ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের দেড় দশক কাটতে না কাটতেই এল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। না খেয়ে, অখাদ্য কুখাদ্য, এমনকি নরমাংশ খেয়েও বাঁচতে চেয়েছে নিঃস্ব বাঙালি। তবু এক তৃতীয়াংশ বাঙালির প্রাণ গেল সেই বিপর্যয়ে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এল বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়। মূল্যবৃদ্ধির সেই যে ছোয়া লাগল তা আর কখনো নিম্নমুখী হ'লনা। ১৭৯৩ সালে এল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফরমান। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হল বাঙালির চোখের জলে।

১০৮। প্রকাশ দাস বিশ্বাস— পূর্বোক্ত।

মুর্শিদাবাদ জেলায় সতীদাহের ঘটনা ও সংখ্যার পর্যালোচনা

আশীষ কুমার মণ্ডল

সতীদাহের ঐতিহাসিক বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলায় সতীদাহ অনেক কম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, সে সময়ে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন থাকতেও কেনই বা মুর্শিদাবাদ জেলায় সারা বছরে দু'চারজনের বেশি সতী হতে এগিয়ে আসত না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মনে হয় যে, সে যুগে অর্থাৎ নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী। স্বভাবত কারণে এখানে মুসলিম প্রাধান্য ছিল বেশি, তুলনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্য ছিল অতি নগণ্য। সেই কারণে বাংলায় সতীদাহ প্রথার প্রচলন থাকতেও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সতীর সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। সেই অল্প সংখ্যক ঘটনার কথা আলোচনা করার পূর্বে এই নিবন্ধের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সতীদাহের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে সামান্য কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি।

সতীদাহ প্রথাকে বর্তমান যুগে বলা চলে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। প্রাচীনকালে সভ্যতা বিকাশের এক স্তরে সমাজে নারীর মর্যাদা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সে যুগের নারীগণ ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকতে পারতেন। সুতরাং শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অসুবিধা হত না। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক পর্যন্ত ছেলেদের মত মেয়েদের নির্দিষ্ট সময়ে উপনয়ন হত।[১] এরপর তারা বেদ পাঠের সুযোগ পেতেন। সে জন্য বেদের যুগে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করতে হত।[২] এর ফলে তাদের পক্ষে উপযুক্ত পাত্র পেতে কোনও অসুবিধা হত না। বেদের পূর্বে বিধবা নারীদের বিবাহের প্রচলন ছিল। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত ভারতীয় নারীদের সহমরণে যাওয়ার প্রচলন ছিল না। সে সময় বিধবা নারীদের সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল যথা— (১) বৈধব্য জীবন যাপন করা (২) দেওয়রকে অথবা (৩) অন্য কাউকে বিয়ে করা।[৩] এমন কি অথর্ব বেদেও বিধবা মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহের খবর পাওয়া যায়।

কিন্তু কালপ্রবাহে, সভ্যতার ধারার আরেক পর্যায়ে, যখন সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদে গিয়ে পৌঁছাল, তখন দেখা গেল শাস্ত্রীয় বিধানে নারী অন্তঃপুরবাসিনীতে পরিণত হল। তখন থেকেই হিন্দু সমাজ নারী জাতি সম্পর্কে কোনরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব পোষণ করত না। ফলে নারীর মর্যাদা দিনে দিনে হ্রাস পেল।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

১, ২, ৩। A. S. Altekar– "The Position of women in Hindu civilization."
বিনয়ভূষণ রায়— ''বাংলায় সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুল্যায়ণ'', সাহিত্য শ্রী, কলিকাতা—১৯৮৬

কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই প্রথার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে দেখব, মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, অথচ ইংরেজ শাসন তখনও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, দেশের সর্বত্র অরাজকতা, শান্তিশৃঙ্খলার প্রচণ্ড অভাব, জনগণকে সীমাহীন দারিদ্র গ্রাস করেছে, প্রজাদের ওপর জমিদার অথবা তার প্রতিনিধিদের অসহনীয় অত্যাচার। এ সবের ফলে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা মূল্যবোধে এল ভাঙন, সাধারণের জীবনে নেমে এল এক ভয়াবহ শূন্যতা। একদিকে যেমন ছিল অপরিমিত বিলাসব্যাসন মত্ততা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের শোচনীয় দুর্গতি এই ছিল বাংলার সাধারণ অবস্থা। সামাজিক দিক দিয়ে ভারসাম্যচ্যুত এমন এক অবস্থায় প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মধ্যে নানা প্রকার বিকৃতি প্রবেশ করল। ধর্মের নামে বিকৃত আমোদ-প্রমোদ, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি দেখা দিল। তৎকালীন সমাজপতিগণ আপন আপন স্বার্থের জন্য ভাঙন ধরা সমাজের ভাঙন রোধের প্রচেষ্টায় পদে পদে মানুষকে (বিশেষভাবে নারী সমাজকে) নানারূপ নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কৌলীন্যপ্রথা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি এই সময় সামাজিক জীবনে শ্বাসরোধকারী হয়ে দাঁড়াল। শিশুকালে বিবাহ, স্বামীর বয়সের কোনও মাপকাঠি নাই। স্বামী মারা গেলে তৎকালীন শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী সেই স্ত্রীকেও সহমরণে যেতে হবে। তা সে ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক। পুনর্বিবাহের অধিকার তাদের ছিল না। অবশ্য সকল বিধবাকেই যে সহমরণে যেতে হত এমন নয়। যেমন, অন্তঃসত্তা রমণী; ঋতুকাল অবস্থায়, শিশু সন্তান থাকলে অথবা নাবালক অবস্থায় থাকলে, এই সব বিধবা নারীদের সহমরণে যেতে হত না।[৪] কিন্তু তাহলে কি হবে, এই সব নারীদের পরবর্তী জীবন হত অত্যন্ত কঠোর এবং ভয়াবহ দুঃখের। তৎকালীন হিন্দু সমাজ এই সমস্ত অবহেলিত অবলা-নারীদের কথা মোটেই চিন্তা করেনি। সসম্মানে জীবনধারণের পথ এদের সামনে খোলা থাকত না। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে এমন লোক ছিলেন, যাঁরা জ্ঞানীগুণী হয়েও সতীদাহ প্রথাকে সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

সতী, সতীদাহ, সহমরণ, সহগমন, অনুগমন প্রভৃতি শব্দগুলির অঙ্গে কেমন যেন একটা ভয় মিশ্রিত শিহরণ আজও লুকিয়ে আছে। সেই বীভৎস নারকীয় দৃশ্য এ যুগের মানুষ আমরা কল্পনাও করতে পারব না। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জলজ্যান্ত এক বা একাধিক রমণী আগুনের লেলিহান শিখায় যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ছটফট করে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, কত কষ্টেই না তাদের প্রাণবায়ু নির্গত হচ্ছে, উঃ সেই বীভৎস লোমহর্ষক নারকীয় দৃশ্যের কথা চিন্তা করলে আজও সকলে ভয়ে শিউরে ওঠেন।

সতীদাহ প্রথার ধর্মীয় দিকটি যাই থাকুক না কেন, প্রকারান্তরে এই বীভৎস প্রথা যে কৌশলে অবাধে নারীহত্যা বা নারীবলির নামান্তর এ কথা বলাই বাহুল্য। দগ্‌দগে দূষিত ঘায়ের মত এই জঘন্য প্রথা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের সমাজকে কলুষিত করেছিল। কত যুগ যুগান্তর ধরে এই রাক্ষসী প্রথা কত কোটি কোটি বালিকা, যুবতী, পৌঢ়া এমনকি অতি বৃদ্ধাকে পর্যন্ত কবলিত করে হিন্দুর সমাজবক্ষে জ্বালাময়ী চিতাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে হিন্দু সমাজ দগ্ধ করে আসছিল তার ইয়ত্তা নাই। সুসভ্য ইংরেজরাজ এ দেশে যে সকল কল্যাণকর বিধি-বিধানের প্রবর্তন করেছেন, আমাদের মনে হয় এই সতীদাহ প্রথা নিবারণ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এটাই অনুমিত হয় যে, মানুষের মধ্যে যখন মানবীয় বোধের অভাব ঘটে, তখনই সম্ভবতঃ সমাজে ধর্মের নামে কিছু কিছু কলঙ্কিত আচরণ চরিতার্থ

৪। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়— "বাংলার নারী জাগরণ"— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা-১৩৫২

হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে এই রকম কতকগুলি অমানবিক অন্ধ কুসংস্কারের দাসত্ব যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির কাছে মর্মান্তিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এই সতীদাহ প্রথা যে কবে কোনও লগ্নে ভারতবর্ষের প্রচলিত হয়েছিল কিম্বা তার উৎপত্তি স্থান কোথায়, তা স্থির নির্ধারণ করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে বেদে এই প্রথার উল্লেখ কোথাও নেই। কেবল মাত্র ঋগ্বেদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'ইমা নারীর বিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রাবোহনমা বাঃ সুরত্নাঃ আরোহন্তু জনয়োযোনীমগ্নে॥[৫]

শ্লোকটির অর্থ হলোঃ— এই সব নারীগণ যাঁরা অবিধবা ও সুপত্নী তাঁরা বৈধব্য ক্লেশ ভোগাপেক্ষা অঞ্জন ও ঘৃতাদি নিয়ে চিতায় প্রবেশ করুক। অশ্রুশূন্য ও দুঃখশূন্য হয়ে সেই নারীগণ উত্তম রত্নালঙ্কারে ভূষিতাহয়ে অগ্নিমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করুক।

আবার অন্যদিকে স্মৃতিকারগণের মধ্যে মনুই সর্বপ্রধান। মনু প্রণীত মানব ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় সহমরণের কোন উল্লেখ নাই। মনু সংহিতায় বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালনেরই ব্যবস্থা আছে। মনু সংহিতার মাধ্যমে যোষিধর্মকথন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথ্গ যজ্ঞো না ব্রতং নাপ্যুপোষিত্ম।
পতিং শুশ্রুযতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পানি-গ্রাহস্য সাধবী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোক মভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদ্‌প্রিয়ম॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহীয়াৎ পতৌ প্রেতে পরস্য তু॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যা ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্খান্তী তমনুত্তমম্‌॥
অনেকানি সহস্রানি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্‌।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্‌॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥[৬]

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকগণের স্বামী ব্যতীত পৃথক যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রত বা উপবাস নাই। একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীগণ স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃতই হোক, স্বাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামা হয়ে কখনও তাঁর অপ্রিয় আচরণ করবেন না। পতি মৃত হলে পত্নী বরং শুভ পুষ্প-মূল-ফলের দ্বারা দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি কখনও পতি বিনা পরপুরুষের নাম উচ্চারণও করবেন না। যতদিন না আপনার মৃত্যু হয় ততদিন তিনি কষ্ট সহ্য করে এবং নিয়মাচারিণী হয়ে মধু-মাংস-মৈথুনাদি বর্জনপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বীরমণীর যে অনুত্তম পরম ধর্ম তা পালনেই যত্নবতী হবেন। হাজার হাজার ব্রহ্মচারী কুমার ব্রাহ্মণগণ সন্তান উৎপাদন না করেও নিজ নিজ ব্রহ্মচর্য্য বলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেছেন, সেই সমস্ত ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হলেও সাধবী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গে গমণ করেন।

এইরূপে দেখা যায় যে, ত্রিকালদর্শী মহর্ষি মনু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্যই ব্যবস্থা করেছেন।

৫। ঋগ্বেদ সংহিতা — দশম মণ্ডল, অষ্টাদশ সুক্ত, সপ্তম।
৬। মনুসংহিতা — পঞ্চম অধ্যায়, ১৫৫-১৬০ ম শ্লোক।

আবার মনুকে সমর্থন করে বৃহস্পতি বলেছেন— "মন্বর্থ বিপরিতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।" অর্থাৎ, যে স্মৃতি মনুর বিধানে বিপরীত, সে স্মৃতি প্রশস্ত নয়। তিনি আরও বলেছেন— বিশেষতঃ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা জীবনের ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং ব্রহ্মলাভের হেতু যে এই দেহ, একে কোনও ক্রমেই সেচ্ছায় নাশ করা বিধেয় নয়। কিন্তু স্মরণ, কীর্তন, মনন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বুলাদি বর্জনপূর্বক একনিষ্ঠ হয়ে স্বামীরূপ নারায়ণের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করাই বিধবার প্রশস্ততর ধর্ম।

পরবর্তী সময়ে এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে তৎকালীন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতগণ বহু রকম মত পোষণ করে থাকেন, যেমন—

১) স্বামীর প্রতি আন্তরিক অনুরক্তি।

২) আবহমানকাল ধরে প্রচলিত দেশগত বা বংশগত আচরিত প্রথা।

৩) প্রাতঃস্মরণীয়া সতী স্বাধ্বীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করার যশঃস্পৃহা।

৪) জীবকে ক্ষণভঙ্গুর বলে হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস, আর সেই জন্যই বিধবা রমণী তাঁর জীবনের কোনও মমতাবোধ করেন না।

৫) সে যুগের হিন্দু রমণীগণ আপন স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করত, সেই হেতু শাস্তির জন্য সহগমন প্রথা দ্বারা সেই ভীষণ হত্যালীলা বন্ধ করতে হয়েছিল।

৬) মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ বিধবার প্রাপ্য উত্তরাধিকার হস্তগত করবার জন্যই সহগমন প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

৭) হিন্দু রমণীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য অবস্থায় যে অসহ্য দুঃখকষ্টের মধ্যে পতিত হয়, সেই দুঃখ কষ্ট এবং দৈন্যতার হাত থেকে অব্যহতি পাওয়ার অভিলাষ হেতু এই প্রথার উৎপত্তি।

৮) স্বামীকে নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে চির-সহবাস-সুখ লাভ করবার প্রাণগত ইচ্ছা থেকে এই প্রথার উৎপত্তি। —ইত্যাদি ইত্যাদি।

উক্ত কারণগুলি থেকে এই ভীষণ প্রথার উৎপত্তি স্বীকার করা অসম্ভব। আমাদের মনে হয় এটি একটি অসভ্য প্রথা থেকে উৎপত্তি। কারণ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখা গেছে যে, প্রাচীনকালে অধিকাংশ অসভ্য অনার্য জাতির মধ্যে কোনও পুরুষ মারা গেলে সেই মৃত দেহের সঙ্গে তার প্রিয় দ্রব্যসকল এমনকি তার স্ত্রী ও বাঁদী প্রভৃতিকেও কবরস্থ করা হত, কারণ তাদের মধ্যে সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল যে, সেই পুরুষ 'পরলোকে' গিয়ে ওই সকল দ্রব্যসামগ্রী এবং স্ত্রী ও বাঁদীদের উপভোগ করতে পারবে।[৭] এর থেকে সুস্পষ্টরূপে ধারণা করা যেতে পারে যে, সহগমন প্রথার উৎপত্তি বলপ্রয়োগপূর্বক পুরুষগণের স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আর্যদের বসতি অতি সামান্য ছিল। বেশিরভাগই ছিল হাড়ী, বাগদী, পোদ প্রভৃতি অনার্য জাতির বাস। ফলে অনার্য প্রভাব বেশি থাকায় ক্রমে ক্রমে অনার্য প্রথা, তার ভাবধারা এবং তাদের আচার আচরণ ভারতে আর্য উপনিবেশের মধ্যে প্রচলিত হল, তখন আর্যগণ একে ধর্মের তেজোময় আবরণে আচ্ছাদিত করে সমাজের চোখে এর এক লোভনীয় আকার স্থাপন করল। তার উপর সে সময়ে ভারতে এবং বঙ্গের নানাস্থানে ডাকাতের খুব উপদ্রব ছিল। সুতরাং ডাকাত প্রভৃতির উপদ্রবে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা কঠিন হওয়াতে এই প্রথার কতকাংশে উপকারিতাও বর্ণিত হত। আবার অন্যদিকে মুসলমান সম্রাটদের ভয়ে এই সহগমন প্রথারই রূপান্তরে 'জহরব্রত' সম্পাদন রাজপুত রমণীদের প্রিয় কাজ হল।[৮] এর ফলে সতীত্ব রক্ষার সহায় হিসাবে সহগমন প্রথা, কি নারী কি পুরুষ সকলের চোখে ক্রমে ক্রমে কেবল

৭। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর — "দ্বারকানাথ ঠাকুর"— রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১৩৭৬

সয়ে গেল তা নয়, ধর্মের অনুমোদনও পেল। এই অবস্থায় আমাদের সাগর-সমান বিস্তৃত শাস্ত্রের মধ্যে এর অনুকূল প্রমাণ বের করা স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কাজ হয়নি। কে জানত যে ভবিষ্যতে তাঁদের বিরুদ্ধে এই প্রমাণের ভ্রান্তি ঘোষিত হবে এবং এভাবে স্ত্রীলোকের মৃত্যু নিবারণের জন্য এতবড় একটা চেষ্টা হবে!

যাই হোক, এই রকম অবস্থায় ধনী ব্যক্তিগণ দেখলেন যে বিধবা রমণীগণ সহগমন করলে একদিকে যেমন তাদের পরিবার সতীর মাহাত্ম্যে লোকচক্ষে সম্মান আকর্ষণ করবে, বিধবা রমণীগণের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায়, বিধবারাও (অবশ্য সকলে নয়) স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনদের নিকটে বিষয়সূত্রে সাংসারিক জীবনে যে কষ্ট পেত, সেই সব ভয়াবহ কষ্ট-যন্ত্রণার কথা স্মরণ করে মৃত্যুকেই 'শ্রেয়জ্ঞান' করত এবং সেই সঙ্গে চিরকাল সতী নাম পাবার মোহে অন্ধ বিশ্বাসে মৃত স্বামীর সঙ্গে সহগমন প্রার্থনা করত। তবে যে সকল বিধবাগণ একবার সহগমনের জন্য সঙ্কল্প করতেন তাদের পক্ষে তা পুনরায় অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল, তখন আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলে মিলে প্রয়োজন বোধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত বোধ করতেন না। একথা সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণ এবং মহাত্মা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীগণও একবাক্যে স্বীকার করেছেন। যাইহোক, এইভাবে ক্রমে ক্রমে নানাদিক থেকে চাপের ফলে সহগমন প্রথা সমাজের বুকে বহুদিন স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল।

পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, বল্লাল সেনের আমলে ব্রাহ্মণগণের গুণানুসারে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন হয়।[৯] তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ পৌরোহিত্য অথবা জমিদারী কিম্বা চাকরি করেই জীবনধারণ করতেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই খারাপ ছিল না। তাই ইচ্ছা করলে সে যুগে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ তৎকালীন ধর্মীয় আইনসংগত ভাবে একের অধিক বিবাহ করতে পারতেন। এই কৌলীন্য প্রথা এবং সতীদাহ প্রথা একই সময়ে প্রচলিত থাকার ফলে তৎকালীন বাংলাদেশের নারী জাতির দুর্ভোগ ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল। কারণ একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তার বহু পত্নীকেও সহমরণে যেতে হত।

স্বেচ্ছায় যে সহমরণ ছিল না এমন নয়। তবে অধিকাংশ স্থানে প্রকারান্তরে বলপ্রয়োগে সহমরণের ব্যবস্থা হলেও স্বেচ্ছাতেও সহমরণের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। অবশ্য এর মূলে ছিল সেই সহজাত কুসংস্কার। কারণ বলতে গেলে বলতে হয়, প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ বিভিন্নভাবে এই কুসংস্কার সৃষ্টির সহায়তা করেছিল। বাল্যবিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা নিবারণ এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণগণ ভগবানের সমতুল্য হওয়ায় স্বাধীন চিন্তার স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়ে সমাজে কুসংস্কারের প্রচলন শুরু হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ সেই কুসংস্কারকে এক প্রকার ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত করে সমাজের হৃদয়কে 'বিমুগ্ধ' করে ফেলেছিল। সেই হেতু মৃত স্বামীর রমণীগণ আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাকেই প্রকৃত 'ধর্ম' বলে বিবেচনা করেছিল। এই কারণে সে যুগে অনেক পতিপ্রেম প্রবণ ধর্মনিষ্ঠ স্ত্রী লোককে স্বেচ্ছায় সহরমণে প্রাণবিসর্জন দিতে দেখা গেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এইরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি—

মুর্শিদাবাদ জেলায় কাশিমবাজার ছিল প্রধান বন্দর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম স্থান। ভারতের নানা স্থান থেকে ধনী ব্যবসায়ী এখানে এসেছিল ব্যবসা করতে। রামচন্দ্র পণ্ডিত নামে এক ধনী মহারাষ্ট্রীয় বণিক কাশিমবাজারে মারা যান। তিনি মারা গেলে তার সঙ্গে তার আঠার বছরের যুবতী স্ত্রীকে সহমরণে যেতে দেখেছিলেন মিষ্টার হলওয়েল। প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েল

৮। পূর্ববৎ। ৯। রমেশচন্দ্র মজুমদার — ''বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র''— ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা-জুন, ১৯৭৩

তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছে—

"With what a dignity and undaunted countenance she set fire to the pile the last time, and assumed her seat, can only be conceived, for words cannot convey a just idea of her."[১০]

প্রত্যক্ষদর্শী মিষ্টার হলওয়েল উক্ত ঘটনার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই বিবরণী পাঠে জানা যায় যে— সে সময়ে মহারাষ্ট্র থেকে রামচন্দ্র পণ্ডিত নামে একধনী যুবক ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাশিমবাজারে আগমন করেন এবং কাশিমবাজারে অবস্থিত ইংরেজ কুঠির সামনে বসতি স্থাপন করেন। সে সময়ে কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ হিসাবে ছিলেন স্যার ফ্র্যান্সিস রাসেল। তিনি ও তার পত্নী লেডি রাসেল এবং পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ মিস্টার হলওয়েলও সেই কুঠিতে অবস্থান করেছেন।

১৭৪৩ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভোর পাঁচটার সময় রামচন্দ্র পণ্ডিত হঠাৎ মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে আর যুবতী স্ত্রী ব্রাহ্মণগণের নিকট সহগমণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। অথচ তার নাবালক নাবালিকা ২টি মেয়ে ও ১টি ছেলে বর্তমান, বড়টি বয়স খুব জোর চার বছর। এমতাবস্থায় সতী হওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

যাই হোক ব্যবসায়ীসূত্রে কাশিমবাজার অঞ্চলে রামচন্দ্র পণ্ডিতের এবং তার পরিবারের খুব নামডাক ছিল। সেই সুবাদে মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ দলে দলে তার বাড়িতে হাজির হল। বণিক পত্নীর সঙ্কল্পের কথা শুনে তারা তো অবাক। তারা তাকে অনেক বোঝালেন কিন্তু বণিক পত্নী তার সঙ্কল্প থেকে একটুও সরে দাঁড়ালেন না। ক্রমে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লেডি রাসেল বণিক পত্নীর সহমরণের সঙ্কল্পের কথা শুনে চমকে উঠলেন এবং বেশ কয়েকবার লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি কেবল একজন স্ত্রী-ই নন, তিনি সন্তানের জননীও। অতএব সেই সব সন্তানদের প্রতি তার অবশ্যই একটা কর্তব্য আছে। আর আগুনে পুড়ে মরাটা খুব যে সহজ ব্যাপার তা নয়। শান্তভাবে বণিক পত্নী লেডি রাসেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন— "কি নিয়ে বাঁচব আমি বলতে পারেন? বাঁচার মতো আমার তো আর কিছুই রইল না, দয়া করে তিনি যেন আমার ছেলেমেয়েদের একটু দেখেন।"

অন্যদিকে বণিক পত্নীকে ভয় দেখানোর জন্য যখন আগুনে পুড়ে মরার যন্ত্রণার কথা বলা হল, তখন বণিক পত্নী শান্তভাবে জ্বলন্ত আগুনে আঙুল পুড়িয়ে ক্লেশের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণ করে দেখালেন। এই সময় যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র তার চোখে মুখে ফুটে ওঠেনি। এরপর আরও প্রমাণ দেখানোর জন্য বণিক পত্নী এক হাতে খানিকটা জ্বলন্ত আগুন নিয়ে অন্য হাতের তালুর ওপর রেখে তাতে ধূপ ছিটিয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের সুবাসিত করল। নিরুপায় হয়ে তখন তারা পুনরায় তার শিশু সন্তানদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করালেন। তার উত্তরেও বণিক পত্নী বললেন— "যিনি এদের প্রাণ দান করেছেন, তিনিই এদের আহার দেবেন।" তাতেও কোন ফল হল না দেখে, বাধ্য হয়ে তারা তাদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তারা দৃঢ় ভাবে জানালেন কোন মতেই তাকে সতী হবার অনুমতি দেবেন না। একথা শুনে ক্ষনিকের জন্য তার মন সংশয়ে ভরে গিয়েছিল কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়ে বণিক পত্নী বলেছিলেন— "মৃত্যু আমার হাতের মুঠোয়, যদি তাকে বাধা দেওয়া হয়, তবে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন।" সমবেত আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্যরা তার দৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন এবং

১০। J.Z. Holwell– "Interesting Historical Events"– Part II- Londan, 1767

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। অগত্য ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবরা এবং উপস্থিত মুসলমান রাজকর্মচারীগণ বাধা দেওয়া বৃথা বিবেচনা করে অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন।

পরদিন সকালে রামচন্দ্র পণ্ডিতের মৃতদেহ নদীর ধারে (কাটি গঙ্গা) নিয়ে আসা হল। বেলা দশটার সময় বণিক পত্নীও সেখানে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে তিন প্রধান ব্রাহ্মণ, তার শিশু সন্তানগণ, বাবা-মা, অন্যান্য আত্মীয়গণ এবং অগণিত সাধারণ জনতা।

এদিকে চিতা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ফৌজদারের কাছ থেকে তখনও অনুমতি পত্র আসেনি। বণিক পত্নী নদীতে স্নান করে ব্রাহ্মণদের সম্মুখে করজোড়ে প্রার্থনায় যোগ দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বেলা একটার পর মুর্শিদাবাদের ফৌজদার হোসেন খাঁর কাছ থেকে অনুমতিপত্র এসে হাজির হল। বণিক পত্নী স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছেন কিনা তা দেখার জন্য একজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী অনুমতি পত্রের সাথে হাজির হল।

অনুমতি পত্র এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে বণিক পত্নী উঠে তার বাবা-মা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা সময় অতিবাহিত করার পর দৃঢ়চিত্তে নিজের চুরি-বালা ও অন্যান্য পরিধেয় অলংকার সব খুলে একটা কাপড়ে বাঁধলেন। তার এক আত্মীয় সেটিকে চিতার একপাশে রেখে এলেন।

এদিকে বণিকের মৃতদেহ চিতার ওপর শোয়ানো হয়েছে। অন্যদিকে বণিক পত্নীও প্রস্তুত। চিতার এককোণে সামান্য একটু আগুন জ্বেলে সেখানে প্রধান ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের জন্য কয়েক মিনিট সময় অতিবাহিত করলেন। প্রথম ব্রাহ্মণ একটা বেল পাতায় নানা জিনিস নিয়ে তার হাতে দিলে, বণিক পত্নী সেটাকে আগুনে নিক্ষেপ করে, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের দেওয়া আর একটি বেল পাতা বণিক পত্নী আগুনের ওপর ধরার পরে ব্রাহ্মণ তিনবার তার ওপর ঘি ছিটিয়ে দিলেন, পাতা থেকে ঘি ঝরে আগুনের ওপর পড়ল। এবার তৃতীয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অংশবিশেষ তাকে পড়ে শুনিয়ে কিছু প্রশ্ন করলে বণিক পত্নী শান্তভাবে পবিত্রমুখে তার জবাব দিলেন। ঠিক এই সময় এত গোলমাল হচ্ছিল যে বণিক পত্নী কি যে বললেন, খুব কাছে থেকেও তা শোনা যাচ্ছিল না। যা হোক, এই সব অনুষ্ঠান শেষ হলে ব্রাহ্মণদের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে তিনবার প্রসন্নমুখে বণিক পত্নী মৃত স্বামীর চিতা প্রদক্ষিণ করলেন।

এরপর জাগতিক দিক থেকে বিদায় নেবার পালা উপস্থিত হল। প্রথমে শিশু-সন্তানদের কাছ থেকে, তারপর একে একে বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শেষ হলে একজন ব্রাহ্মণ একটুকরো ঘি মাখান জ্বলন্ত কাপড় তার হাতে দিয়ে তাকে চিতার দিকে নিয়ে গেলেন। বণিক পত্নী এবার সতী হতে চলেছে, তাই উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, আশীর্বাদ নিতে চায় তারা— সতীর আশীর্বাদ। সবাইকে আশীর্বাদ করলে আরা কাঁদতে কাঁদতে তার পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

নির্ভীক চিত্তে চিতায় ওঠার সময় স্বামীর পায়ে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে স্বামীর মাথার কাছে গিয়ে বসল বণিক পত্নী। যেন আত্মসমাহিত— কোনওদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নাই, কোনও কথা কর্ণগোচর হচ্ছে না। কেবল বিহ্বলচোখে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে আছে, হাতে জ্বলন্ত অগ্নিশীখা নিয়ে। চিতার মধ্যে বসে নিজের হাতে চিতার অগ্নি সংযোগ করলেন। কিন্তু বাতাসের গতিতে সেই অগ্নি বাইরের দিকে যেতে লাগল। তখন তিনি পুনরায় উঠে বায়ুর গতির অভিমুখে বসে স্বামীর পদযুগল নিজের কোলে তুলে নিয়ে পুনরায় চিতায় অগ্নি-সংযোগ করলেন। দেখতে দেখতে তার কোমল দেহ চিতাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। সেই সময় তার চিত্তের দৃঢ়তা, এবং

নির্ভীক মনোবলের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম বলে প্রত্যক্ষদর্শী মিষ্টার হলওয়েল জানিয়েছেন।[১১]

আর একবার, এক বিধবা সতী হওয়ার সময় চিতাগ্নির দহনযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রাণপণ চেষ্টায় চিতার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে উপস্থিত ব্যক্তিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে ওই বিধবাকে যে স্বর্গে আর স্বামীর সহবাস সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল, এই বিবেচনা করে স্ত্রীলোকটি সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে অজস্র গালাগাল করেছিল।[১২]

সময়ে সময়ে একসঙ্গে এত বিধবা রমণী সহমৃতা হতেন যে তাদের জন্য বৃহৎ আকারের চিতা তৈরি করতে হত। এমনও দেখা গেছে যে, কুড়ি বা চব্বিশ হাত প্রশস্ত চিতাতেও স্থান সঙ্কুলান হত না। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে চুনাখালি গ্রামে এরূপ একটি সতীদাহ সম্পন্ন হয় তাতে ১৩ জন রমণী এক সঙ্গে চিতারোহন করেন।[১৩]

পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর "A view of the History, Literature and Religion of the Hindus (1817)" গ্রন্থটিতে যেসব বীভৎস সতীদাহের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে পাওয়া যায়— ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজারে অবস্থিত চুনাখালিতে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তিনি সর্বমোট পঁচিশটি বিবাহ করেছিলেন। তার মতে ১৩ জন পত্নী তার জীবদ্দশাতেই মারা যান। আর অপর ১২ জন তার সঙ্গে সহমৃতা হন। তার ফলে ৩০ জন শিশু সহসা অনাথ হয়ে পড়ে।[১৪]

এছাড়া ওই একই খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজার থেকে গঙ্গানদীর (বর্তমানে লোকে যাকে বলে কাটিগঙ্গা, সেই কাটিগঙ্গাই ছিল গঙ্গানদীর প্রাচীন প্রবাহ) মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ ওই চুনাখালিতেই যে প্রায় ৭০ জন বিধবা সহমৃতা হয়েছিলেন তার একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেই তালিকায় দেখা গেছে যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ থেকে শুরু করে কামার, কুমোর, তেলী, ছুতোর, স্বর্ণকার, কৈবর্ত, ধোপা, নাপিত, তাঁতি, গোয়ালা, বাগদী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের বিধবা আছে এবং দেখা গেছে যে তাদের সকলের বয়স ১৬ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে।[১৫]

পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড-এর বিবরণী থেকে আরও জানা যায় যে, ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সতী ঘটনার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকার মধ্যে দেখা যায় যে, কাশিমবাজারে তিনজন রমণী স্বামীর বস্ত্র নিয়ে অনুমরণের[১৬] মাধ্যমে প্রাণত্যাগ করেন। নিম্নের সরণীতে তাদের নাম-ধাম-বয়স ইত্যাদি দেওয়া হল।[১৭]

সারণী-১

জায়গার নাম	সতীর নাম	বয়স	সন্তান সংখ্যা	স্বামীর জাত
কাশিমবাজার	দুখী	৪০	৫	ব্রাহ্মণ
ঐ	রামপ্রিয়া	৫২	৩	ঐ
ঐ	রমণী	২৩	২	ঐ

১১। পূর্ববৎ, শিবনাথ শাস্ত্রী— "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"— বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা-১৯৮৩

১২। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর — "দ্বারকানাথ ঠাকুর"— রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১৩৭৬

১৩। কুমুদনাথ মল্লিক — "সতীদাহ"— জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা ১৯৯১।

১৪। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়— "বাংলাদেশে কৌলীণ্য প্রথার অত্যাচার"।

১৫। অমিতাভ মুখোপাধ্যায় — "জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ"— কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা - ১৯৮১

কাশিমবাজার বড় রাজবাড়ি থেকে আনুমানিক ৫০০ গজ উত্তরে, যেখানে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পত্নী ও তাঁর শিশুকন্যাসহ বহু সমাধি মন্দির আছে, ঠিক তার পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে একটি ইঁট বাঁধানো রাস্তা বরাবর পূর্বদিকে গিয়ে কাটিগঙ্গার তীরে এসে মিলিত হয়েছে। যেখানে মিলেছে তার নাম 'বাঁধাঘাট'। সে সময়ে এই ঘাটেই রাজবাড়ির পূজিত প্রতিমা সকল অতি জাঁকজমকের সঙ্গে বিসর্জন দিতেন।[১৮] বর্তমানে সেই ঘাটের কোনও অস্তিত্ব নেই। তবে কৌতূহল বশত খুঁজে দেখলে এখনও চূণ-বালি দিয়ে কাজ করা কয়েকটি সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ চোখে পড়লেও পড়তে পারে। গঙ্গা এখানে উত্তরবাহী। এই বাঁধাঘাটের ১০০ গজ উত্তরে গঙ্গার কিনারেই বটবৃক্ষের নিবিড় শীতল ছায়াতলে বহু প্রাচীন একটি শিব-মন্দির আছে। নাম তার 'পাথুরেঘাটা শিব' বা 'পাতালেশ্বর শিব'। দীর্ঘকাল রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শিব মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

পরে ১৩৬৪ সালে ৩১ শ্রাবণ গণপত রায় আগরওয়াল নামে কাশিমবাজারের এক ধনী সহৃদয় ব্যক্তি মন্দিরটির পুনঃসংস্করণ করেন। উক্ত মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'সতীদাহের ঘাট'। সে সময়ে এই অঞ্চলটির নাম ছিল 'ব্যাসকাশী'। কারণ এখানে ছোট বড় মিলিয়ে ১০৮ টি শিব মন্দির ছিল। বর্তমানে এর প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ এখনও এখানে সেখানে কয়েকটি শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'মুর্শিদাবাদ কথা' গ্রন্থে উক্ত সতীদাহের ঘাটের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৯] কিন্তু বর্তমানে এই সতীদাহের ঘাটের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক আগেই কালের কবলে চলে গেছে। স্থানটি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে কান্দি মহকুমায় অবস্থিত বড়ঞা থানা। সেখানে ৬ জন সহমৃতার খবর পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে জাতিগত হিসাবে দেখতে গেলে দেখা যায়— ২ জন ব্রাহ্মণ, ২ জন কায়স্থ এবং অন্যান্য ২ জন।[২০]

এছাড়া কান্দি মহকুমার অন্তর্গত ভরতপুর থানায় ১২ জন সহমৃতা হন। তাদের মধ্যে জাতিগত হিসাবে দেখা যায়— ৬ জন ব্রাহ্মণ, ২ জন কায়স্থ এবং অন্যান্য ৪ জন।[২১]

আবার খিদিরপুর গ্রামে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্র দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বহুদিন যাবৎ রোগ ভোগের পর মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। শোনা যায়, তাঁর সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর স্মরণে মৃত্যুই শ্রেয় বিবেচনা পূর্বক তৎসহগামিনী হন।[২২]

অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে সবরকম জাগতিক প্রলোভন, অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে, সন্তানদের মুখের দিকে না তাকিয়ে সে যুগে যেমন অনেক নারী সতী হয়েছেন, ঠিক তেমনি ভয় পেয়ে, বাঁচার তাগিদে সঙ্কল্পচ্যুত হয়ে অনেক নারী শেষমুহূর্তে পিছিয়ে আসত। দেবীত্বের খোলসটাকে

১৬। স্বামী যদি দূরদেশে মারা যান, আর মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যদি সহমরণের নিমিত্তে সেখানে যেতে না পারেন, তা হলে হিন্দু শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সেই পতিব্রতা স্ত্রীকে স্বামীর ব্যবহৃত যে কোনও জিনিষ সঙ্গে নিয়ে পৃথক চিতায় আত্মবিসর্জনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। একেই বলে অনুমরণ।

১৭। স্বপন বসু— 'সতী' — পুস্তক বিপণি, কলিকাতা ১৯৮২।

১৮। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বিজয়া দশমীর দিন এই ঘাটের কাছে নৌকার উপর বসে ৬১ বছরের বৃদ্ধ দক্ষ শিল্পী টমাস ডানিয়েল দুর্গাপ্রতিমা বিসজনের একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন। বর্তমানে কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ডানিয়েল কক্ষে উক্ত ছবিটি স্বযত্নে রক্ষিত আছে। (সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী— ''বন্দর কাশিমবাজার''— বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৮)

১৯। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— 'মুর্শিদাবাদ কথা' (১ম থেকে ৫ম), বহরমপুর- ১৩৪৮।

২০। বিনয়ভূষণ রায়— 'বাংলায় সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ'— সাহিত্য শ্রী, কলিকাতা-১৯৮৬।

২১। পূর্ববৎ

টান মেরে খুলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসত একটি নারী— বাঁচতে চায় সে, অবশ্য অনেক সময় বেঁচেও যেত সে।

এরূপ একটি ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদে কমল দেবীর বেলায়। ঘটনাটি এরূপ— ১৮২১ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর তার স্বামীর মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন যে সতী হবেন তিনি। সে সময়ে তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। ঘোষণাটি শোনার পর চারদিকে সাজসাজ রব উঠে গেল। রাতারাতি হয়ে উঠলেন তিনি রূপকথার নায়িকা।

সকলে তার পায়ের ধুলো এবং আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হতে চায়। যথা সময়ে "মুর্শিদাবাদ কোর্ট অব সার্কিট" থেকে সতী হবার জন্য অনুমতি পত্র এল। ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে, দারোগাকে সব সরকারি নির্দেশাদি ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য কড়া নির্দেশ পাঠালেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দারোগা কমল দেবীর সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু কমল দেবীর সেই একই কথা, স্বেচ্ছায় তিনি সতী হবেন। দারোগা ছিলেন হিন্দু সন্তান। তাই তিনি সবদিক বিচার বিবেচনা করে বললেন— "সতী আপনি হতে চান হোন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে আপনাকে আগুনে আঙুল ধরে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, অগ্নিদগ্ধ হবার যন্ত্রণা সহ্য করতে আপনি সক্ষম।"

সতীর কাছে এতো কিছুই নয়। কমল দেবী রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ আনা হল, জনতার ভীড়, সবার মনে কৌতুহল কি হয়, কি হয়। জ্বলন্ত প্রদীপের শীখায় আঙুল মেলে ধরলেন কমল দেবী। কিন্তু একি! তার মুখ কুঞ্চিত হচ্ছে কেন? কেন যন্ত্রণাবিকৃত মুখে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন তিনি, একি আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে আঙুল সরিয়ে নিচ্ছেন যে তিনি। না সতী তিনি হবেন না।[২৩] সেযাত্রায় কমল দেবী বেঁচে গিয়েছিলেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলি কিম্বা তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলমান নবাবদের আমলে হিন্দুগণ অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থদের মধ্যে অনেকেরই জমিদারি প্রাপ্ত হন।[২৪] মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালে শাসন ব্যবস্থা সুবন্দোবস্তের জন্য ১৬ জন জমিদারের মধ্যে তিনি ৬১৫ টি পরগণা ভাগ করে দেন। এছাড়া আরও ১,০৪৫টি পরগণাকে ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। দেখা যায় যে, সেই সমস্ত জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে তিন চতুরাংশই ছিল হিন্দু। আরও দেখা যায় যে, মুসলমান নবাবদের আমলে হিন্দু প্রজাদের বিভিন্ন গুণানুরূপ নতুন নতুন উপাধি বা খেতাব দেওয়া হত।[২৫] বর্তমানে হিন্দু ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে দস্তিদার, সরকার, বক্সি, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, হালদার, লস্কর, খাঁ প্রভৃতি পদবী ধারী ব্যক্তিদের অতীতকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ পাঠান কিম্বা মুর্শিদকুলি, সুজাউদ্দিন এবং আলীবর্দীর আমলে মুঘল সরকারের অধীনে কোন নামীদামী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[২৬]

মুসলমান রাজত্বকালে উচ্চপদে আসীন হিন্দুগণ হিন্দুদের প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করার জন্য নবাবদের অধীনে 'জাতি মালা" কাছারী থাকত।

২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১৮১৮-১৮৩০, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির— কলিকাতা-১৩৪৪। ২৩। স্বপন বসু— 'সতী' পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-১৯৮২।

২৪। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal-Vol-II মুসলমান যুগ, ঢাকা ১৯৪৮

২৫। পূর্ববৎ ২৬। পূর্ববৎ, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ— 'মুসলমান রাজত্বে খেতাবী ও পদবী' (কায়স্থ সমাজ, অষ্টম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৪, প্রথম সংখ্যা।

হিন্দু বিচারকগণ (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ) এসবের দায়িত্বে থাকতেন।[২৭]

তাই দেখা যায়— বিশেষভাবে মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে এই সমস্ত নতুন জমিদারগণ তাদের কর্মদক্ষতার গুণে প্রভূত অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সংস্কারের নামে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব সমাজের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রভাব বেশি থাকায় সতীদাহের ঘটনা তাদের মধ্যেই ঘটতো বেশি। মোট ৫৬টি ঘটনার মধ্যে ৩৪ জনই ছিলেন উচ্চবর্ণের মহিলা।[২৮]

তাছাড়া তৎকালীন সমাজে নীচু সম্প্রদায়ের মধ্যে সদগোপ, তাঁতি, তেলী, নাপিত প্রভৃতির প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে এদের স্থান নীচে হলেও সতীদাহের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকভাবে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এমনকি অর্থ ও সম্পত্তির বলে কোনও কোনও পরিবার সমাজের বুকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ কাশিমবাজার রাজপরিবারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কৃষ্ণকান্ত নন্দী। এক কথায় লোকে বলে বেণিয়ান কান্তবাবু। কাশিমবাজারে অবস্থিত ইংরেজ কুঠিতে মহুরীর কাজ করতেন এই কান্তবাবু। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র। নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলা যখন কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠি দখল করেন, তখন ওয়াটসন ছিলেন এই কুঠির অধ্যক্ষ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন কুঠির একজন সামান্য কর্মচারী মাত্র। সিরাজ অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে হেস্টিংসকেও বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। কথিত আছে, হেস্টিংস কোনওক্রমে মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে কাশিমবাজারে কান্তবাবুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে হেস্টিংসের মুক্তিলাভের সঙ্গে কান্তবাবুর বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় কান্তবাবুর ভাগ্যোদয়ের সূচনা হয়।[২৯]

কান্তবাবু ছিলেন জাতিতে তেলী এবং তেলী জাতির শীর্ষস্থানীয়। কথিত আছে— তিনি নীচ জাতি বলে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীন পুরোহিত (পাণ্ডা) তাঁর কাছ থেকে জগন্নাথ-দেবের সেবা-পূজার জন্য জমি নিতে অসম্মত হন। তখন তিনি নবদ্বীপে গিয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ থেকে 'বিধান' আনেন যে ব্যবসায়ী তেলীগণ সৎ-শূদ্র এবং নবশাক্ পর্যায়ভুক্ত।[৩০]

বাংলার সতীদাহর ঘটনাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে মোট ২০৭১ টি সতীদাহ হয়। তার মধ্যে মোট সংখ্যার শতকরা ১.২৩ ভাগ মুর্শিদাবাদেই ঘটে।[৩১] কায়স্থদের মধ্যে মোট ৮০০ জন বিধবা সহমরণ হওয়ার খবর পাওয়া যায়। তার মধ্যে মোট সংখ্যার শতকরা ২ ভাগ মুর্শিদাবাদে ঘটে।[৩২] তেলী জাতিদের মধ্যে মোট ১১৩টি ঘটনার কথা পাওয়া যায়। তার মধ্যে মোট ঘটনার শতকরা ০.৪৩ ভাগ মুর্শিদাবাদেই ঘটে।[৩৩] এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মোট ৮২৬টি সতীদাহের ঘটনার কথা পাওয়া যায়। তার মধ্যে মোট সংখ্যার শতকরা ২.৫১ ভাগ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে ঘটে।[৩৪]

মুজাগঞ্জ থানায় মোট ৯টি সহমরণের ঘটনার কথা জানা যায়। তার মধ্যে ৬ জন ব্রাহ্মণ, ২

---

২৭ নগেন্দ্রনাথ বসু— 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (ব্রাহ্মণকাণ্ড) প্রথম ভাগ, কলিকাতা-১৯০০।

২৮। বিনয়ভূষণ রায়— 'বাংলার সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ' সাহিত্য শ্রী, কলিকাতা-১৯৮৬।

২৯। ড. অনিমা মুখোপাধ্যায়— 'আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', সাহিত্য লোক, কলিকাতা-১৯৮৭।

৩০। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়— 'মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা-১৩৩৯।

৩১। বিনয়ভূষণ রায়— 'বাংলার সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন' সাহিত্য শ্রী, কলিকাতা-১৯৮৬।

৩২। পূর্ববৎ। ৩৩। পূর্ববৎ। ৩৪। পূর্ববৎ। ৩৫। পূর্ববৎ। ৩৬। পূর্ববৎ।

৩৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১৮১৮-১৮৩০, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলিকাতা-১৩৪৪।

জন কায়স্থ এবং অন্যান্য ১ জন, শতকরা ৭.৯৬।[৩৫]

আসনপুর থানায় মোট ৫টি সহমরণের ঘটনার কথা জানা যায়। তার মধ্যে ২ জন ব্রাহ্মণ, ১ জন কায়স্থ এবং অন্যান্য ২ জন, শতকরা ৪.৪২।[৩৬]

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ কলিকাতার অন্তপাতী কোর্টের সাহেবগণ সহমরণ বিষয়ক যে রিপোর্ট বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাতে দেখা যায়—

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলায় — ১১ জন

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলায় — ২২ জন

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলায় — ৪২ জন।[৩৭]

তিন সাল অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ শহরের মধ্যে সতীদাহ ঘটনার যে তথ্য পাওয়া তা নিম্নরূপ—

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ৩ জন

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৭ জন

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৭ জন।[৩৮]

বাংলার সতীদাহ বিষয়ক পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই এগার বছরে মুর্শিদাবাদ জেলায় গড়ে প্রতি বছরে প্রায় ১০০ জন বিধবা রমণী সহমৃতা হন।[৩৯]

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাল হিসাবে বাংলার মোট 'সতী'দাহের সংখ্যা গড় ও শতকরার হার—

সারণী - ২

সাল	সংখ্যা	শতকরা
১৮১৫	১১	৮.৮০
১৮১৬	২২	১৭.৬০
১৮১৭	৪২	৩৩.৪৪
১৮১৮	৩০	২৪.৬৪
১৮১৯	২৫	২০.২৪
১৮২০	২১	১৬.৭২
১৮২১	১২	১০.৫০
১৮২২	২২	১৭.৬০
১৮২৩	১৩	১১.৪৪
১৮২৪	১৪	১২.৩২
১৮২৫	২১	১৬.৭২
১৮২৬	৮	৭.০৪
১৮২৭	৯	৭.৯২
১৮২৮	১০	৮.৮০[৪০]

বাংলার মোট সতীদাহের সতীদের বয়সের হিসাব অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় গড়ে সতীদের বয়স সতীদাহের সংখ্যা ও শতকরার হার—

৩৮। হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— 'সিপাহী বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলা'— ইতিহাস পত্রিকা, কলিকাতা।

৩৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১৮১৮-১৮৩০, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলিকাতা-১৩৪৪।

৪০। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত'— দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-১৩৭৯।

সারণী - ৩

বয়স	সংখ্যা	শতকরা
১১-২০	৪	১.৮০
২১-৩০	৯	১.১২
৩১-৪০	১০	১.০৪
৪১-৫০	১২	১.০৩
৫১-৬০	৯	০.৮৫
৬১ ও তদূর্দ্ধ	১২	১.০৫[৪১]

বাংলার মোট জাতিগত হিসাবে 'সতী'দাহের সংখ্যার গড় ও শতকরা হার অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় জাতি বা সম্প্রদায়ে সংখ্যার গড় ও শতকরার হার—

সারণী - ৪

জাতি	সংখ্যা	শতকরা
ব্রাহ্মণ	২৫	১.২৩
কায়স্থ	৮	১.০০
তেলী	১	০.৮৫
গোয়ালা	১	০.৭৮
ধোপা	১	৩.৮৪
অন্যান্য	২১	২.৫১[৪২]

মুর্শিদাবাদ জেলায় সতী পরিবারের যে ৩২ জনের পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল এইরূপ —

সারণী - ৫

পুরোহিত	৩ জন
জমিদার	৪ জন
চাকুরি	৮ জন
কৃষক	১ জন
উকিল	১ জন
ব্যবসায়ী	২ জন
দোকানদার	৩ জন
অন্যান্য	৮ জন
অজ্ঞাত	২ জন[৪৩]

সে যুগে সাধারণ দরিদ্র ঘরের সতীদাহের জন্য খরচ লাগত এরূপ—

৪১। বিনয়ভূষণ রায়— 'বাংলায় সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ'— সাহিত্য শ্রী, কলিকাতা-১৯৮৬।
৪২। পূর্ববৎ ৪৩। পূর্বক্ত

সতীর খরচ

ঘি — তিন টাকা
ওড়ন পাড়ন কাপড় — এক টাকা
সতীর পরিধেয় একজোড়া নতুন কাপড় — আড়াই টাকা
কাঠ — তিন টাকা
পুরোহিত — তিন টাকা
সতীর কোনও ধর্মকার্যের জন্য দান — এক টাকা
চাল — এক আনা
পান — দু পয়সা
সুপারি — দশটি
ফুল — এক আনা
কর্পূর — এক আনা
শন — চার আনা
হলুদ — এক আনা
চন্দন, ধূপ, নারকেল ইত্যাদি — পাঁচ পয়সা
বাহক বা বেহারা — পাঁচ আনা
ঢুলি — আট আনা
নখ কাটার জন্য নাপিত — চার আনা
কাঠ কাটার জন্য — তিন আনা
সুপারি বাদে মোট — পনেরো টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা

এর কমে আর কোনভাবেই সতীদাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। এরপর শ্রাদ্ধবাবদ খরচ পড়ত ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা মতো। সব মিলিয়ে তিরিশ টাকার ব্যাপার। ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। যার যেমন অবস্থা তিনি তেমনি খরচ করতেন।[৪৪]

সে যুগে 'সতীস্মৃতি' বলে একটা কথা প্রচলিত ছিল। সতীস্মৃতি হচ্ছে যে সতীদাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে সতীদাহের স্থানে সতী স্মৃতিরক্ষার্থে স্মৃতিস্তম্ভ বা সতীমন্দির নির্মাণ করা। কোনও কোনও স্থানে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়া গ্রাম, জলাশয় বা রাজপথ প্রভৃতির নামের পূর্বে 'সতী' শব্দটি যোগ করে দিয়ে সতীর স্মৃতি রক্ষা করার আর এক প্রথার প্রচলন ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় এরূপ একটি সতীমন্দির সতীচৌরাস্তার উপর বিদ্যমান ছিল। অদ্যাবধি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ চৌরাস্তা সতীচৌরা নাম ধারণ করে সে যুগের সেই লুপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় করুণ কাহিনীর ক্ষীণ স্মৃতি বহন করে আসছে।[৪৫]

"Two roads of four which meet a little north of Jagat Seth's house from which the place takes its name have been cut away by the river. Near the junction stands Suttee Mandir built to commemorate the Hindoo widow who become Suttee. The temple is over 200 years old; the stone door frames and communication slab have been removed and the temple is in disrepair."[৪৬]

৪৪। কুমুদনাথ মল্লিক— 'সতীদাহ'— জে. এন. চক্রবর্তী এণ্ড কোং- কলিকাতা-১৯৯১।
বিনয়ভূষণ রায়— 'বাংলায় সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ'— সাহিত্য শ্রী, কলিকাতা-১৯৮৬।
৪৫। কুমুদনাথ মল্লিক— 'সতীদাহ'— জে. এন. চক্রবর্তী এণ্ড কোং- কলিকাতা-১৯৯১।
৪৬। Musnad of Murshidabad.

এছাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত শেখালিপুর মৌজার অধীন রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে কলকলির তীরে (মূল পদ্মা থেকে একটি ছোট দাঁড়া বা শাখা বেরিয়ে পূর্ববাহী হয়ে লালগোলা রাজবাড়ির প্রায় উত্তর দিকের কোল ঘেঁষে পুনরায় পদ্মায় মিলিত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই দাঁড়াকে বলে কলকলি। বর্তমানে দাঁড়াটি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব আজও বজায় আছে।) শ্মশানে অদ্যাবধি একটি সতী স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান। নাম তার 'সতীতলা'। বর্তমানে সতীস্মৃতি স্তম্ভ ছাড়া শ্মশানের কোনও অস্তিত্ব নেই।

বহরমপুর শহর থেকে বাসযোগে জঙ্গিপুর যাওয়ার পথে লালগোলা ছাড়িয়ে নাটাতলা কিম্বা পণ্ডিতপুর বাসস্টপেজে নেমে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে পৌঁছানো যায়। বহরমপুর শহর থেকে উক্ত গ্রামটির দূরত্ব প্রায় বাষট্টি কিলোমিটার। কীর্তিনাশা পদ্মা গ্রামের উত্তর দিকের কোল ঘেঁষে পূবদিকে বয়ে গেছে।

কিন্তু সে যুগে রাধাকৃষ্ণপুর বা তার আশে পাশের গ্রামগুলি যেমন ময়া, পণ্ডিতপুর প্রভৃতি স্থানগুলি ব্রাহ্মণ প্রধান ছিল। বিশেষ করে পণ্ডিতপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আধিক্য ছিল বলে স্বভাবত কারণে তথায় টোল বা চতুষ্পাঠী গড়ে উঠেছিল। রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে রামদুলাল ভট্টাচার্য্যের এরকম একটি টোল ছিল। তার আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মণ্ডল নামক গ্রামে। পণ্ডিত রামদুলাল ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হলে তাঁর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী কলকলির তীরে রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের শ্মশানে স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় সহমৃতা হন। স্থানীয় বাসিন্দা মানবেন্দ্র নারায়ণ রায় জানালেন— ব্রহ্মময়ী দেবীকে নিয়ে উক্ত শ্মশানে মোট ৫৬টি সতীদাহের ঘটনা ঘটে। ব্রহ্মময়ী দেবীর পর উক্ত স্থানে আর সতীদাহ হয় নি।

পরবর্তীকালে রামদুলাল ভট্টাচার্য্যের আত্মীয় লালগোলা নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ ১৩৪৭ সালে উক্তস্থানে সতীদাহের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভব স্থাপন করেন। স্তম্ভগাত্রের শ্বেতপাথর ফলকে লেখা আছে এইরূপ—

"সতীতলা"
এই স্থানে আমার প্রপিতামহী
ব্রহ্মময়ী দেবী
তাঁহার স্বামী (বৰ্দ্ধমান—মণ্ডল গ্রাম নিবাসী)
রামদুলাল ভট্টাচার্য্যের
চিতায় স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইয়াছেন।
লালগোলা শ্রীতৈলোক্যনাথ স্মৃতি ভূষণ*
১৩৪৭

সতীদাহ হওয়ার সময় বিপুল উদ্যমে বাদ্যধ্বনির ব্যবস্থা ছিল। আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী শ্মশানে উপস্থিত হলে সমবেত জনতা হরিধ্বনি দিত এবং সতীর জয়নাদে দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে তুলত। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাঁশির শব্দে, তার সঙ্গে উলুধ্বনি আর শঙ্খের আওয়াজে জল স্থল আকাস বাতাশ সব কেঁপে কেঁপে উঠত। সেই ঢাক ও ঢোলের বাজনার তালে তালে কেমন যেন একটা অভিনব মাদকতার রেশ থাকত, দূর থেকে সেই শব্দ শুনলেই লোকে বুঝতে পারত কোথাও সতীদাহ হচ্ছে। মনে প্রশ্ন জাগে যে সতীদাহের সময় কেনই বা বিপুল উদ্যমে বাজনা বাজান হত? তার কারণস্বরূপ অনেকে অনুমান করেন যে, আগুনে পুড়ে মরার সময় দগ্ধ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সতী কাতরভাবে চিৎকার করত,

* লেখকে কর্তৃক সংগৃহীত

সেই চিৎকার সমবেত জনতা জাতে শুনতে না পায় তার জন্য এই বাদ্যধ্বনির ব্যবস্থা। কিন্তু একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ মন্তব্য করেছেন যে, না তা ঠিক নয়, সতীর শেষ বাক্য দৈব বাক্য, সুতরাং তা দৈববাণীর তুল্য, অতএব সেই বাক্য মানুষের কানে গেলে পাছে জগতের কোনও অমঙ্গল হয়, তাই এরূপ বাদ্যধ্বনির ব্যবস্থা করা হত।[৪৭]

A few instrument of music had been provided and they played as usual as she approached the fire, not as is commonly, supposed in order to drown screams, but to prevent the last words of the victim from being heard, as these are supposed to be prophetic and might become sources of pain and strife to the living– Colonel Sleeman write in Modern Hinduism, By W.I.Wilkins.

পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকে দেখা যায় যে, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেছে। যে মনীষীর আবির্ভাবে উনিশ শতকে একটি বিশিষ্ট যুগসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, মহাত্মা রামমোহন রায় সেই যুগন্ধর মহাপুরুষ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দটি বাংলার সামাজিক পট পরিবর্তনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। বিশেষভাবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক-বাহিত নানা প্রকার পুরানো বিচিত্র সুসংস্কারের আবর্তে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছিল। সে সময়ে হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা সমাজের মধ্যে কুসংস্কারজনিত কালাপাহাড়ী শক্তিতে চেপে বসেছিল। আবার সেই চাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শ্বাসগ্রহণের একটা ইচ্ছাকে সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ মনে মনে পোষণ করছিল। তাই সতীদাহ নিবারণকল্পে সেই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহাত্মা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাঁদের সময়ে তৎকালীন বাংলার সামাজিক পটভূমিতে সবচেয়ে যেটি শোচনীয় ব্যাপার ছিল, তা হল সমাজে নারীর স্থান। নারীর বিশেষ মর্যাদা দূরে থাকুক, সাধারণ মর্যাদা দিতেও ভুলে গিয়েছিল সেদিনের সমাজ।

প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে অনেক বাঙালিই অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে মোগল রাজসরকারে, বিশেষভাবে মুসলমান শাসকদের রাজস্ব-বিভাগে চাকরি নিতেন এবং সেই চাকরিলব্ধ অর্থে ভূসম্পত্তি কিনে নিজ গ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য চেষ্টা করতেন।

রামমোহনের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজসরকারের অধীনে চাকরি করে নিজ দক্ষতার বলে 'রায়-রায়ান' উপাধি লাভ করেন। পিতামহ ব্রজবিনোদ আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। পিতা রামকান্তও সে সময় মুর্শিদতাবাদে রাজ সরকারের অধীনে চাকরি করে প্রচুর ভূসম্পত্তির অখিকারী হন।[৪৮]

পরবর্তীসময়ে রামকান্ত রায়ের ভূসম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হলে মধ্যমপুত্র রামমোহন কলিকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়ি ও গ্রামের বেশ কিছু সম্পত্তির অধিকারী হন। কর্ম্মোপলক্ষে রামোহন রায়কে নানা স্থানে যেতে হয়েছিল। এই ঘোরাফেরার মধ্য দিয়ে এদেশীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, ধর্মবোধ ও নৈতিকতার অসারতা, বিভিন্ন কুংসসকারজনিত প্রথা, জাতিভেদ, পৌত্তলিকা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে অবহিত হতে পেরেছিলেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই রামমোহন রায় মুর্শিদাবাদে আসেন। সে সময় তাঁর দুই সিবিলিয়ান বন্ধু র‍্যামজে ও উডফোর্ডও সেখানে অবস্থান করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে

৪৭। কুমুদনাথ মল্লিক— 'সতীদাহ'— জে. এন. চক্রবর্তী এণ্ড কোং- কলিকাতা-১৯১।

৪৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'রামমোহন রায়' বঙ্গীয় সাহিত্য সাদক চরিতামাল— প্রথম খণ্ড — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—কলকাতা ১৩৫০।

এসে রামমোহন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র অধীনে চাকরি করতে থাকেন।[৪৯] চন্দ্র ও মজুমদার সঙ্কলিত রামমোহন সম্বন্ধীয় Letters and Documents থেকে জানা যায় যে, রামমোহন মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগস্ট থেকে মুর্শিদাবাদের আপিল আদালতের তৎকালীন রেজিস্ট্রার মিঃ উডফোর্ডের ব্যক্তিগত মুন্‌সি নিযুক্ত হন। এখানে তিনি বছর দুই চাকরি করেছিলেন।[৫০] রামমোহন ইংরেজের অধীনে চাকরি করলেও তাঁর রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না; এমনি ছিল তাঁর তেজস্বিতা।

মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালীন রামমোহন দেখেছিলেন সেখানকার সতীদাহের বীভৎসতা ও নারীদের ওপর অত্যাচারের পৈশাচিক লীলার রূপটা। দেখেছিলেন, সহমৃতা অসহায় বিধবা নারী যাতে মৃত্যু ভয়ে স্বামীর চিতা থেকে উঠে পালাতে না পারে তার জন্য তাকে মৃত স্বামীর চিতায় বেঁধে রেখে তারপর চিতায় আগুন দিতে। ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসের মোহে মানুষ তখন মোহগ্রস্ত। এই সতীদাহ প্রথা যে হিন্দু সমাজে এক অতি দুর্মর অমানবিক আচরণ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সে সম্পর্কে এই সময়েই রামমোহন মানবিক ভাবনার আলোকে ক্লিষ্ট বোধ করেন। অন্যদিকে রামমোহন রায়ের বৌদি অলকমণি বা অলকঞ্জরীকে নিজের চোখের সামনে সতী হতে দেখে প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন বাঁচবেন, ততদিন এই ভয়ঙ্কর প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাবেন।[১]

মানব-কল্যাণ যজ্ঞের ঋত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের কোমল প্রাণ নারী জাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। তার অন্যতম কারণ তিব্বত ভ্রমণকালে মাতৃস্থানীয় এই নারীজাতির সাহায্যেই তাঁর মূল্যবান জীবন রক্ষা পায়। নারীর এই সাহসিক কার্যে রামমোহন মুগ্ধ হন এবং রামমোহনের অত্যন্ত অনুরাগী বান্ধবী মিস্ মেরী কার্পেন্টার লিখেছেন যে,— "তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করতেন।[৫২]

রেনেশাঁসের ঝরণাধারায় স্নাত মানুষ শেখে নারীর প্রতি সম্মান। অথচ সেই নারী, সমাজে সব থেকে অবহেলিত। সুতরাং রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল তার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল এই নারী মুক্তি আন্দোলন। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল সতীদাহ বা সহমরণ রদ্ আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলন, যার অন্যতম নায়ক ছিলেন রাজা রামমোহান রায়।

মিস্ কোলেট লিখেছেন যে, মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালীন ১৮০৩-০৪ কালে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে রামমোহন আরবী ও ফারসী ভাষায় 'তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদ্দিন' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স ৩০ বছর।[৫৩]

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ধর্মসম্বন্ধীয় বিচার ও পুস্তক প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ করেন। রামমোহন সতীদাহ নিবারণের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেন, এবার তাকে এক ব্যাপক চরিত্র দান করেন। সমাজের মানুষকে সচেতন করবার জন্য তিনি বাংলায় তিনটি ও ইংরেজিতে চারটি পুস্তক লিখে বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

৪৯। পূর্ববৎ ৫০। ঋষি দাস 'রাজা রামমোহন'— অশোক পুস্তকালয়— কলিকাতা-১৩৯৯। ৫১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' দে'জ, কলিকাতা-১৩৯৭

৫২। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়— 'বাংলার নারীজাগরণ'— সাধর ব্রাহ্মসমাজ-কলিকাতা-১৩৫২

৫৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'রামমোহন রায়' বঙ্গীয় সাহিত্য সাদক চরিতামাল— প্রথম খণ্ড — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—কলকাতা ১৩৫০।

রামমোহন কর্তৃক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় 'আত্মীয় সভা'। এই 'আত্মীয় সভা'য় মূলত ধর্মীয় সভা হলেও আলোচনা সব সময় ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকত না, সামাজিক নানা প্রসঙ্গের সাথে সহমরণ বিষয়েই বেশি আলোচনা হত। Vigilance committee-র মত আত্মীয়সভার সভ্যরা কলকাতা ও আশেপাশে নানা শ্মশানে ঘুরে ঘুরে জ্বলন্ত চিতা থেকে বিধবাদের উদ্ধার করতে লাগলেন। একদিকে শাস্ত্রীয় বিতর্ক অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করে চেষ্টা করছিলেন যাতে এই নৃশংস প্রথা বন্ধ হয়।

অন্যদিকে রামমোহন বিরোধিরাও চুপ করে বসেছিলেন না। তারাও আত্মীয় সভার বিপরীত 'ধর্মসভা' স্থাপন করলেন। সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হল, একদিকে সতীদ্বেষী, অন্যদিকে সতীপক্ষীয়রা, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব মুখোমুখি দাঁড়াল, রাধাকান্ত, রামকমল, ভবানীচরণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ একযোগে সংঘবদ্ধ হয়ে সতীদ্বেষীদের বিরোধিতায় নামলেন। বলা বাহুল্য রামমোহনের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হল। এমন কি তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা চলতে লাগল। অকুতোভয় রামমোহন আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রকাশ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে সতীদ্বেষী আন্দোলন অক্ষুণ্ণ রাখলেন। ক্রমে ক্রমে জন সমর্থন লাভ করতে লাগলেন। কলকাতায় হুলুস্থূল পড়ে গেল।

যা হোক, দিনে দিনে বিশেষ করে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে যখন সরকার ও বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই চিন্তিত, তখন রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ধারণ করলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' নামে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। সতীদাহ নিরোধকে রামমোহনের অন্যতম প্রধান কীর্তি বলা হয়। তার প্রধান কারণ, রামমোহনই সর্বপ্রথম এর শাস্ত্রীয় দিক এবং এর লৌকিক অশাস্ত্রীয় দিক সম্পর্কে বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করে অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিদৃপ্ত যুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলেন। তাঁর এই নিবন্ধগুলিই পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকারকে সতীদাহ নিরোধের পক্ষে শক্তিশালী হাতিয়ার জুগিয়েছিল। ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে হতে পেরেছিলেন যে, সতীদাহ নিরোধ করলে কোনও মতেই হিন্দুর ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করা হবে না, বরং একটি নৃশংস স্বার্থপুষ্ট জঘন্য প্রথার বিলুপ্ত করা হবে। অবশেষে সংঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করে বন্ধ করেন।[৫৪]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন ছাড়া বাঙালি সমাজে অন্য কোনও সতী বিরোধী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এতবড় ছিল না। তাই সতীদাহ নিরোধের উপযুক্ত ক্ষেত্র রামমোহনই রচনা করেছিলেন বলা একান্তই যুক্তিসঙ্গত হবে। রামমোহন কখনও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি; তিনি হিন্দু ধর্মের বিপথগামিতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। আজ কোথায় বা সেই ধর্মসভা, আর কোথায় বা সেই রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু কত অনাথা রমণী আজ সেই ভীষণ অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাচ্ছে। এই ভীষণ প্রথা নিবারণে সে সকল মহাত্মাগণের কিছুমাত্র সংশ্রব আছে, তাদের সকলকেই হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করছি।

৫৪। পূর্ববৎ

সংবাদ ও সাময়িকপত্রে
মুর্শিদাবাদের নীলবিদ্রোহ

তুষার ভট্টাচার্য

সূচনাপর্ব

সমকালের বিশ্বস্ত দর্পণ হল সংবাদ ও সাময়িকপত্র। ইতিহাস, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ছবি জানতে হলে সমসাময়িক কাল ও সময়ের সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালেই একটি ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠে। সে ছবি, সে তথ্য কতখানি নিখুঁত কিংবা নির্ভরযোগ্য কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু চলমান ঘটনাপ্রবাহের উপর আলোকপাত করতে গেলে, সংবাদ ও সাময়িকপত্রকেই দলিল বা মূল উপাদান হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংবাদ ও সাময়িকপত্রের এখানেই অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার নীলচাষ এবং রায়তদের (প্রজাদের) নীলচাষ (Indigo) নিয়ে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের হালহকিকৎ সম্পর্কে জানতে হলে সেকালের ইংরাজি এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ ও সাময়িকপত্রের পাতায় দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে আমাদের।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিম্ন বাংলায় (Lower Bengal) অর্থাৎ গঙ্গার দুই পাশে এবং মেঘনা নদীর দুইপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষ শুরু হয়েছিল। রায়তরা বা কৃষকরা আদতেই তাঁদের চিরাচরিত চাষবাস ছেড়ে নীলচাষে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু নীলকর সাহেবদের এবং দেশীয় জমিদারদের তীব্র জুলুম ও অত্যাচারের ফলে অনেকে বাধ্য হয়ে নীলচাষ করতে রাজী হন। নীলচাষ বাংলায় ছড়িয়ে পড়ার কারণ ছিল মূলত তিনটি, ১) অনুকূল জলবায়ু, ২) সস্তায় শ্রমিক, সুলভ মজুরী এবং ৩) শাসকশ্রেণীর বিশেষত দেশীয় রাজা এবং জমিদার শ্রেণীর অতিরিক্ত আনুকূল্য। এইসব কারণেই বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীলের ব্যবসায় ইংরেজদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম হয়। যশোর-নদীয়া-বারাসত-পাবনা এবং মুর্শিদাবাদে ব্যাপকভাবে নীলচাষ শুরু হয় এবং প্রতিটি জেলার বিভিন্নস্থানে নীলকর সাহেবরা নীলকুঠি স্থাপন করেন। এইদেশে ব্যবসা শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে নীলকর সাহেবদের লোভ হয়ে ওঠে সীমাহীন। অনেক

জায়গায় তাঁরা রায়তদের (কৃষকদের) সম্মতি ছাড়াই, লাঠিয়াল বাহিনীর সাহায্য নিয়ে জমিতে জোর করে নীল বুনে দিতে আরম্ভ করে।

চাষিদের জমিতে উৎপাদিত নীল নেওয়ার সময় ওজনে কারচুপি বা ঠকানো ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। এছাড়াও কৃষকদের জোর করে নীলচাষের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হতো। জমির লীজ বা চুক্তি চাষের জন্য সীমা ধার্য হতো চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের। দরিদ্র কৃষকরা দারিদ্রতার জন্য সেই টাকা খেয়ে ফেলতেন। যার ফলে নীল কর সাহেবদের কাছে দেনা কখনই শোধ হতো না, কৃষকরা জড়িয়ে পড়তেন ঋণের ফাঁদে।

সবদিক দিয়ে ঠকতে ঠকতে নীলকর সাহেবদের জুলুমে তিতি বিরক্ত হয়ে ও অকারণে নির্যাতিত হতে হতে, বাংলার নীলচাষিদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে এবং তা ধীরে ধীরে বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। বাংলার সর্বত্র অত্যাচারিত, শোষিত কৃষকদের মধ্যে নীলচাষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সেদিনের নীলবিদ্রোহের দুটি দিক ছিল— ১) প্রজাদের নীল চাষের ক্ষেত্রে অসহযোগিতার দিক, ২) নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদের দিক।

নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্ব

নীলচাষের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবদের এবং দেশীয় জমিদারদের অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রথমে বিদ্রোহের সূচনা করেন ২৪ পরগণার সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান তিতুমীর। অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে তিতুমীরের নেতৃত্বে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক নীলকুঠি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হতে থাকে। বাংলার নীপিড়িত কৃষক সমাজ এতদিন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের হাতেই মার খেয়েছে। জমিদার এবং নীলকর সাহেবদেরও যে উল্টে মার দেওয়া যায় তা তিতুমীরই প্রথম কৃষকদের বোঝাতে সক্ষম হন। নিপীড়িত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বিদ্রোহ আন্দোলনে যোগ দিতে থাকেন। তিতুমীরের সবচেয়ে কৃতিত্ব যে তিনি বাংলার অশিক্ষিত নিপীড়িত, কৃষক সমাজের একাংশকে জমিদার, রাজা এবং নীলকরদের পৃষ্টপোষক ইংরেজ রাজের চরিত্রটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বৃটিশদের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এবং তিনি এই প্রতিরোধ আন্দোলনেই প্রাণ হারান। বৃটিশদের আগমনকে ঈশ্বরের আশির্বাদ হিসাবে গণ্য করে ব্যবসায়ী জমিদাররা শ্বেতপ্রভূদের তোষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ের প্রেক্ষিতে তিতুমীরের বৃটিশ বিরোধী ভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্বাভাবিকভাবেই তিতুমীরকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি 'ডাকাত' আখ্যা দেন।

নীল করদের বিরুদ্ধের তিতুমীরের আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ফরাজী আন্দোলেন নেতা হাজী শরিয়তুল্লা (যিনি বিশ্বাস করতেন one who acts upto the commandments of god– Judicial pros. No. 99, 7.4.1847) পুত্র মহম্মদ মহসীন ওরফে দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরিদপুর জেলার নীলকর বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। তার নেতৃত্বে ডানলপ সাহেবের নীলকুঠী আক্রমণ করা হয়। অত্যাচারী জমিদার কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলালকে দুদুমিয়ার অনুচররা হত্যা করেন। এই সময়ে 'ঢাকা নিউজ' নামের একটি সংবাদপত্র (নীলকর সাহেবদের দরদী পত্রিকা) দুদুমিয়াকে 'Preince of dacoits scoundrel' আখ্যা দেয়।

যদিও তিতুমীরের মতো দুদুমিয়া নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে কোনও সংগঠিত আক্রমণের নেতৃত্ব দেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি লুণ্ঠিত ধনসম্পদ নিজেই আত্মসাৎ করেছেন। সরকারি পদ ও পেনশন চেয়ে তিনি বৃটিশ রাজের কাছে আবেদনও করেছেন। তাঁর আন্দোলন সীমায়িত ছিল কিছুটা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষিদের বিদ্রোহ পর্ব

সংবাদ ও সাময়িকপত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বাংলার নীলচাষিদের প্রতিরোধ আন্দোলনের যে সব সংবাদ বা প্রতিবেদন দেখতে পাওয়া যায়, তাতে মুর্শিদাবাদ জেলায়, নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় না। হতে পারে সে রকম যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে, স্থানীয় প্রতিবেদকের অভাবে নীলচাষিদের, নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের খবর আদতেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদ ও সাময়িকপত্রে পৌঁছয়নি। আর সেই সময়ে অধিকাংশ ইংরেজি সংবাদপত্র ছিল শ্বেতাঙ্গ প্রভূদের পরিচালিত। দেশীয় মালিক দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও (যথা হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি) নীলচাষিদের উপর দেশীয় জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করতো। এরফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলচাষিদের প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা তেমনভাবে আলোচিত হয়নি তৎকালীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পাতায়। যেমনটি হয়েছে বারাসত, কৃষ্ণনগর কিংবা যশোর, পাবনার নীলচাষিদের বিদ্রোহের কথা।

অথচ মুর্শিদাবাদ জেলায় সেই সময়ে ব্যাপকভাবে নীলচাষ হতো। পঞ্চাননতলায় ছিল নীল কুঠির মূল কেন্দ্র (বর্তমানে জেলাপরিষদ ভবনে)। কাশিমবাজার বন্দর দিয়ে ইংল্যাণ্ডে নিয়মিত নীল ও রেশম রপ্তানী করা হতো। দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপকভাবে নীলচাষ হলেও রায়তদের (কৃষকদের) খুব বেশি অসন্তোষের খবর সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়নি। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামের একটি ইংরেজি দৈনিক (৮/৩/১৮৬০-এ) লিখেছে— The district of Moorshedabad, Krishnaghur, Jessore, Baraset are now the scene of outrages. A bandof 2000 has been marching throughout Krishnaghur, intimidating the ryots of the different factories, gomastah, no doubt richly deserving it have been seized out houses, burnt down and stacks fired. There is little prospect of indigo being grown in these district this season.

However that may be, it seems certain that the ryots at first engaged only in a strike, rapidly proceeded to open rioting, bands of half armed men crossed the country and threatened the labourers who still continued to grow indigo. In at least three concerns, the cultivation seems to have been suppressed by force and all through Krishnaghur and part of Moorshedabad the peasantry are for the moment masters of the situation.

১৫ মার্চ ১৮৬০-এ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার আরেকটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে (বঙ্গানুবাদ) ঃ ১৫০ শতাংশ লাভের আশায় রায়তরা নীল চাষ শুরু করেছিল। কিন্তু তাঁরা দেখতে পাচ্ছে কিছুই লাভ নেই নীলচযে। এদিকে পঞ্চাশ বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে নীলচাষি। তাদেরকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়েছে। চাষিরা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে গেছে। নীলকরদের বিরুদ্ধে বৃটিশদের অসন্তোষ বাড়ছিল। রায়তরা প্রথমে নীল চাষ করবে না বলে ধর্মঘট শুরু করলো। নীলকর সাহেবরা লাঠিয়ালরা পুলিশরা হুমকি দিতে শুরু করলো। কৃষ্ণনগর এবং আংশিক মুর্শিদাবাদে

পুনরায় জোর জবরদস্তি করে নীলচাষ শুরু হলো।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রসঙ্গে লিখেছে ইংল্যাণ্ডে একজন ভদ্রলোক আইনী সহায়তা চাইলে পায় সরকারের কাছে। কিন্তু কৃষ্ণনগরে কোনও আইন নেই এখানে রায়তরা সরকারের বিরুদ্ধে গেলে শাস্তি পায়। তাদের কোনও স্বাধীনতাই নেই। এখানে কার্যত কালোমানুষদের চাকরের চোখে দেখা হয় (Natrive servants)। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে, এই দেশের রায়তরা ইংরেজ নীলকর সাহেবদের কাছে শুধু অত্যাচারীতই হয়েছে। কোনও আইনের সুবিচার পাইনি। আয়ারল্যাণ্ডে এরকম অবিচার হয়না।

৩ মার্চ ১৮৬০ তারিখের Calcutta weekly press সাময়িকপত্রে মুর্শিদাবাদ জেলায় অরঙ্গাবাদে নীলচাষিদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের কথা লেখা হয়েছে ঃ The Englishman relates an affray which took place four days ago at Kalapanee an indigo factory belonging to the Aurungadabad concern in Moorshedabad. It originated thus. The gomostha of the factory had been for some time oppessing the ryots. The complained of his conduct to the manager, but without having any attention paid to their grivences. Finding no redress was to be obtained from the manager. The ryots assembled togather in a large body and attacked the factory. The agent fled, but the gomostha has been so severly handled that his life is despaired of thus encouraged the rioters induced others to going them. They have been proceedings from village to village gaining new volunteers and inviting everyone to aid. The police attempted to interfere, but they were commanded by the mob to keep quiet. Those villagers who remained passive were illtreated by the rioters. This is a fine state of things in Bengal.

২২ মার্চ ১৮৬০-এ Bengal Harkaru একটি প্রতিবেদনে লিখেছে যে অরঙ্গাবাদে (মালদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, হবে মুর্শিদাবাদ) একজন নীলকুঠির গোমস্তা জোর করে রায়তের জমিতে নীল চাষ শুরু করতে গেলে নীলচাষিরা চাষকরতে অস্বিকার করে। বেণিয়া গ্রামের নীলকুঠির প্রধান জনৈক মি. লায়ন মুসলমান রায়তদের চেক দিতে গেলে তারা সেই চেক ফিরিয়ে দেয়। সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় এবছর অর্ধেক নীলচাষ শুরু হবে। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ার জন্য।

Bengal Harkaru তে (২৪.৩.১৮৬০) একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে— সেক্রেটারি টু গভর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল। টু ওল্ড অফিস স্ট্রিটকে জানাচ্ছেন অ্যাশলে ইডেনকে সম্প্রতি বারাসত থেকে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি করা হয়েছে। যার ফলে নীলচাষীদের কাছে একটি বার্তাই পৌঁছাবে তা হলো জেলা মেজেস্ট্রেট রায়তদের সমব্যাথী। এবং এতে করে সব জেলাতেই নীলচাষের বিপক্ষে জনমত তৈরি হবে, এসব কথা আমি নিশ্চিতের সঙ্গে জানাচ্ছি।

ইতি

আপনার বিশ্বস্ত

এ ফরবস

অফিস সেক্রেটারি, আই পি অ্যাসোসিয়েশন

Bengal Harkaru- (২৬.৩.১৮৬০) আরেকটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ২২ শে মার্চ অরঙ্গাবাদের বানিয়া গ্রামের মি. পি লায়নের নীল কুঠি ফ্যাক্টরিতে ২০০ জনের বেশি উন্মত্ত জনতা আক্রমণ করে। ফ্যাক্টরি ভাঙচুর করে টাকা পয়সা আসবাবপত্র লুঠ করে নিয়ে যায়।

পরে সশস্ত্র পুলিশ এসে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। আবার যে কোনও সময় আক্রমণ হতে পারে। সরকার যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখনই না গ্রহণ করে তবে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

১২ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে প্রকাশিত 'Friend of India' এর একটি সংবাদে লেখা হয়েছে— বেনিয়া গ্রাম সন্নিহিত এলাকায় মি. পি লায়নের ফ্যাক্টরি আক্রান্ত হয়েছে। প্রায় ৫ হাজার মানুষ ছিল ওই আক্রমণে। মি. পি লায়ন ৭ জন বরকন্দাজ গুলি ছুঁড়লে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। নীল চাষিদের এই আক্রমণ মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। তারা চীৎকার করে বলছে যে মারো মারো সাহেবকো। Friend of India আরেকটি প্রতিবেদনে লিখেছে ঃ The reports from the indigo districts grow no worse but that is all. Krishnaghur, Barasat, Jassore and part of Moorshedabad are still disturebed by large bodies of the peasantry moving across them, Threatening Europeans raising fires and assaiting all who consent to work.

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (২০.৯.১৮৬০) আরেকটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, ১৮৩৩-৩৪ সালে বাংলা থেকে কোনও তিসি রপ্তানী হয়নি নীলচাষের জন্য। ১৮৫৫ থেকে ৫৬ সালে তিসি রপ্তানী হয়েছে মাত্র ২৫৩৮ মণ। ১৮৪৩-৪৪ সালে বাংলা থেকে সর্ষে রপ্তানী হয়েছে মাত্র ২৬১.৫৪ পাউণ্ড মূল্যের।

এই প্রতিবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, সমগ্র বঙ্গ দেশেই বিশেষত নিম্ন বাংলায় নীলচাষ জোর করে করার জন্য অন্যান্য ফসলের চাষবাস শিকেই উঠেছিল। এই সময় নীলচাষের জন্য চাষিদের প্রতি বিঘেতে খরচ হতো ১০ টাকার মতো এবং নীল বিক্রি করে চাষিরা পেতেন মাত্র ৬ টাকা।

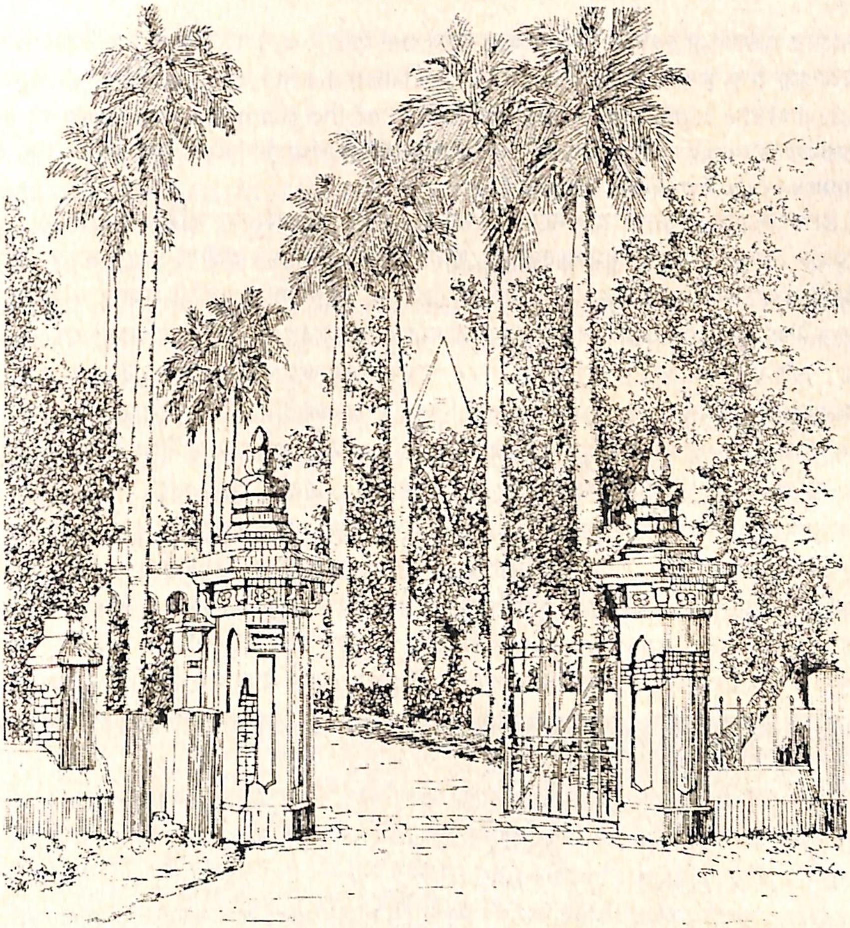
২৪ জুলাই ১৮৩৫ তারিখে Calcutta courier-এ একজন শ্বেতাঙ্গ নীলকর সাহেব লেখেন— ১০টির ক্ষেত্রের মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে নীলবোনা নীল চাষির কাছে ছিল অলাভজনক। নীল ব্যবসার গোটা ব্যাপারটাই থাকতো নীলকরের নিয়ন্ত্রণে। নীলকররা যে দাম বলতো সেই দামেই নীলচাষিকে নীল বিক্রি করতে হতো। যেভাবে নীলকররা ওজন চাইতো সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ফলে সারা বছর খেটে জমি থেকে যে নীল উৎপাদন হতো তা কুঠীতে জমা দিয়ে লাভ হওয়া তো দূরের কথা নীলকরদের দেনায় পরিশোধ হতো না। এই প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়ট লিখেছে, "নীল কুঠির অর্থ একবার স্পর্শ করলে কৃষকদের জীবদ্দশায় তার আর পরিশোধ হয় না।" (২৯.৭.১৮৫৮)।

নীল চাষিদের নিগ্রহ প্রসঙ্গে দেশীয় সংবাদপত্রে ভূমিকা

এ কথা সর্বজন বিহিত যে সংবাদপত্র জনমত গঠন করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় নীল চাষের বিরুদ্ধে দেশীয় রায়তদের নিগ্রহ নীলকরদের বিরুদ্ধে রায়তদের অসন্তোষ বা বিদ্রোহের খবর তেমনভাবে প্রচার করেনি। সে কালের বিখ্যাত দেশীয় মালিকদের দ্বারা পরিচালিত 'সংবাদ প্রভাকর', 'সমাচার দর্পণ', 'ঢাক প্রকাশ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি। শ্বেতাঙ্গদের পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'ক্যালকাটা হরকরা' প্রভৃতি পত্রিকায় রায়তদের নীলচাষে অসন্তোষের কথা কিছুটা জায়গা পেলেও এই দেশীয় সংবাদপত্রে নীল বিদ্রোহের খবর তেমন গুরুত্ব পায়নি। সংবাদ প্রভাকর, সমাচার দর্পণ পত্রিকাগুলি দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকাংশেই পরিচালিত হতো। জমিদাররা যেখানে জমির মালিক সেখানে রায়তদের বঞ্চনার খবর এই সব সংবাদপত্রে তেমন গুরুত্ব

পায়নি কোনদিনই। এছাড়াও এইসব জমিদার শ্রেণী ছিলেন ইংরেজ রাজ প্রভূদের খেতাললোভী ও মোসাহেব গোছের। যার ফলে দেশীয় নীলবিদ্রোহের খবর সেকালে প্রকাশিত সংবাদপত্রে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে সেসবই ছিল ভাসাভাসা। এই ঘটনার অন্তর্তদন্তে কেউ মনোনিবেশ করেনি। স্থানীয় ভাবে প্রকাশিত যে সমস্ত পত্রপত্রিকার কলমে প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে চেষ্টা করেছে কিংবা বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছে রাজরোষে পড়ে সেসব পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্ষণস্থায়ী এইসব পত্রিকা র কপি আর পাওয়া যায় না।

এই কারণেই মুর্শিদাবাদ জেলায় ঘটে যাওয়া নীলচাষিদের সংঘবদ্ধ আক্রমনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিঃসশয়ভাবে জানা যায় না। কোনও বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে থাকলেও তা জানা এখন প্রায় অসম্ভব। ইংরেজি সংবাদপত্রে কিছুটা সংবাদ পাওয়া গেলেও বাংলাভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে একচ্ছত্র সংবাদও কেন জায়গা পায়নি বা প্রকাশিত হয়নি, সেই জিজ্ঞাসা আজও রয়ে গেছে আমাদের একালের পাঠকদের।



মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষার বিকাশ
ঊনিশ শতকের আগে, ঊনিশ শতক ও স্বাধীনতা পর্যন্ত

আশীষ হালদার

গঙ্গা পদ্মা বিধৌত মুর্শিদাবাদ তার দুই নদীর বিপুল জলরাশি বঙ্গোপসাগরে পরিবহনের মতই সমাজের জীবন্ত মনুষ্য ধারাকেও প্রবাহিত করে চলেছে ইতিহাসের গতিপথে। এই সমাজপ্রবাহে সামাজিক চাহিদাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তার শিক্ষা। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিকশিত হয়েছে, নতুন নতুন মানবগোষ্ঠী, পরাজিত বা অবলুপ্ত হয়েছে এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী শ্রেণী। অর্থনীতির বুনিয়াদ পাল্টিয়েছে। তাকে কেন্দ্র করেই সামাজিক চাহিদাও পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজচাহিদাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাব্যবস্থায়ও এসেছে পরিবর্ত্তন। ১৬ শতকে শ্রী নিবাস

আচার্যের প্রভাবে এ জেলায় বৈষ্ণব আন্দোলন শুরু হয়। ১৬, ১৭, ১৮ শতকে বৈষ্ণব ভাবধারা এ জেলায় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। "Murshidabad district, or to be more precise, the Rarh and the regions adjoning the banks of the Bagirathi, can boast of a rich cultural heritage. The Vaishnava tradition of Murshidabad begins in the 16 th century with Srinivasacharya."[১]

ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর বিধিনিষেধের ফলে সমাজে যে অসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসন করেছিল বৈষ্ণব ধর্ম। এই ধর্ম জাতপাত, ছোঁয়াছোঁয়ির ভেদাভেদ অস্বীকার করে সমস্ত মানুষকেই সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিল। 'নিত্যানন্দের প্রেরণায় গোপ বা গোয়ালা সমাজ ও সুবর্ণ বণিক সমাজ দীক্ষা নেয় এই ধর্মে। বল্লাল সেনের সমাজ সংস্কারের ফলে সুবর্ণবণিকরা অজলচল হয়ে যায়। এই ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে তারা ফিরে পায় তাদের আগের সম্মান। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহদের ভূমিকা নিয়েছিল এই সুবর্ণবণিকরা। রাজশাহীর কায়স্থ নরোত্তম দত্ত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর প্রভাবে কায়স্থরা দীক্ষিত হয়, এই ধর্মে। যবনকের অধীনে কাজ করতেন হিন্দু কর্মচারীরা (রূপ, সনাতন) সমাজে হলেন জাতিচ্যুত। এঁরাও বৈষ্ণবধর্মে সম্মান ফিরে পান। গরিব ব্রহ্মণেরা বৈষ্ণব সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা পান। ব্যবসায়ে যুক্ত থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা হন ধনী। কিন্তু সমাজকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা থাকে না তাঁদের। বৈষ্ণব ধর্ম দেয় সামাজিক প্রতিপত্তি। এই ধর্মে সমাজভুক্ত হয় বর্ণশংকররা।'[২] ১৬-১৭ শতকে মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণব কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ১৮ এমনকি ১৯ শতকেও এই ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল এবং সমাজকে প্রভাবিত করত। বৈষ্ণব কেন্দ্র নানা নামে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে কিছু ছিল আখড়া। যেখানে সন্ন্যাসী সেনারা থাকত এবং নানা ধরনের শরীর চর্চা যেমন কুস্তি, ডন, বৈঠক ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

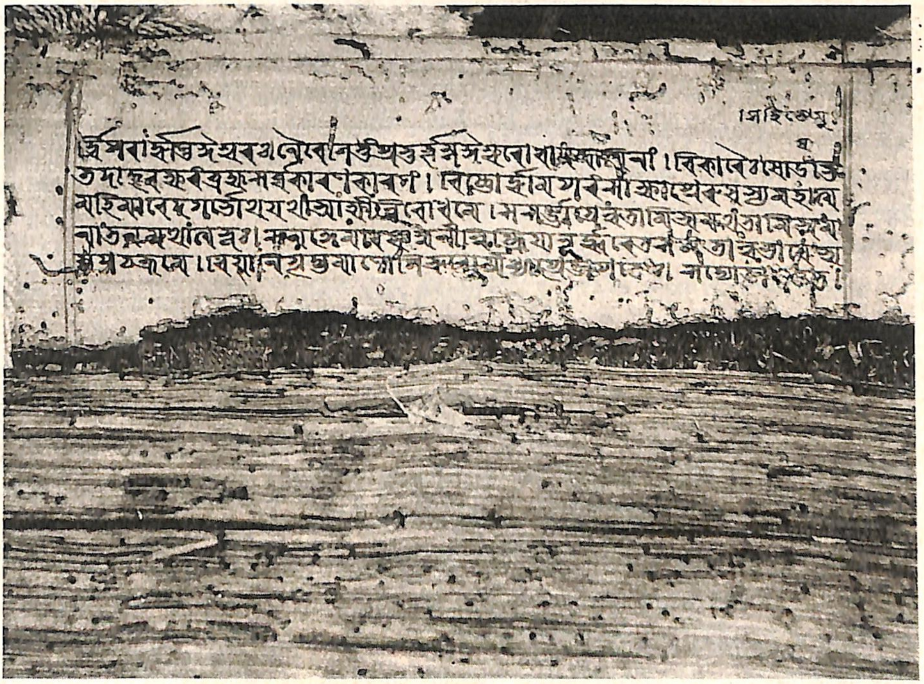
'উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব গুরুর জন্মস্থান ধাম, একাধিক বৈষ্ণব গুরুদের মিলন ক্ষেত্র হল মহাপাট। গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব নিদর্শন যেমন মহাপ্রভুর হাতের লেখা পুঁথি বা কোন স্মারক যে কেন্দ্রে আছে তা শ্রীপাট নামে পরিচিত।'[৩]

জমিদার, রাজা বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলিকে নানা ভাবে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। নবাবরাও মুর্শিদাবাদে অনেকগুলি কেন্দ্রকে নিষ্কর জমি দিয়ে বসার অনুমতি দিয়েছিল। জেলার বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি তখনকার দিনের সমাজসেবা মূলক কাজে এগিয়ে এসেছিল। ফলে সাধারণ মানুষের সাথে বৈষ্ণবকেন্দ্রগুলোর যোগাযোগ ছিল গভীর।

'চৈতন্য চরিতামৃত' লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদ সীমান্ত বর্দ্ধমানের কোন একগ্রামে। কিন্তু তার শ্রীপাট ছিল মুর্শিদাবাদের মধ্যে। মুর্শিদাবাদ সৃষ্টি করেছিল কিছু বৈষ্ণব কবি ও দার্শনিক। তাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, সৈয়দ মুর্ত্তজা, নরহরি দাস, যদুনাথ দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, বংশী দাস, চৈতন্য দাস, বৈষ্ণব দাস প্রমুখ। বৈষ্ণব কবিদের বৈষ্ণব পদাবলী এবং বরাহনগরের রাণী ভবানীর ছেলে রামকৃষ্ণ রচিত শাক্তপদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হলেও তখন বাংলা ভাষার সামাজিক গুরুত্বছিল না। রাজকাজে বাংলা ছিল অচল। বাংলা গদ্যসাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে এর অনেক পরে। অলংকার যুক্ত সাহিত্যের উপযুক্ত বাংলা সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ শতকে। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাংলা বর্ণমালা সংস্কার করে নতুন লিপি থেকে বাংলা ভাষার জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৬-১৭ শতকে সংস্কৃত ছিল অনেক উন্নত ভাষা। এই ভাষা শিক্ষা জমিদার ও ভূস্বামীদের আনুকূল্য পেয়েছিল। সংস্কৃত

শিক্ষার প্রাথমিক স্তর চতুষ্পাঠী এবং সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র গুলি টোল নামে পরিচিত ছিল। রানী ভবানী চতুস্পাঠী ও টোলশিক্ষার ব্যয় নির্বাহে বছরে ৮-১০ হাজার টাকা ব্যয় করতেন। চতুষ্পাঠী ও টোলে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়ার সুযোগ পেতে ছাত্রদের থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিতেন পণ্ডিতমশাইরা। পণ্ডিতরা আবার জমিদার, ভূস্বামীদের নিষ্কর-জমি অনুদান পেতেন। বহু ব্রাহ্মণ পরিবার তাদের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী চতুষ্পাঠী বা টোল খুলতেন। বৈষ্ণব কেন্দ্রের সাথে শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী ও টোল চালু ছিল। বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি নবাবদের আনুকূল্য লাভ করেছিল। 'নিজামতী রাজস্ব বিভাগে প্রাচীন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর জন্য বিনা খাজনায় যে জমি দেওয়া হত তা ব্রহ্মোত্তর হিসাবেই গন্য হত।'[৪] রানীভবানীর অর্থানুকূল্যে পরিচালিত টোলগুলির মধ্যে সৈদাবাদ, মহুলা ও কাশিমবাজারের টোলগুলি উল্লেখযোগ্য। মহুলায় নব্যন্যায়ের চর্চাকেন্দ্র ছিল।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত শুধু গুরুমশাইয়ের পাঠশালাগুলোতে। সাধারণত পাঁচ বছরের শিশুরা এই পাঠশালা শিক্ষা শুরু করে দশ এগারো বছর বয়সে এই শিক্ষার সমাপ্তি ঘটাত। গুরুমশাই ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে যে কোনও জাতির হওয়াতে কোনও সামাজিক বাধা ছিল না। অ্যাডম রিপোর্টে (১৮৩৫) একটি পাঠশালায় গুরু মুসলমান ছিল বলে উল্লেখ আছে। শিক্ষার্থীরাও যে কোনও জাতির— বর্ণহিন্দু, অন্ত্যজশ্রেণী, মুসলমান হওয়াতে অসুবিধা ছিল না। গুরুমশাইরা সংসারের অন্যকাজ করেও পাঠশালায় শিক্ষাদানে লিপ্ত হতে পারতেন। পাঠশালা



অষ্টাদশ শতকেও পাঠ্যপুস্তক বলতে বোঝাতো তাল পাতার পুঁথিকেই। কয়েকশত পৃষ্ঠার দুষ্প্রাপ্য এই তাল পাতার পুঁথিটি এ জেলার জগতাই-এর বর্ষীয়ান জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর হেফাজতে রক্ষিত।

শিক্ষা ঠিক কোন সময় থেকে চালু হয় তা প্রমাণের অভাবে বলা কঠিন। 'টোল বা চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার আগে ছাত্রদের যে পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করতে হত তার বিবরণ আমরা সরকারি নথিপত্রে পাই।'[৫] 'গুরুমশাই-এর কুটির, চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির অথবা আবহাওয়া ভাল থাকলে গাছের নীচেও পাঠশালা বসত। পড়ুয়াদের মাটিতে দাগ কেটে অক্ষর পরিচিতি করাতেন গুরুমশাইরা। তালপাতা বা কলাপাতায় লেখা শেখান হত। পরে কাগজেও লেখান হত।'[৬] অ্যাডাম রিপোর্টে উল্লেখিত আছে শুধু স্মৃতি থেকে নয় পুঁথি ও ছাপানো বইও ছাত্রদের পড়ানো হচ্ছে। ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থের বিনিময়ে গুরুমশাই পাঠদান করতেন।

মুসলিম সমাজের ছাত্রদের পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণে বাধা না থাকলেও ইসলামী ধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য আরবী ফার্সী পঠন পাঠনের জন্য গড়ে ওঠে মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি।

চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব শিক্ষা সমাপ্ত করে পারিবারিক বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে পারত পড়ুয়ারা। সে যুগে কাজ চালানোর মত শিক্ষা এই সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষালয় থেকে ছাত্ররা লাভ করত। কেবল মাত্র মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীরাই টোল ও মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পেত। এগুলি ছিল উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে পড়তে ছাত্রদের থাকা-খাওয়া বা শিক্ষার কোনও খরচ দিতে হত না।

চতুষ্পাঠী টোল শিক্ষায় ব্যয় বহন করত জমিদার শ্রেণী। রানী ভবানী একাই বহু টোলের পণ্ডিতদের মাইনে ও ছাত্রদের ভাতা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পণ্ডিতদের করতে হত। পণ্ডিতরা জমিদারদের দেওয়া নিষ্কর জমি থেকে ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করত। রানীর দান অন্যান্য জমিদারদেরও প্রভাবিত করেছিল। কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ সংস্কৃত শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি কাশীর পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ পঞ্চাননকে নিয়ে এসে কাশিমবাজারে বেশ কয়েকটি চতুষ্পাঠী খোলেন। '*There were several Chatuspathis* at Kasimbazar where students flocked from other districts. The chief of the Paudits was Krishnath Nayapanchanan. He was profoundly versed, not only in Naya Sastra, but also in Smriti. He has studied Nyaya at Nadia and was considered a first rate Naiyayik'[৭] আঠারো শতকের শেষ দিকে কাশিমবাজারের আন্নাকালী দেবী বহরমপুরে ভিক্টোরিয়া জুবিলী টোল প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিল নবাব, অভিজাত, আমির ও ধনী মুসলমানেরা। মাদ্রাসায় ছাত্ররা বিনা খরচে খাওয়া, থাকার সুযোগ পেত। পড়াশোনা চালানোর কোনও বেতন লাগত না। ''রাজধানী শহর মুর্শিদাবাদের মতিঝিল এবং মনসুরগঞ্জে দুটি বড় বড় মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এ জাতীয় মাদ্রাসাগুলি কেবলমাত্র ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্রই ছিল না। এগুলিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য দক্ষ প্রশাসক, করণিক, সমরকর্মী, চিকিৎসক, আইনবেত্তা, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক দার্শনিকও তৈরী করত। ... শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের খ্যাতি বহুদূর থেকে বহু শিক্ষক ছাত্রকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। হাজিমমহম্মদ মহসীন হুগলীতে প্রাথমিক শিক্ষান্তে মুর্শিদাবাদে আসেন উচ্চশিক্ষালাভের জন্য। ... মুর্শিদকুলি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দুই হাজার কবি, কারী, শাস্ত্রবিদ, জ্ঞান চর্চা করতেন। গোলাম হোসেন তবাতবাই এর 'সিয়ার উল-মুতাখেরীন' অনুযায়ী আলিবর্দী খাঁ পশ্চিম প্রদেশ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত পণ্ডিতদের বৃত্তি ও ভাতা প্রদান করে তাদের মুর্শিদাবাদে বসবাসে অনুপ্রাণিত করেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হায়দারাবাদের মীর মহম্মদ আলি যিনি তার সঙ্গে আনেন দুই হাজার গ্রন্থ সমন্বিত সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার। নিজেও

রচনা করেন আরবী, ফার্সি ভাষায় কয়েখখানি গ্রন্থ।"[৮]

ফার্সী তখন রাজভাষা। ফার্সী শিক্ষার আলাদা মাদ্রাসাও ছিল। দরবারে চাকরি পেতে এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তরা একত্রে বোধহয় ফার্সীভাষা শিক্ষা করত। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু মধ্যবিত্ত হিন্দুই ফার্সী জানতেন। "Murshid Quli Khan, a financier par excellence, completely reorganised the revenue system and appointed Bengali Hindus to high and responsible positions in the revenue department. To that revolutionary change may be attributed the growth of a prosperous Bengali middle class in the 18th Century"[৯]

সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা মুর্শিদাবাদে নবাবদের দরবারে সমাদর পেতেন। পণ্ডিত বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন আলিবর্দীর সভাকবি। মুর্শিদাবাদের সিহারী গদ্দারী নিবাসী পরমানন্দ তর্ক পঞ্চাননের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে আলিবর্দী তাকে ৩৪১ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। নবাব সিরাজ ও মীরজাফরও তার পাণ্ডিত্যের সমাদর করেন। নিজামত আদালতে হিন্দু আইন বুঝিয়ে দেবার জন্য পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হত।

চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্য ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও পরে এর প্রভাবকে এড়াতে পারেনি। এর ফলে জাতিভেদ প্রথা সমাজে নির্মূল হওয়ার পরিবর্তে টিকে থাকল। বৈষ্ণব কেন্দ্রগলিতে পুজো করার অধিকার ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্ত্যজরা লাভ করেনি। মুসলিমদের দীক্ষিত করতে প্রায় সব বৈষ্ণবকেন্দ্রগুলিই অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে ভগবানগোলার তেলিয়াবুধূরী শ্রীপাট ব্যাতিক্রমী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বৈষ্ণবদের মধ্যে একসময় নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও পরকীয়া প্রেমের প্রাধান্য বৈষ্ণবধর্মের 'বৈপ্লবীক শক্তিকে ধ্বংস করেছিল।'[১০]

১৮ শতকে রাজা, জমিদার, নবাবদের ব্যক্তিগত দান সংস্কৃত চর্চারক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল। ১৯ শতকের প্রথমার্ধে সেই দান সংকুচিত হয়ে এল। জমিদাররা তাদের অবস্থার অবনতির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ভাতা দিতে অপারগ হলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রানী ভবানীর মৃত্যুর পর ইংরেজরা নানাভাবে তার দানকে সংকুচিত করেছিল। ১৭৫৭তে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় এবং ১৭৬৫তে ইংরেজদের সুবা বাংলার দেওয়ানী লাভ করায় নবাববংশ তখন ইংরেজদের পেনশনভোগী। ফলে টোল, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা শিক্ষায় অর্থের টান পড়ল। ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হল এবং অবৈতনিক থাকা খাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা কমে আসতে লাগল।

বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান পাঠ-শালাগুলিই নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে কালক্রমে প্রাইমারি স্কুল ও তার বিকাশের মাধ্যমেই মাধ্যমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবেই টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তবের যুগ পার হয়ে শিক্ষা স্কুলের যুগে পদার্পন করে।

মিশনারীরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশীয় পাঠশালা বেশি ব্যবহার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে মিশনারীরা শিক্ষা বিস্তারের কার্যকলাপ শুরু করে ১৮০৯ সালে। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী স্টিফেন সেটন মুর্শিদাবাদে এসে স্কুল সোসাইটি গঠন করেন স্থানীয় জনগণের কাছে দেড় হাজার টাকা চাঁদা তোলেন। সেই টাকায় তিনি গড় বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ শহর ও দৌলতাবাদে তিনটি স্কুল গড়ে তোলেন। কিন্তু সেগুলি অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। এবার লণ্ডন মিশনারীরা একাধিক মিশনারী স্কুল ও স্ত্রীশিক্ষার জন্যও স্কুল স্থাপন করেন। সেগুলিও অল্প অল্প সময়ের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে যায়। পাঠশালার গুরুমশাই থেকে শুরু করে জনসাধারণ তাদের খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধতা করায় তারা বিফল হন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারী কর্তৃক ছয়ঘরী ও দৌলতাবাদে

২টি স্কুল খোলা হয়। ১৮৪৬ সালে ছয়ঘরীর স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায় কারণ সেখানে ছাত্ররা বাইবেল পড়তে অস্বীকার করে। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় মিশনারীরা এই জেলায় ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের পথিকৃৎ। স্কুল শিক্ষায় ক্লাস সিস্টেম বা শ্রেণী বিভাগ মিশনারীরাই প্রথম চালু করেন। তারাই প্রথম পাঠশালা শিক্ষাক্রমের সাথে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল অন্তর্ভূক্ত করেন। ইংরেজ সরকার ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে কোনওরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সরকার ১৮২৪ সালে নবাব পরিবারের কিশোর যুবকদের নৈতিক ও চারিত্রিক মান সংশোধনের জন্যই মুর্শিদাবাদ শহরে নিজামত কলেজ স্থাপন করে। কিন্তু এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। পরে নবাব পরিবারের যুবকদের সাথে সাধারণ পরিবারের ছাত্রদেরও শিক্ষাগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। মুসলিম ছাত্ররা সে সময় ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী থাকায় ইংরাজি শিক্ষার ফল খুব খারাপ হয়। সরকার তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ১৮৪৫ সালে কলেজটি বন্ধ করে স্কুলে রূপান্তরিত করে। ১৮৪৫ সালে মিশনারীদের উদ্যোগে খাগড়া ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুর্শিদাবাদ জেলায় ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম সোপান। অ্যাডমকে অনুসন্ধান করে শিক্ষা সম্বন্ধে রিপোর্ট (১৮৩৫-৩৮) তৈরি করতে পাঠানোর মাধ্যমেই সরকারি স্তরে শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৮৪৪ সালে গভর্ণর জেনারেল হার্ডিঞ্জ সরকারি চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে জেলাস্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেন। এর জন্য তিনি তার নিজস্ব তহবিল খরচ করে বাংলায় ১০১ টি স্কুল খুলেছিলেন। এই পরিকল্পনায় ১৮৪৬ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় সৈদাবাদে ও জঙ্গিপুরে দুটি স্কুল খোলা হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে কান্দিতেও স্কুল খোলা হয়। হার্ডিঞ্জ পরিকল্পনায় প্রত্যেক স্কুলে একজন করে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছিল। ওই সময় সৈদাবাদ স্কুলে লেখাপড়ায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই স্কুলের পণ্ডিত অভয় চরণ রায় সরকারি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ইংরাজি চালু করেন। এতে এই স্কুলের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ বেড়ে যায়। হার্ডিঞ্জ-এর উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষায় স্কুল প্রতিষ্ঠা, কিন্তু দেশীয় মানুষের উৎসাহেই এখানে ইংরেজি পড়ানো শুরু হয়। এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের উৎসাহেই হার্ডিঞ্জ প্রতিষ্ঠিত এই ভার্ণাকুলার স্কুলগুলি কোনও কোনওটি দীর্ঘজীবন লাভ করে। যার মধ্যে সৈদাবাদ হার্ডিঞ্জ স্কুল অন্যতম। তাছাড়া সৈদাবাদ তখনও জনবসতিপূর্ণ বড়সড় গঞ্জ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই হার্ডিঞ্জ প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি যখন একের পর এক উঠে যাচ্ছে, তখন সৈদাবাদ হার্ডিঞ্জ স্কুল মিড্‌ল ভার্ণাকুলার স্কুলে উন্নীত হয়। এজন্য প্রয়োজন একাধিক শিক্ষকের। ১৮৭১-এ মহারাণী স্বর্ণময়ী দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিয়োগের প্রশ্নে মাসিক বেতন বাবদ ১৫ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। দীর্ঘদিন এভাবে চলার পর ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তৎপরতায় মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলটি উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর বিদ্যালয় কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রাজপরিবারের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যালয়টির নাম করণ করেন মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নামে।

১৮৫৪ সালে সরকারি উদ্যোগ খানিকটা প্রসারিত হয়। ব্রিটিশ হাউস অব কমেন্সের অন্তর্ভুক্ত সিলেক্ট কমিটি ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালায়। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি উড তার অনুসন্ধান পত্রিকা 'উড্‌স ডেসপ্যাচে' সরকারকে দেশীয় বিদ্যালয়কে উৎসাহ দিতে এবং নিম্নবর্গের মানুষের শিক্ষা দিবার জন্য সরকারকে উপযুক্ত মনোযোগ দেবার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ মেনে সরকার শিক্ষায় গ্রান্ট-ইন-এড্‌ প্রথা চালু করে। শর্ত হল স্থানীয় সম্মানীয় ব্যক্তিদের দায়িত্ব নিতে হবে। সরকার যে পরিমান অর্থ অনুদান দেবে তাদেরও সেই পরিমাণ আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। এই শর্ত মেনেই গোরাবাজার, বালুচর (জিয়াগঞ্জ) এবং

আজিমগঞ্জে তিনটি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ সালে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ছয়টি 'সুপিরিয়ার ভার্ণাকুলার স্কুল জেলায় গড়ে উঠে। খাগড়া, কাশিমবাজার, লালবাগ, শক্তিপুর, পাঁচথুপি, রাজারামপুর আর জঙ্গিপুরে 'সুপিরিয়ার ভর্ণাকুলার' স্কুলগুলি গড়ে ওঠে। ১৮৫৮-৬৪ সালে জেলার নটি জনবহুল ও সমৃদ্ধস্থানে 'এ্যাংলো ভর্ণাকুলার' স্কুল গড়ে ওঠে। এই স্কুলে বাংলার সাথে ইংরাজি সাহিত্য, ইংরাজি ব্যাকরণ, ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হত। গোয়াস, ভগীরথপুর, নশীপুর, লালগোলা, জঙ্গিপুর, শ্রীমন্তপুর, ফরিদপুর, ভগীরথপুর, পাটকেবাড়ী ও চোঁয়ায় এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়।[১১]

১৯১৩ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় সরকার পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ১ এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ৯, সাহায্যবিহীন স্কুল ৭টি। সরকার পরিচালিত স্কুলটি হল 'নবাব বাহাদুরের ইন্সটিটিউশন' আর সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাইস্কুল হল বানওয়াড়ীবাদ, বেলডাঙ্গা, ডোমকল, জঙ্গিপুর, জিয়াগঞ্জ, কাগ্রাম, কাঞ্চনতলা, খাগড়া ও সালার। সাহায্যহীন হাই স্কুলগুলি হল বহরমপুর কলিজিয়েট, ভগীরথপুর, গোকর্ণ, ইসলামপুর, কান্দি, পাঁচথুপি আর শক্তিপুর।[১২] স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৮৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত পলাশী থেকে সারগাছি পর্যন্ত কোনও প্রাথমিক স্কুল ছিল না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ অরফ্যানেজ মিড্‌ল ইংলিশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল' নামে কাঠের কাজ ও কাপড়বোনা শিক্ষা দেওয়ার স্কুল সারগাছিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'নিবেদিতার পরিকল্পনামাফিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল আশ্রমবাসী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বালক বালিকারা পাঠ লাভ করে। স্কুল উন্মুক্ত ছিল সকল ধর্মের ছাত্রদের কাছে। এই স্কুল পরে সরকারি অনুমোদন লাভ করে।'[১৩]

ঊনিশ শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৫৩ সালে বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা। যে কলেজ ১৯০৩ সাল থেকে 'কৃষ্ণনাথ কলেজ' রূপে পরিচিত। "The history of Krishnath college is a part of the history of Western education in Bengal and, in a wider sense, forms a chapter in the history of social and cultural progress of Bengal in the 19th and 20th Centuries.

Long before 1853, the year of the birth of this institution, the objective conditions were ready for the foundation of a college at Berhampore for imparting Western education. During the thirties and forties of the last century the people of Murshidabad felt the impulse of the Renaissance which had its start in Calcutta with the foundation of Hindu college in 1817."[১৪]

মুর্শিদাবাদের উর্বর ভূমিতে তুঁত আর তুলো চাষের সৃষ্ট জগৎবিখ্যাত মুর্শিদাবাদ রেশম আর সুতী কাপড় দেশে বিদেশে জলপথে ও স্থলপথে পাড়ি জমিয়ে বণিকী পুঁজির সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। মুর্শিদাবাদ সিল্কের আর সূতোর আকর্ষণেই ১৭-১৮ শতকে ইউরোপীয়ানদের এ জেলায় আগমন। আসে ডাচ্, ফরাসী, আর্মেনিয়ান ও ইংরেজ বণিকদল। এই পর্বেই উত্তর ভারতের ভাগ্যান্বেষী শেঠদেরও এ জেলায় আগমন। ১৭০৪ সালে মুর্শিদকুলির ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপনের এটি এক প্রধান কারণ। পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে সুবে বাংলার দেওয়ানী ইংরেজরা লাভ করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার এক ব্যাপক পটপরিবর্তন সূচিত হয়। এদেশের সঞ্চিত বণিকী পুঁজি শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার মত পরিস্থিতি সত্ত্বেও বৃটিশ পুঁজির বাধা এবং বৃটিশ শাসনের প্রতিকূলতায় তা বৃটিশ পণ্য কোম্পানিগুলির এজেন্ট, বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দিতে পরিণত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিল্পের পরিপূরক কাঁচামালের যোগান দেওয়ার জন্য এ জেলার কৃষিতেও পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে। তুঁতচাষ নতুন করে বাড়তে

কলেজে পাঠ্য বিষয় হবে কলা, বিজ্ঞান, আইন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান। তিনি এই কলেজ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাদের বাগানবাড়ি বানজেটিয়ায়। তিনি চেয়েছিলেন কলেজে সমস্ত ধরণের ইংরাজি বিদ্যা, বাংলা, ফার্সী ও সংস্কৃত শেখানো হোক। উপযুক্ত মেধাবী দেশীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষক উপযুক্ত মোটা মাইনের ভিত্তিতেই নিযুক্তি চেয়েছিলেন। কলেজের নাম দিতে চেয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণনাথ কলেজ।

১৮৪৪ সালের ৩০ অক্টোবর তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পূর্বের উইলের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ২য় উইল করে যান। দ্বিতীয় উইলে তিনি পরিষ্কারভাবে কলেজের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি লেখেন। উল্লেখ্য, ভারতে তখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হবে তার বানজেটিয়ার বিশাল দোতালা বাড়িতে। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হবে ইংরাজি, ল্যাটিন, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, আরবী ও বিজ্ঞান। এই বাড়ির পার্শ্বে একটি হাসপাতাল নির্মিত হবে। অভিজ্ঞ ইউরোপীয়ও ভারতীয় চিকিৎসক হাসপাতালে নিযুক্ত হয়ে কাজ করবে। অনেক পরে সুপ্রিম কোর্ট তার দুটি উইলই অকার্যকর ঘোষণা করে। '১৮৫৩ সালে বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০২ সালে তার ভাগ্নে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে কলেজের নতুন নাম 'কৃষ্ণনাথ কলেজ'রূপে অভিহিত হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজা কৃষ্ণনাথের স্বপ্নের আংশিক সফলতা প্রাপ্তি ঘটে।[১৭]

মহারাণী স্বর্ণময়ী

এদেশের শিক্ষা বিস্তারে ও আধুনিক কর্মোদ্যোগে অগ্রগণ্য নারী হিসাবে রাজা কৃষ্ণনাথের বিধবা পত্নী স্বর্ণময়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে যুগে বিত্তশালী পরিবারের বিধবাদের প্রাসাদ তৈরি করে কাশীবাসী হওয়ার কথা সে সময় মেয়েদের চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য প্রস্তাব বহরমপুরে আইন কলেজ স্থাপনের প্রয়াস, পরিশ্রুত পানীয় জলের আধুনিক ব্যবস্থা হিসাবে বহরমপুর জলট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা (রাণীর কল) বিস্ময়াভূত করে। জনকল্যাণমূলক বহু কাজে অগ্রসর হয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন একজন পর্দানসীন নারীও পুরুষের চেয়ে কোনও অংশেই কম নন। আমৃত্যু তিনি এই কর্মব্যস্ততায় জীবন কাটিয়েছেন। সমস্ত কাজ তিনি স্বয়ং পাল্কিতে চেপে তদারক করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টায় সামাজিক কু-আচার বহু বিবাহ রদের আন্দোলনে এ জেলা থেকে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তার স্বাক্ষর মিলেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দানের যে উল্লেখ নথিভূক্ত হয়েছে তার থেকে অনথিভূক্ত দানের পমিনই বেশি। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর নথিভূক্ত দানের উল্লেখ করা হল।

মেদিনীপুর হাইস্কুল ১০০০ টাকা, কলিকাতা বেথুন স্কুল ১৫০০ টাকা, বগুড়া ইন্সটিটিউশন ৫০০ টাকা, রাজশাহী মাদ্রাসা ৫০০০ টাকা, কটক কলেজ ২০০০ টাকা, রংপুর হাইস্কুল ৪০০০ টাকা, মিস মিলম্যানেরস্ত্রী শিক্ষায়ন ১০,০০০ টাকা, আলিগড় কলেজ ২০০০ টাকা, জিওলজিক্যাল সোসাইটি বাগান ১৪,০০০, কলিকাতা ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ৩,০০০ টাকা কলিকাতা হিন্দু হোস্টেল ৪,০০০ টাকা, স্টেন জেমস স্কুল ৫০০ টাকা, সংস্কৃত কলেজ (বৃত্তিদানের জন্য) ৮,০৫০ টাকা, জেনারেল অ্যাসেম্বলি কলেজ (বৃত্তিদানের জন্য) ৬০০ টাকা, বিশপ হেয়ারের বক্তৃতা অনুবাদের জন্য ১০০০ টাকা, দেশীয় স্ত্রীলোকদের শিক্ষাকল্পে নানাখাতে ৩০০০ টাকা, কেশব অ্যাকাডেমি ৫০০ টাকা, কলিকাতা মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশন ৫০০ টাকা, পুনরায় কেশব অ্যাকাডেমি ৫০০ টাকা, অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট স্থাপনার্থে ২০০০ টাকা।[১৮] অগণিত দরিদ্র ছাত্র

মহারাণীর কাছে সাহায্য পেয়েছেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের জন্য ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার রাণীর সাহায্যপ্রার্থী হলে তিনি আট হাজার টাকা দেন। কৃষ্ণনগর কলেজের জন্য ২০ বিঘা জমিদান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছেও তার দান পৌঁছেছিল। তাঁর দানের ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তাহল শিক্ষা ও সমাজসেবায় তার দান থাকলেও কোনও মন্দির নির্মাণে তাঁর কোনও সাহায্য নাই। "মহারাণী মহোদয়ার অশেষ বিধ কীর্তি থাকিলেও হিন্দু ভাবের কোনও বিশেষ স্থায়ীকীর্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।"[১৯] মাত্র ২২ বছরে রাজা কৃষ্ণনাথ মারা গেলে ইংরেজরা তাঁর সম্পত্তিতে কতৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে তারা কৃষ্ণনাথের দুটি উইল কোর্টে উপস্থিত করে। এই উইল গ্রাহ্য হলে স্বর্ণময়ী মাত্র ১৫০০ টাকা মাসোহারা পেতেন আর শিক্ষাবিস্তারের নামে কিছু ইংরেজ অফিসার রাজার বিপুল সম্পত্তির অধিকার করায়ত্ব করার অধিকার জন্মাত। শোকের মধ্যেও এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মহারাণী আত্মসমর্পণ না করে ঘুরে দাঁড়ান। তাকে সহায়তা করেন দেওয়ান রাজীবলোচন। ১৮৪৭ সালে ১৫ নাভেম্বর সুপ্রিমকোর্ট ২ টি উইলই অকার্যকর হিসাবে রায় দিলে স্বর্ণময়ীর জয় হয় এবং তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন। বর্ধমানের এক দরিদ্র পরিবারের প্রায় নিরক্ষর কন্যা স্বর্ণময়ী ১৬/১৭ বছর বয়সেই বিধবা হন। তখন তাঁর দুই কন্যা সন্তান লক্ষ্মীমণি ও সরস্বতী। তিনি উপলব্ধি করেন আইনী লড়াই চালাতে গেলে তাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি নিজেকে তৈরি করলেন। মাত্র তিন বছরে তিনি বাংলা ছাড়াও শিখলেন ইংরাজি, ফার্সি আর সংস্কৃত। স্বামীর আদর্শশিক্ষা তাকেও প্রভাবিত করতে পারে। ১৮৫৩ সালে বহরমপুরে একটি কলেজ স্থাপনার ব্যাপারে সরকার চিন্তাভাবনা শুরু করে। ওই বৎসরেই জেলা জজ ডি জে মনির বাসভবনে তার সভাপতিত্বে প্রায় দুশ জন সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বহরমপুরে একটি কলেজ স্থাপনের বিষয়ে সকলে একমত হন ওই সভাতেই সর্বসাধারণের দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯,০৮৬ টাকা। রাণী স্বর্ণময়ী তাতে সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা দান করেন। কলেজ গড়ার এই দান তহবিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দান ছাড়াও হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর মৌজার ৮৪ জন কৃষক ১ টাকা করে ৮৪ টাকা দান এবং জনৈক রাজকৃষ্ণ রায় এর বিধবা পত্নীর ২৫ টাকা দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৩ সালের ২৯ জুলাই কলেজের স্থায়ীভবন নির্মাণের জন্য এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুলাই কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর সিসিল বিডন। রাণী স্বর্ণময়ী সিসিল বিডনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে এই কলেজে আইন পড়া চালু করার প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১ বিঘা ৮ কাঠা ৯ ছটাক জমির উপর গথিক স্টাইলের নতুন ভবনে কলেজ চালু হয় ১৮৬৯ সালে ২৮ জুন।

রাণী স্বর্ণময়ী পর্দানুসীন ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে রাত্রি ১০ টা কোন কোনও দিন ১২টা পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে তাঁর নিজের বজরায় সময় কাটাতেন। সেই বজরায় কামরা আলোকমালায় সজ্জিত থাকত। বজরার উপরে সশস্ত্র সান্ত্রীরা পাহারা দিত। তাঁর এই রহস্যময় নিত্যাভ্যাস প্রতিদিনের কাজকর্ম নিয়ে নীরবে চিন্তায় আবগাহন করা বা নিজের কাজকে নিজেই মূল্যায়ন করার কারণে হতে পারে। তার কোনও ফটো বা ছবি পাওয়া যায়নি। হয়তো তিনি সচেতনভাবে এটাকে এড়িয়ে চলেছিলেন। অন্যান্য রাজা বা রাণীর মত জলের জন্য কোনও গড়ে বা পুষ্করণী কাটা নয় আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, শিক্ষায় অকাতরে দান অথচ মন্দির প্রতিষ্ঠায় তার কোনও দান না থাকা— তাঁর চরিত্রের হিউম্যানিস্ট বা মানবিকতার মূল্যবোধেরই প্রকাশ যা রেনেশাঁরই প্রতিফলন। তিনি কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে তার যে

বিমূর্ত ছবি এঁকে দিয়েছেন তা আজও অম্লান।

মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

'রাজা কৃষ্ণনাথ অপুত্রক থাকায় তার বিধবা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর রাজা কৃষ্ণনাথের ভগ্নী গোবিন্দ সুন্দরীর পুত্র মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজার জমিদারীর উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। রাজা হওয়ার আগে তিনি প্রবল অর্থ সংকটের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-সন্তান পরিজন সহ ত্রিশ জনের সংসার প্রতিপালন করতেন সাধারণ গৃহস্থের মতোই। তাই তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল এই বিপুল সম্পদ সাধারণের জন্য, আমি নিমিত্তমাত্র সাধারণের কল্যাণের কাজে এর সুষ্ঠু বণ্টনই আমার দায়।' শিক্ষাসহ জনকল্যানমূলক কজে মহারানী স্বর্ণময়ী যে দানের প্রবাহ সৃষ্টি করেন মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাকে আরও ব্যপক, বিস্তৃত ও গতিশীল করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, নাট্যজগৎ, সঙ্গীত সবক্ষেত্রে তার দক্ষিণহস্ত ছিল প্রসারিত। সেই যুগে তার দানের পরিমান ছিল মূল্যে তিন কোটি টাকা শুধু শিক্ষা বিস্তারেই এর পরিমান ছিল এক কোটি টাকা। কৃষ্ণনাথ কলেজের উন্নয়নে এই দানের পরিমান ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। ছাত্রাবাস নির্মান ছাত্রাবাসের জন্য জমিদানের পরিমান এই হিসাবের বাইরে।

১৭ বছর বয়সে বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামের কালীশ্বরী দাসীর সাথে বিয়ের আগেই তিনি হিস্ট্রী অব ফ্রেঞ্চ রেভ্যেলিউশন, রাসেলস্ হিস্ট্রীঅব ইউরোপ, গীবনস হিস্ট্রী অব রোমান এম্পায়ার, বার্কস ইমপিচমেন্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস, আফ্রিকান ট্রাভেলস্ ইত্যাদি পাঠ করেছিলেন। এছাড়া তিনি নিজে মনে করতেন অঙ্ক এবং আইনে পারদর্শী না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। পারিবারিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। বিবেকানন্দের চিন্তা ও প্রভাব দেশজুড়ে প্রবল জাত্যাভিমানের জন্ম দিয়েছিল মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তার দ্বারাও আলোড়িত হয়েছিলেন। বিংশ শতকের প্রথমেই মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কৃষ্ণনাথের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহন করেন। তার প্রস্তাবক্রমে একটি বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট গঠন করা হয় যার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। বহরমপুর কলেজের নাম কৃষ্ণনাথ কলেজ রাখার আবেদন জানালে গর্ভনমেন্ট তা অনুমোদন করে। ১৯০৩ সাল থেকে বহরমপুর কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজ নামে অভিহিত হয়ে আসছে। ১৯০৬ সালে এডওয়ার্ড মনমোহনী হুইলার অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দিলে মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীও হুইলারের যুগলবন্দী সারা দেশের মধ্যে এই কলেজ উল্লেখযোগ্য বিদ্যায়তনে উত্তরন ঘটে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত বিভাগকে নতুনভাবে সাজানো হয়। অত্যন্ত উন্নতমানের ল্যাবরেটারি গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের গতানুগতিক রান্নাবাড়া খাবার থেকে মুখ বদলের জন্য মাঝে মধ্যেই আমন্ত্রিত হত কাশিমবাজার রাজবাড়িতে। ছাত্রদের রাজবাড়িতে যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করতেন রাজা। প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতির পাতায় তার বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন— "My debts to these noble souls are irrepayable. I am Mr. Wheelar's intellectual child. The Maharaja was more to me than my own father." (My reminiscences of Rv. E. M Wheeler- Prof. Kausiknath Bhattacharyya. Krishnath College Centenary Volume.

'মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ছিলেন কলেজের "গৌরীসেন"। যখন যে কোন কাজে ছাত্রদের টাকার দরকার হইত মহারাজের কাছে অনায়াসেই পাওয়া যাইত। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তিনি সমস্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রগনকে নিমন্ত্রন করিতেন। তাঁহার কাশিমবাজার প্রাসাদে দলে দলে যাইয়া বুভুক্ষু হোস্টেলবাসীগন চর্ব-চোয়্য-লেহ্য-পেয় আহার করিতাম, আবার চারজন ছাত্র একত্রে

খাজাঞ্চিখানায় নাম লেখাইলে গড়ি ভাড়া পাঁচসিকা করিয়া পাওয়া যাইত। রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত বারান্দায় দলে দলে খাইতে বসিয়াছি; বৈষ্ণব মহারাজ গলবস্ত্র হইয়া জোড় হস্তে আমাদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছেন— সে দৃশ্য এখনও ভূলি নাই ...। (বহরমপুর কলেজের স্মৃতি ঃ শ্রী বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় Krishnath College Centenary Volume



আচার্য রেভা. ই. এম. হুইলার

আচার্য রেভা. ই. এম. হুইলার

'সংস্কৃত শাস্ত্রের আচার্য রামজয় বিদ্যাভূষনের দৌহিত্র আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর হেয়ার, ডিরোজিও, রিচার্ডসনের মত পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরুদের অগ্রগন্য ছাত্র তারই দৌহিত্র রেভারেণ্ড ই. এম.হুইলার। কৃষ্ণমোহনের বিদুষী কন্যা মনোমোহনীর বিয়ে হয় হুইলার সাহেবের পিতার সহিত।'

মনোমোহনী হুইলার সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপুত্র হুইলার সাহেব একাধিক বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ ল্যাটিনে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান লাভ করেন। হুইলার সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরই ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁর সময়েই কৃষ্ণনাথ কলেজের 'Augustan Age'। হুইলার সাহেবের ছাত্রপ্রীতি, খেলাধূলা প্রীতি এবং ইংরেজ পুলিশের হাত থেকে ছাত্রদের সুরক্ষিত রাখার কাহিনী আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কবিশেখর কালিদাস রায় আচার্য রেভা.ই.এম. হুইলার সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন 'বারান্দায় বা করিডোরে যাইবার সময় আমাদের কাঁধে হাত দিয়া কথা বলিতে বলিতে দুধারে দণ্ডায়মান ছাত্রদের দিকে হাসিয়া আপ্যায়ন করিতে করিতে চলিতেন।' 'ছাত্রাবাসে কোন ছাত্র অসুস্থ হইলে তিনি দুবেলা তাহার শর্য্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার ব্যাধির অবস্থা সম্বন্ধে সন্ধান লইতেন। ছাত্র যদি বলিত তাহার মাথার যন্ত্রনা হইতেছে, তাহা হইলে নিজ হাতে তাহার মাথা টিপিয়া দিতেন, গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন এবং শুশ্রূষা করিতেন। এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা একটু বলি। এফ. এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমার বুকে ফিক ধরিয়া

একটা বেদনা হইয়াছিল। আমাদের এফ. এ পরীক্ষা কলেজে হয় নাই, হইয়াছিল মিলিটারী ব্যারাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাহেবের মনোমালিন্য চলিতেছিল! সে জন্য সাহেবের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভার দেয় নাই। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁহার এক প্রতিনিধি পরীক্ষার হলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। আমি একহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া অন্যহাতে লিখিতেছিলাম। মুখে আমার ক্লেশের চিহ্ন। সাহেব হলে আসিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমার কাছে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া ভারপ্রাপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন— One chair please for this boy! ভারপ্রাপ্ত বলিলেন, "Is he sick?" সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "No, he is ill!" তারপর দপ্তরির হাত হইতে নিজেই চেয়ার লইয়া আনিয়া আমাকে বসাইলেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে উৎসাহিত করিলেন। কিছুক্ষন পরে একটি ট্যাবলেট আনিয়া আমাকে খাওয়াইলেন। সেদিন বারবার আমার কাছে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,"How do you feel my boy!" তারপর দিন দশটার সময় আসিয়া আগে আমার খোঁজ লইলেন। আমি ভালো আছি জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। এই খানে বলিয়া রাখি আমি একজন সাধারন ছাত্র মাত্র। (তথ্যসূত্রঃ আচার্য রেভা. ই. এম. হুইলার ঃ কবি শেখর কালি দাস রায়) হুইলার সাহেব সপ্তাহে ২৬ টা ক্লাস নিতেন। ৪টের পর অনার্সের ক্লাসে যেতেন যে দিন অনার্সের ক্লাস থাকত না বটানির ক্লাস নিতেন। এই বটানী বিষয়ে তার অনুরাগ ছিল। কোন অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকলে তিনি ফিলজফি, ইকনমিক্স ক্লাসও নিতেন। তার কঠোর পরিশ্রম অন্যান্য অধ্যাপকদেরও প্রভাবিত করত। পড়ানোর ব্যাপারেও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের কোন নাটক, কবিতা ইত্যাদি পড়ানোর আগে পাঠ্য বিষয়বস্তুর সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির অবস্থান সম্পর্কে ছাত্রদের ওয়াকিবহাল করতেন। তারপর পাঠ্য বিষয়ে প্রবেশ করতেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফ্লাউয়ার পোয়েমস্ পড়ানো শীতকাল অবধি মুলতবি রেখে নিজের বাগানের টবে তৈরি করা ডেইজী, প্রাইমরোজ, ড্যাফোডিল ফুলের টবগুলিকে ক্লাসের টেবিলে আনিয়ে ছাত্রদের ফুলগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে তারপর পড়ানো শুরু করতেন। সন্ধ্যায় প্রায়ই ছাত্রদের ডেকে এনে তাদের জলখাবার খাইয়ে শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং-এর কবিতার উপর স্পেশ্যাল ক্লাস নিতেন। "প্রতি রবিবারে ছাত্রদের বিশেষ করে মেইন হোস্টেলের ছাত্রদের বহরমপুরের আশেপাশে কখনও বহরমপুর শহর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে বটানিক্যাল এক্সকারসানে নিয়ে যেতেন। পথে চলতে চলতে প্রায়ই পথের পার্শ্বের উদ্ভিদের ফুল-পাতা পাড়তেন এবং তাদের বিভিন্ন অংশের নামও একের সাথে অন্যের কোথায় পার্থক্য বোঝাতেন। আমার মনে আছে এইরকম উদ্দেশ্যেই একবার আমরা মহারাজার বাগানবাড়ি বানজেটিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে সারাদিন ধরে বনভোজনে কাটিয়ে শুধু মাত্র মনোরঞ্জক খাদ্য খেয়েই নয় তাস খেলে, গান করে আমরা দিনটা উপভোগ করেছিলাম। মি. হুইলার নিজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাছাড়া তার গল্প বলার আশ্চর্যজনক ক্ষমতাও আমরা উপভোগ করেছিলাম।'

ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যাও হুইলার সাহেব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সেই সমস্যা থেকে তাদের মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। হুইলার সাহেবের স্মৃতি কথায় প্রফেসর কৌশিক ভট্টাচার্য উল্লেখ করছেন যে তাদের জমিদার তার প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করায় প্রজাদের দুরবস্থার কথা হুইলার সাহেবকে জানান। হুইলার সাহেব ধৈর্য ধরে সব শুনে বিষয়টি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের গ্রামে গিয়ে বিষয়টা ফয়সালা করেন।

একবার ডোমকল এলাকার কিছু ছাত্র মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির প্রজাদের উপর

নির্যাতনের কাহিনী হুইলার সাহেবকে জানান। সে সময় কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করেছেন কুখ্যাত স্টেনহাউস। তার স্বেচ্ছাচারিতা ও বাড়াবাড়ি নিয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'নায়েব মশাই' বই লেখা হয়েছে। হুইলার সাহেব ছাত্রদের মুখে সব কিছু শুনে ব্যাপারটা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি স্টেনহাউসের সাথে দেখা করেন। প্রথমে স্টেনহাউস সাহেব রেগে গেলেও হুইলার সাহেবের প্রভাবে বিষয়টা মিটিয়ে নেন এবং ছাত্রদের সাথেও হুইলার সাহেবের সাথে স্টেন হাউসের সখ্যতা হয়।

হুইলার সাহেব ১৯০০ সালে কিছু কিছু গ্রামে কো-অপারেটিভ সোসাইটি চালু করেছিলেন। এই সোসাইটির টাকা যোগাতেন মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। এর জন্য বিভিন্ন গ্রামে তিনি ঘোড়ারগাড়ি করে যেতেন। দেশীয় খাবার খেতে তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন। এবং খোলা গরুর গাড়িতে বালিশ না নিয়ে ঘুমাতেন। গ্রামবাসীদের সাথে সহজেই মিশতে, তাদের হৃদয়ের কথা শুনতে ভালবাসতেন।

হুইলার সাহেবের খেলাধূলা প্রীতি তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। বিকেলে তিনি ছেলেদের মাঠে নামিয়ে দিতেন। যারা খেলা ভালবাসত না তাদেরও মাঠে না গিয়ে কোনও উপায় থাকত না। তিনি ফুটবল, ক্রিকেট সবই খেলতেন। কিন্তু ফুটবলের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রতিযোগিতা মূলক খেলায় তিনি ছিলেন কলেজটিমের গোলকীপার। তিনি বহুবার কলেজটিমের হয়ে শহরের বাইরে খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। হুইলার সাহেব ও মনীন্দ্রচন্দ্রের উদ্যোগে বহরমপুরবাসীরা অনেক প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচ দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

ইংরেজ পুলিশের হাত থেকে ছাত্রদের রক্ষা করার ভূমিকায় হুইলার সাহেব ছিলেন অনন্য। তিনি যতদিন অধ্যক্ষ ছিলেন কোনও পুলিশ অফিসার কোনও ছাত্র বা শিক্ষককে কলেজ বা হোস্টেল থেকে গ্রেপ্তার করার সাহস পায়নি। এমনকি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেও তাদের বিফল মনোরথ হতে হয়েছে। সেই সময় কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্র বৃদ্ধি পাওয়ার এটিও এক অন্যতম কারণ।

একবার মেন হোস্টেলের ছাত্র কালীকুমার ব্যানার্জী ঘাটে স্নান করার পর গঙ্গা পাড়ে ধ্যান করছিল। সেই সময় ইউরোপীয় কুঠির চাকর এক ভেস্তিওয়ালা কালীকুমারকে ভিজিয়ে দেয়। কালীকুমার প্রতিবাদ করলে এক দর্জি, ভেস্তিওয়ালার পক্ষ নিয়ে কালীকুমারকে অপমান করে। আসলে ভেস্তিওয়ালা ও দর্জি দুজনেই ছিল কুঠির চাকর। এবার মেন হোস্টেলে অন্যান্য ছাত্ররা ঘটনা শুনে সকলে কুঠির দিকে ধাওয়া করে। কুটির জমাদার ছাত্রদের ফিরিয়ে দেয়। ছাত্ররা দর্জিকে খুন করার কথা বলে। ইউরোপীয়রা ভীত হয়ে মুর্শিদাবাদের এস পি ডিকেন্সকে ছাত্রদের গ্রেপ্তার ও শিক্ষা দেবার জন্য প্ররোচনা দেয়। ডিকেন্স একজন এস আইকে সঙ্গে নিয়ে মেইন হোস্টেলে ছাত্রদের ধরতে আসে। হুইলার সাহেব খবর পান। তিনি এসে এস আই-এর ঘাড় ধরে মেইন হোস্টেলের বারান্দা থেকে নামিয়ে দেন আর ডিকেন্সের কাছে গিয়ে বলেন, "Dickens and Donkey begin with the same letter 'D'"।

হুইলার সাহেবকে কলেজের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে দেখলে ১৯ শতকে এবং ২০ শতকের প্রথমার্ধে আক্ষরিক অর্থেই নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব হয়েছে কৃষ্ণনাথ কলেজে। সকলের সম্বন্ধে আলাদা করে লেখা অত্যন্ত শ্রম সাধ্য কাজ।

১৯ শতকের রেনেশাঁর চেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক ও মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের অপ্রতিরোধ্য তেজ ও সাহসের সাথে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা

করেছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। পুলিশী নির্যাতনকে তারা পরোয়া করেনি। ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে আপোষহীন ও আপোষমুখী ২টি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষ্ণনাথ কলেজেও এই ২টি ধারাই ছিল এবং পরিপুষ্টতা লাভ করেছিল। আপোষহীন বিপ্লবী ধারার সমস্ত বিপ্লবী সংগঠন ও গুপ্ত সমিতি এখানে গড়ে উঠেছিল আবার আপোষমুখী গান্ধীবাদী ধারাও এখানে সক্রিয় ছিল।

১৯ শতকের বিপ্লবী চিন্তা চেতনার ভিত্তিতেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়েছে। নলিনী বাগচী ও মাস্টারদা যে পথে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সুভাষ বোস যেভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। আপোষের মারফৎ বৃটিশ শর্ত মেনে পাকিস্তান, ভারত ভাগ শিরোধার্য করে স্বাধীনতা এসেছে। স্বাধীন ভারতের মুক্ত ভূমিতে জাত-পাত ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে এক ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের এবং সে শিক্ষার আলোকে অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকার দুরীভূত করার কথা, কিন্তু তার পরিবর্তে ইতিহাস বিকৃতি, ভেদবুদ্ধি, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা শিক্ষা অঙ্গনকে কলুষিত করছে। শিক্ষার বিকাশের পরিবর্তে শিক্ষা ব্যয়বহুল ওসংকুচিত হয়ে চলেছে। শত সহস্র মানুষের আত্মত্যাগ, জীবন কোরবানির মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা তাই পূর্ণ স্বাধীনতা আনে নি। যুগের প্রয়োজনে নতুন শিক্ষাকে হাতিয়ার করে অসংখ্য বিপ্লবীর অতৃপ্ত অপূরিত স্বপ্নকে সফল করতে এগিয়ে চলাই হবে ইতিহাস চর্চার যথার্থ শিক্ষা।

তথ্যসূত্র

১। History of krishnath college, chapter one. The back ground :Krishnath College centenary Volume. ২। মুর্শিদাবাদ জেলার বৈষ্ণব ধর্মের ইতিবৃত্ত— শক্তিনাথ ঝা।
৩,৪,৫। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাংস্কৃতিক মুক্তধারা ঃ ঐতিহাসিক সমীক্ষা — দেবশ্রী রায়।
৬। History of Krishnath College, The background : Krishnath College centenary Volume. ৭। প্রাক্-পলাশী বাংলা— সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৮। মুর্শিদাবাদে আধুনিক শিক্ষার ধারা— শামশুল আলম (শতবর্ষ উদ্‌যাপন স্মরণিকা ডোমকল ভবতারণ উচ্চবিদ্যালয়।) ৯। History of Krishnath College– Krishnath College centenary Volume. ১০। প্রাক্-পলাশী বাংলা— সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১১। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাংস্কৃতিক মুক্তধারা ঃ দেবশ্রী রায়।
১২। Bengal District Gazetters Murshidabad : L. S. S. O'Malley
১৩। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাংস্কৃতিক মুক্তধারা ঃ দেবশ্রী রায়।
১৪। চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত — সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত। ১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা — Krishnath College centenary Volume.
১৬। Krishnath College centenary Volume. ১৭। Krishnath College centenary Volume. ১৮। মহারাণী স্বর্ণময়ী ঃ শ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায় Krishnath College centenary Volume.
১৯। মুর্শিদাবাদ কাহিনী— নিখিলনাথ রায়। পৃ: ৩০৯।
২০। আচার্য রেভা. ই. এম. হুইলার— কবিশেখর কালিদাস রায় Krishnath College centenary Volume.

শিক্ষা প্রসারে মহারাণী স্বর্ণময়ী — মহাফেজখানা থেকে

বিদিশা চক্রবর্তী

জন্মকালে সারদাসুন্দরী নামকরণ হওয়া সত্ত্বেও, মহারাণী স্বর্ণময়ী নামেই তিনি পরিচিত। মাত্র এগারো বছর বয়সে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর অকালমৃত্যুতে মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। স্বামীর উইল অনুযায়ী তাঁর প্রাপ্তি ছিল নাম মাত্র।* কিন্তু মোকদ্দমা করে তিনি স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিনী হন। বনেদী হিন্দু ঘরের বিধবা হিসাবে তিনি ছিলেন পর্দানসীন যদিও তা তাঁর পরবর্তী কর্মব্যস্ত জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জমিদারী চালানোর সাথে সাথে দানধ্যানেও তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মহিলা শিক্ষা প্রসারে তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কথা আমরা তাঁর মহিলাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদানের কথা থেকেই জানতে পারি। কিন্তু এ ব্যতীত সংস্কৃত শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা আমাদের কাছে প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। সরকারি নথিপত্র নাড়াচাড়া করলে এর কিছু নজির আমরা পাই। তারই কয়েকটা এখানে তুলে দেওয়া হল।

নিজে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবতী, ধার্মিক, পর্দানসীন হিন্দু বিধবা, তাই পুরুষ চিকিৎসকদের কাছে অসুখ সারানোর অসুবিধেটা তিনি বুঝেছিলেন বলেই এমন একটা পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

> "The want of properly educated female medical practitioners for the treatment of persons of my sex has been felt by me for a long time ... Consequently, I have now made up my mind to do what little I can to lay the foundation, and as it were, of a work which might be completed in the hands of far abler and competent persons..."
>
> [GENERAL (EDUCATION). FILE 89-8-9, DECEMBER, 1884]

কি পদক্ষেপ তিনি নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন তাও আমরা তাঁর চিঠি থেকে জানতে পারি।

> "I had thought of establishing an institution in this district of Moorshedabad for imparting medical education to the females through the medium of the Bengalee and the English languages. But ... I have been convinced that an institution of the kind is not likely to be a success here. Whereas one, if located in Calcutta and incorporated with the Medical College there, is sure to succeed and realise my long-cherished hopes. An institution of

*. BOARD OF REVENUE (WARDS), NO. 13, JAN-DEC 1845, VOL. NO. 96]

that sort, however, is likely to require a fund which, having regard to my finances and present state of affairs, I regret to say I do not feel myself justified in endowing in full.

3. Under the circumtances, I have thought it proper to place, at the disposal of our noble and benevolent government, the sum of rupees one lakh and fifty thousand and in order that it may be pleased to accept the amount and supplement the same by such aid as may be necessary, and adopt such measures as may be considered desirable and proper, so that my intention may be carried out and fulfilled ...

[Do]

১৮৮১ সালে বাংলাদেশের লেফঃ গভর্ণর যখন দেশীয় শিক্ষা প্রসারের প্রতি নজর দিতে শুরু করেন তখন মহারাণী স্বর্ণময়ী এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে পড়েন। সংস্কৃত ভাষাকে আবার তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের জন্য জলপানির কথা ভাবেন। এবং এই মর্মে তিনি তৎকালীন ডি পি আই A. W. Goft-কে এক চিঠি লেখেন, যার কিছুটা অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

Sir,

It affords me unalloyed delight to understand that the Sanskrit, the much boasted language of this country, which was once in the height of its glory, lut is now reduced to a state of utter insignificance, is in the way of being revived, and that this honour the lieutenant Governor whose willingness to help in everything that contributes to the discrimination of Native Education, is a fact universally known and acknowledged has kindly taken in the matter in hand. In furtherance of the noble cause I beg to enclose a donation of Rupees Eight thousand and Fifty (Rs. 50/- is added to cover premiun charge if needed, to be otherwise in some suitable way disposed) which I request you to invest in 4 per cent Government securities yielding an annual income of R. 320/- out of which Rs. 300/- should go towards the establishment of four scholarships as detailed below ...

The most successful students in Darsana (Hindu Philosophy), Snriti (Hindu Law), Vedas and Shahitya (General Literature) should each receive a scholarship of Rs. 8, 7, 6 and 4 a month which will be tenable for one year ...

Cossimbazar Sd/- Maharanee Surnomoyee
Rajbaree
The 31st. January, 1881.
[GENERAL (EDUCATION), MARCH 1881, PROCEEDING NO. B 1-3]

শিক্ষার বিভিন্ন শাখার উন্নতিসানের কথা তিনি ভাবতেন। তাই চিকিৎসাবিদ্যায় মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণের সুবিধার্থে দান, সংস্কৃত ভাষার উন্নতি প্রকল্পে সাহায্য'র পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষার উন্নতি সাধনেও তিনি ব্রতী হন। তাই যখন বাংলার ছোটলাট ক্যাম্বেল বহরমপুর কলেজ থেকে বি. এ. পঠনপাঠন তুলে দিয়ে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন, তখন তার মান-উন্নয়নের জন্য মহারাণী কলেজের ব্যয়-নির্বাহের জন্য দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট J. Anderson-কে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে জেলায় কারিগরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি ২০,০০০ টাকা দানে বিশেষভাবে উৎসুক। চিঠিটির

No. 2264

Moharanee Surnomoyee

MEMBER OF THE IMPERIAL ORDER OF THE CROWN OF INDIA.

The Under Secretary to the

Government of Bengal

General Dept. Education Branch

Dated Cossimbazar Rajbati, the 24th December 1903.

Sir,

With reference to the accompanying copy of a letter from the Principal, Sanskrit College, Calcutta No 180, dated the 11th Instant, I have the honor to forward herewith Rupees (two) hundred, being the 5th instalment of my annual contribution for the creation of studentships in the Sanskrit Collegiate

Half F. C.

Rs 20100

Rs 6683

Total Rs

I have the honor to be

Sir

Your most obedt Servant

Moharanee Surnomoyee

মহারাণী স্বর্ণময়ী

18-1-03-1000

কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

Sir,

... I have the honour to state that on consultation with the Board of Trusties, Berhampore College I have come to the following conclusion as to the disposal of my promised endowment of Rs. 20,000/- Twenty thousand for the promotion of Technical Education in this district.

... endowment of (1) a class at the Berhampore Collegiate School to which the present Technical School under their charge should be transferred along with its apparatus and materials and (2) of fceder classes atleast at some of the elementary schools maintained by and situated within the municipality.

... I feel no hesitation in stating that the arrangements proposed, if carried into effect will infuse new life in the existing Instructions and extend the scope of usefulness and operation of the one to be founded.

Sd/- Moharany Shurnamoye

Cossimbazar
Rajbaree the
– July/87
[GENERAL (EDUCATION), AUG, 1887, NOS. B 96/97]

উপরিউক্ত চিঠিগুলি থেকে আমরা মহারাণী স্বর্ণময়ী শিক্ষা প্রসারে যে ভূমিকা রেখে গেছেন তার একটা আন্দাজমাত্র পাই, কারণ তাঁর কর্মজীবনের বৃহৎ পরিধিকে এইটুকু লেখার মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহাফেজখানা থেকে তাঁর একটি চিঠির প্রতিলিপি আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

মুর্শিদাবাদ চর্চার রকমফের

দেবশ্রী দাস

১. ভূমিকা

১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ মুকসুদাবাদের জীবনে বড় অর্থবহ। ঢাকার দেওয়ান তাঁর দেওয়ানী কার্যালয় নিয়ে এলেন এখানে। কালক্রমে মুকসুদাবাদ হয় মুর্শিদাবাদ। বহু মানুষের শুরু হয় আনাগোনা। তবে বৈভবের দিন খুব বেশি স্থায়ী হয়নি। ক্রমে শ্রীহীন হয়। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ৩০০ বছর অতিক্রম করে এই নগরী। ইংরজে শাসনের প্রথম সোপান হিসাবে নানা গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রচিত হয়েছে নানা গ্রন্থ। দেশি-বিদেশি বহু লেখক এই অঞ্চলকে চেনাতে চেয়েছেন। তবুও এর সব চর্চা শেষ হয়নি সেই 'চেনা-অচেনার' কথা বলার জন্যই এই লেখার অবতারণা।

২. ফার্সী ও উর্দু উপাদান

দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ তখন সবেমাত্র স্থিত হয়েছেন মুকসুদাবাদে। নানা মানুষ নানা অভিপ্সা নিয়ে এই অঞ্চলে বাসা বাঁধছেন। ক্রমে দেওয়ান হয়েছেন স্বাধীন নবাব। সুতরাং মানুষের আকর্ষণ ক্রমাগত বেড়েছে মুর্শিদাবাদের প্রতি। নিশ্চিত আশ্রয় ও সহানুভূতিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছেন ফার্সী ও উর্দু পণ্ডিতবর্গ। তাঁরা তাঁদের সাবলীল লেখনী দিয়ে করে চলেছেন প্রভূ বন্দনা। এঁকে চলেছেন নানা যুদ্ধের বর্ণময় চিত্র, রণক্ষেত্রে নবাবদের বীরত্ব, নবাবী দরবারের বর্ণময় দ্যুতি। তাঁদের রচনায় ধরা পড়েছে নবাবী শাসনের স্বরূপ, নবাবদের মহানুভবতা, নবাবী মেজাজ আবার নবাবদের অসহায়তাও। এই চিত্রকরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বালমুকুন্দ, মুনশী সলিমুল্লাহ, ইউসুফ আলি খান, সৈয়দ করম আলী, গোলাম হোসেন খান তাবাতাবাই, গোলাম হোসেন সলিম, মোহাম্মদ আলী খান, মোহাম্মদ ওয়াফা, মোহাম্মদ হোসেন আজাদ বিলগ্রামী।

২.১ বালমুকুন্দ

বালমুকুন্দ তাঁর গ্রন্থ *ইবরাত-ই-আরবার-ই-বাসার* রচনা করেন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বিষয় ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস। তবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে মারাঠা অভিযান, আলীবর্দীর শাসনব্যবস্থা, সিরাজের পূর্ণিয়া ও কোলকাতা অভিযান।

২.২ মুনশী সলিমুল্লাহ

নবাব মিরজাফরের মুন্সী ছিলেন সলিমুল্লাহ। তাঁর গ্রন্থ *তারিখ-ই-বাংলা*। তিনি গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের মুন্সীও ছিলেন। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস তাঁর উপজীব্য বিষয়। শোভা সিংহের বিদ্রোহ, মুর্শিদকুলী খাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব তিনি বিশদভাবে চিত্রিত করেছেন। তবে সমকালীন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আকৃষ্ট হয়েছেন বেশি। শাসন ব্যবস্থা ও রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে দিয়েছেন নানা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য। তবে তথ্য সংগ্রহে তিনি সবসময় তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন না। ঘটনার ক্রম নয়, আবেগ হয়েছে অনেক সময় তাঁর লেখনীর চালক। তবুও পরবর্তীকালের লেখক গোলাম হোসেন সেলিম জইদপুরীর ও আবদুল করীমের রচনায় তিনি উদ্ধৃত হয়েছেন। ফ্রান্সিস গ্লাডউইন তাঁর রচনা 'A narrative of the Transactions in Bengal'-এ করেছেন সলীমুল্লাহের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অনুবাদ।

২.৩ ইউসুফ আলি খান

ইউসুফ আলি খান ছিলেন সরফরাজ খানের জামাতা। তবুও নবাব আলীবর্দী খানের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শেষ করেছিলেন তাঁর গ্রন্থ *তারিখ-ই-বাংলা মহাবৎজঙ্গ*। তিনি সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্রায়ণ করেছেন অকপটভাবে। ঘটনার নিখুঁত বর্ণনায় ও বিচার বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন অনন্য। সহজ-সরল অথচ-অকপট তাঁর লেখনী যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনায় ছিল অত্যন্ত সাবলীল।

২.৪ সৈয়দ করম আলী

করম আলীর অমূল্য কৃতিত্ব হল *মুজাফ্ফর নামা*। তাঁর পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ রেজা আলী খানের অবমাননা ও লাঞ্ছনা তাড়িত করেছিল তাঁকে লেখনী ধরতে। এই গ্রন্থ শেষ হয়েছিল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থের বিষয় ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস। তবে খুব দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন নবাব পূর্ববর্তী সময়ে নবাব আলীবর্দীর জীবন। অসংখ্য সদ্গুণের আধার ছিলেন তিনি। ছিলেন জ্ঞানী-গুণীজনের আশ্রয়স্থল। সমকালীন সমাজ জীবন ছিল স্বচ্ছল। তবে আলীবর্দীর মৃত্যুতে সেই সমাজ কাঠামো হয়েছিল বিশৃঙ্খল।

২.৫ গোলাম হোসেন খান তাবাতাবাই (১৭৭২-১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ)

কবিতা, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। মহাকাব্য প্রমাণ তিনটি খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন প্রাচীনকাল থেকে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস। ১৭০৭ থেকে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে তাঁর *সিয়ারে মুতাক্ষরীণে* (A view of Modern Times), ভারত তথা বাংলার সমকালীন ঘটনার মুকুর তাঁর রচনা। সুশিক্ষা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন তিনি। আঠারো শতকের অবক্ষয়, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা, হিন্দু-মুসলমান সমাজের উৎসব ও নবাবী সভা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বৃটিশ অপশাসনের আলোচনায় তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন ও অকপট।

২.৬ গোলাম হোসেন সেলিম জইদপুরী

তাঁর জন্ম অযোধ্যার জইদপুরে। মালদহে কোম্পানির বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট জর্জ উড্‌মী'র মুন্সী ছিলেন তিনি। এই সময়ে কোম্পানির চিঠিপত্র, ফারমান, দলিল, পাণ্ডুলিপি তাঁর গোচরে আসে। উডনীর নির্দেশে ১৭৮৬-৮৭ সালে তিনি *রিয়াজ-উস-সালাতিন* রচনা করেন। ১২০০ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি। আফগান ও মুঘলযুগের শাসকদের ধারাবাহিক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, ভৌগোলিক পরিবেশ, শহর-বন্দর-চাকলা-পরগণার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারও তাঁর আলোচ্য বিষয়। সমাদর করেছেন ইংরজেরদের সদ্‌গুণের। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ফার্সী ভাষায় ইতিহাস রচনার ধারা রুদ্ধ হয়।

২.৭ মোহাম্মদ আলী খান

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন *তারিখ-ই-মুজাফ্‌ফরী* গ্রন্থ। মোহাম্মদ রেজা খান মুজাফ্‌ফর জঙ্গের নামাঙ্কিত এই রচনা ভারতে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ-দৌলার-পতন পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস লিখেছেন তিনি। বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাও বাদ যায়নি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে তাঁর পাণ্ডুলিপি।

২.৮ মোহাম্মদ ওয়াফা

আজিমাবাদের অধিবাসী শাহ মহম্মদ-ই-ওয়াফা ছিলেন আলীবর্দী খানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৭৪০ থেকে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা নিয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থ *ওয়াকিয়াৎ-ই-ফৎ-ই-বাঙ্গালা* বা *ওয়াকিয়াৎ-ই-মহব্বতজঙ্গ।* নবাব আলীবর্দীকে উৎসর্গ করা এই গ্রন্থে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় সন তারিখ ও আফগানদের সম্পর্কে।

২.৯ মোহাম্মদ হোসেন আজাদ বিলগ্রামী

মোহাম্মদ হোসেন আজাদ বিলগ্রামী ইরাণ থেকে ঢাকাতে এসেছিলেন। লাভ করেছিলেন সুজাউদ্দিন খানের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের পৃষ্ঠপোষকতা। তাঁর *নৌবাহারি মুর্শিদকুলী খান* গ্রন্থে পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের করেছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা। মীরজুমলা ও মহম্মদ আজম শাহের শাসনকাল সম্পর্কে দিয়েছেন মূল্যবান তথ্য। ফার্সী কবি ও ঐতিহাসিকরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরার চেষ্টা করেছেন সমকালকে। তাই বিশেষ বিশেষ সময়ের বা ঘটনার অভিঘাত ধরা পড়েছে তাঁদের রচনায়। এঁদের রচনা এখন প্রায় অমিল। তাই একটু বিশদেই এগুলোর আলোচনা থাকল।

৩. সরকারি নথিপত্র ও প্রশাসকদের রচনা

ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতকে ভালো করে জানার তাগিদও বেড়ে যায় প্রশাসকদের। নিজ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রমে W.W. Hunter ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেছেন তাঁর *A Statistical Account of Bengal*, Vol-IX পাবনা সহ মুর্শিদাবাদ জেলার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। ভৌগোলিক অবস্থান, জনবিন্যাস, কৃষি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে বিশদ তথ্যের পসরা সাজিয়েছেন তিনি।

এরপর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দশবৎসর অন্তর প্রকাশিত হয়েছে জনবিন্যাস সংক্রান্ত প্রতিবেদন। স্বাধীনোত্তর কালে অক্লান্ত পরিশ্রমে অশোক মিত্র মহাশয় তৈরি করেছেন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এবং বিশ্বেশ্বর রায় প্রস্তুত করেছেন ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিবেদন।

হান্টারের পথ ধরেই হেঁটেছেন L. S. S. O'Malley তাঁর *Gazetter of the Murshidabad District, Selection from unpublished records of Government, for the years 1748 to 1767 inclusive*-এ জেলার বিবরণ, ইতিহাস, জনবিন্যাস, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কর-মজুরী-মূল্য, স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষার কথা আলোচনা করেছেন। একই ধারা অনুসরণ করে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় *West Bengal District Gazetter.*

এছাড়া West Bengal District Records-এর নতুন পর্য্যায়ে কিছু তথ্য মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশিত। *Murshidabad Nizamut Letters issued part-I* (1802-1831), *Murshidabad Letters issued Part - II* (1834-1872) এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত উপাদানগুলি নবাবীযুগের পরবর্তীকালের অবক্ষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। বহরমপুর কালেক্টরেটের তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে *Murshidabad affairs* 1821-50 নামে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় Persian Correspendence এবং Fort William Correspondence-এর নাম। নবাবী আমলের ইতিহাস রচনায় এরা বিশেষ সহায়ক। কুটির শিল্পের বিভিন্ন ধারা যেমন হাতির দাঁত কিংবা রেশমের উপর মনোগ্রাফ বা একক প্রবন্ধ ও বিশেষ অপরিহার্য উপাদান ওই শিল্পগুলোর ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায়।

৪. জনপ্রিয় স্থানীয় ইতিহাস

এই পর্বের ইতিহাসকাররা গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। তবে এরা প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক সত্য যাচাই করার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষায় ছিলেন অক্লান্ত। লেখাকে তথ্যনিষ্ঠ ও সজীব করার জন্য করেছেন নিরন্তর তথ্যের অনুসন্ধান। স্থানীয় সময়পঞ্জী, ফার্সী গ্রন্থ, ইংরাজ লেখকদের রচনার বহুল ব্যবহার করেছেন এঁরা। এঁদের নাম ও রচনা সকলেরই খুব জানা। তাই নাম উল্লেখেই নিরত থাকছি। এঁদের মধ্যে উল্লেযোগ্য হলেন শ্যামধন মুখোপাধ্যায় (*মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, ১৮৬৪), নিখিলনাথ রায় (*মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, ১৯০২/ *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, ১৮৯৭/ *জগৎশেঠ*, ১৯১২), অক্ষয় কুমার মৈত্র (*সিরাজ-দৌল্লা*, ১৮৯৭, *মীরকাশিম*, ১৯১২), J. H. Tullwalsh (*A History of Murshidabad district, Biographies of some of its noted families*, 1902) রসিকলাল গুপ্ত (*মহারাজ রাজবল্লভ ও তৎকালীন বাংলার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ*, ১৯০৪), P. C. Mojumder (*The Musnud of Murshidabad*, 1704-1908, 1905,) শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (*মুর্শিদাবাদ কথা*, ১৯৩২-৩৭), কমল বন্দোপাধ্যায় (*মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি, দুই খণ্ড*), প্রতিভারঞ্জন মৈত্র (*মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, ১৯৭৯), বিশ্বনাথ রায় (*A peep through the Hazarduari palace of Murshidabad*, 1981)।

এছাড়া দুটি সম্পাদিত গ্রন্থের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করতেই হয়। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিভারঞ্জন মৈত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *মুর্শিদাবাদ চর্চা*। মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মূল্যবান লেখার সংগ্রহ এটি। অন্যটি ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্যের স্মরণে প্রকাশিত *মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক ধারা* ১৯২৫-১৯৭৫। এই সঙ্কলনে মুর্শিদাবাদের

বামপন্থী আন্দোলন এবং অনন্ত ভট্টাচার্যের স্মরণ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

৫. গবেষণা গ্রন্থ

৫.১ প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গত শতকের একেবারে প্রথমদিকে বহু প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই অঞ্চল। নবাবী আমলের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের গবেষণার বিষয়। ড. কালীকিঙ্কর দত্ত তাঁর *Alivardi and his time,* 1905, গ্রন্থে আঠারো শতকের বিশৃঙ্খল ঘটনাপ্রবাহকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে ড. নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের *Mir Quasim, the Nowab of Bengal* 1760-1763, প্রশাসক হিসাবে মীরকাশিমের সুনাম থাকলেও সমসাময়িক মুসলিম জগতে তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রপ্রিয় নবাব। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *Maharaja Rajballov* (১৯৪৩) গ্রন্থে সমসাময়িক তথ্যের বিশ্লেষণে রাজা রাজবল্লভের তথ্যনিষ্ঠ চরিত্র এঁকেছেন। ড. অতুল চন্দ্র রায়ের *The Career of Mirjafar* প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। শাসক হিসাবে মিরজাফরের অদক্ষতাকে তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। আবদুল করিম তাঁর *Murshid Quli Khan and his times* (1963) গ্রন্থে মুর্শিদকুলীর শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ষাটের দশকেই প্রকাশিত হয়েছে J.H. Little-এর *The House of Jagat Seth (1967)* বি. কে. রায়ের *The Career and Achievements of Maharaja Nandakumar* (1969), Khan Abdul Majid Khan-এর *The transition in Bengal* (1969)
এই সমস্ত গবেষণাগ্রন্থে আলোচনাকাল মোটামুটি ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ। অধিকাংশ গবেষণাই নবাবদের রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিক উত্থানপতন এবং ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা বিশ্লেষণই তাঁদের গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয়। কি আধুনিক বাংলা ইতিহাস নির্মাণে বা মুর্শিদাবাদ জেলার কায়া রূপায়ণে এই গবেষণা গ্রন্থগুলোর সাহায্য অপরিহার্য।

গবেষণার ধারা আবার বেগবতী হয়েছে বিশ শতকের সত্তরের দশকে। নতুন আকর বিশ্লেষণ করে গবেষণার মোড় ফিরিয়েছেন ড. সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। কাশিমবাজার রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী তিনি। তাঁর *Life and Times of Kanta Babu, the benian of warren Hastings,* 1742-1804, 2 vols (1978) এবং *History of Cossimbazar Raj in the Nineteenth century,* 1804-1897 (1986) গ্রন্থে নন্দী পরিবার তথা মুর্শিদাবাদ ও বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকাকে তুলেছেন দক্ষ কারিগরের অনায়াস প্রচেষ্টায়। তাঁর ইতিহাস রচনার মালমসলা সংগৃহীত হয়েছে কান্তবাবুর ডায়েরি, হিসাবের খাতা, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে।

পুরাতত্ত্ব ও স্থাপত্য ভাস্কর্য গবেষণায় *পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ* (১৯৮২) গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। লেখক শ্রী বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠায় এই ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আগেই ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে খান মহম্মদ মহসীনের অমূল্য গবেষণাগ্রন্থ *A Bengal district in transition : Murshidabad* 1765-1793 দক্ষ ঐতিহাসিকের নিপুণতায় তিনি তুলে ধরেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিহাস। বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে ড. নন্দ দুলাল ভট্টাচার্যের Ph. D. গবেষণা সন্দর্ভ *A study in settlement geography in the District of Murshidabad.* এই গবেষণা গ্রন্থের

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যায় বি রায় সম্পাদিত ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস হ্যাণ্ড বুক-এ। ড. নন্দদুলাল ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণায় তুলে ধরেছেন মুর্শিদাবাদের ভূসংস্থান ও জনবসতি গড়ে ওঠার কাহিনী।

ড. বিষাণ গুপ্তের *The Political Movements of Murshidabad* (1920-1947) প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের এক বিশ্বস্ত দলিল তাঁর এই গবেষণার গ্রন্থটি। ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায় তাঁর *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ* (১৯৯৪) গ্রন্থে নবাবী আমলের জমিদার শ্রেণীর সামাজিক বিন্যাস, নবাবের বিরোধী গোষ্ঠী ও তাদের ষড়যন্ত্র, ইংরাজদের অংশগ্রহণ ও পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ সংঘটনে দেশীয় জমিদার ও অভিজাতদের যে বড় ভূমিকা ছিল সেই সামাজিক প্রেক্ষিত তিনি খুব সহজে তুলে ধরেছেন সমকালীন দলিলপত্রের ভিত্তিতে।

অধ্যাপক সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্তের পাণ্ডিত্য সুবিদিত। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর *চেনা মুর্শিদাবাদ ঃ অচেনা ইতিবৃত্ত*। মূলত প্রকাশিত গ্রন্থ তাঁর মূল উপাদান। তবুও মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের টানাপোড়েন তাঁর গ্রন্থে সুচিত্রিত।

লোকায়ত সমাজদর্শন যিনি নিজের অভিজ্ঞতায়, মননে ও নিজের জীবনচর্যায় পরতে পরতে মিশিয়ে নিয়েছেন তিনি হলেন অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা। তাঁর পিএইচ ডি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে *বস্তুবাদী বাউল, উদ্ভব সমাজ সংস্কৃতি ও দর্শন* নামে। প্রকাশকাল ১৯৯৯ সাল। তাঁর অক্লান্ত ক্ষেত্র সমীক্ষা ও মননঋদ্ধ বিশ্লেষণে ধরা পড়ে এই লুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি ও দর্শন।

লোকায়ত সমাজের অলি-গলির সন্ধান যিনি রাখেন তিনি হলেন লোক-সংস্কৃতি-গবেষক শ্রী পুলকেন্দু সিংহ। তাঁর অবিরাম ক্ষেত্র সমীক্ষার ফসল *লোকায়ত মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য* (১৯৭০) ও *ফিরে চল মাটির গানে* (১৯৯৮)।

২০০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে আমার *মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক মুক্তধারা ঃ ঐতিহাসিক সমীক্ষা*। এই স্বল্প পরিসরে মুর্শিদাবাদের সমাজ, বৈষ্ণবকেন্দ্র, শিক্ষা, সাহিত্য ও লোকনাট্যের উপর আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

ঐতিহাসিক সুশীল চৌধুরী *পলাশীর অজানা কাহিনী* (২০০৪, জানুয়ারী)তে প্রাক্ পলাশী ও পলাশী যুদ্ধের সময়কালে নবাব বনাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের টানাপোড়েন, ষড়যন্ত্র ও পলাশী যুদ্ধের অনিবার্যতা আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন ইউরোপীয় বিশেষত ইংরেজ ঐতিহাসিক যাঁরা ইংরেজ রাজপুরুষ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য কলাপকে ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন G B Malleson, P. J. Marshall, Percival spear, A. M. Davies, Kith Feiling, G-Forrest, J.Z. Holwell, William watts, H. H. Dodwell, J. Grant, D. Bewar প্রমুখ। Lord clive, Warren Hastings ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ আলোচিত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। তাছাড়া বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে লেখা গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে থেকে গেছে মুর্শিদাবাদের কাহিনী।

৫.২ অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী মুর্শিদাবাদ চর্চার মূল্যবান আকর। ড. অঞ্জলী সেনের ডি. ফিল. গবেষণা সন্দর্ভ *Life and work of Murshid Quli Khan* (1963) এবং ড. জয়তী রায়ের গবেষণা গ্রন্থ

(ডি ফিল) *Career of Suja-ud-din Md. Khan* (1727-1729 AD), 1973. মূল্যবান সংযোজন নবাবী ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে। অঞ্জলি সেন ফার্সী, ফরাসি ও অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে নতুন আলোকপাত করেছেন মুর্শিদকুলী খানের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনায়। অন্যদিকে জয়তী রায় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও রেকর্ডস এবং জাতীয় মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত উপাদানে তিনি সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালের পুনর্মূল্যায়ণ করেছেন। বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের M. Phil গবেষণাপত্র। *Socio-Economic aspects of the town of Murshidabad* 1765-1795 নামক গবেষণার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় *The Indian Historical Review* vol-2, January-1976 সংখ্যাতে এবং এর সম্যক আলোচনা আছে *Cambridge Economic History of India,* vol-IIতে। কল্পনা ঘোষালের গবেষণাপত্র Growth and development prospects of Cottage Industries of Murshidabad District. এটি জমা পড়েছিল ১৯৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুর্শিদাবাদ জেলার কুটির শিল্পে ক্রমাবনতির চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গবেষণাপত্রে। অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্ট ১৯৮৬ সালে পেশ করেন তাঁর এম. ফিল গবেষণাপত্র মূল্যায়ণের জন্য। In-Migrant Community in culture Contact : A study of the Marawari community of Jiaganj Azimganj Municipal area নামক সন্দর্ভে তিনি মাড়োয়ারী ও জৈন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্ররক্ষার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ড. মুজিবর রহমান তাঁর অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা নিবন্ধে 'Muslim castes in rural Bengal, a study with special reference to the district of Murshidabad'. মুসলিম সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন চর্যার উপর আলোকপাত করেছেন। মুর্শিদাবাদের দুটি অপ্রকাশিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন ড. রেজা আলী খান ও ড. তনবীর আহমদ। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে উর্দু ভাষাতে মুর্শিদাবাদের উর্দু কবিদের কবিকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. খান। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পেশ করা Persian studies in Bengal under the Nawabs (1717-1765) নামক পিএইচ ডি নিবন্ধে ড. আহমেদ বাংলার ফার্সী ও উর্দু কবি, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিকদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করেছেন। ড. কিশোর রায়চৌধুরী তাঁর 'মুর্শিদাবাদ জেলার আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ঃ ১৭৬০-১৮৮৫' পিএইচ ডি গবেষণা প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলার আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের কথা বলেছেন। সংস্কৃতির আলোচনাও বাদ পড়েনি। আমার পিএইচ ডি গবেষণা নিবন্ধ হল Murshidabad a cultural profile, from the early eighteenth to the early twentieth century. ক্ষেত্র সমীক্ষা, বিভিন্ন সরকারি মহাফেজখানা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দু শতকের মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ধরার চেষ্টা করেছি। ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে জমা পড়েছিল এই গবেষণাপত্র।

এই সমস্ত প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণা পত্রের প্রাচুর্যে মনে হয় মুর্শিদাবাদের কোনও অঙ্গই আজ চর্চার বাইরে নেই। কিন্তু তা কোনওমতেই সত্য নয়। বহু বিষয়ই থেকেছে অধরা। তাদের বিশ্লেষণের জন্য চাই নতুন উদ্যম ও পূর্ণ গবেষণার নিষ্ঠা, গবেষণা পদ্ধতি। এই পর্বে অধরা বিষয়ের আলোচনাতে সীমাবদ্ধ থাকব।

৬. অচর্চিত প্রাঙ্গণ

মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা। একসময়ে সে ছিল সবার রাণী। কালের আবর্তনে সেই অঞ্চলই হয়েছে সবচেয়ে হতশ্রী। তাই শুধু তার অতীত গৌরবকে

লালন করা নয়। খুঁজে বের করতে হবে তার পিছিয়ে পড়ার কারণও।

৬.১ অর্থনীতি

মুর্শিদাবাদের অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ গবেষণার প্রয়োজন, এখনো বহু তথ্য সরকারি দলিল দস্তাবেজের মধ্যে চাপা পড়ে আছে। ধুলো সরিয়ে সেগুলো উদ্ধার না করলে হারিয়ে যাবে অচিরে। মুর্শিদাবাদের ভূমি ব্যবস্থার উপর অজস্র তথ্য ছড়িয়ে আছে Board of Revenue, Governor general in Council, Provincial council of Revenue of Murshidabad নামের বিভাগগুলোতে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জমিদারীর উত্থান ও রাজস্ব আদায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই নথিপত্রের মধ্যে।

মুর্শিদাবাদের জমিদার পরিবারগুলো তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদ কথা'তে জমিদার পরিবারগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। ড. সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁদের পারিবারিক তথ্য ও বিভিন্ন মহাফেজখানার উপাদান দিয়ে কাশিমবাজার রাজবাটীর ইতিহাস পরিস্ফূট করেছেন। মুর্শিদাবাদের জমিদারদের উত্থান নিয়ে প্রশংসাঋদ্ধ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সৌমেন গুপ্ত তাঁর *'চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত'*তে। তবুও প্রত্যেক জমিদারীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্য্যাবলী গবেষণার অপেক্ষায়। এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে সরকারি নথিপত্র বিশেষ করে Board of Revenue, Governor general in Council, General Department. কাজে লাগতে পারে জমিদারবাড়ির নথিপত্র, স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য, লোক প্রবাদ ইত্যাদি। নাটোরের মহারাণী ভবানী সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী, মতিলাল রায়, মকসুদুর রহমান রানীর চরিত্রের বহুদিক উন্মোচিত করেছেন। তবুও রাজশাহী জমিদারির উত্থান-পতন এবং তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতিতে এই জমিদার পরিবারের সঠিক ভূমিকা নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রানী ভবানীর জমিদারি তাঁর সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের টানা পোড়েন, তাঁর পরিবারের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ, তাঁর ব্যাপক দানকার্যের পরিচয় সম্পর্কে অজস্র তথ্য পাওয়া যায়– The controlling council of Revenue at Murshidabad, Revenue Department, Provincial council of Revenue at Murshidabad, General letters to and from the court of Directory প্রভৃতি নথিপত্রে।

এই জেলার রেশম ও নীলচাষ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সৌমেন গুপ্ত। তবুও বহু তথ্য এখনো ব্যবহারের অপেক্ষায়। The Board of Revenue, general letters to and from the court of Directors, The controlling committee of Revenue সরবরাহ করতে পারে অজস্র উপাদান। এছাড়া General Department এ প্রত্যেক বৎসরের রেশম ও নীলচাষ সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। মুর্শিদাবাদের হাট-বাজার, গঞ্জ, বাঁধ সম্পর্কে আজানা তথ্য সন্নিবেশিত আছে Revenue Department এবং Judicial Department-এর নথিপত্রে। তবে আশু প্রয়োজন এই জেলার পিছিয়ে পড়ার কারণ নির্দ্ধারণ করা। কৃষি প্রধান এই জেলার রেশম ও বিড়ি শিল্পের এখনো আন্তর্জাতিক বাজার আছে। অন্য শিল্পগুলো মৃতপ্রায়। স্থায়ী আকালকে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নিয়েছে যে জেলা তার মূল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আশু প্রয়োজন এই জেলার গ্রামোন্নয়ন, কৃষি, মৎস্যচাষ, পর্যটন, স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান। আজানা অসুখে শিশুমৃত্যু মুর্শিদাবাদের এক আতঙ্ক। দারিদ্র, অজ্ঞানতার কারণ অনুসন্ধান এবং আকালের সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য সমাজ সচেতন অংশের সহমর্মিতা আরো বেশি প্রয়োজন।

৬.২ সমাজব্যবস্থা

এবারে ফিরে তাকান যাক মুর্শিদাবাদের সমাজব্যবস্থার দিকে। ব্যক্তিগত সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর খণ্ড খণ্ড চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখনো অগোচরে থেকে গেছে নবাব পরিবারের-সামাজিক, ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুপুঙ্খ বিবরণ। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এ জেলার বাসিন্দা। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী হিসাবে স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে দীর্ণ হয়েছেন দিনে দিনে। আর্থিক দীনতা ও মানসিক ক্লীবতা তাঁদের হীনবল করেছে প্রতিমুহূর্তে। সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে নিজেদের উন্নয়নের সমতা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান বোধ হয় বিশেষ জরুরী। জরুরী বোধ হয় এই কারণে আরো বেশি যে তাঁদের সম্পর্কে জানার তথ্য দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা প্রায় চলে যাওয়ার পথে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক নথিপত্র। কমে যাচ্ছেন সেই নথিপত্র উদ্ধারের মানুষ। নবাববাড়ির খুব কাছেই বসবাস করেন কিছু ইরানি পরিবার। মহরমের 'মাতন' উৎসব নিয়ম মেনে পরিচালনা করার জন্য এদের নিয়ে আসা হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল কিছু নবাবী ভাতা। কিন্তু নবাবের বৈভবের দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও দীনতা বেড়েছে। রোদ-চশমা বা শৌখিন কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করা বা পড়াশোনার জগতে প্রবেশ করার মত মানসিকতা তৈরি হয়নি এঁদের। সমৃদ্ধির কাছাকাছি থেকেও তারা সমৃদ্ধির অংশীদার হয়নি। নবাবদের সঙ্গে তারাও শ্রীহীন হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে।

অধ্যাপক মুজিবর রহমান তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে মাত্র কয়েকটি গ্রামের মুসলমান সমাজকে নমুনা হিসাবে নিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্নী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক পরিচয় সংগ্রহে এখনো কেউ যত্নবান হননি। এই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, সামগ্রিক উন্নয়ন এখনো অনালোচিত থেকে গেছে। এখনো আলোচনার বাইরে রয়েছে এই জেলার দুটি বড় জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক। দীর্ঘদিন এক জেলাতে বাস করেও তারা পরস্পরের অচেনা একে অন্যের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা থেকে বঞ্চিত। একে অন্যের এলাকায় বসবাসের অনুমতি সংগ্রহেও অপারগ। এই দিকগুলোর দিকে নজর দেওয়া তাই বিশেষ প্রয়োজন।

জৈন ও মাড়োয়ারী সম্প্রদায় এই জেলার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্ট তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ভিত্তিতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দিকটি আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক কার্য্যাবলী, তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা, পরিবার পরিচালনায় মহিলাদের সক্রিয় সহযোগিতা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে। তাদের জনসংখ্যা কম তাই আলোচনার গভীরে ঢোকার কোনও অসুবিধা নেই।

মুর্শিদাবাদের ধর্মীয় জীবন তথা সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ বৈষ্ণব আখড়া। নবাবী আমলের আগে থেকেই সক্রিয় ছিল অনেক শ্রীপাট। বৈষ্ণব গুরুদের প্রাধান্য ছিল এই জেলায়। জিয়াগঞ্জের গাম্ভীলা পাট মনিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে দীক্ষিত করেছিল। নবাবী পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের সৌভাগ্য ও সংখ্যা দুই-ই বেড়েছিল। ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেছিল নবাব ও অভিজাত পরিবারগুলোর সঙ্গে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভূমিকা নিয়েছিল জমিদারী কেনার পর। তবে সাধারণ মানুষের সেবায় তারা ছিল সতত নিরত। তাদের এই সদর্থক ভূমিকার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে সরকারি নথিপত্রে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে এই আখড়াগুলো হয়েছে

হতশ্রী। তবুও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা যোগ হারায়নি। এখনো তাদের মানসিক নির্ভরতাস্থল এই আখড়াগুলো। সমাজ উন্নয়নে এই আখড়াগুলো হতে পারে অনুঘটক। স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা নিয়ে সমাজ রূপান্তরে তারা হতে পারে প্রতিনিধি স্থানীয়। তাই এদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকার নতুন মূল্যায়ণের জন্য বিশদ গবেষণা হওয়া দরকার।

৬.৩ রাজনীতি

রাজনৈতিক আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ড. বিষাণ গুপ্তের *Political Movements in Murshidabad* 1920-1947 (1992) এবং বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্যের স্মরণে প্রকাশিত গ্রন্থ *মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা* ১৯২৫-১৯৭৫। এই জেলার ভূমিকা আংশিক তুলে ধরলেও দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি।

৬.৪ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ

বিশ শতকের প্রথমভাগ থেকে এই জেলার সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর হতে পারে গবেষকের আলোচনার বিষয়। এই বিষয়ে পত্র-পত্রিকা, সরকারি নথিপত্র অজস্র। General Department, Political Department, Judicial Department-এর অজস্র তথ্য এখনো গবেষকের বিশ্লেষণের অপেক্ষায়। শিক্ষা, সাহিত্য, নাট্য আন্দোলন, শিল্পকলা, বিভিন্ন কুটির শিল্পের অবস্থা এখনো বিশদভাবে আলোচিত হয়নি। এগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালে ধরা পড়বে এই জেলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর, অনগ্রসরতার ইতিহাস। আলোকিত হবে লোক-সংস্কৃতির নানা প্রাঙ্গণ। লুপ্তপ্রায় আঙ্গিকগুলো অন্তত ঠাঁই পাবে সংরক্ষণালয়ে। তবে এগুলোর বাইরেও থেকে গেল অজস্র প্রাঙ্গণ। সেগুলোর খোঁজ দেবে উৎসাহী গবেষকরা।



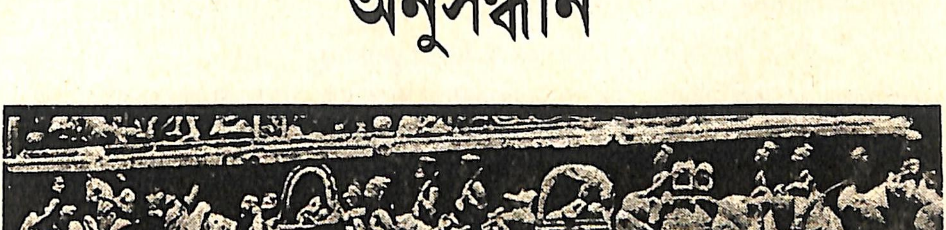
প্রসঙ্গ ঃ মুর্শিদাবাদ

হারানো দিনের

বিবর্ণ পুঁথির পৃষ্ঠা থেকে

সন্ধান

অনুসন্ধান



ভূমিকা

১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের অন্তত ৭ বছর আগে রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামে একটি পুঁথিতে যদি গোয়ালজান, নিয়াল্লিশপাড়া, আঁধারমানিক ইত্যাদি বহু পরিচিত নামগুলি চোখে পড়ে— কেমন লাগে!

আলিবর্দীর শাসনকালে বর্গী হামলা কী রূপ নিয়েছিল তা আজ অজানা নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী যদি সেই সমসাময়িককালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে যান, তো তেমন উপাদান আজ একজন ইতিহাস-সন্ধানীকে সেই সময়ের একেবারে গর্ভে পৌঁছে দিতে পারে। নবাব আলিবর্দীর কালে নবাবী সেরেস্তার রাজকর্মচারী গঙ্গারাম যেমন দেখেছেন তেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, মহারাষ্ট্রীয় লুঠেরাদের লুঠতরাজ, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যার মতো পৈশাচিক কীর্তি। বর্গী হামলায় লুঠ হয়েছে জগৎশেঠের কোষাগার। তারা গ্রামের পর গ্রাম, শষ্যাগার জ্বালিয়ে দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল বাংলার স্বাচ্ছন্দ। তৎকালীন যুগের একজন স্পর্শকাতর শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া— 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'।

ময়মনসিংহ থেকে প্রখ্যাত গবেষক কেদারনাথ মজুমদার এটি উদ্ধার করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রায় ১০০ বছর আগে এটি প্রকাশিত হয়। পুঁথি গবেষণায় অগ্রগণ্য পণ্ডিত ব্যোমকেশ মুস্তফি অত্যন্ত মূল্যবান ব্যাখ্যা সহ এটি উপস্থাপনা করেন। ওই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুঁথিটির আবিষ্কর্তা কেদারনাথ মজুমদার 'প্রতিবাদ পত্র' নামে একটি সংশোধনী দেন। আমরা আগ্রহী পাঠকের উদ্দেশে তিনটি রচনাই পুনর্মূদ্রিত করলাম।

প্রায় সমসাময়িক সময়ে 'সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভাব কাল' শীর্ষক গুরুদাস সরকারের অত্যন্ত বিশ্লেষণী রচনাটিও এখন আর সহজপ্রাপ্য নয় আমরা এটিও পুনঃপ্রকাশ করলাম।

এছাড়া প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ-এর দুটি রচনা, জিয়াগঞ্জের বালুচরি শাড়ীর অনন্য সৃজনকর্তা দুবরাজ দাস চামার এবং মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার বেড়াভাসা উৎসব সংক্রান্ত রচনাদুটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বিবেচনায় প্রকাশ করা হল।

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস পরিক্রমায় দীর্ঘদিন যিনি তন্নিষ্ঠ থেকেছেন এ জেলারই সেই প্রয়াত সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোম্পানীর আমলে কোর্ট কাছারী' রচনাটি ১৩৭৯-এর 'শারদীয় জনমত'-এ প্রকাশিত হয়। এটিও পুনঃপ্রকাশ করা হল।

এইসব প্রবন্ধ নিবন্ধ মুর্শিদাবাদ চর্চায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান, অথচ এগুলি আজ আর সহজপ্রাপ্য নয়। হারানো দিনের বিবর্ণ পুঁথি থেকে এই সব রচনার প্রকাশ যদি ইতিহাস অনুরাগীদের ইতিহাস চর্চায় সহায়ক হয়, তবে এই প্রয়াস সার্থক হবে।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ

কবি গঙ্গারাম

প্রথম কাণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

রাধা নাহি ভজে পাপমতি হইএগা।[১]
রাত্র দিন কৃড়া[২] করে পরস্ত্রী লইএগা॥
শ্রীঙ্গার[৩] কৌতুকে জিব[৪] থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥
এত জদি[৫] পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
পাপের কারনে[৬] পৃথি[৭] ভার সহিতে নারে॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর।
কহিতে লাগীলা[৮] পৃথি ব্রহ্মা বরাবর॥
পাপের কারনে প্রভু পৃথী[৯] হইল ভারি।
কত ব্যাম[১০] পাব আমী[১১] ভার সহিতে নারি॥
এতেক সুনিএগা[১২] ব্রহ্মা বোলিছে[১৩] বচন।
ব্যাকুল না হইয়[১৪] তুমি ধর্য্য[১৫] কর মন॥
পৃথী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব[১৬] স্তানে।[১৭]
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে॥
তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥

---

(১) হইএগা—হইয়া। রাঢ় (পশ্চিমরাঢ়) দেশের 'য়া' অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির আকার 'এগা' বর্ণদ্বারা প্রাচীন পুথিতে লিখিত হইয়া থাকে। (২) কৃড়া—ক্রীড়া। (৩) শ্রীঙ্গার—শৃঙ্গার। (৪) জিব—জীব। ৫। জদি—যদি। এই পুথিখানি অধিকাংশ স্থলে 'য' স্থলে 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে। (৬) কারনে—কারণে। সর্ব্বত্র 'ণ'কার স্থানে 'ন' ব্যবহৃত হয় নাই, তৃতীয় চরণে 'ক্ষণ' শব্দ দ্রষ্টব্য। (৭) পৃথি—পৃথ্বী।
(৮) লাগীলা—লাগিযল। এরূপ হ্রস্ব-ইকার স্থানে দীর্ঘ-ইকারের প্রয়োগ খুব অল্প প্রত্যুত অধিকাংশ ঈ-কার স্থানেই ই-কার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা তৃতীয় চরণে 'জিব' শব্দ ও দ্বাদশচরণে 'আমী' শব্দ দ্রষ্টব্য।
(৯) পৃথী— পৃথ্বী, এখানে ঈ-কারের সুপ্রয়োগ বলিতে হইবে। (১০) ব্যাম—ব্যামোহ।
(১১) আমী—আমি। (১২) সুনিএগা—শুনিয়া। অধিকাংশ 'শ' স্থানে 'স' ব্যবহৃত হইয়াছে।
(১৩) বোলিছে—বলিছে। রাঢ়ীয় উচ্চারণে ওকার দেওয়া হইয়াছে।
(১৪) হইয়—হইও। এ পুথিতে কোথাও অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় 'ও'কারের ব্যবহার নাই। সর্ব্বত্র 'য়' দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথর ঠাকুর মহাশয় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় 'য়'কার ব্যবহার করেন। (১৫) ধর্য্য—ধৈর্য্য। (১৬) শীব—শিব। (১৭) স্তানে—স্থানে। ইহা স্পষ্টতঃ লিপিকর প্রমাদ, কারণ ৪র্থ চরণে 'স্থাবর' শব্দে 'স্থ'কারের বর্ত্তমান আকার স্পষ্ট লিখিত আছে।

তুমি মাতা তুমি পীতা[১৮] তুমী[১৯] বন্ধুজন।
এই মহি[২০] মণ্ডল প্রভু তোমার শ্রিজন[২১] ॥
এতেক বিনয় কৈলা[২২] ব্রহ্মাবর।
হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা সঙ্কর[২৩] ॥
এতেক মিনতি কর কীসের[২৪] কারণ।
বোল[২৫] দেখি সুনি আমি তাহার বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা বলিলেন হাঁসি ত্রিলোচনে।
পৃথী ভার সহিতে নারে পাপের কারণে॥
পাপমতি হইল জিব করে দুরাচার।
পাপীষ্ট[২৬] মারিআ[২৭] প্রভু দুর[২৮] কর ভার॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞা।
পাপীষ্ট মারিছি[২৯] দুত[৩০] পাঠাইঞা॥
এতেক বলিলা জদি ব্রহ্মার গোচর।
পৃথী সঙ্গে ব্রহ্মা তবে গেলা আপন ঘর॥
তবে ব্রহ্মা বিদাএ[৩১] করিলা পৃথীরে।
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা য়াপন[৩২] ঘরে॥
ব্রহ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রইলা[৩৩] ধ্যানে।
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল[৩৪] মনে॥
নন্দীকে ডাকীয়া[৩৫] সিব[৩৬] বলিছে বচন।
দক্ষিন[৩৭] সহরে তুমি জাহ[৩৮] ততক্ষন॥

---

(১৮) পীতা—পিতা। (১৯) তুমী—তুমি। (২০) মহি—মহী। (২১) শ্রিজন—সৃজন। (২২) কৈলা—করিলা। (২৩) সঙ্কল—শঙ্কর।

(২৪) কীসের—কিসের। রাঢ়ে 'কি' অর্থে 'কিসের' শব্দও প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে ইহার সমধর্ম্মা (Co-relative) 'ইসের' শব্দ 'ইহার' অর্থে প্রচলিত আছে। (২৫) বোল—বল। অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় ধাতুর উপান্ত অ-কারের এরূপ ও-কার উচ্চারণ রাঢ়ে নাই, হিন্দী ও বঙ্গভাষীর মধ্যবর্ত্তী দেশে শুনিতে পাওয়া যায়। (২৬) পাপীষ্ট—পাপিষ্ঠ।

(২৭) মারিআ—মরিয়াঁ। প্রাকৃত শব্দে 'য়'কারের স্থলে সর্ব্বত্র 'অ'কার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় 'য়' গ্রহণাবধি 'অ'কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'মরিয়া' শব্দ 'মরিঞা' হইলে প্রাচীন উচ্চারণ ঠিক থাকিত, কিন্তু 'মারিআ' ব্যাকরণ-সঙ্গত। প্রাচীন পুথিতে এরূপ বানানের শব্দ অনেক দেখা যায়।

(২৮) দুর—দূর। (২৯) মারিছি—মারিতেছি। (৩০) দুত—দূত।

(৩১) বিদাএ—বিদায়। ইহা 'মারিআ' শব্দের ন্যায় নহে। 'বিদাএ' সংস্কৃত শব্দ, প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ইহার বানান পরিবর্ত্তন হইলে 'বিদাএ' হয়।

(৩২) য়াপন—আপন। আপন শব্দই বাঙ্গালা, তাহার 'অ' 'য়া' হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ ব্যবহার প্রাচীন বিরল নহে।

(৩৩) রইলা—রহিলা। এই শব্দটী আরও সংক্ষেপে 'রলা' হয়। 'তুমি রহিলে' অর্থে 'তুমি রলে' বা তুমি 'রল্যা' এইরূপ য-ফলান্ত পদও হয়। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে য-ফলান্তে পদই অধিক চলিত।

(৩৪) পইল—পড়িল। (৩৫) ডাকীয়া—ডাকিয়া। (৩৬) সিব—শিব।

(৩৭) দক্ষিণ—দক্ষিণ। (৩৮) জাহ—যাহ্‌। ইহাও প্রাকৃত ব্যাকরণের পরিবর্ত্তন।

সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হয়[৩৯] জাইয়া[৪০] তাহার দেহেতে॥
বিপরিত[৪১] পাপ হইল পৃথীবি[৪২] উপরে।
দুত পাঠাইএ্যা জেন[৪৩] পাপি লোক মারে॥
এতেক শুনিএ্যা নন্দী গেলা সিগ্রগতি[৪৪]।
উপনিত[৪৫] হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি॥
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেক দিন হইল বাঙ্গালার[৪৬] চৌত[৪৭] না দেএ[৪৮] মোরে॥
দুত পাঠাইয়া দেয়[৪৯] বাদসার[৫০] স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে॥
একখানি পত্র লিখ বাদসা প্রতি।
দুত জেন তাহা লইয়া জএ সিগ্রগতি॥
রঘুরাজা পত্র লিখে আখর[৫১] পাঁচ[৫২] সাতে।
পত্র লইএ্যা দুত তবে বাধিলেন[৫৩] মাথে॥
রজনি[৫৪] প্রভাতে দুত জাএ সিগ্রগতি।
পত্র আসি[৫৫] দিলেন জেখানে দিল্লিপতি॥
উজিরকে য়াজ্ঞা[৫৬] তবে দিলা দিল্লিশ্বরে[৫৭]।
সিগ্রগতি পত্র পড়ি শুনায়[৫৮] আমারে॥
উজির পড়েন পত্র বাদসা সুনেন।
সাহুরাজা লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ॥

---

(৩৯) হয়—হও। এই বর্ত্তমান অনুজ্ঞাবোধক 'হও' 'খাও' 'যাও' প্রভৃতি পদ হইতে অনুজ্ঞার বিভক্তির আকার যে 'ও', 'য়' নহে তাহা বুঝা যায়। হইও, করিও, বলিও প্রভৃতি স্থলে 'হইয়ো', 'বলিয়ো', 'করিয়ো' (ইহার বলিহ, করিহ প্রভৃতি রূপও আছে) 'য়ো' বা 'য়'কে বিভক্তি স্থলে লইলে 'হইও' প্রভৃতি 'ইও'কারান্ত পদে ই+ও হইয়া সন্ধির যে আশঙ্কা থাকে তাহা নিবারিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ওরূপ বিভক্তিজাত নিকটবর্ত্তী দুই স্বরের সন্ধি দেখা যায় না, ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে হয় বটে। অতএব 'বলিয়ো' 'করিয়ো' ইত্যাদি আধুনিক ভাবে বলিও করিও প্রভৃতি শব্দের বানান পরিবর্ত্তনের আবশ্যক দেখা যায় না।

(৪০) জাইআ—যাইয়া। 'ইও' বিভক্তির যুক্ত অনুসারে এই 'ইআ' বিভক্তিও না বদলাইলে চলিত, কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে এই দল চলিয়া গিয়াছে এখন কি করা যাইবে। তবে যদি কেহ বলেন, তবে 'ইআ' বদ্‌লাইয়া যখন 'ইয়া' লইলে তখন 'ইও' বদ্‌লাইয়া 'ইয়ো' লাও বেদরূপটা একরূপই হউক। এই যুক্তি মানিলেও চলে কিন্তু বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় শুদ্ধ 'ও' বিভক্তি স্থানে মিশ্র'য়ো' গ্রহণ করা সুবিধাজনক হইবে না। অর্থান্তর ঘটিয়া যাইবে। হও—'হয়ো' নহে; 'হয়ো' অর্থ হইও।

(৪১) বিপরিত—বিপরীত। (৪২) পৃথীবি—পৃথিবী। (৪৩) জেন—যেন।

(৪৪) সিগ্র—শীঘ্র। ৯৪৫) উপনিত—উপনীত।

(৪৬) বাঙ্গালার—'বাঙ্গালা' দেশের নাম লিখিত প্রাচীন প্রয়োগ এইরূপ অতএব 'বাঙ্গলা দেশ' এরূপ লেখা ভুল। (৪৭) চৌত—চৌথ। (৪৮) দেএ—দেয়।

(৪৯) দেয়—দেহ, দাও। (৫০) বাদসা—বাদশাহ।

(৫১) আখর—অক্ষর। (৫২) পাচ—পাঁচ। (৫৩) বাধিলেন—বাঁধিলেন।

(৫৪) রজনি—রজনী। (৫৫) আসি—আনি(?)। (৫৬) য়াজ্ঞা—আজ্ঞা।

(৫৭) দিল্লিশ্বরে—দিল্লীশ্বরে। (৫৮) শুনায়—শুনাও।

বাদসা তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে।
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে॥
চাকর হইয়া মারিলে সুবারে।
জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে॥
লোক-লস্কর তবে নাই আমার স্থানে।
হেন কোনজন নাই তরে গিয়া আনে॥
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।
দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে॥
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায়[৫৯] তথাতে॥
এতেক বচন পত্রে লিখীলা[৬০] উজির।
পত্র পাইঞা দুত তবে নোঞাইল সির[৬১]॥
দুত তবে বিদাএ হইলা তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি[৬২] পহুছিলা সেতারাতে॥
সভা করিঞা রাজা বইসা[৬৩] আছে দ্যানে[৬৪]।
হেনকালে পত্র দুত আনে সেইখানে॥
পত্র আসি দিলা দুত রাজার গোচর॥
ডাড়াইলা এক ভিতে করি জোড়কর॥
আজ্ঞা দিলা দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।
পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজনা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চোথাই নেএন[৬৫] জেন জবর করিঞা॥
এতেক সুনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মূলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ[৬৬]।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই॥
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করণ[৬৭]॥
রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।

(৫৯) পাঠায়—পাঠাও।
(৬০) লিখীলা—লিখিলা। (৬১) সির—শির।
(৬২) য়াসি—আসি। (৬৩) বইসা—বসিয়া।
(৬৪) দ্যানে—দেওয়ানে, দেওয়ানখানায়, দরবারে।
(৬৫) নেএন—লয়েন। (৬৬) বসিআ—বসিয়া। (৬৭) ভাস্করণ—ভাস্কর পণ্ডিত।

তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে॥

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য[৬৮] সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান[৬৯] চলে সত সত[৭০]
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন॥
সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা তবে
এক রাত্রির রইলা সেইখানে।
রাগরঙ্গ হইল জত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত
নাগপুর আসি উপনিত[৭১]।
সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত[৭২]॥
ডাক দিয়া দুতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি দুত চলে সিগ্রগতি
নবাব য়াছে জেইখানে॥
দূত সম্বাদ লইয়া সিগ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে।
বর্দ্ধমান সহরে রাণির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে॥
দুত মুখে সুনি কথা ভাস্কর চলিল তথা।
লস্কর লইয়া নিসাতে[৭৩]।
লস্কর নিসব্দে[৭৪] জাএ কেহ্ু[৭৫] নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ[৭৬] উনিশাতে॥
বৈশাখের উনিশা জাএ বরগি আইলা তাএ
মহা য়ানন্দিত[৭৭] হইয়া মনে।
বিরভুই বামে থুইয়া গোআলা ভুইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বর্দ্ধমানে॥
তবে বরগীর লস্করে চতুদ্দিগে[৭৮] আসি ঘিরে
হরকারা[৭৯] কেহ নাহি জানে।
দুই প্রহর রাইতে[৮০] হরকারা আইলা তাথে
আসী[৮১] কৈল রাজারাম স্থানে॥

---

(৬৮) সন্য—সৈন্য। (৬৯) নীসান—নিশান। (৭০) সত সত—শত শত। (৭১) উপনিত—উপনীত।
(৭২) তরিত—ত্বরিত। (৭৩) নিসাতে—নিশাতে।
(৭৪) নিসব্দে—নিঃশব্দে। (৭৫) কেহ্ু—কেহ। (৭৬) বৈসাখ—বৈশাখ।
(৭৭) য়ানন্দিত—আনন্দিত। (৭৮) চতুদিগে—চতুর্দ্দিকে। (৭৯) হরকারা—প্রহরী অর্থে ব্যবহৃত।
(৮০) রাইতে—রাত্রিতে। (৮১) আসী—আসিয়া।

রজনি[৮২] প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে।
ইহা য়ামি[৮৩] না জানিল অচম্বিতে সন্য আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে॥
রাজারামে এত কএ নবাব সুনিয়া রএ
তদপরে[৮৪] দিলেন উত্তর।
হরকারা পাঠাইয়া হকিকত[৮৫] আন জায়া[৮৬]
কোথা হইতে য়াইল লস্কর॥
এতেক সুনিল জবে হরকারা পাঠাইল তবে
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে।
সাজিএ্যা হরকারা লস্করে ফিরে তারা
আসিয়া কহিল নবাবেরে॥
চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিস হাজার ফৌজ লইএ্যা।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহুরাজার হুকুম পাইএ্যা॥
এতেক কথা সুনিয়া জমাদার আনে ডাকদিয়া
কহিতে লাগিলা নবাব।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইলা চৌথ নিতে
ইহা কি বোলহ জবাব॥
বাদশাই খাজানা জাইত শেখানে চৌথাই পাইত
সুজা খাঁ আছিল জখন।
মুস্তফা খাঁ এত কএ জাহা তোমার চিত্তে লএ
তাহা তুমি করহ এখন॥
উকীলকে কহিল সন্য সাইজা[৮৭] কেন আইল
এই কথা বল জাইয়া তারে।
উকীল কহেন কথা ভাস্কর সুনেন তথা
তবেত কহিল তার পরে॥
সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চোথাই নিবার তরে
তেকারণে আইলাম আমি।
জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে
সিগ্রগতি চলিজাহ তুমি॥
এতেক সুনিয়া জবে উকীল কহিল তবে
অন্যাএ কথা কেনে বোল।
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিতে
এইত অন্যাএ[৮৮] বড় হইল॥

---

(৮২) রজনি—রজনী। (৮৩) য়ামি—আমি। (৮৪) তদপরে—তৎপরে। (৮৫) হকিকত—মূলতথ্য। (৮৬) জায়া—যাইয়া। (৮৭) সাইজা—সাজিয়া। (৮৮) য়ন্যাএ—অন্যায়।

ভাস্কর বুলিল[৮৯] তারে কেবা য়ন্যাএ করে
মনেতে কৈলে ভাবনা।
কাহার হুকুম পাইয়া নিলা মারিয়া মুলুক
বাদসাই খাজনা
সুনিয়া উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকিল পাঠাইতা তার কাছে।
উকীল জাইয়া পরে কহিতে নবাব তরে[৯০]
চৌথাই দিতেন তিনী[৯১] পাছে॥
আপন কটক লইয়া পুন জায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাএ
চৌথাই পাবে সেইখানে॥
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রায্য[৯২] নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন॥[৯৩]
এতেক বচন সুনি উকীল কহেন বানি[৯৪]
ভদ্র তুমি কিসে দেখায়[৯৫] তারে।
তোমার জতেক সেনা চত্তদিগে দিল থানা
তারা সব কী[৯৬] করিতে পারে॥
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহশ্র[৯৭] জনা
তব[৯৮] তার ভূরূক্ষেপ নাই।
চৌখুটা মুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই॥
উকীল বুলিলা জবে ভাস্কর জানিলা তবে
কহিতে লাগিলা তারপরে।
চৌথাই নাদিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে
এইকথা বোল জাইয়া তারে॥
উকিল আসিএগ্র পরে কহিল নবাবে তবে
রণ করিতে সেহ চাহে।
এতেক সুনিএগ্র জবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদারে কহে॥

---

(৮৯) বুলিল—বলিল।
(৯০) নবাব তরে—নবারের পক্ষ হইয়া। (৯১) তিনী—তিনি। (৯২) রায্য—রাজ্য।
(৯৩) রন—রণ। (৯৪) বানি—বাণী। (৯৫) দেখায়—দেখাহ—দেখাও।
(৯৬) কী—কি। (৯৭) সহশ্র—সহস্র। (৯৮) তব—তবু।

জত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।
জতেক সরদার ছিল, তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে ॥[৯৯]
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে[১০০] জেন আইস্তে[১০১] নাই পরে।
বরগি সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে ॥
সুনিয়া এতেক বানি সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল।
পানবাটা কাছে ছিল পান তুইলা সভারে দিল
বিদাএ হইয়া সভে আইল ॥
এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেএ জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে।
তোমরা কত জনা চতুদিগে দেয়[১০২] থানা
কতজনা জায়[১০৩] লুটিবারে ॥
সরদারে কহে এত সাজে জমাদার এত
চতুদিগে জাএ লুটিবার।
সাজিল জত জন শুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তার ॥

ধাম্‌ধরমা জাএ আর হিরামন কাসি।[*]
গঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিমন্ত জোসি ॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহড়া।
সন্তুজি জাএ আর কেসজি আমোড়া ॥
কেসরি সিংহ মহন শিংহ এ দুই চামার।
জার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হার[১] ॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুটিতে।
আর চৌদ্দজনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে ॥
বালারাও সেশরাও আরসিস পণ্ডিত ॥
সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত ॥

---

(৯৯) সিপাএরে—সিপাহীকে। (১০০) দেসে—দেশে।
(১০১) আইস্তে—আসিতে। (১০২) দেয়—দেহ, দাও।
(১০৩) জায়—যাহ, যাও।
(*) ইতিপূর্ব্বে বানানব্যত্যয়ের এক শত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, বানান-বিভ্রাট কিরূপ বিপুল। অতঃপর আর তাহার উদাহরণ দিবার আবশ্যক মনে করি না। বিভ্রাটগুলি পাঠকের দৃষ্টিতে আপনিই পড়িবে, তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে উল্লেখ করিব।
(১) পাঁচহার—পাঁচ শ্রেণী, পাঁচ দল (Five Companies of troops) অথবা পাঁচ হাজার শব্দের 'জ'টি পড়িয়া গিয়াছে!

মোহন রাএ পিত রাএ আর সিসো পণ্ডিত।
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরীত॥
শিবাজি সামাজি আর ফিরিঙ্গ রাএ।
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি দ্রিত[২] ধাএ॥
✲ ✲ ✲ সুনতান খাঁর আর ভাস্কর।
এই চৌ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর॥
একদিন দুইদিন করি সাত দিন হইল।
চতুদিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥
মুদি বানিঞা জত বারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারে ছমুতে[৩] পাএ জারে॥
বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ
চতুর্দ্দিকে বরগির তরে রসদ না মিলএ॥
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ।
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ॥
গাজা ভাংগ তামাকু না পাএ কিনিতে।
আনাজ নাহি পাওয়া যাএ লাগিল ভাবিতে॥
কলার আইঠা[৪] জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া[৫]॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিসম বিপত্য বড় বিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল॥
এই মতে লস্কর আছিল চৌদ্দ রোজ।
তবে নবাব কুচ কৈলা লইয়া সব ফৌজ॥
ঘোড়ার উপরে কত নিশান চলিল।
তবে ডঙ্কা লাগারা কত বাজিতে লাগিল॥
ঝাকুড় ঝাকুড় কত সাদিয়ানা বাজাএ।
সাহিসরা তবে নবাবের আগে জাএ॥
চাইদিগে [৬] লস্কর চলে নাই লেখাজোখা।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে বরগী দিল দেখা॥
চাইরদিগে বরগী আইল কত আর।
তা সভার হাতে দেখি লাহাঙ্গা তলোয়ার॥

(২) দ্রিত—দ্রুত। (৩) ছমুতে—সম্মুখে, সমুখে। (৪) আইঠা—এঁঠে, কদলী বৃক্ষের গোড়ার অংশ।
(৫) সিজাইয়া—সিদ্ধ করিয়া। (৬) চাইদিগে—চাইরদিকে, চারিদিকে।

তখন নবাবের লস্করে পইল হড়বড়।
হেন বেলা তেরহইনাতে[৭] ধরিলা ডেহড়[৮]॥
হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একিবারে।
হারা হারা[৯] কইরা আইসে কাছাইতে নারে॥
তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া[১০] লইয়া।
বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহড় মারিয়া॥
তবে সামনে হইতে বরগি পলাইল।
আর কত বরগি আইলা পিছাড়ি ঘেরিল॥
মির হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল।
বেকাবুতে পইড়া সেহ মিসাইল॥
পিছাড়ি লুটিল বরগি য়াসি আর কত।
পোড়াইল ডেরাডাণ্ডা তাম্বু যত॥
খাজানার গাড়ি জত সাতে ছিল।
চাইর দিগে বরগি আইসা লুটিতে লাগিল॥
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ।
বড় বড় সিপাই জত অমনি পলাএ॥
দউড়া দউড়ি[১১] আইলা তবে নিকুলসরাএ।
মোসাহেব খাঁ তবে পড়িল ঘেরাএ॥
ডেড় হাত্বির সাইর[১২] হইল তার সাএ।
পচিশ ঘোড়া সুর্দ্দা[১৩] খেত আইল তাথে॥
মোসাহেব খাঁ জদি পইল নিকুনেতে।
যল্‌দি নবাব সাহেব যাইল কাঁটয়াতে॥
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইঞা।
পাঠাইঞা দিল কত নৈকায় করিয়া॥
তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহচিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাচিল॥
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাতে।
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে॥
ছিছিছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
এতদিন ব্রথা[১৪] আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া॥
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥

---

(৭) তেরহইনাতে— (?)। (৮) ডেহড়—দ্যাওড়, অবিশ্রান্ত গতি। (৯) হারা হারা— 'হারারারা' করিয়া আসিয়া পড়িল, কোন বাধা মানিল না।

(১০) চাইর হার ঘোর—চারি দল অশ্বারোহী সৈন্য (Five Companies of Horse)।

(১১) দউড়াদউড়ি—দৌড়াদৌড়ি।

(১২) ডেড় হাত্বির সাইর—কোনরূপ ব্যূহের অর্থাৎ সৈন্য যোজনার বিবরণ হইবে বোধ হয়।

(১৩) সুর্দ্দা—শুদ্ধ। (১৪) ব্রথা—বৃথা।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা[১৫] পলায় কত নিক্তু হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা[১৬] মাউছা[১৭] পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
সঙ্ক বণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে চিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলায়নে পেটারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ য়মনি॥
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপালাএ[১৮] চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জয় বাহুকে[১৯] করিয়া॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন[২০] বল্‌দের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
গর্ব্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল॥
দস বিস লোক য়াইসা পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া।
কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিয়া॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি।
চাঞি ধানুক[২১] পালাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥
চাইর দিগে লোক পলাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
ছর্ত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥

(১৫) সোনার বাইনা—সোণার বেণে। (১৬) জাউলা—জেলিয়া, জেলে। (১৭) মাউছা—মেছো, মৎস্যব্যবসায়ী। (১৮) চোপালাএ—চৌপারায়, ডুলিতে। (১৯) বাহুকে—বাঁকে, ভারে।
(২০) বিছন—বীজধান অথবা বিছনা(?) (২১) চাঞি-ধানুক—সাঁওতাল জাতীয় পশুপালক অসভ্যজাতি।

এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥
কারূ হাত কাটে কারূ নাক কান।
একি চোটে কারূ বধএ পরাণ॥
ভাল২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড়২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
কপি দেহ২ বোজে
কাহুকে ধরিয়া বরগী পখইরে ডুবাএ।
কাফর হইএগ তবে কারূ প্রাণ জাএ॥
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বগগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥
ত্রেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা॥
পৃথিবীতে নাম তার হইলা ভাগিরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহিত॥
তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিয়া পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম সুন মন দিয়া॥
চন্দ্রকোনা মেদিনিপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্দ্ধমান সহর॥
নিমগাছি সেড়গা আর সিমলাই।
চত্তিপুর শ্যামপুর গ্রাম আইলা॥

এই মতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে॥
সের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল।
তাহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল॥
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর।
কাত্থারা সরাই ডামদ্বৈ জদুপুর॥
ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়া।
কুড়বন পালাসি য়ার বউচি[২২] বেড়ড়া॥
সমুর্দ্ধরগড়[২৩] জার্ন্নগর[২৪] আর নদিয়া।
মাহাতাপুর সূনন্টপুর[২৫] থইল পোড়াএ গিয়া॥
পরাণপুর ভাটিয়া পোড়াএ আর মান্দড়া।
সরভাঙ্গা ধিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া॥
সাতসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞা।
কুমিরা বউলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞা॥
কড়ই বৈথন পোড়াএ আর চাড়ইল।
সিঙ্গি বাস্কা ঘোড়ানাস মস্তইল॥
গোটপাড়া চাঁদপাড়া আর য়াগদিয়া।
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া॥
আতাইহাট পাতাইহাট আর ডাঞিহাট।
বেড়া-ভাওসিংহ পোড়াএ আর বিকীহাট॥
এইরূপে ইন্দ্রাইল পরগণা বরগি লুটি।
কাগাএ মোগাএ লুটে ওলন্দাজের কুটি॥
এইরূপে কাগা মোগা পোড়াইঞা।
রাতারাতি পহচিলা জাউমাকান্দি[২৬] গিয়া॥
তবে বিরভূই[২৭] পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া।
আমডহরা মহসেরপুর থানা কৈল গিঞা॥
গোয়ালাভূঞি সেনভুঞি সব পোড়াইলা।
চতুদ্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা॥
তবে বোনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
য়সাদ্য[২৮] বরগির তবে কি করিতে পারে॥
সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া।
নৈহাটী উর্দ্ধানপুর কাটাঞ ডাইনে থুইয়া॥
বাবলা নদী বরগি তবে পার হলি।
মাঙ্গনপাড়া সাটিই কামনগর আইল॥
মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগী রাঙ্গামাইটা[২৯] দিয়া॥

---

(২২) বৈঁচি। (২৩) সমুদ্রগড়। (২৪) জাননগর। (২৫) সুনন্দপুর।
(২৬) জেমুন্না কান্দী। (২৭) বীরভূমি। (২৮) য়সাদ্য—অসাধ্য। (২৯) রাঙ্গামাটী।

গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া।
সিঘ্রগতি আসিয়া পহুচিল দাহাপাড়া॥
হাজি ছোট নবাব উপারে[৩০] ছিল।
বরগির নাম সুইনা কীল্লাএ সাঁধাইল॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীঘ্রগতি আইসা জগৎ সেটের বাড়ী লুটে॥
আড়াকাট[৩১] টাকা যত ঘরে ছিল।
ঘোড়ার খুরচি[৩২] ভইরা সব টাকা নিল॥
তবে সও[৩৩] দুই তিন টাকা ছড়াইয়া।
শীঘ্রগতি গেলা বরগী গঙ্গা পার হইয়া॥
তবে ফকীর-ফকীরা[৩৪] গিরস্ত জত ছিল।
সেই সব টাকা তারা লুটিতে লাগিল॥
তবে কাটাঞাতে নবাব সাহেব সুনিল।
জগত সেটের বাড়ী বরগি লুইটা গেল॥
এতেক কথা জদি হরকরা কহিল।
কাটঞা হইতে নবাব শীঘ্র চলিল॥
রাতারাতী তবে নবাব আইলা মোনকরা।
ভোর হইতে হইতে তবে পহছিলা ডেরা॥
তবে হাজি সাহেবকে নবাব অনেক বুলিল।
এতেক লস্কর রইতে বাড়ী লুইটা গেল॥
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাতে॥
আসাড় মাসের দেওয়া[৩৫] ঘন[৩৬] বরিষণ।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন॥
গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার।
তবে বরগী লুটিবারে নাহি পাএ আর॥
কাটঞা ভাওসিংহ-বেড়া ডাইহাট নিয়া।
চাইরদিগে বরগি ছায়নি কৈল গিয়া॥
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্করে মিলিল॥
গ্রামে গ্রামে যত তাগিদার গেল।
তারা সব জাইয়া খাজনা সাদিতে লাগিল॥
এথা মির হবিব লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
ফরাসবন্দির[৩৭] পর্ত্তন করিলা তখন॥
বড় বড় নৌকা যেখানে যত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল॥

---

(৩০) উপারে—ওপারে, অপর পারে। (৩১) আড়কাট—আড়াই কোটী। (৩২) খুরচি—ঘোড়ার ঘাস খাইবার ছোট থলি, তোমড়া। (৩৩) সও—শত। (৩৪) ফকীর-ফকীরা—ফকীর-ফক্রাণ, ফকীরাদি। (৩৫) দেবতা, মেঘ। (৩৬) ঘন—অবিরল। (৩৭) ফরাসবন্দি—পুলবদ্ধি।

ইপারে উপারে লাহাস[৩৮] দিল তানাইয়া[৩৯]।
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিয়া॥
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস[৪০]।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন ফরাস॥
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটী ফেলিতে লাগিল॥
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর॥
ডাঞিহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা গেল।
কত সত বরগী তারা লুটিতে চলিল॥
এথা ভাস্কর লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
জেরুপে[৪১] ডাঞিহাটে কৈলা পূজা আরম্ভন॥
তবে গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগতজননি মায়ের পূজা করিতে চাই॥
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে।
শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উর্জোগ[৪২] করে॥
ঘটকর্পূর[৪৩] আনেগ কেহ করিয়া সন্মান।
আসিঞা প্রতিমা তারা করেন নির্ম্মাণ॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাঁই তারা গেল বিদায় লইয়া॥
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল জত।
ভার বাহান্ধিতে বোঝাএ কত শত॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে॥
এই মতে করে ভাস্কর পূজা আরম্ভন।
এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন॥
তবে বরগী ফরাসবন্দিতে পার হইয়া।
রাতারাতি ফুটীসাঁকো উঠিলেন গিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হড়বড়ি হইল।
ফুটিসাঁকো বরগি আইল নবাব শুনিল॥
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাএ।
দ্বিতীয়প্রহর রাইতে নকিব শীঘ্র ধাএ॥
নকিব আসিঞা তবে বোলে বার বার।
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার॥

---

(৩৮) লাহাস—(?)। (৩৯) তানাইয়া—টাঙ্গাইয়া, বাঁধিয়া। (৪০) বাস—বাঁশ।
(৪১) জেরুপে—যেরূপে। (৪২) উর্জোগ—উদ্যোগ। (৪৩) ঘটকর্পূর—ঘটকর্পর, প্রতিমানির্ম্মাতা, কুম্ভকার।

এতেক কহিল জদি নকিব আসিয়া।
তবে সব ঘোড়ায় জিন দিল চড়াইয়া॥
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে॥
মুস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার॥
রহম খাঁ করম খাঁ দুইজনাতে জাএ।
দশ হাজার ঘোড়া জার সঙ্গে ধাএ॥
আতাউল্লা মির জাফর দুইজনা সাজিল।
পোনের হাজার ঘোড়া সঙ্গে চলিল॥
উমর খাঁ আসালত দুই জনাতে গেল।
পাঁচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইরা নিল॥
ঠাকুরসিংহ জাএ আর বক্সি বহনিয়া[৪৪]।
চল্লিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গেত করিয়া॥
ফতেহাজি ছেদনহাজি দুই জনাতে গেল।
পেএতিশ[৪৫] হাজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল॥
সাইট হাজার ঘোড়া ডেড়লাক বহনিয়া।
তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া॥
যেই মাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল॥
তবে বরগি পিছ দিয়া শীঘ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ॥
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল।
নবাব সাহেবের নাম সুইনা অমনি পলাইল॥
সিঘ্রগতি আসি বরগি পুলে পার হইল।
পার হইএগ্রা পুল তবে কাটএগ্রাত[৪৬] দিল॥
এথা নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে।
দেখে বরগির ছাউনি কাটিএগ্রাত উপরে॥
রহনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল।
চতুর্দ্দিগে তোপ খা রুপিয়া রাখিল॥
পূরনিয়া[৪৭] পাটনাএ লেখিলেন খত।
চলিলা দুইজনা শুইনা হকিকত॥
হেথা জয়ন্দি[৪৮] আহম্মদ খাঁ আইলা পাটনা হইতে।
বার হাজার ঘোড়া ফৌজ লইয়া সাথে॥
নবাব বাহাদুর আইলা পুরনিয়া হতে।
পাচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে॥

---

(৪৪) বহনিয়া—ভারবাহী। (৪৫) পেএতিশ—পঞ্চত্রিংশ। (৪৬) কাটিএগ্রাত—কাটিয়া, ভাঙ্গিয়া। (৪৭) পূর্ণিয়া। (৪৮) জয়ন্দি—জৈনুদ্দীন্।

তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে।
পূজা না হৈতে আগে মার ভাস্করকে॥
নবাব বোলে আগে দসরা জাউগ।
চাইর দিকে জল কাদা সকলি সুখাউগ॥
এত যদি নবাব বুলিলা তার তরে।
জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ বোলে নবাবেরে॥
জল কাদা শুকাইলে বরগির হবে বল।
চতুদিগে লুটিবে পোড়াবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকায় করিয়া।
রাতারাতি যেন বরগী মারে গিয়া॥
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনসুবা করে।
মির হবিব লইঞা কিছু শুন তার পরে॥
বড় বড় কামান আইনা থুইলা থরে ঘরে।
হুগলি হইতে সুলুফ[৪৯] আনে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোল দাগিতে লাগিল।
মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল॥
জেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পৈল।
তখন নবাব সাহেবের অমনি পিছাইল॥
গোলা দাগিতে কামান গেল ফুইটা।
সুলুফ ডুবিল তলা তার ফাইটা॥
দস বিস লোক তারা নিকটে ছিল।
কামান ফাটীয়া দুই চাইর জনা মাইল॥
সুলুফ কামান যদি দুই তবে গেল।
শুনিয়া মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল॥
ফতে নাই নাই বলে বারে বারে।
এতেক উর্জোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে॥
সূর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন।
এথা নবাব লইঞা কিছু সুন বিবরন॥
সম্বাদ লইয়া হরকারা আইলা হাইটা[৫০]।
কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা॥
এতেক শুনিয়া নবাবে হৈল বল।
হুকুম করিলা ফৌজে আউগাউক[৫১] সকল॥
জত লস্কর তারা পিছে হইটা ছিল।
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল॥

---

(৪৯) সুলুফ-সুলুক—একপ্রকার বাণিজ্য-দ্রব্যবাহী দূরগামী বৃহৎ নৌকা। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও এই সুলুক নৌকা কলিকাতা, হুগলী, হিজলী, প্রভৃতি বন্দর হইতে মাদ্রাজ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত। (৫০) হাইটা—হাটিয়া। (৫১) আউগাউক—অগ্রসর হউক।

তবে বল মহাতাব[৫২] সব জালিয়াত দিল।
বরকন্দাজের পরা[৫৩] মোরচাএ লাগিল॥
হাজারে হাজারে আওয়াজ হএ একিবারে।
ডাড়াইয়া বরগি সব দেখে উপারে॥
এই মতে নবাবের ফৌজ আছে বরাবরে।
এথা জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ আইলা উদ্ধারণ পুরে॥
বড় বড় পাটেলি[৫৪] সাথে আইসা ছিল।
জুড়িন্দা[৫৫] বাধিয়া গুদারা[৫৬] লাগাইল॥
উর্দ্ধরনপুরে জত ফৌজ পার কৈলা।
য়জএর ধারে আইসা সব দাড়াইলা॥
পূনরপি জুড়িন্দা আইনা লাগাইল।
দশ হাজার ফৌজ নিসন্দে পার হৈল॥
বাইস সও লোক সুর্দ্ধা রতন হাজারি।
পাটেলির উপরে তারা সভে চড়ি॥
যেই মাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে।
তলা ফাটীয়া ডুবিল সেই স্থানে॥
পাটেলি ডুবিল ফৌজে হইল কলরব।
উপারে বরগীর ফৌজে জানিলা সব॥
মোগল আইল আইল পইল হড়বড়ি।
তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বরগি জাএ দউড়া দউড়ি॥
বরগির লস্করে জদি পইল হড়বড়।
হেনকালে বহইনাতে ধরিলা ডেহড়॥
এক এক ঘোড়ায় দুই দুই বরগি চড়িয়া।
দ্রব্য সামগ্রী কত জাএ ফেলাইয়া॥
সপ্তমী অষ্টমী দুই পূজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাএ প্রতিমা ছাড়ি॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত ছিল কাছে।
বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে॥
ছাগ মৎস্য মহিষ জাহা যত ছিল।
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল॥
এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়া।
হোতা ফৌজ লইয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া॥
ভাস্কর পলাইয়া যদি গেল অনেক দুরে।
জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ সুনিল তার পরে॥

---

(৫২) মহাতাব—মশাল, বৃহৎ আলোক। (৫৩) পরা—(?) (৫৪) পাটেলি—নৌকাবিশেষ। (৫৫) জুড়িন্দা—বাঁধিয়া, জোড়া গাঁথিয়া। (৫৬) গুদারা—অস্থায়ীসেতু।

সাদিয়ানা নহবত[৫৭] কত বাজে থরে থরে।
ফকির ফুকুবাকে খএরাত কত করে॥
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্রমাসে পুনরূপি আইল সাজিয়া॥
জেই মাত্রে পুণরূপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল॥
স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা॥
এতেক বচন জদি বলিল সরদার।
চতুদিকে লুটে কাটে বোলে মারমার॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সত সত কৈল॥
হাজারে হাজারে পাপ কৈল দুর্ম্মতি।
লোকের বিপত্য[৫৮] দেখি রুষিলা পার্ব্বতী॥
পাপিষ্ঠ মারিতে আদেশিলা পসুপতি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈল পাপমতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী॥
ভৈরবি জোগিনী জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা ছমুতে[৫৯] ডাড়াইল॥
তবে দুর্গা কহে সুন যতেক ভৈরবী।
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি॥
এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন।
এখন জেরূপেতে ভাস্কর মৈল সুন বিবরণ॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটএাতে।
সুনিএা নবাবের ডেরা পইল মোনকরাতে॥
পাল চাই ধুম পইল সহরেতে।
মুদি বানিএা চলে নবাবের সাথে॥
মোনকরাতে নবাবের ফৌজ হইল সুমার।
ভাস্কর লইয়া কিছু শুন তবে আর॥
তবে আলি ভাই বলে ভাস্করের তরে।
এইরূপে কতবার আসিবা বারে বারে॥
ফৌজকে মানা কর গ্রাম লুটিতে।
আমি জাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাথে॥
এতেক সুনিয়া ভাস্কর কহিলেন তাকে।
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে॥

---

(৫৭) সাদিয়ানা নহবত—অশ্বারোহী সৈন্যদলসঙ্গী নহবত বাদ্য।
(৫৮) বিপত্য—বিপত্তি, বিপদ। (৫৯) ছমুতে—সম্মুখে।

তবে আলি পচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে।
নবাবের সাতে মিলিতে আইল মোনকরাতে॥
ফুটিসাঁকো যদি আলি ভাই আইলা।
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা॥
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে।
আলিসাহেব আইসে নবাব সাহেবকে মিলিবারে॥
তবে নবাব বোলে বোল যাইয়া তারে।
হাতিযার থুইয়া আইসা মিলুক আমারে॥
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাকে।
হাতিয়ার থুইয়া যাইয়া মিল নবাবকে॥
আলি ভাই য়াইলা তবে হাতিয়ার থুইয়া।
পচিশ ঘোড়া সুদ্ধা মিলিল আসিয়া॥
নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ।
আলি ভাই বোলে বন্দোবস্তের কারণ॥
ভাস্করের সাথে বিবাদ কেনে কর।
দুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দোবস্ত কর॥
তবে নবাব সাহেব বুলিলেন তারে।
ভাস্কর আসিয়া নাকি মিলিবে আমারে॥
জে সময়ে পূর্ব্বে ঘেইরাছিল বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তার স্থানে॥
বন্দবস্ত করিতে যদি থাকিত তার মনে।
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে॥
মুলুক পোড়াইল লুটিল বারবার।
কাঁউয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব য়ার॥
আলি ভাই বোলে যাহা হবার তা হৈল।
কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল॥
দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে।
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে॥
তবে নবাবসাহেব কহিল দুজনারে।
আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাস্করে॥
জানকীরাম মুস্তফা খাঁ দুজনে চলিল।
কাটোঞার যাইয়া ভাস্করকে মিলিল॥
ভাস্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল।
মুস্তফা খাঁ জানকীরাম দুই জনাএ আইল॥
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া জাইয়া মিলাবে তোমারে॥
এতেক শুনিয়া তবে মির হবিব কয়।
কদাচিত ভাস্করকে জাইতে মত নএ॥

মির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে।
কদাচিত জাইয়া তুমি না মিল তাহারে॥
মোগলের ফের তুমি করিবা মোনসুবা।
আমার কথা শুন জদি কদাচিত না যাবা॥
তবে মুস্তাফা খাঁ কহিতে লাগিল।
এতেক কথা তুমি কেনে কহিলা॥
আমরা দুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা নিব।
বন্দবস্ত কইরা পুন এইখানে আনিব॥
কিছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরাণ দরমান কইরা কিরা খাইছি আমি॥
জানকীরাম কহে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিব মিলাইয়া॥
এতেক শুনিয়া ভাস্কর বোলে ভাল ভাল।
মুস্তফা খা বোলে তবে শীঘ্র কইরা চল॥
ভাস্কর বোলে সাথে ফোজ নিব কত।
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত॥
আলি ভাই বোলে ফৌজে নাহি কাম।
জন দশ বারো লোক সঙ্গে কইরা জান॥
মির্ত্তুকাল হইলে যেন মতিচ্ছন পাএ।
আলি ভাইএর কথায় ভাস্কর ভূইলা যাএ॥
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে॥
আলি ভাই আদি করি বাইস জনা য়াইল।
পলাসি য়াসিঞা ভাস্কর ডেরায় থাকিল॥
তার পরদিনে ভাস্কর করিল গমন।
এথা নবাব লইয়া কিছু শুন বিবরণ॥
হরকারা বোলে নবাবকে ভাস্কর য়াইসে।
এতেক শুনিয়া নবাব সভা কৈরা বৈসে॥
সোটাবর্দ্দার খা সর্দ্দার নবাবের আগে।
বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর দিগে॥
দুসরঞি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য[৬০] ও গুইলা[৬১] গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল॥
ভাস্কর পণ্ডিত জদি মিলিল নবাবকে।
তার পরে নবাব কহেন কিছু তাকে॥

---

(৬০) বুধ্য—বুদ্ধি। (৬১) গুইলা—ঘুলাইয়া।

আমার মুলুক তুমি লুটিলা বারে বারে।
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলা আলি ভাইএর তরে॥
যে কালে আসিয়া তুমি ঘেরিলা বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে॥
বন্দোবস্ত করিতে যদি থাকিত তোমার মনে।
সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমার স্থানে॥
তবে এতেক শুনিয়া ভাই আলি কহিল।
এত দিন জাহা হবার তাহা হইল॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে।
কিছু দিএ্যা বন্দবস্ত কর ইহার সনে॥
এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি[৬২]॥
পূর্ব্বে সভারি মন সুবা ছিল।
সেই মন সুবাএ নবাব উঠা গেল॥
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন॥
দুই ডণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই।
এখন তবে আমি সান[৬৩] পূজাএ জাই॥
মুস্তফা খাঁ বোলে চলো সভাই মিলে জাই।
সেপহরিতে[৬৪] আসিব নবাবের ঠাই॥
এতেক বুলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল।
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেন তাথে॥
সেইক্ষণে তবে ঘটাচট্টি হইল।
জত জনা য়াইসা ছিল সব জনা মইল॥
তারপরে নবাব সাহেব সমাচার সুনে।
সুনি য়ানন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল॥
মোনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল।
মনসুবাদ উড়াইয়া কবি গঙ্গারাম কইল॥

ইতি মহারাষ্ট্রা পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব। সকাব্দ ১৬৭২, সন ১১৫৮ সাল॥ তারিখ ১৪ পৌস, রোজ শনিবার॥

---

(৬২) লঘ্যি কইরা আসি—প্রস্রাব করিয়া আসি, 'লঘ্যি' শব্দের অর্থ প্রস্রাব নহে। সভাস্থলে এই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে। ইহা ঠিক ইংরাজী Please let me go out হিসাবের কথা।
(৬৩) সান—স্নান। (৬৪) সে পহরিতে—তৃতীয় প্রহরে।

কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ

পরিষদের চেষ্টায় আবার একখানি অশ্রুতপূর্ব্ব পুথির বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই আলোচ্য পুথিখানির নাম 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'। পুথির রচয়িতার নাম কবি গঙ্গারাম। পুরাণখানি কত বড়, কয় খণ্ডে বিভক্ত, তাহা কিছুই জানা যায় না। আমরা যে অংশটুকু পাইয়াছি, তাহা প্রথম-কাণ্ড মাত্র। এই কাণ্ডের নাম 'ভাস্কর-পরাভব'। পুথিখানির তারিখ শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার। বাঙ্গলা ১১৬৪ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়; সুতরাং পুঁথিখানি পলাশীর যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ব্বে লেখা। লেখকের নাম নাই। ১৩১১ সালে ময়মনসিংহে যে শিল্পকৃষি-সাহিত্য প্রদর্শনী হইয়াছিল, ''ময়মনসিংহের ইতিহাস'' প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সেই প্রদর্শণীতে এই পুথিখানি উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি কোথায় কিরূপে এই পুথিখানি পাইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ''মহারাষ্ট্র-পুরাণ'', অতএব পুরাণের ন্যায় ইহার মুখবন্ধ অতি শুদ্ধ গম্ভীরভাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ লিখিতে গিয়া মহর্ষি বেদব্যাস যে কৌশলে পুরাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রপুরাণ-কর্ত্তা কবি গঙ্গারাম সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিবেন কেন? — তিনি গ্রন্থারম্ভেই লিখিতেছেন—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

''রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা। রাত্রিদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শৃঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্ব্বক্ষণ। হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে। এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥
এত যদি পাপ হইল পৃথিবী উপরে। পাপের কারণে পৃথি ভার সহিতে নারে॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর। কহিতে লাগিলে পৃথি ব্রহ্মা বরাবর॥
পাপের কারণে প্রভু পৃথি হইল ভারি। কত ব্যাম পাব আমি ভার সহিতে নারি॥
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা বোলিছে বচন। ব্যাকুল না হইয়া তুমি ধৈর্য্য কর মন॥
পৃথি সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেল শিবস্থানে। কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে॥
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি নারায়ণ। স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি বন্ধুজন। এ মহীমণ্ডল প্রভু তোমার সৃজন॥
এতেক বিনয় যদি কৈলা ব্রহ্মাবর। হাসিঞা তাগারে তাহারে তবে বলিলা শঙ্কর॥
এতেক মিনতি কর কিসের কারণ। বোল দেখি সু(শু)নি আমি তাহার বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা কহিলেন হাসি ত্রিলোচনে। পৃথিভার সহিতে নারে পাপের কারণে॥
পাপমতি হইল জীব করে দুরাচার। পাপিষ্ঠ মারিআ প্রভূ দূর কর ভার॥

কহিতে লাগিলা হয় এতেক সুনিঞা। পাপিষ্ঠ মারিছি আমি দূত পাঠাইঞা॥
এতেক বলিলা যদি ব্রহ্মার গোচর। পৃথি সঙ্গে গেলা ব্রহ্মা আপন ঘর॥
তবে ব্রহ্মা বিদায় কলিরা পৃথ্বিরে। ভাবিতে ভাবিতে পৃথি আইলা আপন ঘরে॥

ইহার পরের মহাদেব একটু ভাবনায় পড়িলেন। ব্রহ্মা ও পৃথিবীকে তিনি অভয় দিলেন, কিন্তু কিরূপে কাজটা সমাধা করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে বসিলেন।

'ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়া শিব রইলা ধানে।
কতক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে॥'

ধ্যানে ভাবিয়া চিন্তায় কথাটা শিবের মনে উদিত হইল,— পৃথিবীর ভারনাশের প্রণালীটা স্থির হইয়া গেল। তখন,—

'নদীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন। দক্ষিণ সহরে তুমি জাহ ততক্ষণ॥
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে। অথিষ্ঠান হও জাইয়া তাহার কণ্ঠেতে॥
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে। দূত পাটাইঞা জেন পাপিলোক মারে॥
সুনিঞা নন্দী গেলা শীঘ্রগতি। উপনীত হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি॥'
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে। অনেকদিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেয় মোরে॥

এইস্থান হইতে আমাদের আলোচ্য মহারাষ্ট্র-পূরাণের ঐতিহাসিক অংশ আরম্ভ হইল; কিন্তু গোড়ায় গলদ! কবির কথায় বলিতে গেলে 'দক্ষিণ সহর' নতুবা আসলে সেটি কোন দেশ তাহা ভূতভাবন ভবানীপতি ভাবিয়া চিন্তিয়াও বলিয়া দিলেন না। আসল কথা, কবি গঙ্গারামের বাড়ী রাঢ়ের যে গ্রামেই থাকুক না, তিনি যে বাঙ্গালার বাহিরে চতুর্দ্দিকে কোথায় কোন দেশ আছে, আর তাহার নাম কি, তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তাহা তাঁহার শিবের কথায় বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক কবির দক্ষিণ সহরের রাজা সাহুরাজা যে কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই; কারণ ভাস্করপণ্ডিত যখন আসেন, তখন মহারাষ্ট্রে বালাজী রাও পেশওয়া রাজত্ব করিতেন। যাহা হউক শিব নন্দীকে দক্ষিণ সহরে যাইতে বলিলেন বটে; কিন্তু সাহুরাজার অবস্থিতি স্থানটা বেশ সুনির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়া দিলেন না, "সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।" যাহা হউক নন্দী বেচারী শীঘ্রগতি পৃথিবীটা খুঁজিয়া "উপনীত হইল গিয়া সাহুরাজা প্রতি।" কবি গঙ্গারামের দক্ষিণ দেশের জ্ঞান বা মহারাষ্ট্র দেশের জ্ঞান যতই অস্পষ্ট হউক না, ঐতিহাসিক ঘটনায় তাঁহার অতঃপর আর ভুল নাই। সাহুরাজার ঘাড়ে নন্দী ভর করিলে, সাহুরাজা রঘুরাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুদিন বাঙ্গালার চৌথ পাই নাই কেন? এই রঘুরাজা যে নাগপুরের রঘুজী ভোঁস্‌লা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিছেন, আর তখন মহারাষ্ট্র রাজ যে বাঙ্গলার রাজস্বের এক চতুর্থাংশ পাইতেন তাহাও জানেন।

আলীবর্দ্দী খাঁ বিদ্রোহী হইয়া যখন সরফরাজ খাঁর হাত হইতে বাঙ্গালার মসনদ কাড়িয়া লন, সেই গোলোযোগে বাঙ্গালার রাজস্ব দুই বৎসর দিল্লীতে যায় নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৭৪০ সালে দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্‌র নিকট বাঙ্গালার চৌথ দাবী করিয়া পাঠান। বাদশাহ্ সত্য কথা বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাঙ্গালার আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতে আদেশ দেন।

নন্দী ভর করিবামাত্র সাহুরাজা রঘুরাজাকে বলিলেন, বাদশার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দাও, জানিয়া আসুক— বাঙ্গালার চৌথ কেন পাওয়া যাইতেছে না। 'রঘুরাজা পত্র লিখে আখর পাঁচ সাতে' অর্থাৎ সংক্ষেপে পত্র লেখা হইল। দিল্লীপতি যথাকালে পত্র পাইলেন ও তাহার মর্ম্মার্থ

অবগত হইলেন। এই দিল্লীপতিটি কে, কবি গঙ্গারাম তাহা আমাদের বলিয়া দিলেন না। কিন্তু তিনি যে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর দিল্লীপতি একটু কৌশল করিয়া জবাব দিলেন,—

''চাকর হইয়া মারিল সুবারে। জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে॥
লোক লস্কর তবে নাই আমার স্থানে। হেন কোন নাই তারে গিয়া আনে॥
বাঙ্গালা মুল্লুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে। দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেয় মোকে॥
জবর হইয়া সেই আছে বাঙ্গালাতে। চৌথের কারণে লোক পাঠাও তথাতে॥'

দিল্লীপতি এই পত্র লিখিয়া কৌশলে ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বটে; কিন্তু আপনার অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, হীনতা শত্রুর নিকট ষোল আনা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন— কবি গঙ্গারাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহুরাজাও একটু বোকাধাতুর লোক বলিতে পারা যায়। এরূপ একটি চিঠি পাইয়া সাহুরাজার বাঙ্গালার সামান্য চৌথ আদায়ে যাত্রা করা অপেক্ষা দিল্লীর ষোল আনাই আদায় করিতে গেলে বোধ হয় ক্ষতি হইত না। যাক্ সাহুরাজা বুদ্ধিমান হইবার আশায় তাহা করেন নাই, ইতিহাস বজায় রাখিবার জন্য তিনি বাঙ্গালাতে চৌথ আনিতেই গেলেন; অর্থাৎ বাদ্শার পত্র পাইয়া কাহাকেও চৌথ আদায়ের জন্য বাঙ্গালায় যাইতে বলিলেন। রঘুরাজা নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি নিজে যাইবার অনুমতি চালিলেন, 'তথাস্তু' আহাই পাইলেন— কিন্তু রঘুরাজা নিজে না গিয়া দেওয়ান ভাস্করকে পাঠাইলেন। ভাস্কর ডঙ্কা নাগারা নিশান ও ফৌজ লইয়া চলিলেন। সেতারা ছাড়িয়া বিজাপুর হইয়া তিনি রওয়ানা হইলেন, বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালার নবাবী চাল দেখিয়াছেন, নবাবী সেনার কুচ কাওয়াজের প্রথাই তিনি জানেন, কাজেই তিনি মহারাষ্ট্রীয় কঠোরতার বিষয় না জানিয়াই পথের বিবরণে বিজাপুরে ভাস্করসৈন্যের একরাত্রি বিশ্রাম বর্ণনার মধ্যে স্বচ্ছন্দে লিখিয়া দিলেন, —

'সেতার ছাড়িয়া জবে, বিজাপুর আইলা তবে,
একরাত্রি রইলা সেই খানে।
রাগরঙ্গ হইল যত, নাটুয়া নাচিল কত,
কটক চলিল পর দিনে॥'

যাহা হউক, ভাস্কর ক্রমে গ্রাম উপবন ছাড়াইয়া নাগপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার জানা আবশ্যক হইল, নবাব কোন স্থানে আছেন। চর প্রেরিত হইল। শীঘ্র চরমুখে সংবাদ আসিল। বর্দ্ধমান সহরে রাণীর দীঘীর পাড়ে নবাব ছাউনি করিয়া আছেন। তখন আবার কুচ আরম্ভ হইল। বীরভূম বামে রাখিয়া গোয়াল-ভূমের পার্শ্ব দিয়া ভাস্কর স্বদলে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে ভাস্কর নবাবকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, নবাব নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিলেন না। হরকরা অর্থাৎ প্রহরীরা রাত্রিতেই এই বিপদের কথা জানিতে পারিল এবং রাজারামকে সংবাদ দিল। এই নবাবটির নাম কি, কবি গঙ্গারাম তাহাও আমাদের কোথাও বলিলেন না। রাজারাম লোকটা যে কে, তাহারও কোন পরিচয় তিনি দেন নাই, তবে একটা আরিখ তিনি আমাদের এই সময় বলিয়া দিয়াছেন—

'বৈশাখের উনিশায়, বরগী আইলা তায়,
মহা আনন্দিত হইয়া মনে।'

১৯শে বৈশাখ বরগী বর্দ্ধমান ঘিরিল; কিন্তু কোন্ বৎসর তাহা কবি গঙ্গারামের মনেই রহিয়া গেল, কলমে ফুটিল না। পরদিন প্রাতে রাজারাম সংবাদদাতা হরকরাকে সঙ্গে লইয়া নিজের

সতর্কতার কথা জানাইয়া অম্লানবদনে নবাবকে বলিলেন ; —

'ইহা আমি না জানিল, আচম্বিতে সৈন্য আইল,
আসিয়া ঘেরিল লস্করে।'

নবাবটী এ সংবাদে রুষ্ট কি তুষ্ট হইলেন, রাজারামকে কর্ত্তব্য পালনের জন্য অথবা তাহার সরল সত্য কথার জন্য কোন আদর আপ্যায়ন করিলেন কি না, কবি তাহা কিছুই লেখেন নাই ; কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নবাবটিকে একটু বুদ্ধিমান্, কর্ম্মতৎপর লোক বলিয়া বুঝা যায়। কবি লিখিয়াছেন—

'রাজারামে এত কয়, নবাব শুনিয়া রয়,
তৎপরে দিলেন উত্তর।
হরকরা পাঠাইয়া, হকিকত আনাইয়া,
কোথা হইতে আইল লস্কর ॥'

গতানুশোচনা ত্যাগ করিয়া নবাব উপস্থিত মত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চর গিয়া সংবাদ আনিল,—

'চব্বিশ জমাদার, ভাস্কর সরদ্দার,
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইএগ্রা।
সেতারা গড় হইতে, বরগী আইল চৌথ নিতে,
সাহুরাজার হুকুম পাইএগ্রা ॥'

নবাব শুনিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে মুস্তাফা খাঁ বলিলেন, একি কথা, যখন সুজা খাঁ নবাব ছিলেন, তখন বাঙ্গালার বাদশাহী খাজনা দিল্লী যাইত, সেখান হইতে মাহারাট্টা চোখাই পাইত, এখান হইতে কখন দেওয়া হয় নাই।

তাহার পর নবাব উকীল পাঠাইয়া ভাস্করকে দিল্লী হইতে চৌথ নিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভাস্কর বলিলেন, দিল্লীর বাদশাহ্র হুকুমে যখন আসিয়াছি, তখন রাজ্য নষ্ট করিয়াও চৌথ লইয়া যাইব। নবাব আশায় পড়িয়া চৌথ দিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—

'এতেক শুনিয়া যবে, নবাব জানিল তবে,
ডাক দিয়া জমাদারে কহে।
যত জমাদার ছিল, তারে নবাব কহিল,
চৌথাই চাহে বারে বারে ॥'

জমাদার অর্থাৎ সেনাপতিরা নবাবের মনোভাব বুঝিয়া বলিল,—

''সেই টাকা দেহ সিপাএরে।
আমরা যত লোকে, মারিব বরগিকে,
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে ॥'

সৈন্যগণের বেতন পাওনা ছিল, তাহারা দেখিল টাকাটা কেন বাহিরে যায়, নবাবও কথাটা গ্রাহ্য করিলেন, কারণ দিল্লীপতির ন্যায় তাঁহার আয় তখন ''হেন কোন জন নাই তারে গিয়া আনে'' বলিয়া নাকে কাঁদিবার অবসর রহিল না। নবাব তার পর, ''পানবাটা কাছে ছিল, পান তুলিয়া সভারে দিল।''— যুদ্ধের উদ্যোগ পড়িয়া গেল।

এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতও সাজিতে লাগিলেন। যে সকল সর্দ্দার সজ্জিত হইল, কবি গঙ্গারাম

তাহাদের নামের একটা তালিকা দিয়াছেন,—

'ধামধমা মাত্র আর হিরামন কাশী। গঙ্গাজি আমজ জাএ আর সিমন্ত জোশী॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহেড়া। সভুজি জাএ আর কেশোজী আমোড়া॥
কেশব সিংহ মোহন সিংহ এ দুই চামার। যার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হাজার॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুঠিতে। আর দশজনা থাকে নবাবের চারিভিতে॥
বালারাও শেষরাও আজ শিশু পণ্ডিত। সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত॥
মোহন রায় পীতরাএ আর শিশোপণ্ডিত। যার সঙ্গে আছে বরগী মহা বিপরীত॥
শিবাজী সামাজি আর ফিরঙ্গরাএ। লুটিতে যাহার সঙ্গে বরগী দ্রুত ধাএ॥
আদি ❊ ❊ সুনন্দন খাঁ আর ভাস্কর। এই চৌদ্দ জানাতে ঘেরিল লস্কর॥'

কবি গঙ্গারাম এই বরগিসর্দ্দারদের নামাবলি না দিয়া যদি নবাবের সেনাপতি জমাদারদিগের নামাবলি শুনাইতেন, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্বান্বেষীদিগের বেশী তৃপ্তির কারণ হইত।

যাহা হউক, ভাস্কর একদিন দুই দিন করিয়া সাত দিন বর্দ্ধমান অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তখন নগরের অবস্থাটা কবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুনাইতেছি,—

'একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন হইল। চতুদ্দিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥
মুদি বাণিঞা জত বারাইতে নারে। লুটে কাটে মারে ছমুতে পাএ জারে॥
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। চতুদ্দিকে বরগীর ডরে রসদ নাহি লএ॥
চাউল কলাই মটর মুশুরি খেসারি। তৈল ঘি আটা চিনি লবণ একসের করি॥
টাকা সের হইল আনাজ কিন্‌তে নাহি পাএ। ক্ষুদ্র কাঙ্গাল যত মইরা মইরা জাএ॥
গাজা ভাঙ্গ তামাক না পাএ কিনিতে। আনাজ নাহি পাওয়া জাএ লাগিলা ভাবিতে॥
কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া। তাহা আনি সবলোকে খাএ সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল। কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইল। অন্য পরে কাকথা নবাব সাহেব খাইল॥'

কাজেই আর ধৈর্য্য রহিল না। নবাব আক্রমণের হুকুম দিলেন; কিন্তু দিলে কি হইবে শাহী ফৌজ— নবাবী সেনা নড়িতে চড়িতে নবাবী করিতে চায়, কাজেই নিশান উড়াইয়া ডঙ্কানাগারা বাজাইয়া তাহারা উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিল। মহারাষ্ট্রারা বুঝিল, নবাবসৈন্য নড়িতেছে তাহারা অবসর দিবে কেন? তাহারাও চারিদিক্ হইতে চাপিয়া আসিল—

'তখন নবাবের সেনাতে পড়িলা হড় বড়। হেন বেলাতে বহইলাতে ধরিলা ডেহর॥
হাজার হাজার ঘোড়া উঠাএ একবারে। হারা হারা কইরা আসে কাছাইতে নারে॥'

কাজেই আর বিলম্ব করা চলিল না,—

'তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া লইয়া। বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহর মারিয়া॥
তবে সামনে হইতে বরগী পলাইল। আর কত বরগি আসি পিছাড়ি ঘেরিল॥
মীর হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল। বে-কাবুড়ি সইরা সেহ মিসাইল॥
পেছাড়ি লুঠিল বরগি আসিয়া বকত। পোড়াইল ডেরা ডাণ্ডা তাম্বু আদি জত॥
খাজনার গাড়ী জত সাতে ছিল। চাইরদিগের বরগি আইসা লুঠিতে লাগিল॥'

এই সময়ে নবাবের সেনাপতি মুসাহেব খাঁ সদলে মহারাষ্ট্রাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া

একদিগের পথ কিরয়া দিলে নবাব সসৈন্যে সেই দিক দিয়া কাটোঞায় উপস্থিত হইলেন। হাজী সাহেব নৌকা করিয়া নবাবের জন্য কটোঞায় খাদ্যাদি প্রেরণ করিলেন। শিকার পলাইল দেখিয়া ভাস্কর লুণ্ঠনে মন দিলেন। গ্রামের লোকজন ভয়ে পলাইতে লাগিল। কবি গঙ্গারাম অতি উজ্জল ভাষায় এই পলায়নের বিবরণ দিয়াছেন,—

'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া। সোণারবাইনা পলাএ কত নিত্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত। তামাপিতল লইয়া কাসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পালাএ লইয়া চাক নড়ি। জাউলামাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
গন্ধবণিক পলাএ করাত লইয়া কত। চতুর্দ্দিগে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কায়স্থ বৈদ্য জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে। বরগির পলানে পেটারি লইয়া মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত জত তলয়ারের ধনি। তলয়ার ফেলাইয়া তারা পলান অমনি॥
গোসাঞি মোহন্ত জত চৌপালাএ চড়িয়া। বোচকাবুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা। বিছন বল্‌দের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া॥
সেক সাইয়দ মোগলপাঠান জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
গর্ভবতী নারী জত না পারে চলিতে। দারুণ বেদনা পাইয়া প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
দসবিস লোক যাইয়া পথে ডা-ড়াইলা। তা সভারে সোধায় বরগি কোথায় দেখিলা॥
তারা সব বোলে মোরা চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥
কাঙ্গাল গরিব জত জাএ পলাইঞা। কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিঞা॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি। চাঞি ধানুক পলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল। বরগির ভয়ে সব পলাইল॥'

তারপর বরগি পলাতক জনের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। দুলপাট ছাড়া কবি বলিতেছেন,—

'কারু হাত কাটে কারু কাটে নাক কান। একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ। আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেএ তার গলাএ॥
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। * * * * *
এই মত বরগি কত পাপকর্ম্ম কইরা। সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেএ সব ছাইড়া॥'

তারপর গ্রামে ঢুকিয়া গৃহদ্বার পোড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন অনেকে গঙ্গা পার হইয়া রক্ষা পাইল। ভাস্কর কাটোচার নিকট যে সকলগ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছিলেন, কবি গঙ্গারাম তাহার একটি ফর্দ্দ দিয়াছেন,—

'চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর। ক্ষিরপাই পোড়াএ আর বর্দ্ধমান সহর॥
নিমগাছি সেড়গাঁ আর সিমইলা। চণ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা॥'

তারপর—

'এই মতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চারিভিতে। পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে॥
পির খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল। তাহার কারণে বরগি লুটিতে নারিল॥'

এই পীর খাঁ ফৌজদার কি কৌশলে বরগীকে বিমুখ করিলেন, কবি যেটুকু লিখিলেন না, ইহা

ক্ষোভের কথা বটে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি, ভাস্করের সেনাপতি শিবরাও হুগলীতে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই রাজস্ব আদায়ের সংবাদ শুনিয়াই কলিকাতায় ইংরাজেরা ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মহারাট্টা-নালা খনন করান এবং সহরের সমস্ত ফিরিঙ্গী ও আরমানিদিগকে লইয়া অবৈতনিক সৈন্য দল গঠন করেন। ভলান্টিয়ার সৈন্যের উৎপত্তি এইরূপে হয়।

তারপর ভাস্কর রাঢ়ের যে সকল গ্রাম ছারখার করেন, কবি তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, বীরভূম এবং হুগলী জেলায় বিস্তর গ্রামের নাম দেখা যায়। সে তালিকা অতি দীর্ঘ, সেজন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। কাগামোগা নামক স্থানে ওলন্দাজের কুঠি ছিল, তাহাও লুটিয়া লইয়াছিল। শেষে বরগিরা জেমোকান্দী ডাহাপাড়া পোড়াইয়া হাজিগঞ্জের ঘাটে পার হইয়া বরগিরা মুরশিদাবাদে ঢুকিয়া জগৎশেঠের বাড়ী লুটিল। হাজি আহম্মদ ও নোয়াজিস মহম্মদ কেবল মাত্র কোন ক্রমে নবাবের কেল্লা রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন,—

'হাজি আয় ছোট নবাব উপরে ছিল। বরগির নাম সুইনা কিল্লাএ সাধাইল ॥'

নবাব তখনও কাটোঞায়। মুরশিদাবাদ লুঠের কথা শুনিয়া তিনি শীঘ্র সহরে আসিলেন। নবাবের আগমন জানিতে পারিয়া ভাস্কর সরিয়া পড়িল। জগৎশেঠের বাড়ী লুঠিয়া ভাস্কর বড় কৌশলে নগর ত্যাগ করেন। কবি গঙ্গারাম বলিতেছেন,—

'তবে বরগি পার হইলা হাজিগঞ্জের ঘাটে। শীঘ্রগতি আইলা জগৎসেঠের বাড়ী লুটে ॥
আড়কটি টাকা জত ঘরে ছিল। ঘোড়ার খুরচি ভরি সব টাকা নিল ॥
তবে সও দুই তিন টাকা ছিটাইঞা। শীঘ্রগতি গেলা বরগি গঙ্গাপার হইয়া ॥
তবে ফকির ফকিরা গিরস্ত জত ছিল। সেই সব টাকা তারা লুঠিতে লাগিল ॥'

এইরূপে নগরের লোককে অন্যমনস্ক রাখিয়া নিজামত কেল্লার আক্রমণ হইতে বাচিবার জন্য ভাস্কর গঙ্গা পার হইয়া গেল। এক জগৎশেঠের কুঠি লুটিয়া আড়াইকোটি টাকা পাওয়ায় আর অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া ভাস্কর এই কৌশলে পলাইল।

নবাব কাটোঞা ছাড়িয়া আসিবার পর ভাস্কর সদলে কাটোঞায় গিয়া জমিল এবং কাটোঞা, ভাওসিংহের বেড়া ও দাঁইহাট জুড়িয়া ছাউনি করিয়া বসিল। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, আর লুটপাট চলে না, কাজেই ভাস্কর তখন চারিদিকে খাজনা আদায় করিতে লাগিল। জমীদারেরা আসিয়া মিলিল এবং —

'গ্রামে গ্রামে চর তাগিদায় গেল। তারা সব জাইয়া খাজানা সাদিতে লাগিল ॥'

ইহার পূর্ব্বে মীর হবিব বর্দ্ধমানের যুদ্ধে বরগির হস্তে বন্দী হন। তিনিই এখন ভাস্করের বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার পরামর্শে গঙ্গায় নৌকার পুল বান্ধিয়া সৈন্য পারের ব্যবস্থা হইল। দাঁইহাটের ঘাট পর্য্যন্ত পুল বাঁধা হইল। ইহা আশ্বিন মাসের পূজার সময়ের কথা। বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে তখন দুর্গোৎসবের ধুম দেখিয়া ভাস্কর পণ্ডিতও দুর্গোৎসবের আয়োজন করিল। জমীদারদিগকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া মহা ধুমধামে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিন রাত্রিতে বরগিরা সেই পুল বাহিয়া এপারে ফুটিসাকো নামক স্থানে আসিল, নবাব সে কথা শুনিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া —

'ষাট হাজার ঘোড়া আর ডেড় লাখ বহনিয়া। তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া ॥'

এই সকল ফৌজের সঙ্গে যে সকল ফৌজদার আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঠাকুর সিং নামে একজন

হিন্দু সেনাপতির নাম আছে। এত বৃহৎ নবাবী সেনা তারকপুরে আসায় ভাস্কর সদলে পিছাইতে লাগিল। নবাবী সেনা পাশ্চাদ্ধাবন করিল। পলাশী পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গেলে, পলাশীর বরগীরাও পলাইল এবং পুলপার হইয়া পুল কাটিয়া দিয়া গেল। নবাব নিজে রহনপুরে পহুছিয়া চারিদিকে তোপ সাজাইয়া "মুরচা লাগাইয়া" বসিলেন। পূর্ণিয়া হইতে ছোট নবাব বাহাদুর ও পাটনা হইতে জইনুদ্দীন আহম্মদকে সসৈন্যে আসিতে লেখা হইল। তাঁহারা আসিলে জইনুদ্দীন অবিলম্বে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, নবাব কিন্তু বর্ষার জলকাদা শুকাইবার অপেক্ষা করিতে বলিলেন। জইনুদ্দীন বলিলেন,—

'জলকাদা সুকাইলে বরগীর হবে বল। চতুর্দ্দিকে লুটিবে পোড়াবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকাএ করিয়া। রাতারাতি যেন বরগি মারে গিয়া॥'

মীর হাবিব এ সংবাদ পাইয়া নবাবকে ফৌজ পারের অবসর না দিয়াই—

'বড় বড় কামান আইনা থুইলা থরে থরে। হুগলি হইতে সুলুক আনে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোলা দাগিতে লাগিল। মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল॥
জেইমাত্র গোলা আইসা ফৌজে পড়িল। তখন নবাব সাহেব লোক উমনি পিছাইল॥'

মীর হহিবের কৌশল সফল হইয়াও হইল না, কামানটা ফাটিয়া গেল, সুলুকের তলা টা হইযা গেল। এ সংবাদ নবাব শিবিরে যেমন পৌঁছিল, অমনি নবাব ফৌজ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। মশাল জ্বালিয়া সেনা কুচ করিয়া নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিল। জইনুদ্দীন উদ্ধারণ পুরে আসিয়া বড় বড় পাটেলি নৌকা "জুড়িন্দা" বান্ধিয়া "গুদারা" লাগাইয়া দিলেন। ফৌজ তাহার উপর দিয়া পার হইয়া অজয়ের তীরে গেল। সেখানেও আবার জুড়িন্দা বাঁধিয়া লইল। রতন হাজারী বাইশ শত ফৌজ লইয়া "পাটেলি" চড়িয়া যখন পার হইবে, অমনি কতকদূরে পাটেলি তলা ফাটিয়া ডুবিয়া গেল। তখনও বরগী নিশ্চিন্ত, তবে তাহারা সংবাদ রাখিতে ছিল। রতন হাজারির দল সাঁতারাইয়া ডাঙ্গার উঠিবামাত্র হঠাৎ বরগীর শিবিরে "বহনিয়া" দলে মোগল আসিল বলিয়া একটা কলরব উঠিল; সকলে ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল, ভাস্কর পণ্ডিত সে পলায়নে বাধা দিতে পারিলেন না। অষ্টমীর রাত্রিতে ভাস্কর প্রতিমা ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সে যাত্রা কাটোঞা হইতেই ফিরিলেন। ভাস্কর পুনরায় সসৈন্যে চৈত্রমাসে আসিলেন। এবার আসিয়া লুঠের অপেক্ষা হত্যার মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলেন। কবি এখানে নিজের কাব্যের সুত্রপাতের সঙ্গে পরিণামে সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্যাসী ছিল। গোহত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল॥
হাজার হাজার পাপ করিল দুর্ম্মতি। লোকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্ব্বতী॥
পাপিষ্ঠ মারিতে আদেশিলা পশুপতি। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈলা পাপমতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি। এতেক কহিয়া তবে রুষিলা শঙ্করী॥
ভৈরবী জোগিনী যত নিকটে ছিল। জোড়াহস্ত কইরা তারা ছমুতে দাড়াইল॥
তবে দুর্গা কহে শুন জতেক ভৈরবী। ভাস্করকে বাম হইঞা নবাবকে সদয় হবি॥
প্রত্যেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন। এখন যেরূপে ভাস্কর মইল শুন বিবরণ॥

আমরাও তাই বলি যে— দেবতাদের ব্যবস্থা দেবতারা যাহাই করুন আর তদ্দ্বারা কবি গঙ্গারামের কাব্যশক্তি যতই কেন প্রকাশ হউক না, এখন ইতিহাসটা শেষ করা আবশ্যক।

ভাস্কর এ যাত্রাতেও আসিয়া কাটোঞায় ছাউনী করিলেন। নবাব শুনিয়া মনকরাতে আসিয়া চাউনী করিলেন। আলীভাই নামে একব্যক্তি ভাস্করকে পরামর্শ দিলেন এবার আর লুঠে কাজ

নাই। বারবার আসিয়া সৈন্যক্ষয় করিয়া কি হইবে? নবাবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেল। ভাস্কর সম্মত হইলেন। আলীভাই পঁচিশ জন সওয়ার লইয়া ফুটিসাকোতে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নবাব-শিবিরে লোক পাঠাইলেন। নবাব নিরস্ত্র হইয়া আলীকে আসিতে আদেশ দিলেন, নিরস্ত্র হইয়া সওয়ার লইয়া আলিভাই আসিলেন ও বন্দোবস্তের প্রার্থনা করিলেন। নবাব বর্দ্ধমানের কথা তুলিয়া বলিলেন, আমি যখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তখন তোমরা এ কথাটা কাণে তুল নাই। শুনিয়া

"আলিভাই বোলে জাহা হবার তাই হইল। কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল।
দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে। ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এইস্থানে॥"

ইহা শুনিয়া নবাব জানকীরাম ও মুস্তাফা খাঁকে সঙ্গে নিলেন। ভাস্করও আসিতে সম্মত নহেন, মীর হবিবও পরমার্শ দিলেন না। শেষে মুস্তাফা খাঁ নিজে কোরাণ ও জানকীরাম গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া জামীন হওয়ায় ভাস্কর স্বীকৃত হইলেন। ১লা বৈশাখ শুক্রবারে ভাস্কর কাটোঞা হইতে যাত্রা করিলেন। ২রা তারিখে মনস্করা-শিবিরে দরবারে নিরস্ত্র হইয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব পুরাতন কথা পাড়িলেন।

"এতেক শুনিঞা ভাই আলি কহিল। এতদিন যাহা হবার তাহা হইল॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলু তোমার স্থানে। কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে॥"

তারপর কবি যেটুকু লিখিয়াছেন সেটুকু বেশ হাসির কথা,—

"এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেক হাসি। খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি॥"

এইরূপে নবাব 'লঘ্যি" অর্থাৎ please let me go out-এর ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলেন। ষড়যন্ত্র পূর্ব্বেই স্থির ছিল। কতক্ষণ বসিয়া ভাস্কর বলিলেন, তবে আমিও স্নানপূজায় যাই। মুস্তাফা খাঁ বলিলেন, চল সকলেই যাই, "সে পহরে আসিব নবাবের ঠাঁঞি।" তাহার পর—

জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়াএ চড়িতে। তলয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে॥
সেইক্ষণে তবে খটাবট্টি হইল। যতগুলা আইসা ছিল সবগুলা মইল॥

তারপর নবাব শিবিরে আনন্দ হইল, ফকীর ফকরাণ খাইল, বাজনা বাজিল, নিশান উড়িল আর কবি গঙ্গারাম গ্রন্থ সমাপন করিয়া বলিলেন,—

মনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল। মনসুরা দউড়াইয়া কবি গঙ্গারামে কইল॥

ইতি মহারাষ্ট্র-পুরাণে প্রথমকাণ্ডে ভাস্করপরাভব। শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ই পৌষ রোজ সনিবার।

কবি গঙ্গারামের কাব্য-কথা এই পর্য্যন্ত। ইহা তাঁহার প্রথমকাণ্ড, এই পুরাণের দ্বিতীয়াদি কাণ্ড আর লেখা হইয়াছিল কি-না জানি না। ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃ:) আলীবর্দ্দী খাঁ নবাবের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রথম আগমন হয়। ভাস্করের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরেই বিদ্রোহ দমন হয়; সুতরাং আমাদের আলোচ্য কাব্যখানি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিত বলিলেও বলা হয়। বর্ত্তমান পুঁথিখানিও ঘটনার আট বৎসরের মধ্যে লেখা; সুতরাং এ পুথিখানি কবির নিজের মূল পুস্তক না হইলেও তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থ। কবি গঙ্গারাম এই কাব্যে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার বিশেষ অসামঞ্জস্য নাই। একটা প্রধান ঘটনা কেবল মিলিল না। বর্দ্ধমানসহরে নবাব সসৈন্যে যে ভাস্কর পণ্ডিতকর্ত্তৃক সাত দিন অবরুদ্ধ ছিলেন, তাহা মুতাক্ষরীণ,

---

*. অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহার পর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় 'বঙ্গে বর্গী' নামে একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস লিখিয়াছেন, যে খানিও দ্রষ্টব্য।

তারিখী-বাঙ্গালা বা হলওয়েলের বিবরণীতেও নাই। আমাদের কালীপ্রসন্ন বাবুও তাঁহার নবাবী আমলের ইতিহাসে সে কথা বলেন না। তবে নবাব সৈন্য যে অন্নহীন হইয়া কলাগাছের এঁঠে সিদ্ধ করিয়া খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা অতিশয়োক্তি নহে। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাব বৰ্দ্ধমান হইতে সত্তর ক্রোশ দূরে কাটোঞাতে যে কষ্টে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং নিরন্ন অবস্থায় যেরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা তারিখী-ইউসুকীর গ্রন্থকার ইউসুক আলীর কথা হইতে কালীপ্রসন্ন বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল,* —

বাঙ্গালা ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) আলীবর্দ্দি খান, বাঙ্গালার নবাবী অধিকার করেন। এক বৎসরের মধ্যে রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য নিজ মনোমত লোকজন নিযুক্ত করিয়া সুজাউদ্দীনের জামাতা মুরশিদকুলী খান্‌কে (২য়) কটক হইত উচ্ছেদ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক মাস অবরোধের পর মুরশিদকুলীর জামাতা বাকর খান একদিন যুদ্ধে আহত হইলে, মুরশিদকুলী পরাজিত হইয়া মছলীবন্দরে পলায়ন করিলেন। আলীবর্দ্দির জামাতা সৈয়দ আহম্মদ উড়িয্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুরশিদকুলী খানের অনুকূলপক্ষ আবার বিদ্রোহী হয়। নবাব আবার উড়িষ্যায় গিয়া তাহা দমন করেন এবং জামাতার সঙ্গে মাসুম খান্‌কে প্রতিনিধি রাখিয়া আসেন। ১১৪৯ সালের শেষে নবাব মন্দ-গমনে রাজধানীতে ফিরিতে লাগিলেন। পাঁচ হাজার সেনা সঙ্গে রাখিয়া নবাব আর সকলকে বিদায় দিলেন। মেদিনীপুরের দক্ষিণে আসিয়া নবাব শুনিলেন, পঞ্চকোটের পাৰ্ব্বত্যপথ দিয়া চল্লিশহাজার সেনা লইয়া নাগপুরের অধীশ্বর রঘুজী ভোঁস্‌লের রণনিপুণ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালার রাজস্বের "চৌথ' আদায়ের আছিলায় বৰ্দ্ধমানের দিকে চলিয়াছে। উভয়দলের মধ্যে কেবল কুড়িক্রোশ মাত্র ব্যবধান, পরদিন হয়ত মহারাট্টারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নবাবের শিবিরের কাছে আসিতে পারে। নবাব মনে মনে চিন্তিত হইয়াও মুখে সাহস প্রকাশ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে জানা যায়, উড়িয্যার দেওয়ান মীর হবিব খান্ মহারাট্টাদিগকে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। হলওয়েলের বর্ণনা হইতে জানা যায়, মহারাট্টাযুদ্ধের সন্ধি অনুসারে মহারাট্টাগণ দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্‌র নিকট দুই বৎসরের বাকী চৌথ চাহিয়া পাঠায়, কিন্তু বাদ্‌শাহ্ বলেন, বাঙ্গালার সুবাদার বিদ্রোহী, সে কোন রাজস্বই এখানে পাঠায় না, অতএব তোমরা গিয়া সুবাদারকে দমন করিয়া চৌথ আদায় করিয়া লইতে পারে। ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হয়। ইহার দুই বৎসর পরে ভাস্করপণ্ডিত বাঙ্গালায় আসেন।*

নবাব তাহার পর বুঝিলেন যে যদি মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে স্বদলে আক্রান্ত হইতে হয় তবে অবরোধে পড়িয়া খাদ্যাভাবে মারা পড়িতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত বৰ্দ্ধমানে রওয়ানা হইতে আদেশ দিলেন। বৰ্দ্ধমানে আসিয়া দেখিলেন, বরগীরা তাঁহার পূর্ব্বে আসিয়া নগরের একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছে। নবাব আসিতেই, তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল। শেষে উভয় দলে যুদ্ধ হইতে লাগিল। জয় পরাজয় নাই, প্রত্যহ প্রাতে যুদ্ধ হয়, সন্ধ্যায় উভয় দল যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া

---

*. এই পর্য্যন্ত কবি গঙ্গারামের বর্ণনার সহিত ইতিহাসের মিল আছে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবরণটাও একটু বিচার করিয়া দেখিবার কথা। মহারাষ্ট্র যুদ্ধে বাদশাহর সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাহা পেশবার সহিতই হইয়াছিল; চৌথের দাবী করিলে তিনিই করিবেন, নাগপুরের ভোস্‌লে রঘুজী তাহার অধিকারী নহেন সুতরাং চৌথের জন্য ভাস্করের আগমন ঠিক নহে, তবে এ অছিলার মীর হবিব খানের আহ্বান রক্ষা করা একবারে সম্ভবও না হইতে পারে।

শিবিরে ফেরে। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের যুদ্ধরীতি দেখিয়ে জয়ের আশা ছাড়িয়া কিছু টাকা লইয়া ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি নবাবকে জানাইলেন, মহারাট্টারা বহুদূর হইতে অর্থের আশায় অসিয়াছে, নবাব দশ লক্ষ টাকা দিলেই ফিরিয়া যাইবে। মুস্তাফা খান্ তখন নবাবের সঙ্গী সেনাদলের সেনাপতি। তাঁহার প্রস্তাবে নবাব ইহাতে সম্মত হইলেন না। কাজেই লঘুযুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাগিল। একদিন নবাব সমস্ত সেনা লইয়া বিপুলবেগে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সৈন্যচালনায় বিশৃঙ্খলা হওয়ায় মহারাট্টাগণের সুবিধাই হইতে লাগিল। তাহারা কৌশলে নবাব-বেগমের হস্তী ঘিরিয়া ফেলিল। মুসাহেব খান্ নামে একজন সেনাপতি অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বেগমদিগকে উদ্ধার করেন। নবাব লক্ষ্য করিলেন, মুস্তাফা খান্ যুদ্ধে তেমন মনোযোগী নহেন। নবাবী-শিবিরের দ্রব্যাদি সমস্ত শত্রুহস্তগত হইয়াছে। যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে অগ্রসর হইবার বা ফিরিয়া শিবিরে যাইবার উপায় নাই। একটি তাম্বু ও তিন চারিখানি শিবিকা ভিন্ন তখন নবাবের নিশাযাপনের অন্য আশ্রয় নাই, কাজেই নবাব দশ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। ভাস্কর অবস্থা বুঝিয়া এককোটী টাকা চাহিলেন এবং নবাবের অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়া প্রচার করিলেন, নবাবপক্ষের যে কেহ মহারাট্টার দলে আসিতে চাহ, এস, আমি আশ্রয় দিব। সন্ধ্যার সময়ে নবাবের দলের অনেকে বরগীর দলে গিয়া মিলিল। উড়িষ্যার যুদ্ধের সময় আলীবর্দ্দি খান্ মুস্তাফা খানের কয়েকটি অনুরোধ রাখেন নাই বলিয়া মুস্তাফা খান্ আলীবর্দ্দির উপর চটিয়া ছিলেন। এই তাঁহার শোধ লইবার সময়। আলীবর্দ্দি ইহা বুঝিতে পারিয়া, সেনাপতিকে শান্ত করিবার জন্য বালক সিরাজকে লইয়া রাত্রিতে মুস্তাফা খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ও নিজ দৈন্য জানাইয়া তাঁহার সাহায্য চালিলেন। মুস্তাফা অন্যান্য সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নবাবকে ভরসা দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নবাব অমিততেজে বিপক্ষ মধ্য দিয়া স্বদলে যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাবের প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাপার অতীব ভীষণ ব্যাপার। পূর্ব্বদিন সেনারা অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছে, রাত্রিতে মহারাট্টার বিজিত কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহার উপর দশ বার ক্রোশব্যাপী লুণ্ঠিত ভষ্মীভূত গ্রাম-নগরাদির মধ্য দিয়ে অনাহারে যুদ্ধ করিতে করিতে ফিরিতে হইতেছে! এই দুর্দ্দশায় অবস্থা বুঝিয়া বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান রাজা মাণিকচাঁদ প্রত্যুষেই পলায়ন করিলেন। গ্রামনগরে লোক নাই, সকলে বরগীর ভয়ে পলাইয়াছে, কাজেই আহার্য্য মিলিবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা বৃক্ষপত্র, বল্কল, পিপীলিকাদি ধরিয়া খাইতে লাগিল। নবাব তিনদিন উপবাসী; তৃতীয় দিবসে তিনপোয়া মাত্র খিচুড়ী সংগৃহীত হইলে তাহা সাতজনে ভাগ করিয়া খাইতে হইল। একদিন নবাবীসেনাদল রন্ধন নিযুক্ত মহারাষ্ট্রীয়গণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি খাইয়া ফেলিল। তিনদিন পরে সকলে কাটোযায় পঁহুছিয়া দেখিলেন, মহারাট্টারা আগে আসিয়া নগর ও শস্যভাণ্ডার পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নবাবীসেনা সেই দগ্ধশস্য অমৃত মনে করিয়া খাইতে লাগিল। এই সময়ে মুরশিদাবাদ হইতে আহার্য্য ও সাহায্য আসায় নবাবীসেনার অবস্থা ফিরিল। এই সময়ে বর্ষাও আসিয়া পড়িল। মীর হবিব খান্ ইতিপূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রদলে প্রকাশ্যতঃ যোগ দিয়াছিলেন। নবাব যখন কাটোয়ায়, তখন পরামর্শ করিয়া মীর হবিব খান একদল সেনা লইয়া মুরশিদাবাদের পশ্চিম ডাহাপাড়ায় গিয়া অগ্নিদান ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন; পরে গঙ্গাপার হইয়া জগৎশেঠের কুঠি লুঠিয়া দুইকোটী টাকা ও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করিলেন। হাজী আহম্মদ ও নওয়াজিস কেবল কেল্লাটি রক্ষা করিতে পারিলেন, আর কিছু পারিলেন না। পরদিন প্রাতে নবাব মুরশিদাবাদে আসিয়াছেন জানিয়াই মীর হবিব সদলে কাটোয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ইহা ১১৪৯ সালে (১৭৪২ খৃষ্টাব্দের) প্রথমে ঘটে।

মহারাট্টারা কাটোয়ার উত্তরে অজয় পারে সাঁকাই নামক পল্লীতে এক মৃন্ময় দুর্গ ও গড়বেষ্টিত ফৌজদারের বাড়ী অধিকার করিয়া বর্ষা কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। এখান হইতে তাহারা মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমান, হুগলী, রাজশাহী, রাজমহল প্রভৃতি স্থান লুঠিতে লাগিল। মুরশিদাবাদের লোকেরা, মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়ায় চলিয়া গেল। নবাবও পরিবারবর্গকে পদ্মাপারে গোদাগাড়ীতে পাঠাইলেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকেরও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইল। কাটোয়া ও বর্দ্ধমানের দক্ষিণ লোকাভাবে জঙ্গল হইয়া উঠিল।

হুগলীতে বরগীরা একটা প্রধান আড্ডা করিল। মীরহবিব খানের পরামর্শে শিবরাও নামে মহারাট্টা সর্দ্দার রাজস্ব আদায় আরম্ভ করিতে লাগিল। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের লোকেরা কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ইংরাজেরা এই সময়ে কলিকাতার তিন দিকে গড় কাটাইতে লাগিলে। ইহাই মহারাষ্ট্রনালা। এই কাজে মজুরেরা বেতন লয় নাই। অন্যান্য ব্যয় নগরবাসীরা চাঁদা করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজেরা এই সময়ে সহরের ইউরোপীয়, আর্ম্মাণী এবং ফিরিঙ্গীদিগেকে লইয়া ভলন্টিয়ার সেনাদল গঠিত করিলেন। চাঁদা ও ভলন্টিয়ারের এই সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে বেহার হইতে নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দীন সসৈন্যে যোগ দিলেন। বর্ষাশেষে নবাবী সেনা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইল। রাত্রিতে নৌসেতু করিয়া নবাবী সেনা কাটোয়া পার হইল। দুই তিন হাজার সেনা পার হইলে সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা হউক আবার সেতু নির্ম্মিত ও মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পঞ্চকোটের পথ দিয়া উড়িষ্যায় পলাইল। ইহা ১১৪৯ সালের আশ্বিনের ঘটনা। এই যুদ্ধে মুস্তাফা খান্ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যায় মাসুম খান্‌কে নিহত করিয়া দেশে চলিয়া গেল। হলওয়েল বলেন শিবরাও ধরা পড়েন এবং তাঁহার সাহায্যে পেশবা বালাজীরাও এর সহিত সন্ধি হয়। ইহার পর ১১৪৯ সালের শেষে (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) বালাজীরাও স্বয়ং ১১ লক্ষ টাকা চৌথের জন্য বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রঘুজী ভোঁসলেও এই সময়ে নিজে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালাজীরাও সন্ধি অনুসারে নবাবকে সাহায্য করিতেই আসিতেছিলেন। বেহারের চৌথ দিয়া আলীবর্দ্দি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময়ে রঘুজী বর্দ্ধমান অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। নবাবী-সেনা ও বালাজীর মহারাষ্ট্রীয় সেনা একত্র তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। রঘুজী এবার অসুবিধা বুঝিয়া বর্দ্ধমান হইতেই পলাইলেন। পরবর্ষে রঘুজী ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাইলেন, ভাস্করের উদ্দেশ্য চৌথ আদায় নহে, লুণ্ঠনে উপার্জ্জন, কাজেই ভাস্কর বেশী অগ্রসর না হইয়া পশ্চিম-বাঙ্গালার নানাস্থানে লুঠিতে লাগিল। আলীবর্দ্দী ইহাতে বিপন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, কারণ এবার ভাস্কর যুদ্ধ করিতে চাহে না, এক স্থানে তাড়া দিলে অন্য স্থানে সরিয়া গিয়া লুঠ করে। কাজেই মন্ত্রী জানকীরাম ও মুস্তাফাকে পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা নবাবের শিক্ষানুসারে কৌশলে ভাস্করকে মনকরা নামক স্থানে নবাব দরবারে লইয়া আসিলেন। ভাস্কর দরবারে আসিলে লুক্কায়িত সেনারা তাহাকে হত্যা করিল। বাহিরে ভাস্করের অনুচর মহারাষ্ট্র সেনাদল অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা নবাবী সেনাদ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পলাইল। ১১৫০ সালে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ) ভাস্কর নিহত হন।

ইতিহাসের এই পর্য্যন্ত আমাদের মহারাষ্ট্র-পুরাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পাঠকগণ দেখিবেন, ইহার সহিত কবি গঙ্গারামের একটী কথারও অমিল নাই।

গঙ্গারামের কবিতার মধ্যে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকের পরিচয় উপরের লিখিত বিবরণে পাইয়াছেন। বাকী কয়েক জনের মধ্যে রাজারাম সিংহ নবাবের চরের অধ্যক্ষ ও মেদিনীপুরের ফৌজদার ছিলেন। ইহারই নিযুক্ত লোকে দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া সংবাদ

সংগ্রহ করিত। সমশের খান্ আলীবর্দ্দীর কেজন সেনাপতি ছিলেন। যে যুদ্ধে সরফরাজ খানের পতন হয়, সেই যুদ্ধে মীরহবিব খান্, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ ও সমশের খান্ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মীর উমের খান্ও একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। সিরাজের সময় যে দিলীর খান্ ও আসালত খান্ সওকত জঙ্গের যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা এই মীর উমের খানের পুত্র। এতদ্ভিন্ন আর কাহারও পরিচয় তেমন কিছুই পাওয়া যায় না।

ভাস্করের দুর্গোৎসবের কথা কোন ইতিহাসে নাই, কিন্তু তাহা যে ঘটে নাই, তাহা বলিবারও কোন প্রমাণ নাই, কারণ কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং সমসাময়িক কবি। তাঁহার সাক্ষ্য এ বিষয়ে অধিক গ্রহণীয়। সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাসলেখকের পক্ষে এ পুতুল-পূজার ব্যাপার অকিঞ্চিৎকর বোধে লিপিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে অগ্রাহ্য হওয়া কিছু অন্যায় নহে।

গ্রন্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠতা বিশেষ কিছু নাই। বর্গীর অত্যাচার বর্ণনা করিতে তিনি যে আলঙ্কারিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাব্যরস না ছড়াইয়া সাদাসিধা কথায় ঘটনার সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে ভাস্করের দ্বিতীয়বার আক্রমণে তাঁহা কর্ত্তৃক গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও স্ত্রী হত্যার যেরূপ অবাধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়াই বোধ হয়।

অতঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুথিখানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণসুলভ আনুনাসিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে রাঢ়ের লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায আর সে অনুমান আমার নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে, আমি তাঁহাকে রাঢ়ীয় লোক বলিতে একটুও ইতস্তঃ করিতেছি না। একটা কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, — পুথিখানি আমরা ময়মনসিংহে পাইয়াছি, সুতরাং এখানি যে পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন লোকের নকল করা পুথি তাহাতেও সন্দেহ নাই আর তাহার প্রমাণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। অধিকাংশ স্থলেই রাঢ়ীয় উচ্চারণসুলভ আনুনাসিক ক্রিয়াপদের মধ্যে মধ্যে দুই চারিটির বানান আবার পূর্ব্ববঙ্গ-সুলভ স্বরবিস্তৃতি যুক্ত। স্বর-ব্যত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে যথা,—

(১) লোকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্ব্বতি।

(২) যেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পড়িল।

(৩) বরগির নাম সুইনা সব পলাইল।

পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকের হাতে নকল হওয়াতে রাঢ়ীয় উচ্চারণের অনেকগুলি ক্রিয়াপদের বানানও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যথা,—

(১) বোচা বুচ্‌কি লয় যত বাহুকে করিয়া।

(২) বিছন বলদের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া।

আর একটি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে রহস্য আমি এই গ্রন্থে লক্ষ্য করিয়াছি।

অধিকাংশ স্থলে এই পুথিতে শ ও ষ এর স্থলেই স ব্যবহৃত হইয়াছে। 'জ' 'য' স্থানে সর্ব্বত্র 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে। ই-কারের প্রয়োগই বেশী। ণ-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে; কিন্তু 'র'কার স্থানে 'অ'কারের প্রয়োগ তত বেশী নহে। প্রথমভাবে কিছু কিছু আছে শেষের দিকে আদৌ নাই।

'য়া'কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলি রাঢ়ীয় উচ্চারণে সর্ব্বত্র ঞ তে আকার দিয়া লেখা হইয়াছে— পাইঞা করিঞা পাঠাইঞা ইত্যাদি। কোন কবির সময়ের এত নিকটবর্ত্তীকালের কোন পুস্তক আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই পুথিতে অধিকাংশ কথার রাঢ়ীয়

উচ্চারণ অনুসারে বানান দেখিয়া আমার মনে হয়, রাঢ়ীয় কবিরা ব্যাকরণে লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বানান লিখিতেন। আবার রাঢ়ীয় পুস্তক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর পঠনার্থ লিখিত হইলে বোধ-সৌকর্য্যার্থে তাহার বানান পরিবর্ত্তন করিয়া লেখা হইত। তাহার আভাস ও প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুথির ছাপার সময় বানান নির্ণয় করিতে বড় বিপদে পড়িতে হয়। একখানি পুথির সর্ব্বত্র একই শব্দের একই প্রকার বানান পাওয়া যায় না। পরিষদে যে সকল গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ ব্যাপার যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায। এই পুথিখানিতে য়ামি ও আমি দুইরূপ প্রয়োগই আছে। বরগি ও বরগী দুইরূপই আছে। আবার দেইখ্যা, দেইখা, দেখিয়া দেখিএগা এই চতুর্ব্বিধরূপই আছে,— এ সকলের সামাঞ্জস্য করার উপায় কিছু হয় কি না, আমি জানি না। নকার স্থানে সর্ব্বত্র 'ন' কারের প্রয়োগ এবং জকার স্থানে সর্ব্বত্র 'জ'কারের প্রয়োগ ও শকার স্থানে সর্ব্বত্র 'স'কারের প্রয়োগ, যাঁহারা প্রাচীন রীতি বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি আমি তাহা জানি না, কিন্তু কোন পুথিতে তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই না। এ পুতি‌তে অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের মত সমর্থিত হইয়াছে বলিতে পারি; কিন্তু সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত বা দেশজ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে ব্যাকরণসিদ্ধ বানান পরিবর্ত্তন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত কি না তাহা মীমাংসার বিষয়; যেমন এই পুথিতে 'যদি' শব্দটি সর্ব্বত্র 'জদি' এই বানানে লিখিত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন বা রক্ষণ কোনটী প্রার্থনীয়, তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

যাক্ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপর আর বেশী বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। পরিষৎপত্রিকায় এই পুথিখানি যেমন আছে সেইমত বানানে ছাপাইয়া দিলাম, এবং এ সম্বন্ধে মনীষীরা আলোচনা করিলে সুখী হইব।

শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী।

কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ

(প্রতিবাদ)

১৩১৩ সনের ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিষদের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কবি গঙ্গারাম ও তৎকৃত মহারাষ্ট্রপুরাণের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ও তৎসঙ্গে কবির সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ টীকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী কথা বলিবার আছে, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইল।

লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবু কবির গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া কবির জন্মস্থান সম্বন্ধে যে শেষ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার ভাষা হইতে উদ্ধৃতি করিলাম।

"অতঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুঁথি খানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণসুলভ অনুনাসিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে রাঢ়ের লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, আর সে অনুমান আমার নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে আমি তাহাকে রাঢ়ীয় লোক বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছি না।"

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবু যে যুক্তিবলে কবি গঙ্গারামকে রাঢ়ীয় বলিতেছেন, এই যুক্তি দেখিতেছি আজকাল যে কোন অজ্ঞাত কবির উপর প্রযোজ্য হইয়া কবিকে লইয়া টানা হেঁচ্‌রা করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কবি মুকুন্দের নাম এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। কিছুদিন পূর্ব্বে কবি মুকুন্দের জগন্নাথমঙ্গল লইয়া পরিষৎ পত্রিকায় এইরূপ বিচার হইতেছিল। বিশ্বকোষের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বহু গবেষণামূলক যুক্তির উপর দেখাইয়াছিলেন, কবি মুকন্দারামের বাসস্থান রাঢ়ভূমি আর আমাদের ময়মনসিংহের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় দেখাইয়াছিলেন কবির নিবাস ময়মনসিংহে। সে সময় রসিকবাবুর যুক্তিগুলি আমাদের নিকট যেরূপ লাগিয়াছিল, অদ্য সহৃদয় ব্যোমকেশ বাবুর যুক্তিগুলি আমাদের নিকট সেইরূপ প্রতীয়মান। এইরূপ প্রতীয়মান হইবার কারণ, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কবি মুকন্দ ময়মনসিংহের লোক নহেন এবং কবি গঙ্গারাম সম্বন্ধে আমি জানি তিনি ময়মনসিংহবাসী।

এই কবি গঙ্গারামের বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলা কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ধরিশ্বর গ্রামে। আমার রচিত "ময়মনসিংহবিবরণ" নামক গ্রন্থের (১ম সংস্করণের ৭৩ পৃষ্ঠায়) প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের অধ্যায়ে কবি গঙ্গারাম বা গঙ্গানারায়ণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। আবশ্যক বোধে এখানে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিলাম।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ধরিশ্বর গ্রামে গঙ্গারাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন গঙ্গারামের প্রপিতামহ হরিদাস দেব প্রায় ২২৫ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া ধরিশ্বরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। কবি গঙ্গারামের বংশধরেরা বর্ত্তমানে ধরিশ্বর গ্রামে তাঁহাদের পৈতৃকবাসভূমিতেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গঙ্গারামের যে বংশাবলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্য হইতে দুই শাখা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হরিদাস দেব (১)

আনন্দিরাম দেব (২)	রামমোহন দে (২)
কাণারাম (৩)	দুর্ল্লভনারায়ণ (৩)
মুকুন্দরাম (৪)	(কবি) গঙ্গারাম ওরফে গঙ্গানারায়ণ (৪)
সহদেব (৫)	নন্দকিশোর (৫)
সূর্য্যনারায়ণ (৬)	
ভোলনাথ (৭)	
গোপীনাথ (৮)	
রজনীনাথ (৯)	

বঙ্গীয় "বারভূঞা" দিগের শ্রেষ্ঠ ভূঞা দেওয়ান ইশাখাঁর বংশধরেরা এখন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে বর্ত্তমান আছেন। এক সময় তাঁহারাই এ জেলার অদ্বিতীয় ক্ষমতাপন্ন জমিদার ছিলেন।[১]

১৯০২ সনে আমি যখন ময়মনসিংহের কবিদিগের গ্রন্থাদি ও দলিলপত্র সংগ্রহ করিতে ছিলাম, তখন কবি গঙ্গারামের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীমান রজনীনাথ আমাকে কবির দস্তখতি কতিপয় দলিল প্রদর্শন করেন। ঐ দলিলগুলির একখানার তারিখ "সন ১১৬৩ তারিখ ২৩ আশ্বিন মোঃ ধুলদিয়া" অপর একখানার "সন ১১৬৭ তারিখ ৫ই পৌষ মোঃ মুখযুদাবাদ" ও আর একখানির তারিখ "সন ১১৭৩ তারিখ ১৫ই চৈত্র মোঃ জঙ্গলবাড়ী।"

এই তিন খানা দলিলের আলোচনায় অবগত হওয়া যায় (১) কবি ১১৬৩ বঙ্গাব্দে জঙ্গলাবাড়ীর দেওয়ানদিগের "ঢুলদিয়া" কাছারীতে চাকুরী করিতেন (২) নবাব সরকারে দেওয়ানদিগের পক্ষে নিকাশ প্রদান জন্য ১১৬৭ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং (৩) ১১৭৩ সনে প্রয়োজন অনুসারে দেওয়ান সাহেবদিগের জঙ্গলবাড়ীস্থিত সদর কাছারীতে উপস্থিত ছিলেন।

কবির বর্ণনা ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া ও অন্যান্য নানা কারণে আমি বিশ্বাস করি, কবি গঙ্গারাম বর্গীর হাঙ্গামার সময় দেওয়ান সাহেবদিগের নিকাশ-কর্ম্মচারী রূপে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন ও এই বিপদ্‌কে সম্পূর্ণ নিজ বিপদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা ইহার সম্পূর্ণ সমর্থক। তবে এমন হইতে পারে যে ১১৬৭ সনে দেওয়ান সাহেবদিগের পক্ষে নিকাশ প্রদান জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে অবসর সময়ে কবি ভুক্তভোগীদিগের নিকট তাহাদের বিস্তৃত অবস্থা শ্রবণ করিয়া আলোচ্য 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুমান দুটীর মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত তাহা বলা সুকঠিন। অনুমান ভিন্ন ইহার জন্য কোন প্রমাণ নাই। মুর্শিদাবাদে দস্তখতি কাগজপত্রে যে তারিখ আছে, তাহা বর্গীর হাঙ্গামার ১৭ বৎসর পরে লিখিত। কবির বর্ত্তমান বংশধর রজনীনাথ চৌধুরী (যাঁহার নিকট হইতে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি) বলেন "আলোচ্য হস্তলিখিত গ্রন্থখানা গঙ্গারামের নিজ হস্তের লিখিত।" আমি ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ পাইতেছি না। গঙ্গারামের যে হস্তলিপি তখন আমাকে দেখান হইয়াছিল, তাহা কেবল দলিলের দস্তখত মাত্র; তাহা হইতে গ্রন্থের লেখার কোন সামঞ্জস্য করা যায় না। হয়ত বর্গীর ঘটনার সময় কবি মূলগ্রন্থ লিখিয়া থাকিবেন এবং পরে গ্রন্থকার সময় সময় ঐ গ্রন্থের যে সকল প্রচার করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থখানা তাহারই একখানা। কবির পক্ষে এইরূপে নিজ গ্রন্থেরই পুনঃ পুনঃ অনুলিপি প্রস্তুত করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কবি মুক্তারামের আলোচনায় ("আরতি" ১৩০৮, ২২৬ পৃ:) আমি দেখাইয়াছি, কবি মুক্তারাম নিজকৃত বৃহৎ গ্রন্থ দুর্গাপুরাণের বহুলিপি প্রস্তুত করিয়া গ্রামে গ্রামে গীত হইবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ হস্তলিখিত এইরূপ একখানা গ্রন্থ আমার নিকটও আছে; তাহা কলিকাতা সাহিত্য-প্রদশনীয় সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-রিষদে প্রেরিত হইয়াছিল।

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানসাহেবদিগের অধীন যাঁহারা ডিহির নায়েবী কার্য্য করিতেন, তাঁহারা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। গঙ্গারামও বহুদিন কার্য্য করিয়া শেষে ঢলদিয়া কাছারির নায়েব পদে প্রতিষ্ঠিত হন ও চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের বংশধরগণ সেই সময় হইতে চৌধুরী

১। কবি গঙ্গানারায়ণ সেই দেওয়ানদিগের নিকাশের সেরেস্তায় কর্ম্মচারী ছিলেন।

উপাধিতে পরিচিত। অতঃপর দেওয়ানসাহেবদিগের বিরাগভাজন হইয়া তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, জমিদারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধবয়সে কবি ''শুকসংবাদ'' নামক পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ''লবকুশের চরিত্র'' নামক তাঁহার রচিত অন্য একখানা গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ তাঁহার কোন্ সময়ের রচনা তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক সুহৃদ্‌বর ব্যোমকেশ বাবু কবির পরিচয় না পাইয়া অনুমানের উপর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। পরন্তু অধিক স্বাভাবিক। কারণ

(১) কবি গঙ্গানারায়ণ একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন।

(২) শিক্ষিতদিগের সহবাসেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

(৩) বিশেষ, তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদেই অনেক সময় বাস করিতেন।

এইরূপ স্থলে তাঁহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। পরন্তু বিশুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিশুদ্ধ ভাষী হইলে রাঢ়বাসী হইতে হইবে এরূপ কল্পনা সমীচীন কি না চিন্তার বিষয়। গঙ্গারামের গ্রন্থে বিশুদ্ধ উচ্চারণের দুর্ব্বল চেষ্টা থাকিলেও পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্যভাষার ব্যবহার পরিত্যাগের চেষ্টা আদৌ নাই। দুঃখের বিষয় ব্যোমকেশ বাবু সেটা দোখিয়া এবং বুঝিয়াও, কি কারণে জানি না, তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইয়াছেন।

রাঢ়দেশীয় কবির কোন গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক অথবা পূর্ব্ববঙ্গের কবির গ্রন্থ রাঢ়দেশীয় লোক নকল করিলে তাহাতে নকলকারকের উচ্চারণানুযায়ী বানান অশুদ্ধ বা শুদ্ধ লিখিত হয় এবং তদ্দ্বারা শব্দের বিকৃতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আদত দেশজ শব্দের প্রায়ই পরিবর্ত্তন হয় না। এই গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে।

এই গ্রন্থে কবি রাঢ়ে অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণে গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করিয়াও মাতৃভূমির পরিচিত শব্দগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। যথা—সাধাইল (প্রবেশ করিল) দেওয়া (মেঘ), বানাইল (প্রস্তুত করিল), আগুযাউক (অগ্রসর হউক), কাউয়ার (কাকের), কিরা খাইছি (শপথ করেছি), ডের হাতীর সাইর (বহু হাতীর শ্রেণী) আড়কট (আর্কট নগরের টাকা) প্রভৃতি। উচ্চারণ বিষয়েও কবি যে কেবল অনুনাসিক ক্রিয়াপদের উচ্চারণ ব্যতীত আর কোন রাঢ়ের অনুসরণ করিয়াছেন এরূপ গ্রন্থে দেখা যায় না। এরূপ অনুনাসিক উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কবির গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী প্রদান করিলাম।

নারিকেল খাইয়া রাজা সোঙরে গোসাঞি।
এমন অপূর্ব্ব বস্তু আইল আমার ঠাঞি॥ (পদ্মাপুরাণ—দ্বিজবংশীদাস)

তারার উদ্দেশে আমি নৌকা বাত্তাইনোঁ।
রাক্ষসের দেশে যেয়ে লঙ্কাত উতরিলোঁ॥ (পদ্মপুরাণ—নারায়ণ দেব)

প্রথমে কলির পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেই সব বিবরণ শুনিবার চাই॥ (কালীপুরাণ—মুক্তরাম নাগ)

ভিটাদিয়া গ্রামে ক্ষত্রিয় কায়স্থের বসতি।
মুই অধমের হইএগছে জন্ম তপি॥ (কৃষ্ণদাসের বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী)

তিনি মুর দীক্ষাগুরু হন উপাধ্যায়।
এ শরীর আমি বিকাঞাছি তাঁর পায়॥ (ঐ—গ্রন্থ)

এতদ্ব্যতীত রামেশ্বর নন্দী ও অন্ধকবি ভবানী প্রসাদের গ্রন্থে ঁ চন্দ্রবিন্দুর ও ঞ উচ্চারণের অবধি নাই। বলা বাহুল্য ইহারা সকলেই ময়মনসিংহের কবি তাহা আমি আমার ময়মনসিংহবিবরণের প্রথম সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

দুর্গাপুরাণের লেখক কবি জগন্নাথ দাস, গঙ্গারামের সহিত এক গৃহে বাস করিতেন, তাহা আমরা জগন্নাথের জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছি। (আরতি)। জগন্নাথও একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। জগন্নাথ কবি মুক্তরামের একজন শিষ্য ছিলেন। কবি দ্বিজবংশী দাসও গঙ্গারামের সমসাময়িক। এই চারি কবির বাসস্থল ৮।১০ মাইলের ভিতর।

এইবার ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একটু একটু আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কবির লিখিত 'দক্ষিণ সহর লইয়া' সুহৃদ্বর ব্যোমকেশ বাবু একটু রসিকতা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার রসিকতার রস পাইয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছি। কবির দক্ষিণ সহর পরিচয় করিতে যাইয়া কোন সময় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদগণ চিন্তিত হইবেন তাহা বোধ হয় কবি তখন মনেও স্থান দিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় কবির সঙ্কীর্ণ ধারণা তখন মুর্শিদাবাদ ও দিল্লী অতিক্রম করিয়া আর একটী তৃতীয় সহরের আবিষ্কার করিয়াছিল, ইহা তখনকার কবির পক্ষে শ্লাগার বিষয় মনে করা উচিত। ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, তৎকালে মোগল ও মহারাষ্ট্রই ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। সুতরাং কবির পক্ষে ঐ দুই শক্তির দুইটী কেন্দ্রস্থলকেই কেবলমাত্র সহর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন তাহা সমীচীন কি না বিচার্য্য বিষয়। ব্যোমকেশ বাবু লিখিয়াছেন "কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং সমসাময়িক কবি, তাহার সাক্ষ্য এ বিষয় অধিক গ্রহণীয়। সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস লেখকের পক্ষে এ তুমুল ব্যাপার অকিঞ্চিৎকর বোধে লিপিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে অগ্রাহ্য হওয়া কিছু অন্যায় নহে।" মহারাষ্ট্রীয় আচার ব্যবহারাভিজ্ঞ পৌরাণিক গ্রাম্য কবির যে কোন কল্পনা সমসাময়িকতার অজুহাতে গ্রহণ করা আমরা নিরাপদ মনে করি না। গ্রন্থের "গুরুগম্ভীর আরম্ভ ভাগের" ন্যায় ইহাও কবির আর একটী পুরাণোচিত কল্পনা কি না কে বলিতে পারে?

ব্যোমকেশবাবু প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন এই পুঁথিখানিতে দেইখ্যা, দেইখা, দেখিয়া, দেখিঞা এই চতুর্ব্বিধরূপ উচ্চারণ আছে।" এই সম্বন্ধে আমার মত কবি রাজধানীতে অবস্থিতি হেতু কোন কোন স্থলে সমাধানে অবিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুসরণ করিয়া পুনরায় অসাবাধনতা প্রযুক্ত স্বাভাবিক পথে আসিয়া জন্মভূমির প্রচলিত উচ্চারণে শব্দ বিন্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন।

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থের প্রাপ্তির সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবনী সংগ্রহ করিবার জন্য আমি ১৩০৭ সালে গ্রামে গ্রামে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান করি। ঐ সময় কবি জগন্নাথের গ্রন্থাদি ও মানসি সঙ্গীত সংগ্রহের জন্য আমি কবির জনৈক আত্মীয়কে চিঠি লিখি। তিনি তদুত্তরে আমাকে জানান "কবি জগন্নাথের জীবনের অবসান কাল ধরীশ্বর গ্রামে যাপন করেন। সুতরাং তাঁহার হস্তাক্ষর ও পুঁথিপত্র তথায় পাইবেন।" আমি এই চিঠি অনুসারে ধরীশ্বরে কবি জগন্নাথের গ্রন্থ অনুসন্ধান করি ও শ্রীমান

রজনীনাথ চৌধুরীর নিকট হইতে কবি জগন্নাথ কৃত "নিগম" "হাড়মালা" নামক দুইখানা সাধন গ্রন্থ ও কবি গঙ্গারাম (গঙ্গানারায়ণ) কৃত "শুকসংবাদ" "লবকুশচরিত্র" "ভাস্কর পরাভব" বা মহারাষ্ট্র পুরাণ এই তিনখানা গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। সেই সময় আমি ইহাও অবগত হই যে, গঙ্গারাম নবাব সাহেবদিগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া যখন পারমার্থিক চিন্তায় মন দিয়া শুকসংবাদ লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন কবি জগন্নাথও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাধনসঙ্গীত, নিগম, হাড়মালা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথ কবির জন্মস্থান দাসপাড়া, ধরীশ্বরের অতি সন্নিকটে। জগন্নাথ একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনসঙ্গীত দুর্গাপুরাণ এখনও গ্রামে গ্রামে শারদীয় পূজায় গীত হইয়া থাকে। মল্লিখিত ময়মনসিংহের বিবরণের ১ম সংস্করণে আমি ময়মনসিংহবাসী কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের একখানা পৃথক্ জীবনী-গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা হওয়ায় বিবরণের দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ প্রাচীন সাহিত্যের অধ্যায়টী পরিত্যাগ করিয়াছি। গঙ্গারামের বিস্তৃত জীবনী "পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবি" গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল

শ্রীগুরুদাস সরকার

একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কোনও পুস্তকের ছিন্ন পৃষ্ঠা কুড়াইয়া পাইলে, উহাতে তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণের অংশবিশেষ লিখিত থাকা সম্ভাবনায় সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া থাকেন। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে এখন আর পুস্তকাদির ছিন্ন পত্রের বড় অভাব নাই; কিন্তু প্রস্তরখণ্ডাদিতে উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা আর সহজ-লভ্য নহে; তাই এখনও দেখিতে পাই, কোথাও আরবী বা পারসী-লিখিত প্রস্তরখণ্ড পাইলে, তাহাতে ভগবানের পবিত্র নাম লিখিত আছে জানিয়া, অজ্ঞ গ্রামবাসী মুসলমানেরাও সেগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে;—স্বধর্ম্মাবলম্বী বা বিধর্ম্মী কেহই তাহাদের সরল প্রাণে ব্যথা দিয়া, এরূপ কোনও খোদিত লিপি কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার ওজুহাতে স্থানান্তরিত করিতে সাহসী হয় না। তাই অদ্য আপনাদের নিকট একখানি অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব তোগ্‌রা-অক্ষর-খোদিত সুন্দর আরবী প্রস্তর-লিপির পরিবর্ত্তে এই কারুকার্য্যবিশিষ্ট কষ্টি-প্রস্তরখণ্ডমাত্র আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার চিত্র পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্থানে প্রস্তরখানি পাওয়া যায়, তাহা মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত সুতী গ্রামের মুসলমান-পল্লীতে অবস্থিত। প্রাপ্তিস্থান সুতী থানা হইতে বড় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। প্রস্তরখণ্ডটি দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা কোনও মস্‌জিদের খিলানে সংলগ্ন ছিল। মসজিদটি আর বর্ত্তমান নাই। সে সামান্য ইষ্টক-স্তূপের নিকট হইতে উহা সংগৃহীত হয়, তাহা বোধ হয়, সেই পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ইষ্টক-স্তূপের কয়েক রশি দূরেই পূর্ব্বোক্ত যে তোগরা লিপিখানি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, এখনও বৃক্ষমূলেই সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি তদানীন্তন সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (এক্ষণে ইন্সপেক্টার)* প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে উহার একখানি ছাপ তুলিয়া লইতে সমর্থ হই। পরে জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটাবাসী মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব এবং জঙ্গীপুর স্কুলের সুযোগ্য মৌলবী ও হেয়ার স্কুলের প্রধান মৌলবী শ্রীযুক্ত খয়ের-উল-আনাম মহাশয়গণের সাহায্যে এই লিপির পাঠোদ্ধার ঘটে। নব পর্য্যায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় মল্লিখিত "Some Traditions about Sultan Alauddin Hossain Shah and Notes on Arabic Inscriptions from Murshidabad" নামক প্রবন্ধের চতুর্থ চিত্রে (Plate IV) এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্টে এই শিলালিপির অবিকল প্রতিলিপি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্ব্বিংশ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত এবং বাংলা ১৩২৫ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত। * এক্ষণে অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আগে

প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। (লিপির পাঠ ''ক'' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

''পবিত্র পুরুষ (মোহম্মদ)— ভগবান্ যেন তাঁহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন— বলিয়াছেন যে, ভগবানের জন্য যে ব্যক্তি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন— ভগবান্ তাঁহার জন্য স্বর্গে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। চাঁদমালিকের পুত্র মহানুভব মোকর্‌রব্ খাঁ مقرب خان—উভয় জগতে খ্যাতাপন্ন— বিজয়-শ্রীর জন্মদাতা—তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব ভগবান্ সুদীর্ঘ কাল রক্ষা করুন—সেখ সৈয়দ আস্‌রাফ-উল-হোসেনীর পুত্র আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদিন সুল্‌তান্ আবুল মুজফ্‌ফর হুসেন সাহের রাজত্বকালে এই ''জামি'' মসজিদ হিজরী ৯০৯ সনে (খৃ অঃ ১৫০৩-৪ অব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন।'' ইহা ব্যতীত প্রস্তর-মধ্যস্থ উদগত অংশে আরও দুটি ছত্র লিখিত আছে;—একটির অর্থ—''এই মস্‌জিদ্ যেন মৃত্যুর পর পুনুরুত্থান-কাল (resurrection) পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে'' এবং ''খোরসেদের মজলিসের (বা 'মজ্‌লিস্ খোরসেদের') যেন শুভ পরিণাম ঘটে।'' দক্ষিণভাগস্থ প্রথমোক্ত পংক্তির অর্থ লইয়া কোনও গোল নাই—কিন্তু বামপার্শ্বস্থ শেযোক্ত পংক্তির সূর্য্যবাচক ''খোর্‌সেদ'' শব্দ ও ''মজ্‌লিস'' শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। Imperial Library গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট Bohair Library নামক আরবী ও পারসী পুস্তকাগারের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব আব্দুল মুক্‌তাদির মহাশয় ''মজ্‌লিসে মাহ্ ও খোরসেদ'' مجلس' مه و خورشید এইরূপ পাঠান্তর প্রস্তাব করেন। 'মজ্‌লিসে' শব্দের শেষাংশে ''সিন'' অক্ষরের উপরিভাগে م 'মিমে'র ন্যায় একটি অক্ষর দেখা যায়। কিন্তু মাহ্ শব্দের বক্রী অংশ ও 'و' উয়াও অক্ষরের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আবুল ফজল সাহেব ছাপ দেখিয়া লিপিটি যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও مجلس خورشید را عاقبت باخیر باد (''মজ্‌লিসে খোরশেদরা য়াকেবৎ বাখায়ের বাদ'') এইরূপই লেখা রহিয়াছে। প্রস্তাবিদ পাঠের চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলনজ্ঞাপক ছত্রটির প্রকৃত অর্থও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহাতে কোনও জ্যোতিষিক ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছে, কিম্বা ''খোরশেদ'' শব্দে ''সুলতান্'' এবং মাহ্ শব্দে তাঁহার প্রাধানা রাজ্ঞী, কি প্রধান অমাত্য, কি মস্‌জিদ্‌নির্ম্মাতা মোকর্‌রব খাঁই উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা স্থির করা সহজ নহে। আরবী লিপিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব মৌলবী আব্দুল ওয়ালী মহাশয় ''মজ্‌লিস্'' শব্দটি খেতাবের ন্যায় সম্মানজ্ঞাপক বিশেষণ এবং ''খোরশেদ'' শব্দটি লিপি-খোদকের নাম বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে লিপি-খোদক ভাস্কর এই ক্ষুদ্র পংক্তিতে নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়াছে। মৌলবী আব্দুল ওয়ালী সাহেব ''মাহ ও খোরশেদ'' এই পাঠান্তরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে م এর ন্যায় অক্ষরটি খোদকের অনবধানতাঘটিত বাটালির চিহ্নমাত্র।

কালাল্‌নবি মালল্লাহ্ قال النبي صلى الله প্রভৃতি শব্দগুলি মস্‌জিদ্-সংলগ্ন লিপিসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ-সম্পর্কীয় লিপিসূচনার ইহা একরূপ সাধারণ পদ্ধতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিঃ ৮৮৫ অব্দের গৌড়ের ইউসুফ সাহার লিপি (J, A. S. B. 1873, Vol XLII P. 277*), মামুদ সাহের লিপি (Ivid P. 289) এবং হুসেন সাহার ৯০৭ হিঃ অব্দের মাচাইন্ মস্‌জিদের লিপি, (Ibid P. 298) ৯১১ হিঃ মালদহ্ মস্‌জিদের লিপি (Ibid P. 294), ৯০০ হিঃ অব্দের খেরুল লিপি (J. A. S. B. (N.S.) Vol XIII p.148) এবং হুসেন সাহের পুত্র নসরৎ সাহার ৯৩০ সনের মঙ্গলকোটস্থ লিপি প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিজরি ৮৮৪ অব্দের হজরৎ পাণ্ডুয়াস্থ ইউসুফ সাহের খোদিত লিপি ও মুর্শিদাবাদ বাবরগ্রামের

---

* J. A. S. B. – Journal of the Asiatic society of Bengal.

লিপির প্রথমাংশও এইরূপ। তবে প্রভেদের মধ্যে দেখা যায় যে, সুতী লিপি بيتان "বইয়েতান্" শব্দের পরিবর্ত্তে দুর্গবাচক قصرا "কস্‌রা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হুসেন সাহার রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ অঃ) পাঠান-রাজত্বের পূর্ত্তকার্য্যের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। তৎকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কূপ, জলাশয়, সেতু, বিদ্যালয়, সমাধিমন্দির, মস্‌জিদ্ ও দরওয়াজা باب প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা যাদুঘরে, কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত হুসেন সাহার আমলের যে তিনখানি প্রস্তর-লিপি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে আরবী ভাষায় ৯০৯ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫০৩) একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ এবং ৯১৬ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫১০) পুষ্করিণী খননের কথা লিখিত আছে। স্বর্গীয় ব্লক্‌ম্যান্ (Blochmann) মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন,— "বাঙ্গালার আপর কোনও নৃপতির রাজত্বকালের এত অধিক প্রত্নলিপি পাওয়া যায় না। প্রাক্ মোগলযুগের মুসলমান নরপতিগণের স্মৃতি জনপ্রবাদ ও স্থানাদির নামে সংরক্ষিত হওয়া বড়ই বিরল, কিন্তু ধার্ম্মিক হুসেন সাহা সুলতানের কীর্ত্তি ব্রহ্মপুত্র হইতে উড়িষ্যা-সীমান্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি ঘোষিত হইয়া থাকে।"

শীলেট, বীরভূম, মাচাইন (ঢাকা), ধামরাই, সোণার গাঁও, বেহার, পাণ্ডুয়া, মুঙ্গের, গৌড়, মালদহ (ঁরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ:১২৫) মান্দারণ (J. A. S. B. New Series Vol XIII p. 134), খেড়ুর, বাবরগ্রাম, বালিঘাটা[১] সুতী (Ibid p. 148-149) ও নদীয়া শ্রীনগর (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ২৩শ ভাগ, ২৫৮ পৃ:, পাদটীকা) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবপ্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ) হুসেন সাহার রাজত্ব-কালের যে সকল জন-হিতকর অনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্থানে অন্যূন ২৫।২৬ টি মস্‌জিদ নির্ম্মাণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। যে যুগে স্থাপত্য-বিষয়ক এরূপ প্রচেষ্টা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে যুগের স্থপতিগণ যে কারুকার্য্য-পরাঙ্মুখ ছিলেন, এরূপ ধারণার কোনও কারণ দেখি না। খিলান-সন্নদ্ধ এই অনতিবৃহৎ জালিকাটা প্রস্তর-খণ্ডটিই তাৎকালিক শিল্প-রুচির পরিচয় দিতেছে[২]। কয়েক বৎসর গত হইল, জঙ্গীপুরের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, সোদরোপন বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় আমাকে দহরপাহাড় গ্রামবাসী অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামক কোনও প্রবীণ ভদ্র মহোদয়ের রচিত একখানি হস্তলিখিত পুথি আনিয়া দেন। ইহাতে অনেক স্থানীয় প্রবাদ কবিতাকারে গ্রথিত ছিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরলোকে। তাঁহার সে পুথিখানি এখন কোথায় গিয়াছে, তাঁহার পুত্র তাহা বলিতে পারেন না। আমি গ্রন্থকর্ত্তার টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতিতে স্থানীয় জনপ্রবাদ অবিকৃত আকারে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া, উহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া, সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে সেগুলি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থাদির পোষকতা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সুতীর পুরাবৃত্ত অনুশীলন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে জন্য পরলোকগত

১। এই ভগ্ন লিপিখানি এক্ষণে বন্ধুবর সৈয়দ আবুল ফজল মহাশয়ের নিকট আছে। ইহার তারিখ ৯২১ হিঃ রবিঅল আউআল।

২। প্রবন্ধ-পাঠের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এরূপ জালি-কাজ মোগল-যুগেই প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, পাঠান-যুগের মস্‌জিদাদিতে দেখা যায় না। মোগল-যুগে— আরংজীবের রাজত্বকালে সুতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া স্কন্ধাবার সংস্থাপিত ছিল। সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত কোনও মস্‌জিদে হয়ত এই জালি-কাটা কষ্টি-প্রস্তরখানি সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। কালের কুটিল গতিতে নূতন-পুরাতন সকল মস্‌জিদই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ ক্রমশঃ স্থানান্তরে নীত হওয়ায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত এরূপ মাল-মস্লা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন।

পুথি-রচয়িতা ও শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় উভয়েই আমার ধন্যবাদার্হ।

পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির এক অংশে দেখিয়াছিলাম যে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীর নৃপতিগণ সুতীর নিকট ভাগীরথী অতিক্রম করেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোথা হইতে এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, জানি না। এরূপ প্রবাদ আমার কর্ণগোচর না হইলেও, উহা একবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত মনে করি না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র Antiquities of Orissa গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজগণের প্রভাব এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ বড়ই প্রবল হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতামহ প্রথম নরসিংহদেব (খৃ: অ: ১২৩৮-১২৬৪) শুভ্র গঙ্গা-প্রবাহ, রোদন-পরায়ণা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীয় যবনীগণের নয়নাঞ্জন-বিধৌতকারী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত করাইয়া, বিস্ময়াপন্ন নিস্তরঙ্গা গঙ্গাকে যমুনায় পরিণত করিয়াছিলেন (J.A.S.B.1896, Copperplate of Nrisingha Deva, II)।[১]

গঙ্গারাজগণের তাম্রশাসন হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, তৎপূর্ব্বে অনন্তবর্ম্মা চোড় গঙ্গাদেব (খৃঃ অঃ ১০৭৬-৭৭—১১৪৭-৪৮, শকাব্দা ৯৯৮-১০৬৯) গঙ্গাতটস্থ ভূভাগ হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ("গৃহ্যাতিস্ম করং ভূমে গঙ্গাগৌতমগংগয়োঃ" J.A.S.B. 1895, LXIV Pt. J, P. 138)। চোড় গঙ্গা মন্দারের রাজাকে গঙ্গাতীরে পরাভূত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এ কথারও উল্লেখ আছে (J.A.S.B.– 1903, P. 110)। অনঙ্গভীমের কন্যা চন্দ্রিকা দেবীকর্ত্তৃক ভূবনেশ্বরের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক শিলালিপি হইতেও জানা যায় যে, চোড় গঙ্গ গোদাবরী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন ("আগোদাবাদমরসরিতং যাবদেকো ভূবোভূৎ", Epigraphia Indica, Vol XIII Pt. IV p 151)। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাম্রলিপি প্রভৃতির চর্চ্চা করিতেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য ইতিকথা-সংগ্রহে এই অপ্রমাণিত, সম্ভবতঃ জনপ্রবাদমূলক উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। সুতীর strategic অবস্থান হিসাবে এরূপ আক্রমণ সম্ভবপর হইলেও, কোনও উড়িয়া রাজা বঙ্গাভিযানকালে সুতী-তট পর্য্যন্ত বাস্তবিকই অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না, তাহার যথাযথ ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা দুরূহ।

সুতী ও তৎসন্নিকটস্থ দহরপাহাড়, মঙ্গলপুর, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি গ্রাম, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল হইয়া যে সুদীর্ঘ রাজপথ দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার ঠিক পার্শ্বভাগেই অবস্থিত।[২] রাজমহল, সুতী বা আরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ২৮ মাইল হইবে।[১] শুনিতে পাই, পাঠান নরপতি প্রথম সেকেন্দর

১। "রাঢ়াবরেন্দ্রযবনীনয়নাংজনাশ্রুপূরেণ দূরধিনিবেশিতকালিমশ্রী:। তদ্বিপ্রলম্ভকরণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা গঙ্গাপি নুমযমুনা যমুনাধুনাভূৎ।"

২। বাদশাহ সাহ আলমের আদেশক্রমে মেজর রেনেল এ রাস্তাটি মাপ করিয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫১৯ ক্রোশ (J.A.S.B. Memoir Vel III, no 3 Itinerary p. 196 & foot note) এই বিখ্যাত রাজকর্ম্ম গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছে; পাটনা হইতে শোণ নদীর ধারে-ধারে দণ্ডনগর (Dandnagar) পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে নদী পার হইয়া সোজাসুজি (cross country) মোগলসরাই পর্য্যন্ত এবং তথায় গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বারাণসী এবং বারাণসী হইতে গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত; এলাহাবাদে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া 'দোরাব' ধরিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত এবং আগ্রায় যমুনা পার হইয়া অবশেষে দিল্লী আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

সাহ নিজ রাজত্বকালে (১৩৫৮ খৃ: অ: হইতে ১৩৯০ খৃ: অ: মধ্যে) এই সুবিস্তৃত বর্ত্মটি ছায়াতরু-সন্নিবিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কিংবদন্তী ব্যতীত ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে সেকেন্দর বিশাল আদিনা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে আবশ্য এরূপ একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

কথিত আছে যে, হুসেন সাহার মাতৃদেবী এই রাজবর্ত্ম দিয়া শিবিকারোহণে গৌড়-গমন-কালে জনৈক তীবর রাজার অনুচরবর্গ তাঁহাকে "গৌড়-বাদশার মা। একবার নাচন দেখিয়া যা।" বলিয়া অপমানিত করে। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুসেন সাহার জন্ম সম্বন্ধে তিনটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০২)। ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ প্রচলিত একটি মতানুসারে গোড়েশ্বর হুসেন হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান-জননীর পূর্ব্ব-জীবন উল্লেখেই তাঁহার নৃত্য-কলা-পারদর্শিতা সম্বন্ধে এই বিদ্রূপ-বাক্যগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। প্রবাদ-মতে হুসেন সাহা এ অপমান সহজে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার সৈন্যগণ নাকি তীবর-রাজের দুর্গ ও রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া তবে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও হুসেন সাহা কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও বিদ্রোহী তিওর বা তীবরজাতীয় জমিদার শাসন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪)।[২] সুতীর অনতিদূরস্থ— পুরাতন মঙ্গলপুর-সন্নিহিত জীয়ৎকুঁড়েই নাকি সেই তীবর বা রাজবংশী রাজার দুর্গ অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়-রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ১৮০ পৃ: ও ১৯১৭ সালের J. A. S. B. পত্রিকায় (Vol XIII, no 3, P. 147) জীয়ৎকুড়ি বা জীবৎকুণ্ড-সংক্রান্ত জনপ্রবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় জীবৎকুণ্ড পুষ্করিণীর গর্ভস্থিত একটি অর্দ্ধ প্রোথিত দেবীমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিমতিতার সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমি যখন জীয়ৎকুড়ি দেখিতে যাই, তখন কেবল প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি দরজার সর্‌দাল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহার গাত্রে বিভিন্ন ফলকে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। পল্লী সীমন্তিনীদিগের ভক্তির আতিশয্যে প্রস্তর-নিহিত চিত্রগুলি সিন্দুর-প্রলেপে অস্পষ্ট হইয়া উঠায়, আমরা কোন্‌টি কি মূর্ত্তি, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তবে আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এটি নবগ্রহ-প্রস্তর (architrave) হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতী-সান্নিধ্যে হিন্দু-প্রভাবের অপর একটি চিহ্নের কথাও মনে পড়িতেছে। সুতীর পার্শ্ববর্ত্তী বন্দর ছাপঘাটীর মধুসূদন চৌধুরী নামক কোনও মহাজনের পাটের আড়তের প্রাঙ্গণে, খোদিত 'গণ' বা 'যক্ষ' মূর্ত্তিবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ইহা কোনও প্রস্তরময় চৌকাঠের পার্শ্বদেশ (door jamb), গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী-খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। ১৩১৯ সালের

১। রেণেল সাহেব যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, (Ibid. p. 196) তাহাতে অরঙ্গাবাদ হইতে রাজমহলের দূরত্ব ১৬ ক্রোশ অর্থাৎ ৩২ মাইল আন্দাজ হয়।

ক। মুর্শিদাবাদ হইতে দেওয়ানসরাই	৭ ক্রোশ
খ। দেওয়ানসরাই হইতে অরঙ্গাবাদ	১০ ক্রোশ
গ। অরঙ্গাবাদ হইতে ফরক্কাবাদ (ফরক্কা)	৮ ক্রোশ
ঘ। ফরক্কা হইতে রাজমহল	৮ ক্রোশ

২। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল ওয়ালী মহোদয় J. A. S. B. পত্রিকায় জনৈক তীবর রাজা সম্বন্ধীয় অপর একটি জন-প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সহিত দেবগ্রামের দেবল রাজা সংক্রান্ত প্রবাদেরই সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

'সাহিত্য' পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ: ৫৬৩) বাণনগর হইতে সংগৃহীত পাথরের চৌকাঠের চিত্রের সহিত এই প্রস্তর-খণ্ডের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতী অঞ্চল মুসলমান-প্রধান বলিয়া এই সকল প্রাচীন হিন্দু স্মৃতি-চিহ্নের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।[১] শুনিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃ: অব্দে), রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, চৈতন্যদেব রামকেলি নামক আধুনিক বৈষ্ণব তীর্থস্থানে গমনকালে সুতীতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ে রামকেলি গমনপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"হেন মতে প্রভু সর্ব্ব-জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান পানে গঙ্গার পুরিল মনোরথ॥"

—(শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ)

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ এবং প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষামত কয়েক জন গোপ-বালক তাঁহাকে উল্টাপথ দেখাইয়া দিলে, গঙ্গাতীরস্থ সেই পথ অবলম্বন করিয়া নদীয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গাঁঙ্গুলী মহাশয়ের পুথিতে শ্রী চৈতন্যের সুতীতীর্থে স্নানাদিবিষয়ক কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি সুবিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থে ও গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতিতে এ কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। জঙ্গীপুরবাসী বৈষ্ণবমতাবলম্বী কোনও ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম যে, বৈষ্ণবদিগের "ছয় ঘাট তীর্থ" সুতীর বন্দর ছাপঘাটিরই নামান্তর মাত্র। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সাহায্যে আমি যে কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহার কোথাও "ছয় ঘাট" তীর্থের নাম-গন্ধ নাই। ছাপঘাটির নামকরণ প্রস্বন্ধে অন্য যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাই অধিক সমীচীন-বোধে এ স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। মুসলমান-রাজত্বকালে "ছাপঘাটি" নাকি শুল্ক আদায়ের স্থান ছিল এবং সমরনীতি হিসাবে বন্দরটির সুবিধাজনক অবস্থান হেতু ইহা অনেক সময় "নওয়ারার আড্ডা"রূপে ব্যবহৃত হইত। শুল্ক আদায়ের ছাপযুক্ত রসিদ বা ছাড়পত্র দেওয়া হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ ছাপঘাটি নাম সাধারণ্যে প্রচার হইয়া থাকিবে। সুতীর নিকটেই মোঙ্গলপুর বা পুরাতন মঙ্গলপুর। প্রবাদ এই যে, আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মোগল সেনাপতি মুনিম (মুনাইম?) খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া পুরাতন মোঙ্গলপুরে বাজার সংস্থাপিত করেন। গাঁঙ্গুলী মহাশয়কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রবাদগুলির মধ্যে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। মোগল বা মোঙ্গলগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গ্রামটির নাম নাকি 'মোঙ্গলপুর' হইয়াছিল। মঙ্গলপুরের নামোৎপত্তি কোনও eponymous রাজা মঙ্গল সেনের নামানুসারে হইয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ষ্টুয়ার্ট (Stewart) রাজমহলের যুদ্ধের কথা কিছুই লেখেন নাই। তাঁহার ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুনিম খাঁ পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া ১৫৭৫ খৃ: অব্দে (হিঃ ৯৮০) টাঁড়া বা তাঁড়া[১] হইতে

১। খৃ: ১৮৫৮ সালের আদমসুমারীতে হিন্দু জনসংখ্যা ৬১৬৩ এবং মুসলমান অধিবাসিগণের মোট সংখ্যা ২৮,৪৯৯ জন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। (Major Tull Walsh প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইংরাজী ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

গৌড় নগরে গমন করেন এবং বর্ষাকালের নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও গৌড় রাজধানী পুনঃ সংস্থাপনোদ্দেশ্যে রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্য-সামন্তদিগকে তাঁড়া হইতে গৌড়ে যাইতে আদেশ করেন (Stewart's Bengal, Sec. 5 p. 186-187, Ed. Bangabasi)। ভিন্সেন্ট স্মিথ মহোদয় নব-প্রকাশিত "আকবর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুনিম খাঁ তাঁড়ায় ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মোগল-সেনাপতির আদেশমত "বাজার" প্রতিষ্ঠাবিষয়ক এই প্রবাদটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, বোধ হয়, গৌড় গমনের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া, সুতী হইয়া টঁপড়া যাইবার সময় মোঙ্গলপুর সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরবর্ত্তী কালে—প্রবাদমতে বাদসাহ আরংজীবের রাজত্ব-সময়ে পুরাতন মোঙ্গলপুর পরিত্যক্ত হইয়া নূতন মোঙ্গলপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্ব-বিষয়ক কাগজ-পত্রাদি হইতে অবগত হওয়া যায়, মঙ্গলপুর সরকার উদুম্বর চাকলা একব্বর নগরের অন্তর্গত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রণীত আরংজীবের রাজত্ব-কালের ইংরাজী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৬৫৯ খৃ: অব্দে ৮ই জুন তারিখে মোগল-সেনাপতি মিরজুমলা যখন সুতী স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজকুমার মহম্মদ তখন দোগাছি শিবির হইতে পলায়ন করিয়া, পিতৃব্য সুজার কন্যা, নিজ বাগ্‌দত্তা পত্নী গুল্‌রুখ বেগম (Princess Roaycheek) এর পাণিগ্রহণ করেন (Prof. J.N. Sarkar's Aurangzebe, Vol II p. 261)। ইহার পর সুজার লঘু সৈন্যদল ও নওয়ারার আক্রমণ ফলে সুতী হইতে সম্রাটের সৈন্যদিগকে অপসৃত করিতে হয়। মিরজুম্‌লা সুতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে তাঁড়া অভিমুখে গমন করিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। (op. cit. vol II p. 272)। পরে জঙ্গীপুরস্থ বালিঘাটার নিকটও যে সম্রাট্‌শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ আছে (op. cit. vol II p. 265)। ইহার পর মিরজুম্‌লা পুনরায় সুতী আগমন করেন এবং সুতী-সন্নিকটস্থ চিলামারির নিকট সুজার সৈন্যদলের সহিত (২৮শে ডিসেম্বর তারিখে) তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজমহল হইতে মোগল-বাহিনী যে সুতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রায় বৎসরেকব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে বা তৎপরবর্ত্তী কালে সুতী-পার্শ্বস্থ অরঙ্গাবাদ গ্রাম স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

অরঙ্গাবাদ পূর্ব্বদেশান্তর ৮৮°২৩ উত্তর অক্ষাংশ ২৪°২৭ মিনিটে অবস্থিত। এরূপ একটি

১। তাঁড়া নগরী বহু দিন হইল লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা লইয়াই এখন মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁড়া এখন নদীগর্ভে। মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, ১৭৮৬ খৃ: অব্দে বার্লিন নগরে প্রকাশিত Description de L'Inde নামক গ্রন্থের memoire sutle carte de L'Inde আখ্যাবিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ডের ৫৮ পৃ: হইতে তাঁড়ার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল। তাঁড়া নগর (Chawaspur Tanda) ১৫৪০ খৃ:অব্দের সন্নিকটে সেরসাহের রাজত্বকালে অল্প দিনের জন্য বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল (a e'te'la capitale du Bengala pendant un court espace de temp sous le regne de Scher Schah vers I'an 1540). ইহা যে জেলা বা বিভাগের অন্তর্গত ছিল, সেই বিভাগের নামানুসারেই বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। খৃ: ১৫৮০ অব্দে আকবরের রাজত্বকালে তাঁড়া বাঙ্গালার রাজধানীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। গৌড় এখন যে স্থানে বিদ্যমান, তাহার সন্নিকটেই রাজমহল যাইবার পথের উপর তাঁড়া নগর অবস্থিত ছিল। Bernoulli লিখিয়াছেন, "দুর্গ-প্রাকার ব্যতীত তাঁড়ার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। (Il ne reste que tres peu de cette place, excepte la rempart) পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা ১৭৮৬ খৃ:অব্দের পূর্ব্বের কথা। কোন্ সময়ে তাঁড়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ১৬৫৯ খৃ: অব্দে আরংজীব যখন বাঙ্গালা দেশ নিজ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন, তখনও তাঁড়া বাঙ্গালার রাজধানী।

নূতন গ্রাম সংস্থাপনের কথা রাজ ঐতিহাসিকগণ যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহা অবশ্য ভরসা করা যায় না। এই সময়ে প্রেমসিংহ হাজারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সেনানায়কের এই অঞ্চলে বস-বাস করার কথা গাঙ্গুলী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ-সংবলিত হস্তলিখিত কবিতাপুস্তকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। ইতিহাসে প্রেমসিংহের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং এ সম্বন্ধে অপর কোন কিংবদন্তীও অবগত হইতে পারি নাই। প্রেমসিংহের বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের সৌজন্যে নিম্নে ইঁহাদের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হইল;—

প্রেমসিংহ হাজারি
|
শ্রীরাম সিংহ
|
মনসারাম সিংহ
|
হরভঞ্জন সিংহ
|
জগমোহন সিংহ
|
বেণীমাধব সিংহ (ইনি জীবিত রহিয়াছেন)

প্রেমসিংহ হইতে বেণীমাধব পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের ব্যবধান মাত্র। এক এক পুরুষ গড়ে ৪০।৫০ বৎসর করিয়া ধরিলে ছয় পুরুযে আড়াই তিন শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। মোটামুটি ২৫০ বৎসর ধরিয়া লইয়া বর্ত্তমান সন ১৯১৮ খৃ:অ: হইতে বাদ দিলে ১৬৬০ খৃ:অ: পর্য্যন্ত পৌঁছে। আরংজীবের রাজত্ব-কাল (১৬৫৮-১৭০৭); সুতরাং বাদসাহ আলমগীরের রাজত্ব-কালে প্রেমসিংহ হাজারীর সুতী আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ওয়ালস্ সাহেব ঔরঙ্গাবাদের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ("Aurangabad ... was at one time a town of some importance")। নূতন মঙ্গলপুর সংস্থাপন-কালে তথায় একটি সুন্দর স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে গ্রামপার্শ্বস্থ পরিখাও সংস্কৃত হয়। একটি বৃহৎ "বাউলি" বা ইঁদারা এবং একটি সরাইও এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। "বাউলি" এখনও রহিয়াছে, কিন্তু সরাইয়ের আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থে এই সরাইয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং গ্রাম্-বৃদ্ধগণ এখনও স্থানটিকে পুরাতন সরাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। James Rennel-এর সমসাময়িক ভৌগোলিক ও ইতিহাসবেত্তা মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, পূর্ব্বোল্লিখিত "Description historique et Geographique del Inde" গ্রন্থে দেখিতে পাই[১] (Tome Ip. 450) যে, অরঙ্গাবাদের সরাই মোহানা সুতী হইতে মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।[১]

১। M. Bernoulliর পুস্তকখানি Father Tieffen-thaler ও Major Rennel-এর গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত। জৈন দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ. বি এল্ মহাশয়ের সৌজন্যে আমার Bernoulliর মূল্যবান গ্রন্থখানি দেখিবার সুযোগ ঘটে।

(mohana Soti est une ville situee sur la rive citerieure du petit Gangu .. a 1m 1/2 de Pholelleric d'aurangabad) সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও hotellerie বা সরাইয়ের অন্তত কিয়দংশ যে বিদ্যমান ছিল, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। পুরাতন সরাইয়ের নিকটেই ইমামবাজার নামক স্থান। ইহা এখন গ্রাম-সীমানারই অন্তর্গত। শুনিতে পাই, এই স্থানে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণিশ্রেণী ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মাধিকরণ অবস্থিত ছিল। কাজিপাড়া স্থানে নাকি মুসলমান বিচারকগণ বাস করিতেন এবং জল্লাদপুর শুনিতে পাই, জল্লাদদিগের বাসস্থানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি জঙ্গীপুর অবস্থানকালে সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের নিকট কয়েকখানি মিনা-করা (enamelled) ইষ্টক প্রাপ্ত হই; তাহার একখানি সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এগুলি সেই স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত। স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকট এই স্নানাগারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।[২] বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন স্নানাগার খনন-কালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি পত্রে-লিখিয়াছিলেন, — "Babu R-S-of Aurangabad utilised a few (of the enamelled bricks) in repairing an old brick wall. They were excavated out of the walls of the Bath which stood near Aurangabad M.E. School : remains can still be seen." এরূপ একটি সুন্দর প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রামবাসিগণের অযত্নে নষ্ট হইয়া যাওয়া বড়ই দুঃখের কারণ, সন্দেহ নাই। একবার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে আরও কয়েক টুকরো সুন্দর মিনা-করা ইষ্টক প্রাপ্ত হই। ইহার মধ্যে একটির পার্শ্বদেশে নাগরী "আ" অক্ষর লিখিত ছিল। ইহা স্থপতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন (mason's mark) বলিয়াই অনুমিত হয়। ইষ্টকখণ্ডটি বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত রেভারেণ্ড ই, এম্ হুইলার (Revd. E. M. Wheeler)* মহোদয়ের নিকট তৎপ্রস্তাবিত বহরমপুর কলেজসংশ্লিষ্ট সংগ্রহশালার জন্য প্রেরিত হয়। পরে ইহা আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নাগরী সাঙ্কেতিক চিহ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, যে সৌধ-গাত্রে ইষ্টকখণ্ডটি সংলগ্ন ছিল, সেটি কোনও হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির না হউক, অন্ততঃ স্নানাগার-নির্ম্মাতা শিল্পীটি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সুতীর সহিত "মর্ত্তুজা হিন্দ" বা বিখ্যাত পদরচয়িতা ও সাধক সৈয়দ মর্ত্তুজার স্মৃতি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাতীরে সতী দহের নিকট তাঁহার আস্তানা অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই তিনি ও তাঁহার ভৈরবী, ব্রাহ্মণ-কন্যা আনন্দময়ী, সমাহিত হইয়াছিলেন। পাশাপাশি অবস্থিত গোর দুইটি এখন নদী-গর্ভে স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের

১। Rennel সাহেবের বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লীর পথে অরঙ্গাবাদই দ্বিতীয় stage বা মঞ্জিল। সতের ক্রোশ রাস্তা অতিক্রমের পর পথিশ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ও সার্থবাহ প্রভৃতির জন্য এরূপ স্থানে 'সরাই' বা বিশ্রাম-ভবন নির্ম্মিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়।

২। শুধু সুতী বলিয়া নহে, অন্যত্রও মুসলমান হর্ম্ম্যাদির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এরূপ স্নানাগার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশোহর মির্জ্জা নগরে "নবাব বাড়ী" নামক প্রাসাদের সান্নিধ্যে "ইমারতী কার্য্য-খচিত" একটি চৌবাচ্চা বা স্নানাগার থাকার কথা অবগত হওয়া যায়। Westland সাহেব যশোহর বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"In front of this, and within the courtyard is a large masonry reservoir, which is said to have been a bath" (শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার বি এ মহাশয়ের লিখিত 'মির্জ্জানগরের ধ্বংসাবশেষ'— আর্য্যাবর্ত্ত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯, পৃ:৫২)।

* আচার্য কৃষ্ণমোহনের দৌহিত্র রেভা হুইলার ১৯০৬ থেকে কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৫র ৫ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। — সম্পাদক ঝড়।

ইতিহাসে পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা, ৩য় পল্লব হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক পুস্তিকায় (১৩০২ বঙ্গাব্দের সংস্করণে) পূর্ব্বোক্ত পদটি ব্যতীত আরও দুইটি পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "সৈয়দ মর্ত্তুজা" নামক গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ২৩টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদ কয়টি মর্ত্তুজা হিন্দের রচিত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, অনেকের মতে মর্ত্তুজাই প্রাচীন মুসমলান কবিগানের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রবাদ-মতে মর্ত্তুজা জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায়[১] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃ: ৩১১)। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ হোসেন কাদেরী। নিখিলবাবু, মর্ত্তুজার জন্ম খৃ: ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু একটি কারণে ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। রিয়াজুস্ সালাতিন্ গ্রন্থে সুতীতে শা মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধির উল্লেখ আছে। (P. 311 l. 17 Ed. Bibliothica Indica.) مزار شاه مرتضی هندی بسوتی ১৭৪০ খৃ: অব্দে গিরিয়ার যুদ্ধের সময় মহবৎ জঙ্গ আলীবর্দ্দীর সৈন্যদল মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধি-স্থান বলিয়া খ্যাত সুতী মোহনার নিকটবর্ত্তী আওরঙ্গাবাদ হইতে বালকাটা (জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বালিঘাটার) ময়দান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৪০ খৃ: অব্দের পূর্ব্বেই যে সৈয়দ মর্ত্তুজা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৪২ খৃ: অব্দে মর্ত্তুজার জামাতা— তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা আসিয়া, বিবির স্বামী সৈয়দ কাসেম বালিঘাটার বর্ত্তমান মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।[২] পাঁচ ছয় বৎসর হইল, মর্ত্তুজার দৌহিত্রবংশের আবাসবাটীর সন্নিকটে পথিপার্শ্বস্থ সমাধি হইতে বিচ্যুত একখণ্ড শিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শিলাফলকে "বিশমিল্লাহ রহমানে রহিম, লা এলাহা এল্লালা মহম্মদ রসুলাল্লাহ— খোদা এক মহম্মদ রসুলাল্লাহ্ বর-হক সাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী[৩] সনাআলিফ ই সতা আরবাউন ১০৪৬ হি:"। (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)। লিপির শেষ পংক্তিতে 'য়াকেবৎ বাখায়ের বাদ' অর্থাৎ মৃতের পরলোকে যেন শুভ পরিণাম ঘটে, এইরূপ লিখা আছে। তারিখের অংশটির ভালরূপ ছাপ না উঠায় ১০৪০ হি: (খৃ: অ: ১৬৩০-৩১) এরূপ পাঠও প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে নূতন ছাপ আনাইয়া খাঁ সাহেব আবদুল মুকতাদির মহাশযের যত্নে ১১৪৬ হি:, খৃ: অব্দ ১৬৩৬ এই পাঠ স্থিরীকৃত হইয়াছে। লিপিলিখিত বৎসরেই সাহ সাহেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সৈয়দ হোসেন কাদেরী ও শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মর্ত্তুজার জন্ম খৃ: ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধরিলে তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে (পূর্ব্বোল্লিখিত দুই বিভিন্ন পাঠ মতে)— তাঁহার বয়স ৮০ বা ৮৬ হইয়া পড়ে। দীর্ঘজীবী লোকের বয়স্থ পুত্র রাখিয়া পরলোক-গমন

১। বালিঘাটা এক্ষণে জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জের উপকণ্ঠস্থ সামান্য পল্লীমাত্র। এই স্থানে খান-ই-মজলিস্ উলুগ্ সরফরাজ খাঁ কর্ত্তৃক (খৃ: অ: ১৪৪৩) হি: ৮৪৭ অব্দে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠাবিষয়ক একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইহাই বোধ হয়, মুসলমানযুগের প্রাচীনতম শিলালিপি J. A. S. B. (n.s.) vol XIII no 3 p. 151. Bernoulliর গ্রন্থেও বালিঘাটার উল্লেখ আছে (p. 451 Tome I)।

২। সৈয়দ কাসেমের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে জঙ্গীপুর লোকাল বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুফী মতবাদের শাখাবিশেষের সংস্থাপয়িতা সুবিখ্যাত 'সুফী' সেখ আব্দুল কাদের গিলানীর নামানুসারে তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ আপনাদিগকে "কাদেরী" বা "আল্‌কাদেরী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ("The order of dervishes called after him the quadiris acknowledge him as founder." Beal's Oriental Biography p.5) আব্দুল কাদের গিলানী সাহেব খৃ: একাদশ শতাব্দীতে, খৃ: অ: ১০৭৮-১১৬৬ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

বিরল নহে; কিন্তু মৃত্যুকালে ৮০-৮৬ বৎসরের পুত্র বিদ্যমান থাকা সাধারণতঃ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। নদীর ভাঙ্গনে মর্ত্তুজানন্দের সমাধি-বিলোপের সহিত আস্তানা-সন্নিধানে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মেলাও লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সুতীতে সেরূপ ফকিরাদির সমাগম দেখা যায় না।

বোধ হয়, সৈয়দ মর্ত্তুজার জীবিতাবস্থাতেই—ফরাসী পর্য্যটক তাভার্ণিয়ে ১৬৬৬ খৃ: অ: ৬ই জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন যে, সুতী (Soutiqne) নগরের নিকট চড়া পড়িয়া জল অত্যন্ত অগভীর হওয়ায় বার্ণিয়ে (Bernier)কে রাজমহল হইতে কাশীমবাজার স্থলপথেই আসিতে হইয়াছিল।[৩]

এই ঘটনার প্রায় ১২০ বৎসর পরে প্রকাশিত মশিয়ে Bernoulli প্রণীত গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, ভাগীরথী বা ছোট গঙ্গা বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়; কেবল সুতী মোহনার কয়েক স্থানে বদ্ধ জল মাত্র পড়িয়া থাকে (Hors la saison des pluies il eat a sec, si ci n'est qu'il laisse quelques eaux stagnantes pres de mohana Soti)। চড়া পড়িয়া নদীর মুখ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া তখন আর এ পথ দিয়া বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যায় না। (বোধ-সৌকর্যার্থ Bernoulliর গ্রন্থে প্রদত্ত সুতী মোহনার মানচিত্রের একখানি প্রতিলিপি প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।) মানচিত্রের 'aqua stagnans' বা 'বদ্ধ জল' চলিত কথায় এ অঞ্চলে "ডামশ" বলিয়া পরিচিত। এই ডামশের ধারেই সৈয়দ মর্ত্তুজার দর্গাহ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুনিতে পাই, ডামশের দর্গাহ-সন্নিহিত অংশটি "সতীদহ" নামে অভিহিত হইত। বন্ধুবর নীলকান্ত সেন মহাশয় ছাপঘাটির পার্শ্ববর্তী গোপালগঞ্জ গ্রামের হাজী দুর্ব্বাজ নামের কোনও বৃদ্ধের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, বাল্যকালে এই ব্যক্তি 'ডামশ'-তটেই মর্ত্তুজানন্দ-আশ্রম অবস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তখন মর্ত্তুজার কোনও চেলা দরগাহের গদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ইহার পর খৃ: ১৭৪০ অব্দে সরফরাজ ও আলীবর্দ্দীর সংগ্রাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে সুতীর বিশেষ

৩। "On the 6th having arrived at a great town called Donapur at 6 cross from Rajmahal, I lert M. Bernier, who went to Ka'simbazar & thence to Hughll by land because when the river is low one is unable to pass on account of a great bank of sand which is before a town called Soutique (Sooty or Suti) -- Bernier's Travels in India. McMillian Ed. 1889 Vol I p. 125-26. Rennel সাহেব Itinerary হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কাসিমবাজার হইতে সুতী পর্য্যন্ত 'ভাঙ্গা' রাস্তা পশ্চিম পথ (western road) নামে অভিহিত হইত। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল।

	মাইল	ফারলং
কাসিমবাজার হইতে মুরাদবাগ	৬	৩
মুয়াদবাদ হইতে গয়সাবাদ	৬	৬
গয়সাবাদ হইতে বেলিয়া	৫	১
বেলিয়া হইতে মহম্মদপুর	৪	১
মহম্মদপুর হইতে বালিঘাটা	৭	
বালিঘাটা হইতে সুতী	৮	৫

(Memoirs A.S.B. Vol III. No 3 The Journal of Major James Rennel edt. H.D. La Touche p. 105)

রেনেল সাহেবের তত্ত্বাবধানে এ রাস্তাটিও মাপ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

F-/5

উল্লেখ দেখা যায় না। আলীবর্দ্দী খাঁ রাজমহল হইতে ফরাক্কায় ও পরে তথা হইতে সুতী ও বালিকাটা বা বালিঘাটা পর্য্যন্ত নিজ সৈন্য সন্নিবেশিত করেন এবং সরফরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি— জনপ্রবাদে "জিন্দাপীর" বলিয়া খ্যাত মহম্মদ গাউস খাঁ শত্রুপক্ষের শিবির-সংস্থাপনের কথা অবগত হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হয়েন (নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৫৯৩-৫৯৪ পৃ:)। সুতরাং সুতীতে এ উপলক্ষ্যে অল্প-বিস্তর skirmish বা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ইহার পর আলীবর্দ্দীর শাসনকালে (সম্ভবতঃ খৃ: অ: ১৭৩১-৪২ হইতে ১৭৪৫ খৃ: অব্দের মধ্যে।) বর্গীর উৎপাতে সুতীর লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া স্থানে স্থানে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহারাষ্ট্রপুরাণে সুতী এলাকায় বর্গীর অত্যাচারের কোনও বর্ণনা না থাকিলেও, ৺গাঙ্গুলী মহাশয়ের হস্ত লিখিত পুথিতে ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি এবং মুখর জনপ্রবাদ এখনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

ইহার পর মিরকাশিমের নিজামতীর সময় (১৭৬৩ খৃঃ অঃ) পুনরায় এ অঞ্চলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মিরকাশিম হঠিয়া আসিয়া, সুতী-সান্নিধ্যে আলমপুর ও রায়াঁপুর নামক দুইটি গ্রামের মধ্যস্থিত আট মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে সৈন্য ও কামানাদি সংস্থাপিত করেন। ৺গাঙ্গুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামদ্বয়ের নামকরণ নাকি নবাব সরফরাজ খাঁর বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান রায় রায়াঁ আলমচাঁদের নামানুসারে হইয়াছিল। রায়াপুর সুতী থানা এলাকার নিমতিতা ও অরঙ্গবাদের মধ্যবর্তী স্থানে— গঙ্গাতীরে অবস্থিত।[১] ইংরাজ সৈন্য জঙ্গীপুরের অদুরবর্তী বংশ বা বাশলোই নামক ক্ষুদ্র কায়া স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়া নবাববাহিনী আক্রমন করে। সুতীর নীকটবর্ত্তী কুণ্ডলিয়া গ্রামে নবাবের আর এক দল সৈন্য অবস্থিত ছিল এবং সুলতানপুর নামক অপর একটি গ্রামে কামানাদি রক্ষিত হয় (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। শুনিয়াছি, কিছুকাল পূর্ব্বেও কুণ্ডলিয়ার ভূগর্ভ হইতে কামানের গোলা প্রভৃতি পাওয়া যাইত। সাদেক আলী নামক মীর কাশিমের কোনও রণকৌশলী সেনানায়ক পরিখা প্রভৃতি খনন করিয়া কামানগুলি সুকৌশলে বিধ্বস্ত করেন; এই পরিখা অদ্যাপি সাদেক আলির "নালা" বা "দাঁড়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। সুলতানপুর-সান্নিধ্যেই যুদ্ধের বেগ প্রখরতর হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। সুলেখক ৺পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Musnud of Murshidabad গ্রন্থে কাটোয়া হইতে হটিয়া আসার পর জয়-পরাজয় নির্দ্ধারক শেষ যুদ্ধের জন্য— প্রাকৃতিক ও মানবীয় কৌশলে সুরক্ষিত সুতীতেই মীরকাশিম কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদল একত্রিত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গিরিয়া হইতে সামান্য দুরে অবস্থিত এই যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ-ভাগ রীতিমত গড়বন্দী করা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। ৺মজুমদার মহাশয়ের মতে ঘটনার কাল ১৭৬৩ খৃ: অ:, আগষ্ট মাস— ফল ইংরাজদিগের পরাজয়।[২] ইংরাজী ভাষার মুর্শিদাবাদের অন্যতম ইতিহাস-লেখক Major Tull Walsh সুতী-যুদ্ধের সময় ও ফলাফল অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ হইয়াছিল

১। কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি নরহরিদাস খৃ: সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জঙ্গীপুর মহকুমার রেঁয়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঁয়াপুর ও রেঁয়াপুর অভিন্ন গ্রাম নহে। জঙ্গীপুরের সবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৈলাশপতি ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি, পানিশালা গ্রামের সন্নিহিত এই রেঁয়াপুর লালগোলা থানার অন্তর্গত।

২। "After his reverse at Catwa Mir Coshim resolved to fight his decisive battle– caused his army to assemble at Suti. The position was strong naturally and artificially. The whole fort was covered by entrenchments. The village of Giria lay about a mile from the scene of action. Here the English were defeated in August 1763.

জুলাই মাসে। ইংরাজেরা নবাবের কামান ও রসদাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে ১৫০ নৌকা চাউলও তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমলে" ১লা আগষ্ট তারিখে যুদ্ধ হওয়ার কথা লিখিত আছে (পৃ: ৪১৯)। পূর্ণবাবু ও কালীপ্রসন্নবাবু উভয়েই মূল পারসীক গ্রন্থাদি ভালরূপই আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে ইহাঁদিগের মতেই আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়। ইংরাজ-সৈন্য যে ক্ষুদ্র বাঁশলোই নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পরপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যুদ্ধকালে ইহারা যে অনেকেই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাও "নবাবী আমল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত পুস্তকে এই সুতী-যুদ্ধ প্রসঙ্গে "সুতীর গড়বন্দী স্থানের"ও উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সেনানায়ক সাদেক আলীর রণদক্ষতার কথা লিপিবদ্ধ না করিলেও এতদ্‌বিষয়ক জনপ্রবাদ নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। সুতীর যুদ্ধের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা যে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। জয়োদ্ধত মুসলমান সৈন্য সম্ভবতঃ পরিখাদি পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে পর, বিজয়-লক্ষ্মী বৃটিশ-বাহিনীর ক্রোড়স্থ হইয়া থাকিবেন। রসদাদি ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্ভবতঃ এই সময়েই ইংরাজদিগের করতলগত হইয়াছিল। ইহার পর মুর্শিদাবাদের **cock-pit** সুতীর রণপ্রাঙ্গণে ইতিহাসের কোনও নূতন অঙ্ক অভিনীত হয় নাই। ১৮৫৪-৫৫ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সুতী এলাকায় লোকেরা বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে, ভাগীরথীর দক্ষিণ ধারে সাময়িক আইন (**martial law**) জারী করা হয়। (**Buckland's Bengal under Lieutenant Governors, vol. I, p. 171**)। তখন মহকুমা ছিল অরঙ্গাবাদে— আর হাকিম ছিলেন, পরবর্ত্তী কালের ছোট লাট সার্ এস্‌লি ইডেন (**Sir Ashley Eden**)। ইডেন সাহেব সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়— **Special Commissioner** এর সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃ: অব্দে ইডেন সাহেবের চেষ্টাতেই মহকুমা অরঙ্গাবাদ হইতে জঙ্গীপুরে উঠিয়া আসে। বিদ্যোৎসাহী ইডেন সাহেব অরঙ্গাবাদে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানীয় কুঠিয়ালগণের নাকি তাহাতে মত না থাকায়, সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুর্শিদাবাদ জেলায় বেসরকারী ইংরাজগণের অপর কোথাও বিদ্যালয় সংস্থাপণ সম্বন্ধে আপত্তির কথা শুনা যায় না; সুতরাং মহকুমা স্থানান্তরিত হওয়াই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

শুনিতে পাই, সুতীর নিকট "ইংলিশ" নামক স্থান পূর্ব্বে অরণ্য-সঙ্কুল থাকায় হিংস্র ব্যাঘ্রাদির আবাসরূপে পরিগণিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে ফৌজের অবসরপ্রাপ্ত নায়েক, সুবাদার প্রভৃতি সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে নাকি তথায় কয়েক সহস্র বিঘা জমি, বোধ হয় অস্থায়ী ভাবে নিষ্কর দিয়া, এই গ্রামটি পত্তন করান হইয়াছিল। ইংরাজরাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামের নাম "ইংলিশ" হইয়া থাকিবে। এই নামে অপর একটি গ্রাম ফরক্কা থানার এলাকাতেও অবস্থিত ছিল। তথায় রাজমহলস্থ বিদ্রোহী সাঁওতালদিগের সমাগম ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী নামক জনৈক মোক্তার, সুতী থানার ইংলিশ গ্রামে সাঁওতালগণ উপস্থিত হইয়াছে, ভ্রমক্রমে এই কথা প্রচার করেন। অমূলক জনরব প্রচার করিয়া লোকের মনে ত্রাস (**panic**) উৎপাদনের জন্য তিনি ফৌজী আইনের কবলে আসেন, পরে **Sri Ashley Eden** মহোদয়ের অনুরোধে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

সুতীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আমরা প্রায় বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পর সুতীসংক্রান্ত অপর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা অবগত নহি। সুতরাং আপনাদিগের আর

ধৈর্য্যচুতি না ঘটাইয়া এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরিশিষ্ট

(ক)

সুতীগ্রামে প্রাপ্ত হি: ৯০৯, খৃ: ১৫০৩-৪ অব্দে নৃপতি হোসেন সাহের রাজত্বকালে চাঁদ মালিকের পুত্র খাঁ মকর্‌রব খাঁ কর্ত্তৃক মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ-বিষয়ক প্রস্তর-লিপি।

قال النبي صلى الله عليه وسلم من بني مسجدا لله بني الله له بيتا
في الجنة مثله في عهد السلطان المعظم المكرم علاؤ الدنيا و الدين
ابي المظفر *
حسين شاه السلطان ابن سيد اشرف الحسيني خلد الله ملكه
و سلطانه بني هذا المسجد الجامع خان معظم مقرب خان ابن چاند
ملك في سنه تسع و تسعماية
لايهدم الله تعالى هذا المسجد الى يوم القيامة
مجلس خورشيد را عاقبت بخير باد

পাঠান্তর—

مجلس مه و خورشيد را عاقبت بخير باد

(খ)

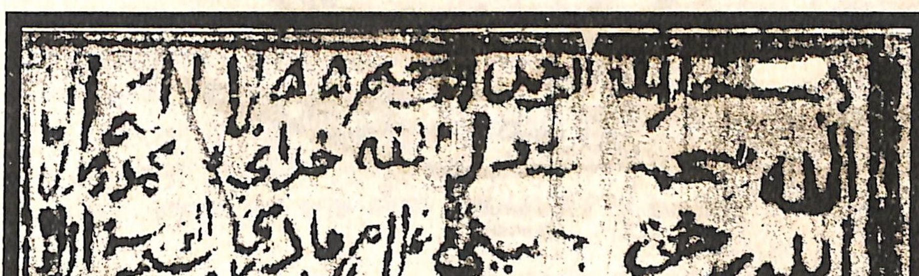
জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত সাহ হোসেনী গোলামকাদেরীর লিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم
لا اله الا الله محمد رسول الله خدای بلك محمد رسول الله برحق
حسيني غلام قادري سته الف سنه اربعين عاقبت بخير باد

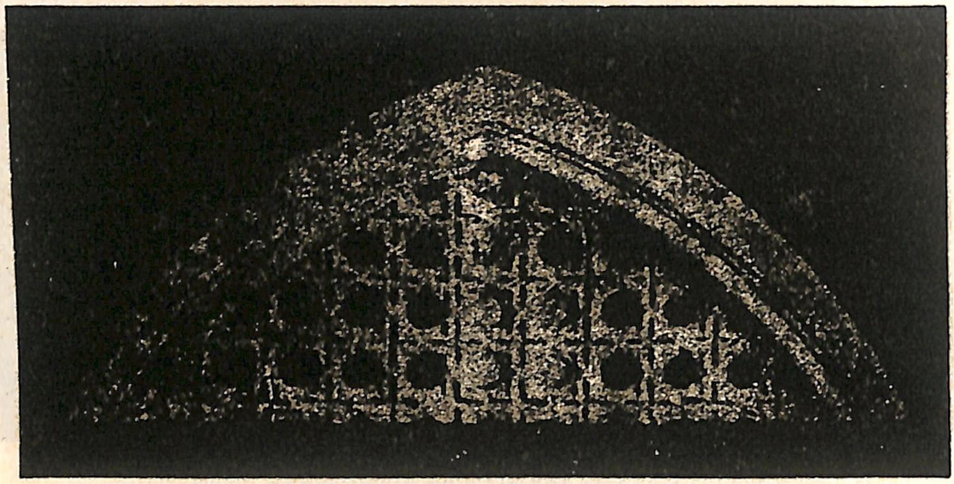
এই পাঠ অবলম্বন করিলে লিপির কাল ১০৪৬ হি:, খৃ: ১৬৩৬ অব্দ হয়।



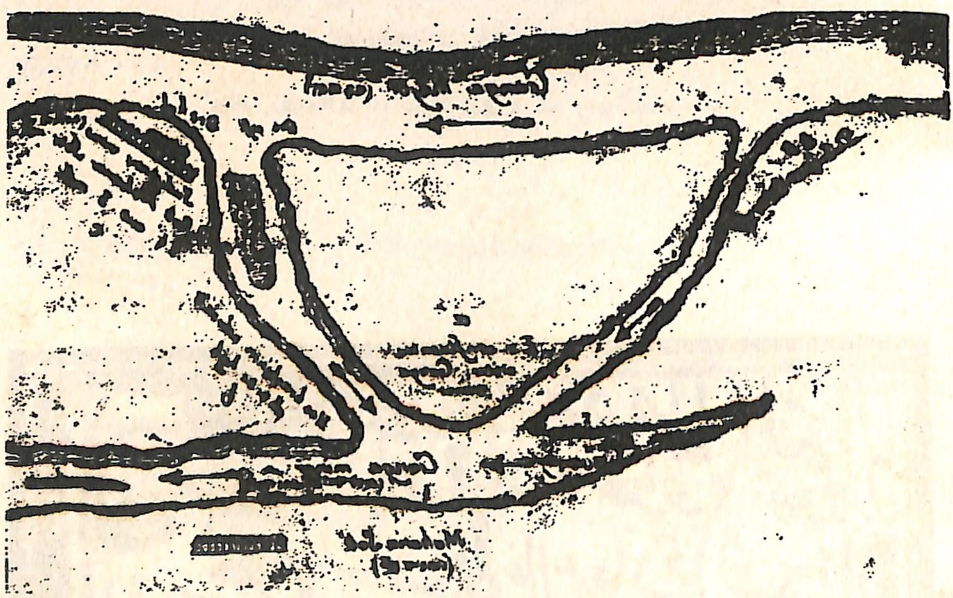
সুতী গ্রামে প্রাপ্ত খাঁন মক্‌র্‌রব খাঁ নির্ম্মিত মস্‌জিদ-বিষয়ক শিলালিপি।



জঙ্গিপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত হোসেন-ই গোলাম কাদেরীর শিলালিপি।



সুতী মস্‌জীদের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত জালিকাটা কষ্টি পাথরের চিত্র।



সুতী মোহনার পুরাতন মানচিত্র

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চিত্রগুলি গৃহীত।

তাঁতশিল্পী দুবরাজদাস চামার

বিনয় ঘোষ

মারাঠা বর্গীরা বালচর লুট করেছিল এবং সেখান থেকে নবাব আলিবর্দী খাঁ তাদের বিতাড়িত করেছিলেন। বালুচর গ্রামে এমন কি ধনসম্পত্তি ছিল যা বর্গীদের কাছে লোভনীয় মনে হতে পারে? অবশ্য ধনিক জৈনদের বাস ছিল বালুচরে এবং তাঁদের ধনদৌলত নিশ্চয় লুটেরাদের কাছে লোভনীয়। কিন্তু বালুচরের আরও একটি অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু ছিল, যা সোনারুপোর অলঙ্কারের চাইতেও মূল্যবান হলেও লুটের বস্তু হিসেবে আকর্ষণীয় নয়। এই বস্তুটি হল রেশমশিল্পজাত নানা রকমের বস্ত্র। যদিও বালুচর তন্তুশিল্পীদের বসতিকেন্দ্র ছিল না, তার চারিদিকের গ্রামে তাঁরা বাস করতেন, তাহলেও বালুচরই ছিল এই শিল্পীদের বোনা বস্ত্রাদির সবচেয়ে বড় আড়ত ও ব্যবসাকেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঢাকার তাঁতশিল্পীদের মতো মুর্শিদাবাদে বাহাদুরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীদের খ্যাতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রসারিত হয়। এই বাহাদুরপুর অঞ্চলের তন্তুশিল্পীদের গৌরবময় ঐতিহ্য ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাঁরা বহন করে এনেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবত শেষ বিচিত্রকর্মা তাঁতশিল্পী দুবরাজদাস চামার।

গঙ্গার পূর্বতীরে জিয়াগঞ্জ বালুচর জৈন-পরিবারের বসবাস প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বালুচর যদিও বালুচরী শাড়ির জন্য ইতিহাসে খ্যাত তাহলেও তাঁতশিল্পের জন্য যে গ্রামগুলি স্মরণীয় তার মধ্যে প্রধান হল বাহাদুরপুর বেলিয়াপুকুর রামডহর রম্নাপাড়া রণসাগর আমডহর বাগডহর আমাইপাড়া। বাহাদুরপুরের খ্যাতি একজন শিল্পীর জন্যই সবচেয়ে বেশি, তিনি দুবরাজদাস চামার।

প্রথমে দুবরাজের বাস ছিল মীরপুর গ্রামে, জিয়াগঞ্জ থেকে মাইল তিনেক দূরে। পরে দুবরাজ মীরপুর থেকে বাহাদুরপুরে এসে বসবাস করেন এবং তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই গ্রামেই তিনি তাঁর অননুকরণীয় শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। মীরপুরে দুবরাজের গৃহের চিহ্ন গঙ্গায় লুপ্ত হয়েছে। বাহাদুরপুরেও তাঁর ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই। যেটুকু বসতজমি আছে তাতে অন্যেরা বাড়িঘর তুলে বাস করছে। শিল্পী দুবরাজের কোনো ঘর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল মনে হয় যদি তাঁর বসবাসের একখানা ঘরেরও কোনো চিহ্ন থাকত! তা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। যদি তাঁর সেই ঐতিহাসিক তাঁতের কোনো চিহ্ন থাকত, যে তাঁতে তিনি যাদুকরের মতো বালুচরী শাড়ি

বুনতেন! অথবা যে-ঘরে বসে তাঁত বুনতেন! তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা মুর্শিদাবাদের নবাবের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের চেয়ে বাংলার ও বিশ্বের মানুষের কাছে অনেক বেশি দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় মনে হত।

দুবরাজদাসের মতো বয়নশিল্পীদের শিল্পকুশলতা সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে কাপড় বোনার ব্যাপারটাও সামান্য একটু জানতে হয়। কাপড় বোনার সময় এককালে পাঁচ বা দশ বা কুড়িখানা কাপড়ের টানা নরোজে জড়ানো হয়। এইজন্য ৫০ থেকে ৮০ গজ পর্যন্ত লম্বা করে সুতো সাজিয়ে নিয়ে 'পোঠে' প্রস্তুত করতে হয়। যদি খাড়ি ও রং করে কাপড় বুনতে হয়, তাহলে পোঠে থেকে টানার সুতো খাড়ি বা রং করা হয়। ভর্ণার সুতো লাটাই থেকে বার করে ফালা অবস্থায় রং ও খাড়ি করার নিয়ম। পোঠে লাগাবার সময় কতকগুলো বাঁশের খণ্ড (জোয়া) মাটিতে পুঁতে লাটায়ের সুতো তার এপাশ-ওপাশ করে সাজাতে হয়। পোঠে থেকে কোড়া বা রং-করা সুতো উঠিয়ে তাঁতে সাজানো হয়। তাঁত সাজাবার সময় পোঠের মধ্যে পাতলা জোয়াকাঠি লাগিয়ে, পোঠেটি বাহির-নরোজ নামক কাষ্ঠদণ্ডে সাজিয়ে জড়িয়ে নিতে হয়। জোয়াগুলি পোঠের মধ্যে প্রবেশ করাবার দু'টি উদ্দেশ্য থাকে— (১) ভিন্ন-ভিন্ন রঙের পোঠে পৃথক রাখা, (২) 'ব'-গুলি ওঠাবার-নামাবার সময় তার ভিতরের সুতোগুলি যেন জড়িয়ে না যায়। চেক-কাপড় বুনতে হলে প্রায় ৫০ গজ টানার সুতোর মধ্যে ২০০ জোয়াকাঠি ব্যবহার করা হয়।

রেশমের কাপড় আর সুতোর কাপড় বোনার তাঁত প্রায় একরকম। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় বালুচরের বুটিদার শাড়ি তৈরি করার জন্য যে তাঁত প্রচলিত ছিল তার গঠনপ্রণালী অত্যন্ত জটিল। বাংলার শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবত আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়, রেশমশিল্পবিজ্ঞান-বিশারদ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে উনিশ শতকের শেষ দশকে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত হল। প্রসঙ্গত তিনি শিল্পী দুবরাজের কথাও উল্লেখ করেছেন বলে তাঁর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

> *রেশম বস্ত্রবয়নের তাঁত, সূত্রবস্ত্রের তাঁতেরই অনুরূপ। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় বালুচরের বুটেদার প্রস্তুত করিবার জন্য যেরূপ তাঁত প্রচলিত আছে তাহার গঠন প্রণালী এত জটিল যে এক্ষণে কেবল একজনমাত্র ওই প্রণালী বুঝিতে এবং ওইরূপ তাঁত প্রস্তুত করিতে সক্ষম। বালুচরের বুটেদার সাটী নিতান্ত অপ্রচলিত হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে নক্সাতাঁত প্রস্তুত করিবার জন্য এ জেলায় অনেককাল হইতে কেবল দুই একজন মাত্র লোক পাওয়া গিয়াছে। দুবরাজ নামক যে একজন মাত্র লোক এক্ষণে নক্সার তাঁত প্রস্তুত করিতে সক্ষম, সেও অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ।[1] দুবরাজ কর্তৃক নক্সার তাঁত প্রস্তুত করা বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা যাহাতে দেওয়া হয়, তাহার উদ্যোগ হইতেছে। দুবরাজ নিজে যে সকল তাঁত প্রস্তুত করিয়া ফুলকাটা সাল, গলাবন্দ, মেজের চাদর, সাটী ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্ত্র বয়ন করে, ওই সকল দেখিতে অতি সুন্দর এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সাদরে ওই সকল ক্রয় করিয়া থাকেন। সাধারণ বালুচরে— বুটেদার সাটী দেখিতে অতি জঘন্য এবং ইহার আদর একেবারে গিয়াছে। কাপড়ে কোনওপ্রকার ফুল উঠাইতে হইলে কিরূপে তাঁত প্রস্তুত করিতে হয়, কয়েকজন তন্তুবায় বালককে এ-সম্বন্ধে দুবরাজ দ্বারা রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইলে, বালুচরে-বুটেদার সাটী প্রভৃতি কাপড় পুনরায় আদরে সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সচরাচর যেরূপ তাঁত আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে বস্ত্র*

১. নিত্যগোপাল পুস্তকরচনাকালে, ১৮৯৪ সালে, দুবরাজের বয়স ছিল ৮০ বছর হয়, তাহলে দুবরাজের জন্ম হয় আনুমানিক ১৮১৪ সালে।)

বয়ন করিবার সময় টানার সুতো পৃথক করিবার জন্য কতকগুলি 'ব' মাত্র ব্যবহার হয় এবং ভর্ণার সূতা চালাইবার জন্য মাকু মাত্র ব্যবহার হয়। নক্সার তাঁতে ব ও মাকু ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই টানার সূতা পৃথক করিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি রজ্জু ব্যবহার করা হয়, এবং যে ভর্ণার সূতা ফুল উঠাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহা নলী দ্বারাই পৃথক পৃথকভাবে চালাইয়া দেওয়া রীতি। সাধারণ তাঁতে এক ব্যক্তিই কাপড় বুনিয়া যাইতে পারে; নক্সার তাঁতে এক ব্যক্তি পাসা-নড়িতে পা দিয়া ব চালাইতে থাকে ও হস্ত দিয়া একবার করিয়া মাকু ও একবার করিয়া নলী চালাইতে ও পরক্ষণেই সানা সমেত দুক্তি চাপিতে থাকে, এবং অন্য এক ব্যক্তি ঝাঁপের রজ্জুগুলি একে একে টানিয়া যাইতে থাকে। এই ঝাঁপের রজ্জু সাজাইবার প্রণালী নিতান্ত জটিল। প্রত্যেক রজ্জুর সহিত কতকগুলি টানার সূত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকে। রজ্জুগুলি পরে পরে টানিতে থাকিলে যে টানার সূত্রগুলি উঠিয়া পড়ে, সেগুলির মধ্য দিয়া ভর্ণার নলী চালাইলে ফুল উঠিতে থাকে।

'রেশম-বিজ্ঞান' গ্রন্থে এই কথা লেখা আছে। গ্রন্থখানি বহরমপুর থেকে ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।[১] তাঁর আগে ১৮৯২ সালে লেখক একটি বিখ্যাত শিল্পবিষয়ক পত্রিকায় মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।[২] এই প্রবন্ধেও দুবরাজের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে দুবরাজই একমাত্র তাঁতশিল্পী 'who can set the loom to any pattern' এবং পুরাতন প্যাটার্নের তাঁত হলেও তা পুনরুদ্ধার করার জন্য এখানকার তাঁতিরা দুবরাজেরই শরণাপন্ন হন। নিত্যগোপাল এ কথাও বলেছেন, দুবরাজ এত দরিদ্র যে মাসে ৩০ থেকে ৪০ টাকার মতো বেতন পেলেও সে তন্তুবায়দের তাঁত তৈরি করা ও সংস্কার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। ১৮৯২-৯৩ সালে দুবরাজের বয়স প্রায় ৮০ বছর হয়েছিল এবং তখন বাহাদুরপুর গ্রামে ছয়টি মাত্র তাঁত চলত এবং ছয়টি তাঁতেরই মালিক ছিলেন দুবরাজ দাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুবরাজের দারিদ্র্যের যে ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন নিত্যগোপাল, খুব অল্পকথায়, তা থেকে শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে, দুবরাজ তাঁর নিজের শিল্পদক্ষতা দেখাবার মতো শাড়ি বা অন্যান্য কাপড় তখন বয়ন করা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। ছেড়ে দেবার প্রধান কারণ হল পোষকতার অভাব। যে ধনিক ব্যক্তিরা দুবরাজের হাতে বোনা বালুচরী-বুটিদার শাড়ির সমঝদার ক্রেতা ছিলেন, উনিশ শতকের শেষদিকে তাঁদের অর্থের অভাব যত না ঘটেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটেছে তাঁদের রুচির বিকার। বিলেতী জাপানী চীনা প্রভৃতি বিদেশী রেশমশিল্পের বস্ত্রাদির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিদেশী রেশমের গুণের জন্য নয় অথবা বিদেশী রেশমী কাপড়ের কোনো শিল্পকর্মের জন্যও নয়, কেবল বিদেশী পণ্যের পোষকতার 'আভিজাত্য' প্রদর্শনের জন্য। বিলেতি দ্রব্য ব্যবহারের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল। রাজা-মহারাজা ও জমিদার-পরিবারের লোকজন বিলেতি বা জাপানী বস্ত্রাদি ব্যবহার করতেন সামাজিক আভিজাত্যের জন্য। অথচ নিজের দেশের শিল্পকর্মের মান, বিশেষ করে তাঁতশিল্পের, বিদেশীদের চেয়ে যে কত শতগুণ উন্নত ছিল, তা আজকে সমস্ত দেশের শিল্পরসিকরা স্বীকার করেন এবং আমরাও কোনো প্রদর্শনীতে বা মিউজিয়ামে তার প্রাচীন নিদর্শন দেখে বুঝতে পারি আর পত্রিকাদিতে অথবা সেমিনারে লিখে ও বক্তৃতা দিয়ে তার গুণগান করি।

১। নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ঃ রেশম-বিজ্ঞান, বহরমপুর ১৮৯৪, পৃষ্ঠা ২০৬-৭।

২। The Journal of Indian Art and Industry, vol, V, No 38, 1892 : 'The Silk Industries of Moorshidabad' by Baboo Nitya Gopal Mookarji.

দুবরাজের বংশ প্রায় নির্বংশ হয়ে গিয়েছে। দুবরাজের তাঁতশিল্পের ধারাও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দুবরাজের মতো না হলেও নিত্যগোপাল গণকরের শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় সরকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কারও বংশে বাতি দেওয়ার মতো কেউ নেই। এরকম অনেক শিল্পীর বংশের বাতি আমরা নিজেরাই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছি। অবশ্য এই নিভিয়ে দেবার কাজে বৃটিশ শাসক বণিকরা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, কিন্তু আমাদের নিজেদের রুচিবিকৃতি ও মতিচ্ছন্নতার কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, এবং তা ক্ষমার্হও নয়। 'রেশম-বিজ্ঞান' গ্রন্থে তন্তুবায়দের দারিদ্র্যের সমাধান প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,

> বিলাতী রেশম-বস্ত্র বিক্রয় করিবার জন্য যেরূপ উদ্যোগ ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ উদ্যোগ ও উৎসাহে এদেশীয় রেশম-বস্ত্রের বিক্রয় প্রয়াস অতি দুরূহ কার্য। রেশম তন্তুবায়গণ অতি সামান্য লোক। তাহাদিগের জন্য রেশম-বস্ত্র বিক্রয়ের উদ্যোগ করিতে পারিলে বিক্রয় মন্দ হয় না। এই উদ্যোগ তাহাদিগের নিজে নিজেই করিয়া লওয়া কর্তব্য। বড় বড় শহরে মেলায় ভাল ভাল রেশম-বস্ত্র বিক্রয়ার্থ লইয়া যাওয়া এবং ওই সকল শহরের বড় বড় বাড়ির দ্বারে দ্বারে কাপড় বিক্রয় করিয়া বেড়ান, এই দুইটি উপায় দ্বারা এদেশীয় রেশম-বস্ত্রের আদর বাড়িবার সম্ভবনা। এদেশের কয়েকজন ভদ্রলোক দুই-এক হাজার টাকা মাত্র মূলধন লইয়া, দেশীয় রেশম ক্রয় করিয়া, যদি পার্শি অথবা য়িহুদীদিগের ন্যায় প্রধান প্রধান শহরগুলিতে 'ফেরি' করিয়া বেড়াইতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, অথচ নিজেরাও বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন।

নিত্যগোপালের এই প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে বর্তমানে কোনো মন্তব্য করা অনাবশ্যক। তার কারণ কোনো শিল্পকে দরজায়-দরজায় ফেরি করে অথবা মেলায়-মেলায় ঘুরে অথবা সরকারি ঋণ বা পুরস্কার দিয়ে যে বাঁচানো যায় না, একথা আমাদের দেশের সরকারি পরিকল্পনার বহর ও তার শোচনীয় ফলাফল দেখে সকলেই বুঝতে পারেন। দেশের জনসাধারণের কোনো কাজে না লাগলে অথবা তাদের পোষকতা না পেলে কোনো শিল্পকর্ম যে কেবল রাজা-জমিদারদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করে বাঁচতে পারে না, একথা ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল সত্য। নিত্যগোপাল দ্বিতীয় যে প্রস্তাবটি করেছেন তা মহাজনদের কবল থেকে শিল্পীদের রাহুমুক্ত করার জন্য। তিনি লিখছেন

> *কৃষকদিগের ন্যায় তাঁতিরাও মহাজনের ঋণে জড়িত। শতকরা বার্ষিক ২০/২৫ টাকা সুদ দিয়া স্বল্প মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করা অসম্ভব। মহাজনের সুদ যোগাইতে না হইলে তাঁতিরা রেশম-বস্ত্র অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াও অধিক লাভবান হইতে পারিত। মহাজনগণ বস্ত্র প্রস্তুতও করেন না, বস্ত্র বিক্রয়ও করেন না, অথচ তাঁহারাই ব্যবসায়টীর অন্তঃসার বাহির করিয়া লইয়া অর্থোপার্জন করেন। মহাজনের হস্ত হইতে তাঁতিদিগকে উদ্ধার করিয়া, অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে তাহাদের নিকট বস্ত্র ক্রয় করিয়া যদি কেহ ওই সকল বিক্রয়ের উদ্যোগ করেন, তাহা হইলে দেশীয় পট্টবস্ত্র-বয়ন ব্যবসায়ের সমূহ উন্নতি হয়।*

নিত্যগোপালের মতো জ্ঞানীব্যক্তির এই প্রস্তাব অনেকটা শিশুর কল্পনার মতো অবাস্তব। 'মহাজনের হস্ত হইতে' তাঁতশিল্প বা শিল্পীকে কেন, কোনো মানুষকেই উদ্ধার করা যায় না, অন্তত

৩। W. W. Hunter : Statistical Account of Bengal, Vol IX, Murshidabad, Londan 1876, P. 155.

১৮৯০-এর দশক থেকে বর্তমান ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি, সরকারি নীতি ও পরিকল্পনার যথেষ্ট আড়ম্বর সত্ত্বেও। পরে 'সমিতি' স্থাপন করার কথাও তিনি বলেছেন, আজকালকার সমবায় সমিতির মতো। কিন্তু গত একশো বছরের সমবায়-সমিতির ইতিহাস থেকে দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রামের শিল্পী সমবায়ের, কারুশিল্পীরা আরও দ্রুত উচ্ছন্নে গিয়েছে এবং সমবায় আন্দোলনের উৎসাহী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বেশ লাভবান হয়েছেন। অতএব একথা আজ ঋষিদের বাক্যের মতো সত্য যে বর্তমান সমাজের শ্রেণীগত গড়ন অক্ষত অপরিবর্তনীয় থাকা পর্যন্ত শোষিত গ্রাম্যশিল্পীদের মহাজনের কবল থেকে মুক্তি অথবা সমবায়-সঞ্জীবনীতে উন্নতি সম্ভব নয়। দুবরাজের মতো অনেক শিল্পী তাই নির্বংশ হয়েছে।

হান্টার সাহেব যখন মুর্শিদাবাদের 'স্টাটিস্টিকাল অ্যাকাউন্ট' লিখেছিলেন, ১৮৭০-৭২ সালে, তখন বৃদ্ধ হলেও দুবরাজ দাস চামার কর্মক্ষম অবস্থায় জীবিত ছিলেন। তাঁতশিল্পীদের মজুরী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন[৩]

The wages of the silk weavers are regulated not by time, but by the quantity of work done. The rate varies from Rs. 2.8.0 to 4 for every five yards of silk woven; and the average, if reckoned by the day, would be somewhere about 5 annas or $7\frac{1}{2}$ d., but it must be recollected that few weavers are in constant employment.

এই ছিল মুর্শিদাবাদের তাঁতশিল্পীদের অবস্থা। অথবা মুর্শিদাবাদের কলেক্টর ১৮৭২-৭৩ সালের Administration Report-এ জানান[৩]

> ***Certainly, judging from appearances, I should conclude that the Oswals or Jains of Azimganj, Baluchar, Murshidabad and Berhampur. who are the principal merchants and bankers in the District. are rapidly accumulating wealth.. These men appear to have a genius for trade, and their cereful and frugal habits are eminently suited to the accumulation of money, being seldom disturbed by alternations of lavish expenditure, except in the case of religious observances. They gratify their pride and love of show by the entertainment of retainers from the north-west; even as they have for some years past indulged their religious feelings by taking leases of some miles of the Bhagirathi from the Zamindars, and preventing fish being caught in these waters.***

কালেক্টরের বক্তব্যের মর্ম হল— আজিমগঞ্জ বালুচর মুর্শিদাবাদ বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জৈনরা ব্যবসা বাণিজ্য ও মহাজনী কারবার করে (রেশম-বাণিজ্যের সঙ্গে অনেকে জড়িত ছিলেন) প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছেন। বাণিজ্যকর্মে তাঁরা 'genius' এবং তাঁদের অভ্যাস-আচরণ এত সংযত ও মিতব্যয়ী যে ধনসঞ্চয় তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই করতে পারেন। কলেক্টরের কথা মিথ্যা নয়।

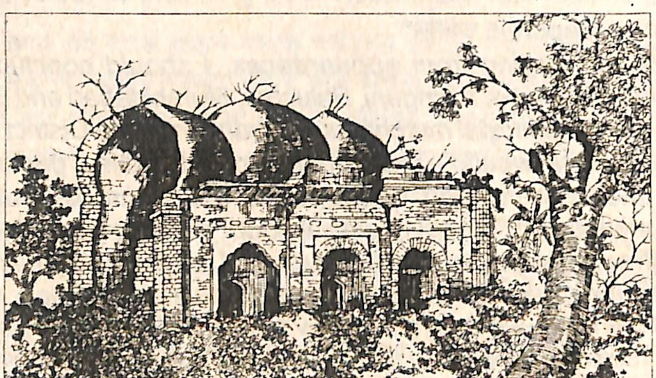
কিন্তু দুঃখের বিষয় জৈন অধিবাসীদের ক্ষেত্রে যা সত্য, বাংলার বাঙালি অধিবাসীদের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। অর্থাৎ বাঙালিদের 'genius' অন্য যে-কোনো ক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত হোক না কেন,

---

৩। W. W. Hunter : Statistical Accout of Bengal, Vol IX, Murshidabad, Londan 1876, P. 158-59.

বাণিজ্যক্ষেত্রে কদাচিৎ হয়। একটি বাণিজ্যেই বাঙালিরা কীর্তিমান সেটি হল 'দালালি' বা 'নেপোমি'। বৃটিশ আমলের বিখ্যাত দালালদের মধ্যে বাঙালিরাই অন্যতম। এই 'genius' বা প্রতিভা বাংলার তাঁতশিল্পীদের বা লোকশিল্পীদের ছিলনা। তাই তাঁরা শিল্পক্ষেত্র থেকে লুপ্ত হয়েছেন এবং তাঁদের শীর্ণকায় বংশধররাও আজ দ্রুত বিলীয়মান। সরকারি নানারকম ইনজেকশনের ফলে তাঁরা আরও দ্রুত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন।

দুবরাজের একমাত্র পুত্র নারায়ণ দাস পিতার প্রতিভার নগণ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। দুঃখকষ্টে অভাব-অনটনে তাঁরও জীবন শেষ হয়েছে। অন্যান্য বংশধররা তাঁত ছেড়ে কেউ মিষ্টির দোকান করেছেন আজিমগঞ্জে, কেউ বা পার্থিব জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমবাসী হয়েছেন। বাঙালি জীবনের অনিবার্য পরিণতি বাংলার লোকশিল্পীও নিঃশব্দে বরণ করে নিয়েছেন।*



* রচনাটি বিনয় ঘোষ-এর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি তৃতীয় খণ্ড থেকে পুণর্মুদ্রিত।

খোজা খিজির উৎসব

বিনয় ঘোষ

ভোরবেলা এবং মধ্যরাতে নবাবপ্রাসাদের নহবতখানা থেকে বাদ্যসংগীতের সুর ভেসে আসে কানে। অতীতের নবাবী আভিজাত্যের রেশ এই সুরের মধ্যে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

> The most striking emblem of royal dignity still maintained of Murshidabad is the imperial music, which may still be heard in the early morning sounding from the great fortified gateway which leads to the palace.[১]

মজুমদার বলেছেন, অনভ্যস্ত কানে এই সুর যতই বেসুরো মনে হোক, মধ্যরাতের ও ভোরের সুর শুনতে সত্যিই সুন্দর— 'the midnight and the early morning strains are indeed sweet.'[২] নাগরা, ঢোল কাড়ানাকাড়া সহযোগে শিঙা সানাই ইত্যাদি সুরের মিশ্রণ একটা করুণ বিষণ্ণ রাগিনীতে ধ্বনিত হয়ে বাতাসে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। সেই সুরতরঙ্গে অতীতের নবাবী আমলের স্মৃতি ভাগীরথীর বুকে জেগে উঠে আবার ভাগীরথীর বুকেই বিলীন হয়ে যায়।

নবাবপ্রাসাদের এই সুরের মতো মুর্শিদাবাদের দু'একটি উৎসব আছে যা আজও নবাবী আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরকম একটি উৎসব হল 'খোজা খিজি'র বা বেরা উৎসব। প্রায় সত্তর বছর আগে এই উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রসঙ্গে ও'মালি লিখেছেন[৩]

> This is observed by launching tiny lightships on the river, a spectacle which may be seen to great advantage on the Bhagirathi. On certain nights in the rainy season thousands of little rafts, each with its lamp burning, are floated down the stream. Their construction is very simple, for a piece of plantain or bamboo bears a sweetmeat or two and the lamp. The festival is

---

১. Hunter :
২. P. C. Mazumder : The Masnad of Murshidabad.
৩. Bengali District Gazetteers : Murshidabad; L.S.S. O'Malley : Calcutta, 1914, pp-210-11

celebrated with much magnificence on the last Thursday of the month of Bhadra (September). A raft is constructed of plantain trees and bamboos and covered with earth. On this is erected a small fortress, bearing fireworks on its walls. At a given signal the raft is launched and floated to the further side of the river, when the fire-works are let off, their reflection on water producing a picturesque effect.

বেরা উৎসব ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্রের ভরা নদী ভাগীরথী উৎসবের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই জলময় প্রাঙ্গণ আলোর ভেলায় ও ছোটবড় জলযানে আলোকময় হয়ে ওঠে। ভেলা ও জলযান নির্মাণ এবং তাদের রূপসজ্জার কাজ উৎসবের অনেক আগে থেকেই কারুশিল্পীরা করতে থাকেন। মুর্শিদাবাদ নগরের কাছে জাফরগঞ্জ একটি বড় নির্মাণকেন্দ্র। বাঁশ ও কলাগাছ এই নির্মাণের প্রধান উপাদান। গ্রামাঞ্চল থেকে এইসব উপাদান সংগ্রহ করা হয়। বাঁশ থেকে জাফরি ছেঁচা চালি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

নবাবী আমল থেকে একশ্রেণীর দক্ষ কারিগর এই ভেলা ও জলযান নির্মাণের কাজ বংশানুক্রমে করে আসছেন। সেকালে মহরম ও খোজা খিজির উৎসব উপলক্ষে কুশলী শিল্পীদের নিয়োগ করা হত, অভ্রের পাত দিয়ে তৈরি আলো চিত্রিত করার জন্য। এই সমস্ত অভ্রের তৈরি আলোকে কোরানের বাণী, মসজিদ, গাছপালা ও নানারকমের মূর্তি চিত্রিত করার প্রথা ছিল। চিত্রণের কাজে শত শত শিল্পী নিযুক্ত হতেন। ভেলা ও জলযানগুলিকে বহুবর্ণের দীপালোকে সাজানো বেশ উচ্চাঙ্গ শিল্পীদের কাজ ছিল। কলাগাছ জলে ভাসিয়ে তার উপর বাঁশ-বাখারি-ছেঁচা-চাটাই দিয়ে মিনার তোরণ গম্বুজ নিশান দুর্গ ইত্যাদির কাঠামো তৈরি করে সাজানো হত। কতকগুলি জলযান দ্বিতল-ত্রিতল রণতরীর মতো করা হত। নানারঙের রঙীন কাগজ অভ্র রাংতা ইত্যাদি দিয়ে জলযানগুলিকে মুড়ে দেওয়া হত এবং দুর্গ মিনার গম্বুজ প্রভৃতির চুড়োয় ময়ূর নিশান ও আলোর ঝালর দেওয়া হত। রূপালী আচ্ছাদনে আবৃত কৃত্রিম ঝাড়লণ্ঠন জলযানে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। ধীরে ধীরে উৎসবের বিশেষ দিনটি যত এগিয়ে আসত তত লোকের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকত, কবে ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবার আসবে এবং ভাগীরথীর ভরাবুক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

হাজারদুয়ারী প্রাসাদের সামনে তোপখানার ঘাটে নবাববাড়ির উত্তরে প্রায় মাইল দুই দূরে মহীনগরের নিচে ভাগীরথীর জলে ভেলা সাজিয়ে রাখা হত। তোপখানা থেকে কামানদাগার সঙ্গে সঙ্গে বেরার ভেলা ভাসানোর সময় ঘোষিত হত। লালবাগ থেকে মহীনগর পর্যন্ত গঙ্গার তীর আলোয় আলোকময় হয়ে কি অপূর্ব দৃশ্য রচনা করত, নবাবী আমলে, তা আজকের উৎসবের দৃশ্য দেখেও কল্পনা করা যায়। শোনা যায়, ইংরেজ-নবাব ক্লাইভের কাছে খোজা খিজির উৎসবের এই আলোকিত গঙ্গার দৃশ্যের একটি চিত্রকরদের হাতে-আঁকা ছবি ছিল। ছবিটি এখনও হয়ত ক্লাইভের বংশধরদের কাছে অথবা ইংলণ্ডের কোনো মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যায়। ছবিটিতে গঙ্গার এপার মুর্শিদাবাদের দিক থেকে ওপারের আলোকসজ্জা দেখানো হয়েছে। একটি অলিন্দে গঙ্গার তীরে নবাবের দরবার। সেই দরবারে মুর্শিদকুলি খাঁ গম্ভীরভাবে সোজা হয়ে বসে আছেন এবং তাঁর পাশে তাঁর তরুণ দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ। আতসবাজীর খেলা হচ্ছে আলোকসজ্জার মধ্যে আর গঙ্গার বুকে আলোকিত শত শত বজরা ভাসছে। নবাবের সামনে সভাসদদের মধ্যে দেখা যায় আলিবর্দী খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন। আলিবর্দীর উপস্থিতি থেকে মনে হয় ছবিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের (১৭২০-২৫) আঁকা, অর্থাৎ আজ থেকে অন্তত আড়াইশো বছর আগেকার

বেরা উৎসবের দৃশ্য এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়।[৪] এই ছবি দেখে একথাও মনে হয় যে মোগলচিত্রশৈলীর একটি বিশেষ ধারা মুর্শিদাবাদের নবাবদের পোষকতায় বাংলাদেশে অনুশীলিত হয়েছিল। শিল্পীদের সঙ্গে এই শিল্পকলার ধারাটিও লোপ পেয়েছে।

তোপখানা থেকে কামানদাগা হলে ভেলার দড়ির বাঁধন কেটে দেওয়া হয়। নৌবহরের মতো ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে ভেলাগুলি ভেসে যেতে থাকে। এইসময় মতিমহল থেকে বেশ বড় একটি জৌলুষের অনুগামী হয় সুসজ্জিত হাতী ঘোড়া উট অশ্বারোহী ও পদাতিক। জলযানগুলিও মন্থর গতিতে চলতে থাকে এবং তার তালে তালে বাজনা বাজতে থাকে। সেকালের সদাগরী ডিঙ্গার মতো কয়েকখানি মকরমুখো নৌকাও দেখা যায়, তার উপরে চারচালা বাংলো।

মুর্শিদাবাদের এই ভেলাভাসান পরব বা বেরা উৎসবের দু'একটি প্রায় দেড়শো বছর আগেকার বিবরণ প্রাচীন পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা হল।[৫]

সমাচার দর্পণ । ৯ অক্টোবর ১৮১৯

মুরশেদাবাদ॥— ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংলণ্ডীয়দিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য ২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এককালে ছোড়া গেল। তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বালাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট ২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ওই সময় জ্বলাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্ম্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বান্ধা তাহার উপর ঘর সে ঘরের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্ম্মিত। এবং কোন কোন স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারিজন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পট্‌কা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র খানা খাইলেন।

সমাচার দর্পণ । ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১

বেরা ভাসান॥ ২১ সেপ্তম্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদ হইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্তম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহা হইতে কোন বিষয় ন্যূন হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচগান ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের

৪. আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ 'মুর্শিদাবাদ-চিত্রকলার উদ্ভব প্রসঙ্গে'— সমকালীন (মাসিকপত্র) জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩।
৫. সংবাদপত্রে সেকালের কথা ঃ প্রথম খণ্ড ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কলিকাতা ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ২৭৭।

আরম্ভের উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তামাসা দেখিলেন।

জলদেবতা খাজা খিজিরের স্মরণোৎসব এই বেরা উৎসব বা ভেলা-ভাসান পরব। বাংলার রাজধানী ঢাকাতেও এই উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। বাঙালী হিন্দু সদাগরদের বাণিজ্যযাত্রার নানারকমের উৎসব-অনুষ্ঠানের বিবরণ মধ্যযুগের সাহিত্যে আছে, বাংলার মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্যেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হিন্দু উৎসবের সঙ্গে বেরা উৎসব মিলিত হয়ে, নবাবদের পোষকতায়, এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে, বিশেষ করে বাদ্য চিত্র ও আতসবাজির সংমিশ্রণে। বাংলার কুশলী মুসলমান লোকশিল্পীদের দান এই উৎসবে স্মরণীয়, এবং তাঁদের অভাব ছিল না মুর্শিদাবাদে। তারপর ব্রিটিশ আমলে কলকাতা যখন রাজধানী হল তখন ইংরেজ লাট-বেলাটদের উৎসবের কেন্দ্র হল শহর কলকাতা এবং তাঁদের পোষ্য নব্যধনিক হিন্দু রাজা-মহারাজারা দোলদুর্গোৎসব জাঁকিয়ে কলকাতাতেই আরম্ভ করলেন। অভিজাত হিন্দুদের কলকাতার মহোৎসবে সাহেবী খানাপিনা নাচগান আতশবাজির অনুষ্ঠান একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। অস্তগামী মুর্শিদাবাদে হৃতগৌরব নবাবরা এই উৎসবের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন, মুসলমান লোকসমাজকে নিয়ে, এবং এই প্রতিযোগী উৎসবের মধ্যে খাজা খিজির বা বেরা উৎসব অন্যতম।

খাজাখিজির

যতীন্দ্রমোহন রায়

খাজাখিজির সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক প্রচলিত আছে। ইহার বিষয়ে মোসলমানগণ মধ্যে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। কোরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে মুসা ও জসুয়ালর আল্‌খেদর বা জুলকরনাইন এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে গ্রীকবীর অলিকসন্দর জুলকরনাইন নামে পরিচিত; এজন্য অনেকে অলিকসন্দরের সহিত খাজাখিজিরের অভিন্নত্ব প্রতি পাদন করিতে প্রয়াসী। আবার অনেকে ইহাকে ইলিয়াস বা ইলিজা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক। ইলিয়াস জীবন-নির্ঝর (আব-ই-হায়েৎ) আবিষ্কার করিয়া অমরত্বলাভ করেন। প্রতীচ্য সাহিত্যে খাজাজির অপিরিচত নহে। Hermitএর কবিতা, এবং tVoltaireএর Ladigপুস্তিকায় 'L' Ermiteপ্রসঙ্গ খাজাখিজিরের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। Deutsch বলেন, Talmud এ ইলিজা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন অমর দেবযোনী বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি আরবদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এরূপ লিখিত আছে। আবার কেহ কেহ ইহাকে জুলকরনাইন বা কৈকোবাদের সহচর, উপদেষ্টা এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এসিয়া মাইনরে খিজির ইলিয়াস St. George of Cappadocia নামে

৺ প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষের রচণাটি ১৯৮০-র জানুয়ারিতে প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি তৃতীয় খণ্ড থেকে পুণর্মুদ্রিত। বিনয় ঘোষ এই নিবন্ধে বলেছেন, ''বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে এই উৎসবের উৎপত্তি হয়নি, ... বাংলার রাজধানী ঢাকাতেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত মহাসমারোহে হত।'' আগ্রহী পাঠকের অবগতির জন্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত 'ঢাকার ইতিহাস' প্রমথ খণ্ড থেকে 'খাজাখিজির' নিবন্ধটি পুণর্মুদ্রিত করা হল।— সম্পাদকমণ্ডলী ঝড়।

পরিচিত।

বর্ত্তমান সময়ে খাজাখিজির ভারতীয় নদনদী এবং সমুদ্র মধ্যে অবস্থা পূর্ব্বক বিপন্ন বৈবিকদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। চল্লিশ দিন ব্যাপী কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া খাজাখিজিরের দর্শন লালসার তন্ময় চিত্তে নদীতীরে অবস্থান করিলেই নাকি তাঁহার দর্শন লাভ সুলভ হয়। সর্ব্ব সম্পদায়ের মোসলমানগণ বিপদুদ্ধরণের জন্য, রোগ মুক্তি কামনায়, অথবা সন্তান লাভ মানসে ইহার পূজোপচার প্রদান করিয়া থাকে।

ঢাকায় নবাব মকরখাঁর সময়ে বাঙ্গলার মোসলমানগণের এই পর্ব্বানুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণপ্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এই পর্ব্ব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে এতদুপলক্ষে ঢাকায় সমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিক হইতে কদলীবৃক্ষও বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রচণ্ড আলোকযান প্রস্তুত হয়। তাহার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে মণ্ডিত তরণী, গৃহও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে আলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই উৎসব ''বেরা'' উৎসব নামেও পরিচিত। পূর্ব্বে তিন শত হস্ত বিস্তৃত আলেকযানও প্রস্তুত হইত। এতভ্ভিন্ন অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মোসলমানেরও বেরা থাকিত। বুড়িগঙ্গা বক্ষ এইরূপে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া নয়ন মনোরম অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। এতদঞ্চলের মোসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের প্রদোষে আদ্রক, তণ্ডুল ও কদলী সমন্বিত নৈবেদ্য সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা নদী বক্ষে ভাসাইয়া দেয়। মোসলমানগণ ব্যতীত জলিক ও নমঃশূদ্রগণ কর্ত্তৃকও এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কোম্পানির আমলে কোর্ট কাছারী

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে হাজার বছরের মুসলমান অভিযান ও রাজত্বকে ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে থাকেন।

১ম— সবুক্তগীন পর্যন্ত আরব অভিযান ঃ—
৭১২ থেকে ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

২য়— তারপর ৯৯৯ থেকে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ পর্যন্ত। ঘন ঘন ভারত আক্রমণ করে লুটপাট করাই ছিল যার উদ্দেশ্য। ভারত জয় করে রাজত্ব স্থাপনের কোনও চেষ্টা এই সময়ে হয়নি।

৩য় — ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দাস রাজবংশের শাসনকাল থেকে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যু পর্যন্ত ভারতে মুসলমান শাসনের কাল। দেশের বিভিন্ন অংশে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা এই ৩৫০ বছর ধরে চলেছিল।

৪র্থ — ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশার রাজত্বকাল থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুশো বছরের বেশি সময় পুরোপুরি মুসলমান শাসন। তারপর থেকেই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছে। পাঠান রাজত্বে দেশের শাসন ব্যবস্থা যে রকম ছিল মোগল রাজত্বে তার রদবদল অনেক হয়েছিল। বিচার ব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আকবরের রাজত্বকালে বিচার ও শাসন ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে একটা স্থায়ী রূপ নিয়েছিল। তাঁর আগে শেরশাহ দেশ শাসনের ধারা যেভাবে বদল করেছিলেন, বিচারের সেই কাঠামো আকবর রেখেছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেছেন যে আকবর বুঝেছিলেন যে দেশ শাসনের জন্যে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শেরশাহ তাঁর রাজ্য কয়েকটি সরকার ও পরগণায় ভাগ করেছিলেন। আকবর মোগল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবাতে ভাগ করে মোট ১০০ টি সরকার গঠন করেন। প্রত্যেক সরকারে

কয়েকটি পরগণা ছিল এবং তাঁর রাজত্বে পরগণার নামকরণ হয় মহাল। শেরশাহ প্রত্যেক সরকারের কর্তা করেন এক একজন প্রধান শিকদারকে। আর আকবর প্রত্যেক সুবার শাসনকর্তা করেন সুবাদারকে। সুবাদারী শাসন তারপর থেকেই চলতে থাকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত, পলাশির যুদ্ধের আট বছর পরেও। শেরশাহ ফৌজদারী আইনের কর্তা করেছিলেন শিকদারদের। আকবর ফৌজদার ও সুবাদারের উপর সেই ভার ন্যস্ত করেন।[১]

আকবরের আগে দেশের বিচার ব্যবস্থা চলতো কাজি, মুফতি ও মুহতাসিবদের দিয়ে। তাঁর রাজত্বকালে কাজি ও মুফতিদের সঙ্গে যুক্ত হলো আরও নানা ধরণের কর্মচারী। আমিন, আমিল, ভকিল, উজির, বক্সী-সদর, মুস্তফী আরও নানা রকমের কর্মচারী। আইন-ই আকবরীতে তাদের দায় দায়িত্বের উল্লেখ আছে। রাজধানীতে দৌলতখানায় বসে স্বয়ং বাদশাও বিচার করতেন। তাঁর প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান এ-আদালত এবং কাজি উল কুজুত বা প্রধান বিচারপতি। শহরের পুলিশ ও মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার প্রধান মুহতাসিবের হাতেও বিচার করা ও শাস্তি দেবার ক্ষমতা ছিল।

প্রত্যেক সুবাতে নিজামত আদালত ছিল সুবাদার বা নাজিমের অধীন। তাঁকে সাহায্য করতেন দেওয়ান। সুবাতে ফৌজদারী মামলায় বিচার কাজি করতেন। কোনো কোনো সুবাতে কাজি-উল-কুজুত বা প্রধান কাজি ছিলেন। তিনি কাজিদের উপরওয়ালা। সাধারণ আদালতের বিচারকের নাম ছিল আদল বা আদিল। প্রত্যেক সুবাতে দেওয়ানী মামলার তিনিই প্রধান। এই বিচারব্যবস্থা মোগল রাজত্বের শেষ কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। স্যার যদুনাথ সরকার মোগল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> The Indian villager in the Mughal Empire was denied the greatest pleasure of his life in our time viz. facility for civil litigation with government courts of first instance close to his doors and an abundance of courts of appeal rising up to the High Court at the Capital.

মোগল রাজত্বকালে গ্রামের লোকে সুবিচার পেতো না আর সুবিচার পাবার মত কোনো সুযোগও গ্রামবাসীদের ছিল না। নিম্ন আদালতে যদি বিচার বিভ্রাট হতো, তা হলে তার বিরুদ্ধে আপীল কোথায় করতে যাবে? আপীল কোর্ট থাকতো সুবার প্রধান শহরে। সেখানে বিচার পেতে যাচ্ছে কে? এখনকার মত প্রত্যেক জেলাতে কোর্ট কাছারী ছিল না।

মিঃ সি ডি ফিল্ডস্-এর 'রেগুলেশনস্ অব দি বেঙ্গল কোড' বইখানিতে মোগল শাসনে বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং মুর্শিদাবাদ যখন তিন সুবার রাজধানী সে সময়ে বিচার ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। মোগল রাজত্বের শেষের দিকে যে সব সুবার কাজিদের প্রসিদ্ধি ছিল এবং সুবাদারের সঙ্গে খাতির ছিল তাঁরা বিচার নিয়মিত করতেন। কিন্তু যাঁরা কাজের কাজি না হয়ে মাত্র নামেই কাজি হতেন, তাঁরা কেবল দলিল-দস্তাবেজে সই সাবুদ দিতেন এবং মুসলিম বিয়েতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাজ করতেন। বিচারের জন্যে তাঁকে মাথা ঘামাতে হতো না। সে কাজ সুবাদারের দেওয়ান বা অন্যান্য কর্মচারীরাই যা হয় করে দিতেন। আজ পর্যন্ত তাই মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রারদের গ্রামের লোক কাজি বলে থাকে।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন তিন সুবার দেওয়ানী পেয়েছিল, সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ রাজধানীতে বিচার ব্যবস্থা কেমন ছিল, সে কথাও মিঃ ফীল্ডস্ বলেছেন। নবাব-নাজিম হচ্ছেন সুবাদার, ইংরেজ বলতো 'দি সুবাহ', — তিনি হচ্ছেন সবার বড় বিচারক। খুন-হত্যাকাণ্ডের

---

১. Administration of Justice during the muslims Rule – W. Hussain.

বিচারে তিনিই সব। কাজি, ভকিল, সাক্ষী সাবুদ শুনে তিনি শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন, খালাসও করতে পারেন। জমি এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার বিচার ভার ছিল দেওয়ানের উপর। কিন্তু তিনি কদাচিত নিজে জমির মামলার বিচার করতেন। ফৌজদারী মামলার ব্যাপারে নবাব-নাজিমের প্রধান সহকারী ছিলেন দারোগা-আদালত-অল্-আলিয়া, তিনি ঝগড়া-ঝাঁটি, মার-দাঙ্গা, গালিগালাজ প্রভৃতি নিয়ে কেউ বিচার প্রার্থী হলে তার নালিশের বিচার করতেন এবং জমি ও সম্পত্তি ঘটিত ছোট মামলার বিচার তাঁর কাছে হতো। তবে ভূসম্পত্তির মালিকানা বা উত্তরাধিকার নিয়ে কোনো নালিশ তাঁর কাছে করা যেতো না। সেটা দেখতেন দারোগা-আদালত-ই-দেওয়ানী। নবাবী আমলে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের দুই কর্তা ছিলেন দুই দারোগা-ই-আদালত। ফৌজদারী মামলার বিচার ফৌজদারও করতেন। চোর, ডাকাত, বাটপার, জালিয়াত প্রভৃতির বিচার করতেন ফৌজদার। উত্তরাধিকার নিয়ে মামলার বিচার কাজি করতেন। কারণ সেখানে প্রচলিত হিন্দু ও মুসলিম আইনের ব্যাপার ছিল। মুহতাসিব ছিলেন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট। মাতলামি, মদ, চোলাই, ওজনে চুরি, বাটখারার কম ওজন, লুকিয়ে গাঁজা-আফিম পাচার প্রভৃতি নালিশের বিচার হতো মুহতাসিবের কাছারিতে।

উত্তরাধিকারের মামলায় কাজিকে সাহায্য করতেন মুফ্তি ও পণ্ডিত। আইনের কথায় মুফ্তি বা পণ্ডিত যদি একমত না হতেন তা হলে সে মামলা নবাব নাজিমের কাছে পাঠানো হতো। নবাবী আমলে কানুনগো ছিলেন ভূমি ও ভূমি রাজস্বের হিসাব রক্ষক এবং তাঁর সেরেস্তার নানারকম দলিলপত্র থেকে জানা যেতো কোন জমির মালিকানা কার, আর সে জমির খাজনা কত। জমির খাজনা ও জমিদারীর রাজস্ব সংক্রান্ত সব মামলার বিচার কানুনগো করে দিতেন। আর ছিলেন কোতোয়াল। শহরবাসীরা যাতে শান্তিতে রাত কাটাতে পারে, সেটা তাঁকেই দেখতে হতো। মোটামুটিভাবে এই ছিল নবাবী আমলের বিচার ব্যবস্থা। আদালতের প্রধান দারোগা-ই-আদালত আর পুলিস কোতোয়ালীর কর্তা কোতোয়াল।

ইংরেজ কোম্পানি যখন বাংলা-বিহারের বিচার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিলেন, তখনই এই দুটি সুবাতে বিচার ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গিয়েছে। মিঃ ফীল্ডস্ লিখেছেন ঃ

> The operation fo these Courts was confined to the circle round about Murshidabad and there were no proper arrangements for subordinate jurisdiction in the distant districts.

আইনের শাসন রাজধানীর বাইরে ছিল না বললেই হয়। কাজি থাকতেন শহরে, তাঁর হয়ে অন্য লোকে কাজ করতো। কিন্তু তাদের কারও আইনসম্মত ক্ষমতা ছিল না। জমিদার, জোতদার, তহশীলদার বা নিজামতের অন্যান্য ছোট কর্মচারীরাও বিচার করতেন এবং তাঁরা কেউ ন্যায়নীতির ধার ধারতেন না। তিনটি সুবার দেওয়ানী হাতে নেবার সাত বছর পরে কোম্পানি সরকার বিচার ব্যবস্থার সংশোধনের চেষ্টা শুরু করেন। তার আগে নবাব নাজিমের হাতেই বিচার ব্যবস্থার ভার ছিল।

মোগল রাজত্বে বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন কাজি-উল-কোজাত বা প্রধান বিচারপতি। বাদশা স্বয়ং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতেন। সেখানে সুবাদারদের কিছু বলার ছিল না। মোগল শাসনের অধঃপতনের সময় মুর্শিদকুলি খাঁ তিন সুবার কাজি-উল-কোজাত নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল সদরস সদুর। নিজামতী ও দেওয়ানী দুই আদালতের রেজিস্ট্রার ছিলেন দু'জন দারোগা-ই আদালত। পরবর্তীকালে তাঁদের উপর বিচার ভার দেওয়া হয়েছিল। মুসলমান আইনের ব্যাখ্যার জন্য থাকতেন মুফতী এবং হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য বড়

বিচারালয়গুলিতে পণ্ডিত নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল। দেওয়ানী আদালতের বিচারের ভার খালসার বা রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানের উপর থাকলেও তিনি সব সময় আদালতে বিচার করতেন না। রাজস্ব বিভাগের কোনও কর্মচারীর উপর তিনি বিচারের ভার দিতেন। ফলে বিচার-বিভ্রাট হতো।

সয়ের-উল-মুতাক্ষরিণে দেখা যায় সুজাউদ্দিনের আমলে বাংলা দশটি ও বেহার আটটি ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি ছিল এক একজন ফৌজদারের অধীন। তাছাড়া রাজধানী মুর্শিদাবাদের জন্যে একজন পৃথক ফৌজদার ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের অধীনে হাজার দু'হাজার সৈন্য থাকতো। অবাধ্য জমিদারদের বশীভূত বা উৎখাত করার দায়িত্ব ছিল ফৌজদারদের। বিদ্রোহী জমিদারদের ধরে সুবাদারের কাছে পাঠানোর দায়িত্বও ফৌজদারকে পালন করতে হতো। চোর, ডাকাত দমনের সঙ্গে রাজ্য মধ্যে অশান্তি উপদ্রব দূর করাও তাঁর কাজ। কোম্পানি আমলের ম্যাজিস্ট্রেটদের মতই তাঁদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হতো। ফৌজদারেরা তার জন্যে রাজ্যের অনেক জায়গায় থানা বসাতেন এবং থানাদার নিযুক্ত করতেন। বড় বড় শহরে কোতোয়াল এবং তাঁর অধীনে চৌকিদারেরা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করতো। নবাবী আমলের চৌকিদারদের ক্ষমতাও কম ছিল না। কাউকে ধরে আনতে বললে চৌকিদারেরা তাকে বেঁধে আনতো। কোতোয়ালের হুকুম পেলেই হলো।

মোগল রাজত্বের কোর্ট কাছারির কথা সেকালের বিদেশী ভ্রমণকারীরাও বলে গিয়েছেন। মিঃ সেবাষ্টিয়ান ম্যানরিক লিখেছেন সেকালের কোর্ট কাছারির কথা ঃ

> Justice is well-organised and law Courts equipped. The 'vkils' and the Kazis' are rich and respected. Criminal and revenue laws are extremely stringent and severe. Capital punishments of brutal nature are frequent.

মুর্শিদাবাদে নবাবী আমলের বিচার ব্যবস্থাও একই ধরণের ছিল। ন্যায় বিচারকও ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নিজের একমাত্র ছেলের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়েছিলেন। চোর-ডাকাতদের শাস্তি ছিল চরম শাস্তি। বিদ্রোহী জমিদারদেরও কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো মুর্শিদকুলীর আমলে। যে সব জমিদার সময়মত খাজনা দিতেন না, তাঁদের ধরে এনে 'বৈকুণ্ঠ বাস' করানো হতো অর্থাৎ হাত পা বেঁধে পায়খানার চৌবাচ্চায় বসানো হতো। খাজনার টাকা দিলে তাঁরা মুক্তি পেতেন। নবাব আলিবর্দ্দির আমলেও একই রকম ব্যবস্থা ছিল। ডাকাত ধরা পড়লে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হতো। হাত-পা বা নাক-কান কেটে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। মুর্শিদাবাদে ছিল সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত, যেখানে জমি, ধার-দেনা এবং ফৌজদারী মামলার বিচার হতো। কোম্পানিও প্রথমে সেই কোর্ট কাছারি দিয়েই কাজ চালাতেন।

পলাশির যুদ্ধের পরেই ইংরেজ এদেশের শাসন ব্যবস্থা হাতে নেয়নি। ১৭৭০ সালে ইংরেজ কোম্পানি তিনটি সুবার দেওয়ানী ও সুবাদারী নিজেদের হাতে নিয়েছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর বাদশার আদেশ মত তিন সুবার দেওয়ান আর মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম নামেমাত্র সুবাদার। রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলায় এসে দেশের শাসন ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন যে নবাবকে যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়া সোজা এবং নবাবের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও অসন্তোষ কাজে লাগিয়ে কোম্পানির শাসন চালু করাও কঠিন নয়। কিন্তু—

> It is difficult to bring in the matter of collection of revenue and put order in right direction.

কাজেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডনের ডিরেক্টর বোর্ড বাংলা শাসনের নতুন ছক করলেন

১৭৭২ সালে। ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন গভর্ণর জেনারেল আর তাঁর সঙ্গে থাকলো চারজনের এক কাউন্সিল। নবাব গভর্ণর জেনারেল এণ্ড কাউন্সিলের শাসন ব্যবস্থা চালু হলো। মুর্শিদাবাদ থেকে সদর নিজামত ফৌজদারী কোর্ট কলকাতায় আনা হলো, নাম হলো সুপ্রিম কোর্ট। চিফ জাস্টিস হলেন স্যার ইলাইজা ইম্পে আর তাঁর সঙ্গী মিঃ কাষ্টিস হাইড ও চেম্বার্স। মুর্শিদাবাদ থেকে সদর দেওয়ানী আদালত তুলে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সামিল করা হলো। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সদর ফৌজদারী আদালতটি আবার মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর নিজামত ফৌজদারী আদালত লর্ড কর্ণওয়ালিশ আবার কলকাতায় নিয়ে যান। ১৭৯৩ সালে চারটি কোর্ট-অব-সার্কিট স্থাপন করা হলো এবং সার্কিট কোর্টের বিচারক করা হলো কোম্পানির খাস কর্মচারীদের। মিঃ কীটিং ছিলেন মুর্শিদাবাদ মিন্টের কর্তা, হলেন সার্কিট কোর্টের জজ। এই চারটি সার্কিট কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি চারটি জায়গায়। তবে ইংরেজ কোম্পানি ১৭৭১ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে তিনটি সুবাতেই অনেক চৌকি ও এরিয়া কোর্ট স্থাপন করেছিলেন যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ফৌজদারি এবং মুনসেফদের উপর দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার দেওয়া হয়েছিল।

১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ছিলেন স্যার জন এডওয়ার্ড হ্যারিংটন নামে কোম্পানির একজন সুদক্ষ কভেনান্টেড অফিসার। মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী আদালত চালাতে মাসে মাসে কত টাকা খরচ হয়, তার একটা হিসাব হারিংটন সাহেব কলকাতার কোম্পানি সরকারকে দিয়েছিলেন। তখন জেল ডিপার্টমেন্ট এবং কোতোয়ালীও ছিল মুর্শিদাবাদ দেওয়ানী আদালত এষ্ট্যাবলিশমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। হ্যারিংটনের রিপোর্টে আছে, একজন জজ বেতন পেতেন ২৫০০ টাকা ও একজন রেজিষ্ট্রার পেতেন ৫০০ টাকা। তাঁরা দুজনেই ইংরেজ। আর কোর্ট এষ্ট্যাবলিশমেন্টে ছিল ঃ

১ জন	সেরেস্তাদার	বেতন ১০০ টাকা
১ জন	পর্তুগীজ কেরাণী	বেতন ৮০ টাকা
১ জন	নেটিভ কেরাণী	বেতন ৪০ টাকা
৬ জন	মহুরী ২৫ টাকা হিসেবে	বেতন ১৫০ টাকা
১ জন	মৌলভী	বেতন ১০০ টাকা
১ জন	জজ পণ্ডিত	বেতন ৬০ টাকা
১ জন	মুন্সী	বেতন ৫০ টাকা
১ জন	নাজির	বেতন ২৫ টাকা
১ জন	নায়েব	বেতন ১৫ টাকা
২০ জন	পেয়াদা ৪ টাকা হিসাবে	বেতন ৮০ টাকা
১ জন	ডাক্তার	বেতন ১০ টাকা
১ জন	মোল্লা	বেতন ৫ টাকা
১ জন	ব্রাহ্মণ	বেতন ৫ টাকা
১ জন	মির্দা	বেতন ১০ টাকা
১ জন	ভিস্তি	বেতন ৪ টাকা
১ জন	মেথর	বেতন ৩ টাকা

প্রতি মাসে কাগজ, কালি ইত্যাদি ৩০ টাকা

তখন কোর্টের কাজ ফার্সী ভাষায় চলতো। মুন্সী ও নেটিভ কেরাণিকে তাই ফার্সী ও ইংরাজি

জানতে হতো। পর্তুগীজ দলিল দেখার জন্যে পর্তুগীজ ভাষা জানা কেরাণীর প্রয়োজন ছিল। মৌলভী বুঝাতেন শরীয়তী আইন আর পণ্ডিত বুঝাতেন হিন্দু আইন। মোল্লা বুকে কোরাণ ঝুলিয়ে সাক্ষীদের কোরাণ ছুঁইয়ে কোর্টে শপথ নেওয়াতেন। আর পণ্ডিতের কাছে থাকতো তামার ঘটে তুলসী পাতা ও গঙ্গাজল। তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে সাক্ষীরা আদালতে শপথ নিতেন। এখনকার মত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্যি-মিথ্যের শপথ বাক্য পাঠ করে তখন রেহাই ছিল না।

কোম্পানি শাসনের গোড়ার দিকে সরকারি খাজনা না দিলে বা ব্যক্তিগত দেনা পরিশোধ না করলে দেনদারদের ফাটক খাটতে হতো। ঋণ পরিশোধে অক্ষম ভদ্রলোক দেনদারদেরও রেহাই ছিল না। দেনদারকে সুদের সুদ তস্য সুদ দিতে হতো। জেল খাটবার সময় দেনদারের আত্মীয় স্বজন বা অন্য কেউ দেনার টাকা শোধ করে দিলে দেনদার জেল থেকে ছাড়া পেতো। মুর্শিদাবাদ জেলার ধনবান মানুষ বিশেষ করে আজিমগঞ্জ বালুচরের সঙ্গতিসম্পন্ন জৈন সম্প্রদায়ের অনেক কোম্পানি সরকারে কিছু টাকা জমা দিয়ে কতকগুলি দেনদারকে প্রতি বছর ফাটক থেকে মুক্তি দেওয়াতেন এবং পূণ্যার্জন করতেন। সেই কারণে জেল বিভাগ বিচার বিভাগের অধীনে ছিল।

কালেক্টর হ্যারিংটন সাহেব ১৭৯৩ সালের বিচার বিভাগের ব্যয়বরাদ্দে তাই জেল বিভাগের খরচও ধরেছিলেন। মুর্শিদাবাদের জেল বিভাগের কর্তা ছিল মাসিক ২৫ টাকা বেতনের একজন মীর্দা এবং তার অধীনে ত্রিশজন বরকন্দাজ। তাদের প্রত্যেকের বেতন মাসে তিন টাকা। তা ছাড়া ছিল একজন ২০ টাকা বেতনের কর্মচারী বরকন্দাজদের ক্যাপ্টেনের মত। আর ছিল মাসিক চার টাকা বেতনের একজন জল্লাদ এবং আরও দু'জন যারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের লোহার দাণ্ডা-বেড়ী পরিয়ে দিতো। কোতায়ালী সমেত বিচার বিভাগ চালাতে মাসে খরচ হতো ৪,৫৫৯ সিক্কা টাকা এবং স্যার জেমস হ্যারিংটনের এই টাকা মাসিক বরাদ্দ করে আদেশ দেন রেভেনিউ বোর্ডের তৎকালীন সেক্রেটারি মিঃ ই এইচ বার্খো।

১৭৭৫ সালে সদর ফৌজদারী আদালত মুর্শিদাবাদে আসার পরে আঠার বছর এখানে ছিল। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে সদর ফৌজদারী আদালত শেষবারের মতো মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরিয়ে দেন। ফৌজদারী বিচারের দায়িত্ব গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিল নিজেদের হাতে নিলেন এবং তাঁদের সাহায্য করতেন একজন চিফ ইণ্ডিয়ান ল-অফিসার। সদর ফৌজদার আদালত সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে মিশে গেল এবং তিন সুবার জন্যে চারটি কোর্ট-অব-সার্কিট প্রথমে বসানো হলো। পরে আরও দুটি সার্কিট কোর্ট উত্তর প্রদেশে চালু করা হয়েছিল। ন্যায় বিচারের সুযোগ যাতে প্রজা-সাধারণের সকলেই পায়, কোম্পানি সরকার সেদিকে দৃষ্টি রাখতেন। ১৮১৯ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' খবর বেরিয়েছিল ঃ

ইংলণ্ডীয়দের অধিকৃত নানাদেশের বিচার স্থান ঃ

এই হিন্দুস্তান ইংলণ্ডিয়েরদের অধীন হওয়াতে বিচারস্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারসথান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌরাত্ম হইলে তন্নিবারনার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপিল আছে কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে পাটনা ও বারানস ও বারলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এই দুই প্রকার বিভক্ত আছে। ... মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচারস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতী মুগের ও দিনাজপুর ও দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুর্শিদাবাদ ও মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী প্রদেশ ও পুরনিয়া রাজসাহী ও রঙ্গপুর দুই। ...

মুরশিদাবাদ কোর্ট-অব-আপীলের অধীনে রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহীর সঙ্গে মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও বীরভূমের কোর্ট-কাছারীগুলিও ছিল। ১৭৯১-৯৩ সালের মধ্যে এই সব জেলায় চৌকি কোর্ট ও এলাকা কোর্ট বহু সংখ্যায় স্থাপিত হয়েছিল। এই সব কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল করার সুযোগ প্রজা সাধারণকে দেওয়ার জন্যে কোর্ট-অব-আপিল স্থাপিত হয় এবং সিনিয়র কভেন্যান্টেড সার্ভিসের ইংরেজ জজেরা আপিল শুনতেন। প্রত্যেক আপিল কোর্টে তিনজন করে বিচারক থাকতেন। কলকাতার সদর আদালতের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুর্শিদাবাদের আপিল কোর্ট।

পুরানো রেকর্ড পত্রে দেখেছি মুর্শিদাবাদের সার্কিট কোর্ট-অব-আপিলের প্রতি মাসে এসট্যাব্লিশমেন্ট খরচ কত ছিল। তিন জন ইংরেজ জজের মধ্যে প্রথম জজের বার্ষিক বেতন ছিল ৪৫,০০০ সিক্কা টাকা অর্থাৎ মাসিক ৩৭৫০ টাকা। দ্বিতীয় জজ পেতেন বছরে ৪০,০০০ সিক্কা টাকা এবং তৃতীয় জজ পেতেন ৩৫,০০০ সিক্কা টাকা অর্থাৎ ২৯১৬ টাকা ১০ আনা ৮ পাই। তা ছাড়া সার্কিট কোর্টে আরও চার জন্য ইউরোপীয়ান অফিসার ছিলেন— রেজিস্ট্রার মাসিক বেতন ১,০০০ টাকা, এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার বেতন ৪০০ টাকা এবং দুজন পর্তুগীজ রাইটার প্রত্যেকে মাসে ৭০ টাকা মাইনে পেতেন। এটা ভুললে চলবে না কোম্পানির আমলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সব ইংরেজ ও ইউরোপীয় ভারতে আসতেন টাকা রোজগার করতে। কাজেই আপিল কোর্টে জজদের বেতন তাঁদের মর্যাদার মতই হতো। তবে সিনিয়ার সিভিল সার্ভেন্ট ছাড়া কাউকে সার্কিট কোর্টের ফার্স্ট জজ করা হতো না।

তবে দেশীয় কর্মচারী না থাকলে সার্কিট কোর্ট চলবে কি করে? তার হিসেবও পুরানো রেকর্ডে পাওয়া গিয়েছে। নবাব নাজিমের যে বাড়িতে সার্কিট কোর্ট বসতো, ফেল্ডলবাগের সেই বাড়ির ভাড়া মাসে ১৫০ টাকা কোম্পানি সরকার দিতেন। কাগজ কলম কালির খরচ হতো মাসে বিশ টাকা। আর নেটিভ অফিসার বা দেশীয় কর্মচারী ছিলেন ঃ

১ জন	কাজি (cauzey)	বেতন ২০০ টাকা
১ জন	মুফতি	বেতন ২০০ টাকা
১ জন	পণ্ডিত	বেতন ১০০ টাকা
১ জন	সেরিস্তাদার	বেতন ১০০ টাকা
১ জন	নেটিভ রাইটার	বেতন ৩০ টাকা
২ জন	মুনসী ৫০ টাকা হিসেবে	বেতন ১০০ টাকা
৪ জন	মোহরী ২৫ টাকা হিসেবে	বেতন ১০০ টাকা
২ জন	মোহরী ২০ টাকা হিসেবে	বেতন ৪০ টাকা
১ জন	নাজির	বেতন ২০ টাকা
২০ জন	পেয়াদা ৪ টাকা হিসেবে	বেতন ৮০ টাকা
২ জন	মোল্লার কেরানি ৮টাকা হিসেবে	বেতন ১৬ টাকা
২ জন	গঙ্গাজল ব্রাহ্মণ ৬ টাকা হিসেবে	বেতন ১২ টাকা
১ জন	নায়েব	বেতন ১০ টাকা

তাছাড়া ভিস্তি ও মেথর ২ জন করে ছিল। প্রতি মাসে মুর্শিদাবাদ সার্কিট কোর্টের জন্য খরচ বরাদ্দ ছিল ১২,৭৩২ সিক্কা টাকা এবং তার মধ্যে ১১,৫০০ টাকা পেতেন ইংরেজ জজ, রেজিস্ট্রার প্রভৃতি। আর বাকি ১,২৩২ টাকা বেতন হিসেবে দেওয়া হতো ৪৩ জন দেশীয় কর্মচারীদের।

১৮৩০ সাল পর্যন্ত এইভাবেই সেকালের কোর্ট কাছারী চলেছিল। ১৮৩০ সালে সুপ্রিম

কোর্টের জজ ছিলেন তিন জন। তাঁরা প্রত্যেকে বছরে বেতন পেতেন ৫০,০০০ সিক্কা টাকা। ১৮৩৪ সালে সুপ্রিম কোর্টে আর একজন জজ নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সেই কারণে জজদের বেতনের পরিবর্তন করা হয়েছিল। চীফ জাস্টিসের বেতন ৫০,০০০ টাকা রেখে, অপর তিনজন জজের বেতন কমিয়ে বার্ষিক ৪৬,০০০ টাকা করা হয়। কোম্পানির আমলে বিচারকদের যে বেতন দেওয়া হতো বর্তমানের হিসেবে সেই বেতন কয়েক লক্ষ টাকা যে হবেই তাতে নিঃসন্দেহ। সেকালের কোর্ট কাছারিতে ইংরেজদের সঙ্গে দেশীয় কর্মচারীদের বেতনের যে ছিল আকাশ পাতাল ফারাক, সেটাও লক্ষণীয়।

বেভারিজ সাহেব তাঁর মুর্শিদাবাদের পুরানো জায়গা প্রবন্ধে লিখেছেন যে কোর্ট অব আপিলের মুর্শিদাবাদ সার্কিটের জজেরা থাকতেন নিয়াদবাগে এবং সার্কিট কোর্ট বসতো আফজলবাগে। স্যার টমাস প্যাটল ছিলেন আপিল কোর্টের জজ এবং নিজামতে গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট। তিনি সর্বদা চার ঘোড়ার গাড়িতে চলাফেরা করতেন। নবাব নাজিমের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আগে পিছে ঘোড়া সওয়ার ছাড়াও সাহেবের মাথায় মখমলের ছাতা। জজের মান-খাতির রাখতে এসকলের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ইংরেজ গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট বা প্রতিনিধির ইজ্জত তো কম নয়। নবাব নাজিমের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তাঁদের চলতে হতো সেকালে। নইলে জনসাধারণের চোখে তাদের ছোট হতে হতো।

১৮০৭ সালে মুর্শিদাবাদের সার্কিট কোর্টের সিনিয়ার জজ ছিলেন স্যার টমাস প্যাটল, দ্বিতীয় জজ ছিলেন রিচার্ড রক এবং তৃতীয় জজ ছিলেন ক্রিষ্টোফার ওল্ডফীল্ড। কোম্পানির আমলের সিভিল সারভেণ্টদের কালেক্টর বা জজের আসনে বসানো হতো গভর্ণর জেনারেলের হুকুমে। ওল্ডফীল্ড সাহেব ১৭৯৩ থেকে পাঁচ বছর ছিলেন মুর্শিদাবাদের কালেক্টর। পরে তিনি সার্কিট কোর্টের জজ হয়েছিলেন। এই প্রথা কোম্পানির আমলে বরাবর চালু ছিল। স্যার টমাস প্যাটল এবং রিচার্ড রক নিজামতে গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টও ছিলেন। পরবর্তীকালে স্যার ফ্রান্সিস ম্যাগনিয়াক, উইলিয়ম লক প্রভৃতি জজ সাহেবরাও নিজামতের এজেন্ট হয়েছিলেন। সার্কিট কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশের রাজত্বকালে। কিন্তু সে সময়ে ইংরেজ সরকারের আইন তেমন পাকাপাকিভাবে তৈরি হয়নি। তবে আইনের শাসন প্রচলিত করার জন্যে কোম্পানি সরকার সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সত্যি করে বলতে গেলে আইনের শাসনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ইংরেজ সরকারের প্রায় ষাট বছর লেগেছিল এবং ১৭৯৩ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত কোর্ট কাছারি পরিচালনা করার ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৫১ সালের আগে জুডিসিয়াল সিস্টেম সঠিক রূপ পায়নি। তখন পর্যন্ত জেলাগুলি ছিল পরগণাতে বিভক্ত। থানাওয়ারী জেলা ভাগের সময় প্রত্যেক জেলার ভিন্নরূপ ছিল। তখন মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমার মধ্যে রামপুরহাট, জঙ্গিপুর, গোয়াস, হরিহরপাড়া, জেমুয়াকান্দি, ডোমকল, আজিমগঞ্জ এবং করিমপুর ছিল। মুর্শিদাবাদ সিটি ছিল উত্তর ও দক্ষিণ দুটি সাবডিভিশনে বিভক্ত। বীরভূম জেলার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ সাঁওতাল পরগণা ছিল। রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলা আরও বড় ছিল। জেলার সীমান্ত ঠিক করতে রদবদল ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত চলে। তখনকার দিনে প্রত্যেক সাবডিভিশনে মুনসেফী কোর্ট ছিল দেওয়ানী মামলার জন্যে আর ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে গোয়াস, চোঁয়া (হরিহরপাড়া), ডোমকল প্রভৃতি জায়গায় মুনসেফ কোর্ট তুলে দেওয়া হয় এবং দুটির বদলে ৫, ৬টি থানা নিয়ে নতুনভাবে মহকুমা গঠন করা হয়েছিল।

পুরোনো ডিরেক্টরি ও নথীপত্রে দেখা যায় ১৮৭০-৭৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল রাজশাহী

ডিভিশনে এবং ডিভিশনের কমিশনারের অফিস ছিল গোরাবাজারে বর্তমান কুমার হোস্টেলে। কুমার হোস্টেলে অনেক কাল ধরে সার্কিট হাউসও ছিল। তার আশে পাশে আরও কিছু কুঠি ছিল, যার দু'চারটে এখনও বর্তমান। ১৮৭৫ সালে রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনার ছিলেন মিঃ আর ডবলু মোলোনী। তিনি তার আগে ১৮৬৬ সালে ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলা জজ। বেইনব্রিজ সাহেব ১৮৬৫ সালে ছিলেন এই জেলার কালেক্টর আর ১৮৭৩ সালে তিনি ছিলেন জেলা জজ। এন্টনী বেইনব্রিজের পরে মুর্শিদাবাদের জেলা জজ হয়েছিলেন মিঃ জন কেলোড। মিঃ জন মরিস বোফোর্ট এই জেলাতে প্রথমে কালেক্টর এবং পরে ১৮৭২ সালে জেলা জজ হয়েছিলেন। আরও পরে মিঃ বেইনব্রিজ, মিঃ বিজেল ও মিঃ বোফোর্ট হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। কোম্পানির আমল থেকে মুর্শিদাবাদের বহু আই সি এস জেলা জজ কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন।

কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট ১৭৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিঃ বুসিয়ে (Mr. Bouchier) নামে এক সওদাগরের বাড়িতে। তখন এই বাড়িকে কোর্ট হাউস বলা হতো। বর্তমান ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ছিল সুপ্রিম কোর্ট। ১৭৯২ সালে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়েছিল। তারও অনেক বছর পরে ১৮৭২ সালে পুরোনো বাড়ি ভেঙে সেখানে বর্তমান হাইকোর্ট নির্মাণ করা হয়। ১৭৮৭ সালে শিল্পী ড্যানিয়েল পুরোনো সুপ্রিম কোর্টের একখানি ছবি এঁকেছিলেন। তাতে দেখা যায় দোতলা কোর্ট হাউসের সামনে চব্বিশটা থাম ছিল। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের মত সব জেলাতেও কোম্পানির রাজত্বের প্রথম দিকে কোর্ট কাছারি ভাড়া বাড়িতে বসতো কিন্তু বহরমপুর মুর্শিদাবাদে সাহেবদের কুঠি, সরকারি কুঠি এবং নবাবদের পাকাবাড়ির অভাব ছিল না। বর্তমান কুমার হোস্টেল ছিল আগে সার্কিট হাউস এবং এই বাড়িতে কোর্ট কাছারি ও পরবর্তীকালে বহরমপুর কলেজ চলতো। তারপরে জেলার কোর্ট কাছারি সরিয়ে আনা হয় বর্তমান জজ কোর্ট বিল্ডিংসগুলিতে। গোড়ার দিকে এখানেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্টগুলি ছিল। বহরমপুর থেকে সৈন্যাবাস তুলে দেবার পরে ফৌজদারী কোর্ট জজ কোর্ট কম্পাউণ্ড থেকে সরিয়ে আনা হয়। এক সময় জজ কোর্টের পশ্চিমে পার্ভিস সাহেবের কুঠিতে বহরমপুর কলেজ বসতো। পরে এই কুঠি লণ্ডন মিশন কিনে নিয়েছিল। তখনকার দিনে জেলার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট একজনই থাকতেন। (বর্তমান জজ কোর্টের উত্তর পূর্বদিকে এক সময় জেলখানা ছিল। পরে জেলখানা মাদাপুরে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেকালে বিচার বিভাগের হাতে জেল পরিচালনার ভার ছিল। প্রবীণ সিভিল সার্ভেন্টদের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ করে পাঠানো হতো এবং তাঁদের অনেকেই হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। কোম্পানির আমলে জজ সাহেবদের হিন্দু আইন বুঝাবার জন্যে যেমন জজ পণ্ডিত থাকতেন তেমনি শরীয়তী বিধান ব্যাখ্যা করতে মৌলভীও থাকতেন।) জমিদারদের আম-মোক্তারেরা আইনের পাঠ নিয়ে শুধুই মোক্তার হয়ে গেলেন। আম মোক্তার কথাটির অর্থ প্রধান মোক্তার আর বাদী বা বিবাদির পক্ষে দাঁড়িয়ে যাঁরা ফৌজদারী কোর্টে সওয়াল জবাব করেন তখন থেকে তাঁরা শুধুই মোক্তার। দেওয়ানী আদালতে মোক্তারেরা ছিলেন উকিলের সাহায্যকারী। ইংরেজ কোম্পানি আইন করে কাজিদের বেকার করে দিলেও উকিল ও মোক্তারদের রেখেছিল। শেঠদের মামলার কাগজপত্রে দেখেছি জজ সাহেবকে বিক্রম সংবৎ বুঝাতে ভকিল মোক্তারদের সাহায্য চাইছেন। ইংরেজ কোম্পানির আইনের শাসন তখন মাত্র রূপ নিচ্ছে।

চৌকি ও এলাকা কোর্ট তুলে দিয়ে কোম্পানির আমলেই মহকুমা মুনসেফ ও ফৌজদারী কোর্ট চালু হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ছিল। তখন পুলিশ ছিল না, ছিল বরকন্দাজ। পেয়াদা পিয়নের বদলে ছিল হরকরা। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত কোম্পানি আমলের কোর্ট কাছারীর বেশ কিছু দলিলপত্র ঘেঁটেছি। বাংলা দলিলে সর্বদা লেখা

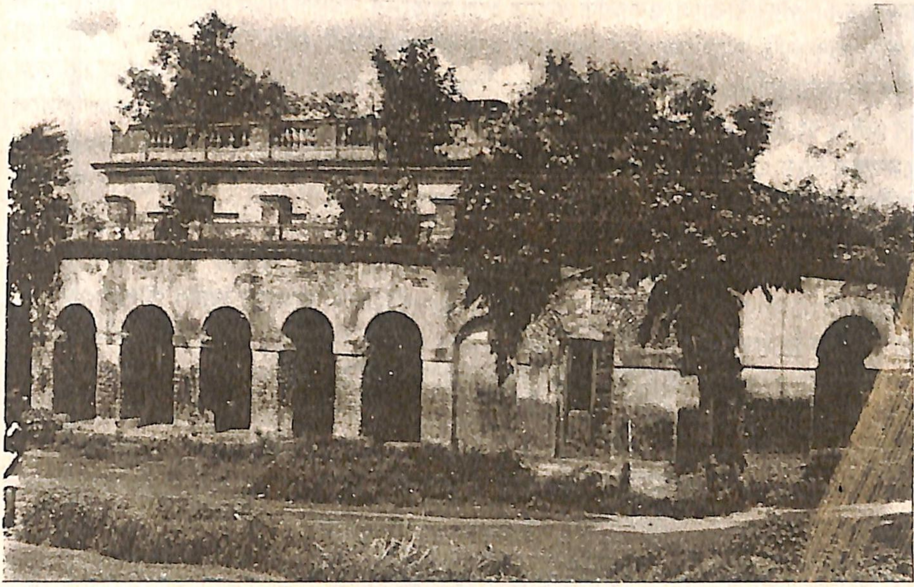
হতো মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু অমুক ডেপুটি কালেক্টর বাহাদুর। আবার ইংরেজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলে বলা হতো ডেপুটি কালেক্টর সাহেব বাহাদুর। তেমনি সেকালের পারশী দলিলেও লম্বা চওড়া ভণিতার সঙ্গে লেখা হতো প্রশংসিত নওয়াব কালেক্টর কিম্বা নওয়াব জজ সাহেব বাহাদুর।

১৮৪৪ সালে বোফোর্ট সাহেব 'গাইড টু দি ক্রিমিন্যাল ল অব দিস প্রেসিডেন্সী' নামে একখানি বই ছাপিয়েছিলেন। তাতে কোম্পানি সরকার এযাবৎ যে সব রেগুলেশন ও এ্যাক্ট করেছিলেন তা একত্রিত করে ইংরাজি আইনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তার আগে মার্শম্যান সাহেবের একখানি 'গাইড টু দি সিভিল ল' বেরিয়েছিল। তখন পর্যন্ত সরকারি সার্কুলার অর্ডার দিয়ে ফৌজদারি কোর্টের কাজ চলতো। আর এই গাইড পড়ে এদেশের আইন সম্পর্কে শিক্ষিত লোকে জ্ঞান লাভ করতেন। এক অধ্যায়ে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, ভকিল বা মোখতার কার কি ডিউটি বা ক্ষমতা তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিচার বিভাগের অধীনে তখন পুলিশ ও জেল বিভাগ থাকায় সেইসব বিভাগের অফিসারদের সম্পর্কেও এই বইয়ে আলোচনা আছে। তখনকার দিনে জমিদারদের পুলিশকে সাহায্য করতে হতো। নইলে আইনগত ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট নিতেন। তখনও কোম্পানি সরকার আইনগত শাসনের পাকা ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি।

১৮৬১ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হাইকোর্ট স্থাপিত হবার পরে সব সুপ্রিম কোর্ট ও সদর কোর্ট হাইকোর্টের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ইংরেজ সরকার পাকাপাকিভাবে আইনের শাসন চালু করেন। হাইকোর্টের জজদের মোট সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ সিভিল সার্ভেন্ট এবং বাকি দু'ভাগ ইংলণ্ডের ব্যারিস্টার, হাইকোর্টের এডভোকেট এবং সাবর্ডিনেট জুডিসিয়ারী থেকে মনোনীত করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস পদে নিয়োগ করা হতে থাকে ইংলণ্ডের ব্যারিস্টার বা স্কটল্যাণ্ডের এডভোকেটদের মধ্যে থেকে। ১৯১১ সালে ইণ্ডিয়ান হাইকোর্ট এ্যাক্ট চালু হলে ভারতের লাহোর ও পাটনা এবং বর্মার রেঙ্গুনে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়েছিল। ভারতবাসীরা হাইকোর্টের সিভিলিয়ান জজ পছন্দ করতো না। কিন্তু জেলায় জেলায় সিভিলিয়ানেরাই জেলা জজের কাজ করতেন। তাদের হাইকোর্টের জজ হবার পথ খোলাই ছিল। তবে ইংরেজ সরকার পরে প্রতি হাইকোর্টের মোট জজের তিন ভাগের এক ভাগ জজ আই সি এস থেকে রিক্রুট করার নিয়মটি পরবর্তীকালে বদলিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা জজের পদে চিরকাল আই সি এস জজেরাই নিযুক্ত হতেন। কোম্পানি রাজত্বে একই সিভিলিয়ান সাহেব একবার কালেক্টর আবার একবার জজ হয়ে আসতেন। মুর্শিদাবাদ জেলাতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত এমন অনেক সিভিলিয়ান এসেছিলেন। যাঁরা এই জেলাতে কালেক্টর ও জজ দুই পদেই ছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট প্লীডার বা সরকারি উকিলের পদ মুর্শিদাবাদে চালু হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে। ১৮৬৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত দীননাথ গাঙ্গুলী ছিলেন জেলার সরকারি উকিল। ১৮৬৬ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ছিলেন সিভিলিয়ান ডব্লু এল হীলি এবং জেলা জজ ছিলেন ই ডব্লু মলোনী। সেই বছর দীননাথ গাঙ্গুলী জেলার কালেক্টর হীলি সাহেবের কাছে ৩রা নভেম্বর যে দরখাস্ত করেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছেন ঃ

> I received my education in the Presidency college and having passed the Junior and Senior Scholarship examinations in the years 1852 and 1853. I entered the Law Department of the College, where in I studied for three years and obtained Certificate of proficiency in Law and Jurisprudence on the 29th June, 1858.
>
> I began my practice as a pleader in the Murshidabad Civil Court in February, 1857 and has been practising there for nearly eight years, a period



বর্তমান কুমার হোস্টেলের এই জরাজীর্ণ ভবনটি ১৮৭০-৭৫-এ সার্কিট কোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

which is not inadequate for acquirring sufficient exprience, which is unavoidably necessary for the very responsible post of Government Pleader. On the 26th November, 1860, I obtained the Pleader's Sunnad of the late Calcutta Sudder Court and my name was enrolled in the list of pleaders of the present High Court after the amulgamation of the former with the latter.*

নবাবী আমলে নিজামত দরবারে বিভিন্ন রাজা জমিদারের নিজস্ব ভকিলেরা থাকতেন। কোম্পানি সরকারের আমলেও ভকিল ও মোক্তারেরা মামলা লড়তেন বাদী প্রতিবাদীদের পক্ষে। সুপ্রিম কোর্টে এটর্নী ও ব্যারিস্টারেরা বিলেত থেকে প্র্যাকটিস করতে আসতেন। তাঁরা বিলেত থেকে এক গোছা পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতেন। সুপ্রিম কোর্টের জজদের কাছে ভাল প্রশংসাপত্র না দেখাতে পারলে ওকালতির অনুমতি পাবার কোনো আশা ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে ওকালতি করতে হলে সাহেবদেরও সার্টিফিকেট দেখাতে হতো। মফঃস্বলেও একই ব্যবস্থা ছিল। রাজা

✳ দীননাথবাবুর অরিজিন্যাল দরখাস্ত ও ওকালতি পাশ করার সার্টিফিকেট আমি দেখেছি। ওকালতি পাশ করার সার্টিফিকেটের সই করেছেন ১৮৫৮ সালের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাক্সন মিঃ উইলিয়াম গর্ডন ইয়ং এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ই লজ।

জমিদারদের ভকিল মোক্তারেরা জজ সাহেবের হুকুম পেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে মামলা চালাতেন। পরবর্তীকালে ওকালতি করতে হলে আইনের পরীক্ষা দিতে হতো এবং সার্টিফিকেট পেলে ওকালতি করা যেতো। মোক্তারী পরীক্ষা গভর্ণমেণ্ট প্রতি বছর নিতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরে আইনের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা হয়। উকিলেরা গ্রাজুয়েট হলে বি এল এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েট হলে পি এল হতেন। ফৌজদারী আইনের পরীক্ষায় পাশ করলে মোক্তার হওয়া যেতো। লর্ড মেকলে পিন্যাল কোড তৈরি করার পরে এই সব আইনের পাঠ ও পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। কোম্পানির আমলের ভকিল মোক্তারদের সঙ্গে ইংরেজ আমলের উকিল মোক্তারদের তাই অনেক পার্থক্য ছিল।

কোম্পানির আমলে অনেক কুঠিয়াল সাহেবকেও ম্যাজিস্ট্রেটের মত শাসনক্ষমতা দেওয়া হতো। ইংরেজ আমলে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে ফৌজদারী মামলার বিচার ব্যবস্থা শুরু হয়। প্রথমে কেবলমাত্র সাহেবদের এই বিচার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পদ দেওয়া হতো। ইংরেজ সরকার যেমন উপাধি দিতেন তেমনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পদ দিয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ইজ্জত দিতেন। কলকাতা শহরের জাস্টিস অব-দি-পীস এর মত মান খাতির ছিল অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদের। বহরমপুর, লালবাগ, কান্দি ও জঙ্গিপুর মহকুমা কোর্টে ১৮৭০ সাল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পর্যন্ত যাঁরা অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফৌজদারী মামলার বিচার করেছেন এই জেলাতে তাদের নামের তালিকা খুবই দীর্ঘ। অনেকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে নিয়মিত কোর্ট করতেন। তাঁদের মধ্যে রাজা জমিদার, ব্যবসাদার ও উকিল এ্যাডভোকেটও ছিলেন। এই জেলাতে কোম্পানির আমলের কোর্ট কাছারির কথা বলতে গিয়ে ইংরেজ রাজত্বের গোঁড়ার দিকের কোর্ট কাছারির কথাও কিছুটা বলা গেল। সিপাহী বিদ্রোহের আগে কোম্পানির কোর্ট কাছারি এইভাবেই চলতো।*

** রচনাটি রাধাররঞ্জন গুপ্ত সম্পাদিত বাংলা ১৩৮৯-এর শারদীয় জনমত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।*

লোক জীবন
লোক সাহিত্য
লোক সঙ্গীত
এবং
কারু শিল্প

মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস

নুরুল আমিন বিশ্বাস

এক

বাংলায় তথা মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের পত্তন ও বিকাশ

বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছরের এই মধ্যবর্তী কালে বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। ইখতিয়ার উদ্দিনই প্রথম বাংলায় মুসলিম ভাবানুষঙ্গে -র বিস্তার ঘটনা।[১] মুসলমান সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন প্রায় পাঁচশত বছর। মাঝখানে রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮), রাজাটোডরমল (১৫৮০-১৫৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-১৫৯৬) বাংলাদেশ রাজত্ব করেন। স্বাধীন সুলতান আমলেই সমগ্র বাংলাদেশের নাম হয়েছিল বাঙলা। বাংলায় রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিগত সময়সীমা বিভাজন করা হয়েছে এইভাবে ঃ ১২০৪-১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৩৩৮-১৫৩৮ (স্বাধীন রাজ্য); ১৫৩৮-১৫৭৬ (আফগান কর্তৃত্ব); ১৫৭৬-১৭১৭ (মুঘল সুবা); ১৭১৭-১৭৬৫ (স্বাধীন নবাব)। এরপরেই 'Islam as a political force was supplanted by the rule of the British in Bengal.'[২]

সাত শতকের প্রথমার্ধে আরব ভূমিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩৩)। এর পরেই ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য প্রসারে আরবেরা ছড়িয়ে পড়েন ভারতের ভূমধ্যসাগরে, পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূল ভূমিতে। বাংলায় তুর্কী ক্ষমতা প্রসারের আগেই চট্টগ্রামে আরব বণিকদের আগমন ঘটে। চট্টগ্রাম শহরে এখনও 'আরব কলোনী'র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই বণিকদের জাহাজেই ইসলাম প্রচারে বহু সুফী, দরবেশ, পীর আওলিয়া

১। The Oxford History of India (3rd Edition)– V.Smith.

২। Islam In Bengal – Jagadish Narayan Sarkar, 1972.

এদেশে এসে আস্তানা গেড়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। পৌরাণিক যুগের বর্ণভেদের কড়াকড়িতে নিম্নবর্ণের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন— বর্ণভেদ প্রথা, দাসপ্রথা, অস্পৃশ্যপ্রথার কারণে নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক ও মানবাধিকার ছিল না।[৩] যবন দোষে দুষ্ট অনেক হিন্দুই মধ্যযুগে জাতিচ্যুত হয়েছিলেন।[৪] এইসময়েই পীরদরবেশদের মানবসেবা, পরহিতব্রত এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামে দীক্ষিত হন। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীবিজয়ের ফলে একদিকে যেমন পীরদরবেশদের সংখ্যা বাড়ার সাথে ধর্মান্তরকরণ ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে তেমনি উচ্চপদলাভ, ব্যবসায় সুবিধা, সামাজিক মর্যাদার লোভ এবং অনেকাংশে তরবারির ভয়েও অনেকে মুসলমান হতে থাকেন।[৫] এর শেষ দিকে মারাঠা, আমেঠি, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালিদের দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার সন্ধানে একটি জনস্রোত বাংলায় এসে স্থানীয় নারীপুরুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৬]

ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে অমর্ত্য সেন বলেছেন ঃ "প্রাক মুসলিম ভারতও নিছক হিন্দু ভারত ছিল না। বস্তুত সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য বিষয় দিয়েই শুরু করা যেতে পারে, প্রাক মুসলিম পর্বের মহত্তম ভারতীয় সম্রাট ছিলেন একজন বৌদ্ধ, অশোক এবং রাজা হর্ষসহ সেখানে ছিলেন অপরাপর মহান অহিন্দু সম্রাট। এমনকি যখন গজনির সুলতান মাহমুদ ভারতে আক্রমণ পরিচালনা করেছেন, পূর্ব ভারতে তখন বৌদ্ধ পাল রাজারা দৃঢ়ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বস্তুত বাংলা খুব দ্রুতই বৌদ্ধ শাসন থেকে মুসলিম শাসনে রূপান্তরিত হয়, মাঝখানে ছিল স্বল্প সময়ের হিন্দু রাজত্ব— ভাগ্য বিড়ম্বিত সেন রাজাদের শাসন। ... বস্তুত সপ্তম শতাব্দীতে ব্রিটেনে খ্রীষ্টধর্ম যখন ভিত্তি অর্জন করতে শুরু করেছিল, তখন অন্তত তিনশত বছর ধরে নিশ্চিন্তভাবেই— চতুর্থ শতক থেকে ভারত ছিল বসতিস্থাপনকারী বড়ো আকারের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। ইহুদীরাও ভারতে বসতি গড়েছিল সত্যিকারভাবে জেরুজালেমের পতনের পর থেকেই। এবং স্মরণাতীত দীর্ঘকাল ধরে ভারতে গভীরভাবে শেকড় প্রোথিত করেছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। মুসলিম আগমণ এই বর্ণচ্ছটাকে বিস্তৃত করেছে মাত্র। আরেকটি দিক উল্লেখ্য, ভারতে ব্রিটিশ শাসন, যেখানে শাসকরা শাসিত থেকে ছিল আলাদা, তা থেকে ভিন্নতরভাবে মুসলিম শাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানদের উপস্থিতি। দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ বরণ করে ইসলামকে, সেটা এতটাই বড়ো যে সমসাময়িক বিশ্বের চারটি বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর তিনটেই উপমহাদেশে অবস্থিত, ভারত, পাকিস্তান

৩। সংস্কৃতির রূপান্তর— গোপাল হালদার— ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী কলিকাতা, ১৯৬৫ "বৈদিক যুগে বর্ণভেদের বাড়াবাড়ি ছিল না। পৌরাণিক যুগে বর্ণভেদের উপর কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। 'মনুসংহিতায়' শুদ্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা অবজ্ঞা এমনকি যুদ্ধ করার কথা বহুজায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' আছে যে, প্রভু অবাধ্য দাশশুদ্রকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারেন। নিম্নবর্ণের লোকের এবং বৌদ্ধশ্রমণের দর্শনে, স্পর্শে পাপ-একথা প্রচার করা হত।"

৪। হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য—ডঃ অতুল সুর-সাহিত্যলোক, ১৯৮১। "মধ্যযুগের সমাজে যবন দোষের জন্য অনেকে জাত হারান। যারা যবনদের সংস্পর্শে আসত, তাদেরইযবনদোষ ঘটত। যবনদোষ তখনই ঘটত যখন হিন্দু নারী মুসলমান, মগ ও পোর্তুগীজদের কর্তৃক ধর্ষিতা হত, বা পুরুষ রা তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত। গোড়ার দিকে সমাজের বিধানকর্তারা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে যবনদোষদুষ্ট পরিবারদের জাতিচ্যুত করত।"

৫। History of Bengal – Jadunath Sarkar University of Dacca.

৬। Social and Caltural History of Bengal – Vol. 1, 1200-1576.

আর বাংলাদেশ।''[৭]

বাংলায় মুসলমানদের কুলপরিচিতি ও বংশবৃদ্ধি প্রসঙ্গে গ্রিয়ার্সন, হাণ্টার, ডান্টল, উইলিয়ম কুক, জেমস ওয়াইজ, হাবার্ট, রিজলি, জেমস লঙ প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেসব মত পোষণ করেছেন তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতার কারণে ও পীর দরবেশদের প্রভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন।[৮] কিন্তু মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর 'হাকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালাই' (১৮৯১)তে একথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর লোক।[৯] ফজলে রাব্বির এই অভিমত সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। মুহম্মদ আবদুর রহিম অবশ্য বলেছেন যে বাংলায় আগত বিদেশী মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা বেশি।[১০] ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলাভিত্তিক লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ঢাকা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা রঙপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাটনা, যশোর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের হার অনেক বেশি।[১১] অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির তীব্র দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে বেশ কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ নেপাল-তিব্বতে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।[১২] ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়াতে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে টমাস ওয়াকার আরনল্ড

Vol. II, 1576-1757)– Muhammad Abdur Rahim, Karachi, 1961.

৭। বহুপ্রভাবের মিলিত ফসল—অমর্ত্য সেন (মুসলিম সমাজ এবং এই সময়—প্রথম খণ্ড—সম্পাদনা—মইনুল হাসান) ৮। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা— ড. ওয়াফিল আহমেদ।

i) Languistic Survey of India (5 vols)– Grierson, ii) Annals of Rural Bengal (1868). The Indian Musalman Hunter, iii) Descriptive Ethnology of Bengal (1872).

iv) The Races, castes and Tribes of Eastern Bengal (1883)– Wise.

v) The Popular Religion and Folklore of Northern India(1893)– Crooke.

৯। The origin of the Musalmans of Bengal– Khon. Fuzli Rubbee. (Calcutta-1895). খোন্দকার ফজলে রাব্বির যুক্তি গুলি ছিল এরূপ ঃ— ১) বাংলা বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল। ২) মুসলমান শাসকগণ অন্য অঞ্চলের স্বধর্মীদের আহ্বান করেছেন; সৈয়দ, মোঘল, পাঠানদের চাকুরী দিয়েছেন শিক্ষিত, ধার্মিক, নিঃস্ব ব্যক্তিদের করমুক্ত, ভূমি দিয়েছেন বসবাস করার জন্য। গিয়াসুদ্দিন (১২১৪-২৭), নাসিরুদ্দিন (১৪২৬-৫৭), হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫২১) সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বাংলায় আসতে এবং বসতি করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ৩) বাংলার শাসকগনের সৈন্যবাহিনী বাইরের মুসলমান দ্বারা গঠিত; তাদের অধিকাংশ এদেশে থেকে গেছে। ৪) উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাস্তুত্যাগী ও পলাতকদের আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ। বিশেষ করে, স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছর রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৫৭৬) এ ধরনের রাজনৈতিক আশ্রয় অনেক ছিল। (ঘোরী বংশের রাজত্বকালে এবং মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পরিবার বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের রাজত্বকালেও অনেক ধর্মীয় নেতা বাংলায় প্রেরিত হয়েছেন। ৫) অনেক ব্যক্তি বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য ও ভূমির উর্বরতায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে।

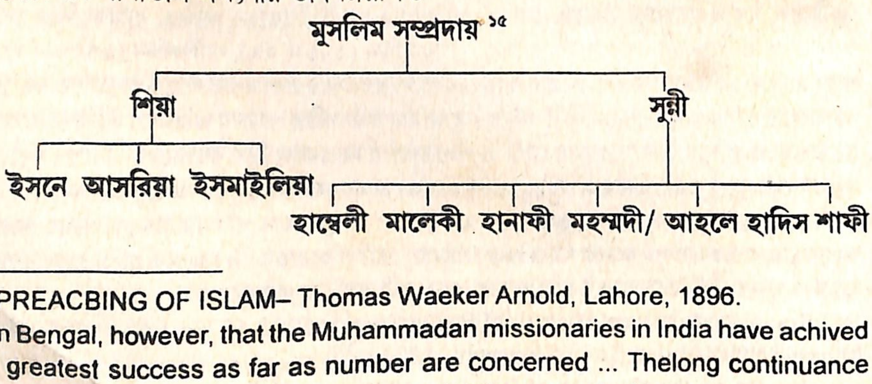
১০। Social and cultural History of Bengal (vol.I, 1200-1576), vol. II (1576-1757)– Murshidabad Abdur Rahim Karachi, 1961.

১১। Report on the Sensus of Bengal– 1872

১২। বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজ মত জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫)।

পীরদরবেশ, অলি আউলিয়াদের প্রভাব ও প্রচারকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৩] মুহাম্মদ আবদুর রহিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমানের ৩০ ভাগ বহিরাগত বংশধর, ৭০ ভাগ স্থানীয় হিন্দু বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত। তিনি মনে করেন বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, প্রভৃতি প্রথার কারণে দ্রুত বংশবৃদ্ধির দ্বারা বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা ৩০ ভাগে দাঁড়ায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যে প্রায় সমপরিমাণ অভিজাত ও নিম্নবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর আছে।[১৪] সুতরাং বাংলায় ইসলামের প্রচার ও মুসলমান সমাজের পত্তন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান; ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাত মিশ্ররক্ত ধারার মানুষ— এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বৃদ্ধির কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে ইসলামের প্রথম সূত্রপাত ঘটে অখণ্ড বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আরব বণিকদের আগমনের ফলে। বাণিজ্যসূত্রে এদেশে এসে তাঁরা বসবাস শুরু করেন এবং স্থানীয় মানুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এছাড়া, সমাজের নিম্নবর্গের থেকে ব্যাপক হারে মুসলমান হওয়ার প্রবণতা শুরু হয় পারস্য থেকে আগত সুফী এবং পীর ফকিরদের প্রভাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্নিহিত জাতপাতের বৈষম্য, অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি ঘৃণাবোধ, বৌদ্ধ পীড়ন এবং মোগল আধিপত্যের ফলে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের যে উদার মানবতাবাদ ও ভ্রাতৃত্বের আকর্ষণে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং যে মানবতাবাদ ও ভ্রাতৃত্বের সুবাদে আজও ইসলামের যে জনপ্রিয়তা আর গভীরে এখনও মুসলমান সমাজে আত্মগোপন করে আছে বর্ণবৈষম্যবাদ। এই বর্ণবৈষম্যবাদকে গোষ্ঠীবিভাজন বললেই হয়ত তা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। মুসলিমদের মধ্যে প্রধানত দুটি গোষ্ঠী— শিয়া ও সুন্নি। মুসলিম বিশ্বে সুন্নি নব্বই শতাংশ। ইরাণই একমাত্র শিয়া প্রধান রাষ্ট্র। এছাড়া বেশ কিছু শিয়া রয়েছে ইরাক, শিরিয়া, ইয়েমেন, লেবানন, পূর্ব আফ্রিকা, পাকিস্তান এবং ভারতেও। পারিবারিক উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে জনমতের ভিত্তিতে হজরত মহম্মদের পরবর্তী নেতা বা খলিফা নিযুক্ত হন আবুবকর। এভাবেই হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত আলি ছিলেন চতুর্থ খলিফা। শিয়ারা হজরত আলির পূর্ববর্তী তিন খলিফার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শিয়া সুন্নির প্রধান বিভেদ এখানেই। মুসলমান সমাজের এই শিয়া-সুন্নি থেকে যে শাখাগুলি লক্ষ্যণীয় তা নিম্নরূপ ঃ



১৩। PREACBING OF ISLAM– Thomas Waeker Arnold, Lahore, 1896.
It is in Bengal, however, that the Muhammadan missionaries in India have achived their greatest success as far as number are concerned ... Thelong continuance of Muhammaden Rule would naturally assist the spread of Islam.

১৪। Social and cultural History Bengal (vol.I) Muhammad Abdur Rahim.

১৫। মুসলিম এবং এই সমাজ (২য় খণ্ড) / সম্পাদনা ঃ মইনুল হাসান

ভারতের লখনউ যখন নবাবদের শাসনে ছিল তখন থেকেই লখনউতে বহু সংখ্যক শিয়ার বসতি। শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ গদিচ্যুত হয়ে শেষজীবন কলকাতার মেটিয়াব্রুজে কাটান। কলকাতাতেই নির্বাসন ভোগ করেন টিপু সুলতান। এঁরা সকলেই ইরাণী বংশজাত এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। মুর্শিদাবাদের নবাবরাও তাই। কলকাতা এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে যে সংখ্যালঘু শিয়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা অবশ্যই নবাবদের অবদান। পশ্চিমবঙ্গে সুন্নিদের হানাফী মতাবলম্বীরাই সংখ্যায় অধিক। হানাফিদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা — দেওবন্দ এবং ব্রেলভি। ইসলামি বিদ্যাচর্চার একটি বড় কেন্দ্র দেওবন্দ। আসলে এটি একটি মাদ্রাসা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদাসম্পন্ন। বিদেশ থেকেও বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসেন। দেওবন্দিরা প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে এঁদের অবদান স্বীকৃত। অন্যদিকে সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভির অনুগামীরা ব্রেলভি। এঁরা অনেকটাই রক্ষণশীল। ইতিহাস স্বীকৃত ওয়াহবি আন্দোলনের ওয়াহবিও এক স্বতন্ত্র মত। এঁরা পীর পরিপন্থি। ওয়াহবিদেরই একটি শাখা আহলে হাদিশ। এঁরা হানাফী মত থেকে পৃথক শাফি মতের অনুসারী। মুর্শিদাবাদে হানাফী এবং আহলে হাদিশ দুপন্থারই মানুষ বাস করেন। বেদবিরোধী গ্রামীণ লোকায়ত সমাজের যে দর্শন আমরা বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সমজিয়াদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম মুসলিম সমাজেও সেই সহজিয়া পন্থার দেখা পাই সুফীবাদের মধ্যে। শরীয়তপন্থী কঠোর মোল্লাতন্ত্রের পরিপন্থি এই সুফীবাদ। কিন্তু সুফীদর্শনের এই সহজিয়াপন্থাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের ধর্মান্তরিত মুসলমান ও কৃষক শ্রেণী। মধ্যযুগের বাংলা সমাজে সুফী দর্শনের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের হাত ধরেই বাংলায় ইসলামের এই প্রসার সম্ভব হয়েছিল। সুফীদের মধ্যেও দুটি ভাগ লক্ষ্যণীয় (ক) শরা (খ) বে-শরা। যাঁরা শরীয়ত মান্য করেন তাঁরা শরা। অন্যরা বে-শরা। এই বেশরা সুফীরা হলেন ফকির দরবেশ এবং বাউল সম্প্রদায়। সুফীদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। এগুলি এক একটি তরিকা বা পন্থা। এই পন্থাগুলি এক একটি মুর্শিদ বা গুরুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই পন্থাগুলি হল— কাদেরিয়া, চিশতিয়া, শহারাবর্দি ইত্যাদি। কাদেরিয়া গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বাগদাদের জনপ্রিয় সম্মানিত পীর আব্দুল কাদের জিলানি। আজমিরে যে দরগা আজ ট্যুরিজমের একটি আকর্ষক স্পট হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই দরগা হল খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির। এই পীরসাহেবের নামানুসারে তাঁর অনুগামীরা চিশতিয়া বলে পরিচিত। শেখ সাহাবুদ্দিন সুহরাবর্দির অনুগামীরা হলেন সুহরাবর্দি। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হোসেন শাহিদ সুহরাবর্দি তাঁরই বংশধর। এছাড়াও রয়েছেন আহমেদীয়া পন্থীর মানুষ। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই গোষ্ঠীর বাস আছে।[১৬] সম্প্রতি পাকিস্তান তাঁদের অমুসলমান বলে ঘোষণা করেছে। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার হড়হড়ি গ্রামে আহমেদিয়া পন্থীর একটি পরিবার আছে যাঁদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

মুসলমান সমাজে রাষ্ট্র কাঠামোর মূল নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তার ধর্মে। নীতিগতভাবে ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন মানবতাবাদের ভিত্তিতে সমাজগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু আদৌ তা বাস্তাবয়িত হয়নি। আরবে প্রথম চারজন খলিফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হলেও পরবর্তীতে বংশগত পরম্পরায় রাজতন্ত্র প্রথায় উম্মিয়া, আব্বাসীয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতেও খিলজী, তুঘলক, ঘোরী, মামলুক, শূর, মোগল প্রভৃতি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৭] ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চতুর্বর্ণের যে বর্ণবৈষম্যবাদ পরিলক্ষিত হয়

১৬। মুসলিম এবং এই সমাজ (২য় খণ্ড) সম্পাদক মইনুল হাসান।

১৭। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা - ডঃ ওয়াকিল আহমেদ।

মুসলমান সমাজেও সেই ভেদরীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। চতুর্বর্ণের এই ভেদরীতিই নাম পাল্টে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ এবং আরজল নামে প্রতিষ্ঠা পায়।[১৮] অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভেদাভেদও মুসলিম সমাজে কম নয়। আভিজাত্যের মানদণ্ডে এখানেও আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ কিংবা আরজল এই থাকগুলি লক্ষ্য করা যায়। আশরাফ শব্দের অর্থ ভদ্র এবং অভিজাত সম্প্রদায়। বহিরাগত শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান রক্তের বিশুদ্ধতায় এবং অর্থের কৌলিন্যে আশরাফ নামে চিহ্নিত। স্থানীয় রক্তজাত এবং ধর্মান্তরিত মিশ্রশ্রেণীর মধ্যবিত্ত মুসলমানরা আতরাফ। আতরাফ এর অর্থ ইতর। পক্ষান্তরে নিম্নবর্ণ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত নিম্নবর্গীয় আরজল। আরজল এর অর্থ জল অচল কিংবা স্পর্শের বাইরে। এই ভেদ ইসলামী আইনসম্মত নয়। আচার-বিচারগত এবং অর্থনীতিগত বিভাজন এটি।

ড. শহীদুল্লাহ্-এর মতে, তুর্কি মধ্য এশিয়া থেকে আগত জনগণ মোগল, আফগানেরা পাঠান এবং আরব পারস্যের আগত বণিকরা শেখ। অন্যদিকে এনামুল হক এবং আবদুল করিমের মতে, হজরত আলি ও ফাতেমার বংশধররা সৈয়দ, আরব থেকে আগত বণিকরা শেখ, তুর্কিস্থানের অধিবাসীরা পাঠান এবং মধ্য এশিয়া থেকে আগতরা মোগল। আর এদেশীয় মুসলমানরা বাঙালি মুসলমান। কিন্তু মুর্শিদাবাদে এই বংশধারা সেভাবে রক্ষিত হয়নি। মুর্শিদাবাদে শেখ কোনও জাতিগোষ্ঠীভুক্ত নয়, নামপদবিমাত্র। অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানরাই শেখ উপাধিগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদে রাঢ় এলাকায় বহিরাগত মুসলমানদের বসতিস্থাপন শুরু হয় তুর্কি পাঠান মোগল থেকেই। জঙ্গিপুর, ভরতপুর ও সালারের বহু পরিবার বহিরাগত এবং উর্দুভাষী। মুর্শিদকুলীর আমলে পারস্য থেকে বহু পরিবার মুর্শিদাবাদে এসেছেন। মধ্য এশিয়া থেকে বিশেষ করে বাগদাদ থেকে অনেক সুফীসাধক মুর্শিদাবাদে আসেন। ভরতপুর, সালার, লালবাগ এবং জঙ্গিপুরে এঁদের খোঁজ মেলে। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত ফকিররা কৃষ্ণপুরের ফকিরপাড়ায় এবং জঙ্গিপুরের শাহজাদপাড়ায় বসতি শুরু করেন। মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র এবং কৃষক। ধনবান আশরাফদের নিকট এঁরা শুদ্রতুল্য। ফলে, আসরাফতুল্য সৈয়দ মিঞারা এঁদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে তেমন আগ্রহী নয়। প্রচুর বিহারী মুসলমান এজেলায় এসে বসবাস শুরু করেন। বিশাল অংশের এই বিহারী মুসলমান জাতে জোলা বা আনসারি, মোমিন বা তাঁতি। জঙ্গিপুরের বরজ, মহম্মদপুর, রঘুনাথপুর বাঁধের ধার, মীর্ধাপাড়া, ফুলবাড়ি, অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান এবং বেলডাঙ্গার বেশ কিছু জায়গায় এঁদের বাস করতে দেখা যায়। খোট্টা বা খোট্টাই নামে এঁদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে। মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী এঁদের অনুন্নত শ্রেণীর তালিকায় রাখা হয়েছে। এঁরা বস্ত্রবয়ণ করেন। হরিহরপাড়া তরতিপুরে বেদেরা থাকেন। লালবাগে মুসলিম মেথররা আছেন। এঁরা বর্তমানে বেশিরভাগ মুচির কাজ করেন। হরিহরপাড়ার গঙ্গাধারীতে মুসলিম চাঁইরা বাস করেন। কান্দির হিজল অঞ্চলে নিকিরি মুসলমানরা বাস করেন— এঁরা মাছ ও শুটকীর ব্যবসা করেন। জোলা বা আনসারি নয় অথচ খোট্টাই

১৮। Persian-English Dictionery, London (1954-4thEdition) Edited by– F steingass. 'চতুর্বর্ণ প্রথমে পেশা বা কর্মভিত্তিক ছিল। শক, হুণ, গ্রীক, প্রভৃতি বিদেশী শক্তির আক্রমণের ফলে ভারতের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছিল। সপ্তম শতকে মনু সমাজ-কাঠামো রক্ষার এবং একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ কর্মের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের শ্রেণীকরণ করেন। পরে ঐ কৌলিক ভেদপ্রথায় রূপান্তরিত হয়। এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। শরীফ (আরবী) শব্দের অর্থ পবিত্র বা মান্য; শরীফের বহুবচন আশরাফ; অনুরূপ তরফ (শ্রম) শব্দজাত আতরাফ, জিলফ (নীচ) শব্দজাত আজলাফ, রজীল (ইতর) শব্দজাত আরজল।

ভাষাভাষির অন্য পেশার লোকও বাস করতে দেখা যায় ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, আখেরিগঞ্জ এবং ভগবানগোলার বেশ কিছু জায়গায়। এঁদের পূর্বপুরুষরা ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়া থেকে এসেছেন মাছের ব্যবসা করতে। হরিহরপাড়ার স্বরূপপুরে ডোমকলের ভাতশালায় বাস করেন লাহাড়ি সম্প্রদায়— এঁরা লাক্ষার ব্যবসা করতেন। সাগরদিঘির বালিয়াতে বাস করেন আবদাল সম্প্রদায়। এঁরা গরু, মোষ, ছাগল খাসী করেন। লালবাগে মেহনাদের বাস। এঁরা হাম্বেলা এবং ধাই। মেয়েরা ধাই-এর কাজ করেন, পুরুষরা ঘোড়ার নাল পরানোর কাজ করেন। লালবাগের কুমীরদহ ও ধরমপুরে কর্তাভজা মুসলমানদের বসতি আছে। বহরমপুরের খর্সাডাঙ্গা, হরিহরপাড়ার দস্তুরপাড়া, নওদার ডাঙ্গাপাড়ায় বাস করেন ভরোরা সম্প্রদায়। এঁরা বাসনের ফেরিওয়ালা। হরিহরপাড়ার খামারমাটি, জামনাবাদ, শঙ্করপুর, তরতিপুর, ডোমকলের কুমারপুর, বেলডাঙ্গার রতনপুর, ব্যধবেড়িয়াতে বহু দাফালি পরিবার বাস করেন। এঁরা পাঁচপীর এবং মানিকপীরের উপাসক। এঁরাই একদিল পীর গানের প্রবর্তক। সুতী এবং দোগাছিতে বাস করেন শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠী। এঁরা বিয়েতে নাচ এবং গান করেন। কাহারপাড়া, সর্দারপাড়া, লালনগর, রসিকপুরে এবং নশিপুরে কাহারদের বাস। এঁরা ছিলেন পাল্কি বাহক। বর্তমানে এই পেশা বিলুপ্ত। এদের সঙ্গে অপরাপর মুসলমানদের বিবাহ হতো না। কাহার সম্প্রদায়ের মুসলিম মেয়েরা শাঁখা সিঁদুর পরেন। মুসলমান সমাজের অন্ত্যজ তথা একেবারে নিচের থাকের বহু মানুষ মুর্শিদাবাদে আছেন যাঁরা প্রকৃতঅর্থে উভধর্মী অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম নিয়ে আছেন। এঁরা পটুয়া, সাপুড়ে, বেদে, লালবেগি এবং আবদাল সম্প্রদায়। কান্দি মহকুমার গোকর্ণ, পাঁচথুপি, দক্ষিণখণ্ড, গোলাহাট, কাঁতুরহাট, ছাতিনাকান্দি, বাসোয়া বিষ্ণুপুরে পটুয়া সম্প্রদায় বাস করেন। এঁরা অনেকেই সাপুড়ে, বাঁদর নাচিয়ে, ভালুক নাচিয়ে এবং পাখি শিকারি। আর অনেকেই পট খেলান, পট আঁকেন। রঘুনাথগঞ্জের সোনারটিকুড়িতে আবদাল সম্প্রদায় বাস করেন যাঁরা উভয় ধর্ম লালন করে আসছেন। এঁদের জীবিকা চাষবাস ও ঘুঁটো বিক্রয়।

ইসলাম ধর্মে নাম পদবির কোনও উল্লেখ নেই। ইসলামে পদবি সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ না থাকায় এজারুল শেখ-এর পুত্র মাজহারুল ইসলাম বা আনারুল হক হতে পারেন। ফলে, ইসলামের সূত্রানুসারে কোনও নামপদবি যেমন চোখে পড়ে না, তেমনি নামপদবি দেখে গোত্রবিচারও সম্ভব নয়। যেমন গোলাম কুদ্দুস নামের কোনও পদবি নেই। গোলাম মূলনাম হলে কুদ্দুস একটি দ্বিপদী শব্দ। ব্যানার্জী, মুখার্জী, মণ্ডল, সরকার ইত্যাদি পদবিকে বাঙালি পদবি হিসেবে যেভাবে সনাক্ত করা যায়, নিজামুদ্দিন শেখ কিংবা গোলাম কুদ্দুসকে তাঁদের জন্মস্থান বা মাতৃভাষা নাজানা পর্যন্ত সেভাবে চেনার যো নেই। বাঙালি মুসলমানদের নাম পদবি ব্যবহার না করার অন্য কারণও আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই গ্রামীণ ভূমিপুত্র ও অন্ত্যজ নিম্নকোটি হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। এইসব ভূমিপুত্র মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও আশরাফ শ্রেণী ও বর্ণহিন্দুদের পাশে তাঁদের নামপদবি ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। এর অন্যতম কারণটি ছিল ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও সেই হীনমন্যতাবোধ তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আশরাফ মুসলমান বা বর্ণহিন্দুরাই সরকারি উচ্চপদগুলিতে আসীন ছিলেন। প্রশাসনের সাথে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁরা যে সরকারি উপাধি লাভ করেন পরবর্তীতে তা নামপদবি হিসেবেই ব্যবহৃত হতে থাকে। সেনাবিভাগ, বিচারবিভাগ, রাজস্ববিভাগের উচ্চপদে যাঁরা আসীন ছিলেন তাঁদের উপাধিগুলি ছিল যথাক্রমে কাজী, মীর, মুন্সী, হাজারী সরকার, তরফদার, চৌধুরী ইত্যাদি যা পরবর্তীতে নাম পদবিতেই পরিণত হয়। আশরাফ মুসলমানরা বহু পদবি বণিক বা শাসক মুসলমানদের থেকে

নিয়েছেন। যেমন খান, সৈয়দ শেখ ইত্যাদি। তুর্কি মঙ্গোলীয়দের খান বলা হত, সৈয়দরা হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবি করেন, আরব বণিকদের শেখ বলা হত। এই পদবি পরবর্তীতে ব্যাপকহারে ভূমিপুত্র মুসলমানরাও ব্যবহার করছেন। এভাবেই সুফী সাধক এবং পীরদের শিষ্যরা তাঁদেরই পদবি ব্যবহার করা শুরু করেন। পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কারণে যেসব বর্ণহিন্দুরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা খান পদবি ব্যবহার করেন। মুর্শিদকুলি নিজে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও পদবিতে খান ব্যবহার করেছেন। ভূমিপুত্র এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর যেসব মুসলমানরা সরকারি নিম্নপদগুলিতে আসীন থাকতেন তাঁদেরও সরকারি উপাধি নামপদবীতে পরিণত হয়। যেমন, নস্কর/লস্কর, হালদার, সর্দার, মোল্লা, গাজী প্রমুখ। ধর্মান্তরিত হয়েও যাঁরা আঁদের পূর্বতন পদবি পরিহার করেন নি তাঁরা এখনও মণ্ডল, বিশ্বাস, বৈদ্য, ঢালী, মিস্ত্রী, রুদ্র, মজুমদার, নামপদবিগুলি ব্যবহার করেন। নামের আগে বা শেষে যে মহম্মদ, আলি, হোসেন, রহমান, হক, উদ্দিন, আহমেদ, বক্স, জামান শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তা আসলে নামপদবি নয়, জাতিবাচক শব্দ, নামের দ্বিপদী শব্দ।

নামপদবির ব্যবহার নিয়ে মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা যায়। সাধারণত বিয়ের আগে খাতুন, বিয়ের পরে বিবি বা বেগম, বিধবা হলে বেওয়া শব্দ ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রেও বিয়ের আগে কেবল কুমারী এবং বিয়ের পরে ব্রাহ্মণ হলে দেবী এবং অন্যক্ষেত্রে, বালা, রাণী, দাসী ব্যবহার করতে দেখা যেত। লক্ষণীয় বিষয় হল, এগুলি যেমন কোনও নামপদবি নয়, খাতুন, বেগম, বেওয়াও কোনও নামপদবি নয়, এর পরে, হিন্দু মহিলারা প্রচ্ছন্নভাবে যেভাবে তাঁদের পিতা বা স্বামীর পদবিই ব্যবহার করছেন, মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। খাতুন, নাহার, নেসা, বেগম, আরা, খানম এসবই হচ্ছে দ্বিপদী শব্দ।

দুই

মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজে আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ধারা

অনেকের ধারণা স্বাধীনতার পর পরই ব্যাপকসংখ্যক বর্ধিষ্ণু, বিত্তবান, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মুসলমান জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তার খোঁজে অধুনা বাংলাদেশে পাড়ি জমিয়েছেন বলেই পশ্চিমবঙ্গ তথা মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের এমনতর হীনদশা। এই অভিমত দুর্দশার একটি কারণ হতে পারে, একমাত্র কারণ কখনই নয়। মধ্যযুগ থেকে ব্রিটিশশাসন এবং তার পরবর্তীতে বাঙালি মুসলমানদের সেই অর্থে কোনও সংগঠিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়নি এবং এর অস্তিত্ব আজও চোখে পড়েনা। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বই একটি জাতিকে, একটি দেশকে অগ্রসরের পথে ধাবিত করতে সহায়তা করে। এই নেতৃত্বের অভাবেই মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা এবং শিক্ষা সংস্কৃতির পশ্চাপদতা লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজে আর্থ সমাজিক পট পরিবর্তনে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা নিম্নরূপ —

১) সরকারি পদে হিন্দু কর্মচারীদের গুরুত্ব

বিদেশী মুসলিম শাসকরা উপলব্ধি করেছিলেন যে শাসক হিসেবে এদেশে টিকে থাকতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সাহায্য ও সহযোগিতা জরুরি। দীর্ঘমেয়াদী শাসন এবং বিস্তারই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুসলিম রাষ্ট্রগঠনের ভাবনা এক্ষেত্রে কখনোই প্রশ্রয় পায়নি। আর এই সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে, মোগল আমল, নবাব আমল এবং ব্রিটিশ আমলেও উচ্চপদে

অধিষ্ঠিত অধিকাংশ কর্মচারীই ছিলেন হিন্দু। "পাঠান আমলের রাজ্য শাসনে, বিশেষতঃ রাজস্ব ব্যাপারে একটা হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ... মুর্শিদকুলি খান বেশিরভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতে নতুন ইজারাদার নিয়োগ করিতেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারেরা প্রায় লুপ্ত হইল এবং নূতন ইজারাদাররা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই রাজা, মহারাজা এইসব উপাধি পাইলেন। এইরূপে বাংলাদেশে নূতন এক হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। ... ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ও তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। ... তাঁহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল।"[১৯] মুর্শিদকুলির জামাতা সুজাউদ্দিন ও নবাব আলিবর্দির আমলেও এর পরিবর্তন ঘটেনি। এ সময়ে যাঁদের উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে জানকীরাম, দুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ, কীরিটচাঁদ, উমিদ রায়, বীরু দত্ত, রাম সিং, গোকুলচাঁদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আলিবর্দীর কালে গুরুত্বপূর্ণ সাতটি পদের ছয়টিতেই ছিলেন বর্ণহিন্দু। একমাত্র বক্সী ছিলেন মীরজাফর। তৎকালীন ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই ছিলেন হিন্দু।[২০] নবাব দরবারে শাসকদের সঙ্গে অভিজাত বাঙালি হিন্দু এবং অভিজাত অবাঙালি মুসলমানদের যেমন সম্পর্ক ছিল গভীর, তেমনি শাসকদের সঙ্গে অন্ত্যজ এবং সাধারণ হিন্দু ও ধর্মান্তরিত বাঙালি-মুসলমানদের বিষময় দূরত্ব ছিল।

২) শাসকশ্রেণী ও প্রজাদের সংস্কৃতিগত ভেদ

মুসলিম শাসকদের সংস্কৃতি ছিল ফার্সী ও উর্দু আশ্রিত ইসলামী ভাবধারায় প্রভাবিত নাগরিক সংস্কৃতি। সমগ্র বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের সাধারণ-মুসলিমরা এই নাগরিক সংস্কৃতির উৎসমূলেই ছিলেন বিচ্ছিন্ন। কারণ, তখন গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি ক্ষীণ ধারার সাথে অধিকাংশ মুসলমানই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। নাগরিক সংস্কৃতির রূপরেখাকে গ্রাম্যস্তরে পৌছানোর প্রয়াসও প্রশাসন মহলে নেওয়া হয়নি। সে সময়ের সাধারণ মুসলমান সমাজের রূপরেখাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ (ক) বেশিরভাগ মুসলমানই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের একেবারে নিম্নবর্গ এবং অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত; (খ) এঁদের অধিকাংশই ছিলেন আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত এবং সামাজিক দিক থেকে সম্পূর্ণ মর্যাদাহীন, (গ) প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে এঁরা ছিলেন অবহেলিত এবং হিন্দু বর্ণবৈষম্যবাদের কষাঘাতে বিপর্যস্ত ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠী; (ঘ) এঁদের অনেকেই ছিলেন অত্যাচারিত বৌদ্ধ ভিক্ষুক থেকে ধর্মান্তরিত; (ঙ) গ্রামীণ সংস্কৃতিতে সুফিসাধক, বাউল ফকির ও দরবেশদের সমন্বয়বাদী মানবতাবাদ এঁদের আকৃষ্ট করায় এই সহজিয়ার জয়গানে তাঁরা ছিলেন মুখরিত। ফলে নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে তৎকালীন গ্রামীণ সংস্কৃতির যে পার্থক্য, শাসক শ্রেণীর সঙ্গে প্রজা বা সাধারণ মানুষের যে বিস্তর ফারাক, তা নির্মূল করার তৎপরতা যেমন ছিল না তেমনি রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ও প্রশাসকদের অত্যাচার বরং রাজদরবারের বৈশিষ্ট্য থেকে সাধারণ মানুষকে ঐতিহ্যবিমুখ করে তুলেছিল। সামান্য হলেও যেসব অভিজাত মুসলমানরা নবাব দরবারে উচ্চপদে আসীন ছিলেন তাঁরাও নবাবদের সংস্কৃতিতেই নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পছন্দ করতেন। উর্দু, ফার্সী কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ভাষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষাকেও

১৯। বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পদনা রমেশচন্দ্র মজুমদার (২য় খণ্ড, মধ্যযুগ)।
২০। বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক— ডঃ নজরুল ইসলাম।

বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই প্রবণতা অভিজাত হিন্দুদের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। আর্য-গর্বান্বিত বর্ণহিন্দুরা কখনই বাঙালি পরিচয় দিতে চাননি। বাঙালির পরিবর্তে বর্ণহিন্দুরা রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা তুর্কি-মোগল-পাঠানদের সম্বোধিত শব্দ হিন্দু পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করতেন। 'জাতি রাঢ় আমিরে/কর্মে রাঢ় তু' (ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল) কিংবা 'অক্ষটি হিংসক রাঢ়/ চৌদিকে পশুর হাড়/ কৃতাঞ্জলি বীর কহে হইগো চোয়াড়/ লোকে না পরশ করে সবে বলে রাঢ়' (মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল)। লক্ষ্যের বিষয়, এই আরব-ইরাণী, তুর্কি-মোগল-পাঠান শাসক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণহিন্দুদেরকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত বলে সম্মান জানাতেন। এক বর্ণ হিন্দুর সঙ্গে আর এক আশরাফ মুসলমান তথা শাসক গোষ্ঠীর পারিবারিক সম্পর্কও ছিল গভীর। আশরাফ এবং উচ্চবিত্ত মুসলমানদের সাথে ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুরা অবাধ পারিবারিক মেলামেশার সুযোগ পাওয়ায় এঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। এভাবেই সংখ্যাতে কম হলেও ব্রাহ্মণ এবং বর্ণহিন্দুরা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ হলে সৈয়দ এবং কায়স্থ হলে খান পদবি ব্যবহার করতেন। সরকারি উচ্চপদে, সাংস্কৃতিক ও বিবাহাদির মত সামাজিক কাজকর্মে আশরাফ বা শাসকশ্রেণীর লোকেরা একদিকে যেমন এইসব বর্ণহিন্দুদের অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে ভূমিপুত্র ও অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমানদের পাত্তাই দিতেন না। বরং তাঁদের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার চোখেই দেখতেন।[২১] এই ব্যাখ্যা থেকেও একটি স্পষ্ট ধারণা নেওয়া যায় যে ধর্মীয় মূল্যবোধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই তখনও শাসকশ্রেণী এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীকে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন।

৩) বাঙালি মুসলমানদের প্রতি প্রশাসনিক উন্নাসিকতা

মোগল আমলে এক একটি প্রদেশকে সুবাহ বলা হত। এই সুবাহ বা প্রদেশে দু'জন প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত হতেন— একজন ছিলেন নাজিম, অন্যজন দেওয়ান। নাজিম ছিলেন প্রদেশ পাল বা বাদশাহের প্রতিনিধি, শাসনকর্তা ও সামরিক প্রধান। তিনিই ফৌজদারী বিচার পরিচালনা করতেন। নাজিমের অধীনে কাজ করতেন নায়েব-নাজিম, সের লস্কর, ফৌজদার, কোতোয়াল এবং থানেদার। অন্যদিকে দেওয়ান ছিলেন বাদশাহের অধীনস্থ। কিন্তু প্রদেশপালের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল স্বাধীন। তিনিই প্রকৃত অর্থে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন এবং দেওয়ানী বিচার বিভাগ তাঁর অধীনেই ছিল। দেওয়ানের অধীনে ছিলেন কাজী-আল-কুন্নাত (প্রধান বিচারপতি) কাজী, মুফতি, মীর, আদিল ও সদর। রাজস্বে ছিলেন নায়েব আমিল, সিকদার, কারকুন, কানুনগো ও পাটোয়ারী। রাজস্ব আদায়ে নিয়োগ করা হত জায়গীরদার, জমিদার, সুবাদার, দেওয়ান ও নায়েবদের। কিন্তু নাজিম কিংবা দেওয়ানের অধীনস্থ এইসব উচ্চপদে অন্ত্যজ শ্রেণীর বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমানরা কোনও সুযোগ পাননি। বিচারবিভাগে মুসলমানদের আধিক্য থাকলেও তাঁরা ছিলেন বহিরাগত আশরাফ শ্রেণীর অবাঙালি মুসলমান। রাজস্বে ছিলেন অধিকাংশ বাঙালি বর্ণহিন্দু। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে যে জমিদারী প্রথা চালু হয় তাতেও হিন্দু জমিদারের সংখ্যা ছিল অধিক। সিরাজউদ্দৌলার আমলেও হিন্দু জমিদার ও মুসলমান জমিদারের হার ছিল যথাক্রমে ৮৯ এবং ১১ শতাংশ। প্রজাদের সঙ্গে জমিদারদের আচরণ ছিল প্রভু-ভৃত্যের। নবাব, নাজিম, আমির, ওমরাহ শাসকশ্রেণী প্রজাদের তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক-শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, ডোম-চণ্ডাল, জেলে-জোলারা ছিলেন শোষিত, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত। কোতোয়াল, কয়াল, কলমচি, কাগজি, খাজাঞ্চি, খালাসী,

২১। লোক সংস্কৃতি গবেষণা— মাঘ-চৈত্র ১৪০৯, সম্পাদক, সনৎ কুমার মিত্র।

খানসামা, খাসনবিশ, গোমস্তা, চাপরাশি, চৌকিদার, জমাদার, দরজি, দস্তিদার, দারোগা, দালাল, নকিব, পাইক, পেয়াদা, পোদ্দার, পেশকার, বরকন্দাজ, বাবুর্চি, বিলদার, ভিস্তি, মশালচি, মুনশী, মহালনবীশ, মুহুরি, মোক্তার, মোল্লা, শরাফ, শিকদার, সরকার, সারেঙ্গ, সেরেস্তাদার, হাওলাদার এগুলি ছিল সেসময়ের প্রশাসন এবং রাজস্ব বিভাগের নিম্ন কর্মচারী। বহিরাগতদের সাথে এদেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানরাও এইসব নিম্নপদে সামান্য হলেও চাকুরির সুবিধা পেতেন।[২২] এইসব চাকুরিতে সুযোগ পাওয়ার প্রবণতাও যে ধর্মান্তরকে ত্বরান্বিত করেছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এঁরাই দীক্ষামন্ত্র নিয়ে মুসলমান হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু রাজাদের সংস্কৃতি ছিল এঁদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাছাড়া, এঁরা পূর্বপুরুষদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, সংস্কার তেমনভাবে পাল্টাতে পারেন নি। ফলে, সেই অর্থে বাংলায় তথা মুর্শিদাবাদে মানসিক, আর্থিক, বৈষয়িক, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তেমনভাবে কোনও বিপ্লব আসেনি। এক্ষেত্রে, রাজাদের ও প্রজাদের সংস্কৃতিগত ভেদ বেড়েছে বই কমেনি।

চতুর্বর্ণের ভেদরীতি অনুসারেই আতরাফ ও আজলাফদেরও ভাগ্যে কায়িকশ্রম জুটেছিল। আতরাফ এবং আজলাফ শ্রেণীর পেশাগত একটি রিপোর্ট পাওয়া যায় ১৮৯১ সালের সেন্সাসে। এই সেন্সাসে ১০২টি পেশাজীবী মানুষের উল্লেখ আছে। সেগুলি হল ঃ আবদাল, বাদ্যকার, বাজিকর, বকলি, বাখো, বোরহি, বোরজিব্র, বেহারী, বেপারি, বেসাতি, বেশ্যা, ভণ্ড, ভাট, ভাতিয়ারা, ভিস্তি, চামার, চৌধুরী, চৌকিদার, ছিপিগর, চিক, চিত্রকর, চুনারি, দফালি, দহিয়ারা, দাই, দালাল, দফতরি, দর্জি, ধরি, ধাওয়া, ধোপা, ধুনিয়া, ফকির, ফেরুশ, গদি, গজনবী, গোলাম, হাজাম, হিজড়া, গোলদার, গোয়ালা, জমাদার, ঝাড়ুদার, জোলা, জোতদার, খয়াজি, কাহার, কলাল, কলু, করদার, কারিগর, কসাই, কসবি, কাজি, খোজা, খোন্দকার, কুসিয়ারা, লাহেরি, মহলদার, মাহিফেরুস, মিরিয়াসি, মালা, মাল-বৈদ্য, মালী, মালিক, মণ্ডল, মাঝি, মশালচি, মৌলবী, মেহতর, মেওয়াফেরুস, মিস্ত্রি, মৃধা মুকোরি, মোল্লা, মুনসি, নগরচি, নলবানধ, নলিয়া, নিকারি, নুরবাফ, পাসি, পাটনি, পটুয়া, পাটুরিয়া, পাওয়ারিয়া, পেসকার, রঙ্গরেজ, রসুয়া, সাজগার, সরকার, সাইন, সিকলগর, শিকারি, সিনলি, সোরিয়া, তরফদার, তকলিহর, তুতিয়া।[২৩] মুসলমানদের একচেটিয়া যে শ্রমগুলি ছিল তা হ'ল ঃ রাজমিস্ত্রির কাজ, দর্জির কাজ, খালাসী-সারেঙ্গার কাজ, কসাই-এর কাজ, বাবুর্চির কাজ, সহিস-কোচোয়ান, কোতোয়ালের কাজ, ফেরিওয়ালার কাজ, বই বাঁধাই, চামড়ার কাজ, ফলমূল ও শাকসব্জি বিক্রয় এবং গরু ছাগল ঘোড়া কেনাবেচার কাজ। কিন্তু এসব পেশাগত কাজ ছিল শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানই ছিলেন কৃষিজীবী।[২৪]

৪) শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বাঙালি মুসলিমদের প্রতি প্রশাসনিক অবহেলা

পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনে মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল দিল্লী, লখনউ, পাটনা, ভূপাল, হায়দ্রাবাদে। কিন্তু গৌড়, মুর্শিদাবাদ বা ঢাকা রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলার কোথাও শিক্ষা সংস্কৃতির কোনও কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবি-শ্রেণীর অস্তিত্বহীনতার এ এক অনন্য নজির। নবাবী আমলে কারোর জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন জোরালো ছিল না। টোল বা মক্তব, মাদ্রাসার মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ই শিক্ষা গ্রহণ করতেন। উভয় সমাজেই শিক্ষা ছিল মূলত উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রথাগতভাবেই মাদ্রাসাগুলির

২২। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা— ডঃ ওয়াকিল আহমেদ।

২৩। Census of India, 1891.

২৪। The Origin of the Musalmans of Bengal.

উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। এবং তা অবশ্যই ছিল ধর্মভিত্তিক। ১৮৮২ সালে ঢাকার নবাব আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ঘোষণা করলেন যে আশরাফ তথা উঁচু জাতের মুসলিমদের ভাষা হ'ল উর্দু আর আতরাফ তথা নীচুজাতের মুসলমানের ভাষা হ'ল বাংলা। এই ঘোষণার ফলে অনেকেই উর্দু শেখার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। ইংরেজ আমলেই টোল, মক্তব, মাদ্রাসার সীমানা পেরিয়ে সর্বপ্রথম পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ শুরু হয়। ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।[২৫] ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ইংরাজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এতে দেশীয় লোকদের শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল না। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এতে মুসলমানদের শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল না। ১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় প্রথম ইংরাজি চালু হয়। ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। লর্ড বেন্টিং ১৮৩৭ সালে রাজভাষা ফারসীর বদলে ইংরাজি করার কথা ঘোষণা করলে ইংরাজির গুরুত্ব বেড়ে যায়। এর ফলে প্রথমে কলকাতা ও শহরতলীতে এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে জেলাতেও স্কুল কলেজ স্থাপন করে আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ শুরু হয়। ১৮৩৫ সালে ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি ছাড়া অন্যসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২৬] কিন্তু এইসব স্কুল কলেজের ইংরাজি শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি মুসলমানরা। ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা মুসলিমদের মধ্যে যেভাবে দানা বেঁধেছিল এটি তার অন্যতম কারণ। ধর্মচ্যুতির ভয়ে এইসব স্কুল কলেজ এবং খ্রিষ্টান মিশনারীগুলিতে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করতে বিরত ছিলেন। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে তখন এই শিক্ষাব্যবস্থা সেভাবে প্রসারলাভ করেনি এবং নিম্নবিত্ত মুসলমানদের পক্ষে এই ব্যয়বহন করার অক্ষমতার কারণে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান শিক্ষার্থীর হার ছিল নগণ্য।[২৭] ১৮৩৮ সালের একটি রিপোর্টে এ তথ্য সামনে এসেছে। এ তথ্য থেকে মুর্শিদাবাদের চিত্রটি নিম্নরূপঃ

	ভাষা	শিক্ষায়তনের সংখ্যা	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র
১।	বাংলা ও হিন্দি	৬২—৫	৯৯৮	৮২
২।	ফারসী	১৭	৬১	৪১
৩।	আরবী	০২	০১	০৬
৪।	ইংরাজি	০১	১০	০২

(তথ্য ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিমসাধনা— ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান)

২৫। Mohammadan Education in Bengal– Abdul Karim. কলকাতা মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ 'To promote the study of the Arabic and Persian Languages and of Muhammadan law with a view especially to the production of qualified officers for the courts of justice.'

২৬। 'British policy and The Muslims In Bengal' – 'His Lordship in council is of the opinion that great of that the British Government ought to be promotion of Europion literature and Scince amongst the natives of India and all the funds appropriated for purposes of education would be best employed on English education."

২৭। i) Report of the Indian Education Commission 1883 - W.W.Hunter: " A Candid Mohamedan would probably admit that the most powerful factors are to be found in pride of race, a memory of by gone superiority, religious fears and a not unnatural attachment to the learning of India.

ii) Mohamadan Education In Bengal– School Inspector Abdul Karim : " ... ancient conquering race cannot easily divert itself of the traditions of its nobler days. The Musalamans confident of the implicity of their system of education, continued to persue their old studies."

১৮৯০-৯১ সালে বাংলার মুসলমান শিক্ষার্থীর অবস্থা কেমন ছিল তা এই চিত্র থেকে পরিস্কার হয়ে যায় ঃ

	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র সংখ্যা	হার (%)
১।	আর্টস কলেজ	৫২৩২	২৯৩	৫.৬
২।	উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়	৭৮,৭২৭	৮,২৬৫	১০.৫
৩।	মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়	৬১,০০০	৮,৮৮৪	১৪.৫
৪।	মধ্য বাংলা বিদ্যালয়	৬৭,৭৪১	১০,৩২৯	১৫.২
৫।	উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৩৮,৯৫০	২৬,৬৮৮	১৯.৩
৬।	নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯,৭৭,৬৩২	২,৭১,২২২	১৭.৭
৭।	প্রফেশনাল কলেজ	১,৪৯৩	৫২	১.৫
৮।	টেকনিক্যাল স্কুল	২,৭২২	৪২৭	১৫.২
৯।	ট্রেনিং স্কুল	১,৯৮৩	২২০	১১.১
১০।	মাদ্রাসা	২,৪২৬	২,২৭৯	৯৭.৯

(তথ্য ঃ Mohamedan's Education In Bengal– Abdul Karim School Inspector)

এই তথ্য অনুযায়ী ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রছাত্রী পাশের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ (১) এম. এ-৬৭, (২) বিএ (অনার্স)-১৩৬, (৩) বিএ (পাস) - ৫০২, (৪) বি এল-১৬৮, (৫) এম. বি.-৫, (৬) এম এল এস-১৭, (৭) বিই-০২, (৮) এলই-০১। ১৮৬৯ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো আরবী বিভাগে অধ্যায়নরত ১১৫ জন ছাত্রের কুলগত পরিচয় ছিল এরূপ ঃ জমিদার ৩৩, তালুকদার-৩৭, মুনশী-১৩, ব্যবসায়ী-৬, কাজী-৬, মুন্সেফ-৩, দারোগা শিক্ষক-উকিল ইত্যাদি অবশিষ্ট। এ্যাংলো ফরাসী বিভাগের ২৮০ জন ছাত্রের কুলগত পরিচয় ছিল ঃ জমিদার-জোতদার-১০২, ব্যবসায়ী ৪৪, শিক্ষক-মুন্সী ২৯, মোক্তার ২২, নকলনবিশ-২০, সরকারি কোর্ট অফিসার ১৩, ডাক্তার ৯, কেরাণী ৮, অনুবাদক ৮, সরকারি পেনসনভোগী ৮, পুলিশ অফিসার ৫, রুটি প্রস্তুতকারী ১, অপেশাজীবী ৫ (Selection from the Records of the India Home Depatt, Calcutta-1886)। এই তথ্য থেকে সেসময়ে সরকারি বিভিন্ন পদে চাকুরিরত যে পরিসংখ্যান জানা যায় তাতে মুর্শিদাবাদে ৩৮২টি পদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন ৩৪৩ জন এবং মুসলমান মাত্র ৩৯। উপরিলিখিত পরিসংখ্যানগুলি থেকে যে বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে তা হ'ল মুসলিমদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার যে চেষ্টা আবদুল লতিফরা গ্রহণ করেছিলেন তাতে অন্য প্রদেশের অবাঙালি মুসলমানরা যেভাবে এই আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের সেভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কলকাতা ছাড়া জেলাগুলের মুসলমানদের পক্ষে সে সুযোগ গ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি আর্থিক কারণেই।

৫) মুসলিম পরিপন্থী ব্রিটিশ নীতি

ব্রিটিশরা প্রশাসনের মাধ্যমেই পক্ষান্তরে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তন করে যান। ১৭৯৩ সালের কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলার মুসলমান কৃষকদের ধনে নিধন করেছিল। এর ফলে জমিদাররা ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজার মালিকানা অর্জন করেন। বিনিময়ে বার্ষিক ধার্য কর কোম্পানিকে প্রদান করে এই ভোগদখল বংশপরম্পরায় চালানোর অধিকার পান জমিদাররা। এই রাজস্ব প্রদানে অপারগ জমিদারদের জমি নিলামে বিক্রি হতে থাকে। জমিদারী বদল হতে থাকে। এ ব্যবস্থার

ফলে বনেদী জমিদারী একদিকে যেমন বিধ্বস্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে কলকাতার নব্য বিত্তবান বণিকরা এই জমিদারী কিনে নিয়ে জেলাগুলিতে জমিদারী ভোগ করার সুযোগ পান। এইসব নাব্য জমিদারদের উদ্দেশ্যই ছিল বিনা ঝুঁকিতে উদ্বৃত্ত মুনাফা অর্জন, ভোগ নয়। আর একারণেই, কৃষি ও জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেমন এঁদের কাছে গুরুত্ব পায়নি, তেমনি জমি মুনাফাভিত্তিক উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হওয়ায় কৃষকদের সার্বজনীন সমস্যাও তাঁদের চোখে পড়েনি। ১৭৯৩ সালে জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৩১৭। ১৮৭২-৭৩-এ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫৪,২০০তে।[২৮] খাজনাবৃদ্ধির ক্ষমতা জমিদারদের হস্তগত হওয়ায় নির্বিচারে যেভাবে খাজনাবৃদ্ধির প্রকোপ বাড়তে থাকে তার ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলার মুসলমান কৃষকদের অর্থনীতিতে ঘা পড়ে। কাজী আবদুল ওদুদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার উপরে যা হ'ল তার চাইতেই গুরুতর হল Resumption Proceedings— নিষ্কর বাজেয়াপ্তর ব্যাপার।" এ বিষয়ে হান্টার সাহেব একই ভাবে সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন।[২৯] নবাব আমলের পর থেকেই ব্রিটিশ আমল জুড়েই বাংলার মুসলমানদের অস্তিত্বহীনতার ও সংকটের যুগ। আর এই সংকট প্রকট করেছে ব্রিটিশ সরকারই। তাঁদের বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মুসলমানদের বিপক্ষে গেছে। অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে বাংলার মুসলমান সমাজকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)-এর ফলে নবাবী আমলের অভিজাত মুসলমানদের অর্থনৈতিক সংকট যেমন শুরু হয় তেমনি নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ কৃষিজীবী মুসলমানও জোর ধাক্কা খেয়েছেন। এর কিছুকাল পরেই মাঞ্চেস্টারের বাজারে ভারতীয় কাপড় বিক্রির উদ্দেশ্যে বয়নশিল্প ধ্বংস করে বয়নাশিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার মুসলমানকে বেরোজগার করে দেওয়া হয়। লর্ড ক্লাইভ সামরিক ক্ষমতা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে এনে উচ্চপদগুলি ইংরাজ অফিসারদের দিয়ে পূরণ করেন। ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী লাভের পর মুর্শিদাবাদের শাসনভার নামেমাত্র নবাবদের হাতে ছিল। মুর্শিদাবাদের নবাবদের বৃত্তিভোগী করে পক্ষান্তরে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ১৭৮৬ সালে দেওয়ানী বিচার ক্ষমতা এবং ১৭৯০ সালে ফৌজদারী ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার দেশীয় কর্মচারীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ নিয়ম করেন যে সরকারি ডিগ্রি না থাকলে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করা হবে না। ফলে, তৎকালীন হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি শিক্ষায় অগ্রসর

২৮। The Bengal Administration Report of 1872– Haling Barry.

২৯। The Indian Musalmans, Annals of rural Bengal– W. Hunter.

"The greatest blow which we dealt to the old system was in one sense an underhand one, for neither the English nor the Mohammedans foresaw its effects. This was the series of the changes introduced by Lord Cornwallis and Sir Johnshore ending in thepermanent settlement of 1793. By it was usurped the functions of those higherMusalman officers who had formerly subsisted between the actual collector and the Government, andwhose dragoons were the recognised machinery for enforcing land. Tax. Instead of the Musalman Revenue farmers with their troopers and spearman, we placed an English collector in each district with an unarmed fiscal police attached like common bailiffs to his court. The Muhammadan nobility either lost their former connection with land Tax or became mere land-holders with an inclastic title to a part of the profits of the soil.

The Permanent Settlement however consummated rather than introduced this change. It was in another respect that it most seriously damaged the porition of the great Muhammadan Houses. For the whole tendencysettlement was to acknowledge as the land-lords the subordinate Hindu officers who dealt directly with the husban man. I have carefully gone over the Mrs. Settlement Reports of

হওয়ায় অফিস আদালতে তাঁদেরই চাকুরি হ'ল, মুসলমানরা পিছিয়ে পড়লেন।[৩০] ১৮৩৭ সালে পারসীর বদলে ইংরাজি ভাষা প্রশাসনিক মহলে ম্যাণ্ডেটরী হওয়ায় পারসী ভাষা শেখা মুসলমানরা বেরোজগার হয়ে পড়েন। এতে অনেক শিক্ষক, মৌলবী, মুনসী জীবিকা হারান ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন। ১৮৫৭ সালে সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে, "বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারীর সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তস্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ সালে ফারসীর রাজভাষাচ্যুতি পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসক শ্রেণী নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিস্ক্রীয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরাজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এরূপটি হয়েছে। মূলতঃ অভিজাত শ্রেণীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কৃষক, শ্রমিক, বিত্তহীন শ্রেণীর লোকেরা এসব আইনের বাইরে ছিল; তবে বণিক কোম্পানির শোষণনীতি থেকে তারাও রেহাই পায়নি। কোম্পানি এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করেন বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য। কোম্পানির বাণিজ্যনীতির ফলে তাঁতি সর্বস্বান্ত হয়। নীলচাষে কৃষকের সর্বনাশ ঘটে। এর উপর রোগব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। আধুনিক জীবনের ফল তারা কিছুই পায়নি। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঘোর অন্ধকারের

1788-1790; and not with standing the clauses touching intermediate holders in the code of 1793, it is clear to me that our Revenue officers of those days had an eye to only three links in the previous system – the state, the local agent or landholder who collected direct from the Peasantry, and the husbandmen who tilled the soil. These were the three features of the former administration requisite to our new plan and by degrees all the other links of the Muhamnadan Revenue system were either extruded or allowed to drop out.For example, the provision respection of the separation of Independent Talukders was in itself fatal to the greatness of many a Mohamnedans House.Such a family although it might grant away part of its territory in permanent farms, always exercised a sort of Juridiction over its subordinate holders and when occasion demanded, managed to extract cesses or benevolences, in short money in form or other, from them.The officer (Mr. James O' Kinealy, C. S.) Who has studied the Permanent Settlement most intimatly in connection with the present Mohammedans disaffection (Wahabi Rebellion) writes thus ; It elevated the Hindu collectors who upto the time had held but unimportant posts, to the position of land holders ,gave them a proprietory right in the soil, and allowed them to accumulate wealth which would have gone to the Musalmans under their own Rule.

- - - - The feeling against resuming such tenures was then too strong to allow of any active steps being taken. In 1793 lord Cornwallis agaiin asserted in the strongest and broadest manner the inalienable right of Government to the rent free grants which had not obtained the sanction of the Ruling Power. But even the stronger Government of that day did not venture to carry out this principle, The subject rested for another quarter of century untill 1819, when the Government again asserted its rights but again shrank from enforcing them. It was not until 1928 that the legislature and Executive combined to make one great effort. Special courts were created, and during the next eighiteen years the whole province was over-run witn informers, false witnesses, and calm stern Resumption officers. At an outlay of 8,00,000 pound and calm stern Resumption officers an additional revenue of 3,00,000 pound a year was permanently gained by the state representing a capital of five percent of six millions sterlings. A large part of this sum was derived from lands helds rent free by Musalmans or Muhammedans

দিকে টেনে নিয়ে গেছে।"[৩১] হান্টার এই আইন প্রবর্তনকে মুসলমানদের জন্য— 'মরণাঘাত' বলে উল্লেখ করেছেন।

৬) মুসলিমদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

কিন্তু নবাব আমলের পতনের পর মুর্শিদাবাদের বাঙালি মুসলমানদের জীবনে যে আইডেনটিক্যাল ক্রাইসিস বা অস্তিত্বহীনতার সংকট দেখা দিয়েছিল, তা যে ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও প্রশাসনিক নিয়মনীতি প্রবর্তনের ফলেই সৃষ্ট হয়েছিল একথা যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, তেমনি এই দুর্ভোগের কারণে যে তৎকালীন মুসলিম উলেমা, নেতা, আলেম, মৌলবী, মাওলানা এবং কর্ণধারদের একপেশে ফরমান যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে সে কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। মুসলমানদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ইংরেজরা। তাই প্রথম থেকেই তাঁরা ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারেন নি। প্রথম থেকেই শুরু হয় সশস্ত্র জেহাদ। চলে একশ বছরের বেশি। ব্রিটিশ আমলে নবাবি আমলের অভিজাত মুসলমান এবং কাজী মোল্লা উলেমা প্রমুখ ধর্মনেতাদের বৈষয়িক প্রভাব এবং প্রতিপত্তি যেভাবে ক্ষুন্ন হয়েছিল তাতে তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করবেন জেহাদ করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। রিলিজিয়ান স্থায়ী, স্থিতিধর্মী এবং অপরিবর্তনীয়, আর কালচার হ'ল সর্বব্যাপক, গতিধর্মী, সৃষ্টিশীল এবং বিকাশ শীল— রিলিজিয়ান এবং কালচারের এই মৌলিক দ্বন্দ্বের গুরুত্ব না বুঝেই ধর্মীয় নীতিকে বুকে আঁকড়ে তাঁরা ভারতীয় মুসলমানদের উপর যে ফরমান জারি করলেন সেটাই তাঁদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আরবীয় সংস্কৃতির মায়াডোরে যে ধর্মীয় উত্থান তা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে কতটুকু কার্যকরী হতে পারে তার আগাম কোনও ভাবনাচিন্তা ছাড়াই ভারতীয় মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইসলামের কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি। হিন্দী বলয়ের মুসলিম সংস্কৃতি বাংলার মুসলিম সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন এবং পৃথক এই উপলব্ধি ছিল তাঁদের ভাবনার বাইরে। পীরদরবেশ আউলিয়া এবং সুফীদের সহজিয়া পন্থাতে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন যেসব মুসলমান তাঁদের সামনে এই ফরমান ছিল অসহনীয়। নবাব দরবারে কদর পাওয়া এইসব অভিজাত মুসলমান কাজী মৌলানারা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নিজেরাই যে দূরত্ব প্রস্তুত করেছিলেন ব্রিটিশ আমলে এইসব মুসলমানদের ফরমান সেকারণেই তাঁদের কাছে কোনও গুরুত্ব পায়নি। ফলে যে সব ধর্মান্দোলনের ডাক তাঁরা দিয়েছিলেন গ্রাম

---

foundations. The panic and hatred which ensued have stamped themselves for ever on rural records. Hundred of ancient families were ruined and the educational system of the Musalmans, which was almost entirely maintained by rentfree grants, received its death blow– Muhammadans foundation suffered most for with regard to their title deeds, as with regard to all other matters, the former conquerors of India had displayed a haughty indeffernce unknown to the provident and astute Hindu (The Resunption proceedings were fierced at the begining, and after languishing for seven years were officially terminated by the Government order of March 4, 1846).

৩০) Bengal Education Consultations (1843 - 52) qouted from Brtish Policy and the Muslims in Bengal.

- - that in every possible case a preference shall be given to these who have been education in institutions thus established (Zilla Schools and Central colleges) and specially to those who distinguished themselves their in of a more than ordinary degree of merit and attainments.

৩১। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা— ডক্টর ওয়াকিল আহমেদ।

বাংলার মুসলমান সমাজে তার তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। কোনও আন্দোলনই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম সুফীবাদের প্রবল বিরোধীতা করেন ইমাম ইবনে তায়ামিয়া। সুফীবাদের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন আবদুল ওয়াহাব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রায়বেরেলির শাহ সৈয়দ আহমেদ-এর ওয়াহাবি আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ওয়াহাবি আন্দোলন যে মুখ্যত একটি ধর্মান্দোলন-এর প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ইঙ্গিত বহন করেছিল আরব ভূমিতে। কিন্তু ভারতের মাটিতে এই আন্দোলনের রাজনৈতিকরূপ সেভাবে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করতে পারেনি। এ যেন ভারতীয় মুসলমানদের নবাবী আমলের ক্ষুন্ন জাত্যাভিমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়া; ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় হুঙ্কার। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলমান জগতের ধংসের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৈয়দ গোলাম হোসেন তাঁর 'সিয়ারুল মোতা আখেরিন' গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতীয় মুসলানদের জন্য এক গভীর চেতনাহীনতার শতাব্দী বলে বর্ণনা করেছেন। এই চেতনাহীনতার কালে একে একে ভারতীয় মুসলমানের রাজ্য গেছে, ধনৈশ্বর্য গেছে, সম্ভ্রম গেছে। ওয়াহাবি আন্দোলনের মূলসূত্র ছিল 'ইসলামীকরণ'। বরং বলা চলে ভারতীয় ইসলামের শুদ্ধিকরণ। কারণ, ওয়াহাবিরা মনে করতেন, ভারতবর্ষ হচ্ছে 'দারুল হরব এটাকে তাঁরা 'দারুল ইসলাম' করতে চেয়েছেন। স্বভাবত কারণেই খাঁটি মুসলমান করার তাগিদে পক্ষান্তরে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনই করতে হয়েছে। ইসলামী নীতিকে শক্তপোক্ত ভিত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াহাবিরা ইংরাজি শিক্ষাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পরবর্তীতে দেশীয় ভাষা, দেশীয় ভাবধারা এবং ঐতিহ্যকে বর্জন করার কথা ঘোষণা করেছেন। এই ইসলামীকরণ আন্দোলনে বাংলাকে বর্জন করে উর্দুকে গ্রহণ করার পরামর্শও এসেছে। এর ফলে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সমান্তরালে একটি ক্ষীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিষ বীজও যে বপন করা হয়েছিল, একথাও কি অস্বীকার করা যায়? উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে ড. অমলেন্দু দে বলেছেন ঃ "মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়াকে প্রধানত দু'টো স্তরে বিভক্ত করা যায়; (ক) ১৮১৮-৫৮; ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন এবং ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ, (খ) ১৮৫৮-১৯৪৭; মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ধর্মতত্ত্ববিদ পরিচালিত আন্দোলন। প্রথম স্তরে মুসলিম সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাতে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উপাদানগুলোর বিশেষ প্রভাব ছিল। এই উপাদানগুলো পরস্পর ওতোপ্রতভাবে যুক্ত থাকায় আন্দোলন এক মিশ্রিত রূপ ধারণ করে। বিশিষ্ট মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদদের নেতৃত্বেই ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালিত হয়। ... ফলে মুসলমান সমাজে ইসলামীকরণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফরাজি-ওয়াহাবি তত্ত্বে জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে। ফরাজি ওয়াহাবি আন্দোলনে (১৮১৮-১৮৭০) এবং ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়।"[৩২] মজনু শাহের ফকির বিদ্রোহ, সৈয়দ আহমেদ বেরেলভির 'ওয়াহাবি আন্দোলন, বাংলার নিসার আলি ওরফে তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ, ফরিদপুরের দুদুমিঞার ফরায়েজি আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলনগুলি ছিল মূলত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, বিদেশী শাসন উৎখাত করার লড়াই। উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাগরণের উপাদানগুলির মধ্যে যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা লক্ষ্য করা গেছিল তা হ'ল (ক) ইসলামী করণের ধারা (খ) ব্রিটিশবিরোধী ধারা (গ) ব্রিটিশ শাসনে সহযোগিতার ধারা এবং (ঘ) আধুনিকীকরণের ধারা। প্রথম দুটি ধারা ছিল এইসব আন্দোলনগুলির উৎসমুখ। পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বর্জন করে, ইসলামীকরণ

৩২। মুসলিম সমাজ এবং এই সময় — সম্পাদনা মইনুল হাসান (২য় খণ্ড)

প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে, ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতাকে দূর করতে এগিয়ে আসেন আবদুল লতিফ স্যার সৈয়দ আহমেদ এবং মৌলানা মোহাম্মদ কাসিম নৌনতভীর। তাদের নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে কলকাতা, আলিগড় এবং দেওবন্দে তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র। কিন্তু এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে আধুনিক শিক্ষার আত্মীকরণ সম্ভব হয়নি। ফলত এতে মাওলানা, উলেমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। মৌলানা কেন্দ্রিক গ্রাম্যশাসন কিংবা ধর্মীয় ফতোয়া থেকে মুক্ত হতে পারেনি মুসলমান সমাজ। তার দাপট আজও অব্যাহত। আর নিজেদের ভুল সংশোধন করে যখন বাঙালি মুসলমান বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় আধুনিক শিক্ষার প্রবল আগ্রহে উন্মুখ তখন বাঙালি হিন্দু একশো বছর তাঁদের পিছনে ফেলে দিয়ে এতটাই অগ্রসর হয়েছে যে প্রতিযোগিতার আসরে তাঁদের ওয়াকওভার দেওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। মুসলিমরা ব্রিটিশ বিরোধিতার সম্মুখে পড়ে যা যা বর্জন করেছিলেন সেইসব বৈশিষ্ট্যকে রপ্ত করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে বাঙালি হিন্দু এক সুসংগঠিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পরিচিতি লাভ করেছেন। ফলে, আজ "বাংলার জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান, মহাজন হিন্দু ঘাতক মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু, রোগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু, আসামী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু, দর্শক মুসলমান, জেলার হিন্দু কয়েদী মুসলমান। সমাজ জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে এই পার্থক্য ছিল পল্লবিত, প্রকটিত ও প্রতিফলিত।"[৩৩] সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা প্রভৃতি বিপরীত ধর্মী উপাদানের মিশ্রিত জটিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন বাঙালি মুসলমান। মৌলবী, মাওলানা, আলেম, উলেমাদের নেতৃত্বে যে মুসলমান সমাজ গঠিত হয়েছিল, তাঁদেরই দেওয়া ধর্মীয় বিধিবিধান মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। ব্রিটিশ আমলে শহরাঞ্চলের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, অর্থলগ্নি সংস্থা, সুদের কারবার প্রভৃতি ব্যবসাভিত্তিক কর্মে উচ্চবিত্ত মুসলমানরা ধর্মীয় কারণেই যোগ দিতে পারেন নি। মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক দুর্গতিই আরও নানাবিধ সমস্যাকে ডেকে এনেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতা, জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম লীগ গঠন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আভাস প্রভৃতি কারণগুলি মুসলিমদের সেই আইডেন্টিক্যাল ক্রাইসিসকে যে প্রকটরূপ দান করেছিল, তারই লড়াই আজও অব্যাহত। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়াতে এসেও একজন বাঙালি মুসলমানকে কেবলমাত্র বাঙালি বলার লোক খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। পরিবর্তে তাকে কেবল মুসলমান শব্দটিই শুনে যেতে হয়। এই সংকট অস্তিত্বহীনতার সংকট— এ কেবল বাঙালি মুসলমানের নয়, এই সংকট সমগ্র বাঙালির। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের চিত্তশুদ্ধির যে প্রয়াস বিংশ শতাব্দীতে নেওয়া হয়েছে— তাকে ভারতীয় হিন্দু তথা বাঙালি হিন্দুরা সঠিকভাবে গ্রহণ করলে সংস্কৃতিগত ভেদ মুছে দিয়ে এক সুসংহত বাঙালি সমাজ গঠন করা যেত এই বিস্মৃতিও যে হিন্দু সমাজের এক মারাত্মক ভুল, সেকথাও আজ অস্বীকার করার উপায় আছে কী? বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গে শেষ কথাটি হাণ্টার সাহেবই বলতে পেরেছেন (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) ঃ '১৭০ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল; আজ ধনী থাকাই তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।'[৩৪]

৩৩। প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে— রনবীর চক্রবর্তী

৩৪। Our Indian Musalmans - Hunter (Publishedin 1871) 'A hundred and Seventy years ago it was almost impossible for a wellborn Musalman in Bengal to become poor,at present it is almost impossible for him to continue rich.'

তিন

মুর্শিদাবাদে মুসলিম সমাজের লোকজীবন এবং লোক ঐতিহ্যের ধারা

মানুষের চরমতম দুর্ভাগ্য হ'ল তাঁকে ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করা। মানুষের বয়সকাল বিচার করে জানা যায়, মানুষ টিকে আছেন চল্লিশ হাজার বছর ধরে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ধর্মের বয়স খুব জোর পাঁচ হাজার বছর। স্বভাবতই, প্রশ্ন আসে— বিনাধর্মে মানুষ পঁয়ত্রিশ হাজার বছর বেঁচেছিলেন কীভাবে? চল্লিশ হাজার বছর পূর্বেকার মানুষের সাথে আজকের মানুষের তো বিস্তর ফারাক। এই ফারাককে যদি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের প্রসারের মানদণ্ডে দেখা যায়, তাহলেও প্রশ্ন আসে— এই প্রসারে ধর্মের প্রভাব কতটুকু? হয়ত নেই। কিংবা আছেও। কিন্তু অন্য যাই হোক, রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষানীতি এবং আমাদের বৈষয়িক জীবনে ধর্মের প্রভাবকে আজ আমরা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারছি না। ধর্মই আজ সর্বাধিক আধিপত্য বিস্তার করেছে আমাদের সমাজজীবনে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ধর্মের এই আধিপত্যই আমাদের জনজীবনে উন্নয়নের প্রসারে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাদের হাল করেছে ঠুঁটো জগন্নাথ। সমাজজীবনে নিয়ে এসেছে এক অস্বাভাবিক দেউলেপনা। এখানে ধর্ম বলতে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথাই বলা হচ্ছে। যে ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করছেন, ব্যবসা করছেন বর্ণহিন্দু এবং অভিজাত মুসলমানরা। কেননা, তাঁদের হাতেই আজও আমাদের সমাজ কাঠামো ধরা আছে। এই ধর্মের বাইরেও সমাজের বৃহৎ অংশের জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যকে বুকে আঁকড়ে বেঁচে আছেন। এটাই লোকজীবনের ধারা যা লোকসংস্কৃতি নামে অভিহিত।

লোক ঐতিহ্যের এই ধারায় বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের সংস্কৃতিতে যে ত্রিধারা নজরে আসে তা হল ঃ এক) মুসলিম ঐতিহ্যের ধারা। দুই) হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা। তিন) হিন্দু মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতিসম্পন্ন ঐতিহ্যের ধারা। মুসলিম ঐতিহ্যের ধারাটিকে পুষ্টি যোগাচ্ছেন অভিজাত মুসলমান তথা মৌলভী, মওলানা ও আলেম সম্প্রদায়। হিন্দু ঐতিহ্যের ধারাটিও একইভাবে অক্ষত রেখেছেন বর্ণহিন্দুরা। এই দুই ধারায় সবল-সুঠাম দেহে রয়েছে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের মোড়ক। এই দুই শ্রেণী সংখ্যায় নগন্য হলেও তাঁরাই মূলত সমাজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, বিশাল সংখ্যক নিম্নবিত্ত, ভূমিপুত্র অন্ত্যজ হিন্দু-মুসলিমকে তাঁদের তাবে রেখে বঞ্চিত করছেন, শোষণ করছেন। আর এই ধর্মীয় মূল্যবোধের বেড়া ভেঙে গড়ে উঠেছে মিশ্রসংস্কৃতির তৃতীয় ধারাটি। যার মধ্যে রয়ে গেছে সনাতন এবং আধুনিক, হিন্দু এবং মুসলমান, মানবতাবাদী ধর্মের সংমিশ্রণ। এই-ই আমাদের লোকজীবন। বাঙালি মুসলিমের লোকজীবন। কেননা বাঙালি মুসলমানরা অধিকাংশই অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত; তাঁরা ধর্মান্তরিত হলেও পুরনো সংস্কৃতিকে ছেড়ে দিতে পারেন নি। সনাতন সংস্কৃতিতে নতুন সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই মিশ্র সংস্কৃতির ধারা। এই-ই হচ্ছে মুর্শিদাবাদের বাঙালি মুসলমানের লোকজীবন। সমাজের বৃহত্তর অংশের সংস্কৃতি। পাঠককে তাই স্মরণ করিয়ে দিই— মুর্শিদাবাদেরমুসলিমদের লোকজীবন ও লোকচর্চার ধারায় কোরান, হাদিস ও ইসলামী বিধান আলোচনায় আসেনি। এ আলোচনায় এসেছে, এই জেলার মুসলমানদের সংস্কার ও অভ্যাসগত সংস্কৃতির কথা। মানুষের জীবনে কোরান-হাদিসের ধর্মীয় বিধান যতই জায়গা করে নিকনা কেন- তাঁর জনজীবনে সমান্তরালে চলে আসছে এক প্রথাগত লোকবিশ্বাসের ধারা। লোকচর্চার এই ধারাটিই কেবল এখানে আলোচ্য। ফলে পাঠক কোনক্রমেই— ধর্মীয় বিধানের নিরীখে এই আলোচনা যেন বিশ্লেষণ না করেন। একে বরং Applied Religious Culture হিসেবে অভিহিত করা যায়। ধর্মীয় বিধানের

মূলসূত্রগুলি থেকে আমাদের প্রায়োগিক জীবনের এই ধারা কতটা সরে এসেছে তা না জানতে পারলে লোকজীবনের আসল তত্ত্বটি অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রায়োগিক জীবনের এই ধারাটিকে ধর্মীয় বিধানের পন্থা হিসেবে মেনে নিয়ে আমরা অনেকে বিভ্রান্ত হই। কারণ রিলিজিয়ন এবং কালচার এক নয়। রিলিজিয়ন হচ্ছে Conservative and static অন্যদিকে culture হচ্ছে comprehensive, dynamic and creative বরং বলাচলে, রিলিজিয়ন কালচার নয়— কালচারের এক অংশমাত্র।[৩৫]

প্রত্যেকটি ধর্মের জন্মই তার স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস এবং প্রথার উপর ভিত্তি করে। ধর্মীয় বিধানও নির্মিত হয় সেইসব প্রথাকে ভর করে। ফলে প্রত্যেক ধর্মের বিধানে গোপনে রক্ষিত আছে তার লোকবিশ্বাস। ইসলাম কনিষ্ঠতম সেমিটিক ধর্ম। তাই হজরত মোহম্মদ এর প্রচারিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন আরবের বিশ্বাস, সংস্কার ও অভ্যাস। কোরাণে প্রাচীন আরবীয় ও ইহুদিদের লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের সেই বিশ্বাসের সংস্কার করেছেন হজরত মহম্মদ।[৩৬] এই আলোচনায় অতি সংক্ষেপে মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের লোকভাষা তথা ব্যবহৃত কথ্য ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবাদি, তাঁদের লোকশিল্প, পার্বন ও উৎসব সমূহ, লোকবিশ্বাস ও লোকাচার এবং লোকচর্চার ধারায় শিল্পীদের পরিচয় ইত্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

ক) মুসলিমদের লোকভাষা তথা ব্যবহৃত কথ্যভাষা

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে এবং দক্ষিণপূর্বে বর্ধমান এবং নদীয়া জেলা। দক্ষিণপূর্বের এই অংশে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের সীমা চিহ্নিত করেছে জলঙ্গি। মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে, দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম এবং সাঁওতালপরগণা। জেলার উত্তর এবং উত্তর-পূর্বে গঙ্গা এবং মালদহ জেলা এবং বাংলাদেশ। ফলে পার্শ্ববর্তী জেলা, প্রদেশ কিংবা রাজ্যের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, ধর্ম-সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রভাব মুর্শিদাবাদের প্রান্তীয় এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমা পরিবর্তন করার ফলেও রাঢ় বারেন্দ্র গোষ্ঠীর প্রভাব এসেছে। বিহারের-হিন্দী সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালি ভাষার সাথে মিলে মিশে এলাকার এজেলার ভাষা। ফলে, মুর্শিদাবাদে রাঢ়ী, বাঙালি এবং বরেন্দ্রী উপভাষা সমূহের উপস্থিতি আকর্ষণীয়। মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট, তুর্কি পাঠান আমল থেকেই মুর্শিদাবাদে বহিরাগত মুসমলানদের বসবাস শুরু হয়। জঙ্গিপুর, ভরতপুর সালার, লালবাগের বহু পরিবার তাই এখনও উর্দুভীষা অথবা দ্বিভাষী। বুরহানপুরের মাদারি ফকিররা বাস করেন জঙ্গিপুরে। এঁদের ভাষা শংকর-ফার্সী, উর্দু বাংলা মিশিয়ে। এই জেলায় মৈথেলি, চাঁই, পুণ্ড্র, রাজবংশী, বৌদ্ধ, কাহার, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য বহু ধর্মীয় ভাষাভাষির মানুষ মিলেমিশে বাস করেন ফলে, মুসলিম সমাজের কথ্যভাষার প্রয়োগ সেই অঞ্চলের নিম্নবর্ণীয় গ্রামীণ হিন্দুর মধ্যেও প্রচলিত। এক্ষেত্রে, রাঢ়ের কথ্যভাষার সাথে বাগড়ির কথ্যভাষার যথেষ্ট পার্থক্য নজরে আসে। যেমন রাঢ়ের 'তোদের দেমাকের বাহবা না দিঙ্ যাবো কোতি?' ভাষাটি বাগড়িতে বদলে হয়ে যায় 'তুদের বুধধির তারিফ না কোর‍্যা যাবো কুন্‌ঠে?' 'শুতে যাও' শব্দ দুটি ক্ষেত্র বিশেষে হয়ে যায় (১) শুদোগে যাও, (২) শুতি যাও (৩) শুইঙ্ পড়ো ইত্যাদি। ফলে, এ জেলার মতো এত বেশি বৈচিত্রময় কথ্যভাষা অন্য জেলাতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাঢ় ভূখণ্ডের বিশেষ করে কান্দি ও লালবাগ

৩৫। মুসলিম সমাজ এবং এই সময় (২য় খণ্ড) সম্পাদনা/মইনুল হাসান

৩৬। আরব ঈশ্বর— বাহারুদ্দিন (সম্বনয় শারদ ১৯৯৩)

মহকুমার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য উল্লেখের দাবি রাখে ঃ এ অঞ্চলে রাতি-রেত, জাতি-জেত, মশা-মোশা, দোকান-দুকান, কাপড়-কাপুড়, পেট-প্যাট, তেল-ত্যাল, বাসন-বাসুন, সময়-সুমায়, সোমবার-সুমবার, শাক-শাগ, নাতিন-লাতিন, নয়-লয়, ধরলে-ধল্লে (কুন দুখ্যে বিটি ধল্লাম প্যাটে), মরল-মোলো (ছুঁড়াটা পুঁয়া লাচিয়েই মোলো), উট-উঁট, কাচ-কাঁচ, খেয়ে-খেঁয়ে, নোট-লোট, নৌকা-লৌকা, শুক্র-শুকুর, গম-গহম হিসেবে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হয়। বীরভূমের রাজগ্রাম, মুরারই, চাতরা, নলহাটি, লোহাপুর, ভদ্রপুর, রামপুরহাট, মল্লারপুর, সাঁইথিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার নিকটবর্তী হওয়ায় সাগরদিঘি, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, বড়োঞা থানার সবকটি অঞ্চল এবং রঘুনাথগঞ্জের জরুর অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্য বীরভূমের কথ্যভাষাকে ছুঁয়ে আছে। এই অঞ্চলের মুসলিমদের ব্যবহৃত কিছু কথ্য ভাষার উদাহরণ ঃ থুব্যা (রাখবে), কোতি (কোথায়), গড়হ্যা (ডোবা), গুহাল (গোয়াল), মালয় (কলসির ঢাকনা), ক্যানে (কেনো), ছেঁচকা (খুন্তি), লেঙুড় (লেজ), পেছ্যা (ঝুড়ি), শরীল (শরীর), কোয়্যা (কাক), থুঙেছে (রেখেছে), জাড় (শীত), শালুন (তরকারি), টকি (সিনেমা), পাশনা (কোদাল), ছোড়ান (চাবি), বলটিন (বালতি), ব্যারাম (অসুখ), কাড়ান (বর্ষা), বয়জা/আণ্ডা (ডিম), গিদ্যার (সোহাগ) প্রভৃতি।

অন্যদিকে ফরাক্কা, সমশেরগঞ্জ, সূতি, জঙ্গিপুর থানার সমগ্র অঞ্চল, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা ও ভগবানগোলার একাংশে হিন্দী ও উর্দু ভাষার মিশেল এবং বরেন্দ্রী উপভাষার প্রভাব রয়েছে। যেমন — অরঘের (উহাদিগের), কড়ে (দিকে), কুনঠে (কোথায়), গুধা (শিশু) বহনু (ভগিনীপতি), ওর (শেষ), চন্নু (চললাম), পেনু (পাইলাম), হামি (আমি), এডা (এটা), কেডা (কে), কোনডা (কোনটা), আসতা (রাস্তা), ওদ (রোদ) ইত্যাদি। ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, অরঙ্গাবাদ, ভগবানগোলা, আখেরিগঞ্জ এবং বেলডাঙ্গার কিছু অংশে মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই এক আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেন যা খোট্টা বা খোট্টাই নামে পরিচিত। প্রাচীন মগধ রাজ্যের কথ্যভাষা মগধী বা মগহী। অনেকেই এই মগহীর বিবর্তিত রূপকে খোট্টাই বলেছেন। স্বাভাবিক নিয়মেই এই বিভাষার মধ্যে ভোজপুরী, মৈথিলীও মিশ্রিত আছে। মানভূমের পশ্চিম এলাকায় ‘কোরঠা’কে খট্টা বলে। মানভূমের অন্য এলাকায় খট্টার নাম খোট্টাহি। অনেকের ধারণা, খোট্টাহি শব্দটি থেকেই এই খোট্টা বা খোট্টাই ভাষা। খোট্টাই ভাষার কয়েকটি উদাহরণ ঃ আঁড়িয়া (ষাঁঢ়), গিদাড় (শেয়াল), চুহরি (ইঁদুর), বিল্লি (বিড়াল), মাদা (পুরুষ), ডোল (বালতি), নান (ননদ), ছোড়ি (বালিকা), চাচ্চা (কাকা), জাও (জা), লেরু (বাছুর), থৈল্যা (থলে) ইত্যাদি।

বাগড়ি অঞ্চলের জিয়াগঞ্জ, লালবাগ, বহরমপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানীনগর এলাকাতে কুষ্টিয়া রাজশাহীর প্রভাব আছে। অন্যদিকে জলঙ্গি, ডোমকল, হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা অঞ্চলে নদীয়ার প্রভাব এসেছে। যেমন— এডা (এটা), কেডা (কে), নিছো (নিচ্ছ), দিছো (দিচ্ছ), খেতুক (খেতাম), কন্নু (করলাম), লৈকা (নৌকা), বুন (বোন), দুকান (দোকান), বায়গুণ (বেগুন), কাউয়া (কাক), আনাজ (শস্য), তাকিয়া (বালিশ), বিহ্যা (বিয়ে), মুছ (গোঁফ) জেনানা (স্ত্রীলোক) ইত্যাদি।

খ) মুর্শিদাবাদে মুসলিমদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবাদি এবং তাঁদের খাদ্যাভ্যাস

এদেশে মুসলমানদের আগমণের পূর্বে দর্জির কাজ কেউ জানতনা। সেলাই বিহীন বস্ত্র ব্যবহৃত হত তখন। বাঙালির পোষাকের চৌদ্দ আনা মুসলমানদের দান। মুসলমানদের কাছ থেকেই বাঙালিরা জামা, মোজা, কামিজ, পিয়ান, রুমাল, পা-জামার ব্যবহার শিখেছেন। মুসলমানদের

আমল থেকেই মখমল, শাল পশমীর কাপড়, শাল এবং আলোয়ানের ব্যবহার এসেছে। কেবলমাত্র শাড়ি এবং ধুতিই বাঙালির নিজস্ব গৌরবের। পা-জামা, পাঞ্জাবি, শালোয়ার, কামিজ এসব তো মুসমলানদেরই পোষাক-পরিচ্ছদ। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এখন এইসব পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করছেন।

বাঙালি জীবনে মুসলমানী প্রভাব আসবাবপত্র ব্যবহারেও লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানদের থেকেই বাঙালিরা তখতপোষ, তোষক, তাকিয়া, বালিশ, গালিচা, সিন্দুক, আয়না, শামাদান, দেয়ালগীর, ফানুস, মশাল, রোশনাই, ঝালর, পরদার ব্যবহার শিখলেন। সাবান, চশমা, সেতার, তবল, ঢোল, পিতলের ঘড়া, থালা, ঘটি, বাটি, দেঘচি, তশতুরী, সুরাই এবং কুজার ব্যবহার বাঙালি জীবনে আজ অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

'মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন ঃ 'মুসলমানি যুগে আহারা মোগলাই খানা খাইয়াছে, ফারসী ভাষা শিখিয়াছে, কিন্তু কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করে নাই।' মুসলিম ধর্মে বিলাসীতাকে প্রশ্রয় না দিলেও মুসলমান বড়লোকেরা যথেষ্ট বিলাসী ছিলেন, মোগল ও নবাব আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর ওমরাহ এবং অভিজাত মুসলমানদের মধ্যেও খাওয়া পরার অভ্যাসেও যে চরম বিলাসীতা লক্ষ্য করা গেছে, একথাটিই সৈয়দ মুজতবা আলী বলতে চেয়েছেন। এরই অনুকরণে বাঙালি সমাজে জায়গা করে নিয়েছে পোলাও, কোর্মা, কোফ্‌তা, কালিয়া, কাবাব, সিরকা, আচার, মোরব্বা, সরবৎ, পানীয়, হালুয়া ইত্যাদি। নিম্নবিত্ত বাঙালি মুসলিম এইসব খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে না থাকলেও কোনও আচার অনুষ্ঠানে এইসব খাদ্যের প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়। এইসব ভূমিপুত্র মুসলিমদের জনজীবনে এমন কঁতকগুলো খাদ্যাভ্যাস দেখা যায় যা তাঁদের একেবারেই নিজস্ব। যেমন, ভাদ্রমাসে তালের সময়ে তালের রুটি, ফুলুরি, বড়া, কেক, শীতের সময়ে চালের আটা দিয়ে প্রস্তুত করা ধুকি বা ভেকা, পালো, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে আঁধোসা, পাকোয়ান, তিলপিঠে প্রভৃতি এইসব ভূমিপুত্র মুসলমানদের নিজস্ব নিয়মে প্রস্তুত করা খাদ্য।

গ) মুর্শিদাবাদে মুসলিমদের লোকশিল্প

শ্রমসাধ্য কারুশিল্পে মুসলিমদের প্রাধান্য ছিল মধ্যযুগ থেকেই। মোগল তথা নবাব আমলেও জোলা বা বয়নশিল্পে, রাজমিস্ত্রির কাজে, সূচিশিল্পে মুর্শিদাবাদের মুসলিমরা একচেটিয়া শ্রম দিয়েছেন। জিয়াগঞ্জের বালুচর ও কাশিমবাজারের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ছিল। ভৈরব ছিল তখন মূল বাণিজ্যপথ। ভৈরবের দু'পাশে গড়ে উঠেছিল ব্যবসা ও হস্তশিল্পকেন্দ্র। ভৈরবের গা ঘেঁষে চক ইসলামপুর, ফতেপুর, তরতীপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি তখন গড়ে উঠেছিল রেশম ও সূতীবস্ত্র শিল্পীদের নিয়ে। জঙ্গিপুরের অরঙ্গাবাদে একসময় কাগজ তৈরি করতেন কাগজী মুসলমানরা। শা উপাধিধারী কলুদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল হরিহরপাড়ার স্বরূপপুর, রানীনগরের নলবাটা, ডোমকলের বঘারমনা গ্রামগুলি। এ জেলার বিপুল সংখ্যক হস্তশিল্পী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায়। জঙ্গিপুর মহাকুমার ও অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ করে লালগোলা, ভগবানগোলা ও বহরমপুর মহকুমার বহু জায়গার এক বিশাল সংখ্যক রাজমিস্ত্রিকে কলকাতা বোম্বাই ও ভারতের অন্যপ্রান্ত গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়। এঁদের অধিকাংশই মুসলমান। জঙ্গিপুরের বহু স্বর্ণশিল্পী মুসলমানদের বোম্বাই-এর স্বর্ণবাজারে কাজ করতে দেখা যায়।

ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিড়ি শিল্পকেন্দ্র জঙ্গিপুর-মহকুমায় অবস্থিত। এই মহকুমার জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, নিমতিতাতে ২৫টিরও অধিক বিড়ি কারখানাগুলি অবস্থিত। লক্ষাধিক

মানুষ এই শিল্পের সাথে নিযুক্ত। এই অঞ্চলের সত্তর শতাংশ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এর প্রায় ৬০ শতাংশ শিল্পীই মুসলমান। সাত কোটিরও বেশি বিড়ি উৎপাদিত হয় প্রতিদিন। এই কারখানাগুলি থেকে প্রতিদিন ট্রাকে করে বিড়ি যায় আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে তাঁত বস্ত্রও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মীর্জাপুর, পিয়ারাপুর, নায়াপাড়া, জোতকমল, তেঘরি অঞ্চলে গরদ ও কোরিয়াল শাড়ির কাজ হয়। রঘুনাথগঞ্জের গোফুরপুর বরজ, মহম্মদপুর, সেকেন্দ্রা, ফরাক্কার মহাদেবনগর, মহেশপুর, অর্জুনপুর, সূতী ব্লকের বাহাদুরপুর, অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান, নিমতিতা, সামশেরগঞ্জ ব্লকের সামশেরগঞ্জ, কৃষ্ণপুর, জয়কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, লালগোলা, বেলডাঙ্গা অঞ্চলে সুতী শাড়ি, টাঙ্গাইল, গামছা, মশারি, লুঙ্গি প্রভৃতি বয়নের কাজে যুক্ত আছেন লক্ষাধিক মানুষ। এই শিল্পেও মুসলিমদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ শহরের পশ্চিমপ্রান্তে খড়খড়ি ব্রিজ পেরিয়ে আনুমানিক ১৩০১ সালে গড়ে উঠেছিল গাড়োয়াল সম্প্রদায়ের গোপালনগর (শ্রীকান্তবাটি গ্রামটি)। এই গ্রামেই জেলার একমাত্র পশম শিল্পের সাক্ষাৎ মেলে। বিহারের গাড়োয়ালপাহাড় থেকে উঠে আসা একটি জনপদ। এঁরা হিন্দু ছিলেন না মুসলমান বলা মুসকিল। কেননা, এই গ্রামটি রাস্তার দু'পাশে বিস্তৃত— একপাশে হিন্দু পশমশিল্পীরা, অন্যপ্রান্তে মুসলিম পশমশিল্পী। নিমতিতা-অরঙ্গাবাদের আলমশাহীতে কম্বল তৈরির কাজ হয়।

মুসলিম ঘরানার কিছু নিজস্বতা আছে যা এই জেলার বেশ কিছু লোকশিল্পেও ছাপ ফেলে গেছে। এই সব লোকশিল্প মুসলিমদের নিজস্বতায় ভাস্বর। এর মধ্যে কাঁথাশিল্প, ওয়াড়, হাতপাখা, টুকি /সরপোশ/ ডালি, শিকা শিল্প, পাটি/ শীতলপাটি উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পে যুক্ত আছেন মুসলিম মহিলা বা গৃহিনীরা। আর মাটির ঘর, শস্য ভাণ্ডার /ধানের গোলা/ কুঠি, বালাপোষ ইত্যাদিতে পুরুষরা নিযুক্ত। নিম্নে এইসব শিল্প নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

কাঁথাশিল্প

বাংলার কাঁথাশিল্প মুসলিম লোকজীবনে ঐতিহ্যবাহী এবং অতুলনীয় লোকশিল্পের নিদর্শন। এই শিল্পে নিতান্তই নারীদের চারু ও কারুশিল্পের প্রতিভা বিকশিত। এই শিল্প নিতান্তই নারীশিল্প, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের। এই শিল্প কোনও রমণী প্রথাগত বিদ্যা থেকে গ্রহণ করেন না। বাড়ির বর্ষীয়ান মহিলাদের কাছ থেকে রপ্ত করেন অল্প বয়সী মেয়েরা। এভাবেই কাঁথাশিল্পের পরম্পরা অব্যাহত। এর জন্য লাগে পুরনো কাপড়। পুরনো শাড়ি বা ধুতিকে একের পর এক সাজিয়ে তার উপর বাহারি নকশা রঙিন সুতোর ফোড় দিয়ে বানানো হয়। এই সেলাইয়ের নানা কারুকার্যে তৈরি হয় বৈচিত্র্যময় নকশি কাঁথা যা আমাদের দেশজ, সামাজিক, ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাসকে সামনে হাজির করে। এই কাঁথাতেই গ্রামীণ মেয়েদের প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ-মমতা এবং আবেগমথিত কল্পনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাঁথা সেলাইয়ের মরশুম সাধারণত গ্রীষ্ম-বর্ষা। এই সময়ে বাড়ির গৃহিনীদের কাজ কম থাকে। বাড়ির কাজ সেরে, খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরে নির্জনে বসে কিংবা একসঙ্গে দু-তিনজনের এক একটি গ্রুপ কাঁথা সেলাই করেন।
কাঁথা সেলাই পল্লী রমণীর জীবনের একটি অংশই। কাঁথা উপহার দেওয়ার চল আজও আছে। বিয়েতে কনের সাথে কাঁথা যায়। নবজাতক সহ কন্যা শ্বশুর বাড়িতে সঙ্গে কাঁথা নিয়ে যান। এভাবেই এক অঞ্চলের শিল্প কাঁথা হস্তান্তরের মাধ্যমে অন্য অঞ্চলে প্রভাব ফেলে। এই জেলার প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে কমপক্ষে দশজন মহিলা পাওয়া যাবে যাঁরা কাঁথা সেলাইয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন। গ্রামে তাঁদের কদর আছে। অনেকেই তাঁদের পারিশ্রমিক দিয়েও কাঁথা

সেলাই করিয়ে নেন। এই কাঁথা সেলাইয়ের পেছনে অনেক লোকসংস্কার জড়িয়ে রয়েছে। যেমন, মাগরিব (সন্ধ্যা)র আজান পড়লেই কাঁথা সেলাই বন্ধ হয়ে যায়। কথিত আছে, সন্ধ্যা বা রাতে কাঁথা সেলাই দারিদ্র নিয়ে আসে। গর্ভবতী মেয়েদের কাঁথা সেলাই করতে দেওয়া হয় না। সন্তান মারা যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়। কাঁথা সেলাইয়ের শুভারম্ভ শুক্রবারেই করা হয়। শনিবার কিংবা মঙ্গলবার সেলাই বন্ধ থাকে।

মুসলিম পরিবারে এই কাঁথার অনেক ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে সুজনি কাঁথা, লেপ কাঁথা শয্যায় ব্যবহৃত হয়। একমাত্র শয়নে ব্যবহৃত কাঁথাকেই গ্রামে কাঁথা বলে অভিহিত করা হয়। বাকি কাঁথাগুলি ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। যেমন এক) দস্তুরখানা— এটি সুজনি কাঁথার মতো মোটা হয় না। দৈর্ঘে প্রস্থে ছোট। দৈর্ঘে ৬-৮ ফুট এবং প্রস্থে ২-৪ ফুট। এই দস্তুরখানায় ফুল-লতা-পাতার নক্সা করা হয়। এটি ব্যবহৃত হয় অতিথিদের খাদ্য পরিবেশন করার সময়। এর উপরেই খাবারের থালা-বাটি রেখে অতিথিদের খাওয়ানো হয়। দুই) বর্তন কাঁথা— এটি সাইজে রুমালের থেকে একটু বড়ো। খাবারের প্লেটের ঢাকনা হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এই কাঁথাতেও নক্সা থাকে। তিন) বস্তানি কাঁথা— ট্রাঙ্ক বা সুইটকেসের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয় এটি। সুইটকেস সাইজের চতুষ্কোণ ব্যাগ তৈরি করা হয় এই কাঁথা দিয়ে। লম্বা ফিতে দিয়ে মুখ বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। চার) গিলাফ — এটি কোরাণশরীফ রাখার থলি। এর তিনদিক সেলাই করে একদিক খোলা রাখা হয় এবং খোলা দিকে ফিতে দিয়ে বাঁধার ব্যবস্থা থাকে। আর একধরণের কাঁথাকে গেলাফ বলে। এটি শাল বা চাদর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ) মাজারের কাঁথা— মাজারের ঢাকনা হিসেবে এই কাঁথা ব্যবহৃত হয়। ছয়) গোরুর গাড়িতে যাওয়ার সময় পর্দা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এক ধরণের পাতলা নক্সা করা কাঁথা। উল্লেখ্য এইসব কাঁথাতে কোনও মূর্তি ব্যবহৃত হয় না। মানুষ, পশুপাখির নক্সা এতে নিষিদ্ধ। ফুল লতাপাতা চাঁদতারা বা জ্যামিতিক নক্সা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় এইসব কাঁথাগুলি।

ওয়াড়

সূচিশিল্পে মুসলিম নারীদের প্রতিভা আরও একবার প্রমাণিত হয় এই ওয়াড়ের ফুলতোলার কাজ দেখে। বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর কিংবা লেপের ওয়াড়ে মেয়েরা সূচসুতো দিয়ে নানান নক্সা তৈরি করেন। গ্রামে বেশ কিছু বাড়িতে নক্সা করা বড় রুমাল বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে দেখা যায়। এইসব ওয়াড়ে বা রুমালে 'মনে রেখো' জাতীয় বা প্রেম জাগৃতি বিষয়ক কবিতার দু-এক পংক্তি সূচ সুতো দিয়ে লিখে নেওয়া হয়। প্রিয়জনকে তাঁর প্রেমের প্রকাশ এভাবেই গ্রামের মেয়েরা নিবেদন করে থাকেন।

হাতপাখা

বাড়ির গৃহিনীদের অন্যতম শিল্পভাবনা হাতপাখা। পাখা দু'ভাবে তৈরি করা হয়। এক) তালপাতা বা খেজুরপাতা দিয়ে বোনা, দুই) কেবল মোটা সুতো দিয়ে বোনা। তালপাতা বা খেজুরপাতা দিয়ে তা একটি সরু বাঁশের শিরের ফ্রেমে বোনা হয় পাখা। কিংবা এই ফ্রেমে একের পর এক সুতো বুনে তৈরি হয় বিচিত্র ধরণের পরিশীলিত পাখা। এই পাখা যেমন রঙিন হয়, তেমনি নকশাও করা হয় এই পাখাগুলিতে। সরু বাঁশের হাতলে পাখার দণ্ডটি এমনভাবে ঢোকানো হয় যাতে পাখাটি সহজেই ঘোরানো যায়। এই পাখার মধ্যেও রয়েছে এক রুচিশীল আবেদন।

টুকি /শরপোষ/ডালি

খেজুরপাতা বা তালপাতার ফোঁড় দিয়ে ছোট ছোট পাত্র তৈরি করা হয়। একে টুকি/ডালি বলে।

এগুলি মুড়িখাওয়া পাত্র হিসেবে বা শুকনো কোনো জিনিস রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর এই পাতা দিয়েই বোনা হয় শরপোষ। এটি খাবারের থালার ঢাকনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পল্লীগ্রামে এর ব্যবহার দেখলে চমকে যেতে হয়। বাহারি রঙের ও ডিজাইনের এইসব গৃহশিল্প সহজেই মন জয় করে নেয়।

পাটি/শীতলপাটি

তালপাতা বা খেজুরপাতা দিয়ে তৈরি শীতলপাটি বাংলায় যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। গ্রামের মেয়েরা অবসর সময়ে খেজুরপাতা শুকিয়ে পাটি বোনেন। বিভিন্ন ভ্যারাইটির ডিজাইন তৈরি করে, ফুল লতাপাতার নক্সা তৈরি করে হাতের কারুকাজকে সূক্ষ্মভাবে গ্রামজীবনের এক অপরিহার্য গৃহসামগ্রী হিসেবে পেশ করেন পল্লীগ্রামের মেয়েরা। বিছানাতে, বসতে দেওয়ার আসন হিসাবে এর ব্যবহার মর্যাদা পেয়েছে। গ্রামবাংলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে কাঁথাশিল্পের পাশাপাশি শীতলপাটিও নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে।

শিকা শিল্প

বিশেষ করে ইঁদুর, বিড়াল ও হাঁসমুরগীর উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খাদ্যসামগ্রী বা অন্য কিছু নিরাপদ জায়গায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় শিকা। এটি শণ কিংবা পাট দিয়ে তৈরি করা হয়। শণ কিংবা পাটের দড়ির ঘেরা তৈরি করে এতে নানান রঙের প্রলেপ লাগিয়ে মনমুগ্ধকর করা হয়। এই শিকা ঘরেরে কোনও জায়গায় লটকিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা হয়। শিকার ভিতরে ভাঁড় বা হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই শিকা কড়ি সাজিয়েও অনেককে বানাতে দেখা যায়।

পুষ্প শিল্প

নবাবী আমলে যাট সত্তরটি পরিবার পুষ্প শিল্পে জীবিকা অর্জন করতেন। বাড়িতেই খাস, কুন্দ, জুঁই প্রভৃতি বাগানও তৈরি করতেন তাঁরা। এঁরা ফুলকে সুতো দিয়ে গেঁথে শালমা, চুমকি, বুলেন, শোনা, কিরণ ইত্যাদি মালা ও সেহেরা প্রস্তুত করতেন। ফুল দিয়েই চাদর ও মশারী তৈরিতেও এঁরা দক্ষ ছিলেন। জানা যায়, এরজন্য রজনীগন্ধা, গোলাপ, গাঁদা ইত্যাদি ফুল হাওড়া হাট থেকে কিনে আনা হত। এই পুষ্পশিল্পীদের মধ্যে হিঙ্গল বিবি, জুম্মন বিবি, মুন্না মীর্জা, লাভলী বিবির নাম উল্লেখযোগ্য।

বালাপোষ

মূলত নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্প মুর্শিদাবাদে সমৃদ্ধি লাভ করে। বালাপোষের জন্য লাগে ত্রিশগ্রাম তুলো, দুটুকরো সিল্ক, গরদের কাপড় ও দু'টুকরো মসলিন। তুলো ধোনার কাজটিই কঠিন। ধুনুরিদের মধ্যে গোলাপ ধুনিয়া, রমজান ধুনিয়া, মোগল ধুনিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। সেলাইয়ে রেশম সুতো ব্যবহৃত হয়। বালাপোষে কোথাও কোনও সেলাই থাকে না, কেবল চারপাশে বর্ডারের মতো একটা কাপড় সেলাই করা হয়। একে মুগজি/লালদিয়া বলে। মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বালুচর, খাগড়া এবং গোরাবাজারে বালাপোষ প্রস্তুত করা হয়। শিল্পীদের মধ্যে রমজান সেখ, মুনির হোসেন, মানোয়ার খলিফা, রহমান খলিফা, বকসু খলিফা, সুমনা বিবি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বালাপোষের বিখ্যাত শিল্পী আতর আলি খাঁর নাতি সাখাবাত হোসেন এই শিল্পের ধারা বহন করে চলেছেন।

মাটির ঘর

কান্দি, জঙ্গিপুর এবং লালবাগ মহকুমার রাঢ় অঞ্চলের মাটি শক্ত এঁটেল। এঁটেল মাটি শক্ত

বলেই এই অঞ্চলে খুব ভালো ভালো মাটির তৈরি ঘর দেখতে পাওয়া যায়। ঘরগুলি খড়/টালি কিংবা টিনের ছাউনিযুক্ত। এই ঘরগুলি দোতলা বা তিনতলাও হতে দেখা যায়। চালাগুলি দোচালা, চারচালা বা কাটাচালার। এই মাটির গৃহ নির্মাণে যারা যুক্ত থাকেন তাঁদের ঘরামি এবং বাড়ুই বলে। বাংলার সুলতানরা এই ঘরের রূপে মোহিত হয়ে ধর্মীয় স্থাপত্যে এর প্রচলন শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই বাস্তুশিল্পে। এই শিল্পের জন্য পাড়া গ্রামে ঘরামি এবং বাড়ুইয়ের যথেষ্ট কদর ছিল।

শস্য ভাণ্ডার/ধানের গোলা/কুঠি

মাটির দেওয়াল দিয়ে (তুলনায় অনেক হাল্কা) মাটির বাড়ি তৈরি করার মতোই কাদা-মাটি গেঁথে তোলা হয় শস্য ভাণ্ডার বা ধানের গোলা। চার থেকে ছয় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই দেওয়াল ঘেরাটি উঠোনের এক কোণে নির্মিত হয়। ছাউনি করা হয় একই পদ্ধতিতেই। গোলাটির প্রবেশদ্বার থাকে। রাঢ় অঞ্চলের গৃহস্থরা ধান-গম সংরক্ষণ করেন এই গোলায়। অনেকে খড়ের 'বড়' পাকিয়ে 'বড়' দিয়ে একের পর এক সাজিয়ে তার উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে নির্মাণ করেন এই গোলা। এর আকৃতি গোলাকার অনেকটা লাট্টুর মতো। গৃহিনীরা শস্য সংরক্ষণের জন্য বাড়ির কোণে ছোট ছোট আকারের মাটির কুঠি নির্মাণ করেন। এর আকৃতি গোলার থেকে অনেক ছোট হয়। শস্যবীজ এতে ভালো থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সর্বত্রই এই গোলা বা কুঠির চল্ আছে। এইরকম ছোট ছোট মাটির ঘর তৈরি করে গৃহিনীরা হাঁস মুরগী রাখার ব্যবস্থা করেন। একে অনেকেই 'খুল্লা' বলেন।

ঘ) পণ্য বেচা-কেনা ও হাটবাজারে মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজ

হাট মানুষের জীবনধারাকে ব্যবসায় নতুন দিগন্ত দিয়েছে যা আজও গ্রামাঞ্চলের বুক ভেদ করে গুঞ্জরিত হয়। মুর্শিদাবাদের কয়েক লক্ষ গরিব মানুষ বিশেষ করে এর ষাট শতাংশ মুসলিমরা হাট থেকেই তাঁদের দিনযাপন করেন। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একসময় হোসেন শাহ ও পালরাজারা হাটের উপর জোর দিয়েছিলেন তার নজির এখনও বর্তমান মহীপালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। সাগরদিঘি থানার এই অঞ্চলটিতে পরপর সাতটি গ্রামের নাম হাট দিয়ে। যেমন, হুকার হাট, দস্তুর হাট ইত্যাদি। নবাবী আমলে ধর্মস্থান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচ চালানোর জন্য হাট বসানো হত। কাটরা মসজিদের অধীনে কাটরা (বাজার) বসানো হয়েছিল। বর্তমানে অরঙ্গাবাদের জামা মসজিদ হাট, ধুলিয়ান হাই মাদ্রাসা হাট, ত্রিমোহিনী হাই মাদ্রাসার হাটের আয় সন্নিহিত মাদ্রাসা ও মসজিদে যায়। স্বভাবতই হাটের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন লক্ষাধিক মানুষ। তাঁরা কেউ কেউ ক্ষুদ্র চাষি, কেউ ক্ষেতমজুর, কেউ ক্ষুদে ব্যবসায়ী, কেউ কেউ লোকশিল্পের উদ্গাতা। হাট বাজারে মুর্শিদাবাদ মুসলিম লোকজীবনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। গ্রামগঞ্জের খেটে খাওয়া গরিব মুসলিম মানুষের মধ্যে বেশির ভাগ ধানচালের ব্যবসা করেন। মোগল এবং নবাব আমলেও এই ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন অন্ত্যজ শ্রেণীর মুসলিমরা। শাক্সব্জীর সাথেও যুক্ত আছেন বহু মানুষ। এইসব পণ্য বেচা কেনার কেন্দ্রস্থল হাট।

সরকারি তথ্য অনুযায়ি মুর্শিদাবাদে ১৯৫১সালে ১১১ টি, ১৯৯৩ সালে ১৪০ টি এবং ২০০1 সালে ৮০ টি হাটের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও বেশকিছু হাট মুর্শিদাবাদে চলে কিংবা আরও কিছু হাট বন্ধ হয়ে গেছে, যার উল্লেখ সরকারি তথ্যে নেই। সরকারি তথ্যে যেসব প্রাচীন হাটবাজারের সন্ধান পাওয়া যায় তা এরকম ঃ জিয়াগঞ্জ (১৭৫০), কান্দি (১৭৫৩),

লালবাগ পাঁচরাহার বাজার (১৭৯২), পাঁচথুপি (১৮০০), ধুলিয়ান (১৮০০), জঙ্গিপুর (১৮০১), রঘুনাথগঞ্জ (১৮০৩), গোকর্ণ (১৮০৬), মীর্জাপুর (১৮৪৫), অরঙ্গাবাদ (১৮৫০), মিঞাপুর (১৮৫০), জলঙ্গি (১৮৫০), ভবানীমাটি (১৮৫১), নয়নসুখ (১৮৫১), মহালন্দী (১৮৫৩), সালার (১৮৫৬), রানীতলা (১৮৮০), ইসলামপুর (১৮৮০), লালগোলা (১৮৮০), আমতলা (১৮৮১), আখেরিগঞ্জ (১৮৮১), ডোমকল (১৮৮২), ত্রিমোহিনী (১৮৮৮), পাটকেবাড়ি (১৮৯২), পাড়দিয়াড় (১৮৯৫) ও বেলডাঙ্গা (১৮৯৭)।[৩৭] এখন যে হাটগুলি বসছে এবং পশু ও পণ্য বেচাকেনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেগুলি হ'ল ঃ পশুহাট — সোমবার-লালবাগ, মহলন্দী, কুলগাছি, মঙ্গলবার— সাগরদিঘি, বেলডাঙ্গা; বুধবার— জিয়াগঞ্জ; বৃহস্পতিবার— মণিগ্রাম, ওমরপুর; শুক্রবার— শেরপুর, লালবাগ; শনিবার— ভগবানগোলা এবং রবিবার— শেরপুর, লালবাগ, ডাকবাংলা, কুলগাছি ও উমরপুর। মিশ্র পণ্যের হাট ঃ বড়ঞা থানার গ্রামশালিকা কান্দির ডাকবাংলা, খড়গ্রামের শেরপুর, ডোমকলের গড়াইমারি, জলঙ্গির ভাদুড়িপাড়া, সাগরদিঘি, রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর, কুলগাছি, ধুলিয়ানের লক্ষ্মীপুর, ভগবানগোলার রামবাগ, তেলিপাড়া, লালগোলার পাইকপাড়া, দয়ালসরাই, নসীপুর, ইলিয়াসপুর, ভাটারহাট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চালক্রয় বিক্রয় ঃ চাল বেচাকেনার জন্য মিঞাপুর, রতনপুর উল্লেখযোগ্য। এইসব হাটের অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ক্রেতা, বিক্রেতা যেমন মুসলিম তেমনি অধিকাংশ হাটের মালিকও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। যেমন, সালারের হাটের মালিক চৌধুরী নুরুল কাদির, মহলন্দী হাট চালান আব্দুল মান্নান ও অন্যান্যরা, ভগবানগোলা রামবাগ হাটের মালিক মোশারফ হোসেন, হরিহরপাড়ার বারুইপাড়া হাটের আব্দুল বারি, আমতলা সর্দার ব্রাদার্স হাটের খালেক সর্দার এবং অন্যান্য, পাঁচগ্রাম হাটের মালিক মীর আলম, মীর আবু তাহের ও অন্যান্যরা।

হাটের বিশেষত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে আরও দুটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। এক) মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হওয়ায় মুর্শিদাবাদের হাটের গুরুত্ব বেড়েছে। এই হাটগুলির মাধ্যমেই বাংলাদেশে চলে যায় গবাদি পশু, চাল ও অন্যান্য পণ্যাদি। আবার সস্তা কাপড় ও অন্যান্য পণ্য বাংলাদেশ থেকেও হাটে আসে। ফলে, অর্থ বিনিয়োগের মাত্রা যেমন বেড়ে যায়, লাভের অঙ্কও বাড়ে সেভাবেই। দুই) হাটেই মূলত লোকশিল্পীদের খোঁজ মেলে। বাড়িতে নির্মিত কুটির শিল্পের সামগ্রী একমাত্র হাটেই বিক্রয় করা হয়। আলকাপ, বাউল, পঞ্চরস কিংবা অন্যান্য লোকনাট্যের শিল্পীদেরও এই মেলায় দেখা যায়। সুতরাং মুর্শিদাবাদের লোকঐতিহ্যে বিশেষত মুসলিম জনজীবনে হাটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ) মুর্শিদাবাদে মুসলিম সমাজের পার্বণ ও উৎসব সমূহ

হিজরী বা সন ঃ প্রাচীন আরবীয়রা চান্দ্র ও সৌর বর্ষের নিয়ম অনুসারেই দিনবছর গণনা করতেন। তাঁদের ঋতু নির্ধারণও ছিল এই নিয়মানুসারেই। হজরত মোহম্মদ নির্দেশিত প্রত্যেকটি উৎসব ও পার্বণ এই চন্দ্রমাস বা সৌরবর্ষ কেন্দ্রিক। চান্দ্রমাসের বছর শেষ হয় ৩৫৪ দিনে। সাধারণ বৎসরের হিসেবে যা এগারদিন কম। এর ফলে ৩৩ টি মুসলিম বর্ষ ৩২টি সৌরবর্ষের সমান। মুসলিমদের ব্যবহৃত মাসগুলি হল— মহরম, শফর, রবিয়ল আওয়াল, রবিয়স সানি, জমদিয়ল আওয়াল, জমদিয়স সানি, রজব, সাবান, রমজান, শওয়াল, জেলকদ ও জেলহজ্জ। এই ইসলামী মাসের সাথে তার পরবগুলির সম্পর্ক নিয়ে একটি প্রচলিত ছড়া আছে ঃ

মহরমে ডাহের চাঁদ দশ দিনে খানা

৩৭। লোক (হাট সংখ্যা)

শফর তেজির চাঁদ ত্রিশ দিনে মানা
রবিয়ল আওয়ালের ওয়াকতের চাঁদ বারো দিন বাতি,
রমজানের চারচাঁদে করিবেক শাদি।
শাবানে সোবরাতের চাঁদ চৌদ্দ দিনে বাতি,
রমজানেতে রোজা আর শওয়ালেতে ঈদ,
জেলকদেতে কাম নাই জেলহজ্বে বকরীদ।

ভোর, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রিকে আরবে বলে যথাক্রমে ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা। দিনের পাঁচবেলার নামাজকে এই সময় দিয়েই চিহ্নিত করা হয়।[৩৮]

রমজান ও ঈদ ঃ হিজরি মতে, রমজান নবম মাসের নাম। এই নামটিই কেবল কোরাণে উল্লিখিত আছে। এই একমাস ধরে উপবাস পালন করেন মুসলিমরা। উপবাস পালনের পরদিনই পালিত হয় ঈদ। হাদিসে উল্লেখ আছে, এই মাসে উপবাসকারীর জন্য স্বর্গের দরজা খুলে যায়, রুদ্ধ হয় নরকের দরজা। এই মাসটি মুসলিমদের কাছে মর্যাদাপূর্ণ তিনটি কারণে (ক) এই মাসেই কোরাণ নির্গত হয়েছিল, (খ) এই মাসেই হজরত মোহম্মদ মেরাজে গিয়েছিলেন, (গ) এই মাসেই হজরত মুহাম্মদ প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। ২৭শে রমজানের রাতটি 'শব-এ-কদরের' রাত। এ রাতের মহিমাকীর্তন করেছেন কোরাণ এবং হাদিশ। এই রাতেই নাকি কোরাণ নির্গত হয়।

কোরবানি তথা ঈদ-উল-আজহা ঃ মুসলমানদের দ্বিতীয় উৎসব। এই পার্বণে লুকিয়ে আছে প্রাচীন আরবের লোকবিশ্বাস। ঈদ-উল-আজহার পশুবলি এবং ইব্রাহিম ইসমাইলের পুরাণ কথা খুঁটিয়ে দেখলে জানা যায়— প্রাচীন আরবের পশুবলি প্রথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উৎসব।[৩৯]

শব-এ-বরাত ঃ শাবান মাসের ১৫ তারিখ শব-এ-বরাত সামাজিক পর্ব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এর আচার অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন লোকবিশ্বাস। মিশর, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে যে নববর্ষ পালনের রেওয়াজ ছিল তার সাথে এই রাতের গাঢ় সম্পর্ক লক্ষ্য করেন আরবীয় তাত্ত্বিকরা। কোরাণে এই রাতের কোনও উল্লেখ নেই। লোকবিশ্বাস, এ রাতেই নাকি ভাগ্যনির্ধারিত হয়। মুর্শিদাবাদের সর্বত্রই পালিত হয় এই উৎসব।

মহরম ঃ ইরানে শিয়া অভ্যুত্থানের আগে ইসলামে মহরম-এর কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র কারবালার ময়দানে নিহত হয়েছিলেন। ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এজিদের হাতে এই দিনটিতে ইরাকের কুফায় নিহত হন তিনি। তাঁর হত্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর সমাধিস্থল হয়ে ওঠে প্রধান তীর্থকেন্দ্র। আত্মবলির প্রতীক হিসেবেই শিয়ারা এই দিনটি পালন করেন। মুর্শিদাবাদের যেসব প্রান্তে শিয়াপ্রভাব লক্ষ্যণীয় বিশেষ করে সেইসব স্থানে যেমন, লালবাগ, ভরতপুর, সালার এবং জঙ্গিপুরে সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান পালিত হতে দেখা যায়। আজকাল সুন্নিরাও এই উৎসবে সামিল হচ্ছেন। এই অনুষ্ঠানটি ধর্মীয় নয়, লোকজ। ইরানীয় লোকবিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে মহরম। অনেকের ধারণা, মেসোপটেমিয়াদের পূজার আচার আচরণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই লোকবিশ্বাসজাত শিয়া কিংবদন্তী।[৪০]

৩৮। লোকসংস্কৃতি গবেষণা— মাঘ চৈত্র ১৩০৯ সম্পাদনা/সনৎ কুমার মিত্র
৩৯। আরব ঈশ্বর— বাহারুদ্দিন (সমন্বয় শারদ ১৯৯৩)
৪০। আরব ঈশ্বর— বাহারুদ্দিন (সমন্বয় শারদ ১৯৯৩)

জন্ম ঃ মুসলিম সমাজেও অন্য সমাজের মতো জন্ম-মৃত্যুকেন্দ্রিক বহু লৌকিক আচার পালিত হতে দেখা যায় মুর্শিদাবাদে। প্রাচীন আরবে সন্তান জন্মানোর সাতদিন পূর্ণ হলে সন্তানের মঙ্গল কামনায় পশুবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। শিশুর মস্তক মুণ্ডন করা হতো। এই মুণ্ডন প্রথা মুসলিম সমাজে আকিকা নামে পরিচিত। মা ও সন্তানকে আঁতুড় থেকে বের করে এনে পাক করার চল আজও আছে। নাপিত ডেকে মায়ের হাত-পায়ের নখ কেটে এবং শিশুর মস্তক মুণ্ডন করে, পশুবলি দিয়ে সেই পশুর মাংস আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীকে বিলি করা হয়। এ সময়েই শিশুর নামকরণটিও সম্পন্ন হয়। এই লোকাচার শিশু জন্মঘটিত অশৌচ পালনের নামান্তর।

সুন্নত বা খাতনা ঃ প্রাচীন লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত এই খাতনা বা সুন্নত। কোরাণে এর কোনো উল্লেখ নেই। ইহুদিদের মধ্যে, প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে খাতনার রেওয়াজ আছে। এই প্রথা আজও চালু আছে রেড ইণ্ডিয়ান, এক্সিমো, অস্ট্রেলিয় আদিবাসী, আফ্রিকার পিগ্‌মী এবং বান্টুদের মধ্যেও। পাঁচ/ছয় বছরের, বালকদের লিঙ্গত্বক ছেদন করা হয় এই অনুষ্ঠানে। অনেকে, একে হাজামত বলে জানেন। আগে হাজামদের কদর ছিল, এখন একাজ ডাক্তার দিয়ে করানো হয়।

মৃত্যু ঃ মৃতদেহ কবরস্থ করা ধর্মীয় বিধান। তবে এর পূর্বে এবং পরে অনেক ধর্মীয় লোকাচার পালন করা হয়। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে পুরুষরা এবং মহিলা হলে মহিলারা প্রথমে মৃতকে স্নান করিয়ে দেন। তারপর কফিনে আচ্ছাদিত করে শবদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কবরে শায়িত করার পূর্বে মৃতদেহ সামনে রেখে জানাযা পড়ানো হয়। মৃতব্যক্তির পরিজনবর্গ বাড়িতে প্রতিদিন মাগরিবের সময় বাতি প্রজ্বলন করেন এবং কোরান পাঠ করেন। মৃত্যুর তিন থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যেই বাড়িতে শ্রাদ্ধের মতোই মৌলবী ও আলেমদের দিয়ে ফতেহ পাঠ করা হয় এবং আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্যদের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

ব্রতাচার ও মানত ঃ বাঙালি হিন্দুমেয়েরা তাঁদের পরিবার পরিজনদের মঙ্গলকামনায় যেভাবে বিভিন্ন ব্রতাচার পালন করেন, মুসলিম মেয়েরাও সেভাবে ব্রতাচার বা মানত করেন। এই মানতগুলি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন। মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ব্রতাচারগুলি এরকম—এক) পাঁচপীরের মানত, দুই) সত্যপীরের মানত, তিন) হাসান হোসেন মানত, চার) দশ বিবির মানত, পাঁচ) হানিফ পালোয়ানের মানত, ছয়) বাবা মুখদুম সাহেবের মানত, সাত) দাতাপীরের মানত, আট) নফলরোজা ও নমাজের মানত, নয়) বারো ইমামের মানত, দশ) খাজা খিজিরের মানত প্রভৃতি। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদে যেসব মানত বা ব্রতাচারগুলি পালন করা হয় তারমধ্যে হাসান হোসেনের মানত, দাতাপীরের মানত, নফল রোজা ও নমাজের মানত এবং খাজাখিজিরের মানত উল্লেখযোগ্য।

পুত্র-স্বামী-কন্যার সাফল্য কামনায় বহু নারী নফল রোজা ও নামাজের মানত করেন। সাফল্য এলে কোনো একটি দিনে রোজা রেখে বা নফল নামাজ পড়ে নারীরা এই ব্রতাচার পালন করেন। পীরফকিরী আস্তানাতে মুর্শিদাবাদের বহু মানুষ নিজের মনোকামনা পূরণের জন্য মানসিক দিয়ে থাকেন। এই মানত হিসেবে খাসি, মুরগী, অর্থকড়ি এমনকি মাটির ঘোড়া মানস দেওয়া চল আছে। এখানে উল্লেখ্য, পাথরচাপুড়ির দাতাপীরের কথা। রাঢ় অঞ্চলের বহু মানুষ মুর্শিদাবাদ থেকে পাথরচাপুড়ি দাতাপীরের দরগাতে মানসিক দিতে যান। জেলার বহু নরনারী হাসান হোসেনের উদ্দেশ্যে মহরমের দিনে রোজাব্রত পালন করেন।

মুসলিমদের অনেকেই হজরত-খাজা খিজিরকে জলের মালিক বলে মান্যতা দেন। জলের মালিক খাজা খিজিরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পীর খাজা খিজিরের সম্মানার্থে

প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে গঙ্গার বুকে আলোক উৎসব পালন করেন। এইটি বেরা উৎসব নামে পরিচিত। বেরা উৎসব বহু প্রাচীন উৎসব মুর্শিদকুলি খাঁই বেরা উৎসবের প্রবর্তক। এই উৎসবের ঘটনা মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকে উল্লেখ আছে।[৪১] মুর্শিদাবাদের নবাব বংশ লালবাগের যে এলাকায় বাস করেন সেই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অংশের নাম কেল্লা নিজামত। এর পাশেই ভাগীরথী প্রবাহিত। কয়েকটি কলাগাছ একত্রিত করে একটি বৃহদাকারের ভেলা প্রস্তুত করা হয়। এর উপরিভাগে তৈরি করা হয় মসজিদের মিনার। এই ভেলা বা বেরাটি মোমবাতি দিয়ে সাজানো হয়। রাতে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে মানত দেন এবং শিরণী বিতরিত হয়। এরপরে মোমবাতিগুলি জ্বালিয়ে, আতসবাতি পুড়িয়ে বেরাটি ভাসানো হয়। চোখে দেখলে মনে হয় অসংখ্য স্বর্ণকমল ভাগীরথীর বুকে ফুটে উঠেছে। এই ভেলার মধ্যস্থলে যে ময়ূরপঙ্খী থাকে তা নিয়ে আসা হয় ওয়াসিফ মঞ্জিলে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকহাজার লোক এই উৎসবে সামিল হন।

চ) মুসলিম জনজীবনে মেলার প্রভাব

প্রত্যেকটি মেলার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ধর্মীয় প্রভাব। ভিন্ন ধর্মীয় ভাবনা থেকে এইসব মেলার উদ্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত মেলা বিশেষ কোনও ধর্মে সীমাবদ্ধ থাকে না। ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করে তা মানুষের মিলনমেলায় রূপ নেয়। মেলার চরিত্র হল— মেলা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, পরস্পর বিরোধী করে তোলে না, ধর্মীয় ভাবনার উত্তরণ ঘটিয়ে মানুষ আত্মীয়তা অনুভব করেন, একাত্ম হয়ে যান। মুর্শিদাবাদের মাটিতে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত মেলাগুলির মধ্যে মহরম-এর মেলা এবং ঔরষের মেলা প্রাধান্য পেয়েছে।

মহরমের মেলা ঃ এই জেলার মহরম সম্পর্কিত ঐতিহাসিক মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় লালবাগে হাজারদুয়ারী ইমামবাড়ার মাঠে। এই মেলা নবাবী আমল থেকেই চলে আসছে। বৈদ্যুতিক আলোকের সজ্জাতে স্বপ্নের প্রাসাদ ইমামবাড়া প্রাণোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভেতরে মসজিদে হাসান-হোসেনের নকল কবরে ধূপবাতিও মোমবাতি জ্বালানো হয়। চারিদিকে দুলদুল ঘোড়াকে সজ্জিত করা হয়। মহরমের ১০ তারিখ তাজিয়া সহ জৌলুস বের হয়। সিয়াপন্থীরা মর্শিয়া গেয়ে মাতম করেন। এই শোভাযাত্রা গোটা লালবাগ শহর পরিক্রমা করে কারবালা মাঠে আসে। মেলা চলে পাঁচ সাতদিন। জেলা ও জেলার বাইরের বহু শিয়াপন্থী মুসলমান এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন।

৪১। District Handbook, Murshidabad, 1951 - by A. Mitra,
" Another old ceremony still observed at Murshidabad , which it will not be out of place to mention here is the Bera or festival of Khouja Khizr. This is observed by launching tiny light ships on the river, a spectacle which may be seen to great advantage on the Bhagirathi. On centain nights in the rainy season thousands of little rafts, each with its lamp burning are floated down the stream, Their construction is very simple, for a piece of plantain or bamboo bears a sweet meat or two and the lamp. The festival is celebrated with much magnificence on the last Thursday of the month of Bhadre(September).A raft is constructed of plantain trees and bamboo and covered with earth.On this is erected a small fortress bearing fire works on its walls.At a given signal the raft is launched ard floated to the further side of the river,when the fireworks are let off,their reflection on the water producing a pictures que effect."

নবাবী আমল থেকে চলে আসা আরও একটি মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুরের কারবালা ময়দানে। এই মেলাটি একদিনের হয়। এখানেও তাজিয়া সহ মিছিল হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ মর্শিয়া গাইতে গাইতে, মাতম করতে করতে কারবালা মাঠে উপস্থিত হন। লাঠিখেলা চলে। হাসান-হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মহরমের মেলা জেলার অন্য এলাকাতেও হতে দেখা যায়। এগুলি সবই একদিনের মেলা। জেলার সর্বত্রই এই মেলার চরিত্র একই। এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় ফরাক্কা থানার দেলোয়ারপুরে, রঘুনাথগঞ্জ থানার সুজাপুরে, গোরাবাজারে চিরাগ আলি সাহেবের মাজারে, বেলডাঙ্গা থানায় কাঁদখালি, গারুলিয়া, দলুয়াতে, জলঙ্গির কারবালা মাঠে, জিয়াগঞ্জের কারবালা মাঠে, লালগোলা থানার দেওয়ানসরাইয়ে।

ঔরষের মেলা ঃ মুর্শিদাবাদের যেসব পীর ফকির আস্তানা বা মাজার আছে সেগুলির অনেক জায়গাতে তাঁদের তিরোধান দিবসকে ঔরষের মাধ্যমে পালন করা হয়। প্রত্যেকটি ঔরষের মেলার চরিত্রও একই রকমের। বহু দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন, শিষ্যরা আসেন। চলে জলসা, ধর্মীয় বক্তৃতা, মারফতী গান এবং কোথাও কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সিন্নি হিসেবে খিঁচুড়ি বিতরিত হয়। বহু ফকির দরবেশের সমাগম ঘটে মেলায়। এইসব মেলাতে বহু হিন্দু শিষ্যদের এবং ভক্তদেরও ভিড় জমে। প্রত্যেকটি মাজারে পীর ফকিরদের অলৌকিক কীর্তিকলাপের নিদর্শন ভক্তরা পরিবেশন করেন।

দু'শো বছর আগে সাঁচাদ বাদশা নামে এক ফকির আতাই গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন পরে তিনি নগরের হোসেনশাহ খনিত দিঘির পাড়ে বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই দেহ রাখেন। এই বুজুর্গপীরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে ২০ পৌষ নগরে মেলা ও উৎসব হয়। ইনি দাদা পীর নামে পরিচিত। পীর হজরত দাতা মহবুবশাহ-এর দরগায় কান্দির রোশনীতলায় ১১ চৈত্র মেলা ও ঔরষ হয়। কুলিতে মকদম সাহেবের সমাধিস্থলে মাঘমাসের শেষ বৃহস্পতিবার মেলা বসে। ভরতপুর থানার সিজগ্রামে চৈত্র বৈশাখ মাসে, কুলুটিয়ায় ফাল্গুন মাসে এবং হামিদহাটিতে বৈশাখে, তালিবপুরে ফাল্গুনে পীরের ঔরষ উপলক্ষে মেলা বসে। রঘুনাথগঞ্জ চড়কাতে রাজ্জাক শা'র মাজারে একদিনের মেলা বসে এবহং নওদাতে মেলা বসে একদিনের। রাঙামাটি চাঁদপাড়ায় দাতাশাহ তুর্কন মাজারে মেলা বসে। বহরমপুরে গোরাবাজার চেরাগ আলী শা-এর মাজারে মহরম মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত মেলা বসে। এর আয়োজক হিসেবে সাহা এবং ঘোষরা যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন। রোশনীবাগে শাহশফি রহমতুল্লাহ এবং দাতা সাহেব নামক দুই পীর দরবেশের স্মৃতির উদ্দেশ্যে চৈত্রমাসের ৩-৭ তারিখ জাঁকজমকপূর্ণ মেলা বসে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ভগবানগোলার সন্নিকটে শেখপাড়া গ্রামে সৈয়দ হজরত নাসের আলির মাজার। তাঁকে সকলেই দাদাপীর বলে জানেন। তাঁর আস্তানায় ১৯ পৌষ বিরাট মেলা বসে। সুতী থানার ছাপঘাটিতে সুফীসাধক সৈয়দ মর্তুজার মাজারে প্রতিবছর রজব মাসে মেলা বসে ও ঔরষ হয়। সাগরদিঘি থানার সেখদিঘিতে সৈয়দশাহ আবু তিরমিয-এর মাজার। তাঁর পাশে সৈয়দ বাহরাম শাহর মাজার। ২৫ মাঘ বাহরামশাহর ঔরষ হয় এবং ২২ ফাল্গুন পীর সৈয়দশাহ আবু তিরমিয এর ঔরষ হয়। এই মেলা চলে প্রায় একমাস ধরে। নবগ্রাম থানার খাজুরিয়া গ্রামে সৈয়দ শাহ সাহাবুদ্দিনের মাজারে চৈত্র মাসের শেষ তিনদিন ঔরষ হয় মেলা বসে। মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। লালগোলা থানার বাউসিতে গাজী মোছলেমউদ্দিন সাহেবের ঔরষে ৮ অগ্রহায়ন মেলা বসে। সাগরদিঘি থানার সুখী গ্রামে সুনীল মুখার্জী (পোস্টমাস্টার)র পৃষ্ঠপোষকতায় পীরের ঔরষে মেলা বসে। এই মেলাগুলি ধর্মীয় হলেও হিন্দু মুসলিম মিলনমেলা

হিসেবেই অধিক পরিচিত। সাগরদিঘি থানার চারগাছিতে চৈত্রমাসের শেষের দু'দিন ঔরষ ও মেলা হয়।

বেরা উৎসব-এর মেলা ঃ মুর্শিদাবাদ এস্টেট কর্তৃক বেরা উৎসব উপলক্ষে প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মেলার আয়োজন করা হয়। বাজী পোড়ানো উৎসব দেখার জন্য মেলায় এত লোক হয় যে ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়া মুস্কিল হয়। অনেকে নৌকা করে এই উৎসব দেখেন। আগে এ দিনটিতে নবাব প্রাসাদে দরবারী অধিবেশন হোত। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিমরা আসতেন। বহুদূর থেকে প্রতিষ্ঠিত গায়ক গায়িকারা গান পরিবেশন করতেন।

মুর্শিদাবাদের এইসব মেলাগুলি প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। এইসব মেলাতে ধর্মীয় ভাবাবেগের থেকেও গুরুশিষ্য সম্পর্কই অধিক গুরুত্ব পায়। ফলে, মুর্শিদাবাদে এইসব মেলা হিন্দু মুসলিম মিলনভূমি হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ। কোনও মাজারেই গোমাংস চলে না। বেশিরভাগ ঔরষেই মিষ্টান্ন এবং সব্জীপোলাও বিতরিত হয়। বাউল ফকিরদের সমন্বয় ধর্মী প্রেরণায় মানুষ পার্থিব জীবন ভুলে মানসিক শান্তি খুঁজে পান। লোক ঐতিহ্যের যাবতীয় রসদ যেন লুকিয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদের এইসব মেলাতে।

চার

মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজের লোক ঐতিহ্যে লোক চর্চার ধারা

মুর্শিদাবাদে ধর্মান্তরিত মুসলমানই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা ধর্মে মুসলিম হলেও মনে প্রাণে, আচার আচরণে খাঁটি বাঙালিই। তাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলেও পূর্বতন মৌলিক লোকাচার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ত্যাগ করতে পারেন নি। মুসলিম বিধান বা শরীয়তের পাশাপাশি সমান্তরালে তাঁরা লালন করে এসেছেন এই ঐতিহ্য। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামি আচার আচরণ যুক্ত হয়ে সংস্কৃতির ধারাটি নতুন মোড়ক লাভ করেছে। সেকারণে লোক ঐতিহ্যের ধারাটি অনেকটাই হিন্দু সংস্কৃতির ধারাটিকেই পুষ্ট করেছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-উৎসব এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি ক্রিয়াকরণে লৌকিক আচার-বিশ্বাস চিরায়ত সংস্কৃতি ধারায় মিশে গেছে। এই কারণে ইসলামি বিধান যতটাই নির্মম হোক মুসলিম সমাজের লোক ধারাটিই ততটাই নমনীয়। মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজের লোকঐতিহ্যে এই ধারাটি কতটা অব্যাহত রয়েছে এই অধ্যায়ে সেই বিষয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজের লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস এবং লোকচিকিৎসা

লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার সমার্থক নয়। লোক বিশ্বাস লোকজমাজের ঐতিহ্যগত এবং স্থিতিশীল। বিজ্ঞান চেতনার দ্বারা তা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত লোকবিশ্বাস। কিন্তু ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার পরেও তা লালন করলে কুসংস্কার। মুসলমান সমাজে লোকসংস্কারের কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজের মধ্যেও বেশ কিছু লোকসংস্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হিন্দু সমাজের মতো মুসলিম সমাজেও বেশ কিছু লোকবিশ্বাস আছে যা কিছু দৃশ্য শুভ এবং কিছু দৃশ্য অশুভ সংকেতবহন করে।

অশুভ সংকেত বহনকারী কিছু লোকসংস্কার

ক) শুভকাজে বেরোনোর সময় কিংবা সকালবেলাতে বন্ধ্যা স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ লোক দেখা অশুভ।

খ) যে কোনও শুভ কাজ বিধবাকে দিয়ে সূচিত করা অশুভ।
গ) হাঁচি পড়লে যাত্রা অশুভ হয়।
ঘ) খালি কলসী দেখলে যাত্রা অশুভ হয়।
ঙ) কাকের ডাক অশুভ সংকেত বহন করে।
চ) যাত্রার সময় ডানে শিয়াল দেখলে কিংবা বিড়াল রাস্তা পেরুলে অশুভ সংকেত দেয়।
ছ) পিছন থেকে কেউ ডাকলে অশুভ সংকেত দেয়।
জ) ছাগলের কান লটপট করা অশুভ।
ঝ) মঙ্গলবারে যাত্রা অশুভ।
ঞ) বৃহস্পতিবার বারবেলায় যাত্রা অশুভ।
ট) রবিবারে ধান বোনা অশুভ।
ঠ) শনি কিংবা মঙ্গলবার হালচাষের দড়ি ছিঁড়ে গেলে ফেলে দিতে নেই।

শুভসংকেত বহনকারী কিছু লোকসংস্কার

ক) পিছন থেকে যাত্রাকালে মা ডাকলে শুভ। খ) খালি কলসী ভরতে গেলে শুভ। গ) যাত্রার সময় মাছ দেখা শুভ সংকেত দেয়। ঘ) যাত্রার সময় শবযাত্রা দেখা শুভ। ঙ) শুক্রবারে চাষ শুরু করা কিংবা ধান রোয়া শুভ। চ) শুক্রবারে এবং রবিবারে বাড়ির ভিত দেওয়া শুভ। ছ) চাতালে বুনো পায়রা বাসা বাঁধলে শুভ।

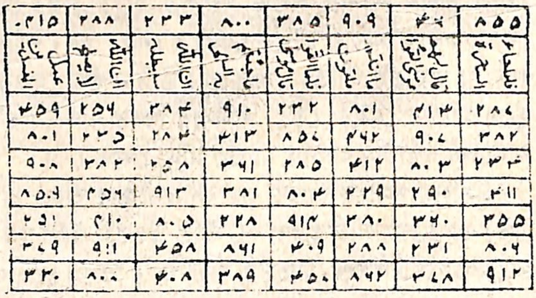
লোকসংস্কারগত কিছু বিধি নিষেধ

এক) বালিশ ডিঙিয়ে যেতে নেই। দুই) গর্ভিনীদের কোনো কিছু ডিঙোনো নিষেধ। তিন) গর্ভিণীদের কবরস্থানে যেতে নেই। চার) গর্ভিণীদের শিল-নোড়া, ধামা-কলসির উপর বসতে নেই। পাঁচ) গর্ভিনীদের লাউকুমড়ো কাটতে নেই। ছয়) আগুনে জল ঢালতে নেই। সাত) মেয়েদের কাটা-ভাঙা চুড়ি হাতে দিতে নেই। আট) মেয়েদের একবিছানা দু'জনে পাততে নেই। (ঘরে সতীন আসার অশুভ সংকেত এটি)। নয়) মেয়েদের মুত্রত্যাগকালীন কিংবা আজান দেওয়াকালীন মাথার কাপড় ফেলতে নেই। দশ) পাটকাঠি দিয়ে কাউকে মারতে নেই (মারলে শুকিয়ে যায় এই ভীতি)। এগারো) উঠোন ঝাঁট দেওয়ার আগে কোথাও যেতে নেই। বারো) ছুঁচো মারতে নেই। তের) শনিবার কিংবা মঙ্গলবার গোবর দিতে নেই। চৌদ্দ) পুরুষদের নারকেল জল কিংবা চ্যাং মাছের মাথা খেতে নেই।

মুসলিম সমাজে আরও বহু লোকসংস্কার আছে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, এক) আঁতুড়ঘরে লৌহদ্রব্য দা, যাঁতি, ইত্যাদি রাখা হয়। দুই) বিয়ের পূর্বে গায়ে হলুদ পড়লে বর/কনেকে একখণ্ড লৌহদ্রব্য তথা যাঁতি কিংবা চাবি ধরিয়ে দেওয়া হয়। চোরচুন্নী, ভূত-প্রেত বা জীন লোহদ্রব্য থাকলে আসতে পারে না এমন ধারণা থেকেই এই লোকসংস্কার। তিন) ফলমূল, শস্য, তরিতরকারি ফলতে শুরু করলে সেই ফলনশীল জমিতে ভাঙা পেছ্যা, ঝাঁঝরি, ঝাঁটা টাঙিয়ে রাখা হয়। এতে নাকি পোকা লাগে না, চুরি হয় না ফলন ভালো হয়। চার) ভোজবাড়িতে মুর্শিদাবাদের অনেক জায়গায় এখনও মুসলিম সমাজের একাংশকে কলাপাতা কিংবা পদ্মপাতা উল্টো করে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখা যায়। পাঁচ) মৃতসম্ভবা নারীরা এখনও ধাইয়ের কাছ থেকে ক্ষুদ, কড়ি, কিংবা অর্থ দিয়ে নিজের সন্তানকে কিনে নেন, তাঁর সন্তানের

দীর্ঘজীবি হওয়ার কামনায়। ছয়) এমনধারণা আছে, হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে গেলে বাড়িতে কুটুম আসে। এবং সাত) খাবার খাওয়ার সময় খাবার গলায় লেগে গেলে বা কাশি হলে আত্মীয়স্বজনরা স্মরণ করছে এমন ধারণা করা হয়।

মুসলিম সমাজের লোকসংস্কারে লোকবিশ্বাস ও লোকচিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনের বাসনা পূরণ করার জন্য পীরের দরগায় কিংবা মসজিদে অনেকেই মানত রাখেন। মানতে ছাগল মুরগী দেওয়া কিংবা লোক খাওয়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায়, কঠিন অসুখে মুক্তিলাভের জন্য পীরের দরগায় মানত দেন। এই লোকবিশ্বাসের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে লোকচিকিৎসাও। গ্রামের আনাচে কানাচে এখনও বহু ওঝা, গুণীন, পীর ফকির মাওলানারা রোগের প্রতিকার হিসেবে জলপড়া, তেলপড়া, ঔষুধপত্র এবং তাবিজ দিয়ে থাকেন। লোকবিশ্বাসের উপরে এর ফললাভ অনেকটা নির্ভর করে। দ্রব্যগুণের কার্যকারীতাও এরসঙ্গে যুক্ত হয়। সাদা কাগজে জাফরাণে জল কালিদিয়ে বিভিন্ন আয়াত, সংখ্যা ও সাংকেতিক শব্দ লিখে দেওয়া হয়। সেই কাগজ তাবিজ বা মাদুলি আকারে হাতে, কোমরে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওই লেখা ধুয়ে সেই জল খেলে রোগ নিরাময় হয়। হাওয়া লাগা, ভূত-প্রেত, জ্বীন-পরী, কুদৃষ্টি, জাদু-টোনা, বাণমারা ইত্যাদি বিশ্বাস লোকসমাজে এখনও রয়েছে। এসবের প্রতিকার হিসেবে ঝাড়ফুঁক, জলপড়া, তেলপড়া দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বাড়ানো, স্বামীকে বশীভূত করা, স্ত্রীকে বশীভূত করা, মেয়ের দ্রুত বিয়ে হওয়া কামনায়, দ্রুত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য, চুরিযাওয়া দ্রব্য ফিরে পাওয়ার জন্য এবং চোরকে ধরার জন্য, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র সহজ আসার জন্য, গাছে ফলধরার কামনায় ইত্যাদির জন্য এখনও গ্রামের বহু মুসলিম পরিবার তেলপড়া, জলপড়া, তাবিজের উপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখেন। এইসব লোক বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে পীরদরগাগুলিতে ঘোড়া মানত কিংবা সাঁঝের দিয়া জ্বালাতে দেখা যায় অনেককেই। এই লোকবিশ্বাস মুসলিম সমাজে সীমাবদ্ধ না থেকে বহু হিন্দু পরিবারের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। সন্তান কামনায়, রোগ নিরাময়ের জন্য বহু হিন্দু মেয়েরা পীর ফকির, মৌলভীর ঝাড়ফুক, তেলপড়া, পানিপড়া এবং তাবিজ ব্যবহার করেন। নীচে এর কিছু দৃষ্টান্ত চিত্র সহ দেখানো হল[৪২]—



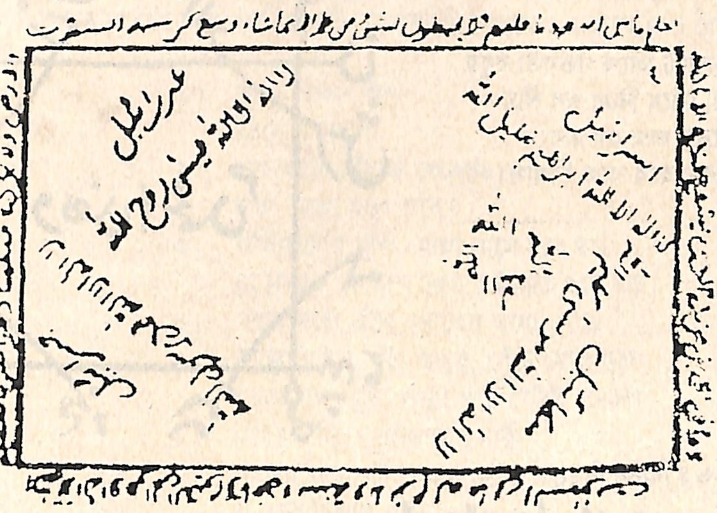
চিত্র ১ ঃ
ভূত-প্রেত-জাদুর প্রতিকার

এই নকশা চিনামাটির বাসনে জাফরান জল দিয়ে লিখে, তা ধুয়ে ভূতগ্রস্ত বা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাওয়ালে জাদু নষ্ট হয়ে যায়।

৪২। ক) রহনী তারিজু (১৯৯৯ সংস্করণ) মওলানা শাহ আব্দুস সাত্তার, রহমানিয় লাইব্রেরী। উঃ ২৪ পরগনা।

খ) নকশা ছোলায়মানী (১-৪ খণ্ড) অনুবাদ মওলানা মহম্মদ সলমন, (১৯৯৬ সংস্করণ) রহমানিয়া লাইব্রেরী উঃ ২৪ পরগণা।

চিত্র ২ ঃ ভূত-প্রেত-জাদুর প্রতিকার।



যে ব্যক্তিকে 'জ্বীন' বা পরী ভর করেছে তার হাতে এবং যে বাড়িতে জ্বীন ও পরীর ভর হয়েছে সে বাড়ির দরজায় এই তাবিজ ঝুলিয়ে দিতে হয়।

চিত্র ৩ ঃ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ক

ا	ز	ن	ک
العل	العل	العل	العل
فلان	بن	فلان	حب
فلانه	بنت	فلانه	على
٧	ی	ف	خ

এই নক্সাটি দুধে ভিজিয়ে স্বামীকে খাওয়ালে বা স্ত্রীর বাহুতে বেঁধে রাখলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেম জন্ম নেবে এমনটাই বিশ্বাস করা হয়।

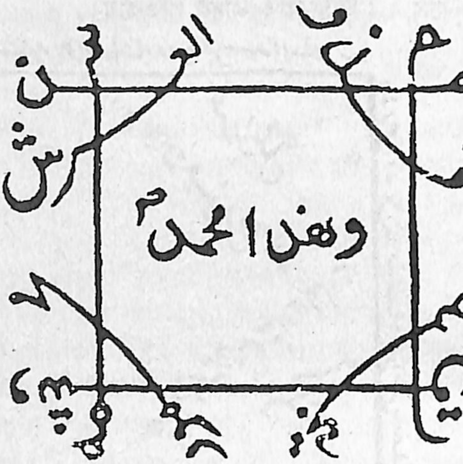
চিত্র ৪ ঃ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ক

٥	١٠	١٥	۴
١۶	٣	۶	٩
٢	١٣	١٢	٧
١١	٨	١	١۴

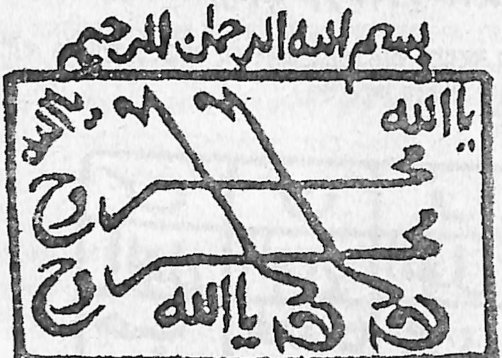
এই তাবিজ লিখে স্ত্রী যদি গোপনে
নিজের চুলে বেঁধে রাখে
বদমেজাজী স্বামীর রাগ
কমে যাবে।

চিত্র ৫ ঃ বিবিধ বিষয়

এই নক্সাটি লিখে গর্ভবতী বধূর গলায় বেঁধে দিলে খুব শীঘ্র সন্তানের জন্ম হয় এবং কষ্ট কম হবে বলে বিশ্বাস।



চিত্র ৬ ঃ বিবিধ বিষয়



এই তাবিজ নিজের কাছে রাখলে ভক্তি ও সম্মান লাভ হয় বলে লোকায়ত বিশ্বাস।

মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত হেঁয়ালি-ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন-হেঁয়ালি-ছড়া যাই হোক না কেন, এর উৎস মানুষের লোকজ জীবন, ধর্মীয় বিশ্বাস, আদিম সংস্কার এবং বিশ্বাসগত অনুসঙ্গ থেকে। প্রবাদ-প্রবচন-হেঁয়ালিও ছড়ারই একটি স্তর। প্রবাদ মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল। প্রবাদ-প্রবচন-হেঁয়ালির মাধ্যমে মানুষ তাঁর মঙ্গ লকামনার জন্য খারাপ, অমঙ্গল এবং অন্যায়কে যেমন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে থাকেন— অন্যদিকে তেমনি ভালো, মঙ্গল, ন্যায় এবং ইষ্টসাধনাকে প্রশংসা করে উৎসাহিত হন। প্রবাদ একটি কথিকা। কোনও কথক বা কোনও এক শ্রেণীর মানুষের উক্তি। বলা হয়, অন্য কোনও মানুষকে শ্রেণীকে বা সম্প্রদায়কে। সুসংহত সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে লোকসাহিত্য চিরকালই নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছে।

শোষিতের পাশে দাঁড়িয়ে তার ওকালতি করেছে। এক্ষেত্রে প্রবাদ প্রবচন তীর্যক এবং ব্যাঙ্গাত্মক খোঁচাতে সাম্প্রদায়িকতা নামক জাতসাপটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রদায়িকতা কেবলমাত্র ধর্মীয় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা ধর্মকেন্দ্রিক, বর্ণ বা বর্গকেন্দ্রিক, বৃত্তিকেন্দ্রিক কিংবা লিঙ্গকেন্দ্রিক হওয়ায় বাংলা ভাষার প্রবচনও সেভাবেই সর্বত্র

হুল ফুটিয়ে তার আসল কাজটি করে গেছে। মুর্শিদাবাদের লোকসমাজে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন হেঁয়ালিতে তাই কথক বা শ্রোতা পৃথকভাবে হিন্দু বা মুসলমান নয়— হিন্দু মুসলমান উভয়েই। প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন বা হেঁয়ালির একটি সারণী (যা মুসলিম সমাজেও ব্যবহৃত হয়) দেওয়া হল ঃ

১। বামুন বাকস বাঁশ
তিনে বাস্তুনাশা

২। এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম
চাচা মোল্লা হলে কবে?

৩। কলিকালের মুন্সি মোল্লা নামে হবে দড়
না মানবে কোরাণ কেতাব ইজ্জত হবে বড়।

৪। গরুর মধ্যে এঁড়ে, জাতের মধ্যে নেড়ে

৫। কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলমান
ঘরজামাই, পুষ্যি পুত্তুর-পাঁচ বেটাই সমান।

৬। হিন্দুর দাড়ি, মুসলমানের নারী
গাঙের কূলে বাড়ি, বনে চরা গাই
এ চারে বিশ্বাস নাই।

৭। শোর শুঁড়ি এঁড়ে নেড়ে
এ চারকে যে বিশ্বাস করে
সে ভেড়ের ভেড়ে,।

৮। এক আঙুলে চাচা
যায়না উকুন বাছা।

৯। এড়িয়ে যেতে ধোঁয়া
আগুনে পোড়োনো মিঞা।

১০। গিলতে বড়ি, করতে বিয়া
মরিয়া হতেই হয় মিঞা।

১১। মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল
ফার্সি পড়ে তাঁতি।

১২। মেয়েরা ভালো থাকে ঘরে আর কবরে।

১৩। আল্লার মার
দুনিয়ার বার।

১৪। ভাদ দেয় কি ভাতারে?
ভাত দেয় গতরে।

১৫। মিঞা বিবি রাজি
তো কী করবে.কাজী।

১৬। খেয়ে দেয়ে ফকির নাচে
ও বেলায় আল্লা আছে।

১৭। আগেতে নামাজের পাটি
পিছনে নাঙের কাঠি।

১৮। মানুষের মন কুমোরের চাক
পলকে দেয় আঠারো পাক।
১৯। বউ যদি হয় কানার
জিম্মা দিও খোদার।
২০। কুমারী মেয়ে পুরনো বাড়ি
আগুনে পোড়ে তাড়াতাড়ি।

এছাড়াও রয়েছে আরও শতাধিক প্রবচন যা এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব হল না।

পাঁচ

মুর্শিদাবাদের লোকচর্চার ধারায় মুসলমান সমাজ ও তাঁদের লোকশিল্পী

লোকসংস্কৃতির আঙিনায় মুর্শিদাবাদের প্রাণপ্রাচুর্য টইটম্বুর। উথলে পড়া যৌবন যেন। বাগড়ি ও রাঢ়বাঙলার মুর্শিদাবাদ নদীভিত্তিক এলাকাগুলিকে লোকসংস্কৃতির বহুবিধ রসে প্লাবিত করে রেখেছে আজীবন। মাটি শেকড়ের টানে গ্রামজীবন মুখরিত। দৈন্যতার বেড়া টপকিয়ে হৃদয়ের উদ্বেলিত জনজীবন। সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখার অভ্যাস অব্যাহত। মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি বলতে আলকাপ-পঞ্চরস-কবিগান-বাউল-বোলান-বিয়ের গীত, আদিবাসী নৃত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু এর বাইরেও মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের আনাচে কানাচে যেসব লোকসংস্কৃতির ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা হল লেটো, ভাদুগান, কথকতা, বিষহরিগান, মনসাগান, দেহতত্ত্ব, জারিগান প্রমুখ। এই লোকসংস্কৃতির ধারায় মুসলিম জনজীবন পিছিয়ে নেই। সেদিক থেকে মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজে লোকসংস্কৃতির ধারাটি যথেষ্ট গৌরবোজ্জ্বল। মুসলিম বিয়ের গীত মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি চর্চায় একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে রেখেছে। দেহতত্ত্ব, জারিগান, ফকিরিগান, একদিল গান মুসলিম জনজীবনে একক চর্চা। এছাড়া, আলকাপ, কবিগান, বাউল, বোলান, লেটো, কথকতা, পটুয়াদের গান প্রমুখেও মুসলিম লোকশিল্পীদের দাপট এ জেলায় উল্লেখযোগ্য।

ক) আলকাপ

মুর্শিদাবাদে ঝাঁকসুই আলকাপ গানের সূচনা করেন। কিন্তু এই গানের পরম্পরা পুষ্টি পায় যাঁদের হাতে তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, মাহাতাব বিশ্বাস এবং নইমুদ্দিন মণ্ডলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। ঝাঁকসুর দলে যাঁরা গান করেছেন শেরশাবাদিয়ার মর্জেম সেখ, নতুনগঞ্জের সুবেদ আলি, ফতেল্লাপুরের জাগু উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে নতুনগঞ্জের সুবেদ আলি যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছেন। আলকাপ জগতের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ হিসেবে রঘুনাথগঞ্জের মহীতোষ আলি এবং কৃষ্ণপুরের নইমুদ্দিন-এর নাম খ্যাত। শ্রেষ্ঠ কপ্যাদের মধ্যে ফতেল্লাপুরের জাগু, কৃষ্ণপুরের সহিদ সেখ, সাগরদিঘির আবদুল্লাহ জোব্বার এবং খাজুরিয়ার বক্তার বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য। ছোকরা হিসেবে আলকাপ জগতে নতুনগঞ্জের সুবেদ আলি, মীরপুরের মাহতাব আলির নাম আজ সকলেরই জানা। ওস্তাদ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন কৃষ্ণপুরের নইমুদ্দিন মণ্ডল, খোসবাসপুরের সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজ, জঙ্গিপুরের আলতাব বিশ্বাস এবং খাজুরিয়ার মুনির মাষ্টার। আলকাপ গবেষক ড. দিলীপ ঘোষ লোকশিল্পী সোহারাব দর্জির একটি গানের উল্লেখ করেছেন ঃ 'চৈত মাসের চৈত্র পরবেতে / আলকাপ সৃষ্টি গাম্ভীরাতে / দেখে ভোলার কায়কিতাং/ ধরলো এসে এই মুসলমান।' নবগ্রাম থানার খাজুরিয়া গ্রামে এরকম একটি গানের

দল গড়ে উঠেছিল। পাঁচকড়ি বিশ্বাসের নেতৃত্বে দলটি বেশ সমাদৃত হয়েছিল। এই গানের ওস্তাদ ছিলেন মুনির মাস্টার। তিনি ছড়াকারও ছিলেন। মনিরুদ্দিন সরকার, সফেদ সেখ, হাবোল সেখ, তাইবুদ্দিন সেখ, আমযাদ আলি, নুরুল হক, মর্জেম সেখ, হাতেম সেখ, তাজেল সেখ, বক্তার বিশ্বাস দাপটের সাথে গান করেছেন। এছাড়া, নবগ্রাম থানার বাঘমারার এহিয়া সেখ, মোক্তার হোসেন দলে গান করেছেন। চোখের সামনে জঙ্গিপুরের ষাট বছরের এক শিল্পীকে সারা বাংলা দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। এই শিল্পীর নাম মাহাতবউদ্দিন (মাহাতাব বিশ্বাস)। তাঁর দলের নাম মাহতাব পঞ্চরস অপেরা। এই দল করেই তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। শ্রুত আছে, গান করে বেশির ভাগ শিল্পীই তাঁদের জমি জিরেত হারিয়েছেন। ব্যতিক্রম মাহতাবের ক্ষেত্রে। তিনি গান করেই জমি-বাড়ি করেছেন। বাল্যকালে তিনি গরুও চরিয়েছেন। আর একজন শিল্পীর নাম ঝাঁকসুর পরেই করা যেতে পারে তিনি হলেন কৃষ্ণপুরের নইমুদ্দিন মণ্ডল। ঝাঁকসু যদি আলকাপকে মার্জিত, পরিশীলিত করে থাকেন তবে সাগরদিঘি থানার নইমুদ্দিন মণ্ডল এই গানকে ঢেলে সাজিয়ে সর্বাধুনিক করে তুলেছেন। তিনি সরকার স্বীকৃত আলকাপ দলের নায়ক। তাঁর সৃষ্ট আলকাপ দল 'বুলবুল আলকাপ পার্টি' এখনও চলছে।

আলকাপ জগতে এবং বর্তমান পঞ্চরসে মুর্শিদাবাদের বহু মুসলিম শিল্পীর খোঁজ মেলে। ঝাঁকসুর সঙ্গে গান করেছেন এবং এখন দলের মালিক এমন শিল্পীও আছেন। যেমন, হরিহরপাড়া থানার কোমনগরের মজিদ সেখ, নশীপুরের ওয়াসেফ মীর প্রদীপডাঙ্গার সমসের আলি, বহরমপুর থানার গজধরপাড়ার ফিরোজ সেখ, কাদাইয়ের রিয়াজুদ্দিন সেখ, সিঙারের পাতু সেখ, দৌলতাবাদ ঘাসিপুরের আমির সেখ, রানীনগর থানার রাধাগোবিন্দপুরের জেকের আলি মোল্লা, গোঘাটা পাটিকাবাড়ির সারাফাৎ সেখ, মেদের দাউদ সেখ, ডোমকলের ফিরোজপুরের আফাজুদ্দিন সেখ, মামুদপুরের জারমান সেখ, গোবরাপাড়া আমোদ আলিপুরের আসমত সেখ, ঝাঁঝা রুকুনপুরের রহিম সেখ, বহরমপুর থানার সোনারটিকুরির চমৎকার আলি সেখ, বেলডাঙ্গা থানার গোবিন্দপুরের আনসার আলি, বাবুলবোনার সমীর সরকার, নবগ্রাম থানার শীলগ্রামের সাজ্জাদ হোসেন, সাগরদিঘি থানার নৈমুদ্দিন মণ্ডল, সাইদ সেখ, আরোজ সেখ, মোজাম্মেল সেখ, মানোয়ার হোসেন, বারী সেখ, গাঙাড্ডার ফকির সেখ, কড়াইয়ার মুগফোর হোসেন মোল্লা, খোসজান সেখ, ঠাকুরপাড়ার সাইফর রহমান, কোলানের পাতু সেখ, মনিগ্রামের হাসেন আলি, ফাইজুদ্দিন সেখ, কাঠেরপাড়ার আনসার সেখ, জঙ্গিপুরের সুবেদ আলি, মাহতাবউদ্দিন, সোলেমান সেখ (ঘুঘুডাঙ্গা) রহিমপুরের আরসাদ সেখ, নবগ্রাম থানার খেঁকুলের মুক্তার হোসেন, গোলাম এহিয়া, পুণ্ডিগ্রামের নৈমুদ্দিন সেখ, কৃষ্ণপুর, সাগরদিঘির রফিকুল মণ্ডল, ভরতপুর মসজিদপাড়ার আব্দুল হাসিব, আব্দুস সাত্তার, কাতলামারির মতিউর রহমান, পাঁচগ্রাম তেঁতুলিয়ার মারফত আলি ও বদিউজ্জামান সেখ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আলকাপ বর্তমানে পঞ্চরসে রূপ নিয়েছে। এবং এইসব শিল্পীরা অনেকেই পঞ্চরসের দল করেছেন নিজেরাই আর অনেকেই কোনও না কোনও অপেরাতে গান করেন।

খ) কবিগান

স্বাধীনোত্তর কবিয়ালদের মধ্যে কবিগানকে সমাদর করে যে কবিয়ালকে রবীন্দ্রনাথ স্নেহাশীষ বর্ষণ করেছেন তিনিও এই জেলার এক প্রখ্যাত কবিয়াল কবি সেখ গুমানী দেওয়ান। সাগরদিঘি থানার বন্যেশ্বর অঞ্চলের জিনদিঘি নামক গ্রামে জন্ম এই প্রাণপুরুষের। ইনিই ভোলাময়রা, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গিদের পরবর্তী রূপকার। এই প্রজন্মে কবিয়াল গুমাণী দেওয়ানের মত তেমন কোনও প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব হ'ল না এ বাংলায়। হরিনারায়ণদের পরে স্বাধীনতা পরবর্তীতে

কবিগানে মুখ্যত আধুনিকতা এনেছেন গুমানী দেওয়ান। এ সময়ের আরও এক প্রতিভাধর কবি হলেন জুব্বারি সেখ। কান্দি মহকুমার জুব্বারি সেখ একজন যশধর কবিয়াল। গুমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তীর সাথে তিনি অনেকবার গান করেছেন। চারণ সম্রাট কবি গুমানী দেওয়ান জুব্বারি সেখকে 'কবি রসরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। বহরমপুর থানার রাধারঘাটের আফাজুদ্দিন সেখ সম্ভবত এখন জেলার সবথেকে প্রভাবশালী কবিয়াল। সারা পশ্চিমবাংলাতে তিনি বিশিষ্ট কবিয়ালদের সাথে গান করেছেন। বেতার ও দূরদর্শনশিল্পী হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। এছাড়া, কবিগানের জগতে যাঁরা নিজেদের পরিচিত করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে হরিহরপাড়ার কোমনগরের আবদুল মজিদ, বাঁকিপুরের আবদুল ওহাব, শেখপাড়ার আবদুল কাদের, আমতলা মালীপাড়ার খোদাবক্স মণ্ডল, ছয়রদ্দি সেখ, নতুনগ্রামের জালালুদ্দিন সেখ, হরিশচন্দ্রপুরের জিসামুদ্দিন সেখ, পুণ্ডিগ্রামের নুরজান রানীনগর সুপারিগোলার বিদু সেখ, বাবুলবোনার মালেক সেখ, নতুনগ্রামের মুহম্মদ জালালুদ্দিন, সৈয়দপাড়ার মোহাঃ জোরাত আলি, পুণ্ডিগ্রামের সাবের আলি, নরেশগঞ্জের সাইদুর রহমান, পুরন্দরপুরের মহঃ হামজার আলি, কুন্তলের জাব্বার আলী, রাজারামপুর হরিপুরের মইনুল হক, দিয়াড় বালাগাছির আব্দুল হামিদ, নিমগ্রাম বেলুড়ি নতুনগ্রামের জামাল সেখ, হরিহরপাড়ার আবুল কাশেম মণ্ডল, কান্দি পুরন্দরপুরের হামজার আলি, লালগোলাদিয়াড় ফতেপুরের ইব্রাহিম সরকার, রানীনগর কোমনগরের মালেক সেখ, বেলডাঙ্গা মকরমপুরের ইব্রাহিম সেখ, জিয়াগঞ্জের সফেদ আলি সরকার, কান্তনগর মেওয়াখানার ফজলুল রহমান ও পুরন্দরপুরের হামজার আলির নাম উল্লেখযোগ্য।

গ) বোলান

বোলানগান লোকনাট্যধর্মী গীত অনুষ্ঠান। শিবগাজনকে কেন্দ্র করে রাঢ়বঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব। চৈত্রসংক্রান্তির ছয় সাতদিন ধরে চলে এই গান বেলডাঙ্গা, নওদা এবং মুর্শিদাবাদের বেশকিছু জায়গায়। বছর শেষ এবং নতুন বছরের আগমণ এই সন্ধিক্ষণেই গাওয়া গাজন গান। এই গান মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা, বেলডাঙ্গা এবং নওদা থানাতেই সীমাবদ্ধ। বোলান গানের বিষয় পুরাণ রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এছাড়া, এখন এই গানের বিষয় হিসেবে পণপ্রথা, বন্যা গ্রাম্যপরিস্থিতি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রভৃতিও গুরুত্ব পাচ্ছে। এই গানে প্রথমদিকে মুসলিমরা কেউই অংশ নিত না। বর্তমানে বেশ কিছু শিল্পী এই গানের প্রতি আগ্রহী। কান্দির পুরন্দরপুরের পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডলের দলে ম্যানেজার ছিলেন নিয়ামত সেখ। পালাগুলির রচনাকার শুকুরুল্লা সেখ ওই অঞ্চলের ছকু ওস্তাদ নামে সমধিক পরিচিত। কান্দির 'সারাংপুর' গ্রামের দলটিতে একাধিক মুসলিম শিল্পী যুক্ত আছেন। এই গ্রামের ইজাই সেখ, আঙুর সেখ এখনও বোলান গান করেন। এই থানারই কোটালডিহি গ্রামের বোলান দলে গান করেন জঙ্গি সেখ, মাইনুদ্দিন, আলেফ সেখ ও সাইদ সেখ। এই দলে 'রাধার মানভঞ্জন' পালাটি রচনা করেছেন জেলার কবিয়াল জুব্বারি সেখ। 'বিল্বমঙ্গল' পালাটি রচনা করেছেন বড়ঞার বসুরপুর গ্রামের মান্নান মিঞা। বেলডাঙ্গার 'কদমতলা'র গ্রামদেবতা আদম-গাদম উৎসবে বোলান গান করতেন করিম সেখ ও তাঁর দলবল। এছাড়া খড়গ্রাম থানার কান্দুরিয়া গ্রামের সাইদুর রহমান, ভরতপুর থানার পলিষা গ্রামের ইসমাইল সেখ বোলান গান রচনা করেন।

ঘ) মর্শিয়া / জারিগান

মর্শিয়া একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ শোকগীতি। কারবালার যুদ্ধে (হিজরি ৬১ সনের ১০ মহরম মাসে) ইমাম হুসেন এবং আরও ৭২ জনকে কারবালার প্রান্তরে এজিদ পক্ষের সৈন্যবাহিনী হত্যা করে। হজরত মহম্মদের নাতি, বিবি ফাতিমার আদুরে সন্তান ইমাম হুসেনের কাটামুণ্ডু

কুফায় পাঠানো হলে জনগণ কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই শোক বিলাপের প্রতীক মহরম উৎসব। এই উৎসবে কারবালার হত্যাকাণ্ড নিয়ে রচিত হয় মর্শিয়া গান, যা জারিগান নামেও পরিচিত। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম এর শিক্ষকরা উর্দুতে বহু মর্শিয়া রচনা করেন। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে খাজা ইমাম এবং জহর আলি ফার্সীতে বহু মর্সিয়া লিখেছেন। কারবালা যুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ঘটনাসহ যুদ্ধের বিবরণ বিভিন্ন খণ্ডে বিষয় হিসেবে জায়গা পেয়েছে। জারীগান বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। একজন মূল গায়েন থাকেন। অন্য চার পাঁচ জন ধুয়া ধরেন। বুক চাপড়িয়ে বৃত্তাকারে গাইতে থাকেন এই গান। লালবাগের শিয়া মহিলারাও এইগান করেন। তাজিয়া সহ শোভাযাত্রার সঙ্গেও এই জারিগান গাওয়া হয়। উদয়চাঁদপুর, ভরতপুর পাটকাবাড়ি, সালার, লালবাগ, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, কিছু যায়গায় এই গানের প্রচলন আছে। রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটাতেও গানের দল আছে। সাগরদিঘি থানার কড়াইয়া গ্রামের তসিউর রহমান, নূর মহম্মদ মোল্লা, দিনদার সেখ, টুটুল সেখ, জশীমুদ্দিন, সাইফার সেখরা সরকারি প্রোগ্রামে জারিগান করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। জারী গানের জন্য যাঁরা জেলায় সমধিক খ্যাতি পেয়েছেন তাদের মধ্যে কান্দি-হিজল নতুগ্রামের মহম্মদ মহসীন আলী, হরিহরপাড়া দস্তুরপাড়ার সাহেব মোল্লা এবং সম্প্রদায়, লক্ষ্মীনারায়ণপুর জীবন্তীর শের আলি ও ধলা জীবন্তীর রসিনা বিবির নাম উল্লেখযোগ্য। এই গানের দুটি নমুনা—

এক) এজিদ বাদশা বেদীন
তখ্ত পরে বসে একদিন
বলে মতলেব উজিরে ... ...
ধুয়া ... ...
ইমাম হাসান, হোসেন দু ভাই
আছে মদিনা শহরে॥
ধুয়া ... ...
কেউ পারে না জোরে
ফিকির করে, মেরে ফেলে তাদেরে॥
ধুয়া ... ...
বড় ইমাম মারা গেলে,
ছোট ইমামকে করবে তারা খঞ্জরের তলে।
শুনে বেদ্বীন উজির স্বীকার করে নিলে।
ইমান মারবো বলে।
হেকমতী এক কুট্নী বুড়ি
একজন এসে দিলে উজিরে॥
ধুয়া ....

হায়রে হোসেনা।
বুকে লাগে বেদনা,
দুঃখ আর সহেনা, হায় হায় হায়

কারবালা প্রান্তরে

পড়ে আছে একারে
কেহ নাহি সাথেরে, হায় হায় হায়

যার নানা নবী
এই কিগো খুবী
সহিতে হয় সবি, হায় হায় হায়

যাঁর পিতা আলী
পড়ে আছো খালি
লাগে ধূলা বালি
হায় হায় হায় ... ...

এই গান দুটি সংকলক মুহাম্মদ আয়ুব হোসেন

ঙ) একদিল গান

দাফালিরা পাঁচপীর এবং মানিক পীরের উপাসক। এঁরাই পুরোহিত এবং বাদ্যকার। 'একদিল পীর' গানের এঁরাই প্রবর্তক। বাড়ির কোণে কিংবা গাছের তলায় পাঁচটি স্তূপ প্রস্তুত করে তাঁরা পাঁচপীরের উপাসনা করেন। পীরের সিন্নি দেন। দাফালিরা একটি লোহাদণ্ডকে লাল কাপড়ে ঢেকে, ফুলসাজিয়ে মাগন ও পূজা করেন। একমুখো দন্ত বাজিয়ে, জিকির করে করে একদিল গান করে তাঁরা মহামারী রোগ তাড়ান, বৃষ্টি আনেন। পীরের মহিমা কীর্তন রয়েছে এই গানে। হরিহরপাড়ার খামারমাটি, জামনাবাদ, শঙ্করপুর, তরতীপুর, ডোমকলের কুমারপুর, বেলডাঙ্গার রতনপুর, ব্যাধবেড়িয়ায় অনেক দাফালি বাস করেন। হরিহরপাড়ার পাঠানপাড়ায়, গাড়িনামায়, রানীনগরের রামনগরে এবং বেলডাঙ্গা-নওদায় ব্যাধবেড়িয়ায় একদিল পীরের গানের নিজস্ব দল আছে। রানীনগরের রামনগর গ্রামের মহঃ ইসলাম আলি ও সম্প্রদায় এবং নতুনপাড়া চোঁয়ার ধনি খাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। একদিল, মানিক, সত্য, মাদার, পীরদের জন্ম, কর্ম, অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত এই গান সারারাত ধরে পরিবেশিত হয়। একজন মূল গায়েন থাকেন আর ৫/৬ জন দোহার থাকেন ধুয়া দেওয়ার জন্য। নাচ গান সংলাপে এই গান লোকনাট্যের রূপ নিয়েছে। সত্যপীরের পাঁচালি করেন পাঁচগ্রাম তেঁতুলিয়ার মারফত আলি ও বদিউজ্জামান।

চ) বাউল/ফকির/দেহতত্ত্ব/শব্দতত্ত্ব গান

বাংলায় প্রচলিত ইসলামী ভাবধারার তিনটি রূপ লক্ষ্য করা গেছে। (১) শরীয়ত শাসিত গোঁড়া মুসলিম ধারা। এই ধারার ধারক হলেন মসজিদের মৌলভী, মৌলানা, মাদ্রাসার মৌলভী এবং মধ্যযুগীয় বিচারকার্যে নিযুক্ত কাজী সম্প্রদায়। এঁদের কঠোর নিয়ম তান্ত্রিকতা, বিধর্মীর প্রতি জেহাদ অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিতো বটেই, নমনীয় মানবতাবাদী মুসলিমদেরও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (২) সুফী মতাবলম্বীদের ধারা। এই ধারা শরীয়তি ধারা থেকে অনেকটাই পৃথক। এঁদের উদার দার্শনিক মত, মানবপ্রেমের বাণী হিন্দু-মুসলিম সমাজের মননশীল মানুষকে আকর্ষিত করেছে। সুফীপন্থায় শরীয়ত, তরীকত এবং হকীকতের পথ অতিক্রম করেই মারেফাতের সাধন প্রক্রিয়ায় পৌঁছনোর কথা বলা হয়। মারেফাতে পৌঁছানোর জন্য মুর্শেদ ধরতে হয়। তাঁরাই পন্থাগুলি বলেছেন। মারেফাতে সুফী নিজে সেই অন্বেষণের খোঁজ পান। সুফী সেই

আদৃশ্যে নিজেকে বিলীন করেন অর্থাৎ ফানা হয়ে যান। সুফী সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রেম সাধনা। ঈশ্বর কখনো প্রেমিক কখনো প্রেমিকারূপ নিয়ে অবতীর্ণ হন। এই প্রেম সাধনার আসিক এবং মাসুকের মিলন মুহূর্তের নাম আনাআল হক্ অর্থাৎ আমিই সেই। (৩) বেশর বা বে শরা ফকিরী ধারা। এই ধারায় রয়েছেন ফকীর সম্প্রদায়। এঁরা খানদানী সুফী নন। এঁরা মূলত সহজিয়া মরমী সম্প্রদায়। ইসলামের কঠোর অনুশাসনকে এঁরা পরিহার করেন। এই ধারার উত্তরাধিকার বহন করেছেন আউল-বাউল-ফকিররা। এঁদের ভাবনায় এবং গানে রয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার রীতি, তান্ত্রিকদের দেহ সাধনার রীতি এবং রাধাকৃষ্ণের বৈষ্ণবীয় প্রণয়তত্ত্ব। দেহই তাঁদের মসজিদ, মক্কা। সেখানেই সর্বদা চলছে তাঁদের নামাজ, রোজা, হজ। বাউল এবং ফকিরদের অর্ধেক বাতুন বা গোপন। এই গোপনকে জানতে তাঁদের গুরু লাগে, দেহলাগে, নারীসঙ্গ লাগে, লাগে আত্মসংযম। তাঁদের মতে, সন্তান মানেই শরিক। শরিক মানেই অভাব, দারিদ্র্য, কান্না, অসুখ, শোক, তাপ, দুঃখ, নিজস্ব শান্তির অবসান। এরজন্য তাঁরা মুর্শেদ ধরে বা গুরু ধরে দম আর শ্বাসের কাজ শিখে নেন, কায়সাধন করে সন্তানের জন্মরোধ করেন। তাঁরা মনে করেন রোজা বা দেহসংযমের চেয়ে আত্মসংযম অনেক জরুরি। বাউল-ফকিরি গানকে অনেকেই দেহতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্বের গানও বলে থাকেন। ফকিরের এই গান তো দেহতত্ত্বেরই গান—

১. আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার ভিতরে
তিন গম্বুজ তিনটি সিঁড়ি
ভিতরে তার খোদার ঘড়ি
রেখেছে নয় দরজা ছয়জনা মৌলবী ফিরে
আল্লা কি মসজিদ ... ...

২. নাভীর মধ্যে মক্কা শরীফ
কইর্যাছে ঠিকানা—
নাভীর উপর বায়তুল মোকাদ্দাম
কলিজাতে থানা —
দেলের ভিতর রাখিয়াছে
সোনার মদিনা।

৩. মালা জপে পাঁচবেলা
কে কোথায় পেয়েছে আল্লা?
মক্কা ও মদিনা গেলে
কই তাহার ঠিকানা মেলে?
হাজিগণকে শুধাইলে
সেথা হয় মানুষের মেলা।
যেয়ে দেখি জুম্মাখানা
তথায় গিয়ে খোঁজ পেলামনা
মানুষে খায় মানুষের খানা
আল্লা খায় না একতোলা

৪. ও তুমি দেলহুজুর না চিনলে
তোসার নামাজ হবে কি রে?

দেল হুজুরে পড়ো নামাজ
আপনার মোকাম চিনে।
৫. বে-আকারে সিজদা দিলে
খ্যাপা সেই সিজদা কি হয় দলিলে
আকার ধরে দাওরে সিজদা
বসে থাকো এক ধ্যানে।

এই গান নিয়েই তো বাউল ফকিরদের সাথে কট্টরপন্থী মুসলিমদের বিরোধ। যার জন্য বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে মুর্শিদাবাদের বাউল ফকিরদের।

ফকিরও ফকিরী গানের শ্রেণীভেদও আছে। (ক) বেশরা ফকির। গানে গানে এঁদের সাধনা। এঁদের সংঘ/সমিতি আছে। মুর্শিদাবাদে এধরণের ফকির আছেন। (খ) গৃহী ফকির। এঁদের সংসার আছে। (গ) ভিক্ষুক ফকিররা এই পর্যায়ের, জঙ্গিপুরের ফকিরপাড়ায় এঁদের বাস। এঁরা সকালে ভিক্ষেয় বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত্রে। (ঘ) যাযাবর/মুসকিল আসান ফকির। এঁদের ঘরবাড়ি নেই। এঁরা সাধারণত এক মাজার থেকে অন্য মাজারে গান করে ফেরেন। বাউল বা ফকিরি গান করেন এমন বহু শিল্পী মুর্শিদাবাদে রয়েছেন এখানে এঁদের মধ্যে হরিহরপাড়া থানার জগন্নাথপুরের হেফাজুদ্দিন ফকির, ভবানীপুরের হানিফ সেখ, প্রদীপডাঙ্গা জগন্নাথপুরের বাবলু সেখ, ফরিদ সেখ, উত্তর পাঠানপাড়া, চোঁয়ার মর্জেম সেখ, শাহজাদপুরের মহিম ফকির, আনিসুর রহমান, জুলমত ফকির, পাঠানপাড়া চোঁয়ার জাহিরুদ্দিন খাঁ, লালনগরের নজরুল ইসলাম, চোঁয়া নতুনপাড়ার আয়ান সর্দার, পীরতলার সামশুল হক, নশীপুরের মাজাহার সেখ, লালবাগ থানার ধরমপুর ডাঙ্গাপাড়ার মুস্তাকিম সেখ, নওদা থানার দুর্লভপুরের লতিফ সেখ, ঝাউবোনার আফাজুদ্দিন মণ্ডল, খোসালপুর বারুইপাড়ার লালমহম্মদ সেখ, পাড়দেয়ারের লোকমান ফকির, খামারমাটি তরতীপুরের মাসুয়া খাতুন, লালনগরের মজরুল সেখ, হরিশপুর বারুইপাড়ার তাজমল্লিক ফকির, আলি বক্সফকির, ভরতপুরের আব্দুস সাত্তার, সারগাছির সোলেমান সেখ, গড্ডা সিঙারির রহিদ সেখ, দহেরধার মহুলার দিলদার ফকির, বাড়ালা বাজিতপুরের আবসার আলি, ভরতপুর থানার সৈয়দ কুলুটের বিক্রম ইয়াসিন, ভরতপুর মসজিদপাড়ার আনসার সেখ ও আসলাম সেখ, বেলেবাড়ির আলি সেখমণ্ডল, চোঁয়ার সামসের ফকির, চণ্ডীপুরের হিমু ফকির, নতুগ্রামের জেসমিনা খাতুন (বাউল), গোধনপাড়ার সিরাজুল ইসলাম, বাগানপাড়ার মনসুর খাঁ, শিমুরালির নজরুল ইসলাম, মোজাফ্ফর হোসেন বিশ্বাস, পাঁচগ্রামের রফিকুল ইসলাম এছাড়া আনসার আলী, আনসারী মাহবুব হোসেন, খাজমৎ আলী, গোলাম রহমান খাঁ, মানোয়ার সেখ, বেদানা বিবি, আলি হোসেন সরকার, খাতেম আলী ফকির, গোলাম ফকির, নাসিরুদ্দিন ফকির, মতিয়ার ফকির, কালু ফকির, নাজিমুদ্দিন, আবুল কালাম, সেনরুদ্দিন ফকির, আবদুস সামাদ, আব্দুল মান্নান, আবতাফ হোসেন, ফজল ফকির, জামাত আলি ফকির প্রমুখর নাম উল্লেখযোগ্য। হরিহরপাড়ার আলেপ সর্দারের নাম আজ কারো অজানা নয়। এঁরা সকলেই ফকিরি গান-বাউল-দেহতত্ত্ব-শব্দগান এমনকি লোকগীতি গেয়ে থাকেন। সরকারি প্রোগ্রামও করেছেন এঁরা। শব্দগানের সোলেমান সেখ, করম আলি, হুরমুজ কানা, ডোমকলের রামচন্দ্রপুরের খাবিরুদ্দিন সেখ, বর্তনাবাদের নওসাদ আলি, জলঙ্গির ফরিদপুরের নজরুল সেখ প্রমুখ। উল্লেখ্য দেহতত্ত্বগানে ইদানীং নবগ্রাম থানার খাজুরিয়া গ্রামের বেদরুল সরকার, সাইরুল বিশ্বাস এবং সম্প্রদায় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

এছাড়া লোকচর্চার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদে আরও বহু শিল্পীকে আমরা তাঁদের শিল্পদক্ষতা নিয়ে

এগিয়ে আসতে দেখেছি। ভাদ্রমাসে পল্লীগ্রামে সাধারণত তেমন কোনও কৃষিকাজ থাকে না। গরম গুমোটে বিদ্যুৎ বিহীন রাতে জটলা বসে বারান্দায়। গভীররাত পর্যন্ত চলে লোককাহিনী শোনার পর্ব। এ ধারা বর্তমানে ক্ষীণ হতে থাকলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। লোককাহিনীতে নানান গল্প বলা হয় (ধর্মীয় এবং রূপকথা প্রাধান্য পায়)। মাঝে মাঝে গান পরিবেশিত হয়। মাঝে মাঝে চলে চা পর্ব। সাগরদিঘি থানার বিনোদবাটিতে এরকম এক শিল্পী ছিলেন। নাম মাজেদ মণ্ডল। বর্তমানে তিনি বেঁচে নেই। বর্তমানে লোককাহিনীর শিল্পীরা হলেন নবগ্রাম থানার খেঁকুলের আখতার হোসেন, লালগোলা থানার ডাঙ্গার মাঠের জালাল সেখ, রঘুনাথগঞ্জ থানার নতুনগঞ্জের সুবেদ আলি প্রমুখ। পাঁচালির ছড়া গেয়ে থাকেন নবগ্রাম থানার খেঁকুলের মহঃ সামসুজ্জোহা, গোপগ্রাম রাইগুার রশিদ সেখ, হরিহরপাড়া থানার গোবরগাড়ার নিয়ামত সেখ, সর্দারপাড়ার আয়ান সর্দার প্রমুখ। ঘোড়ানাচের মনমোহক শিল্পে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছেন সুবর্ণমৃগীর ফকিরচন্দ্র সেখ, ওড়াহার সুন্দরপুরের আইনুদ্দিন সেখ, নৌসাদ আলি শেখ ও রেজাউল সেখ। পট শিল্প ও লোকচর্চায় একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে এই জেলা। এই শিল্পে এড়োয়ালি আসরার আয়ান পটুয়া এবং ঝিল্লি নোনাডাঙ্গার কালাম পটুয়াকে আজ সকলেই জানেন।

ছ) মুসলিম বিবাহগীতি

মুসলিম সমাজে বিবাহ একটি সাংবিধানিক নির্দেশ। একজন অবিবাহিত পুরুষের ৭০ রাকাত নামাজ একজন বিবাহিত পুরুষের এক রাকাত নামাজের সমান— ধর্মীয় বিধানে এভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিবাহকে। বিবাহের দিন ধার্য, সম্মতি, দেহমোহর বা মোহরানা, কাবিলনামা, বিবাহপড়া বা খুতবা পাঠ, ইজারকবুল এসবই বিধান মেনে পালিত হয়। কিন্তু বিবাহে এই শরীয়তি বিধান ব্যতীত বিভিন্ন লোকাচারগুলি মুসলিম সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকচর্চার এক অনন্য সম্পদ মুসলিম বিয়ের গীত। এই গান পুরোটাই মেয়েদের গাওয়া গান। পুরুষরা এখানে অংশ নেননা। কথ্যভাষায় একে 'বিহ্যার গীদ্'ও বলে। মুসলিম বিবাহরীতিতে যে অনুষ্ঠানগুলি আছে প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই পরিবেশিত হয় এই গীত। সমবেতভাবে আত্মীয়স্বজন বাড়ির ও প্রতিবেশীদের মেয়েরা এই গান করে থাকে। বিয়ের মূল অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে — পানচিনি, গায়ে হলুদ, তেলঢালা, ঝুমুর খেলা, আমলা বাঁটা, ঢেঁকিমঙ্গল, ক্ষীর খাওয়ানো, হাজামত করা/ মেহেদিপরা, মাথা বান্ধা, থুবড়া/ আইবুড়ো ভাত, বরণ, আলামতলা, হাত ধোয়ানো, বিয়েপড়া, গিঁটবাঁধা, সিহারা বাঁধা, কড়িখেলা, শুভদৃষ্টি, কন্যাবিদায়। এসব অনুষ্ঠানই কন্যার বা পাত্রীর গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রের গৃহেও গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর বধূর আগমনের পর যে অনুষ্ঠানগুলি হয় তা হল ঃ বৌবরণ, মাছবাছা, বাসি গোসল, ওলিমা / বৌভাত, অষ্টমঙ্গলা, হলদিমুখ ধোয়া।

মুসলিম বিয়ের গীতগুলিতে কেবলমাত্র বিনোদনই নেই, এক গভীর সামাজিক আবেদনও রয়েছে। জেলাতে প্রথম মুসলিম বিবাহের গীতকে লোকসমক্ষে তুলে ধরেন, মঞ্চস্থ করেন এলাহিগঞ্জের বুলু বিবি। বুলু বিবির দল আছে। প্রতিটি মহাকুমাতেই গ্রামে গ্রামে এই বিয়ের গীত বিয়েতে গাওয়া হয়। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে, মুসলিম বিধান বহির্ভুত বলে গান গাওয়ার জন্য আপত্তি ওঠে। বাজনাও সেখানে বাতিল। সাধারণত মুসলিম বিয়ের গীতে দফ্/একমুখো ঢোল (ইসলামী বিধানে এই দফ্এর ছাড় আছে এমনমনে করা হয়) ছাড়া অন্যকোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। মুর্শিদাবাদের বহু জায়গাতে এখন মুসলিম বিয়ের গীতের পেশাদারি দল তৈরি হয়েছে। জীবন্তীর অদূরে ধল্লা গ্রামের মহিমা খাতুন ও তার দলের নাম আজ সকলেরই জানা।

মহিমার স্বামী একরামুল হক তাঁকে সাহায্য করলেও প্রথমদিকে আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বাধা এসেছিল। এখন সে সংকট নেই। তাঁর দলের নাদিরা খাতুন, সহেদা খাতুন কিংবা রসিনা বিবিরাও আজ সে সাহস অর্জন করে পেশাদার হয়েছেন। পলশাতে বিয়ের গানের দল গড়ে উঠেছে। খড়গ্রাম থানার ইন্দ্রানী গ্রামের মুর্শেদা বিবি, হাসেবা বিবি, খাইরুন্নেসা, হাসনা বানুরা সরকারি বেসরকারি প্রোগ্রাম করছেন। এছাড়া, খড়গ্রাম থানার হাজরাবাটি গ্রামের শাহেদা খাতুন, পলসণ্ডার সন্নিকটে তেজাপাড়া গ্রামের বানেরা বিবি, মিনতি বিবি, নগরের চায়না খাতুন, কোহিনুর, ফুলজান, সপাতন বিবি, ভরতপুরের খড়িন্দা গ্রামের নাজনীন বানু, রূপা খাতুন, রাইগ্রামের সানোয়ারা খাতুন ও দলের নাম বিয়ের পেশাদারি গায়িকা হিসেবে সামনে উঠে আসছে। হরিহরপাড়া থানার প্রদীপডাঙ্গার বুলুবিবি, মেহেরুন বিবি ও সম্প্রদায় এবং পাঠানপাড়া চোঁয়ার ওলিসা বেওয়া, মজিদা বিবি ও সম্প্রদায় যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন। তবে, বিভিন্ন জায়গাতে এই গানের সাথে দফ্ ছাড়া একতারা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা মুসলিম বিয়ের গীতে প্রথাবহির্ভুত এবং এই গানের বিশিষ্টতা নষ্ট করেছে। এই গানকে সর্বাধুনিক করতে গিয়ে একসময় হয়তো এর বিশিষ্টতা আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে না— এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ভীষণ জরুরী।

এই পর্যালোচনাসমূহ থেকে বিগত সহস্রাব্দের নিরিখে মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানসের একটি অনুপুঙ্খ চিত্রালোক কল্পনা করতে পারছি। আর এই প্রেক্ষিতকে সামনে এনে আমরা উৎকৃষ্ট সুযোগগুলিকে নিজস্বক্ষমতায় কাজে লাগিয়েই নতুন সহস্রাব্দের একটি প্রতিমা গড়ে নিতে পারি, যা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতার মাধ্যমে আমাদের মানবাধিকারের মূল্যবোধকে ভিত্তি দিতে পারে। এটা সম্ভব তখনই যখন আমরা যুক্তিবাদের মাধ্যমে আমাদের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব, রক্ষণশীলতা ও শ্রেণীভেদকে নির্মূল করতে পারব। আমাদের সামাজিক বিবেককে জাগ্রত করে রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে আঘাত আনতে পারলেই তা সম্ভব। সহনশীলতার মাধ্যমে, সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে সম্প্রদায়গত ভেদ মুছে দিয়ে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে বুঝে নিয়ে এক আত্মীক সম্পর্ক গড়ে নিতে পারলেই এই সীমাবদ্ধতা আর থাকবে না। থাকার কথা নয়। ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে এই বোধই উত্থিত হওয়া জরুরি যে— আমরা প্রথম থেকে শেষ অবধিই মানুষ, কেবলই মানুষ, অন্য কিছু নয়।

ঋণ স্বীকার ঃ

শক্তিনাথ ঝা, মোজাফ্ফর হোসেন, পুলকেন্দু সিংহ, সাধন রক্ষিত, খাজিম আহমেদ
অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, এবাদুল হক, নুরুল হক, সেখ আনিশ, আবুল কালাম,
এস এম নিজামুদ্দিন, সৈয়দ সুশোভন রফি, মবিনুল হক, এম নাজিম,
খন্দেকার গোলাম মার্ত্তজা, এমদাদুল হক মণ্ডল, আলমগীর হোসেন।

আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাথে লোকসংস্কৃতির রূপান্তর

অপরেশ চট্টোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ জেলা ঐতিহাসিক জেলা। এই জেলাকে প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত করেছে ভাগিরথী নদী। জেলার পূর্ব অংশ কে বলা হয় 'বাগড়ী' এবং পশ্চিমাংশ 'রাঢ়'। বাগড়ী পলিমাটি উর্বর অঞ্চল। রাঢ় প্রাচীন, রুক্ষভূমি। এই দুই অংশের ভূপ্রকৃতি, ভাষা, বাসগৃহ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। দুই অংশেই আছে ছোট, বড় বিল। রাঢ়ে হিন্দু আদিবাসী সংখ্যা বেশী। বাগড়ীতে মুসলিমদের প্রাধান্য। জেলার মোট জনসংখ্যা ৫৮,৬৩,৭১৭ জন। তার মধ্যে গ্রামে বসবাস করেন ৫১,৩১,৩৩ জন।। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে সাতাশি জন। গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ৪৩.৫২ শতাংশ। ৫৩২৪ বর্গ কিলোমিটার এই জেলার রাঢ়ের উল্লেখযোগ্য নদীগুলো হলো ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, কুয়ে বা কোপাই। অন্যদিকে বাগড়ী এলাকার উপর দিয়ে প্রবহমান ভাগিরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, শিয়ালমারা। ছোট বড় অনেক নদী বিধৌত এই জেলা আজো কৃষিনির্ভর। আর এই কৃষি নির্ভর পল্লী সমাজই হচ্ছে লোক-সংস্কৃতির আতুরঘর। এই জেলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে বোলানগান, আলকাপ বা পঞ্চরস, ভাদুগান, হাপু গান, গীদ গান, বিভিন্ন বিবাহগীতি, পটুয়া সংগীত, ঝাঁপার গান, ভাঁজুই গান, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকছড়া, সঙের গান, উল্লেখযোগ্য। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন বা রূপান্তরের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে সংক্ষেপে বর্তমান সময় পর্যন্ত আর্থ সামাজিক পরিবর্তন গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা জরুরী ও প্রাসঙ্গিক।

স্বাধীনতার পরে সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে কৃষিকাজ বলতে ধান চাষকেই বোঝাত। বৃষ্টির জলে চাষ হতো। গ্রীষ্মকালে ছিল ফুটিফাটা। তারপর ময়ূরাক্ষী নদীর উপর গড়ে উঠল কানাডা বাঁধ যা ম্যাসানজোড় নামে পরিচিত। ক্যানেল তৈরী করে ময়ূরাক্ষী নদীর জলে সেচের ব্যবস্থা হল। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় কম। রাস্তাঘাট, ব্রীজ নির্মিত হল। ৫৫ সালে ভূমিসংস্কার বিল পাশ হলেও জেলায় কার্যকারী হয় সত্তর দশকের মাঝামাঝি। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে ঘাসজমি বিলি করা হল ভূমিহীনদের মধ্যে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের একটা অংশ ছোট চাষীতে পরিনত হলো। বিলি বন্টনের জমি, অনেকের ভাগেই ছিটেফোটা; চাষ করে সংসার নির্বাহ করার মত নয়। বাগড়ী অঞ্চলে পাট ছিল অর্থকারী ফসল। সবজী চাষ হতো। ছিল আম, কাঁঠাল, বাঁশের

বন। স্বাধীনতার আগে এবং ৭১ সালে বহু পূর্ব বঙ্গীয় জেলায় আসে। ছড়িয়ে পড়ে জেলা জুড়ে। বাগড়ী অঞ্চলের কালান্তর, বিল জায়গায় ধান চাষ, ডালচাষ হতে লাগল। এদের কেউ কেউ পাট্টা ও পেয়েছিল। আম, জাম, কাঠালের বন কেটে জমি তৈরী হল। সড়কপথ, জলপথ, রেলপথ থাকায় দ্রুত বাগড়ী এলাকার অর্থনীতিতে পরিবর্তন এলো। পূর্বে রাঢ় ছিল চাষের জন্য বিখ্যাত। জমির দাম ও ছিল বেশী। বর্তমানে বাগড়ী এলাকার জমির দাম বেশী। পূর্বে একবার মাত্র ফসল হলে বর্তমানে উন্নতবীজ, ট্রাকটর, সেচের কল্যানে দুবার ফসল ফলে। পূর্বে চাষীদের সোনা, বাসনপত্র মহাজনদের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। এখন দুবার ফসল ফলায় সেটা অনেক কমেছে। তবে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে বেশী অর্থ। সত্তর দশকের শেষের দিকে গ্রামীন ব্যংক থেকে চাষীদের কৃষি ঋণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চাষ , গোপালন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন এসেছে ৮০ দশক জুড়ে। ফসল বিক্রির টাকায় উচ্চ ও মধ্য চাষিদের অর্থে গ্রামে ঢুকেছে ট্রাকটর, মোটর সাইকেল, টিভি। কেউ কেউ ভিডিও হল তৈরিও করেছে। পাকা রাস্তার ধারে, গ্রামেও গড়ে উঠেছে ধানকল, গমকল, করাতকল তেলকল। পূর্বের তুলনায় কোল্ড স্টোরস এর সংখ্যাও বেড়েছে। সর্বত্র নাহলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। গ্রামে স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। ওই সময় গ্রামে ধনী চাষি, শিক্ষিত চাকুরিজীবীরা পাকা বাড়িও নির্মাণ করেছে। এই পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কিছু কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যেমন জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (ডি আর ডি এ), জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান (এন আর ই পি) সুসংহত গ্রামীণ কর্মসূচি (আই আর ডি পি)। যদিও এই স্কুলেরই ৯০ শতাংশই গ্রামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কিছু মুষ্ঠিমেয় পরিবারের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে এই পরিবর্তনগুলো স্বাধীনোত্তর নব্বই দশক পর্যন্ত। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয় সংকট। এবং তা ক্রমশ তীব্রতর হয়। ধনী-চাষিরা ফসলের পিছনে যে খরচ করছে তা উঠছে না। কারণ ফসলের দাম নিম্নগামী। প্রযুক্তি ক্রমশ দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। শুধু কৃষি নির্ভর নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশায় আয় করে এমন ধনী চাষিরা ফসলের অবস্থার সামাল দিলেও মধ্য চাষিরা বিপদে পড়েছে। আর যারা জমি পেয়েছিল সেই ভূমিহীন মানুষেরা চাষের খরচ জোগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে তাদের জমি বিক্রি হয়ে চলে যাচ্ছে অন্যের হাতে। তারা আবার ভূমিহীন মজুর বা ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। পাট চাষি, রেশম চাষিদের অবস্থা খুবই খারাপ। আলু জমিতেই পচে। সংরক্ষণের অভাব তো আছেই। জেলায় কোনও বড় শিল্প গড়ে উঠেনি। অথচ, উন্মত্ত প্রযুক্তি কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়িয়েছে। লোক সংখ্যা বাড়ছে। জমি বাড়ছে না। শহরের কলকারখানায় তালা। সব মিলে এক গভীর সংকটের আবর্তে পশ্চিমবাংলা তথা এই জেলা।

কাজের খোঁজে দখিনে যাচ্ছে। দেহব্যবসা, সুদের কারবার (অবৈধ), বন্যা, ভাঙনে সর্বহারা মানুষ চোরাচালান, লটারি ব্যবসা, ডাকাতি, কিম্বা মেয়েরা বড় শহরে 'ঝি-গিরি' করতে চলে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা হাতের নাগালের বাইরে। জেলাজুড়ে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনীতির বেহালদশাই এই অবস্থার কারণ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক মান, শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ার পরিবর্তে, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। পঞ্চায়েত রাজের মূল কাজ ছিল তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তা কার্যত ব্যর্থ। কৃষির আধুনিকীকরণ ও শহরে শিল্পায়ন ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের রাস্তা খুলে দেওয়ার পথে হাঁটেনি সরকার। প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ছোটখাটো ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে অল্প পুঁজির দোকানদারি করতে গিয়ে বেকার যুবকদের অনেকেই নিঃস্ব। ব্যর্থ হয়েছে স্বনিযুক্ত

প্রকল্প। গ্রামীণ মানুষের একটা অংশ দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। চলছে খুন, অপহরণ, লুটের রাজত্ব। গ্রামের স্থিতাবস্থা ভাঙায় শিক্ষিত মানুষ চলে যাচ্ছেন শহরে। সেখানে ব্যবসা বা অন্য কিছু করছেন। গ্রামীণ যুবক শিক্ষান্তে চাকুরি না পাওয়ায় বিপথে চালিত হচ্ছে। এর ফলে গ্রামে একটা সাংস্কৃতিক শূন্যতার সৃষ্টিও হয়েছে। ভোট সর্বস্বতার ফলে ফাটল ধরছে লোকসংস্কৃতি চর্চাকারী দলে। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠছে চুল্লুর ঠেক। বাবা, মা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। সংসারে অশান্তি বাড়ছে। পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে দিচ্ছে ভিডিও হল, দূরদর্শন। নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। বেকারভাতা, লোকশিল্পীদের ভাতা বন্ধ। রেশনে তেল চিনি দিলেও কম। গরিব মানুষ তাও সব সময় কিনতে পাররেন না। সমস্ত রকম উন্নয়ন কর্মসূচি বন্ধ।

বন্যা, ভাঙনে জেলা বিপর্যস্ত। বারবার বদলে যাচ্ছে মানচিত্র। জমি-জমা, ঘরগেরস্থালী সব হারিয়ে চরম অসহায়। সরকার উদাসীন। ভোটবাজ বেশিরভাগই দলই ক্ষমতা দখল করতে ছড়িয়ে দিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। নষ্ট হচ্ছে মানুষে মানুষে সম্পর্ক। এক গভীর সংকট। আর এই সংকটের মধ্য দিয়েই চলেছে জেলার মানুষ। এই আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনের সুফল, কুফল লোক সমাজে ছাপ ফেলেছে। লোক সংস্কৃতির মধ্যে আমরা তারই কিছু প্রতিফলন দেখবো।

হাপুগান

কেউ বলেন 'হাবু' আবার কেউ বলেন 'হাপু'। আবার কারো কারো মতে 'হাফু'। যাইহোক এই গান রাঢ় অঞ্চল ও নওদার দিকে শোনা যায়। মহঃ আয়ূব হোসেনের মতে হাপু গান যারা গায় তারা আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত। এদের আদি বাসস্থান অজয়, দামোদর তীরবর্তী অঞ্চল। ঘর বাড়ি, জমি, বন থেকে উৎখাত এই শ্রেণীর মানুষ দুঃখে যে গান গাইত সেটাই হল হাপু। 'হা' অর্থে অভাব বা হাহাকার, 'পু' অর্থে পূরণ। এমত যদি সত্যি হয়, তবে বলতেই হয় হাপু গান অনেক পুরনো। পিঠে লাঠি মেরে, মুখে শব্দ করে, এই গান গাওয়া হয়। শহর, গঞ্জের ফাঁকা জায়গায় কিম্বা একটু দূরে মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে যাযাবর দেখা যায়। সম্ভবত এরাই আদি হাপু গায়কের দল। বর্তমানে হাপু গান কেউ কেউ তুড়ি মেরে গায় আবার টিম করে দলগত ভাবেও গাওয়া হচ্ছে। ব্যবহৃত হচ্ছে হাত-ঢোল। শুধুই দুঃখে হাপুস হাপুস কান্না নয়, উঠে আসছে বর্তমান অধঃপতিত সমাজের চিত্রও। যেমন—

সিত্যায় সেন্দুর চড়লে পরে এমুন পারমিট পায়
শশুড়, শাশুড়ি ফেলে আগে ভাতারের স্যাঁতে খায়।
ক্যাড় করে না কাউকে তখন যেন লাগাম ছাড়া ঘোড়া
উদোম দ্যাহ আর গুদুম দেঁখায় ভাতারকে করে ভেড়া।
উর-র-র ঘেচ্যাক দুম, ঘেচ্যাক দুম, ঘেচ্যাক দুম
মেয়্যার মুখে পান জর্দা, মরদের মুখে কালিচুন।[১]

এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বেচ্ছাচারী, একগুয়ে নারীদের কার্যকলাপ। একটু চোখ খোলা রাখলে এরকম মেয়েদের সাক্ষাৎ পাই।

সংবাদপত্র খুঁজলে 'সহবাস' মামলার কথা প্রায়ই দেখা যায়। ঘরে বিবি থাকতেও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে কিছু মানুষ। এদের মুখোশ খুলে গেছে এই গানে—

... বাবুবাড়ির মেয়্যা গুলান কত বেশি ঢঙ
সব মেয়্যাকে টেক্কা দিতে মুখে মাখে রঙ।

সাবান ঘষে পালিশ করে সারা দ্যাহ রোজ
ইদিকে রেত্যের বেলায় বাবু গুলান করে অন্য মেয়ের খোঁজ।
উর-র-র ... ঘেচ্যাকদুম, ঘেচ্যাকদুম, ঘেচ্যাকদুম
বোদোদের দিনের বেলায় স্বপন দোষ আর রেতের বেলায় নাই কো ঘুম।[২]

ভোগবাদী মানসিকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় বোধ হারিয়ে ফেলছে মানুষ। এই মানুষ সমাজের উচ্চস্তরের। অর্থশালী।

সংবাদপত্র খুঁজলে দেখা যায় ধর্ষণের অনেক সংবাদ। ফুলবাগানের নেহারবানু থেকে ভবানীপুরের অভিজাত পল্লীর হেতাল পারেখ। ধর্ষণের দীর্ঘ ইতিহাস। মানুষ ক্রমশ মানহুঁশরে পরিবর্তে মান্‌অসুরে পরিনত হচ্ছে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, ভালবাসা, দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতিকে সে টুঁটি চেপে মেরে ফেলছে। তার একটি সুন্দর প্রতিবেদন এই গানে—

বাচ্চা থেকে জোয়ানবুড়ি আজ ধর্ষিত সবখানে
বিবেক বুদ্ধি সব হারালছে এমনি মানুষ খুনে।
উর-র-র ... ঘেচ্যাক দুম, ঘেচ্যাক দুম, ঘেচ্যাক দুম
দ্যাশে ঘুঁষটো আছে হুঁষটো নাই তাই হচ্ছে সব খুন।[৩]

দেশজুড়ে শুধু 'হাওলা', 'গাওলা', 'তহলকা' ও 'কফিন' কেলেংকারী। হুঁশজ্ঞান বলে মানুষের কিছু নেই। এই উদ্বেগ ফুটে উঠেছে উপরের গানে।

দেখতে শুনতে নিজেদের বউগুলো ভাল নয়। খুবই গরিব ঘরের। সুন্দরী নারীদের প্রতি তাদের আকর্ষণ নেই। সেই গরিব ঘরের কুৎসিত মেয়েকেই সে ভালবাসে—

বউ কেমন ভালো?
উটকো মুখী, খ্যাদা নাকী
মোষের মতো কালো,
তাই আমার ভাল॥

দুঃখে শুধুই হাপুস হাপুস করে কাঁন্না নয়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কুৎসিত দিকগুলো গানে তুলে ধরা হয়। লাঠি থেকে আজ ঢোলের ব্যবহার। একক, দু'জন থেকে দলগত এই হল হাপুগানের বিবর্তন বা রূপান্তর।

ভাদুগান

শোনা যায়, মানভূম জেলার রাজধানী কাশীপুরের রাজার কন্যা ভাদু। ভাদুর অকাল মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই নাকি এই ভাদু উৎসব ও গান। গোটা ভাদ্রমাস জুড়েই এই গান হয়। আগে ভাদুকে নিয়েই গান রচিত হতো। ঢোল, জুড়ি গানের সঙ্গে বাজতো। বর্তমানে হারমোনিয়াম, ক্যাসিও, তবলা ব্যবহৃত হচ্ছে। পোষাকেও এসেছে জৌলুষ। দূরদর্শন, সাইবার যুগের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য। হিন্দী, বাংলা থেকে আধুনিক গানের সুর প্রবেশ করেছে। ভাদু গানের বিষয়েও এসেছে বৈচিত্র। যুগের সাথে তাল মেলাতে।

ময়ূরাক্ষী অববাহিকার অনেক শ্রমজীবী মানুষ বর্ধমান-এর দিকে খাটতে যায়। একে 'দখিন যাওয়া' বলে। জীবিকার তাগিদে। সেই সময় রাঢ়ের কুলবধূ স্বামীকে পয়সা দেয় কিছু আনার জন্য। সেই চাহিদা-গাড়ি, বাড়ি, টিভি নয়, একটি মাত্র 'মাদুলী'।

ভাদুর জামাই দখিন যাবে গো

ভাদু দিলে আধুলি
আমার লেগে এনো তুমি
তকমা আঁটা মাদুলী ॥[৪]

মানভূম নয়, ভাদু এখানে ময়ূরাক্ষীর পাড়ে কোনও এক কৃষকের গ্রাম্যবধূমাত্র।

ভাদু আমার শিক্ষিত বেকার গো
চাকরির দ্বার পায়নি খোলা,
দু'চার পয়সা দাও ভাদুকে
কিনবে ভাদু ভাজা ছোলা ॥[৫]

হাজার হাজার বেকারের মধ্যে ভাদুও বেকার। সে পয়সা-পেয়ে ভাজা ছোলা কিনে খাবে। অন্য কিছু নয়। তার চাহিদা অতি সামান্য। লোকসমাজের চাহিদা সামান্যই। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে ভিডিও হল। ঘরে দূরদর্শন। আর তারই ফলস্বরূপ ভাদুকে তুলনা করা হচ্ছে জনপ্রিয় নায়িকাদের সঙ্গে।

ভাদু আমার হেমামালিনী বাংলা বইয়ের মাধুরী
'ববি' বইয়ের হয় যে 'ববি' রূপের তাই নাইকো জুড়ি।[৬]

ঈশ্বর পাটনী দেবী অন্নপূর্ণার কাছে একটাই বর চেয়েছিল। সেটি হল— 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। লোকসমাজের অতি সাধারণ চাহিদা। ভাদুগানেও তারই চিত্র ঃ—

ভাদু খেতে ভালবাসে গো কচিশসা আর গরম মুড়ি
পালাপার্বণে লুচি পুড়ি গো, বাদলা দিনে খিচুড়ি ॥[৭]

ময়ূরাক্ষী অববাহিকায় প্রচুর 'শশা' হয়। 'গরম মুড়ি' চাষির প্রিয় খাবার। রাজনন্দিনী ভাদুকে এখানে গ্রাম্য কৃষকের, শ্রমিকের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায়, নেমে আসা এক গ্রাম্য রমণী বলেই মনে হয়। যার চাহিদা অতি সামান্য।

সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন উঠে আসে ভাদুগানে। গ্রামে গ্রামে জোতদার, জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ফেটে পড়ে লোকসমাজের। নিম্নোক্তগানে তারই প্রতিধ্বনি ঃ—

মোদের ভাদু বলেছে যে আজার (রাজার) ঘরে যাবে নাই
লস্‌কালী (নকশাল) ঢেউ উঠেছে যে, আজারা আর বাঁচবে নাই ॥[৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাদু গান আর শুধু ভাদুর জন্ম, বিয়ে, মৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। নতুন বিষয়, আন্দোলনের কথা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছে এই গানে।

আলকাপ

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম লোকনাট্য আলকাপ। গম্ভীরার মতো আলকাপ তেমন সাড়া জাগাতে না পারলেও সময়ের দাবির সাথে তারও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জেলার মধ্যে কয়েকজন এই আলকাপকে ধরে রেখেছে। তাছাড়া বেশিরভাগই যা পরিবেশিত করে তা 'পঞ্চরস' নামেই পরিচিত ও সমধিক প্রচলন।

আলকাপ প্রসঙ্গে ওস্তাদ ঝাঁকসু বলেছেন ঃ 'আলকাপ হলো রগড়, হাসি, তামাসা, মেয়ে ছেলেদের কেচ্ছা। গম্ভীরা হচ্ছে রাষ্ট্র নিয়ে, আলকাপ হচ্ছে পরিবার নিয়ে।' যেমন 'বোকা ছেলের বিয়ে'— পালায় হাসি, তামাসা, পরিবারকে কেন্দ্র করেই। মানুষ দেখে, হাসে। পূর্বে আলকাপ যতদূর সম্ভব লেখা হতো না। খোলা জায়গায় গোল হয়ে বসতো আসর। একটি বৃত্তাকার পথে একটা চরিত্র গ্রামের খোঁজে বের হতো। একসময় একজনকে জিজ্ঞেস করতো সে কোথায় এসেছে। তারসঙ্গে কথপোকথনে গ্রামের নাম উঠে আসতো, গল্প জমতো। এভাবেই

তাৎক্ষণিক ভাবে গল্প তৈরি করে আসর চলতো। আগে, জমিতেই আসর বসতো। বাদ্যযন্ত্রও ছিল সামান্য। বর্তমানে আলকাপ বিবর্তিত হয়ে পঞ্চরসে রূপ নিয়েছে। পঞ্চরসে যে পালা করা হয় সেই পালা সংগ্রহ করা হয় কোনও লেখকের লেখা থেকে নতুবা বাজারী ফিল্ম হতে। যাত্রার মতোই লাইট, মাইক ব্যবহৃত হয়। বড় মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। জমি থেকে মঞ্চে উত্তরণ। দূরদর্শনের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। তাই পোষাক, ঝলমলে, কণ্ঠে ফিল্মী গানের সুর। দর্শককে আকর্ষণ করতেই এসব পরিবর্তন। পূর্বে বন্দনায় দেবদেবী, তানসেন, পীর পয়গম্বর আসতো। এখন বন্দনাতে উঠে আসে দেশমাতা থেকে কার্গিল যুদ্ধ (ছোট সোলেমানের দল, খড়গ্রাম)। পাঁচালিতে উঠে আসে বন্যা— যে বন্যায় মানুষ সর্বশান্ত হয়। (বিশেষ করে কান্দি মহকুমা)। উঠে আসে ভাঙনের কথাও। আলকাপ/পাঁচালি মুসলিম প্রধান গ্রামেই বেশি হতো। এখন পঞ্চরস-হিন্দু-গ্রামেও অনুষ্ঠিত হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এসেছে ফুলুট, কর্ণাট, ক্যাসিও ইত্যাদি।

আলকাপে লোকজীবনের কথা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আমাদের সমাজে পণপ্রথা চালু আছে। বরপণ হিসেবে মোটা অর্থ দাবি করা হয়। কিন্তু কন্যাপণের কথা কি আমরা জানি? এখানে দেখা যাচ্ছে টাকার জোরে অযোগ্য পাত্রও যোগ্য হয়ে ওঠে। আর পিতা মোটা অর্থ পেয়ে মেয়েকে সঁপে দিতো অযোগ্যের হাতে।

ছোড়া দিলে বারো টাকা বুড়া দিলে ষোল
বুড়ার সাথে বিহা দিতে বাবা রাজী হয়্যা গেল।
বাপ মায়ের চোখ ছিল না টোনা-পড়শী কানা
এ যুবতীর মরণ হলো না![৯]

যুবতী হৃদয়ের হাহাকার, ক্ষোভ-প্রতিফলিত হয়েছে সুন্দরভাবে। এ কাহিনী লোকসমাজেরই।

মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধেও আলকাপে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। পল্লীবধূকে অর্থ ধার দিয়ে ফেরত চায় না। মহাজনের এই অভিসন্ধি পল্লীবধূ ধরে ফেলে। প্রতিবাদে গর্জে ওঠে।

তোর টাকা লিবে কেটা
তোর মুখে মারি ঝাঁটা
ও তোর ধনদৌলত সব উঠুক
আগুন ল্যাগ্যা পুড়ুক॥[১০]

একটা সময় ছিল। আজো ক্ষীণ হলেও এই মহাজনী কারবার আছে গ্রামগঞ্জে। আলকাপে ছেলেরাই মেয়ে সাজে। পঞ্চরসে মেয়েরাই (কবিতা, নূরজাহান) অভিনয় করে। কখনো কখনো সমাজচিত্র ফুটে উঠলেও মূলত আলকাপ আঙ্গিকগতভাবে একই আছে। এর দুটি ভাগ — (১) বন্দনা ও (২) কাপ।

পঞ্চরসে অনেকগুলি বিভাগ। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পালাও অভিনীত হয়। বর্তমানে যা হয় তা একপ্রকার গীতিনাট্য। পঞ্চরসের গানে উঠে আসে কালুখালি (২০০০-এর বন্যা)-র প্রসঙ্গও। সময়ের সাথে সাথে আলকাপ নিজেকে পরিবর্তন না করলে একদিন হারিয়ে যাবে। আবার পঞ্চরস-এর নামে যা চলছে তার গায়ে বেশির ভাগই নিকৃষ্ট নগর সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট।

বোলান গান

আলকাপের পরেই মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম লোকনাট্য বোলান গান। চৈত্রমাসের শিব-গাজনে এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ধর্মরাজ' পূজায় এই গান শোনা যায়। নওদা, কালান্তর এলাকা এবং প্রায় সমগ্র কান্দি মহকুমায় এই গান জনপ্রিয়। আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের সাথে

সাথে সব চেয়ে বেশি পরিবর্তন চোখে পড়ে বোলান গানে। বোলানগানে তিনটি ভাগ— (১) বন্দনা, (২) বই-পাঁচালি ও (৩) পাঁচালি। যতদূর মনে হয় পূর্বে বোলান গান শিব ও ধর্ম দেবতাকে কেন্দ্র করেই হতো। ২২ বছর পূর্বেও শোনা যেত খড়গ্রামের কীর্তিপুর গ্রামে— 'ধর্মের পুত্র মোরা ধর্মের নন্দন'— ধর্ম বোলান। পরে পৌরাণিক বিষয়কে আত্তীকরণ করে। আসে নতুনত্ব। যেমন— দাতাকর্ণ, হরিশচন্দ্র শৈব্যা, সতীসাবিত্রী ইত্যাদি। এগুলি অনেকদিন লোকসমাজকে আনন্দ দিয়েছে, লোকশিক্ষা দিয়ে এসেছে। কিন্তু বিগত ২০/২৫ বছর শুধু পৌরাণিকই নয়, বর্তমান বিষয়কেও সে অঙ্গীভূত করেছে।

বছর বছর ভোট হয়। মন্ত্রী পাল্টায়। কিন্তু জনতার দুঃখ দারিদ্রের নিরসন হয়না।

'আমরা হলাম ভোটের নাগর, জুতুর শুকতলা।'[১১]

ভোট এলে টাকা ওড়ে। জামা-কাপড়, মদ, তাড়ি বিলি হয় বিভিন্ন গ্রামে। উদ্দেশ্য-ভোটে জেতা। এখানে ভোট ও পণ্য হয়ে দাঁড়ায়। বাজার অর্থনীতিতে সবকিছুই পণ্য হয়ে উঠে। লোকসমাজ এ প্রসঙ্গে আলোড়িত—

'প্রধান হয়েছে আমার গিন্নি
আমার বৌকে যে ভোট দেবে, গম দেব এমনি।'

এভাবে ধান, মাইলো, ত্রিপল, মুরগি সবই পরপর আসে।

এখন গ্রাম বিচ্ছিন্ন নয় বরং দেশীয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা লোকসমাজে তরঙ্গ তোলে। উঠে আসে বিভিন্ন বিষয়। তৃণমূলস্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এর কথা বললেও কার্যত বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। উল্টে পঞ্চায়েতে শিকড় গেড়েছে দুর্নীতি বিভিন্ন ক্ষমতাসীন পার্টিকে কেন্দ্র করে। তারই একটি সুন্দর চিত্র এই গানে পাই।

মা ঃ আমার বিটির ভাগ্য ভাল তাইতো পর পর দুবার বন্যা এলো
জামাই ঃ লোকের সর্বনাশে তোদের পৌষমাস এলো
বিটি ঃ বিডিও দিয়েছে চিঠিগো, এবার আসছে শিল্প-অনুদান।

বন্যা এলেই অর্থ আসে পঞ্চায়েতে। শুরু হয় লুঠের পালা।

এই আর্থ-সামাজিক শোষণ ভিত্তিক ব্যবস্থায় শ্বশুড়, শ্বাশুড়ি, বৌমার মধ্যে সম্পর্কও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে।

'ঘোর কলিতে বৌগুলা সব সেজেছে আজ ব্যারিস্টার
শাশুড়ি মাগি পাট-কুড়ানি শ্বশুড় ব্যাটা চৌকিদার।'

কিম্বা

'দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে আসুন একবার সংসারে
শাশুড়ি আর বৌমার ঝগড়া হয় প্রতি ঘরে ঘরে।
শ্বাশুড়ি করে ঝি-গিরি বৌমা ঘড়ি খোলে না।।

সমাজে বধূ নির্যাতন বহু আলোচিত। কিন্তু শ্বশুর, শাশুড়ির প্রতি বর্তমান যুগের শিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিতা বৌমাদের অত্যাচার, তাদের অসহিষ্ণুতা উপরের গানে স্পষ্ট। ইহা প্রচলিত চিত্রের বিপরীত। মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। ভোগবাদী মানসিকতা লোকসমাজে ঢুকে পড়ছে। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতার ছবিও তাই এই গানে ফুটে উঠতে দেখি।

হাইটেকের যুগে জাতীয় ঘটনা, রাজনীতি থেকে গ্রাম বিচ্ছিন্ন নয়।

'মহাজোট হয়েছে এবার দেশে আর অভাব রবে না

মিটবে বহু দিনের আশা, পেলে বাংলার গদিখানা,
জ্যোতি বলে বুদ্ধবাবু এবার বোধ হয় হলে কাবু
ভোটে হেরে হাবুডুবু, খেতে হবে বার্লি সাবু॥

এই গানে পশ্চিমবাংলার নব্বই দশকের মাঝামাঝি ভোটে প্রতিপক্ষ হিসেবে মমতার উত্থানে জ্যোতিবাবুরা যে আতঙ্কিত ছিল তা স্পষ্ট।

ম্যাকিন্‌সে প্রস্তাব কার্যকরী করতে উদ্‌গ্রীব শাসকরা। কেন্দ্রের সরকার 'গ্যাট' অধুনা 'ডব্লু টি ও' চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। ফলস্বরূপ সার, বীজ, কীটনাশকের দাম ক্রমবর্ধমান। চাষির মাথায় হাত। গানে তারই প্রতিফলন —

ফসলের দাম নাই বাজারে, মরছে চাষি অনাহারে
চড়া দামে কিনছে ডিজেল, বেশি পয়সা লাগছে সারে॥

বর্তমানে এ এক গভীর সংকট। ন্যায্য ফসলের দাম নাই। খরচ বেড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রমশই দুর্লভ হয়ে পড়ছে। লোকসমাজ এই সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। আমাদের দেশের জিনিস চলে যাচ্ছে বিদেশে। বিদেশ থেকে আমদানী হচ্ছে, মাছ, শংকর ধানের বীজ। ফলন বেশি হলেও এতে সমস্যাও অনেক। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের মেধাজাত ফসলের বীজ তুলে নিচ্ছে বাজার থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। এটি ভাল নয়। এরকম একটি বোলান গান —

'রুই কাতলা ভুলে গিয়ে, আমরা এবার ব্রিকেট খাবো
দেশী মুরগী চলবে না আর ব্রয়লার খেয়ে পেট ভরাবো॥'

এটা বিশ্বায়নের যুগ। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের খবর পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামান্তরে। লোক সমাজের চিন্তার মানও ক্রমশ বাড়ছে। তাদের গানে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গও উঠে আসছে।

'জর্জ ডব্লিউ বুশ হারায়ে হুঁশ পাঠায় সৈন্য ইরাকেতে
লাখো লাখো ফেলছে বোমা মরছে মানুষ দিনরাতে॥'

সেহালাই-এর দলের বোলানপালা 'দেশের হাওয়া'তে তারই সাক্ষর। লোক সমাজ এখন ক্ষুদ্র, আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। গোটা বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে সে যুক্ত। অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ রাজনীতি। ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে দলগুলি যখন ভারতজুড়ে দাঙ্গা লাগায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করে— লোকসমাজ তখন চুপ করে থাকে না। তার বক্তব্য তারা স্পষ্ট জানায় ঃ

'যে আল্লা আর সেই ভগবান আলাদা নয় পুরাণ কুরাণ
অকারণে ঝগড়া করে মানুষ বুঝতে পারে না॥'

বোলান গানে 'বন্দনা' হয় প্রথমে। বন্দনাতে এসেছে পরিবর্তন। পূর্বে মনসা, গনেশ, সরস্বতী একক কিম্বা একাধিক দেবদেবীর কথা আসতো। এখন একজন দেব কিম্বা দেবীর কথা আসে। আগে বন্দনাতে ছিল গদ্‌গদ্ ভক্তি। এখন দেবতাকেও আক্রমণ করা হচ্ছে। যেমন—

'প্রথমে বন্দনা করি গৌরীসুত গজাসনে
তাঁর ইঁদুরে বস্তা কাটে তেমন ইঁদুর পোষে কেনে?
শ্বেত-বরণী হাঁস পুষেছে ছুতো পাতনায় ধান থাকে না
খেছে কত এত অতো তবু হাঁসে ডিম পাড়ে না॥

বন্যায় শুধু মানুষ নয়। দেবতারাও বিপদাপন্ন। যেন-দেবতারা তাদের প্রতিবেশী।

'গণপতি ভেবে মরে আমি যুদ্ধে যাবো কিসে চড়ে
ইঁদুর আমার গেল মারা বানে বাড়ি চাপা পড়ে।'

দুর্গা আর দেবী নয়। যেন 'লালগোলা প্যাসেঞ্জারের' যাত্রী। তার আসার জন্য মমতাকে রেললাইন সারানোর কথাও বলা হচ্ছে। মমতা তখন রেলমন্ত্রী।

'দুর্গা যাবে বাপের বাড়ি, বানে বন্ধ হলো গাড়ি
ও মমতা লাইন সারা করিস না আর বেশি দেরী।'

আগে ছিল 'ডাক বোলান' বা 'দাঁড় বোলান'। সকলে উঠে ঘুরে ঘুরে গান গাইত। বাদকের ঘাড়ে ঝোলান থাকতো কাঠ ঢোল। বর্তমানে 'পালা বন্দী বোলান' হয়। যা যাত্রা/নাটকের মতোই। কোনও কোনও দলে যাত্রার মতো কনসার্ট বাজে। বাদ্যযন্ত্রেও আধুনিকতার ছাপ। দূরদর্শনের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আবার কোনও কোনও দলে তবলা, হাত ঢোল দিয়েই আসর শুরু করে কিন্তু গান কম, একেবারে গ্রামীণ যাত্রার মতোই।

'সাঁওতালে বোলানে' সকলে সাঁওতালদের মতো সাজে, লাফায়, ঝাঁপায়, সমবেত চীৎকার করে সুর ধরে। তবে এর প্রচলন কম। 'পালা বোলান' বেশি হয় নওদা, কালান্তর এলাকায়। আবার রাঢ়ে ক্রমশ যাত্রাপ্যাটার্ন এই বোলান চালু হচ্ছে, তবে এখন ১ ঘণ্টার মতো বই, গীতিবহুল 'দাঁড় বোলান'-এর প্রচলনও আছে বেশ।

পূর্বের তুলনায় এখন পোষাক ঝলমলে। ভাড়া পাওয়া যায়। কোনও কোনও দলের সেটও আছে। সুর হিন্দী থেকে বাংলা বই ও আধুনিক গান থেকে সংগৃহীত গচ্ছে। লরীতে মাইক বেঁধে, এমনকি টাটাসুমো গাড়ি চড়েও বোলান গাইতে আসে বর্তমানে। আগে বোলান গান চৈত্র সংক্রান্তিতে হলেও বর্তমানে বিভিন্ন সময়ে হয় বা হচ্ছে। হচ্ছে বোলান প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে। ১ম, ২য়, ৩য় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করাও হচ্ছে। যেখানে প্রতিযোগিতা হয়, কিম্বা আসর বসে সেখানে জ্বলে জেনারেটরের আলো। গ্রামীণ জনতার অংশগ্রহণও ভালো। পূর্বে ছেলেরা মেয়ে সাজতো বর্তমানে মেয়েরাও অভিনয় করে। শুধু মেয়েদেরও বোলান দল আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বোলান গানে ভাঙাগড়া সব থেকে বেশি চলছে। শুধু দেবদেবী কিম্বা পৌরাণিক বিষয়েই বোলান গান সীমাবদ্ধ থাকছে না। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সে নিজেকে বারবার পরিবর্তিত করছে। উঠে আসছে বন্যার কথা, সম্প্রীতির কথা, চাষের সংকটের কথা— একথায় নিজেদের কথা। ভিডিও হল, দূরদর্শনের সাথে টিকিয়ে রাখতে পোষাক, সুর ও বিষয় নির্বাচনেও পরিবর্তন আসছে বোলানে। এখানেই বোলান গানের বিশিষ্টতা।

বন্যার পাঁচালি

আমাদের জেলায় গঙ্গা পদ্মার ভাঙনের পাশাপাশি বন্যা, খরার মতো দুর্যোগ এক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাগড়ী এলাকায় ভাঙনের ফলে জেলার মানচিত্র বদলে বদলে যায়। বদলে যায় মানুষের জীবন-জীবিকাও। তেমনি জেলার 'শস্যভাণ্ডার' কান্দি মহকুমা বারবার বন্যায় আক্রান্ত হয়। জমিতে বালি পড়ে। ধানগুলো জলে ভেসে যায়। পড়ে থাকে শূন্য গোলা! ফসলের পাশাপাশি পশু মারা যায়। মারা যায় শত শত মানুষ। গ্রামগুলির আদল বারবার বদলে যায়। জেলায় গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে ৫১,৩১,৩৩৯ জন মানুষ (জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ ভাগেরও বেশি)। কৃষক ১৮.৪৮ শতাংশ; কৃষিশ্রমিক ২৭.৯৯ শতাংশ এবং কুটির শিল্পী ২০.৪৩ শতাংশ। গত ২০০০ সালের বন্যায় জেলায় মারা গেছেন ৬১৭ জন মানুষ। গ্রামে গ্রামে দূরদর্শন ঢুকেছে। রাস্তার উন্নয়নও কিছুটা হয়েছে। দু'বার ফসল ফলায়, চাষিদের একটা অংশের হাতে পয়সা

এসেছে। কিন্তু বারবার বন্যায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্তও কম হয়নি। এর কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থাও নেয়নি সরকার। বন্যা আসে, মানুষ মরে, ত্রাণের টাকা, মৃতদের পরিবার কিছু টাকাকে কেন্দ্র করে শুধুই দুর্নীতি বাড়ে। গ্রামের মানুষ গানে তাদের ক্ষোভ, দুঃখ সবই তুলে ধরে। বছর বছর বন্যাকে নিয়ে যা গান বাঁধা হয়েছে রাঢ়ে তা এক সত্যিই ইতিহাস। এই পাঁচালি গান দীর্ঘ। বোলান ও আলকাপে এই গান গাওয়া হয়।

সারণী -১ মুর্শিদাবাদ জেলার

জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা —	৫,২২,৬০০ হেক্টর
কৃষিক্ষেত্র —	৪,৫০,৬০০ হেক্টর
প্রাণহীন—	৬১৭ (নিখোঁজ ৪৮) (পশ্চিমবঙ্গে ১৩২০ জনের মধ্যে)
ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি —	৪,৯০,৩১৩ হেক্টর

সূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গে বন্যা/ ২০০০।

বন্যায় মানুষ যখন অসহায় তখন কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বেশি অর্থ উপার্জন করে নেয়— যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

'নৌকাবালা ছিল যারা, মজালুটে নিল তারা
ডবল ভাড়া চুক্তি করে ছাড়ল এবার নৌকা খান।'

বন্যায় ত্রাণ আসে। আসে দুর্নীতিও। তারই এক জীবন্তচিত্র—

'মিনিকেট নামেতে ধান বীজ আর গম/ বীজ যোগান দিচ্ছে লাগে না তার দাম / বড়লোকে বেশি, গরিবে পায় কম, মধ্যবিত্ত যারা কিছু পেল না।'

১৩৬৩ সালের একটি বানের গান। রচনা করেছেন হিজলের লোক কবি।

'হলো সোনার বাংলা ফানাফিল্লা তেষট্টি সালে ...
জীবের প্রাণ বাঁচে না ম্যাসানজোড়ের বাঁধা জলে।'

এখানে বড় বাঁধগুলোর ব্যর্থতা স্পষ্ট। তাই ক্ষোভও সংগত।

জামালউদ্দিনের লেখা একটি গান ঃ—

'বালি পড়ে পর্বত হলো কেও হয়েছে লাসা
নদীর বানে ধুয়ে গেল পক্ক আইআর পুষা,
পাঁচধুপির পালেদের জমি বালি পড়ে মরুভূমি
হয়েছে দেখি নয়নে।
ঘটিলকি ঘটনা ১৩৮৪ সালে,
টাটকা টাটকা ধানের গোছা সব খেয়েছে মৌরাক্ষীর বানে।'

এখানে চাষিদের দুঃখের কথাই, যন্ত্রণার কথাই ফুটে উঠেছে।

খরার কথাও পাঁচালিতে এসেছে। যেমন

'সন তেরশ বাইশ ফাল্গুন মাসে/ পুষ্করিণীর জল কিনতে হলো কপালের দোষে। কি দরে জল বেচাকেনা বল তাই শুনি/ হিত করিতে হয় বিপরীত গালে চুনকালী।'

বন্যা, খরা, নিয়ে এত কষ্টে থাকে মহকুমার মানুষ যে কহতব্য নয়। নেতারা আসে, ভোটের কথা বলে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। শহরে পাড়ি জমায় গ্রামের মানুষ,। রাঢ়ের এলাকার কিছু গ্রামের মানুষ 'দখিন' যায়। জীবিকার খোঁজে। ছোট চাষি জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। অনেকে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এসবই সত্যি। নদী বাঁধগুলো জেলার

মানুষের উপর অভিশাপ বয়ে এনেছে। লোককবিরা তাদের গানে দুঃখ, যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। এই দীর্ঘ পাঁচালিগুলি লোকসাংবাদিকতারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাই বলা যায়, পূর্বের নারী, পুরুষ কিম্বা হাল্কা বিষয় এবং ধর্ম, শাস্ত্রকে নিয়ে লেখা পাঁচালির পরিবর্তে পাঁচালি গানে উঠে আসে আজকের সমাজের বাস্তবতা, জীবন্ত সমস্যা। মুখোশ খুলে দেয় বেশিরভাগ ভোটপন্থী দলগুলির।

উপরের আলোচনাগুলি ছাড়াও এই জেলায় শোনা যায় 'গীদগান', 'শব্দগান', 'একদিল পীরের গান', হিন্দু বিবাহগীতি, গাজন গান, সঙের গান, পটের গান, মনসা মঙ্গলের গান / ঝাঁপান গান, ভাঁজুই গান প্রভৃতি। মুর্শিদাবাদে কবিগান, কীর্তন এর একটা ঐতিহ্য আছে। রাঘব সরকার, গুমানী দেওয়ান (জিনদিঘি), যুগবারীর মতো কবিয়াল এই জেলায় জন্ম নিলেও বর্তমানে কৌলিন্য হারিয়েছে। উপস্থিত বুদ্ধি, সুললিত কণ্ঠ, বিষয়ের বৈচিত্র সব কিছুরই অনেক ঘাটতি। কীর্তন গানেও ভাঁটার টান।

শব্দগান, একদিল পীরের গানও এক অর্থে ধর্মীয়। বাদ্যযন্ত্রে বিপ্লব এলেও বিষয় অত্যন্ত পুরনো, সুর একঘেয়ে হওয়ায় কুড়ি বছর আগে গান শোনা গেলেও বর্তমানে প্রচলন খুবই কমে গেছে। কারো ইচ্ছে হলে, 'মানত' করলে 'একদিলপীরের গান' করায়।

গাজনের গানের একটি নির্দিষ্ট সুর আছে। চৈত্রমাসের শেষ দিকেই এই গান শোনা যায় ভক্তদের মুখে। সুর পুরনো, বিষয়— শিবকেন্দ্রিক। ফলে আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের গানও তাই। মনসাপূজায় মায়ের থানে গান হয়। বিষয়ে নতুনত্ব নেই। সুরও পুরনো। শুধু নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র ঢুকেছে। তবে ঝাঁপান গানে (বেদেরা গায়) কবি ও কীর্তনের সুরের ছাপ পড়ে।

জেলায় 'পট' শিল্পের প্রচলন ছিল। দু'ধরণের পট দেখা যেত। কান্দি ঘরানা এবং গণকর ঘরানা। গণকরের পট উন্নত। বর্তমানে মৃত। পট খেলাও উঠে গিয়েছে প্রায়। হরিশ্চন্দ্র, নিমাই সন্ন্যাস, সাবিত্রী সত্যবান, যমপট এই বিষয় সীমাবদ্ধ। তাছাড়া দূরদর্শন, ভিডিও হল, সিনেমার দাপটের যুগে আজকাল কেউ পট শোনে না। সুর একইরকম। এছাড়াও পটুয়ারা সিডিউলড ট্রাইব স্বীকৃতি পাওয়ায় বর্তমানে কেউ কেউ চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। নতুন প্রজন্ম তাই 'পট' পেশাকে ভিক্ষাবৃত্তি হিসেবে মনে করে। মেদিনীপুর ও অন্যত্র নানা বিষয় পটে এসেছে কিন্তু জেলার পটুয়ারা পড়ে আছে সেই তিমিরেই। যারা গরিব, আর্থিকভাবে দূর্বল তাদের বেশিরভাগ প্যাণ্ডেল তৈরি, গো-চিকিৎসা, বেদিয়াবৃত্তি (সাপ ধরা)কে অবলম্বন করেছে। সাপ খেলালে লোকে বলে 'ওস্তাদ', সম্মান ও ভক্তি বেশি।

স্বাধীনতার পরেই কিম্বা সত্তর দশকে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এই জেলায় এসেছিলেন তারা সঙ্গে এনেছিলেন বিবাহগীতি, সূর্যপূজার গান। দীর্ঘদিন অর্থাৎ আশির দশক পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন তাদের সংস্কৃতি। বর্তমানে তাদের সন্তান সন্ততি শিক্ষিত হওয়ায়, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া কম্পিউটারের যুগে ওই গান বড়ই বেমানান বলে মনে করেন।

উঠে যাচ্ছে 'ভাঁজুই গান'। ইঁদুরের তোলা মাটি দিয়ে মালসায় (পাত্র) ধান, সরষে প্রভৃতি দিয়ে চারা গাছ তৈরি করে ঢাক বাদ্যের সাথে গান গাইতে গাইতে নদী বা পুকুরে বিসর্জন দেওয়ার— পূর্বে রাঢ় এলাকায় ব্যাপক প্রচলন ছিল। শিক্ষার প্রসার, নাগরিক সংস্কৃতির ধাক্কায় কৃষকের এই উৎসব আজ মৃত। সময়ও কমে যাচ্ছে মানুষের।

পূর্বে বৃষ্টির জন্য কৃষকেরা ব্যাঙের বিয়ে দিতো। ঢেঁকি পুকুরের জলে খাড়া করে পুঁতে, এক

হাঁড়ি গরমভাত ঢেকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখত। এতে নাকি বৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রসারের ফলে এই কু-সংস্কার ক্রমশ উঠে যাচ্ছে।

উপসংহার ঃ শিক্ষার প্রসার, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রবল দাপটে জেলার লোক সংস্কৃতির জগতে চলছে ভাঙাগড়া খেলা। ধর্মীয়, পৌরাণিক বিষয়েই শুধু আজ আটকে নেই। নতুন নতুন সুর, দেশীয় ও বিদেশীয় ঘটনা, সমস্যা লোক সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে গ্রামে একটু গতি এসেছে। গ্রামগুলি আজ অচল, অনড়, স্থবির নয়। তবে পরিবেশ সমস্যা, দূর্নীতি, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের মুখোশধারী রূপ এসব নিয়ে এখনো সে রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। গ্রাম্য নোংরা রাজনীতি, নানা প্রতিকূলতাও বিদ্যমান। জীবন জীবিকার সংকটের ছায়া এলেও তা অনেক কম। ঈশ্বর নির্ভরতা এখনো প্রবল। শাসক শ্রেণীরা নিজেদের কাজে লোকশিল্পীদের কাজে লাগাচ্ছে, প্রলোভন দিচ্ছে— এতেও অনেক সময় সত্যকথা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

যাইহোক, সত্যি হল জেলার লোকসংস্কৃতির জগতে একটা পরিবর্তন চলছে। এই পরিবর্তন গতিশীল হলেও খুবই মন্থর। আগামী দিনে এই পরিবর্তনে গতি আসতে বাধ্য। আর এই পরিবর্তন এর ফলে অনেক কিছু সংযোজন এর পাশাপাশি বিয়োজনও হবে। এই চরম সত্যকে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না।

তথ্যসূত্র

১, ২, ৩ ঃ গানগুলি অনিল চক্রবর্তীর কাছ থেকে প্রাপ্ত।

৪,৫,৬,৭ ঃ পুলকেন্দু সিংহ (ফিরে চল মাটির গানে)।

৮ নং গান দিলীপ বাগচী (বাসভূমি ২০০৩ সংখ্যা)

বাগড়ী কৃষি উৎপাদন /শক্তিনাথ ঝা / মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ / শ্রেণী বিন্যাসের রূপান্তর ও সমস্যা

ঝড় — বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদ।

কৃতজ্ঞতা ঃ সুমত চট্টোপাধ্যায় (প্রাবন্ধিক/ এ্যাডভোকেট)

বাংলা লোকসাহিত্যে ঘুমপাড়ানি গান, ছেলেভুলানো ছড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় তার রূপ বৈশিষ্ট

মবিনুল হক

১

ক) একটি কবিতা

মিলেনিয়াম শিশু কথা

জন্মেছি এই সহস্রাব্দে, তাই
'মিলেনিয়াম' রাখা হয়েছে নাম আমার
আমার শিশুখাদ্য 'ল্যাক্টোজেন' আর 'মিল্ককেয়ার'
আদরযত্নের ব্যাপারই হাইফাই

সকাল আটটায় বাবার টা-টা
ন'টা বাজলে মায়ের ফ্লাইং কিস
আমার দু-চোখে ওসব লঙ্কাবাটা
দিয়ে ওঁরা যান, কাজে বেরিয়ে যান
তারপর তো ঘরদোর শুনশান
শুনি চারদেয়ালের কানাকানি ফিসফিস

সারাদিন খাওয়া, সারাদিন ঘুম, সারাদিন দেখি কাজ
কাজের ছেলেরা কাজের মেয়েরা এঘর-ওঘর ফেরে
যেন কেউবা হলেন শাজাহান, তো কেউবা মমতাজ

যা হোক তবু একটু-আধটু যত্ন-আত্তি ওরাই করে
ওই ঝি-চাকর আর যন্ত্রটন্ত্র, খেলনাপাতি

রাত্রে কেবল ঝাপসা আলোর ঘুমের বাতি
বাবাকে চেনায়,মাকেও দেখি দূর অচেনা তারার 'পরে!

খ) আমি, তুমি এবং আমাদের পুতুপুতু

উদ্ধৃত কবিতাটি একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া। কবি ও লিট্‌ল ম্যাগের উল্লেখ বাহুল্য। আমাদের ভাবাচ্ছে কবিতাটির অন্তর্ধৃত এই প্রজন্মের শিশুদের মর্মান্তিক শৈশবচিত্র। কিন্তু আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আমাদের শৈশবচিত্র ছিল অন্যরকম। আমাদের ছেলেবেলার গ্রামে ভূত পেত্নি দত্যি দানো আমরা প্রচুর দেখেছি। পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে কতো যে রাজপুত্র রাজকন্যাদের আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি, তার ইয়ত্তা নেই। আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমিরা তো থাকতো বাড়ির আনাচে-কানাচে, আমজামের শাখা-প্রশাখায়। অবশ্য এসব কিছুই দেখতাম মানসচক্ষে (এই 'মানসচক্ষু'টা এখনকার শিশুরা আর পায় না)! ওরা সব দিনমান ঘুমিয়ে থাকতো ঠাকুমা-দিদিমা নানি-দাদিদের গল্পের ঝুলিতে। সন্ধে হলেই বেরিয়ে পড়ত ঝুলি থেকে। কী না থাকতো সেই ঝুলিতে! ঘুম পাড়ানি গান, ছেলে-ভুলানো ছড়া থেকে শুরু করে রাজপুত্র রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্কস, ভূতপেত্নি, গোপাল ভাঁড়, ধাঁধা হেঁয়ালি— এরকম কতো কিছু!

সেসব দিন আর নেই। গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে, বিশেষতঃ গত বিশ বছরে সারা বিশ্বে যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভাঙচুর হয়েছে; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে— গ্রাম বাংলাও তার ছোঁয়া থেকে রেহাই পায়নি। কৃষিকেন্দ্রিক সুজলা সুফলা যে গ্রামবাংলায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বা বাইরের অত্যাধুনিক সভ্যতার নতুন আলো সহজে প্রবেশাধিকার পেত না, যে গ্রাম বাংলা ছিল সাধারণ নিরক্ষর চাষাভুষো মানুষের আজন্মলালিত প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধের আকরভূমি, যে গ্রাম বাংলার প্রাণস্পন্দন ছিল লোকায়ত সংস্কৃতি— সেখানেও আজ অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, রিমোট কন্ট্রোল হাতে পৌঁছে গেছে বিশ্বায়নের সেলফোন, স্যাটেলাইট ফোন! রিমোটের দাপটে ঠাকুমা-দিদিমা নানি-দাদিদের ঝুলি অকেজো হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। আসলে তো হারিয়ে গেছে নানি-দাদি ঠাকুমা-দিদিমারা। হা হতোস্মি ছাড়া করার কিছু কি আছে?

সত্তরের দশককে কেউ কেউ (পণ্ডিত) চিহ্নিত করেন মুক্তির দশক হিসেবে। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন অধীনতা, কোন বন্ধন থেকে মুক্তি? নাকি শুধুই মোহমুক্তির দশক সেটি? প্রকৃতপক্ষে সেই সত্তরের দশকেই রাজনৈতিক ভাঙচুরের সঙ্গে সঙ্গে গভীর গোপনে চলছিল আর্থ-সামাজিক ভাঙচুরও। সে সময়ের গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার যে বয়ান আমরা শুনে থাকি তা রাজনৈতিক দিক থেকে ফলপ্রসূ না হলেও সামাজিক দিক থেকে কিয়দংশে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। গ্রামবাংলার শান্তির নীড় একান্নবর্তী পরিবার ভাঙার কফিনে পেরেক পোঁতার কাজটি সম্পন্ন হয়। একান্নবর্তী পরিবারের মা-মাসি ঠাকুমা-দিদিমা নানি-দাদিরাও ভাঙতে লাগলেন। ভাগ হতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ভাগের মা গঙ্গা পেলেন না। হারিয়ে গেলেন। হারিয়ে গেল শিশুদের ঘুমপাড়ানি গান, ছেলে ভুলানো ছড়া, রূপকথার ভূতপ্রেত দত্যিদানো রাজপুত্র রাজকন্যা রাক্ষস খোক্কস ইত্যাদি। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার ভাগ হতে হতে (আজ মিথ হয়ে গেছে, আর এসব নস্টালজিক

কথাবার্তা লিখতেও ভয় হয়, পাছে বুর্জোয়া সেন্টিমেন্টের প্রথাগত খোঁচা খেতে হয়!) আমরা পৌঁছেছি আনবিক পরিবারে। সেখানে, শুধু আমি, তুমি আর আমাদের পুতুপুতু। আর কেউ নেই, কিছু নেই। ... সূচনায় উদ্ধৃত কবিতাটি আর একবার স্মরণ করুন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

২. ক) মধ্যযুগের একটি ঘুমপাড়ানি গানের নিদর্শন —
চণ্ডীমঙ্গল (ঘুমপাড়ানি গান)/ মুকুন্দ চক্রবর্তী

আরে বাছা আয় আয় আয়।
কিলাগে কান্দে মোর শ্রীমন্ত রায়॥
আনিব তুলিয়া গগনফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার।
সোনার বাছা মোর না-কান্দ আর॥
গগন মণ্ডলে পাতিব ফাঁদ।
বান্ধিয়া দিব তোরে শরদ চাঁদ॥
কপালে দিব তোর সে চাঁদ ফোঁটা।
খেলাতে দিব বাছা সোনার ভেটা॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড পরাব চুয়া।
কর্পুর পাকা পান সরস গুয়া॥
রথ তুরঙ্গ দন্তী যৌতুক দিয়া।
রাজার দুই কন্যা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপিবে বিনোদ নায়।
কস্তুরী কুমকুম চন্দন গায়॥
সুখে নিদ্রা যান চামর রায়।
শ্রী কবিকঙ্কন মুকুন্দ গায়॥

খ) ঠাকুমা-দাদিমা নানি-দিদিমাদের ঝোলাঝাম্পা

লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝে থাকি সাধারণ জনের সংস্কৃতিকে। সেই 'সাধারণজন' হলো গ্রামীণ ভারতের নিরক্ষর অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জনসমাজ। জাতির জীবনে ওই জনসমাজই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ ভারতবর্ষ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। আমাদের এই সুজলা সুফলা পশ্চিমবাংলাও গ্রামকেন্দ্রিক। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও কৃষিনির্ভর এই গ্রামবাংলার চাষাভুষো সাধারণ মানুষ ছিল নিরেট মানুষ। আকাট, নির্ভেজাল। আজন্মলালিত বিশ্বাস, সংস্কার ও পরম্পরাগত মূল্যবোধের সাহায্যে তারা তৈরি করে নিয়েছিল নিজেদের মতো এক সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতিকেই আমরা লোক সংস্কৃতি বা 'ফোক-কালচার' বলি।

সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সংস্কৃতি থেকেই সাহিত্য তার উপাদান সংগ্রহ করে। লোক সংস্কৃতির সঙ্গেও লোকসাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ লোকসংস্কৃতির বুনিয়াদেই গড়ে ওঠে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হয় একান্ত সাধারণ

লোকজীবন থেকেই।

লোক সাহিত্যের দু'টি ধারা। একটি মৌখিক, অপরটি লিখিত। মৌখিক ধারাই হলো প্রাথমিক রূপ। আমাদের আলোচ্য ঘুমপাড়ানি গান ও ছেলে ভুলানো ছড়াও লোকসাহিত্যের একটি মৌখিক ধারা। মৌখিক ধারার লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে মনে হয় যে, একক কোনও ব্যক্তি ওই সাহিত্যের স্রষ্টা নন। ওগুলি আমজনতার স্মৃতিবাহিত পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ফসল। সেকারণেই ওইসব মৌখিক ছড়া বা গানের কোনও একজন নির্দিষ্ট স্রষ্টা বা রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে লোকসাহিত্যের গবেষক ড. সুশীল কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন, "সাধারণ অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষ খেয়ালখুশি মতো আমোদ বা ঠাট্টার ছলে সহকারী মানুষকে হয়তো একটা-দুটো কলি কিছুটা গদ্য কিছুটা পদ্যে মিশিয়ে বলতো। এখন সেই বিচ্ছিন্ন একটা-দুটো পদের যেখানে সেখানে প্রয়োগের ফলে সমাজের অন্য মানুষের মনে ওই ধরণের পদ সৃষ্টি করার প্রেরণা জাগাতো। এবং সেইসব পদগুলো পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উচ্চারণ বৈশিষ্টের পার্থক্যের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যেত। সেই জন্য লোকসাহিত্যে আদি কোনও একক স্রষ্টার কল্পনা করা অসম্ভব, এমনকি ইতিহাসের কোনও অধ্যায় যে এর উন্মেষকালের চিহ্ন বহন করছে, তাও নিশ্চিন্তভাবে বলা দুঃসাধ্য। তবে অশিক্ষিত চাযাভুষা মানুষের মনই যে লোকসাহিত্যের সৃষ্টিভূমি— একথা অনস্বীকার্য।"

বাংলাভাষার প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদে ঘুমপাড়ানি গান বা ছেলে ভুলানো ছড়ার কোনও প্রসঙ্গ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে এরকম একটি নিদর্শন (উপরে উদ্ধৃত) আমরা দেখতে পাই। তবে সাধারণ লোকজীবনে ছড়াটির ব্যাপক প্রচলতার কোনও প্রমাণ নেই। হয়তো চণ্ডীমঙ্গলের কবিকঙ্কন লৌকিক জীবনে এরকম ঘুমপাড়ানি গান শুনে থাকবেন, কিন্তু সেসবের হুবহু অনুকরণ না করে বরং তাঁর নিজস্ব শিল্পরুচিকেই সার্থকতা দান করেছেন। ফলে লোকসমাজে প্রচলিত ঘুমপাড়ানি গান থেকে তা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে।

আগেকার দিনে সব পরিবারেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের, বিশেষতঃ বৃদ্ধাদের দেখা যেত ছোটদের জন্য ছড়া গান বা গল্প-বলিয়ের ভূমিকায়। বয়স্কা মা-মাসি-ঠাকুমা দিদিমা-নানি-দাদিরা তাঁদের নিজস্ব ভাষার বিন্যাসে, সুরে, অঙ্গভঙ্গিতে যে আদর মেশানো আভিনয়িক মাত্রা যোগ করতেন— শিশুমন সহজেই সেই সুরে, সেই পরিবেশনভঙ্গিতে একাত্মতাবোধ করত এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো।

মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবন ও বিকাশের পরও বহুদিন পর্যন্ত মুখে মুখে ছড়া গল্প বলার রীতি প্রচলিত ছিল। স্বাধীনতার দেড় দুই দশক পর শুরু হয় একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের সঙ্কট। ঠাকুমা-দিদিমারা ক্রমে অন্তরালে চলে যান। পরিবর্তে আসে ছাপানো বই 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠান দিদির গল্প'। মুখে মুখে শোনাবার রীতির পরিবর্তে পড়বার বা পড়ে শোনাবার রীতি।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় ছড়া-রূপকথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "... ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে শিশুকে ঘিরে বাঙালি মায়েদের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্খার স্নেহসিক্তভূমিতেই ওইসব গান ও ছড়ার উৎপত্তি।

৩ টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিট্‌ল স্টার

১। খোকাঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি
আর ক'টা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি।
(মন্তব্য : *বর্গী হামলার নিদর্শন*)

২। ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো
আমার খোকার চোখে তুমি
ঘুম দিয়ে যেও।

(মন্তব্য : *মাসিপিসির ভূমিকা*)

৩। হাট-টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দু'টো শিং
তারা হাট টিমাটিম টিম।
(*উদ্ভটতত্ব ও ভীতি প্রদর্শন*)

৪। তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই
মামার বাড়ি ভারি মজা
কিল চড় নাই।
(*মামা-মাসি, স্মর্তব্য প্রবচন* : মামাবাড়ির আবদার)

৫। আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
সূয্যিমামার বিয়েটা।
আয় লবঙ্গ হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই।
একটা পান ফোঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
(ডুম=ডোম? *ডোমেদের পেশা ও বিয়ের অনুষঙ্গ।*
ডুলিবাহক/ বেহারার গান)

৬। এলাটিং বেলাটিং থার্টি ফোর
কাগের গলায় তুলসির মালা
ব্যাঙে বাজায় বাঁশি

আমপাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি ফিরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
বন্দুক তুলে মেরেছে।
অলরাইট ভেরিগুড
পাঁউরুটি বিস্কুট।
মেম খায় কুট কুট
সাহেব বলে ভেরি গুড। *(ইংরেজ শাসনের প্রভাব)*

৭। আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ি
রেল গাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম। *(ভারতে রেলগাড়ির প্রচলন*
বাইকম = ভাই come? আইকম = I come?)

একদা উপরোক্ত ঘুমপাড়ানি গান ও ছেলেভুলানো ছড়াগুলির প্রচলন সারা পশ্চিমবাংলা জুড়েই ছিল। ছিল ওপার বাংলাতেও। সাধারণভাবে বলা হয় যে এসব ছড়ার কোনও উদ্ভবকাল জানা যায় না। কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু আছে। যেমন ১ নং ছড়াটিতে বর্গীর হামলার উল্লেখ আছে। ৭ নং ছড়াতে রেলগাড়ির উল্লেখ আছে। এগুলি বর্গীর হামলা বা ভারতে রেলগাড়ি প্রচলনের পূর্বে রচিত হয়নি? আলিবর্দীর রাজত্বকালে বর্গীরা ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাংশ ও রাজশাহী মুর্শিদাবাদেই অত্যাচার করেছিল বেশি। ওই অত্যাচারের স্মৃতিই ছড়িয়ে আছে ছড়াটিতে। ছড়াটির সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য অপরিসীম। বর্গীর আক্রমণের নজির ওই ছড়াটি ছাড়া বাংলা সাহিত্যে বিরল বলা চলে।

ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির বৈশিষ্ট হলো উদ্ভট অর্থহীন শব্দের ব্যঞ্জনা। যেমন হাট টিমাটিম টিম/ আগডুম বাগডুম / তাই তাই তাই / এলাটিং বেলাটিং / আইকম বাইকম ইত্যাদি। এইসব অর্থহীন উদ্ভট শব্দ ব্যঞ্জনা শিশুর মনোজগতের উদ্দীপনাকে প্রশমিত করে বলেই হয়তো এরকম শব্দের বাহুল্য দেখা যায় ঘুমপাড়ানি গানে, ছেলেভুলানো ছড়ায়। অথবা শিশুরা অনেক সময় যেসব অর্থহীন হ্যাজোর ব্যাজোর ধ্বনি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, আনন্দানুভব করে তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ছড়াগুলির আগডুম বাগডুমে।

এরকম অনেকানেক ছড়া শিশুরা তাদের মা মাসি ঠাকুমা দিদিমা নানি-দাদিদের কাছ থেকে শুনতে শুনতে মুখস্থ করে ফেলতো এবং অনেক সময় খেলাধুলা করতে গিয়েও এগুলি ব্যবহার করতো। যেমন—

এপেন্টি বাক্স
টেন টেন টিক্স
চরণবাবুর বঠকে
পান সুপারির নীচে

পানে আছে মৌরিবাটা
ইসকুলে আছে চাবি আঁটা
আমার নাম মনিবালা
গলায় দিব হীরের মালা।

ফুল নিবে, না গয়না?

প্রশ্নের উত্তরে 'গয়না' বললে তাকে আটকে দেওয়া হয় 'ফুল' বললে ছাড়া পায়। এভাবে 'গয়না' দল আর 'ফুল' দল গড়ে ওঠে। খেলার দল বিভাজন সহজ হয় ওই ছড়া ব্যবহার করে।

তো, এসবই একদা-র ছবি। এখনকার গ্রাম বাংলার ছবি অন্যরকম। ব্যতিক্রম হিসাবে কোথাও কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও হয়তো এইসব ছড়া প্রদীপের আলোর মতো টিমটিম করে জ্বলছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামের আধুনিক নিওনবাতির মতো নার্সারি রাঈমের জেল্লা ওইসব প্রত্যন্ত গ্রামের প্রদীপের আলো-কে ম্লান করে দিয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ গ্রাম থেকেই ওইসব ঘুমপাড়ানি গান ও ছেলেভুলানো ছড়া নির্বাসিত হতে চলেছে। আগডুম বাগডুম-এর ধ্বনিব্যঞ্জনা এখন আর শিশুদের আনন্দানুভূতি দিতে পারে না। পরিবর্তে এসেছে বিজ্ঞাপনী সংস্থার শ্লোগান— এপাং ওপাং ঝপাং। এসেছে পরিচ্ছন্ন ফিটফাট সপ্রতিভ নার্সারি রাঈম— টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিট্‌ল স্টার ...।

৪

মুর্শিদাবাদের ঘুমপাড়ানি ঃ হিঁত্‌ হিঁত্‌ হিঁত্‌রে দাদি

এই পর্বে আমরা আলোচনা করব মুর্শিদাবাদ জেলার (ভাগীরথী নদীর পুর্বাঞ্চল অর্থাৎ বাগড়ি এবং পশ্চিমাঞ্চল রাঢ় এলাকা) প্রচলিত ঘুমপাড়ানি গান ও ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কে। শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার অসংখ্য গ্রামের কোনও দুর্গম প্রত্যন্তে বা ভৈরব শিয়ালমারির উতল চরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোনও কোনও গান বা ছড়া হয়তো আমার অনবধানতায় নজর এড়িয়ে গেছে। সে অর্থে এই সন্দর্ভ কোনও পরিশ্রমী গবেষণার ফল নয়, বরং বলা যেতে পারে এ বিষয়ের উপর একজন উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু লেখকের উপক্রমণিকা বা সূচনা মাত্র।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনি দেবী অন্নপূর্ণার কাছে বর চেয়েছিল, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' সন্তান সম্পর্কে ঈশ্বরীর ওই প্রার্থনার মধ্যে আমরা বাংলার তাবৎ বাবা-মায়ের আকাঙ্খারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

মুর্শিদাবাদের বাগড়ি অঞ্চলের পশ্চিমপ্রান্তে আছে ভাগীরথী আর পূর্বপ্রান্তে পদ্মা। ভিন্ন দুই নামের এই একটিই নদী বাগড়ি অঞ্চলের মাটিকে করেছে উর্বর, শস্য শ্যামলা। এই মাটিতে জন্মায় গুণমানে উৎকৃষ্ট আম, কাঁঠাল আর লিচু। তাই ঈশ্বরী পাটনির মতোই এখানের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মায়েদেরও সন্তানকে ঘিরে তাদের সাধ স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে এরকম ছড়ায়—

উড়কি ধানের মুড়কি দিব
মুচুর মুচুর খ্যাতে
আম কাঠালের বাগান দিব
ছেমায় ছেমায় যাত্যে
দুধের পুখর দিব
ঝাপই খেলিতে।

অনুরূপ আর একটি ছড়া সন্তানকে দোলনায় দোল দিতে দিতে মা-মাসিরা গেয়ে ওঠে—

দোলে দোলে দোলে
দোল পুকরের কোলে
দোলে কাঠাল পাড়ে
না পাড়তে পারে
ভাইকে ডাক ছাড়ে
ভাই নাই ঘরে
আপ্‌নি ধোকড় ভরে
দোলে দোলে দোলে ...।

জনসংখ্যার দিক থেকে মুর্শিদাবাদ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। এবং অধিকাংশ মুসলমান অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র কৃষিজীবী। তুলনামূলকভাবে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র হিন্দু কৃষিজীবীর সংখ্যা অল্প। এঁরা অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ হিন্দু। অশিক্ষিত, দরিদ্র মুসলিম কৃষিজীবীর সঙ্গে এঁদের শ্রেণীগত সমানতার কারণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনেক মিল বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে প্রায় একই রকম ঘুমপাড়ানি গান বা ছেলেভুলানো ছড়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেখতে পাই। কেবল ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় অনুষঙ্গের দু-একটি শব্দ বদলে যায়। এখানে লক্ষণীয় যে মুর্শিদাবাদ জেলার উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের মধ্যে এ ধরণের ছড়ার আলাদা কোনও সৃজন-ঐতিহ্য নেই। সমগ্র পশ্চিমবাংলায় এ বিষয়ে যে সকল ছড়ার প্রচলন আছে, এঁরা সাধারণতঃ সেগুলিই ব্যবহার করে থাকেন।

'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো'— এরকম সরাসরি ঘুমের প্রসঙ্গ ছড়ায় এনে ঘুমকে আহ্বান করার যে আবেদন, সেই একই আবেদনে মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ কৃষিজীবী হিন্দু-মুসলিম মা-মাসি বর্ষিয়সীদের কণ্ঠে সুর খেলে যায় এভাবে—

আয়রে নিঁদু আয়
শিয়ালে বাগুন খায়
তারা নুন কতি পায়
তারা ত্যাল কতি পায়
তারা আন্‌ন্যা রাঁধ্যে খায়
মগডালে বসিয়া তারা
ডুগডুগি বাজায়
আয়রে নিঁদু আয় ...।

এই ছড়াটিতে আছে বাস্তব সত্যের সঙ্গে উদ্ভট অবাস্তব রূপকল্পের মিশেল। ছড়াটি থেকে একথা স্পষ্ট যে কথক মা-মাসির পরিবার কৃষিজীবী এবং দরিদ্র। এখানে তাই শেয়ালে হাঁস-মুরগি না-খেয়ে বেগুন খায়। এবং শেয়ালেরা নুন-তেল ছাড়াই বেগুন রেঁধে খায় (নিজেদের

যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি?)। আর সেই আনন্দে মগডালে বসে ডুগডুগি বাজায়। এমন উদ্ভট মজার কথা শুনে শিশুর চোখে 'নিঁদু' তো আসবেই।

দরিদ্র কৃষিজীবী জীবনে মুরগী পালনের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা আছে। তাই মুরগীর নামেও তৈরি হয় ছড়া। অবশ্য এক্ষেত্রে ছড়াও কীভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির গেরুয়া-সবুজে বিভাজিত হয়ে যায়, লক্ষ্য করুন—

আয় তি তি তি
মুরগী পুষেছি।
মুরগির নাম কী?
ফকির বাবাজি।

এই ছড়া-ই যখন হিন্দু পাড়ায় শুনতে পাই, তখন তার শেষ পংক্তিটি পরিবর্তিত হয়ে যায় 'ভোলে বাবাজি'।

আথাল পাথাল নিমতাথাল
নিম তলাতে ঘর
আগুন নাইরে পানি নাইরে
দাও চাট্টি ভাত—
তুমি খেও ভালোখান
বুড়োকে দিও পচাখান
তোমার কুত্‌তো ভরে না।

উক্ত ছড়ার 'পানি' শব্দটি স্বভাবতই হিন্দুপাড়ায় গেলে 'জল' হয়ে যায়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে নানি-দাদি তার নাতনিকে 'দাও চাট্টি ভাত' বলার পরই হাত পাততে বলে। নাতনি হাত পাতলে কিছু দেওয়ার অভিনয় করে। এবং বলে, 'তুমি খেও ভালোখান' এবং 'বুড়ো' অর্থাৎ নাতজামাইকে দিও 'পচাখান'। কারণ তোমার কুত্‌তো (পেট?) ভরে না।

আবার এখনও দেখা যায় যে কোনও ছড়ার অর্ধেক বা কিয়দংশ হিন্দুপাড়ায় শোনা গেলেও সমগ্র ছড়াটি শুনতে পাওয়া যায় মুসলমান পাড়ায়। যেমন—

ঘু ঘু ঘু ঘু
কী ছেলে?
বেটা ছেলে/ বিটি ছেলে
বেটা কই/ বিটি কই
মাছ মারতে গেল/ ধান ভানতে গেল
মাছ কই? / ধান কই?
চিলে নিলো। /পাখিতে খেল।
চিল কই? / পাখি কই?
ডালে বসল
ডাল কই?
ভেঙে গেল।
ভাঙা ডাল কই?
ধোপা নিলো।
ধোপা কী করবে?

কাপড় কাচা পিড়ে করবে।

হিন্দুপাড়া এ পর্যন্ত এসে থেমেছে। কিন্তু মুসলিমপাড়ায় মা-মাসি নানি-দাদিরা আরও দু-কদম এগিয়ে বেটার বউ-এর খোঁজ করেছে। আর তাই—

বউ কই?
পানি আনতে গেল।
পানি কই?
এঁড়েতে খেল।
এঁড়ে কই?
বনে সাঁধ্যালো?
বন কই?
পুড়ে গেল।
ছাই কই?
উড়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলার পর শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়— তোমার বাড়িতে কালো মেকুর আছে? উত্তরে শিশু বলে —আছে। তখন মা-ম্যাসি নানি-দাদি বলে— ঘেউ ঘেউ ঘেউ। অর্থাৎ 'মেকুর' বা বিড়ালকে তাড়াচ্ছে কুকুর।

এই ছড়াটিই আবার যখন ভাগীরথীর পশ্চিমপারে রাঢ়ের মা-মাসির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তখন শোনা যায় কিঞ্চিৎ ভিন্ন পাঠে। যেমন—

ঘুঘু ঘু
পেটে ফু
কি ছেল্যা?
ব্যাটা ছেল্যা?
ছেল্যা কোই?
মাছ ধরতি গ্যাছে।
মাছ কোই?
চিলে নিলে
চিল কোই?
উড়ে গেল।
উড়া কোই?
পুড়ে গেল।
পুড়া কোই?
ছাই হয়ি গেল
ছাই কোই?
মিলিন গেল।
মায়ের কোলে? না
বাপের কোলে?

অনুরূপভাবে আর একটি ছড়ার সম্পূর্ণ অংশ হিন্দুপাড়ায় শোনা গেলেও ছড়ার শেষে শিশু ও কথকের মধ্যেকার প্রশ্নোত্তর পর্বটি শোনা যায় শুধুমাত্র মুসলিমপাড়ায়। ওটি হিন্দুপাড়ায় অচল। যেমন —

ইচিং বিচিং তাল চিচিং
তালে পড়ল মজুমদার
দোরে এল দামোদর
দামোদরের হাড়িকুড়ি
মাজতে হল তাড়াতাড়ি
ভাত রাঁদতে দুপুরবেলা
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি
কোদাল হল ভোঁতা
খা কামারের মাথা

হিন্দুপাড়ায় এ ছড়ার এখানেই সমাপ্তি। মুসলিম পাড়ায় এ ছড়ার শেষ চরণটির ভিন্নপাঠ হল— 'খাক আমার মাথা'। (খাক ফার্সি শব্দ। অর্থ মাটি বা ছাই। অর্থাৎ ভোঁতা কোদাল দিয়ে ভাতের মাছি চাঁছার কাজটি কথকের বুদ্ধিনাশ করেছে বা তাকে হতবুদ্ধি করেছে।) মুসলিম পাড়ায় এরপরও কথক ও শিশুর মধ্যে চলে প্রশ্নোত্তরপর্ব। যেমন

কথক— চান করেছো?
শিশু— না
ক — চান করে এসো গা।
শি— চান করলাম।
ক — কিসের পানিতে?
শি— গুহের পানিতে!
ক — ছি ছি ছি, আবার চান করে এসো গা!
শি— চান করলাম।
ক — কিসের পানিতে?
শি— গরু ধোয়ার পানিতে!
ক — ছি ছি ছি, আবার চান করে এসো গা!
শি— চান করলাম।
ক — কিসের পানিতে?
শি— সোনার পানিতে।
ক — পাতে বস। এই হাতে কী আছে?
শি— মিস্টি, আঙুর, বেদানা, মণ্ডা, দই ...
ক — আমাকে দিবা?
শি— না না।
ক — আমার কালো বিড়াল আছে, ধরিয়ে দিব।
শি — হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিব।
ক — দাও, দাও, দাও

আমার মিস্টি তুমি খাও
তোমার মিস্টি আমি খাই ...
(শব্দ করে খাওয়ার অভিনয়।)

উক্ত ছড়ার এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি আসলে দরিদ্র কৃষিজীবী জীবনের একঘেয়ে দৈনন্দিনতায় অতৃপ্ত রসনা বাসনার ইচ্ছাপূরণের ছড়া। বাস্তবে না মিললেও ছড়ায় ইচ্ছাপূরণ হয়ে যায়।

দারিদ্র আর হতাশাক্লিষ্ট জীবনের অনুরূপ একটি ছড়া শোনা যায় মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলে। যেমন—

আল্লার কির‍্যা ভোল্লার চাক
মা বলেছে ঘরে থাক
খেতে দিব বাসি ভাত
খেয়ে যাবি মামার বাড়ি
মামি দিল পুড়া মুড়ি
খেতে খেতে ঢুলির বাড়ি
ঢুলি দিল ভাঙা ঢোল
তাই নিয়ে গণ্ডগোল।

ছড়াটিতে আছে একটি শ্রমজীবী পরিবারের শিশু প্রতিপালনের অসহায় চিত্র। বাবা মা দুজনকেই যেখানে দৈনন্দিন অন্নসংস্থানের তাগিদে বেরিয়ে যেতে হয়, সেখানে কিশোর ভাই বা কিশোরী বোনের তত্ত্বাবধানে ছোট্ট ভাই বা বোন যখন ক্ষুধায় অস্থির হয় বা বারবার ঘরের বাইরে যেতে চায় তখন বড় ভাই বা বোনকে ঈশ্বরের দোহাই (আল্লার কির‍্যা) দিয়ে তাকে প্রত্যয়িত করে যে বাইরে আছে ভয়ঙ্কর ভোল্লা বা বোলতার চাক। তাছাড়া সে যদি ঘরে থাকে তাহলে তাকে বাসি ভাত খেতে দেওয়া হবে। এবং তা খাবার পরে মামার বাড়ি যাবার প্রতিশ্রুতিও রাখা হয়। এভাবেই চলে দুরন্ত অবুঝ শিশুকে শান্ত করার প্রচেষ্টা। এখানেও আছে ছড়ায় ইচ্ছাপূরণের ছবি।

রাঢ় অঞ্চলে ছেলে ভুলানো ছড়া বা কেচ্ছার (কিস্‌সা) সমাপ্তি টানা হয় নিম্নোক্ত ছড়াটি বলে।

শিয়ালের ভাই দিয়্যাল দেয়
নেঙ্গুড়ে বাঁধা ফতা
দিয়্যালটা পড়ি গ্যালো
শিয়ালটা মরি গ্যালো
এই তো আমার কথা।

ঘুম পাড়ানি গান বা ছেলে ভুলানো ছড়ার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ছড়ায় যেমন বিভিন্নতা আছে, তেমনই আবার অভিন্নতার ক্ষেত্রটিও অপরিসর নয়। যেমন নিম্নোক্ত ছড়া দুটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই শোনা যায়।

১। আয়রে বাবু আয়
দুধ মাখা ভাত কাগে খায়
২। এক ভুলকি দেখালাম
কাইয়ার গু চাটালাম।

কাইয়া বসল ডালে
হাগ্যে দিল গালে।
গাল চচ্চড় করে
কামারকে যায়ে দেখাগা
কামার হল নেংড়া
পথে বসে গেংড়া!

মজার ব্যাপার হলো, কোনও কোনও ছড়ায় হিন্দু ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও মুসলিম মা মাসি নানি দাদিদের ছেলেভুলানোর ক্ষেত্রে কোনও ছ্যুৎমার্গ নেই। তাঁরা সেই সব শব্দ বর্জন বা পরিবর্তন না করেই সুর তোলেন—

হাড়গিলেরে ভাই
চিঁড়ে কুটকুট খায়
একটা চিঁড়ে উনু হল্যে
দাদার বাড়ি যায়।
দাদার আছে আড়্যেগরু
মামার আছে গাই
সেই গাইয়ের দুধ লিয়ে
লক্ষী পাড়ায় যায়
লক্ষী দিল ধান দুক্কড়ো
মালি দিল ফুল
সেই ফুল বেচেবুচ্যে
লাই-এ দিনু ভাড়া
সেই লা-খানা ডুবতে ডুবতে
ঠিক দুপুর বেলা ...।

অঞ্চলভেদে এই ছড়াটির পাঠান্তর (শ্রবনান্তর) পাওয়া যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও লক্ষ্মীপ্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। যেমন—

ঘুঘু মালা রে ঘুঘু মালা
ঝাল পিঠেলু খায়্যে
আজ ঘুঘুর রবিবার
কাল ঘুঘুর বিয়ে
সেই ঘুঘুকে নিয়ে গেল
লাল কাপড়া দিয়ে
লাল কাপড়া লিব নারে
লিব নারে তসর কিনে দে
তসর করে খসর মসর
দাদ কিনে দে
দাদ ভরে হাগবরে মুতবরে
কাচ্চ্যে আনে দে

কাচতে রে ভাই খুচতে রে ভাই
ললি হল্য কাঠ
হড়হড়্যার পাক্কাপাকা পান
পান কিননু চুন কিননু
ননদে ভাজে খানু
একটা পান হারা'ল
দাদুকে যায়ে বলনু
দাদুর একটা আড়্যেগরু
আমার একটা গাই
সেই গাইয়ের দুধ লিয়্যা
লক্ষ্মীপাড়ায় যাই
লক্ষ্মী দিল ধান দুবড়্যে
মালি দিল ফুল
সেই ফুলকে কাটনুরে কুটনুরে
লাই-এ দিনু ভাড়া
সেই লা-খান ডুবতে ... ডুবতে ... ডুবতে
ঠিক দুপুরবেলা।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলি কেবলমাত্র মুসলিম পরিবারে শোনা যায়।

১। এ ... এ... বাবু ছেল্যা ভালো
কাঠ কুড়াতে গেল
কাঠের মালা গলায় দিয়ে
বউ আনতে গেল
বউশুবে কুঠ্যে
নিমতলার ঘাটে
নিম পড়ল বুকে
হাজি আল্য লিতে
এক পটলের ভাজাভুজি
দুই পটলের ঝোল
কাঁদেরে কোলের ছেল্যা
বাজেরে ঢোল্।

২। এ ... এ ... বাবু সুনার শ্বশুর আল্য
এক থালা মরিচ লিয়ে
একটা পল্য ঘাটে
একটা পল্য মাঠে
ঘাট মোহ্ মোহ্ করে
মাঠ মোহ্ মোহ্ করে
গাই করে হাম্বা
বাছুর করে চিৎ

এক পালটা ধান লিয়ে
পঞ্চার মা-র গীত
পঞ্চার মা ধান ভাহ্নে
পঞ্চা খায় খুদ
বাঁশড়া দিয়ে বিলাই পালাল্য
আয় পুষ ... পুষ ... পুষ ...।

৩। এ ... এ ... বাবু আলি
কালাই টালি
ঘট বাগন্যের চারা
বাবু সুনার বিহে দিব
আসমানের তারা

(উপরোক্ত তিনটি ছড়াতেই 'বাবু' স্থলে স্ব স্ব শিশুর নাম ব্যবহৃত হয়।)

যে শিশু দুরন্ত, সহজে নিদ্রা যায় না তাদের জন্য আছে দীর্ঘ আর মজাদার ছড়া। ছড়াটি শুনে মনে হয় এটি বেশ প্রাচীন। বাল্যবিবাহের নজির আছে ছড়াটিতে। চাষী স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ সম্পর্কিত ছড়া এটি। ছড়ার 'ভাড়লি' হলো রূপকথার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর মতো একধরনের পাখি থাকে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সাক্ষী মানছে এবং তার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করছে।

(স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) একটা ভাড়ালি হ'লদ্যা
পথে মারে ব'লদ্যা
ভাড়ালি রায় রায় ...
একটা ভাড়ালি দিঘল ঠুট
খেয়ে গেল আমার গোলার বুট
একটা ভাড়ালির মাথায় চিৎ
বনে বসে গাহে গীত
ভাড়ালি রায় রায় ...

স্ত্রী— লাঙল বাইতে যাবা তুমি
ভুজে ভাজ্যে খাব আমি।
স্বামী— ভুজে ভাজ্যে খাবা তুমি?
পানঠিসহি করব আমি।
স্ত্রী— পানঠিসহি করবা তুমি?
কানঠাতে লুকাব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্বামী— কানঠাতে লুকাবা তুমি?
কান্ঠাসহি করব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্ত্রী— কানঠাসহি করবা তুমি?

বাপের বাড়ি পালাব আমি।
স্বামী— বাপের বাড়ি পালাবা তুমি?
চুলের মুঠি ধরব আমি।
স্ত্রী— চুলের মুঠি ধরবা তুমি?
কাদায় ল্যাট মারব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্বামী— কাদায় ল্যাট মারবা তুমি?
কোলে তুলে লিব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্ত্রী— কোলে তুলে লিবা তুমি?
কোল ভরে হাগব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্বামী— কোল ভরে হাগবা তুমি?
ধোবার ঘাটে ধুব আমি
ভাড়লি রায় রায় ...
স্ত্রী— ধোবার ঘাটে ধুবা তুমি?
ধুবা মাছ হব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্বামী— ধুবা মাছ হবা তুমি?
জাল দিয়ে ছেঁকিব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্ত্রী— জাল দিয়ে ছেঁকবা তুমি?
মাটির তলায় ঢুকব আমি।
স্বামী— মাটির তলায় ঢুকবা তুমি?
লাঙল দিয়ে চষব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্ত্রী— লাঙল দিয়ে চষবা তুমি?
ফালের উপর নাচব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্বামী— ফালের উপর নাচবা তুমি?
বাঁ পা দিয়া ধরব আমি
ভাড়লি রায় রায় ...
স্ত্রী— বাঁ পা দিয়া ধরবা তুমি?
বাবলা গাছে বসব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্বামী— বাবলা গাছে বসবা তুমি?
বাবলা গাছ কাটব আমি।
স্ত্রী— বাবলা গাছ কাটবা তুমি?

কবুতর হয়ে উড়বো আমি।
স্বামী— কবুতর হয়ে উড়বা তুমি?
বন্দুক দিয়ো মারব আমি
ভাড়লি রায় রায় ...
স্ত্রী— বন্দুক দিয়া মারবা তুমি?
সরষে হয়ে ঝরব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...
স্বামী— সরষে হয়ে ঝরবা তুমি?
কুনি দিয়ে খুটব আমি।
ভাড়লি রায় রায় ...

ছড়াটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছে পুরুষের প্রতি নারীর মোহময়ী ছলাকলার নানারূপ আর নারীর উপর আধিপত্যকামী পুরুষের সদম্ভ দাপটের প্রকাশ।

ছিঁচকাঁদুনে শিশুদের নিয়ে নাকাল হতে হয় মা-মাসিদের। ছিঁচকাঁদুনেদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী একটি মজাদার ছড়া আমাদের সংগ্রহে আছে। ছড়াটিতে ব্যবহৃত 'হিঁত হিঁত' শব্দবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে একটি অব্যয়সূচক শব্দ — যা আসলে ছিঁচকাঁদুনে শিশুর অবিরাম কান্নার অনুকরণ মাত্র। ছিঁচকাঁদুনে শিশুকে ছড়াকথক দাদি শোনাচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি —

হিঁত হিঁত — হিঁতরে দাদি
হিঁত হিঁত — কেমনে যাবি?
হিঁত হিঁত — চাল কিনতে।
হিঁত হিঁত — চাল কী হবে?
হিঁত হিঁত — বউ খাবে?
হিঁত হিঁত — বউ-র কী হয়েছে?
হিঁত হিঁত — ছ্যেলা হয়েছে।
হিঁত হিঁত — ছেল্যার নাম কী?
হিঁত হিঁত — কারি গোল।
হিঁত হিঁত — ছেল্যা হাগে কেমন?
হিঁত হিঁত — বাগ ছরানি।
হিঁত হিঁত — ছেল্যা মুতে কেমন?
হিঁত হিঁত — সরষ্যের ত্যাল।
হিঁত হিঁত — ছেল্যা কাঁদে কেমন?
হিঁত হিঁত — হিঁটটে হিঁটটে হিঁটটে ... এ্যাঁ ...

এরপর ছড়া কথক শিশুর হাত টেনে নিয়ে হাতের তালুতে কিছু দেওয়ার ভান করে এবং একদমে বলে যায়— ভাত দিই মাছ দিই মাংস দিই ডিম দিই ... ইত্যাদি। এবং শিশুর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দিয়ে বলে —

হাঁড়ি ঘুচাও

বিল্লি মারো
বড়ঘর যাও
থাল্যে ঘুচিয়ে ভাত খাও।

এসব বলতে বলতেই ছড়াকথকের আঙুল শিশুর তালু থেকে ক্রমে হাতের উপর দিকে বগলে উঠে যায়। বগলে কাতুকুতু দিতে দিতে বলে —

ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও
কাতুকুতু কাতুকুতু ...।

তখন ছিঁচকাঁদুনে শিশুও হেসে ওঠে খলবল করে।

সহায়কগ্রন্থ ঃ—

১। বিশ্ব লোকসাহিত্যের ধারা/ সুশীল কুমার ভট্টাচার্য
২। লোকসাহিত্য (প্রবন্ধ ঃ ছেলেভুলানো ছড়া/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৩। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত ঠাকুরমার ঝুলি।
৪। হাজার বছরের বাংলা কবিতা, সম্পাদনা বীতশোক ভট্টাচার্য্য।

সহায়ক পত্রিকা ঃ—

১। পূর্বাভাস ঃ বিশেষ লোক সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৮ সাল (প্রবন্ধ ঃ আঞ্চলিক লোক সাহিত্য মুর্শিদাবাদ /আবুল কালাম। সম্পাদক ঃ আবুল কালাম খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ)

কৃতজ্ঞতা ঃ আর্জিনা মবিন, মৈনাক মবিন, সঞ্জয় ঘোষ (ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ)

মুর্শিদাবাদের শব্দগান

তরুণ গোস্বামী

মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চলের মুসলিম জনমানসে এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে শব্দগান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য ফরাজী এবং হানাফি উভয় সম্প্রদায়ের কট্টরপন্থীদের কাছে বাদ্য অনুসঙ্গ গান 'হারাম' পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু মানুষের সৃজনশীল ও নান্দনিক প্রচেষ্টা কখনও বন্ধ্যা হতে পারে না। তাই যতই ধর্মীয় নিষেধ থাকুক না কেন এই অঞ্চলের গান-পাগল মানুষ একটা ধর্মীয় চেতনাযুক্ত গানের সৃষ্টি করেছে তার নাম শব্দ-গান। এই গান বিশেষভাবে মুসলিম ধর্ম-বিশ্বাসের মারিফতী এবং ফকিরি প্রভাবে প্রভাবিত। হিন্দুরা কীর্তন, কথকতা, পাঁচালী গানের মাধ্যমে হিন্দু জনমানসের মধ্যে ধর্মীয় মিথ ও চেতনার সঞ্চার করে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আলকাপ, কবি, লেটো পানসৌ বঁদ, ছঁদ (বঁদ — ছন্দবন্ধ গান, ছঁদ — ছন্দ) এইসব গানে অংশগ্রহণ করে। মুসলমান হৃদয়ের সব আবেগ উৎসারিত হয় মহরমের কাসেদে, জারিগানে, মর্সিয়াতে।

এই জেলার পূর্বাঞ্চলের মানুষের রক্তে গান মিশে আছে। পদ্মা, ভৈরব, জলঙ্গীর উত্তাল ঢেউ-এর মধ্যে, সাগরসমান বিল হাওরের মধ্যে এখানকার জেলে, নিকিরি মহলদাররা যখন ডিঙ্গিপাড়ি দেয় তখন তাদের গলায় গান ওঠে, গান ওঠে মেয়েদের গলায় যখন তারা ঢেঁকিতে পাড় দেয়, ভাদ্রমাসে গ্রামে গ্রামে বসে গান কাহিনীর আসর যার নাম মজলিশ। আর বাউল গান তো এ অঞ্চলের অমূল্য সম্পদ যা লালনশাহ, পানজুশাহ, দুদ্দুশাহ, হাউড়ের পদে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। অবশ্যই সাগর পাড় ছুঁয়ে আসা প্রাতিষ্ঠানিক বাউল গান যা হামেশাই টি ভি, রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ারে শুনতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক বাউল গানের অনেক তফাৎ। জনমানসের এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশের পাশাপাশি দেখা যায় ভি. ডি. ও. কালচার। গ্রামে গ্রামে ব্যাঙের ছাতার মত ভি.ডি.ও পার্লার গজিয়ে উঠেছে। কফি হাউস নাম দিয়ে

যেখানে রগরগে হিন্দী ছবির সঙ্গে চলে নীল ছবির অবাধ প্রদর্শন আর টি ভি, রেডিও ও ক্যাসেট প্লেয়ারের দয়ায় গান এখন সর্বত্র। ধর্মীয় নিষেধ এখানে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

যাই হোক, শব্দগান বুঝতে হলে ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম মানসিকতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সেমেটিক ধর্মগুলির মধ্যে ইসলাম নবীনতম। ইসলাম প্রচন্ডভাবে একেশ্বরবাদী, প্রচন্ডভাবে অপৌত্তলিক, প্রচন্ডভাবে অনুশাসন বদ্ধ — কোডিফায়েড। ইসলামি তৌহিদের পঞ্চস্তম্ভ হল কালেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। কালেমা শুধু "আল্লা এক এবং মহম্মদ তার প্রেরিত পুরুষ" — এই বিশ্বাসী উচ্চারণ নয় — কালেমা হল বিদ্যার্জন। রোজা হল উপবাস এবং জাকাত হল দান। এই পাঁচটা হল ফরজ — অবশ্য কর্তব্য। আর আছে সুন্নত বা আচরণ বিধি যা হজরত মহম্মদ (দঃ) ব্যক্তিগত জীবনে পালন করতেন। একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনগত আচরণ বিধি, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক, সৎভাবে ধন উপার্জন ও জীবিকা অর্জন (রুজি হালাল করা) ধন বন্টন — এক কথায় সমস্ত জীবনচর্চা সুনির্দিষ্ট অনুশাসনে বিধিবদ্ধ আছে। ইসলামের একটা মূলকথা হল বিশ্বাস — ইমান, তাই মুসলমানে আর একটা অভিধা হল ইমানদার — বিশ্বাসী। ইসলামের আকর গ্রন্থ হল মহাপবিত্র কোরান এবং হাদিস। এছাড়া আছে জবুর, তোহরাৎ ও ইনজিল (বাইবেল)।

সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মে কালক্রমে রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে বিভাজনের সৃষ্টি হল। প্রথম বিভাজন হল শিয়া ও সুন্নী। আমাদের জেলার মুসলমান সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায় আবার হানাফি, সাফি, হামবিলি ও মালেকী — এই চার মুজাহাবে বিভক্ত। এছাড়া আছে আহলে হাদিস বা ফরাজী-সম্প্রদায় যাদের বলা হয় লা মুজহাব অর্থাৎ যারা কোন মুজাহাবে বিশ্বাসী নয় — একমাত্র কোরান ও হাদিসে বিশ্বাসী।

পবিত্র কোরান ও হাদিস ছাড়া মুসলিমদের আর দুটো নির্দেশ মানতে হয়। একটা হল ইজমা-ই-উম্মত (মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদের দেখান পথ) আর কিয়াস ব্যক্তিগত অনুভূতি, চিন্তা। কোন সমস্যা সমাধানে একজন মুসলিম দেখবে কোরাণের নির্দেশ। কোরানে যদি সেই সমস্যার কোন সমাধান না থাকে তাহলে সে দেখবে হাদিসের নির্দেশ। হাদিসও যদি এ বিষয়ে নীরব থাকে তখন সে ইজমা ও কিয়াসে তার সমাধান দেখবে। অনুশাসনবদ্ধ শরিয়ত কিন্তু ব্যক্তিগত বিচার বিশ্লেষণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে এই ইজমা কিয়াসের ধারণায়। অবশ্য এখন ইসলামে প্রাতিষ্ঠানিকতা এতদূর গিয়েছে যে এক আজান না দুই আজান-নামাজে হাত বুকে থাকবে না পেটে থাকবে সেই নিয়ে লাঠালাঠি রক্তপাত পর্যন্ত হয়েছে এই মুর্শিদাবাদে।

ইসলামের আছে চার তরিকা বা পথ —

১) শরিয়ত — যা শরা সম্মত। ২) তরিকত — যা বিভিন্ন তরিকা বা মার্গ সম্মত। ৩) হকিকত — যা হক (ন্যায় সম্মত) — যেমন হক কথা, হক রুজি। ৪) মারিফত — যা আধ্যাত্মিক অনুভূতির মার্গ। মারিফতী ধারা বিপুলভাবে সুফী প্রভাবে প্রভাবিত। শব্দগানে এই মারিফতী তত্ত্বের বহুল প্রয়োগ হয়।

ইসলামে বলে "লা রোহ বানিযাত ফিল ইসলাম।" ইসলামে রোহ বানিযাত বা সন্ন্যাস, বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। তবুও ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম শতকেই এই ধর্মের মধ্যে এক অজেয়, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদীর উদ্ভব হয়। এদের বলা হয় সুফী — যেহেতু এরা সুফ বা মোটা লোমের পোষাক ব্যবহার করতেন। খলিফা এ রাশেদিন (আবুবকর, ওমর, উসমান ও আলি — প্রথম চারজন খলিফা) এর পরিবর্তী উম্মিয়াদ ও আব্বাসীয় খলিফাদের যুগের ভোগ সর্বস্ব জীবনযাত্রা পদ্ধতি এবং শরিয়তের মাত্রাতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতিবাদী ছিলেন তারা। হজরত মহম্মদ

ও ইসলামের প্রথম যুগের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা পদ্ধতি ছিল তাদের আদর্শ।

এই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রায় সন্ন্যাস মার্গের সমতুল্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খৃষ্ট্রীয় মিসটিক (মরমী) সাধুদের নিও প্লাতোনিক চিন্তাধারা। যার মূল লক্ষ্য ছিল নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের আকুতি। Passage in the Koran and Hadith were given an esotoric meaning to establish this relation as foundations for mystical structure. The goal of Sufi Life was spiritual perfection and union with God.[১]

বিখ্যাত সুফী সাধক মনসুর হেল্লাজ — আনাল হক — 'আমিই সত্য'— এই "intemperate' utterance" ''অসহিষ্ণু বাক্য'' উচ্চারণেৰ জন্য খলিফার আদেশে নিহত হন[২]। ভারতেও নগ্ন সুফী শর্মাদ ঔরংজেবের আদেশে নিহত হন।[৩] খ্রীষ্ট্রিয় ধর্ম-সঙ্গীতে Songs of Solomon (সোলেমনের সঙ্গীত) এবং Bride of Christ খৃষ্টের বধূ একই অনুসঙ্গের প্রকাশ।

এমন কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতেও সুফী প্রভাব পড়েছে। ডাঃ এনামূল হকের মতে The inner most core of Vaisnabism was filled with Sufistic sentiments. Radha and Krishna, though originally Hindu, had been purified of gross elements and transformed into Asique and Masque তাঁর মতে মুসলিম সুফীদের গজ্জলিয়ত ও বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী প্রায় একই রকম। ''সুফীদের মই ও শর্ব বৈষ্ণবদের প্রেম ও প্রীতিতে রুপান্তরিত হইয়াছে, সুফীদের আশিক — রাধা মাশুক — কৃষ্ণ, হিজরণ — বিরহ, বিসলু — মিলন।[৪]

আগেই বলা হয়েছে শব্দগানে মারিফতী তত্ত্বের বিপুল প্রয়োগ হয়। এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম শব্দগানের তাত্ত্বিক ও শিল্পী সোলেমান সেখকে (জলঙ্গী)। সোলেমান খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন শব্দগান ওপরে শরিয়ত ভিতরে মারিফত। মারিফতি হচ্ছে জ্ঞান মার্গ। সুফি দর্শনে একে বলা হয় আইনুল একিন — আল্লাকে প্রত্যক্ষ জেনে উপাসনা করা। তিনি আরও বললেন ইসলামের অন্য তিন মার্গে ক্কালপ (হৃদয়) থাকে কাঁচের মত স্বচ্ছ। তাতে কোন আধ্যাত্মিক রশ্মির প্রতিফলন হয় না। কিন্তু মারিফতী সাধনায় সদ্‌গুরুর নির্দেশে এই ক্কালপের কাঁচে যেন পারা লাগান হয়। তখন ক্কালপে সমস্ত ঈশ্বর বিভূতি প্রতিফলিত হয়। এ যেন একটা অয়না। তখন সেই সাধক হবে দিদারে ইলাহী আল্লার প্রিয়। এই বলে গান ধরলেন লালন শাহের গান —

বাড়ীর কাছে আরশিনগর। তাতে এক পড়শী বসত করে। চিনেও চিনলাম না তারে।

শব্দগানের আরেক শিল্পী এবং তাত্ত্বিক হচ্ছেন আজমত সেখ (হোগোলবেড়িয়া, নদীয়া)। সোলেমান এবং আজমত দুজনকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম শব্দগানের উৎস, সৃষ্টি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে। সোলেমান বললেন, এই শব্দ মহান আল্লার সৃষ্টি। পবিত্র কোরানের বাণী উদ্ধৃত করে বললেন, আল্লার আদেশ হল কুন হোয়ে যাক, সৃষ্টি হোক। তাই মহান আল্লার প্রথম সৃষ্টি নূর জ্যোতি, আলো। তারপরে সৃষ্টি হল বিশ্বজগৎ, প্রাণী এবং প্রথম মানুষ আদম। ফিরিস্তা জীবের কানে 'রুহু' ফুঁকে দিলেন। সেই রুহু হল প্রাণ। শব্দ উচ্চারণ সব প্রাণী করতে পারে কিন্তু শব্দের মাধ্যমে ভাষার সৃষ্টি করতে পারে মানুষ। তাই যে-গানের শব্দের মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লার এবাদৎ করতে পারে সেই হল শব্দগান।

আজমত সেখ বৈদিক সাহিত্যের নজির দিয়ে বললেন উপনিষদে বলেছে শব্দই ব্রহ্ম। ষড় বেদাঙ্গের প্রথমেই আসে শব্দ তারপরে কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ। বৈদিক ধ্বনির

আদি ধ্বনি ওম — যা হচ্ছে অ+ উ+ম এই তিন ধ্বনি যোগে সৃষ্টি। অ হচ্ছে ব্রহ্মা উ হচ্ছে বিষ্ণু এবং ম হচ্ছে শিব। এই ওম ধ্বনির মধ্যেই আছে সৃষ্টি পালন ও লয়ের বীজ। শূদ্র ও স্ত্রী লোকের পক্ষে ওম উচ্চারণ নিষিদ্ধ। তাই ওম এর মত এই শব্দগান — যা আল্লার কালামকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। ইতিহাসের বিচারে এই ব্যাখ্যা অবশ্যই কষ্ট-কল্পিত তবু এর মধ্যে একটা সমন্বয়ী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

এর পরে আসে শব্দগানের ফর্ম আর কনটেন্ট এর বিষয়। ফর্ম বা গানের দিক থেকে এটা অনেকটা কবিগান বা তরজার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু কনটেন্ট বা বিষয়গত দিক থেকে কিছুটা আলাদা। কবি গানের মতই এতে দুটো পক্ষ থাকে, একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পাল্লা হয় এবং সেই শুধু ধর্ম নয় ধর্মের সঙ্গে সংপৃক্ত নয় এমন বিষয়ও গানের মধ্যে চলে আসে। শব্দগানে থাকে মূল গায়েন একজন এবং দুজন বা চারজন দোহার। যন্ত্র একতারা বা দোতারা, খোল এবং খমক। গায়কের পরনে থাকে সাদা লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী। মাথায় কোন টুপি থাকে না। একটা আশ্চর্যের বিষয় — সোলেমান সেখ, আজমত সেখ, নজরুল সেখ সবাই মুসলমান — একমাত্র ব্যতিক্রম খোল বাজিয়ে মহানন্দ দাস। সে একজন কণ্ঠিধারী নৈষ্টিক বোষ্টম। শব্দগানে পাল্লা হয় অনেক বিষয় নিয়ে যেমন শরিয়ত মারিফত, নারী-পুরুষ, জাতপাত, কামপ্রেম, মা-ছেলে। লৌকিক পালাগানের মত এখানেও থাকে, আল্লা বন্দনা, মুর্শিদ বা গুরু বন্দনা, আসর বন্দনা এই সব।

এই রকম একটা আসরে উপস্থিত ছিলাম ভাদুরিয়াপাড়া গ্রামে। অংশ নিয়েছিলেন সোলেমান সেখ আর রাহেলা বিবি। রাহেলা বিবি বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার শিল্পী, বিষয় ছিল শরিয়ত বনাম মারিফত। শরিয়ত পক্ষে সোলেমান আল্লা বন্দনা ও আসর বন্দনা করার পর গান ধরলেন পবিত্র কোরানের প্রথম বাক্য আলিফ লাম মিম দিয়ে — যার অর্থ আল্লাহ আলম-আল্লা জানেন। এই গান প্রসঙ্গে ইসলামি তৌহিদ, শরা, সুন্না, নামাজ সবই আলোচনা হল গানের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে এলো আল্লার প্রতিস্পর্ধী সাদ্দাতের কথা, অত্যাচারী ফেরাউন নমরুদের কথা। মহান আল্লার প্রতিস্পর্ধী হয়ে সাদ্দাত তৈরী করেছিল অষ্টম জান্নাত — জান্নাত ফিরদৌস। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস — যখন সাদ্দাত সেই ফিরদৌসে ঢুকতে যাচ্ছে — এক পা ভেতরে আর এক বাইরে সেই সময়ই তার মউৎ (মৃত্যু) এসে গেল। সোলেমান গান করলেন ফিরিস্তা জিব্রাইলের চোখে দুবার জল দেখা গিয়েছিল; একবার সাদ্দাতের জন্মের সময় আর একবার তার মৃত্যুর সময়। শিল্পী যখন এই ট্র্যাজেডির কথা অপূর্ব গায়নে বিশ্লেষণ করছিলেন অনেকেই চোখের জল সামলাতে পারে নি। আসর শেষ করলেন নবিয়ুতের গান দিয়ে।

অন্ধকারের আলো নবীর নূরে ছিল
নিরাকারে সে নূর জলেতে ভাসিল।
সেই নূরে সংসার, কুদরতি মৌলারে
সারা আলম তৈরী হল মোহাম্মদী নূরে।
আপে আল্লা নিরঞ্জন, আপনার খাস জবান
কোরাণ বখশিশ করলেন দিনের নবীরে।
কোরানের কলম করিতে বিতরণ
আসিলেন নূরতন মক্কা নগরে।

প্রত্যুত্তরে রাহেলা বিবি ধরলেন মুরশিদি গান। প্রথমেই বন্দনা।

দয়াল গুরু সাঁই। তোমা বিনা আমার গতি নাই। কারণ এই মুর্শিদের দয়াতেই সে পাবে সত্য

পথের নিশানা। শিল্পী বললেন হায়াতুল মোর সালিন — নবী চারযুগে জীবিত। তার মুর্শিদই হচ্ছে নায়েব ই নবী — নবীর প্রতিনিধি। কোরানের প্রথম বাণীকে ভেঙে তিনি গান ধরলেন

লামের ওপর আলেফ খাড়া মিমের কোন নোকতা নাই
মরিফতের মিম ধরিয়ে এক তরিকা জানা চাই।
আলেফ গেল নূরে ধরা, মিমের সাথে নাই মাজেরা
ফাঁকে পড়ে আলেফ খাড়া লাম ধরা তার আছে বাই।

পদকর্তা কে রাহেলা বিবি বা অন্য কোন শিল্পী আমাকে বলতে পারেননি। এখানে আলেফ আল্লা, মিম হজরত এবং লাম কুদরত বা আদম। নোকতা-অক্ষরের ফোঁটা মাজেরা (যোগ)। শব্দগানের শিল্পীরা আসর বুঝে এসব গান করেন কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে মারিফতী বা ফকিরি তত্ত্বে এ সব গানের অর্থ শরিয়তী বিশ্বাসের এতই বিপ্রতীপ হয় যেটা যথেষ্ট দুরূহ এমনকি ঝুঁকির ব্যাপার ঃ

আর একটা শব্দগানের আসরে পাল্লা দিল কাম, প্রেম, বিচার। গোপালপুরে আসর বসেছিল। কাম প্রসঙ্গে শব্দগান শিল্পী গান ধরলেন ঃ

বাঁকা নদীর বাঁকে দিন দুপুরে জোয়ার আসে
ডাঙ্গা ডহর যায় যে ভেসে বিদঘুটে বন্যা এসে
নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে বিদ্যাবুদ্ধি রয়না ঘটে
কাম নামে কুমীর ছুটে চিবিয়ে চুষে খায় তারে।

শিল্পী হলেন বাংলাদেশ (কুষ্টিয়া) থেকে আগত রহমত আলি। প্রেমের পাল্লা ধরলেন নজরুল ঃ

প্রেমের মরা জলে ডুবে না
যে প্রেম করতে দুদিন ডাকতে দুদিন এমন প্রেম আর করোনা।
চন্ডিদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমনি
তারা এক মরণে দুজন মরে এমন মরা কজন মরে।
কাম রতিতে যার সাধনা তার হবে না উপাসনা
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না ব্রজ গোপীর ভাব বিনে।

একজন শব্দগানের শিল্পী আসরে গান করলে গুরু এবং গোপীজনের অনুসঙ্গে। মুসলমান শ্রোতারা মুসলিম মিথের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মিথকে স্বীকার করল কোন প্রশ্ন না তুলে।

আর একটা শব্দগানের আসরে শুনলাম ফানা ফিল্লা তত্ত্বর গান।

নয় দরজায় মার তালা এক দরজা রাখো খোলা
সেই দরজায় মেলে রূপের চাবি ফণা ফিল্লার দেশে যাবি।

সাদের আলি (শ্যামপুর, ডোমকল) গান ধরলেন ঃ

এই দুনিয়া ফানা ফিল্লা দেখতে লাগে পরিপাটি।
দুদিন পরে এই দুনিয়া হয়ে যাবে মাটি।
খাকে আদম পয়দা করি নূর দিল তার হৃদয় পাটি
খাকেতে বানায়ে তন তাহে ছাপে নিরঞ্জন
তিন দিকেতে ত্রিকোণ দেখনারে মন নয়ন খাঁটি।
দমে নামে ফুল ফুটায়ে ত্রিবেনীর ঘাটে যেয়ে
আঘাটাতে ঘাট বসায়ে সদা তার নামে দরগা আঁটি।

এই গানে যে ফানা ফিল্লা বলা হয়েছে তার অর্থ জীবন্তে মরণ। এটা সুফী সাধনার উচ্চতম প্রকাশ। এই সাধনায় অহম লোপ হয়। সুফী তত্ত্ব ছাড়াও এই গানে আছে তান্ত্রিক যোগ সাধনা (ত্রিবেনী — ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না) মুসলিমি ফরজ (নামাজ, অজু — অজু কর চিনে পানি, নামাজ পর নূরের হাটি) ফকিরি তত্ত্ব খাকা (মাটি) দম (বায়ু — প্রাণ, অপান সমান ব্যান উদান — যোগ সাধনা) ত্রিকোণ (স্ত্রী চিহ্ন) ফুল ফুটান (জন্ম রহস্য)। দেখা যাচ্ছে এই গানে হিন্দু মিথ, মুসলমান ফরজ, তান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সুফী সাধনা — সবই এক হয়ে একটা সামগ্রিক রূপ ধরেছে যা এই অঞ্চলের গ্রাম বাংলার সামাজিক মানসিকতার পরিমন্ডলে এখনও ক্রিয়াশীল।

শব্দগানের শিল্পী গান করেন ঃ

গোপন রয়েছে খোদা তারে চিন নি
আপে গোপন রয়েছে কাদের সোভহানি।
আরশ গোপন, কুরশি গোপন, লোওহ গোপন কলম গোপন
কাম গোপন, প্রেম গোপন, নিত্যলীলা সবই গোপন
আরশে আল্লা গোপন পীরের নিশানি।
জলেতে মীন গোপন, ঝিনুকে মতি গোপন,
ফুলেতে গন্ধ গোপন, আপে রব্বানি।
হায়াৎ গোপন, মোউৎ গোপন, রেজেক দৌলত সবই গোপন
নামাজে মারফত গোপন তাই জান নি।

(আরশ — আল্লার আসন, লোওহ — আরশের একটা অংশ যেখানে সমস্ত সৃষ্টি হেপাজতে থাকে, হায়াৎ — জীবন, মউৎ — মৃত্যু, রেজক — রুজি, দৌলত — সম্পদ)

কিন্তু গুরুকৃপা ছাড়া এই গোপন পথ খুলবে না। তাই শিল্পী বলেন —

আমি এসব দেখি কানার হাট বাজার
এক কানা দারোগাবাবু আর এক কানা মন আমার (লালন শাহ্)

এই শব্দগানে অপূর্ব সব চিত্রকল্প (ইমেজারি) রূপকল্প, প্রতীক, রূপক ব্যবহার হয়। এই রূপক ও চিত্রকল্প সবই ফকিরি অনুসঙ্গ বহন করে। তাই এই শব্দগানের নাম ভাবগান বা ফকিরান্তি। চারচীজে দেহ তৈরী — আব, আতস, খাকবাদ-জল, আগুন, মাটি, বাতাস — দেহের আছে চারখুটি হাড়-হাড্ডি-মণি-মগজ — অস্থি, মজ্জা বা শোনিত, শুক্র এবং মস্তিষ্ক, দেহের মাপ চৌদ্দ পোয়া অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত, দেহে আছে নয় দরজা-চার কুঠরি। রজে, বীজে শোনিতে মজ্জাতে যে দেহ তৈরী হয়েছে তার বিচিত্র রসায়নে আছে আলো, হাওয়া, আগুন মাটির উপাদান। রূপকের ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে এই সমস্ত গানে। মাটি, বীজ, কর্ষণ, বর্ষণ, কাম, প্রেম; জীবন মৃত্যু, নদী, জোয়ার, ভাটা — এসব বারে বারে এসেছে গানের অনুষঙ্গে। আধুনিক জীবনের অনুষঙ্গ পাওয়া যায় এই রকম একটা গানে ঃ

কি আজব কলের বিল্ডিং গড়েছে বাড়িওয়ালা —

পাওয়ার হাউস নাভিমূলে / সেখানে অগ্নিতুলে। দুই দিকে দুই পাখা চলে / নাসিকায় তার খেলা। / ইলেকটিরি দুইটা বাতি করাছে উজালা। / চূড়ায় তার তাজুল্লি চিন — সহজে চলে বিল্ডিং। / হইলে রাত্রি মর্নিং সূর্য হয় উজালা।

গানের পদটি হালিমের লেখা। দিয়েছে জলঙ্গীর সব্জী বিক্রেতা কালাম। আজকে গ্রামীণ মানুষের কাছে বিল্ডিং পাওয়ার হাউস বা ইলেকটিরি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। চলতি কথায় ইংরিজির মিশাল এও খুব স্বাভাবিক।

একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি এই গানগুলোকে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষঙ্গ, রিচুয়াল (ritual) তত্ত্ব, দর্শন এই সব বিমূর্ত (abstract) দৃষ্টিতে বিচার করেন তাহলে কিছুটা বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। এই গানের পদগুলো তৈরী করেছেন — লালন, দুদু, পানজু জালাল, হালিম, এমন কি যাদুবিন্দু বা কুবির সরকার।[৫]

স্বতঃই গানগুলোর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পদকর্তা এবং শিল্পীদের সামাজিক পরিবেশ (Social milieu) এবং আর্থ সামাজিক অবস্থান বিচার করতে হবে। এই সঙ্গে একটা প্রশ্ন মনে আসে, কেন এই শব্দগানের সৃষ্টি ও বিকাশ মুর্শিদাবাদের পূর্বাঞ্চল, নদীয়ার করিমপুর, তেহট্ট, বেতাই — এই বিশেষ ভূগোলে সীমাবদ্ধ। কেন এই অপূর্ব মানবিকতা সম্পন্ন গান পশ্চিম বাংলার অন্যত্র দেখা যায় না।

মার্কসবাদী বিচার বিশ্লেষণে যে কোন সাংস্কৃতির ও নান্দনিক আন্দোলনে শ্রেণীগত ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। মুর্শিদাবাদের যে ভূ-বিভাগ ভৈরব ও পদ্মার মধ্যে অবস্থিত, সেই বাগড়ী বা ব্যাঘ্রতটি মন্ডলে এই গানের বিকাশ। হরিহরপাড়া, নওদা, রাজসাহী, কুষ্টিয়াতে (বাংলাদেশেও) এই গানের প্রচলন খুব বেশি। অথচ সেই তুলনায় জেলার পশ্চিম অঞ্চল, বীরভূম এই গানের আওতার বাইরে থেকে গিয়েছে।

ভূ-প্রকৃতি, জনবিন্যাস, উৎপাদনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই পূর্বাঞ্চলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। পদ্মা ও ভৈরবের পলিমাটিতে তৈরী এই ভূ-বিভাগ রাঢ় অঞ্চলের তুলনায় নবীনতর। এখানকার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হানাফি মুসলমান সম্প্রদাভুক্ত। এদের মধ্যে পীর, মুর্শিদ বা সাঁই -এর প্রভাব বেশি। এছাড়া আছে দর্গা বা মাজার পূজা, শিরনি দেওয়া এই সব ধর্মীয় রিচ্যুয়াল এবং তাবিজ কবচ, দোয়াপড়া ইত্যাদি লোক বিশ্বাস। জীবিকা বিন্যাসের ক্ষেত্রে এদের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী — হয় সম্পন্ন গৃহস্থ, না হয় প্রান্তিক চাষী কিম্বা খেত মজুর। এছাড়া বৃত্তি নির্ভর কলু, জোলা, নিকিরি, মাইফরাস, মহলদার, মুসলমান, চাঁই, বেদে, আবদাল এরাও সংখ্যায় বেশি। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সকলেই আতরাফ বা অর্জিল (নিম্ন) শ্রেণীর লোক। মুর্শিদাবাদের এই অঞ্চলে ভূমি বা বৃত্তি নির্ভর অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় — 'আশরাফ' নাই বললেই চলে। আশরাফ আতরাফ বিভেদ শুধু জন্মসূত্রেই নয় জীবিকা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। তাই ধর্মীয় বিধানে সমতা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক অবস্থানে ছিল দুস্তর প্রভেদ।

এই বিশেষ ভূ-প্রকৃতি, জনবিন্যাস ও আর্থসামাজিক পটভূমিতে গড়ে ওঠা জনমানস স্বাভাবিকভাবেই ব্রাত্য পর্যায়ভুক্ত। মুর্শিদাবাদের নগর সভ্যতা ও খানদান, জগৎ শেঠের অমেয় বিত্ত, বন্দর কাশিমবাজারের সম্পদ ও ষড়যন্ত্র, ফতে সিং পরগণার ভূস্বামীদের বিপুল প্রতাপ — এসবের আওতয়ার বাইরে নদী, বিল, হাওর ঘেরা দুর্গম অঞ্চলে একটা প্রতিবাদী জীবন বোধের উন্মেষ হয়। লালন ফকির (মৃত্যু ১৮৯১, একশো পাঁচ বছর বয়সে)। বেশরা, সুফী, সিদ্ধ পীর এই সব ব্রাত্য লোকদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সতীমা, সাহেবধনী, কর্ত্তাভজা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রভাব। এইসব ব্রাত্যজনেরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত ছিল। শব্দগান বা ফকিরাত্তি এই প্রতিবাদী মানসিকতার ফসল। খেয়াল রাখতে হবে ইসলাম ধর্মের মতো একটা নিয়মনিষ্ঠ, অনুশাসনবদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া সহজ ব্যাপার ছিলনা। সঙ্গে সঙ্গে আচার সর্বস্ব, ছুৎমার্গ সম্পন্ন উচ্চ-কোটির হিন্দু জীবনও এই সব ব্রাত্যধর্মীদের আরও প্রতিবাদী করেছিল। এই অনুশাসন, নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল বেশরা, সুফী, পীর ফকির এবং গৌণ হিন্দু লৌকিক সম্প্রদায়ের প্রভাবের ফলে।

এই ব্রাত্যজনেরা, ফকিররা বিদ্রোহী হয়েছে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। ফকির বিদ্রোহের নায়ক মজনুশার কথা এই অঞ্চলের কাহিনীর আসরে শুনতে পাওয়া যায় — এখনও গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় ফকির বিদ্রোহের শ্লোগান — আল্লার মাটি আল্লার পাটি খাজনা দিব কাকে।

মুর্শিদাবাদের ধর্মীয় ও লোক সংস্কৃতিতে শব্দগান একটা অমূল্য সম্পদ। প্রবহমান লোক জীবনের নানা সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এই গান একটা পরিপূর্ণ জীবনবোধ তৈরী করেছে। এই জীবনবোধে যুক্ত হয়েছে ইসলামী তত্ত্ব, সুফী তত্ত্ব, তান্ত্রিক প্রক্রিয়া, গুপ্ত ধর্মাচার এবং গুরুভক্তি; অবশ্যই এই গুরু অপ্রাতিষ্ঠানিক। ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে এই গান মানুষের জয়গান করে। এই গানে স্পর্ধিত ঘোষণা "আদমে করিলে সেজদা — আলেক জন সেই তো পায়।"

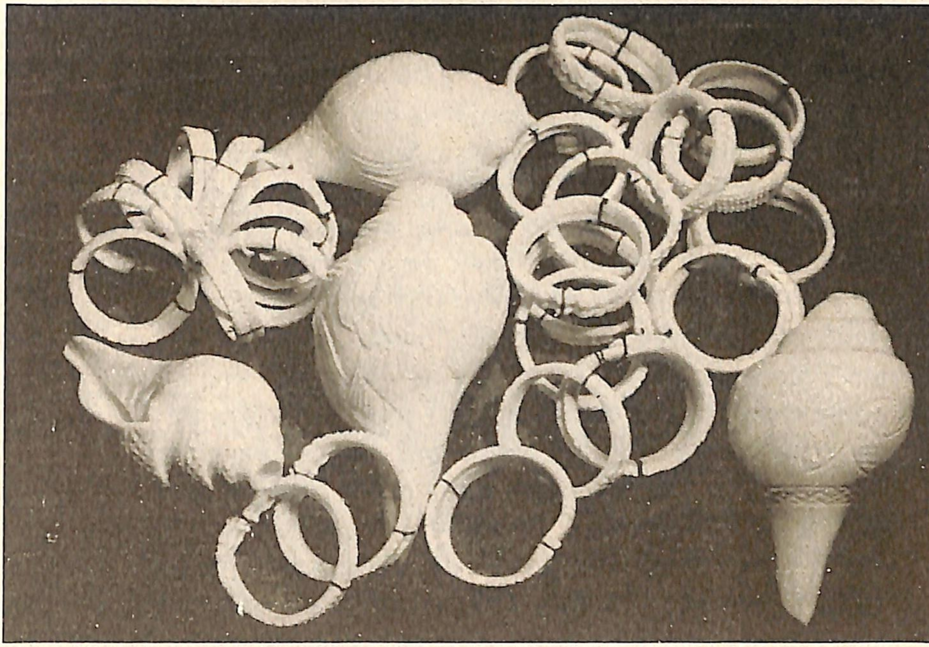
বিচিত্র মানুষ এসেছে এই শব্দগানের শিল্পী হয়ে। সোলেমান সেখ — বাড়ী জলঙ্গী, মোটামুটি গেরস্ত — শব্দগানের আসরে একশ কুড়ি থেকে দেড়শ টাকা পান। আজমত সেখ — বাড়ী হোগোলবেড়িয়া — মোটামুটি গেরস্ত — শব্দগানের আসরে একশ কুড়ি দেড়শ টাকা পান। নজরুল ইসলাম — বাড়ী টিকরবেড়িয়া। সবচেয়ে আশ্চর্য এক শিল্পীর পরিচয় পেলাম শ্যামপুরে (ডোমকল)। পেশায় ঘরামি, অত্যন্ত দুঃস্থ। তবু মনের আনন্দে গান করেন। মাইনুদ্দিন প্রাথমিক শিক্ষক, নজরুল ইসলাম পেশায় দরজি। শ্রোতারাও একেবারে নীচের তলার মুনিষখাটা মানুষ। শিক্ষিত সম্পন্ন মুসলমানরা একে বেশরা গান বলে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। এই গানের আসরে মুসলিম মহিলাদের সংখ্যাও লক্ষ্য করার মত, কারণ এই অঞ্চলে আতরাফ মানুষের মধ্যে পর্দা প্রথা অত কঠোর নয়। আসরে বড় গাইয়ে দক্ষিণা পান দেড়শ টাকা মত, ছোট গাইয়ে পঞ্চাশ টাকা আর খোল বাজিয়ে ষাট-সত্তর টাকা।

আলকাপ, লেটো, বোলান, পানসেটের মত শব্দগানও হারিয়ে যাচ্ছে। এ গান হারিয়ে গেলে জেলার লোক সংস্কৃতিতে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হবে।

<u>নির্দেশিকাঃ</u>

১। Chember's Encyclopedia Under Sufi.
২। Opeit– Under Sufi.
৩। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা — ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ: ৩১
৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — অসিত বন্দোপাধ্যায়, পৃ: ৬৮৮
৫। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা — ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ: ২৬

এছাড়া অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান — বইটার সাহায্য নিয়েছি।
মুসলিম তত্ত্ব বিষয়ে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন আমাদের বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষক — মৌলভী গোলাম মোস্তাফা ও আমাদের গ্রামের যমসের পীর।
অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝাঁ ও অধ্যাপক আবুল হাসনাত এরাও আমাকে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সাহায্য করেছেন। গানগুলো সংগ্রহ করেছি নানা শব্দগানের আসর থেকে। সোলেমান সেখ, আজমত সেখ ও সাদের আলি আমাকে অনেক পদ দিয়ে সাহায্য করেছেন।



শঙ্খ শিল্প

অংশুমান রায়

কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে ঘরের বারান্দায় বসে শিল্পীর ধৈর্য ও অসামান্য দক্ষতায় যে শিল্পকর্ম ললনার অলঙ্কারে পরিণত হচ্ছে তা শঙ্খ শিল্প। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই শিল্পের প্রধান ঘরাণা ডোমকল থানার জিতপুর গ্রাম। বর্তমানে জিতপুর ছাড়াও ডোমকল থানার বাজিতপুর, ভরতপুরের আমলাই গ্রামের বহু মানুষ এই শিল্পকে একমাত্র জীবিকা করে বেঁচে আছেন।

জিতপুর গ্রাম ডোমকল থানার অন্তর্গত হলেও যোগাযোগের দিক থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন আট হাজার জনবসতিপূর্ণ এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটি। বহরমপুর থেকে হরিহরপাড়া হয়ে আমতলা অভিমুখে গঙ্গাধরী ঘাটে নেমে ভৈরব নদী পার হলেই জিতপুর। বর্ষায় এক হাঁটু জল ভেঙে নৌকোয় উঠতে হয়। গঙ্গাধরী ঘাট পর্যন্ত যেতে হলে বাস ছাড়াও ট্রেকার ভরসা। প্রধানত হিন্দু মহিলারাই শাঁখা ব্যবহার করে থাকেন। তবে আলোকপ্রাপ্তা নারীরা এই মঙ্গলচিহ্নগুলি বর্জন করছেন। অন্যদিকে মুসলিম প্রধান এই জেলায় অনেক মুসলিম মহিলা শাঁখাকে অলংঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করছেন।

এই শিল্প বাণিজ্যের উৎস ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

শাঁখা প্রধানত হিন্দু বিবাহিতা মেয়েরা মঙ্গলচিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেন। হিন্দুমতে যে নারীর স্বামী বেঁচে আছেন, তাকে সিঁদুর, আলতা, লোহা, টিপ প্রভৃতির মত শাঁখাও পরতে হয়। পুরুষ

শাসিত সমাজে নারীর উপর অধিকার, বিবাহিতা নারীও যে তার স্বামীর আর পাঁচটা সম্পত্তির মতই এটি বোঝাবার নিদর্শন শাঁখা সিঁদুর। এগুলি পড়লে বোঝা যায় ওই নারীর স্বামী বেঁচে আছেন। এই 'মাঙ্গলিক' চিহ্নগুলি প্রাচীন আর্যদের শাস্ত্রে কোনওটাই ছিল না। প্রাচীনকালে আর্য বিবাহে কন্যা সাদা কাপড় পড়ত, গোরোচনা দিয়ে পাড়ে হংসমিথুন আঁকা থাকত, গয়না বেশিরভাগই ফুলের হত। এখনও গুজরাটে বিয়ের পোষাক সাদা এবং অলংকার সব ফুলের। লাল রঙের মাঙ্গলিক অনুষঙ্গ চীন এবং পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেই ব্যাপ্ত। আর্য সভ্যতার প্রথম বিস্তার ঘটে সরস্বতী দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ব্রহ্মাবর্তে, সেটা উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সমুদ্র থেকে অনেক দূরে, কাজেই ওই অঞ্চলে শাঁখাও ছিল না। শাঁখা ভাঙা অমঙ্গলের। মা-ঠাকমাদের দেখেছি বাড়িতে শাঁখারিরা এসে শাঁখা পরিয়ে যেতেন। যে শাঁখারিরা শাঁখা পড়াতে আসতেন তাদের বিশেষ সন্মান দেওয়া হতো। ভক্তি সহ শাঁখা পরেন। শাঁখা খুব সাদা, এবং ভঙ্গুর হওয়ায় শাঁখা খুব যত্ন করে ব্যবহার করতে হয়। সামান্য চাপেই ভেঙে যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় নারীকে ধীর, সংযত করে রাখবার জন্যই এর প্রচলন করা হয়েছে।

জিতপুর গ্রামে প্রায় চারশো বছরের পুরানো এই শিল্প। শঙ্খ শিল্প আসার আগে এই গ্রামের প্রধান জীবিকা ছিল মাটির কাজ। জিতপুরে শাঁখা শিল্পের প্রচলন হয় তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও অনুমান করা যায় ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন পেশার কারু শিল্পীরা মুর্শিদাবাদে আসেন এবং কালক্রমে স্থায়ী বসতি করেন। ঢাকা বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী। ভৈরব নদীপথেই যাতায়াত ছিল ঢাকার সঙ্গে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ডোমকলের বাজিতপুরে শংখ শিল্প গড়ে উঠেছিল শিয়ালমারা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এই গ্রামে প্রায় দেড় হাজার পরিবার এই শিল্পের সাথে যুক্ত। ভরতপুরের আমলাই গ্রামের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি পরিবার ছাড়াও জঙ্গিপুর মহকুমার ছাপঘাটিতে কিছু পরিবার শাঁখা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

জিতপুর গ্রামের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ এই শিল্পের সাথে যুক্ত। কিছু উত্থান পতন হলেও জিতপুরের গ্রামবাসীরা শাঁখাকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কেননা অন্য কোনও ব্যবসায় গেলে অল্প পরিমান পুঁজিও লাগে কিন্তু শাঁখার কাজ জানা থাকলে কোনও ইনভেস্ট ছাড়াই শ্রমিক হিসাবে কিছু উপার্জন করা যায়। একজন সবল পুরুষ অনায়াসে কোনও পুঁজি না খাটিয়ে মাসে দেড় থেকে দু'হাজার টাকা উপার্জন করতে পারেন। শঙ্খের কোনও অংশই ফেলা যায় না। শঙ্খের কুঁচি থেকে চুন তৈরি হয়। যে চুন দিয়ে আমরা পান খাই বা অন্যান্য ব্যবহার করি। তাছাড়া শঙ্খের গুড়ো মুখে মাখার জন্যও মেয়েরা ব্যবহার করে। এতে নাকি মুখের কালো ত্বক পরিচর্যার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।


শাঁখের করাত

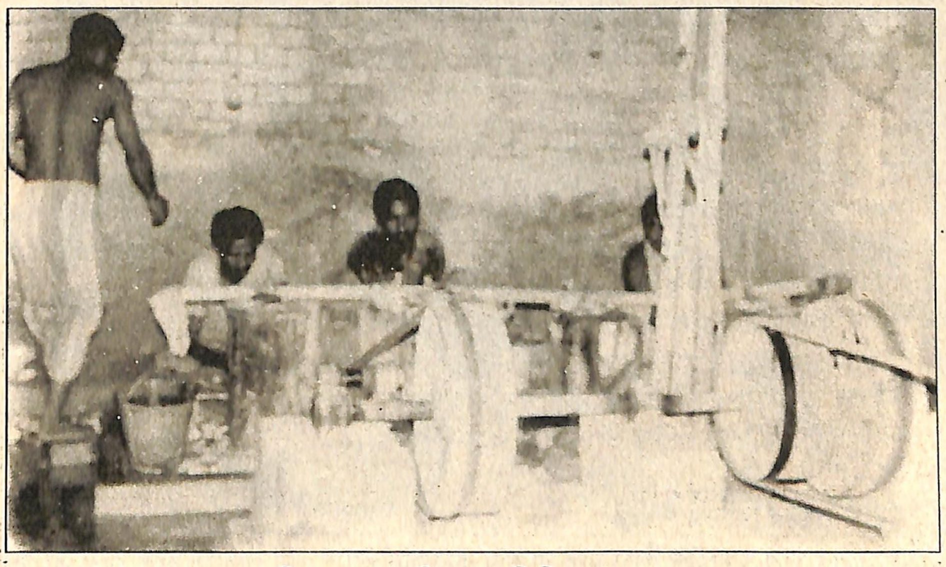
এই শিল্পের অতীত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জিতপুরে শঙ্খ শিল্প এসেছে ঢাকা থেকে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে সালে মুদ্রিত ঢাকার ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রতিবছর সমুদ্র উপকূল

থেকে প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ ঢাকায় আমদানী হতো; এবং ঢাকা থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার নানা শাঁখার দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হতো। প্রেমচাঁদ সুর ও দ্বারিকানাথ নাগের শাঁখার তৈরি দ্রব্য প্রসিদ্ধ ছিল। দেশ ভাগের আগে জিতপুর গ্রামের শাঁখার প্রধান বাজার ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু দেশভাগের পর সাময়িক কিছুদিন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের দিনহাটার বাজারে এখানকার শাঁখা যায়। তবে কাঁচা মালের অপরিমিত সরবরাহ সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে। কোলকাতার কোলুটোলা, বাগবাজার থেকে নির্দিষ্ট মহাজনরাই কাঁচামাল নিয়ে আসত। উল্লেখ ওই মহাজনদের ছাড়া কোলুটোলার বা বাগবাজারের আড়তদাররা অন্য কাউকেই এই মাল বিক্রি করত না। সাগর সুর, অলোক চন্দ্র সুর এরকম আড়তদার। বর্তমানে দিন বদলেছে। এখন যার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে সেই মহাজন। জ্ঞানরঞ্জন পাল, রমাকান্ত পাল, হিমসাগর পাল প্রমুখ দশ বারো জনের বেশি মহাজন ছিলেন না। অতীতে মহাজনদের কারিগরের মর্জির উপর নির্ভর করতে হতো। শাঁখের করাৎ দিয়ে কেটে এক জোড়া শাঁখা তৈরি করতে সময় লাগত প্রচুর। তাই কোনও অর্ডার নেবার আগে কারিগরের কাছে জেনে নিতে হতো কবে ডেলিভারি ডেট দেবেন। এখন মেশিন এসেছে। তাই মহাজনদের দিন বদলেছে। এখন আর তারা কারিগরদের উপর নির্ভর করেন না। কারিগররাই তাদের কথা মতো চলার চেষ্টা করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন মহাজনরা কারিগরদের অগ্রিম টাকাও দিয়ে রাখতেন।

এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা

জিতপুরের কোনও যুবক অন্য কোনও ব্যবসায় না গিয়ে শাঁখাকেই জীবিকা হিসেবেই নিয়েছেন এর কারণ, অন্য ব্যবসায় টাকার প্রয়োজন। শাঁখাই কোনও টাকা না হলেও রোজগার করা যায়।



এখন আধুনিক মোটর চালিত শংখশিল্পীরা ব্যবহার করছেন।

শাঁখার মহাজনদের কাছেই তারা কাজ করতে পারেন। মেশিন আসার ফলে উৎপাদন বেড়েছে। তবে কারো সর্বনাশ কারো পোষ মাস হয়েছে। আয় বেড়েছে মহাজনের। শিল্পীর কদর কমেছে। আগেই উল্লেখ করেছি এখন মহাজন ঘরে ঘরে। যে কেউ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে কাঁচা মাল বস্তাবন্দি করে নিয়ে আসছেন। তারা বাড়ির লোকজনদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তাতে তাদের আয় বাড়ছে, তুলনায় সহায়হীন যুবকদের রোজগার করবার সুযোগ কমে যাচ্ছে। তবে শঙ্খ শিল্পের স্বর্ণযুগে এই ব্যবসা করে অনেকেই কোটিপতি হয়েছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়।

সরকারি সাহায্য

সরকারি উদাসিন্যতা এ শিল্পকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ১৯৬৮ সালের আগে শঙ্খ শিল্পীদের নিয়ে কনসেন্স মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামে একটি সমবায় গড়ে উঠেছিল। অফিস ঘরটি এখনও জিতপুর গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। এই সোসাইটির মাধ্যমে সরকার কমমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করত। কিছুদিন আগে ডি আর ডি এ লোন ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছিল এখন ওসবের কোনও বালাই নায়। নব্বই বছর বয়স্ক প্রবীণ শিল্পী শঙ্কর পাল জানালেন পনেরো বছর বয়সে কাজ শুরু করেন ঢাকায়। তিনি কাথোলী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। বছর কুড়ি আগে কাজ ছেড়েছেন। তিনি কোনও সরকারি সাহায্য এ পর্যন্ত পাননি। দীর্ঘদিন কাজ করার পর শঙ্খ শিল্পীদের হাঁপানি রোগ দেখা যাচ্ছে। দুস্থ, রুগ্ন, শঙ্খ শিল্পীদের জন্য কোনও সরকারি সহায়তা নেই।

এই শিল্পে প্রয়োজনীয় উপাদান

শঙ্খ একটি শক্ত খোল বিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী। এই প্রাণীটিকে সমুদ্রের গভীর থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়। একজন শঙ্খ সংগ্রহকারী দিনে এক-দুটির বেশি শঙ্খ সংগ্রহ করতে পারেন না। বর্তমানে এর উৎপাদন বেশি হয় কন্যাকুমারিকা, শ্রীলঙ্কা, আন্দামানে। এমনকি অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানী করা হয়। কোলকাতার কোলুটোলা ও বাগবাজার মার্কেট পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বাজার যেখানে এগুলি পাওয়া যায়। একটি বস্তায় ৫০ টি, ২৫ টি, ১০ টিও থাকে। আগে এক বস্তায় ১০০ থেকে ১৫০টি শঙ্খ থাকত। তিতকুটি, কন্যাকুমারী, রামেশ্বরী, পাটি, পিনা, জি আর পি, দোআনী, শ্রীলঙ্কা, সালামত, ধলাশাখা এই গুলির মধ্যে সালামাৎ সব থেকে উৎকৃষ্ট। কন্যাকুমারী, তিতকুটিও পাওয়া যায় না। সমুদ্রেই মৃত অবস্থায় বছরের পর বছর পড়ে থাকা এই ধলাশাখা সব থেকে উৎকৃষ্ট। কথাই আছে শাঁখের করাৎ যেতেও কাটে আসতেও কাটে। সেই শাঁখের করাৎ দুই হাতে ধরে দু'পায়ে শঙ্খটাকে বিশেষ কায়দায় ধরে কাটা হতো। তবে শাঁখের করাতের দিন ফুরিয়েছে। এখন মেশিনের মাধ্যমে অনেক বেশি উৎপাদন বেড়েছে। জিতপুর, বাজিতপুর গ্রাম খুঁজে একটি করে মরচে ধরা শাঁখের করাৎ দেখতে পাওয়া গেল। মেশিনে ঘোরানো একটি চাকার মাধ্যমে শাঁখার ভেতর পালিশ করা হয়। আর নরুণের মতো একটি লৌহদণ্ড দিয়ে শাঁখার উপর কাজ করেন শিল্পীরা।

নির্মাণ পর্বের বিভিন্ন পর্যায়

মহাজনের ঘরে বস্তাবন্দি কাঁচা মাল বা শঙ্খ কারুকার্য পূর্ণ শাঁখায় পরিণত হতে বেশ কয়েকটি

পর্ব পার করতে হয়। যে শ্রমিকদ্বারা এই পর্বগুলি সম্পন্ন হয় সেগুলি ঃ কান্তাইদার— মাঝারদার— ঝাপাইদার— শাঁখচির— পেঠেল বা কারিগর।

কান্তাই দার ঃ বস্তাবন্দি কাঁচামাল বস্তা থেকে ঢেলে লেজের মতো অংশটি ভেঙে নোংরা পরিষ্কার যারা করেন তাদের বলা হয় কান্তাই দার।

মাঝারদার ঃ কান্তাইদার পরিষ্কার করে দেবার শঙ্খের লেজ বা নিচের দিক ভাঙার পর যে এবড়ো-খেবড়ো অংশ থাকে তাকে যিনি মসৃণ করেন তিনিই মাঝারদার। খুব দক্ষ লোক ছাড়া একাজ করেত পারেন না।

ঝাপাইদার ঃ নাথা কাটার পর মেশিনে মসৃণ করা হয়। যিনি এই কাজটি করেন তিনি ঝাপাইদার। সুধীন কুমার পাল এমন এক প্রবীণ ঝাপাইদার।

শাঁখচির ঃ মেশিনে মসৃণ করার পর মেশিনে যিনি চুরি বা শাঁখা বের করেন তিনি শাঁখচির। একটি বড় শঙ্খ থেকে ৫ থেকে ৬ জোড়া শাঁখা বেরোয়। দোছাই, তোরাখা, চাইপেটি, চোপাট, কাঠি, কোলকাঠি, ছালি প্রভৃতি এই জাতীয় চুরির নাম। প্রতি শঙ্খ থেকে দোছাই, চোপাট ও ছালি বেরোয়। এদের মধ্যে চোপাট উৎকৃষ্ট। চোপাট থেকে মোগরমুখ শাঁখা তৈরি হয়। গোপালচন্দ্র পাল এমন একজন প্রবীণ শাঁখচির।

পেঠেল বা কারিগর ঃ ওই শাঁখা গুলিকে যিনি মগরমুখ, সোনাপাতা, খানপিস, শংখপাতা, জলতরঙ্গ, দার্জিলিং নক্সা, কঙ্কন, মতিদানা, কাগজফুল নামক ডিজাইন করেন ধৈর্য ও অসামান্য দক্ষতায় তিনিই কারিগর। শঙ্খ শিল্পে যত শ্রমিক জড়িত তাদের প্রায় ৯৫ শতাংশই এই কারিগর। গ্রাইণ্ডার মেশিন আসার আগে চুরির ভেতরের অংশ ঘষে মসৃণ করার জন্য সলুইয়ের ব্যবহার করা হতো। দু-আড়াই ফুটের শক্ত এবং ১ থেকে দেড় ইঞ্চি ব্যাসের কাঠের দণ্ডের উপর গালা



শিল্পীরা নক্সা কাটার কাজ করছেন।

বেং পাথরের গুড়ো পেষ্ট করে মশৃণ করে সলুই তৈরি করা হয়। এখন গাইণ্ডার মেশিনের সাহায্যে ভেতর পরিষ্কার করা হয়। এই ডিজাইনের পর মহাজনের ঘরে ঘুণ ঝাড়াই হয় এবং পুটিংদারের হাত ঘুরে বাজারজাত করা হয়।

শ্রমিকের আয়

শঙ্খ শিল্পের কাজ প্রধানত পুরুষরাই করেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃস্থ পরিবারের মহিলারা বা স্বামী পরিত্যক্ত অসহায় মহিলারা কমশ্রমমূল্যে কিছু কাজ করে থাকেন। তবে জিতপুর গ্রামে এই মহিলার সংখ্যা খুব নগন্য, বাজিতপুরে জনা কুড়ি পঁচিশ মহিলা কাজ করে থাকেন, যদিও তারা বেশিরভাগই মুসলিম পরিবারের। তারা দিনে কুঁড়ি পঁচিশ টাকার বেশি উপার্জন করতে পারেন না।

প্রথমে আসা যাক কাস্তাইদারের কথায়। জিতপুর গ্রামে ২০ জন কাস্তাইদার আছেন। এই কাজে একজন কাস্তাইদার ৫০ পিসের বস্তার জন্য পান ২৫ টাকা, আবার ছোট শঙ্খের ক্ষেত্রে ৩৫ পিসের বস্তা পিছু পান ১০ টাকা। একজন কাস্তাইদার সিজিনে ২০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার কাজ করতে পারেন। তবে মাসে প্রতিদিন কাজ থাকে না।

মাঝারদার ঃ একজন মাঝারদার ১০০ টি শঙ্খ পিছু পান ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। এরা সিজনে দিনে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা রোজগার করতে পারেন। তবে এক সিজিনে ১০ থেকে ১২ দিনের বেশি কাজ পান না। জিতপুর গ্রামে মাঝারদার আছেন ২০ থেকে ২২ জন।

ঝাপাইদার ঃ কাজ থাকলে একজন ঝাপাইদার দিনে ৫০ টাকার কাজ পান। বর্তমানে এই গ্রামে জনা পনেরো ঝাপাইদার আছেন।

শাঁখচির ঃ একজন শাঁখচির দিনে ৮০০ থেকে ১০০০ পিস শাখা কাঁটতে পারেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য মেশিন আসার ফলে যারা পুরোনো তাদের কাজ কমে গেছে। এক্ষেত্রে যাদের একজনমাত্র মহাজন ধরা আছে তারা মাসে ২দিন কাজ পান। যারা একাধিক মহাজনের কাজ করেন তারা বেশি কাজ পান। এর পরেই আসে শিল্পীর কাজ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মগরমুখ শিল্পী সবথেকে ভাল শিল্পী। এছাড়া বাদ্য শঙ্খ শিল্পী ৮ থেকে ১০ জন আছেন। ডিজাইনের উপর দাম নির্ভর করে। ভাল ডিজাইন হলে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত দাম পান।

উৎপাদিত দ্রব্য ও তার মূল্য

কাঁচামালের দাম অত্যধিক বেড়ে গেছে। ২৫ টির বস্তার মূল্য '৭৫ সালে ছিল যেখানে ১২৫ টাকা, ২০০৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫০০০ টাকা। মগরমুখ শাঁখার বর্তমান দাম ১২৫ টাকা জোড়া।

তথ্য সূত্র ঃ

ঢাকার ইতিহাস — যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

এয়োতি এবং — সুকুমারী ভট্টাচার্য, ক্যাম্প প্রকাশনী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ গণকণ্ঠ, ইন্দ্রজিৎ কর্মকার (ভরতপুর), অক্ষয় বিশ্বাস, অঞ্জন পাল (জিতপুর), ত্রিদীপ পাল(জিতপুর), ভরত পাল (বাজিতপুর), শংকর পাল (বাজিতপুর), নারায়ণ চন্দ্র পাল (জিতপুর), মুকুল কুমার পাল (জিতপুর)।

মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্প ঃ অতীত-বর্তমান

এমদাদ উল হক

প্রাককথন

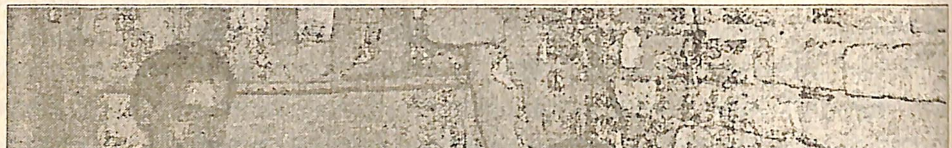
মুর্শিদাবাদ জেলার শিল্পের নাম খুঁজতে গেলে খুব একটা আশাপ্রদ উত্তর হয়ত আসবে না। একদা নবাব নাজিম, রাজা - মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব ঐতিহ্যবাহী শিল্প জেলায় বিকশিত হয়েছিল সে গুলির অধিকাংশই অবলুপ্ত বা মৃতপ্রায়। প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বা আধুনিকীকরনের অভাবে শিল্প গুলির দৈন্যদশা অতীব প্রকট। এ জেলার শিল্পগুলির অধিকাংশই ঘরানা ভিত্তিক। শিল্পগুলি যেহেতু শ্রম নিবিড় শিল্প নয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পীর ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর তার শৈল্পিক উৎকর্ষতা নির্ভর করে, সেই শিল্পীর উত্তর পুরুষ সেই শিল্পে আগ্রহী না হলে শিল্পটির শৈল্পিক ধারা অবলুপ্ত হয়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ শিল্পীরা নিজেদের অপত্য ছাড়া তাদের শৈল্পিক কৃৎকৌশল হস্তান্তরিত করতে চান না, ফলে নানাবিধ সমস্যা জনিত শিল্পের বেহাল দশা দেখে উত্তর পুরুষেরাও সেই সব শিল্পে আগ্রহী হচ্ছেন না। আর তাই মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের অনেক গুলির অবলুপ্তি হয়েছে এবং হতে চলেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঐ সব ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে কাঁসা শিল্প অন্যতম। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে মুকসুদাবাদ বা মুকসুসাবাদ নগরীর সূত্রপাতের ফলে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি বাড়ছিল। ফলস্বরূপ এই নগরীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প সম্ভারও গড়ে উঠেছিল। তাতে অষ্টাদশ শতকের প্রথমে ঢাকা থেকে সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি মুর্শিদাবাদ মুখীন হয়। অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে কাঁসা শিল্পেও এর প্রভাব পড়ে। ঢাকা ও নবাবগঞ্জের শিল্পীরা তখন খুব সুনামের সঙ্গে কাঁসার বাসন পত্রাদি তৈরি করতেন। তার কদরও ছিল সারা বাংলায় এবং অর্থনৈতিক বাজারও ছিল সুদূরপ্রসারী। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় মুর্শিদাবাদের বড়নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে কাঁসা শিল্পীরা ছোট ছোট কারখানা গড়ে তুলতে শুরু করে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন কাঁসার বাসন পত্রাদি বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করতে শুরু করে। বাংলায় বর্গীদের হানা মাঝে মাঝেই ঘটত। নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে বর্গীদের দফায় দফায় হানার ফলে বড়নগর ও ধননগর থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান খাগড়া, কান্দি, জঙ্গিপুর কাঁসারীপাড়া, পাঁচগ্রাম, জিয়াগঞ্জ এছাড়াও বীরভূমের টিকরবেতা, পাথরকুচী, নদীয়ার নবদ্বীপ, মুড়োগাছা, মাটিয়ারী, বর্ধমানের দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে বহু কাঁসা শিল্পী স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যেখানেই তারা বসবাস শুরু করেছেন সেখানেই তারা ছোট ছোট কারখানা চালু করে বাসন পত্রাদি তৈরি করতে শুরু করেছেন। যারা কাঁসা শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা মূলত কংসবণিক। বহরমপুর শহরে এত বেশি কাঁসা শিল্পী বসবাস করতেন যে, বর্তমান কল্পনা সিনেমার মোড় থেকে খাগড়া চৌরাস্তার মোড়

পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটি 'কাঁসারী বাজার' মৌজা নামে লিপিবদ্ধ হয়। এ ছাড়াও খাগড়ার কাঁসারী পট্টিতেও বহু কাঁসা শিল্পী বসবাস করতেন। ১৯৩০-৪০ সালে কাঁসারীবাজার ও কাঁসারীপট্টি মিলিয়ে প্রায় ১৫০ টি কারখানা ছিল, ১৯৪০-৪৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০ টিতে। প্রতিটি কারখানায় কাঁসার বাসনপত্রাদি ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি করতেন দক্ষ শিল্পীরা। শুধুমাত্র খাগড়ায় প্রায় এক হাজার মত কাঁসা শিল্পী ছিলেন। এদের শিল্পকলায় প্রস্তুত খাগড়ার কাঁসা শিল্প বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্প শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। মুর্শিদাবাদের কাঁসার তৈরি দ্রব্য ভারতের বাইরেও রপ্তানি হত। রপ্তানি যোগ্য শিল্পগুলির উল্লেখ করে ১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের (স্বাধীনতা পূর্ব) Authority of Deputy Controller General of Civil Supplies-এর Shoping Guide প্রকাশিত হয়। কাঁসা শিল্পের রপ্তানির জন্য খাগড়ার 'হীরালাল পাল এ্যাণ্ড সন্স, দোকানের নাম তাতে উল্লেখিত।

কাঁসা তৈরির উপকরণ ও পদ্ধতি

কাঁসা একটি মিশ্র ধাতু। তামা ও রাঙ বা টিনের সংমিশ্রণে হয় কাঁসা। ৭ ভাগ তামা ও ২ ভাগ রাঙ (৭৮:২২) আলাদা আলাদা ভাবে গলিয়ে মিশ্রণ করে হয় কাঁসা। কাঁসার বাসন তৈরি দুই ভাবে হয় (১) পেটানো (২) ঢালাই। কাঁসার দ্রব্য তৈরি করতে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। প্রথমে তামা ও রাঙকে আনুপাতিক হারে মুচিতে গলাতে হয় তাকে খুঁটি বা রোয়া বলা হয়। তারপর সেটাকে ২-৩ জন একযোগে পেটাই বা হেমার করে



(শিল্পীদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত যে, আশি পোড়া ঘা দিলে তবেই হবে কাঁসা)। গড়নদার কি দ্রব্য তৈরি হবে তার রূপ দেয় বা সেট করে একটি পিণ্ড তৈরি করে।

চাঁচনদার ঃ পুড়িয়ে কালো রঙের মিশ্র ধাতব পিণ্ডটি চাঁচতে বা ঘষতে থাকে চাঁচনদার। তার ফলে যে বাসনটি তৈরি হবে তার রূপ পায়।

টাননদার ঃ তৈরি হওয়া বাসনগুলো কুদের মাধ্যমে টাননদার পালিশ করে এবং তা বিক্রি বা ব্যবহার যোগ্য করে তোলে মূল শিল্পী।

ঢালাই কাঁসার ক্ষেত্রে এত পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে তামার হার বেশি থাকে, রাঙ বেশি ব্যবহার করা হয় না। মিশ্র গলানো বস্তুটি ছাঁচের মধ্যে ফেলে তা সরাসরি পালিশ করা হয়।

খাগড়ার কাঁসার উৎকর্ষ

খাগড়ার কাঁসার বিশেষ উৎকর্ষ হচ্ছে পেটানো কাঁসা। পেটানো কাঁসার দ্রব্যে কোনও খাদ ব্যবহার করা যায় না। জনশ্রুতি আছে যে, নবাব-জমিদার বাড়ির ব্যবহার্য বাসনে তামা-রাঙ ছাড়াও রুপোর সংমিশ্রণ থাকত, ফলে তা আরও শুভ্র বা চকচকে হত। কাঁসা শিল্পীদের কাছে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মতে পালিশ ভালোভাবে করলে কাঁসা ঝকঝকে হয় পরিশ্রম বেশি করতে হয় এবং খরচ তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়। পেটানো কাঁসার তৈরি বাসন পত্রে কোনও খাদ ব্যবহার না থাকায় তা স্বাস্থ্যপোযোগী, ঔজ্জ্বল্যও বেশি আর ক্ষয়ও হয় কম।

কাঁসার মান

পেটানো কাঁসার মানের কোনও হেরফের করা যায় না। অতীতের মানের কাঁসার সঙ্গে বর্তমানের তৈরি দ্রব্যের মান একই আছে। ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে তামার হার বেশি থাকার ফলে মানের হেরফের হয়।

কাঁসার তৈরি দ্রব্যের রকম

কাঁসার তৈরি জিনিসগুলি বিভিন্ন ধরণের হয় এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত।

থালা— বগি থালা, গ্যাস বগি থালা, চিলমারি থালা, দু'রোখা চিলমারি থালা, দেড়ি থালা প্রভৃতি।

বাটি — সাদা বাটি, গ্যাস বাটি, কামরাঙা বাটি, সেট বাটি, চন্দনী বাটি প্রভৃতি।

গ্লাস — তে-থাকি গ্লাস, জল সন্দেশ গ্লাস বা জামাই ঠকানো গ্লাস, টানা খুড়ো গ্লাস, টমলেট গ্লাস, জাহানকোষা গ্লাস, মৃদঙ্গ গ্লাস প্রভৃতি।

ঝিনুক— গ্যাস ঝিনুক, সাদা ঝিনুক প্রভৃতি।

ডিস— সাদা ডিস, এলোকেশী ডিস, জলতরঙ্গ ডিস, জোড়া ময়ূর ডিস, শঙ্খপদ্ম ডিস, পান ডিস, চিড়িতন ডিস, হরতন ডিস, গোলাপাতা ডিস, দুথাকি গোলাপাতা ডিস, শঙ্খ ডিস, মাছ ডিস প্রভৃতি।

নেমকদামী — ডিসের সব ধরণের ছোট আকারের নাম নেমকদানী।

অন্যান্য— পানের ডাব্বা, পিক দানী, কাঁসার গামলা, সরা প্রভৃতি।

কাঁসা শিল্পের প্রতিটি নামের এক একটি শৈল্পিক দিক আছে, প্রতিটি বাসন তৈরিতে একটা বিশেষ চিন্তাভাবনা, একটা শিল্পশৈলী পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন নামের মাধ্যমে। তাই এর ব্যবহারিক মূল্যের পাশাপাশি শিল্পগত মূল্য বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রাখে।

ব্যবহার

কাঁসার তৈরি জিনিসের ব্যবহার সব ক্ষেত্রেই হয়। পুজো-জন্ম-উপনয়ন-বিবাহ-মৃত্যু সহ বিভিন্ন পর্বেই কাঁসার বাসন পত্রাদির প্রচলন আছে। যেহেতু কাঁসার পুনর্বিক্রয় মূল্য আছে তাই গ্রামাঞ্চলে এটির চাহিদা আজও আছে।

শিল্পী কারিগরদের যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি মজুরি, কাঁচা মাল সরবরাহ ও বাজার।

মজুরী

৬০-৬৫ বৎসর আগে প্রতি সের কাঁসার দ্রব্য উৎপাদন করে শিল্পীরা মজুরি পেত ২ টাকা, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হতো ১২ টাকা সের দরে। ৪০-৫০ বৎসর আগে ৫ টাকা সের মজুরী ছিল ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হত ২০ টাকা সের দরে। একটি কারখানায় ৫ জন মিলে ৭-৮ সের বাসন তৈরি করতে পারত। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কম থাকায় অসুবিধা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

টেলি :—বিপিসিসি

টেলিফোন :—বড়বাজার ২৩০২ কলিকাতা

নং

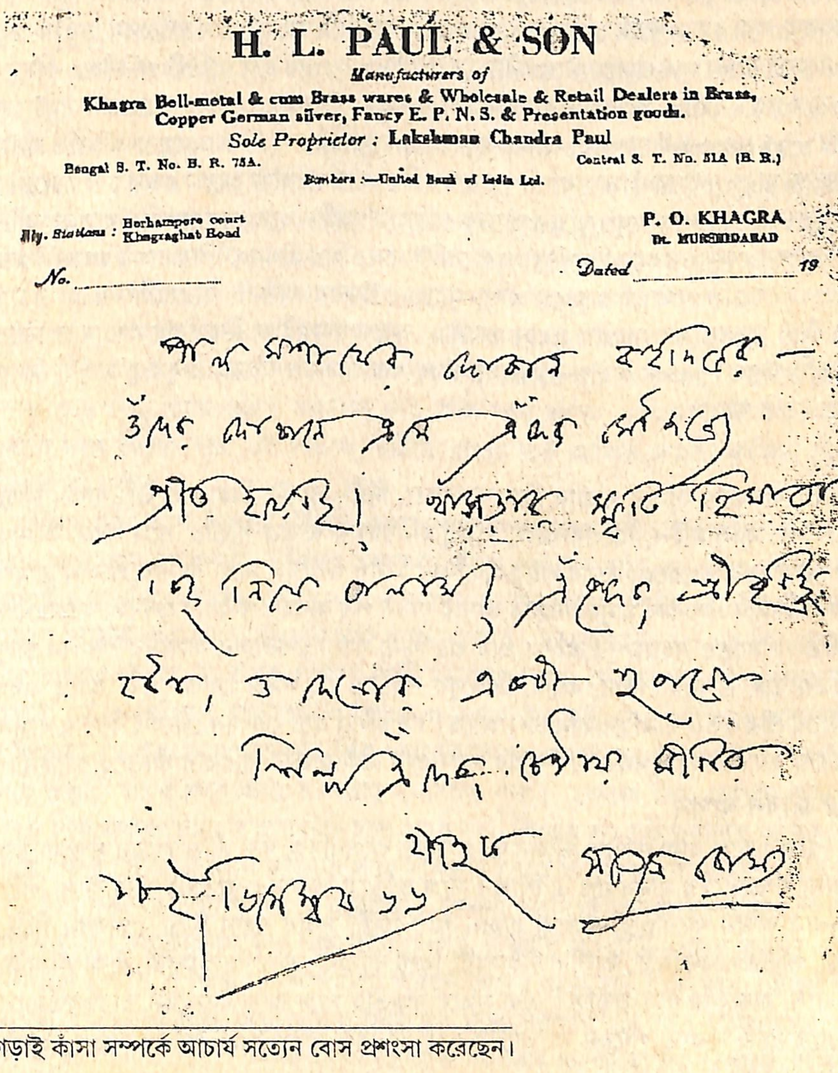
বহরমপুরে এসে প্রদেশের খাগড়াপাড়ায় অবস্থিত শ্রীযুক্ত হীরালাল পালের কাঁসার ও পিতলের বাসনের দোকান দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। জিনিসগুলি অতি সুন্দর। সর্বোপরি কাঁসার জিনিস এখানে সস্তায় ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। দোকানের সকলের ব্যবহার ভদ্র ও সরল। স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের [illegible] দোকানের প্রশংসা করিতেছি। দেশের এইরূপ দোকানের বিশেষ প্রচলন দরকার।

বহরমপুর-
২৬/১/৩১

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

খাগড়াই কাঁসা সম্পর্কে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রশংসা করেছেন।

হত না শিল্পীদের। কিন্তু বর্তমানে ৯০-১০০ টাকা প্রতি কেজি মজুরি পেলেও ৩-৪ জনে সম্মিলিতভাবে ৪-৫ কেজির বেশি বাসন তৈরি করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে মূল কারিগরদের মজুরি বেশি, জ্বালানী ও অন্যান্য খরচা বাবদ বাদ দিলে ন্যূনতম বারো ঘণ্টা কাজ করে বড় জোর ৬০-৭০ টাকা রোজগার হয়। ফলে ভীষণ পরিশ্রম করে এত কম মজুরিতে সংসার চালানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়াও সব সময় কাজ থাকে না, তখন এই শিল্পীদের সংসার চালানোর ক্ষেত্রে দুঃখের বারমাস্যা থেকেই যায়। জনৈক ব্যবসায়ী লক্ষ্মীন্দ্রনিধি সিংহ বা অনেকের মতে মজুরি বাড়ানো অবশ্যই প্রয়োজন। গত দশ বছরে মজুরী তেমনভাবে বাড়েনি যেভাবে কাঁচা মালের দাম বেড়েছে। কিন্তু কেন বাড়ানো হচ্ছে না সে সম্পর্কে তাঁদের অভিমত যে, বাজার এত মন্দা যে ব্যাপকভাবে জিনিসপত্র তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মজুরিও বাড়ানো হচ্ছে না। এ কারণে এই শিল্পীদের উত্তর পুরুষরা এ কাজের সঙ্গে না জড়িয়ে অন্য পেশায় চলে


H. L. PAUL & SON

Manufacturers of

Khagra Bell-metal & cum Brass wares & Wholesale & Retail Dealers in Brass, Copper German silver, Fancy E. P. N. S. & Presentation goods.

Sole Proprietor : Lakshman Chandra Paul

Bengal S. T. No. B. R. 75A. Central S. T. No. 51A (B. R.)

Bankers :—United Bank of India Ltd.

Rly. Stations : Berhampore court, Khagraghat Road

P. O. KHAGRA
Dt. MURSHIDABAD

No. .... *Dated* 19

খাগড়াই কাঁসা সম্পর্কে আচার্য সত্যেন বোস প্রশংসা করেছেন।

যাচ্ছেন। ফলে কেউ রিক্সা চালান, কেউ গ্যারেজে কাজ করে সংসার চালান।

কাঁচামাল সরবরাহ

কাঁচা মাল সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও করুণ। তামা ও রাঙ বা টিন গলিয়ে কাঁসা তৈরি করতে খরচা বেশি পড়ছে। রাঙের বর্তমান বাজার দর ৪৫০ টাকা প্রতি কেজি ও তামা ১৪০ টাকা প্রতি কেজি। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা ব্যয় হয় তার দাম পড়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ পাল (সভাপতি, খাগড়া বেল মেটাল অ্যাসোসিয়েশন) রবীন্দ্রনাথ ধর, দেবাশীষ দাঁ (যুগ্ম সম্পাদক, ঐ), লক্ষ্মীন্দ্র নিধি সিংহ (লকু)দের মতে কাঁসা শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে রুগ্ন দশা চলছে তার জন্য দায়ী এক দিকে যেমন প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অভাব, অন্যদিকে সাম্প্রতিক কালে কাঁসার বাসনের চাহিদা একদম কমে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে দামের বৃদ্ধিকেই দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা। কেননা সরকারি ভর্তুকি দিয়ে আগে কাঁচা মাল সরবরাহ করা হত। বর্তমানে তা পেতে অনেক খড়কুটো পোড়াতে হয়। এখন ভরসা শুধু পুরাতন কাঁসার বাসন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, গ্রামীণ এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কাঁসার জিনিসপত্র আছে যেগুলি প্রয়োজনের সময় বিক্রি করে তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে। ১৯৬৪-৬৬ সালে খরা জনিত কারণে গ্রাম বাংলায় আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে, সেই সময় বহু মানুষ তাদের কাঁসার বাসনপত্র বন্ধক দিয়ে অথবা বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন। আবার সত্তরের দশকে বাংলাদেশ যুদ্ধের অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে ভারতে আসার সময় ঘটি, বাটি, বিক্রি করে কোনওরকমে দিনাতিপাত করেছিল সেগুলির এখন বেশিরভাগই মহাজনদের ঘরে। এখন সেগুলি বাজারে ছাড়ছে এবং পুরাতন কাঁসার বাসনই ব্যবসায়ীদের বা কাঁসা শিল্পীদের কাঁচা মালের সরবরাহের প্রধান ভরসা। আগে কাঁসারীরা নিজেরাই কাঁচামাল নিয়ে জিনিস তৈরি করত। এখন মহাজনদের সরবরাহ করা জিনিস দিয়েই শুধুমাত্র মজুরী নিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করছে।

বাজার

একসময় খাগড়ার কাঁসার বাজার ছিল কলকাতা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বিহার ও উড়িষ্যায়। কিন্তু বর্তমানে স্টিল, ম্যালামাইন, হিণ্ডোলিয়াম, অ্যালুমিনিয়ামের প্রসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁসার শিল্প মার খেতে শুরু করেছে। তবে শহর এলাকার মানুষ জনদের মধ্যে কাঁসার প্রচলন ক্রমশ কমে গেলেও গ্রামীণ এলাকার মানুষজনদের কাঁসার বাসন পত্র ব্যবহার করবার প্রবণতা বর্তমানেও আছে। এতসব সত্ত্বেও বহরমপুর শহরে প্রায় ৩৫ খানা কাঁসা পেতলের বাসনের দোকান চালু আছে। জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, কান্দি, জঙ্গিপুর শহরেও যে সমস্ত দোকানগুলি আছে এবং গোটা জেলায় প্রায় ১৩০ খানা দোকান চালু আছে। সেগুলির প্রায় দোকান থেকেই কাঁসার বাসন পত্রাদি বিক্রয় হয়। এবং এখনও এ শিল্পের সঙ্গে প্রায় এক হাজার পরিবার জড়িয়ে আছেন।

শিল্পীদের জীবন-যাপন

কাঁসা শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তারা মূলত কংসবণিক, দত্ত, দাঁ ও বায়েন সম্প্রদায়ের মানুষ। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরাও এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। অতীতে যারা কাঁসা শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন তারা হলেন ঋষি মিস্ত্রী, সুধীর রঞ্জন মিস্ত্রী, গোবর্ধন মিস্ত্রী, দুলাল মিস্ত্রী, পতিতপাবন মিস্ত্রী, কালীদাস কাঁসারী, বিল্টু কাঁসারী, তারাপদ কাঁসারী, বাঁকা কাঁসারী, গোরাচাঁদ দাস, রাজকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি। এক সময়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন তারা বর্তমানে বয়সের ভারে কাজ করতে পারেন না তাদের মধ্যে দীনবন্ধু দাস (৯০), অনিল মণ্ডল (৮২),

মদনমোহন দাস (৮৫), শ্যাম দাস (৭৫), গোবিন্দ ভূষণ দত্ত (৮৭), বিমল চন্দ্র দাস (৭০) প্রমুখ। ১৯৯১-৯২ সালে সরকারি পরিসংখ্যানে ৪১ টি ইউনিট ও ৪১ জন শিল্পীর নাম নথিভুক্ত ছিল। কিন্তু কাঁসা শিল্পী বা তামার কাজের শিল্পী হিসাবে আলাদা করে উল্লেখ ছিল না। ২০০১ সালের পরিসংখ্যানে ২৫০ জন শিল্পীর নাম নথিভুক্ত থাকলেও এক্ষেত্রেও তামা বা কাঁসা শিল্পী হিসাবে আলাদাভাবে উল্লেখ নেই। ১৯৩১-৩২ সালে বৈদ্যনাথ দাস নামে এক মূক শিল্পী কাঁসার ডিসের উপর খোদাই করে জেনারেল তোজো ও রাজা হিরোহিত্যের ছবি এঁকেছিলেন, এটি জাপানের প্রদর্শনীতে প্রশংসিত হয়। এছাড়াও ভবশঙ্কর দাঁ, তেঁতুল দত্ত, গৌর রাজবংশী বিভিন্ন শিল্প কলার জন্য পুরষ্কৃত হন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দলীয় কাজে বহরমপুর শহরে আসার সময় তৎকালীন এক কাঁসার কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী হীরালাল পাল পুত্র লক্ষ্মণচন্দ্র পালের কিছু বাসনপত্র তাঁকে উপহার দেন নেতাজী কাঁসার কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মণচন্দ্র পালকে ১৯৩১ সালের ১৬ জানুয়ারি একটি শংসাপত্র দেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডা. রাজেন্দ্রপ্রসাদ একইভাবে কাঁসার তৈরি বাসনপত্রের শৈল্পিক কারুকার্য দেখে ওই বৎসরই ৬ ডিসেম্বর একটি শংসাপত্র দেন। বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বহরমপুর শহরে এসে কাঁসার দ্রব্য ও শিল্প কলা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও কাঁসা শিল্পের প্রশংসা করেছেন। এছাড়াও গ্রেট ব্রিটেনের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ভি. জি. কেভনান কাঁসার দ্রব্যের শিল্প কলা দেখে মুগ্ধ হন। ঐতিহাসিক হান্টার তাঁর 'ইমপেরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া'র দশম খণ্ডে খাগড়ার কাঁসা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। অতীতের একটা সময়ে মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্পের এত সুনাম থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে মাত্র তিনটি কারখানা চালু। একটি কারখানার মালিক মনোরঞ্জন দাস ওরফে মানু দাস। তেঁতুল দত্ত, শ্যামসুন্দর দত্ত ও বিশ্বনাথ দত্তদের দুটি কারখানা। ভবিষ্যতে আর কোনও কারখানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করেন বর্তমান শিল্পীরা। নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার মত আর্থিক ক্ষমতা বর্তমান শিল্পী বা কারিগরদের নেই!

মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়ার দরকার মনে করেন ব্যবসায়ী, কারিগর সকলেই। কাঁসা শিল্পীদের বাড়ি ঘর চিনতে অসুবিধা হয় না সারাদিন হাতুড়ি পেটানোর টুংটাং শব্দ ও ঘরদোরের দৈন্য দশা। শিল্পীদের যদি এই দৈন্যদশা হয় তবে শিল্পের পরিনাম যা হওয়ার তাই হচ্ছে বা হবে। অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্প তার স্বত্ত্বা বজায় রাখতে পারবে না তাতে একমত শিল্পী মনোরঞ্জন দাস তেঁতুল দত্ত, শ্যামসুন্দর দত্ত বা ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ পাল, লক্ষ্মীন্দ্রনিধি সিংহরাও। তবে উভয়েই একটা ব্যাপারে আশাবাদী যে এই শিল্পকে বাঁচাতে গেলে সরকারি শিল্প দপ্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করে কাঁচা মাল সরবরাহের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করে এবং সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। কেননা বৈধ যোগান বৃদ্ধি ছাড়া কোনও শিল্প যথাযথভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে না। শিল্পের সাবেকি ঘরানার অনেক কাজই হারিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে নতুন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করার ক্ষেত্রে শিল্প দপ্তরের উদ্যোগ থাকার প্রয়োজন। কেননা গতানুগতিক বাসন পত্রাদির পাশাপাশি সৌখিন দ্রব্য, নানা কারুকার্যকরা ডিস বা বাসনপত্র, উপহার সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব। বর্তমান যে শিল্পীরা এখনও এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তাদের মধ্যে মনোরঞ্জন দাস, তেঁতুল দত্ত বা ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ পাল, লক্ষ্মীন্দ্রনিধি সিংহদের মতে সরকার যদি আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, কাঁচা মালের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করে তবে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে এবং দামও তুলনামূলকভাবে কম হবে এবং বাজারের অন্যান্য সৌখিন দ্রব্যগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে।

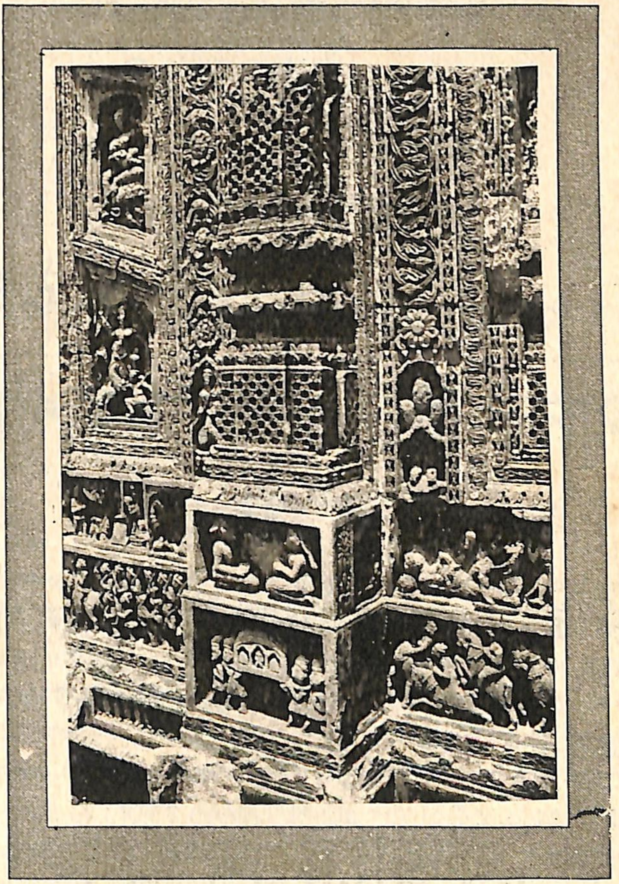
কিন্তু এই যন্ত্রীকরণ বা আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে যে পুঁজির প্রয়োজন তা নানা সমস্যায় জর্জরিত শিল্পী শ্রমিকদের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়— এ ব্যাপারে জেলার শিল্প দপ্তরের আর্থিক সহায়তা ও উদ্যোগ না থাকার ফলে ব্যাঙ্কগুলিও এগিয়ে আসছে না। আধুনিকীকরণ হলে উৎপাদন বাড়বে, উৎপাদন খরচ কমবে, ফলে উৎপাদিত জিনিসের দাম কমবে এবং তার ফলে মজুরিও বাড়বে এবং শিল্পীরা রোজগারের অনিশ্চিয়তা থেকে রেহাই পাবেন। রেহাই পাবে পিতৃপুরুষের গৌরবের শিল্প।

তথ্যসূত্র

১. পরিতোষ পাল, সত্য যুগ ১০.০৬.১৯৮০।
২. খাগড়ার কাঁসা শিল্প — সুজয় বিশ্বাস।
৩. মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার—২০০৩।
৪. রবীন্দ্রনাথ পাল, লক্ষ্মীন্দ্রনিধি সিংহ, মনোরঞ্জন দাস, তেঁতুল দত্ত, হারাধন দাস, বিমল চন্দ্র দাস প্রমুখ।
৫. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হস্তলিখিত পত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ পাল।

নানা প্রসঙ্গ নানা প্রসঙ্গ

নানা প্রসঙ্গ নানা প্রসঙ্গ



নানা প্রসঙ্গ নানা প্রসঙ্গ

নানা প্রসঙ্গ নানা প্রসঙ্গ

প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথ

রবীন বিশ্বাস

মোঘল আমলের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পালাবদলের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল এই মুর্শিদাবাদে। বৈদেশিক বণিকদের সপ্তডিঙায় এসে পৌঁছচ্ছে আরব-পারস্য-ইউরোপের যুক্তিবাদ। এই মুর্শিদাবাদেই আরব-পারস্য থেকে আসা যুক্তিবাদের প্রভাবে জ্ঞানান্বেষী চাকুরিজীবী রামমোহন তু-হ্ফাৎ-উল-মুহাহিদিন প্রকাশ করেন। মিশনারীদের হাত ধরে এখানেও সূচনা হচ্ছে ইংরাজি শিক্ষার। কলাপাতা, তালপাতার পরিবর্তে আসছে মুদ্রিত পুস্তক। কেমন হবে বাংলা অক্ষর-শব্দ-বাক্য! মত প্রকাশের জন্য চাই গদ্য ভাষা। শুধু শাস্ত্র বাক্য উচ্চারণ করে কাজ চলবে না। শাস্ত্রও যে কোথাও কোথাও অশাস্ত্রীয় পথে হেঁটেছে তারও ব্যাখ্যা দিতে হবে। তুলে ধরতে হবে প্রাঞ্জল ভাষায়। রামমোহনের অভ্যুত্থান, ইয়ংবেঙ্গলের জ্ঞানান্বেষণ, বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে বিদ্যাসাগরের পদচারণা, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে 'জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম' ঘোষণার মধ্য দিয়ে সারা দেশে যে ভাব বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, পদে পদে তাকে রক্ষণশীল সমাজ ও শাসক ইংরেজদের বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন এ্যাডাম প্রেস এর কণ্ঠরোধ করার জন্য এক আদেশ জারি করেন। রামমোহন সুপ্রীম কোর্টে-এর বিরুদ্ধে আবেদন করেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে অর্ডিন্যান্স আইনে বিধিবদ্ধ করেন। অতঃপর রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে রাজার কাছে এক আপীল পাঠান কিন্তু সেখানেও অগ্রাহ্য হয় আপীল। দেশীয়দের নুনের ব্যবসার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে নামতে হয় রামমোহনকে। বৃটিশ শোষণের মাত্রা নিরূপণে

সচেষ্ট হন রামমোহন। তাঁর 'পেপার অন দি রেভিনিউ সিস্টেম অব ইণ্ডিয়া' পুস্তিকাতে দেখান ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসকবর্গ মোট ১১০,০০০,০০০ পাউণ্ড ভারতীয় সম্পদ আত্মসাৎ করেছে।

সেকালে রামমোহন যার সূচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ও তার পরবর্তী উত্তরসূরীরা তা বহন করেছেন। শুধু কলকাতা নয়, কলকাতায় বসে যারা যুক্তিবাদের চর্চা করেছেন, তাঁরাও যেমন সেই নব্য চিন্তাকে বাংলার প্রত্যন্তে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন, প্রত্যন্ত এলাকার সুধীজনও সেই নব্যচিন্তার স্পর্শে আপন আপন এলাকার মানুষকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর কলিকাতার অধিবেশনে, বিজ্ঞান শাখার সভাপতি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্য পরিষদের কার্যক্ষেত্র বাংলাদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। ... এই কার্যের জন্য সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্তব্য।"

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ইতিহাস চর্চায় কলকাতা কেন্দ্রিক ইতিহাস সন্ধানই মুখ্য, এলাকা ভিত্তিক ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা হলে এ ভ্রান্তি নিরসন হত যে, এ দেশের নবজাগরণ কেবল 'কলিকাতা কেন্দ্রিক'।

আমরা আজও অনেকে জানিনা মফঃস্বল বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' এই মুর্শিদাবাদ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে, এবং রাজরোষে তা বন্ধ হয়। কোনও মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা প্রকাশনার গৌরবও মুর্শিদাবাদের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও আগে এই মুর্শিদাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসর্বস্ব দান করে, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন ২২ বছরের কৃষ্ণনাথ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্তত চার বছর আগেই বহরমপুর কলেজ (পরে কৃষ্ণনাথ কলেজ) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অকাল প্রয়াত রাজা কৃষ্ণনাথের স্বপ্ন আংশিক পূরণ হয়। শুধু জমিদার বিত্তবান নয়, ওই মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এসেছিল প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে, বিধবা নারীর দানও পৌঁছেছে কলেজ প্রতিষ্ঠা তহবিলে। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর অন্যতম প্রধান রূপকার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই জেলারই সন্তান। ১৮৭২ এ প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার রূপরেখা তৈরি হয় এ জেলায়। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর থেকে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মে পর্যন্ত বহরমপুরে ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মরত ছিলেন। এই সময়েই বাংলার কৃষকদের উপর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কৃষকদের উপর জমিদারদের অবিচারের বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনা করেন। বলা বাহুল্য এ জেলায় নব্য শিক্ষিত সমাজের কর্মকাণ্ডের এই তালিকা দীর্ঘ — দীর্ঘতম।

আমাদের আলোচ্য এমনতর ঘটনার একটি সম্পর্কে। সামন্তি আভিজাত্যের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা সাহিত্য ততদিনে ক্ষেত্র অনুসন্ধান, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পরিমাপ করতে আমজনতার বিতর্ক সভায় এসে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের অবদান এক্ষেত্রে কম ছিল না। কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভায় ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় পঠিত প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, "... মুর্শিদাবাদে নব্য সাহিত্যচর্চার অভাব ছিল না। ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বহরমপুরে এই সাহিত্যচর্চার ধুম পড়িয়া যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

'তখন বহরমপুরে বাঙ্গলা সাহিত্যচর্চার বড় সুবিধা ছিল। ড. রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে,

তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল, আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরেজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসলেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। ... পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরে আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গলার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতী করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিররত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর আমি আসার কিছুকাল পরেই— পিণ্ডান্ত-পিণ্ডশেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া এলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গলাচর্চার মাহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিলে রামদাস ও অক্ষয়চন্দ্রের চেষ্টায় বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়।" নিখিলনাথ রায়ের এই বক্তব্য থেকে তৎকালীন বহরমপুরের সাহিত্য চর্চার যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, বহরমপুর তথা কাশিমবাজারে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের যাত্রা শুরুর পশ্চাদপট আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল।

এ জেলায় রবীন্দ্রনাথের আগমণ ও তাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের বন্দোবস্ত হয় ১৩১৩ সালের বৈশাখে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। রঙ্গপুরেও চেষ্টা হয় কিন্তু সভা না করার নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় সেই সভাও হয়নি। কাশিমবাজারে অধিবেশনের বন্দোবস্ত হয় কিন্তু মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠপুত্র মহিমচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে তখন সভা স্থগিত হয়। পরের বৎসর বাংলা ১৩১৪ সনে ১৭ ও ১৮ কার্তিক কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে সাহিত্য সম্মেলনের দিন স্থির হয়। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে সম্মত হন।

সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বাংলা ১৩১৪ সনের ১৭ কার্তিক, রবিবার (ইং ১৯০৭)। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকাটিও দীর্ঘ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলাধীপ), শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান), শ্রী নফরদাস রায় (মুর্শিদাবাদ), শ্রী নিখিলনাথ রায়, শ্রী শশধর রায় (রাজসাহী), শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রী ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া), শ্রী দূর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী মনীমোহন সেন, (রামদাস সেনের পুত্র) শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তোফি, শ্রী নীলমণি ঘোযাল, শ্রী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রী অবিনাশ চন্দ্র দাস, আহম্মদ হোসেন মিঞা, শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন (ঢাকা), শ্রী ললিতকৃষ্ণ ঘোষ (দিনাজপুর), মহম্মদ রৌসন আলি চৌধুরী (ফরিদপুর), শ্রী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ সিংহ (বর্ধমান), শ্রী জগদানন্দ রায় (বীরভূম), শ্রী মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগলপুর), শ্রী রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ (মুর্শিদাবাদ), শ্রী হরগোপাল দাস কুণ্ডু (রংপুর) প্রমুখ গ্রন্থকার, সাময়িক ও সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশক, শিক্ষা বিভাগের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ, সাহিত্যানুরাগী, রাজা ও ভূম্যধিকারী প্রায় চারশত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের বাইরের সাহিত্যিক ও প্রতিনিধিবর্গ ১৬ই কার্তিক শনিবার সকাল থেকেই উপস্থিত হতে থাকেন।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-এর দেয় বিবরণ থেকে জানা যায়[১] ১৬ কার্তিক শনিবার রাত্রির ট্রেনে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ অতিথি কাশিমবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। নলিনীরঞ্জন লিখছেন, "(রাত্রে গাড়িতে) ... উঠিয়া দেখি প্রায় সমস্ত গাড়ীখানিই পরিচিত সহযাত্রীতে ভরা, তার মধ্যে ঔপন্যাসিক হইতে আরম্ভ করিয়া, বৈয়াকরণিক, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, রিপোর্টার, লেখক, সমালোচক— এমনকি হেড্‌মাস্টার পর্যন্তও ছিলেন। ভাবিয়াছিলাম— বেশ নিরিবিলি যাওয়া যাইবে; কিন্তু ঘটনা একেবারে উল্টাইয়া গেল। সূচনা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য অনেকটা আশান্বিত হওয়া গেল।"

আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানানোর জন্য এক স্টেশন আগেই বহরমপুর কোর্ট স্টেশনেই স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সকালেই কাশিমবাজার স্টেশনে ট্রেন ঢোকে। বুকে ব্যাজ আঁটা স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ অপেক্ষা করছিলো। "স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ নিজেরাই ঘাড়ে করিয়া আমাদের ব্যাগ প্রভৃতি নামাইয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। অনুমানে বুঝিলাম প্রায় ৬০/৭০ জন ডেলিগেট এ গাড়িতে আসিয়াছেন। একখানি গাড়িতে করিয়া জনৈক স্বেচ্ছসেবকের সহিত মহারাজার প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা আট ঘটিকা। মহারাজের তোরণে নহবত, তখন সুমধুর রাগিনী আলাপ করিতেছিল। স্বয়ং মহারাজ, তাঁহার তোরণ দ্বারে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সুসজ্জিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সুন্দর খিলান, পত্রপুষ্প ও রঙ্গীন বস্ত্রে সজ্জিত। চেয়ার ও বেঞ্চে সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে একটি উচ্চবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই বেদীর উপরিভাগ বহুমূল্য সিংহাসন, সিংহাসনের উপর রেশমী চাঁদোয়া।" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের এই বর্ণনা ছবির মতই। তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ নেই গোলাপ জলের একটি পঞ্চমুখী ফোয়ারার, ফোয়ারাটি ছিল সভাস্থলের মাঝখানে।

সুবিশাল কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন অংশে আটটি বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রত্যেক বাড়িতে জলযোগের স্বতন্ত্র ভাণ্ডার ছিল। ছিল স্নানশৌচাদির সুন্দর ব্যবস্থা। প্রত্যেক অতিথির আদেশ পালনের জন্য প্রত্যেক ঘরে "অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিনয়ী, মধুরালাপী স্বেচ্ছাসেবক বালক ও যুবকদল সর্ব্বদা উপস্থিত ছিল; আর ছিল ঘোড়ার গাড়ী,— যিনি যখনই যেখানে যাইতে চাহিয়াছিলেন— কি গঙ্গাস্নান, কি নবাববাড়ী দর্শনে, কি খাগড়া, বহরমপুর, সৈদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যিনি যখন যেখানে যাইতে চাহিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বিনা ভাড়ায় তিনি সেইখানেই যাইতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীবর্গের সুবিধার জন্য মহারাজ স্বীয় প্রাসাদের সিংহদ্বার পার্শ্বে খাগড়াই বাসনের এবং বালুচরের শাড়ী, বহরমপুরী গরদ এবং মটকার বিবিধ ধুতি চাদর ও থানের দোকান বসাইয়া দিয়াছিলেন।[২]

দুপুর নাগাদ 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এর প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। নলিনীরঞ্জন লিখছেন "বেদীর উপর মহারাজা বাহাদুর, লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ও অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পরিবৃত হইয়া সভাপতি রবীন্দ্রবাবু রহিয়াছেন দেখিলাম। নিম্নে বুকে ব্যাজ আঁটা

---

১. তদানীন্তন বঙ্গের প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'জাহ্নবী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও প্রকাশক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ওই সম্মেলনের উপর রচিত আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণটি ১৩১৫ সালে শ্রাবণ মাসে জাহ্নবী পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যার ১৯৮৮তে ওই রচনাটি হুবহু প্রকাশ করেন সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী।

২. মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র— শ্রী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে এ তথ্য গৃহীত।

ডেলিগেট মহাশয়েরা, স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ, বহরমপুর, খাগড়া ও কাশিমবাজার অধিবাসীগণ উপবিষ্ট। ১টার সময় মঙ্গলাচরণ গানের সহিত সভার কার্য্যারম্ভ হইল।''

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র মুদ্রিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি 'শুভাগত মহোদয়গণ' সম্বোধন শেষে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বলেন, ''... মাতৃভাষার ও জাতীয় সাহিত্যের সেবা উপলক্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সুধীগণের এই শুভাগমনে মুর্শিদাবাদ ধন্য হইল, আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমি কৃতার্থ হইলাম। মুর্শিদাবাদবাসী আমাদিগের যে আজি কি গৌরব ও আনন্দের দিন, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সুকঠিন। ... আমাদিগের সকল ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করিবেন।

''... আপনারা এখানে বৃথা উৎসব করিতে আসেন নাই, একটি মহাব্রত গ্রহণে আসিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও উন্নতি সাধন-জন্য-একত্র সমবেত হইয়াছেন। মানুষের জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না। ...

''... বাঙ্গালীর সকল কার্য্যই হুজুগে পরিণত হইতে দেখা যায় এবং হুজুগ বলিয়াই এদেশে কোন একটি মহৎ কার্যের অনুষ্ঠান হয় না। কয়েক বৎসর হইল এদেশবাসীর মনে একটা নূতন আবেগ আসিয়াছে। সেই আবেগটা হুজুগে পরিণত হয় নাই বলিয়া বাঙ্গালী একটি নূতন জীবন লাভ করিয়াছে ... বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির ইচ্ছা অল্প অল্প করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে আসিতেছে। এই জন্যই বাঙ্গালা ভাষার ক্রমশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। ...'' পরিশেষে বলি ''আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যসেবী সৌখিন। ... ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।''

এরপরই কয়েকশত কণ্ঠের হর্ষধ্বনির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। সাধারণভাবে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কিন্তু এদিন উদ্বোধন উপলক্ষে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দেশের বর্তমান জাগরণ ও সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনী ভাষণের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁর 'সাহিত্য সম্মেলন' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বলেন, ''বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কিন্তু দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে।'' তিনি সেই সাহিত্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠের পর ভাষা সংস্কার বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, ''বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্দর কাশিমবাজারে আজ আমরা উপস্থিত। আমরা যে স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি, সেই ঐতিহাসিক ভবনের সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে চারিদিকেই ঐতিহাসিক চিহ্ন বিদ্যমান। আমার পশ্চাতে যে প্রস্তর খচিত বিশাল গৃহ দৃষ্ট হইতেছে, উহা বারানসীর চেৎসিংহের ভবন হইতে আনীত। সম্মুখে ইংরেজ রেসিডেন্সি ও সমাধিক্ষেত্র। তাহার সম্মুখে প্রাচীন গঙ্গার পরপারে বাঙ্গালার রাজস্ব মন্ত্রী সন্ন্যাস-ব্রতধারী, রায় রায়ান চায়েন রায়ের আবাসস্থল সন্ন্যাসীডাঙ্গা। বামপার্শ্বে চেৎসিংহের নিকট হইতে আনীত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, ইংরেজ কুঠির স্থান ও ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র। দক্ষিণে প্রাচীন জৈন দেবালয় নেমিনাথের মন্দির।'' এই বক্তব্যে, বক্তার অবস্থান ও সভাস্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য পরিস্ফুট।

প্রথম অধিবেশনে দুটি প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়। বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, ঐতিহাসিক উপকরণ, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ ও লৌকিক সাহিত্য সংগ্রহ বিষয়ে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার রক্ষা ও প্রচারের কথাও ছিল। প্রস্তাব দুটির স্বপক্ষে ব্যোমকেশ মুস্তাফী, যজ্ঞেশ্বর

বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, দুর্গাদাস লাহিড়ী, হরগোপাল দাস কুণ্ডু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রায় ৬টা নাগাদ প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যার পর সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে, ''যে পক্ষে গানের বন্দোবস্ত ছিল তার পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া মহারাজা বাহাদুর, পরিষদ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং চন্দ্রশেখর বাবু* প্রভৃতি আনেক খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী নানা আলোচনা করিতেছিলেন। সেইখানে গিয়া আমিও তাঁহাদের মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইলাম।'' এইদিন মধ্যরাত্রে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ছিল। নাটক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। ১৮ কার্তিক দ্বিতীয় ও শেষ অধিবেশন শুরু হয় দ্বিপ্রহরে। এদিন মোট আটটি প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়। সভায় সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এদিন যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠের জন্য নির্ধারিত হয় তারমধ্যে ছিল নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিকতত্ত্ব, প্রথমনাথ রায়-এর মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থের মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত বৈষ্ণবসাহিত্য, দুর্গানারায়ণ সেনগুপ্ত শাস্ত্রীর বাঙ্গালা ভাষায় পরিপুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্বেদ শিক্ষা, গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীর বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার, কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়ার ঐতিহাসিকতত্ব। কিন্তু প্রবন্ধগুলি সময় অভাবে পাঠ করা যায়নি। সম্মেলনের রিপোর্টের সঙ্গে প্রকাশ করার জন্য সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে অর্পণ করা হয়। মাতৃভাষাকে 'মা' এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সাধনে আত্মনিয়োগকে মাতৃপূজা জ্ঞান করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হয়েছিল সেদিন কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেও ছিল তারই অনুরণন। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, ''আনন্দের সহিত নির্বিঘ্নে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল। মাতৃপূজার এই প্রথম উদ্বোধন আমাদের চেষ্টায় ও যত্নে নয়, সেই নিখিল আনন্দময়ের ইচ্ছায় সুসম্পন্ন হইল। জননী বঙ্গভাষার সেবার জন্য তাঁহার কুটিরদ্বারে আমরা যেন এমন করিয়া সকলে মিলিত হইতে— তাঁহার চরণকমলে যেন এমনি করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতে সমর্থ হই। আমাদের সম্মুখে উদার আলোকচ্ছটা দেখা দিয়াছে, আলোক লক্ষ্য করিয়া যেন আমরা উত্তরোত্তর অগ্রসর হই। সকলে মিলিয়া মার মন্দির নির্ম্মাণ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। আজিকার দিনে যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা তিনি সেইভাবে মা'র অলঙ্কারের শোভা বৃদ্ধি করুন।'' এই সম্মেলনের পর কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবন নির্মাণের জন্য বিপুল আর্থিক সহায়তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এ জেলার দুই ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। উনিশ শতকের নব্যচিন্তার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত সামন্ত পরিবারগুলি এভাবেই মধ্যযুগীয় নাচমঞ্চের ঝাড়বাতিগুলি নিভিয়ে দিয়ে সেখানে নাট্য-সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এ আলোর ঔজ্জ্বল্য কম হতে পারে কিন্তু সে আলোর রশ্মি শুধু মধ্যবর্তী কোনও একটি মাত্র বস্তুকে আলোকিত না করে বহুদূরে বহু দিকে বিস্তৃত হয়েছে। সামন্ত লাম্পট্যের স্মারক বাগানবাড়ি গুলিও নাট্যশালা বা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে শিক্ষা-চেতনা বিকাশের দায় বহন করেছে।

সমাপ্তি অধিবেশনের দিনই রবীন্দ্রনাথকে মধ্যমণি করে সাহিত্যসেবীদের নিয়ে একটি গ্রুপ ছবি তোলা হয়। সে ছবির পাশেই, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। (ছবিটি এ নিবন্ধের সঙ্গে প্রকাশ করা হল।) কিন্তু পরদিন ১৯ কার্তিক সকালে রবীন্দ্রনাথ

---

* চন্দ্রশেখর মুখার্জী 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' উপন্যাসের রচয়িতা এবং মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত উপাসনা পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। তিনি সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক। উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম ডক্টরেট ড. রামদাস সেন-এর পুত্র মনিমোহন সেন ছিলেন কমিটির ট্রেজারার



কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথ। বাঁ পাশে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

মণীন্দ্রচন্দ্র, লালগোলার রাজা প্রমুখ ও স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের নিয়ে একটি গ্রুপ ছবি তোলার উদ্যোগ চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় সমবেত তরুণ সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, এমনকি সকলের অনুরোধে "তিনি তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত' অয়ি ভুবনমোহনী' গানখানি গাহিলেন"। নলিনীরঞ্জন জানাচ্ছেন, 'ইত্যবসরে আমি রবীন্দ্রবাবুর কক্ষে গিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছাসেবকের সহিত ফটো তুলাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। দু'একজন সময় অল্প বলিয়া আপত্তি করিলেন। মহারাজা বাহাদুর বলিলেন, "কাল তো একবার তোলানো হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "সে আপনাদের সঙ্গে। ছেলেদের সঙ্গে রবীন্দ্রবাবুর ছবি উঠিলে তাহারা বিশেষ আনন্দিত হইবে, আর তাহাদের এ আনন্দ দেওয়া উচৎ নয় কি?" রবীন্দ্রবাবু হাসিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রবীন্দ্রবাবুকে মাঝে বসাইয়া সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের ফটো তোলানো হইল। অল্পক্ষণ পরেই রবীন্দ্রবাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন।"

সূত্র

১। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক— হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশ কলিঃ সন ১৩৩৯, মাঘ-সংক্রান্ত।
২। গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা '৮৮ (মূলসূত্র ঃ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ সংখ্যার ১২৫-১৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিত, পত্রিকার প্রকাশক ও সহ সম্পাদক নহিনীরঞ্জন পণ্ডিত এর প্রতিবেদন। উল্লিখিত সংখ্যাটি বাংলা ১৩১৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত।
৩। ব্যবহৃত ছবিটি 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে।



শিল্পসাধক ক্ষিতীন্দ্রনাথ

মহান শিল্পী—মহত্তর জীবন

জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার এক অখ্যাত পল্লী জগতাই, যে মহান শিল্পীর জন্মভূমি রূপে সমগ্র ভারতবর্ষের মানচিত্রে স্মরণীয় ও স্ব-গরিমায় উল্লেখ্য হয়ে থাকবে,— তিনি ভারতীয় চিত্রাঙ্কন জগতের অনন্য প্রতিভা— শিল্পাচার্য তথা শিল্পসাধক ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

জন্ম বাংলা ১২৯৮ সালের ১৫ শ্রাবণ। এক বছরেই মাতৃহারা শিশুটি বড় হতে লাগলেন পিতার সস্নেহ ও সযত্ন লালনে। ক্ষিতীন্দ্রনাথের কথায়— 'আমার পিতা একাধারে পিতা ও মাতা, এই দুই স্নেহ দিয়েই আমাকে লালন পালন করেন।'

বাল্যকাল থেকেই ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাঁর ভাবুক ও সংবেদনশীল মনটি বাঁধা-ধরা জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যেতো সুদূর স্বপ্ন বা ভাবলোকের আহ্বানে। সমবয়সী ও সহপাঠিগণের ইচ্ছা ও চলার হিসেবটি বারবার ভুল হয়ে যেতো তাঁর। পিতা কেদারনাথ মজুমদার (ছিলেন সাব-রেজিস্টার)। সংগীত ও অভিনয়ের প্রতি ছিলো তাঁর প্রবল আকর্ষণ। তাঁর একটি নিজস্ব সখের যাত্রাদলও ছিলো। বাল্যকালে এই যাত্রাদলে বিভিন্ন ভূমিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন একাধিকবার। এই দলে তাঁর প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু

নলিনীকান্তও (পরবর্তী জীবনে বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য সাহিত্যিক) তাঁর সঙ্গে থাকতেন। বাল্যকালের পারিবারিক পরিবেশ এবং পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষিতীন্দ্রনাথও ছিলেন অত্যন্ত সুকণ্ঠী। সংগীত ও চিত্রাংকন ছিল তাঁর মনের সুখ ও প্রাণের শান্তি।

নিমতিতা পার্শ্ববর্তী গ্রাম। সেখানে জমিদারবাবুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করে ভর্তি হলেন ১২ মাইল দূরে অবস্থিত তৎকালে বিহারের অন্তর্গত পাকুড় হাইস্কুলে। তখন পাকুড় ছাড়া কম দূরত্বে আর কোনও হাইস্কুল ছিলো না। তিনি চার জন গ্রাম্য বন্ধু ও সহপাঠীর সঙ্গে শুরু হলো নতুন শিক্ষার্থী জীবন। ছাত্রাবাসে থাকতেন, শনিবার ক্লাস শেষ করে হাঁটাপথে বাড়ি ফেরা— আবার সোমবার ভোরে রওনা হয়ে ইস্কুলে হাজিরা দেওয়া। এইভাবেই চললো দিন-মাস-বছর। দু'টো বছর কাটলো। কিন্তু মন যার সুর আর সৌন্দর্যের সীমাহীন আনন্দলোকের সন্ধানী-গতানুগতিক জীবনে তাঁর উৎসাহ ও স্ফূর্তি কোথায়? অঙ্ক-ভূগোল-ইংরাজি-ইতিহাস-এর শুষ্ক চর্চায় ক্লান্ত ও অতৃপ্ত তাঁর আত্মা যেন বারবার হাহাকার ক'রে ওঠে। বলে — 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা— অন্য কোনও খানে।'

গ্রামের মেঠো পথ, আম-জাম-কাঁঠালে-ঘেরা গ্রাম্য পরিবেশ, শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত প্রভৃতি বারবার রূপের আড়ালে অরূপ দর্শনের আস্বাদে ভরিয়ে তোলে মন, আকুল হয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত অন্তর, সেই অরূপকে রূপের সীমায় বাঁধতে। অন্যের চোখে 'অকাজের কাজ' আর 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' নিয়েই চলে তাঁর কারবার। এই ভাবেই শুধু আনন্দ ও স্বস্তিতে বেঁচে থাকা, অর্থবহ জীবনের স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা।

পিতার চোখ এড়ালো না যে, ছেলের পড়াশোনায় মন নেই। সাব-রেজিস্টার পিতার আন্তরিক ইচ্ছে, কোনওভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা পাশ করলেই, সাব-রেজিস্ট্রারের কাজে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ...

এমনি সময়ে নিমতিতার (জগতাই-এর পাশের গ্রাম) গুণগ্রাহী ও বদান্য জমিদার শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী[১] এগিয়ে এলেন ক্ষুব্ধ ও হতাশ পিতার কাছে, অভিনব এক প্রস্তাব নিয়ে। তাঁরই আগ্রহ ও পরামর্শে ক্ষিতীন্দ্রনাথকে ভর্তি করা হলো 'কলকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট' স্কুলে। একটি মূল্যবান জীবনের নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো। ভারতীয় চিত্রাংকন ও ললিতকলার জগতে স্বর্ণোজ্জ্বল ও গরিমাময় এক নূতন অধ্যায় সূচনার ক্ষিতীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন মহেন্দ্রনারায়ণ। মহেন্দ্রনারায়ণের প্রতি ক্ষিতীন্দ্রনাথ কতোখানি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৫৪ সালে মহেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী রাধানাথ চৌধুরীর কাছে লেখা একখানা চিঠিতে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ভগবান যদি কোনও সুনাম আমায় দিয়ে থাকেন, তাহা কেবল মহেন্দ্রদাদার জন্যই। কারণ তিনি যদি পিতাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ না করিতেন, তাহা হইলে আর্ট স্কুলে যাওয়া আমার কখনই হইত না।'

ক্ষিতীন্দ্রনাথ যখন আর্ট স্কুলে ভর্তি হন, তখন সেখানকার প্রধান ছিলেন পারসি ব্রাউন। এক বছর পর অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ চেষ্টায় তিনি ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং ক্লাসে যোগদানের সুযোগ পান। তিন চার বছর ধ'রে অনেক ছবি আঁকলেন— কিন্তু কোনও প্রদর্শনীতে সেগুলো দেখানো হয়নি। চোখে স্বপ্নের কাজল নম্র লাজুক ছেলেটিকে আর দশজনের মাঝখান থেকে চিনে নিলেন

নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে নিমতিতা হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। অভিনয় নৈপুণ্য ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণে, স্বল্প শিক্ষিত গ্রাম বাংলার মানুষকে নিয়ে একটি শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। বিষয়ঃ মুর্শিদাবাদ, ২০০৪, ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রথম সংকলনে এ বিষয়ে বর্তমান নিবন্ধকারের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।



'চিত্রে গীতগোবিন্দ' চিত্র মালার অনবদ্য সৃষ্টি— জয়দেব ও পদ্মাবতী

অবনীন্দ্রনাথ। গুরুর ভালোবাসা আর প্রেরণার দীপ্তিতে তরুণ শিল্পীর অন্তর হলো উদ্ভাসিত, সৃষ্টির ফসল উঠলো উচ্ছলিত হয়ে।

বন্ধু-সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' নামক গ্রন্থে লিখেছেন— "স্বল্পকাল মধ্যেই সে উন্নীত হ'ল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল'-এর অধ্যক্ষ পদে। এই সময়েই ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসীতে' তাঁর বিখ্যাত 'বিজলী চমকে' ছবিখানি প্রকাশিত হয়। ক্ষিতীন ছিলো ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ ছবির সংখ্যায় বেশি তাঁর। সে সব ছবিতে ভক্তির ব্যঞ্জনা রূপলাভ করেছে ভক্তের নিপুণ তুলিকায়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার ছবিগুলোতে ক্ষিতীন একটা অনন্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে শিল্পী মহলে। তাঁর একটি অসাধারণ ছবি, 'শ্রী কৃষ্ণভ্রমে শ্রীরাধার 'তমাল তরু আলিঙ্গ ন'। কাণ্ড-শাখা-পত্রপল্লব সমন্বিত তমাল তরুটি এমন নিপুণ হাতে আঁকা, দূর থেকে দেখলে মনে হয়— যেন শ্রীকৃষ্ণেরই নয়নাভিরাম মূর্তি।' ক্ষিতীনের ভাব-সমৃদ্ধ ছবিগুলির অন্যতম— 'জগাই মাধাই উদ্ধার' ১৩২৭ সালে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই ভক্ত-ভাবুক শিল্পী শিষ্যের কীর্তন গানের কথা একদিন কাকা রবীন্দ্রনাথকে জানালেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গান শুনবেন, ঠাকুর বাড়িতে ডাক পড়লো ক্ষিতীন্দ্রনাথের। বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলী, মধ্যস্থলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। ভাব তন্ময় সুরেলা কণ্ঠের পদাবলীর গান এক নব ঔন্মাদনাময় সুরলোকে উত্তীর্ণ করলো সকলকে। মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রশংসায় অভিসিঞ্চিত হলো ক্ষিতীন্দ্রনাথের অন্তরলোক।

শিল্পীর চিত্রাংকন দক্ষতার প্রতিও আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গুরু অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'চৈতন্যসিদ্ধ' রূপে চিহ্নিত ক্ষিতীন্দ্রনাথকে একবার কবিগুরু বললেন, 'ছবিতে রাধাকৃষ্ণের দরকার নেই। তুমি ঘন কৃষ্ণ মেঘে বিদ্যুতের খেলায় রাধাকৃষ্ণের বিমূর্ত ছবি এঁকে দেখাও'। শিল্পী আঁকলেন সেই ছবি, দেখালেন রবীন্দ্রনাথকে— খোলা জানালা, পাশে একলা বসে শ্রীমতী রাধা আকাশের বজ্রমেঘে বিমূর্ত তাঁকেই দেখছেন।' চিত্রাংকন রীতির প্রশংসা করলেন কবি। পরে গুণমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ স্নেহাবদ্ধ শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথের ৬/৭ খানি ছবি সংগ্রহ করেছিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি ক্ষিতীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ও অভিনিবেশ ছিল নিবিড়। তাঁর শিল্পপ্রেরণার মূলেও ছিলো বাংলা সাহিত্য 'কৌস্তভ মনি স্বরূপ' বৈষ্ণব গীতিকাবলী। বৈষ্ণব কবিগণের অপরূপ ভাবোন্মাদনা কখনও ক্ষিতীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কীর্তন হয়ে, কখনও বা তাঁর তুলিকায় শিল্পসৃষ্টিরূপে রূপের রাজ্যে ধরা দিতো। — এ ক্ষিতীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট দিক। শিল্প সাধনা তাঁর কাছে ছিলো দেবার্চ্চনার মতো— ভাবসমাহিত ক্ষিতীন্দ্রনাথকে মনে হতো রং-তুলি-ক্যানভাসের সামনে দেবপূজায় মগ্ন এক ভক্ত প্রাণ।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী, উন্নত নাসা, বিনয়-নম্র, সুদর্শন, লাবণ্যমণ্ডিত, অসামান্য এক দেহ-রূপের অধিকারী।

বিলেতের রয়্যাল আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ একবার কলকাতা আর্ট স্কুল দেখতে এসে অত্যন্ত আগ্রহ করে ক্ষিতীন্দ্রনাথের তিনখানি স্কেচ করেন। এই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথের কাছে রোদেনস্টাইনের "আমি শুধু এই ছেলেটিরই স্কেচ করিতে চাহি। আমি সমস্ত আর্ট স্কুল ঘুরিয়ে দেখিলাম, এমন শান্ত ভারতীয় মুখ দেখিতে পাইলাম না।" মন্তব্যটি স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি সানন্দে 'শ্রী রাধার অভিসার' ছবিখানি ক্রয় করেছিলেন।

১৯১১ সালে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে'র এক প্রদর্শনীতে ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রথম সাতখানি ছবি দেখানোর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ও তাঁর পত্নী ক্ষিতীন্দ্রনাথের শিল্প কর্মে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন এবং একখানি ছবি ক্রয় করেন। পর বৎসরও ক্ষিতীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' ছবিটি ক্রয় করেন লেডি হার্ডিঞ্জ।

জর্জ্জ রোনাল্ডসে ৫ বছর বাংলার গভর্ণর ছিলেন। তিনিও অন্তত ২০/২২ খানি ছবি ক্রয় করেন তরুণ শিল্পীর। তিনিই শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছবির প্রাধান্য দেখে শিল্পীকে 'Vaisnab Artist' এই আখ্যায় চিহ্নিত করেন।

এঁরা শুধুমাত্র শিল্পীর শিল্পকৃতির ক্রেতাই ছিলেন না, খ্যাতির পাদপ্রদীপের আলোয় 'ক্ষিতীন্দ্রনাথ' নামটিকে প্রথম তুলে ধরেন তাঁরাই।

তিনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কতোখানি প্রিয় ছিলেন, তা ক্ষিতীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন 'চিত্রে গীত গোবিন্দ' নামীয় চিত্রসংকলন গ্রন্থে— "আমি একদিন একখানি ছবি আঁকিতেছি— 'শ্রী চৈতন্যের গৃহত্যাগ'। ছবিখানি অর্ধেক হইতেই তিনি আমাকে বলিলেন— 'এ ছবিটি যেন কাউকে দিও না'। ছবিখানি শেষ হইলে ঠাকুর মহাশয় দুইশত টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই তোমার ছবিখানির মূল্য'। আমি গুরুর নিকট হইতে কী করিয়া টাকা লইব, ভাবিতেছি। তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। ইহা ছাড়াও তিনি আমার ৩/৪ খানি ছবি কিনিয়াছিলেন।'

— শিষ্যের কী অসাধারণ শিল্পকর্ম, আর শিল্পগুরুও কী অসামান্য গুণগ্রাহিতা ও স্নেহ-উদারতা।

'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' স্কুলে থাকাকালীন সোসাইটির কাজের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে তাঁর কীর্তন শিক্ষার দীর্ঘ অনুশীলন। এই কীর্তন ও পদাবলী গান শিক্ষার অনুশীলন তাঁর সমগ্র মননসত্ত্বাকে গভীরভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছিল, তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আজীবন।

শিল্প সমালোচক রূপে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও. সি. গাঙ্গুলী তাঁর Kshitindranath Majumder নামক গ্রন্থের শুরুতেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় চিত্রকলায় নবযুগ আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হলে ক্ষিতীন্দ্রনাথের অপরূপ শিল্পকর্মের অবদান অপরিহার্য স্মারক ও চুম্বক

রূপে (epitome) পরিগণিত হবে।

সুদীর্ঘকাল কোলকাতায় সোসাইটির কাজে যুক্ত থেকে ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছবি ছড়িয়ে আছে দেশে বিদেশে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু শিল্পী ও সমালোচকের অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসার অর্ঘ নিবেদিত হয়েছে শিল্পীর উদ্দেশ্যে। নেপালের রাজপরিবার যাদুঘর, কলকাতা আশুতোষ মিউজিয়াম, লাহোর যাদুশালা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরই নামে উৎসর্গীকৃত 'চিত্র বীথিকা ভবন', দিল্লী ন্যাশনাল মিউজিয়াম, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত নিউ দিল্লী কলা ভবন, শান্তি নিকেতন কলাভবন, ললিতকলা অ্যাকাডেমি চিত্রসংকলন (এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড প্রকাশিত চিত্রে গীত গোবিন্দ' গ্রন্থ প্রভৃতিতে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে ক্ষিতীন্দ্রনাথের অনন্য শিল্পসৃষ্টির স্বর্ণসংগ্রহ। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহেই শিল্পীর ছবির সংখ্যা সর্বাধিক।

চাকরির তাগিদে বাইরে থাকলেও জন্মভিটের প্রতি, আপন গ্রাম, গ্রামের মানুষ





ক্ষিতীন্দ্রনাথ অঙ্কিত 'রত্ন-সম্ভার'-এর দুটি অনবদ্য চিত্র। জল রঙে ওয়াস পদ্ধতিতে আঁকা।

গ্রামের পল্লী প্রকৃতির উপর ছিলো তাঁর প্রাণের অসীম-অবুঝ মমতার টান ও আকর্ষণ। সুযোগ পাওয়া গেলেই, ছুটে আসতেন গ্রামে। গ্রাম ছেড়ে শহরবাস তাঁর কাছে ছিলো 'বনবাস' কবিতায় প্রকাশিত বিশিষ্ট পল্লী কবি, বনবাস। কুমুদরঞ্জনের মতোই সহর জীবনে তাঁর অন্তরও যেন সর্বদা হাহাকার ক'রে বলতো 'বনবাস মোর শেষ হবে কবে, ...।

ফাইলেরিয়ার আক্রমণে হাঁটা-চলাতে কষ্ট হতো। তবু গ্রামে এলে গ্রামের পথে পথে, কারণে-অকারণে ঘুরতেন নগ্নপদে। যেন ভক্ত ভাবুকের তীর্থ পরিক্রমা। ভারত বিখ্যাত শিল্পীর শান্ত, নজরকাড়া সেই রূপ আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। গ্রামের গোয়ালা, নাপিত, চাঁই প্রভৃতি সকলকে নিয়ে মেতে উঠতেন সংকীর্তন গানে। কখনও নিজ গৃহে কখনও গুরুপাট— আমাদের 'জগতাই ঠাকুর বাড়ি'র নাটমন্দিরে কীর্তনের আসর বসতো। অমায়িক শিল্পী একদিকে যেমন ছিলেন শিশুর মতো সরল, তাঁর পোষাক পরিচ্ছদও তেমনি ছিলো বাহুল্য-বিলাসিতা বর্জিত নিতান্ত সাদাসিধে ও সাধারণ। সভা-সমিতি, রাজা-মহারাজা, উচ্চ সরকারি পদাধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার— সর্বত্রই তাঁকে কাঁধে ভাঁজ করা একখানি সুতির চাদর ও ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় দেখা যেতো। সংবর্ধনা বা সম্মান জ্ঞাপনের জন্য উদ্যোগী, আয়োজকদের বিলাসবাহুল্যেভরা ব্যবস্থাতে কোনওদিনই সায় থাকতো না তাঁর। সৌখিন নামী দামী হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলে, ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে বা বিমানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করতেন। ভ্রমণ করতেন সাধারণ যাত্রীর মতো সাধারণভাবে। বাড়িতে, গ্রামের রাস্তায় সচরাচর তাঁর পরণে থাকতো ধুতি ও হাফ হাতা একটি গেঞ্জি মাত্র। তাঁর ছিলোনা আত্ম-পর বিভেদ বা কোনও বিষয়ে গোপনীয়তা। নিজের হাঁড়ি হাটে ভাঙায়, নিজেকে আর আত্মীয় পরিজনদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে কতোবার। তবু ...। এমনি অসাধারণভাবে সাধারণ মানুষের একজনের মতো ছিলেন তিনি, তাঁর জীবন চর্যায় — চিরকাল। শেষ জীবনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সামান্য পেনশনের টাকা কটি সম্বল করে সংসার ভার নির্বাহে এই মহান শিল্পীকে চরম অর্থসংকটে পড়তে হয়েছে অনেক সময়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, কন্যাদায়গ্রস্ত শিল্পী-পিতাকে শিল্প পসরা নিয়ে ফেরিওয়ালার মতো অর্থসংগ্রহের জন্য বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু ঈশ্বর-নির্ভর, চিরপ্রশান্ত ও স্বল্পে সন্তুষ্ট— সদা হাস্যময় ক্ষিতীন্দ্রনাথকে কখনও ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন (Commercial) হ'তে দেখা যায়নি। চটুল গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস প্রভৃতির প্রচ্ছদপট এঁকে দেওয়ার জন্য বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে আসতো। কিন্তু এক্ষেত্রে শিল্পীর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট, 'শিল্পের সাধক আমি, আমার তুলি জাত দেয় না।'

শিল্পীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ মজুমদারের উপর্য্যুপরি পত্রাঘাতে এবং কয়েকটি বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় কড়া মন্তব্য ও সমালোচনায় শেষ পর্যন্ত জাতীয় সরকারের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁর জন্য মাসিক সরকারি ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর অসুস্থতার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী ও করণ সিং-এর সহৃদয় সহযোগিতা ও অর্থ সাহায্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সরকারি আনুকূল্যে পদ্মের ছড়াছড়ি দেখি, ফি-বছর। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ক্ষিতীন্দ্রনাথের নামটি 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ' কোনও তালিকায় স্থান পেলো না।

'ললিতকলা আকাডেমি' (দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশ) ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পীকে সম্মান ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে আপন আপন প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাই বৃদ্ধি করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইংরাজি ১৯৭৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ইথার তরঙ্গে প্রচারিত হলো মহাশিল্পীর মহাপ্রয়াণের মর্মান্তিক সংবাদ। আমাদের চিত্ত হাহাকার ক'রে উঠলো চরম শূন্যতার নিষ্ঠুর আঘাতে।

জানি শিল্পসাধক ক্ষিতীন্দ্রনাথ মৃত্যুহীন। তাঁর সৃষ্টির সোনার ফসল তাঁকে অমর করে রাখবে ভারতীয় চিত্রাংকন ইতিহাসে। সেখানে বিরাজ করবেন তিনি, বাধাবন্ধন-বিচ্ছেদ-তুচ্ছতার পরপারে অমৃতলোকের এক দিগ্‌দিশারি ধ্রুবতারা হয়ে।

কিন্তু তবু, তবু মহান শিল্পীর দুর্লভ মহত্তর এক জীবনের সঙ্গ-সান্নিধ্য থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত হওয়ার বেদনায় কোনও সান্ত্বনাই মানেনা গ্রামের মানুষ, কাছের মানুষ, আমাদের মন। কেন জানি, বারবার বলতে চায় যেন—

'তোমার সৃষ্টির চেয়ে,
তুমি যে মহৎ।'



ক্ষিতীন্দ্র মজুমদারের রেখা ও বর্ণের সুমধুর আঙ্গিকে পরিস্ফূট ভারতীয় চিত্রকলার সুরুচিসম্মত রূপ।

তথ্য সহায়তা —
১। শিল্পীর বাল্যবন্ধু 'নলিনীকান্ত সরকারের— আসা যাওয়ার মাঝখানে' গ্রন্থ।
২। চিত্রে 'গীত গোবিন্দ'— এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত।
৩। O. C. Ganguli রচিত Kshitindra Nath Majumder.
৪। ললিতকলা অ্যাকাডেমি চিত্রসংকলন (দিল্লী কেন্দ্র)।
৫। শিল্পীপুত্র রথীন্দ্রনাথ মজুমদার ও মাধবেন্দু মজুমদার।
৬। শিল্পীর বাল্যবন্ধু ঁঅবনীভূষণ দাস।
৭। ছবির প্রতিলিপিগুলি শিল্পী পুত্র মাধবেন্দু মজুমদারের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।



বাংলার প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদের পাট

চন্দ্রপ্রকাশ সরকার

খরিফ মরসুমে মুর্শিদাবাদ জেলায় বাগড়ি এলাকায় চলার পথে দুটি ভিন্ন গ্রামের দু'জন পরিচিত কৃষিজীবীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হলে তাদের বাক্যালাপ শুরুই হয় এইভাবে ঃ "খবরটবর সব ভাল তো? ধান-পাটের খবর?" বাড়িতে 'লোক-কুটুম' এলেও বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, "মাঠে ইবার পাট-পানি ক্যামুন?" বস্তুত 'শস্য মিউজিয়াম' শিরোপাপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর এই জেলার কয়েক লক্ষ কৃষিজীবীর ভাগ্য জড়িয়ে রয়েছে পাটের আঁশের সাথে। বছরের পর বছর পাটের লাভজনক দর না পেয়ে পেয়ে অনেকেই এখন হতাশ। বাবার বয়সী বহু বয়ঃবৃদ্ধ সহজ সরল চাষীকে সৌজন্যবশত কুশল সংবাদ জানতে চেয়ে বেকায়দায় পড়তে হয় অনেক সময়। 'ভাল আছেন' কিনা জানতে চাইলে গভীর দীর্ঘশ্বাস মেশানো মিয়ানো কণ্ঠের উত্তর আসে— "কি কর্যা ভাল থাকবো বাপ? পাটেই তো সাট কর্যা দিল ইবার।" 'একদিন প্রতিদিন'-এর মত প্রতিবারই ঘুরেফিরে আসে 'ইবার'। ভেঙেচুরে যায় বছরভর সাজানো চাষীর সব পরিকল্পনা, ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় তার সব স্বপ্ন, সব সাধ-আহ্লাদ। তবু 'আশায় চাষা খাটে'। পাট বোনে। পাট কাটে। পাট-পচা জলে শরীর পচায়। শরীরের রক্ত শুকিয়ে পাট শুকায়। লাভের কড়ি জমা হয় 'বিশ্বায়ন'-এর ঘরে। সেসব কথায় পরে আসা যাবে, আপাতত পাট চাষের সাধারণ ইতিবৃত্ত খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা যাক।

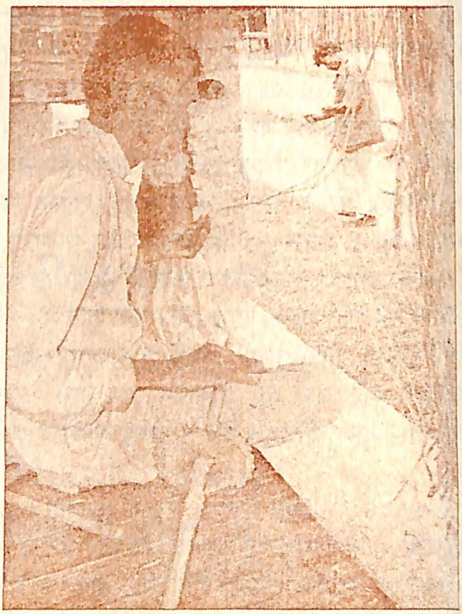
১৩২৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় (মে-জুন, ১৯১৭) সংখ্যা 'গৃহস্থ' পত্রিকায় লেখা হয়েছে— 'বঙ্গদেশে পুরাকাল হইতে ঔষধাদিতে ও অন্যান্য নানা প্রকারে পাটের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও বর্ত্তমান পাটের বাণিজ্যের ইতিহাস ইংরাজ রাজত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট।" পাটের নানা প্রকার প্রাচীন ব্যবহারের মধ্যে অবশ্যই প্রধানতম ছিল দড়ি-দড়া বা রশি-রশার ব্যবহার। এখনও

আমাদের জেলার লোকজীবনে 'গোক্ষুনাথের পাঁচালী' বা 'হাঁচ্চো' গাওয়ার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তাতে মূলত 'পাটের দড়ি'র নামে পাটেরই মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে। পাঁচালীর কিছু অংশ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা যাক।

সূত্রধর ঃ উত্তুর থেক্যা, আসছে হাতি-ই-ই ...
— হাঁচ্চো! (সমবেত কণ্ঠে)
সূত্রধর ঃ হাতি বুলে কি, আমি বড় বী-র,
— হাঁচ্চো!
সূত্রধর ঃ পাটের দড়িতে, সে অস্থি-র!
— হাঁচ্চো!
সূত্রধর ঃ উত্তুর থেক্যা, আসছে ঘুড়া-আ ....
— হাঁচ্চো!
সূত্রধর ঃ ঘুড়া বুলে কি, আমি বড় বী-র,
— হাঁচ্চো!
সূত্রধর ঃ পাটের দড়িতে, সে অস্থি-র!
— হাঁচ্চো!

এইভাবে হাতি, ঘোড়ার পর একে একে গরু, ছাগল, ভেড়া সবাই আসবে। সবাই কেন যে 'উত্তুর থেক্যা' আসবে তার উত্তর পাওয়া না গেলেও সঙ্গতকারণেই সবাইকে 'পাটের দড়িতে অস্থির' হতেই হবে। সামনের সবুজ ক্ষেত মুহুর্মুহু হাতছানি দেবে, অথচ 'পাটের দড়িতে' বাঁধা পড়ায় ক্ষুধাতুর পেটেও ক্ষেতের দিকে পা বাড়ানো যাবে না, এমন হলে কোন পশু না অস্থির হয়! অনুমান করা যায়, কৃষিকাজ শুরু হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই গবাদি পশুরা 'দড়িতে' বাঁধা পড়তে শুরু করেছে, সে দড়ি হতে পারে বন্য পাটের অথবা অন্য কোনও তন্তু বা আঁশের।

দড়ির পরে পরেই মানুষ সম্ভবত পাটকে ব্যবহার করেছে কাপড় তৈরির কাজে। ১৫৯০ সালের আইন-ই-আকবরীতে 'Sackcloth' বা চটের কাপড় (tat)-এর উল্লেখ আছে। এখন থেকে প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে (১৮২৮) গরীব মানুষেরা হস্তচালিত তাঁতে তৈরি পাটের কাপড় পরতেন বলে জানা যায়। পরিকল্পিতভাবে পাটের আবাদ মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে শুরু হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস' (১৯১২) গ্রন্থে লেখা হয়েছে —



'টাকুর'-এ দড়ি কাটছেন বহড়ানের বর্ষীয়ান চাষী কাইমুদ্দিন, সামনেই দড়ি ভাঙাচ্ছে যুবক।

"সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, তুলার চাষ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলেই, এই অভিনব কৃষিশিল্পের দিকে কৃষক দিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে প্রতি মণ পাট ৷৷৹ আনার (আট আনার) অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত না।" শ্রীরায়ের ওই লেখা থেকেই জানা যাচ্ছে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটের দর ছিল প্রতি মণ এক টাকা চার আনা। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দর বেড়ে হয় আড়াই টাকা এবং 'বর্ত্তমান (১৯১২) সময়ে ৭৷৷৹ (সাড়ে সাত) হইতে ১০্ টাকা মণ চলিতেছে।' যাইহোক, কৃষিজ এই পণ্যটিকে অবলম্বন করে যে সমস্ত শিল্পসামগ্রী যুগ যুগ ধরে মানুষ তৈরি করে আসছে সেগুলি হলো, চটের থলে, মাদুর, নৌকার পাল, ত্রিপল, কম্বল, হেসিয়ান ইত্যাদি। ইংরেজ আমলে উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও জেলায় পাট থেকে কাগজও তৈরি হতো।

পাট চাষের ইতিহাস বেশ পুরোনো হলেও এই চাষ ব্যাপকতা লাভ করে বহির্বাণিজ্য শুরু হওয়ার পর। বাণিজ্যিকভাবে এদেশের পাট প্রথম বিদেশে যায় ১৮২৮ সালে। সে বছর কলকাতা বন্দর দিয়ে ৩৬৪ হন্দর বা ৪৫৫ মণ পাট ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছিল। তার প্রায় ২৬ বছর পরে এদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৪ সালে, মহারাষ্ট্রের ডাণ্ডীতে। ওই বছরই এই রাজ্যের হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের কাছে রিষড়াতে ('Ishera') স্থাপিত হয় 'Ishera Yaran Company'। তার তিন বছর পর ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয় বরানগর জুট মিল, যার পূর্বতন নাম ছিল 'Borneo Company Limited'। তারপর ১৮৬৩-৬৪তে গৌরীপুর জুট ফ্যাক্টরী তৈরি হওয়ার পর পরই কলকাতার চারধারে প্রচুর পাটকল গড়ে ওঠে। ১৮৬৯-৭০ সালের ট্রেড রিটার্ণ থেকে জানা যায়, ওই বছর যন্ত্রচালিত ও হস্তচালিত তাঁতে তৈরি ৬৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৬৩ টি চটের বস্তা বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছিল। তার দশ বছর পর (১৮৭৯-৮০) ওই সংখ্যা বেড়ে হয় ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮ হাজারটি। ১৯০৮ পর্যন্ত এদেশে মোট ৪৪ টি পাটকল ছিল, তারমধ্যে একটি মাত্র মহারাষ্ট্রে, বাকি সবই বাংলায়। ১৯১৭ সাল নাগাদ দেশে পাটকলের সংখ্যা হয় ৬১টি। সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় লেখা হয়েছে— "সেই বজবজের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত হুগলীর পারে ৮৫/৮৬ টা পাটকল আছে।" তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৯০৭ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে, মাত্র বিশ বছরে এদেশে পাটকলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। দেশে পাটের চাষ বেড়েছে। পাটকলের সংখ্যা বেড়েছে। কল-মালিকের মুনাফা বেড়েছে। আর সেই সঙ্গে বেড়েছে পাটচাষীদের ক্ষতির খতিয়ান এবং দুঃখ-দুর্দশাও। সেই ১৯৩২ সালেই চাষের খরচ তুলতে না পেরে পাটচাষীরা মনের জ্বালায় গায়ের রক্ত জল-করা ফসল নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ওই বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে প্রকাশিত 'প্রবর্তক'-এ লেখা হয়েছে— 'পদ্মার স্রোতে এবারও হয়ত পাটের রাশি ভাসাইয়া দিতে হইবে।" ওই কাগজেই ১৯২৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে 'পল্লী সংস্কার সমিতির প্রতিনিধি' লিখেছেন, "পাটের বাজার মন্দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যও ক্রমেই অচল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে প্রতি মণ পাট উৎপন্ন করিতে কৃষকদের প্রায় আট টাকার মত খরচ পড়িয়া থাকে, সেখানে বর্তমানে প্রতি মণ পাটের মূল্য ৬৷৷৹ সাড়ে ছয় টাকা হইতে ৭্ টাকা মাত্র হওয়ায়, পাট চাষে কৃষকেরা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিলেও চলে। ... আজ কৃষক তথা পল্লীবাসীর মনে প্রাণে একটা অসন্তোষের প্রধূমিত অগ্নিপ্রবাহ খেলিয়া চলিয়াছে, সামান্য হাওয়া পাইলেই উহা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দিগ্‌দাহী দাবানলের সৃষ্টি করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

'পাটের বাজার মন্দা' হলেও পাটকলগুলির লাভের অঙ্ক যে মোটেই মন্দ নয়, তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'আর্থিক উন্নতি'র প্রতিবেদনে— ''এক একটা পাটকল ২৫/৩০ লাখ টাকা ডিভিডেণ্ড দেয়। বাঙ্গালার জমিদারের মধ্যে বর্দ্ধমানই শ্রেষ্ঠ। ইহার আয় ধরুন বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটা জুটমিলের আয় আমাদের বৃহত্তম জমীদারের আয়ের চাইতে বেশী। আবার জুটমিলগুলির ম্যানেজিং এজেন্ট আসল মজা উড়ায়। তাহারা লুটপাট করিবার পরও শতকরা ২০০/৩০০ ভাগ লভ্যাংশ দিতে পারে।'' ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় (মে-জুন, ১৯১৭) সংখ্যা 'গৃহস্থ' পত্রিকায় লেখা হয়েছে— ''গত বর্ষে স্থানীয় পাটের কল সমূহে এত প্রচুর লাভ হইয়াছে যে পূর্ব্বে কখনও এরূপ লাভ হয় নাই। ১৯১৫ সালের বিপুল লাভের পরিমাণ ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ বৎসরের শেষ ছয় মাসের লাভ বটে।'' বলা হয়েছে, ''অবশ্য গত বর্ষের লাভ অস্বাভাবিক, কিন্তু এই ব্যবসায়ে যাহা স্বাভাবিক লাভ, তাহাও তুলনায় অন্যান্য ব্যবসায়ের পক্ষে অস্বাভাবিক বটে।'' ১৯১৫ সালের 'ইণ্ডিয়ান ইয়ার বুক' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'স্বাভাবিক লাভেরও একটু পরিচয়' দেওয়া হয়েছে— ''বরাহনগর পাটের কল কোম্পানী বর্ত্তমান সময়ে প্রতি মাসে তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে।'' ওই লেখাতেই মন্তব্য করা হয়েছে— ''কলিকাতা বন্দর হইতে সর্ব্বপ্রকারে যত বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়, তৎসমুদয়ের মোট মূল্যের শতকরা ৬০·২১ অংশ এক পাটের মূল্য দ্বারায় পূরণ হইয়া থাকে।'' ১৯১৩-১৪ সাল থেকে ১৯১৫-১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি বাণিজ্যের বিস্তারিত তালিকাও সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাতে 'বিবিধ' সহ ৪২টি পণ্যদ্রব্যের নাম, কোন পণ্য থেকে কত টাকা এবং মোট আয়ের শতকরা কত অংশ আয় হয়েছে তা-ও পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। তথ্যসহযোগে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে— ''পাট বঙ্গদেশে কৃষি সম্বন্ধে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও বণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।''

১৮২৮ সালে পাটের বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বঙ্গদেশে পাটের চাষ হতো অল্প পরিমাণ জমিতে। স্থানীয়ভাবে পাট বিক্রি হতো বড়জোর এক টাকা মণ দরে। সধারণভাবে পাট বিক্রি হতো এক পয়সা 'সের'। পাটের বিলেত যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে দরও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার বাজারে প্রতি গাঁট (৫ মণের বাণ্ডিল) পাটের দর ছিল পাটের মান অনুযায়ী ৪ টাকা থেকে ৯ টাকা। ওই বছর জুলাই মাসে ওই দর হয় ৮ থেকে ১০ টাকার মধ্যে। ১৮৮২ সালে উন্নত মানের পাটের প্রতি গাঁটের দর ওঠে ৩০ টাকায়। তারপর বছর পাঁচেকের জন্য দর নেমে যায় ২৫ টাকায়। এরপর আবার দর বাড়তে বাড়তে ১৮৯৪ সালে প্রতি গাঁট পাট বিক্রি হয় ৪৪ টাকায়। তারপর ফের দর পড়তে থাকে। ১৯০৪ সালে দর হয় প্রতি গাঁট ৩৬ টাকা। তারপর আবার দর উঠতে থাকে। এইভাবে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে পাটের বাজার। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে কলকাতার বাজারে প্রতি গাঁট পাটের দর কত ছিল তা নিচের সারণীটি থেকে জানা যাবে। সারণীটি ১৯০৮ সালে প্রকাশিত পাট বিশেষজ্ঞ এন সি চৌধুরীর 'জুট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রতি গাঁট (৫ মণ) পাটের দর

সাল	উঁচু মানের পাট				সাধারণ মানের পাট			
	জানুয়ারি		জুলাই		জানুয়ারি		জুলাই	
	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা
১৮৯৫	৩২	০	৩৬	০	৩০	০	৩৪	০
১৮৯৬	৩২	০	৩৮	০	২৯	৮	৩৫	০
১৮৯৭	৩৭	০	৩৪	০	৩২	০	৩১	০
১৮৯৮	২৪	০	২৯	০	২৩	০	২৬	৮
১৮৯৯	৩১	০	৩১	০	২৮	৮	২৮	৮
১৯০০	৩৫	৮	৩৬	৮	৩২	৮	৩৫	৮
১৯০১	৩৪	০	৩৮	৮	৩০	০	৩৪	৮
১৯০২	৩২	৮	৩৫	৮	২৮	০	৩৪	০
১৯০৩	৩৭	০	৩৫	৮	৩৩	০	৩৪	০
১৯০৪	৩৬	০	৩৫	০	৩১	৮	৩৩	০
১৯০৫	৩৫	০	৪১	০	৩৩	০	৪০	০
১৯০৬	৫১	০	৭৪	০	৪৫	৪	৬৭	৪
১৯০৭	৮১	৪	৭৩	০	৫৮	৪	৪৫	৮

বঙ্গ প্রদেশের রপ্তানি পণ্য হিসেবে পাটের স্থান যেমন বরাবরই এক নম্বরে, তেমনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও একইভাবে এই পাট বা পাটজাত শিল্পসামগ্রী অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। ১৯২৬-২৭ সালের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ওই বছর ভারতীয় পণ্যের মোট রপ্তানি মূল্যেব শতকরা ২৪ শতাংশ এসেছিল পাট থেকে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯২৬) ফাল্গুন সংখ্যা 'আর্থিক উন্নতি'তে লেখা হয়েছে— ''পাটের কারবার যদি আমাদের মুঠার মধ্যে থাকিত বঙ্গালা দেশ সবচেয়ে ধনী দেশ হইত।'' লেখা হয়েছে— ''পাট ও তুলার মধ্যে প্রধান্যলাভের জন্য একটা লড়াই অনবরত চলিতেছে। তার ফলে কখনো পাট কখনো বা তুলা প্রধান রপ্তানি-পণ্য রূপে পরিগণিত হইতেছে।'' কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির একটা হিসাবও টাকার অঙ্কে পেশ করা হয়েছে। হিসাবটি নিচে তুলে দেওয়া হলো।

সাল	কাঁচা পাট (কোটি টাকায়)	পাটজাত সামগ্রী (কোটি টাকায়)
১৯২২-২৩	২২.৫৩	৪০.৪৯
১৯২৩-২৪	২০.০০	৪২.২৮
১৯২৪-২৫	২৯.০৯	৫১.৭৭
১৯২৫-২৬	৩৭.৯৫	৫৮.৮৪

উপরোক্ত হিসাব পেশ করে মন্তব্য করা হয়েছে— ''পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্যই হোক বা দাম বৃদ্ধির জন্যই হোক পাট ম্যানুফ্যাক্চার (পাটশিল্প) বাবদ আমাদের লাভের অঙ্কটা ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটের বাবদ প্রাপ্ত মূল্যটা বাড়িতেছে না। অর্থাৎ কাঁচা পাটের বাজার অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাই চাষী টান-যোগানের হদিস্ পায়না ও তাল সামলাইতে পারে না। কিন্তু পাট ম্যানুফ্যাক্চারের (পাট-শিল্পের) বাজার খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মাধীন। এই বাজার প্রায় সবটাই ইউরোপীয় ব্যাপারীদের তাঁবে রহিয়াছে। সুতরাং লাভটা তাদের পকেটে যাইতেছে।''

এখানে একটা ব্যাপার বোধহয় আমাদের সবার বুঝে নেওয়ার সময় হয়েছে, সেটা হলো, 'ব্যাপারীরা' ইউরোপীয়ই হোক, আর ভারতীয়ই হোক, বাজার তাঁদের তাঁবে থাকলে লাভের গুড়টা তাঁরা তেমনভাবেই চেটেপুটে খেতে চাইবে, যাতে চাষীর ভাগ্যে চিটেগুড়ও না জোটে। শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা বরাবরই সংগঠিত এবং অতিরিক্ত স্বার্থ-সন্ধানী। তাই পাট উৎপাদনের বহর বুঝে তারা ইচ্ছেমত দরে পাট কেনে এবং পাটজাত সামগ্রী বিক্রিও করে ইচ্ছেমত দামে। ফলে পাটের দর যতই পড়ে যাক, পাটজাত সামগ্রীর দাম কখনও নিম্নমুখী হয় না। অভাবী-অসহায় চাষী শিল্পপতিদের বেঁধে দেওয়া দরেই পাট বেচতে এবং পাটজাত-শিল্প সামগ্রী কিনতে বাধ্য হন। দুঃখ-দুর্দশা সঙ্গ ছাড়ে না চাষীদের।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন, ১৯০৭) প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখা হয়েছে— "বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও পাট জন্মে না। বঙ্গদেশ আর কিছুদিন পাট আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিলে, বঙ্গদেশের প্রজাবৃন্দের সৌভাগ্য বহুপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।" লিখেছেন শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী, যিনি তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা সরকারের একজন পদস্থ আমলা (ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর) ছিলেন। তাঁর ওই উক্তির সময়ে তাবৎ পাট উৎপাদক অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম এবং কুচবিহার মূলত বৃহত্তর বঙ্গেরই অন্তর্গত ছিল। ১৯১৬ সালের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ওই বছর সারা দেশে ৮৩ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬৬ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়েছিল। তার মধ্যে মূল বঙ্গদেশেই (পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ মিলিয়ে) হয়েছিল ৭৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৭৫ গাঁট, যা কিনা মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৯.০৬ ভাগ। বাকি ১০.৯৪ ভাগ (৯ লক্ষ ১০ হাজার ৩৯১ গাঁট) উৎপন্ন হয়েছিল বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম এবং কুচবিহার মিলিয়ে (কুচবিহার তখন পৃথক রাজ্য ছিল, বিহার-উড়িষ্যা সম্ভবত একত্রে ছিল)। আজ এত বছর পরেও পাট চাষের ভৌগোলিক এলাকা মোটামুটি একই রয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক মানচিত্রে। আর বেড়েছে পাটের জন্য কর্ষিত জমির পরিমাণ, বেড়েছে উৎপাদনের হার। দেশ ভাগের ফলে বাংলা ভাগ হওয়ায় বিশ্ববাজারে আমাদের পাটের একাধিপত্য খণ্ডিত হয়েছে সত্য, তবু এখনও বিশ্ব-চাহিদার ৬০/৬২ শতাংশের যোগানদার আমরাই। আবার, আমাদের দেশে যত পাট উৎপন্ন হয় তার ৬০ শতাংশের বেশি হয় পশ্চিমবাংলায়। ১৯৯১-৯২ সালে সরকারিভাবে দেশে যে 'শস্যভুক্ত জমির পরিমাণ' ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মোট পাট উৎপাদনের ৬০ শতাংশই হয়েছে এই রাজ্যে। বাকি ৪০ শতাংশের বিভাজন এইরকম ঃ আসাম ১৫ শতাংশ, বিহার ১৪ শতাংশ, ওড়িশা ৭ শতাংশ এবং উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরা ও মেঘালয় মিলিয়ে মাত্র ৪ শতাংশ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন বছরে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের মোট পাট উৎপাদনের পরিমাণ এবং মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গের অংশ (%) নিচের সারণীতে দেওয়া হলো।

সাল	ভারত (হাজার গাঁট)	পশ্চিমবঙ্গ (হাজার গাঁট)	প. ব. মোট উৎপাদনের কত শতাংশ
১৯৪৭-৪৮	১৪৯২.২	৫৮৩.৬	৩৯.১১
১৯৭৮-৭৯	৫৮০৮.২	৩৭১১.৫	৬৩.৯০
১৯৮০-৮১	৮,১৫৯.৬	৪,৭০২.১	৫৭.৬২
১৯৯০-৯১	৯,২২৭.৫	৫,৫৪২.১	৬০.০৬
১৯৯৮-৯৯	৯,৭০০.০	৭,৪৫৪.৬	৭৬.৮৫
মোট	৩৪,৩৮৭.৫	২১,৯৯৩.৯	৬৩.৯৫

পাটের জাত



যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। আটের দশকের গ্রাজুয়েট, বহড়ান গ্রামের 'ডাক্তার' লিয়াকত আলি এখন বাড়ির প্রয়োজনে ট্যাঁড়া'য় দড়িও পাকান।

পশ্চিমবঙ্গে মূলত দুটি প্রজাতির পাটের চাষ হয় (১) মিঠা বা তোষা বা বঙ্গী পাট, যার বৈজ্ঞানিক নাম Corchorus Olitorius, (২) তিতা পাট, যার বৈজ্ঞানিক নাম Corchorus Capsularis। পাটের ফলের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই রকম নামকরণ করা হয়েছে। যে পাটের ফলগুলি লম্বা এবং স্বাদ মিষ্টি তাকে বলা হয় মিঠা বা তোষা পাট (C. Olitorius)। অন্যদিকে যে পাটের ফলগুলি গোলাকার এবং স্বাদ তেতো তাকে তিতা পাট (C. Caprularis) বলা হয়। ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মিঠা পাটকে 'দেশী'ও বলা হয়। সরকারিভাবে দেশিকে বলা হয় তোষা-দেশী বা T-D। মিঠা পাটকে আগে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলায় 'উত্তরে' নামেও ডাকা হতো। কোনও কোনও জেলায় তিতা পাটকে বলা হতো 'দক্ষিণা' বা 'লংকাগড়'। তিতা পাটের আঁশ দেখতে সাদা বলেই হয়ত একে 'বিলাতী'ও বলা হতো। ইংরেজদের চামড়ার রংয়ের সাথে তুলনা করেই বোধহয় এই ধরণের নামকরণ হয়ে থাকবে। যাইহোক, বন্যা বা খরা, দুইয়েরেই মোকাবিলা করার ক্ষমতা তিতা পাটের আছে। তাই ঘাতসহ এই পাট উঁচু জমিতে যেমন হয়, তেমনি হয় জল-জমা নিচু জমিতেও। তবে মিঠা পাটের তুলনায় এর উচ্চতা কম হয় এবং কাটার উপযোগী হতে সময়ও লাগে একটু বেশি। এর ফলনও মিঠা পাটের তুলনায় কিছুটা কম। আঁশের গুণমানের অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্টতার কারণে এর বাজার দরও অপেক্ষাকৃত কম। এই পাটের চাষ উত্তরবঙ্গ এলাকায়, বিশেষত কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বেশি। মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় মিঠা, তিতা দু'ধরণের পাটেরই চাষ হয়। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে, বিশেষত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দুই চব্বিশ পরগণা ও হুগলী জেলায় একচেটিয়াভাবে মিঠা পাটেরই চাষ হয়। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কিছু কিছু নিচু জমিতে এখনও তিতা পাটের চাষ হলেও হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার কোথাও তিতা পাটের চাষ হয় বলে জানা নেই। গত শতকের সাতের দশক পর্যন্ত সময়ে এ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের অনুন্নত জমিতে 'মোস্তা' নামে অপর একটি জাতের পাটের চাষ হতে দেখা যেত। সেই মেস্তা আজকাল প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

পাট চাষের এলাকা

কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই কম-বেশি পাটের চাষ হয়। এক সময় বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় এই চাষ হতো না, এখন সেখানেও অল্পস্বল্প হচ্ছে। রাজ্যের পাট উৎপাদক প্রধান জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম। পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলা পাট চাষের দৃষ্টে কখনও মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি থাকে, কখনও বা বেশ খানিকটা এগিয়ে থাকে। এই দুই জেলার পাট

চাষ এলাকার কয়েক বছরের তুলনামূলক তথ্য নিচে দেওয়া হলো।

নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার পাট চাষের এলাকা (একরে)

সাল	নদীয়া	মুর্শিদাবাদ
১৮৭২	১,০০০	৩,৬০০
১৮৮০	১৮,৬০০	২,৪০০
১৮৯৫	৪৪,০০০	২০,৩০০
১৯০০	৩৬,০০০	২৪,৮০০
১৯০৫	৪৫,০০০	৪৬,২০০
১৯১৬	৬৭,১৫৫	২৮,১৬৯
১৯২৬	—	৪১,০০০
১৯২৭	—	৩৩,০০০
১৯৮০-৮১	—	২,৮৩,৩৯৮
১৯৮৫-৮৬	—	২,৭০,৭৪৭
১৯৯১-৯২	৩,৫৩,৯০২	২,৩৫,৯০২
১৯৯২-৯৩	২,৯৮,৭৭৭	২,৩৪,৩৭০
১৯৯৯-২০০০	—	২,২৯,১২৫

১৯৯২-৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩০২ একর জমিতে পাটের চাষ হয়েছিল। তার মধ্যে শুধুমাত্র নদীয়া জেলাতেই চাষ হয়েছিল প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে। ওই বছর নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সম্মিলিত পাট-জমির পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৪৭ একর, যা কিনা ওই বছরের এই রাজ্যের মোট পাট-জমির ৪৩.২২ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবিভক্ত বাংলায় সবচেয়ে বেশি পাট চাষ হতো মৈমনসিংহ জেলায়। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগেই, ১৯০৫ সালে, ওই জেলায় পাটের চাষ হয়েছিল ৭ লক্ষ ৫ হাজার ২০০ একর জমিতে। ওই বছর মুর্শিদাবাদে পাটের চাষ হয়েছিল মাত্র ৪৬ হাজার ৮০০ একর জমিতে। উল্লেখ্য, ওই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার আয়তন অনেক বেশি ছিল। তবে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট চাষযোগ্য জমির কত শতাংশে ধান এবং কত শতাংশে পাট উৎপন্ন হয়েছে তার একটি তুলনামূলক তথ্য নিচে দেওয়া হলো ঃ

ফসল	**১৯৫১-৫২**	**১৯৫৬-৫৭**	**১৯৬০-৬১**
১। ধান চাষ	৫৬.৬০	৪৬.৮৮	৫০.০৬
ক) আমন	৪৯.৩৮	৩৪.২৭	৩৪.৪৫
খ) আউশ	১৫.০৫	১২.৩০	১৫.০৬
গ) বোরো	০.১৭	০.৩১	০.৫৫
২। পাট চাষ	১৩.৭৪	১০.১৩	৭.৯৫

সূত্র ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, ২০০৩

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ জেলায় পাট চাষের যে প্রবণতা ছিল তা এক দশকের মধ্যে অনেকখানি কমে যায়। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা

যাচ্ছে, আটের দশক থেকে পাটের চাষ ফের বাড়তে শুরু করে। ২০০২-০৩ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, জেলার মোট চাষযোগ্য জমির (৩,৬৫,০০০ হেক্টর) ৩৫.১৪ শতাংশে (১,২৮,২৯২ হেক্টর) পাটের চাষ হয়েছে। এ বছর (২০০৪) জেলায় 'বিশেষ পাট উন্নয়ন প্রকল্প'-এর অধীন ১২ টি ব্লকে মোট ৪৭ হাজার হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয়েছে বলে জানা গেছে। (সূত্র ঃ বর্তমান, ২০/০৮/০৪) ওই প্রকল্পাধীন সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলি হলো, লালগোলা, ভগবানগোলা-১নং ও ২নং, রানীনগর-১নং ও ২ নং, বেলডাঙ্গা ১ নং, ডোমকল, জলঙ্গি, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, হরিহরপাড়া এবং নওদা। উল্লিখিত তথ্য সত্য হলে বলতে হয়, গত বছর ওই ১২টি ব্লকে যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হয়েছিল তার অর্ধেক পরিমাণ জমিতেও এবার চাষ হয়নি। সাদা চোখে পাটভর্তি মাঠগুলির দিকে তাকালে সংবাদপত্রে পরিবেশিত তথ্য বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বর্তমানে জেলার ২৬টি ব্লকেই কম-বেশি পাট উৎপন্ন হয়।

২০০২-০৩ সালের এক হিসাব অনুযায়ী সবচেয়ে কম পাট চাষ হয়েছে কান্দি মহকুমার বড়ঞা ব্লকে, মাত্র ২০ হেক্টর অর্থাৎ দেড়শো বিঘা জমিতে। ওই বছর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পাট চাষ হয়েছে ডোমকল ব্লকে, ১৪ হাজার ৯০০ হেক্টর বা ১ লক্ষ ১১ হাজার ৭৫০ বিঘা জমিতে। ব্লকগতভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছে নওদা (১৩,২০০ হেক্টর) তৃতীয় স্থানে জলঙ্গি (১২,৭২৫ হেক্টর)। ব্লকভিত্তিক পাট জমির পরিমাণ, মোট উৎপাদন এবং ফলন-হার নিচে দেওয়া হলো।

জেলায় ব্লকভিত্তিক পাট চাষের এলাকা ও উৎপাদনের পরিমাণ (২০০২-০৩)*

ক্র. নং	ব্লকের নাম	পাট চাষের এলাকা (হেক্টর) (১ হেক্টর =সাড়ে সাত বিঘা)	উৎপাদন (গাঁট) (১গাঁট =৫ মণ)	হেক্টর প্রতি ফলন (গাঁট)
১.	বহরমপুর	১০,১০০	১,৩৩,৩২০	১৩.২০
২.	বেলডাঙ্গা-১	৭,১২৫	৯৬,১৮৮	১৩.৫০
৩.	বেলডাঙ্গা-২	৪,০৩৫	৫৫,৬৮৩	১৩.৮০
৪.	হরিহরপাড়া	১০,৮০০	১,৫৮,৭৬০	১৪.৭০
৫.	নওদা	১৩,২০০	১,৫৮,৪০০	১২.০০
৬.	ডোমকল	১৪,৯০০	১,৯৩,৭০০	১৩.০০
৭.	জলঙ্গি	১২,৭২৫	১,৬১,৬০৮	১২.৭০
৮.	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	৬,৫০০	৮১,২৫০	১২.৫০
৯.	লালগোলা	৮,০০০	১,১০,৪০০	১৩.৮০
১০.	ভগবানগোল-১	৬,৫০০	৯১,৬৫০	১৪.১০
১১.	ভগবানগোলা-২	৬,০০০	১,০১,৮৮০	১৬.৯৮
১২.	রানীনগর-১	৯,০০০	১,২৫,০১০	১৩.৮৯
১৩.	রানীনগর-২	৯,৯০০	১,২২,৩৬৪	১২.৩৬
১৪.	নবগ্রাম	৫২০	২,৬৮০	৫.১৫
১৫.	কান্দি	৪৫০	৩,৬০০	৮.০০
১৬.	খড়গ্রাম	৮০	৬০০	৭.৫০
১৭.	বড়ঞা	২০	১৭০	৮.৫০
১৮.	ভরতপুর-১	৬০	৪২০	৭.০০

* উপরোক্ত তথ্যটি উপযুক্ত সরকারি আধিকারিকের নিকট থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু 'বিশেষ অসুবিধা' হেতু আধিকারিক মশায় তথ্যটির গায়ে সরকারি সীলমোহর যুক্ত করে দিতে পারেন নি। সুতরাং তথ্যটিকে পুরোপুরি সরকারি বা বেসরকারি কোনওটাই না বলে আধা সরকারি বলতে চাই।

ক্র. নং	ব্লকের নাম	পাট চাষের এলাকা (হেক্টর) (১ হেক্টর =সাড়ে সাত বিঘা)	উৎপাদন (গাঁট) (১গাঁট =৫ মণ)	হেক্টর প্রতি ফলন (গাঁট)
১৯.	ভরতপুর-২	৪০	২৬০	৬.৫০
২০.	রঘুনাথগঞ্জ-১	৩১০	৪,৩৪০	১৪.০০
২১.	রঘুনাথগঞ্জ-২	২,৩১২	২৪,২৭৬	১০.৫০
২২.	সুতি-১	৮৫০	৭,৯৯০	৯.৪০
২৩.	সুতি-২	২,৫০০	৩৭,৫০০	১৫.০০
২৪.	সামশেরগঞ্জ	৯০০	১০,৩৫০	১১.৫০
২৫.	ফরাক্কা	৯০০	১৩,৫০০	১৫.০০
২৬.	সাগরদিঘি	৫৬৫	৭,৩৪৫	১৩.০০
		মোট ১,২৮,২৯২ হেক্টর	১৭,০৩,২৪৪ গাঁট	১৩.২৭ গাঁট

বর্তমানে জেলায় পাটের উৎপাদন ব্যয়

জেলার বিভিন্ন এলাকার মাটির প্রকারভেদ, জমিতে ঘাস জন্মানোর প্রবণতা, কৃষিশ্রমিকের মজুরি ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় পাট উৎপাদনের খরচেও কিছু কিছু তারতম্য ঘটে। আবার একই এলাকায় বিভিন্ন সময় ক্ষেতমজুরের মজুরি বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, পাটের প্রথম নিড়ানির সময় ক্ষেতমজুরদের হাতে অন্য কোনও কাজ প্রায় থাকে না বলে ওই সময় মজুরি কম হয়। এলাকা বিশেষে ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে মজুর পাওয়া যায়। কিন্তু পাট কাটাকাটি শুরু হলে জমিতে ধান লাগানোরও মারকাট লেগে যায়। স্বভাবতই ওই সময় মজুরের চাহিদা বেশি হওয়ায় মজুরিও বেড়ে যায়। বর্তমানে একজন অদক্ষ শ্রমিকের সরকার নির্দ্ধারিত মজুরি ৬২ টাকা। কোনও দিনমজুর অন্য কোনও সময় 'গেরস্ত'র কাছ থেকে ৬০/৬২ টাকা মজুরি না পেলেও পাট কাটা, বহা ও ছাড়ানোর চরম সময়ে অবস্থা বুঝে ৭০/৮০, এমনকি ১০০ টাকাও পেয়ে থাকেন। নিচু জমিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে গলা ডুবিয়ে পাট কাটার যা ধকল, কিম্বা উঁচু জমি থেকে পাটের বড় বড় বোঝা মাথায় করে খাল-বিল-পুকুরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার যা শ্রম, কিম্বা সারাক্ষণ পচা-দুর্গন্ধ জলের ধারে বসে হাজা-পাঁকুইকে হাত-পায়ের জিম্মা দিয়ে 'পাট ছাড়ানো'র যে কষ্ট, তাতে একশোটা টাকা মজুরি এমন কিছুই নয়। বিশেষত কাদা-জলের মধ্যে ১০/১২ ফুট লম্বা দেহাতি পাটের বিশাল বিশাল বোঝা 'জাগ' দেওয়ার জন্য মাথায় করে জলের ধারে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর তা অন্যদের পক্ষে বোঝা বাস্তবিকই দুষ্কর। পাট বহনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা অনেক সময় আক্ষেপ করে এই কাজকে 'মড়া বহা'র সাথে তুলনা করেন। 'মড়া' বা শবদেহ যতই দুর্বহ হোক না কেন, তাকে যেমন মাঝপথে ফেলে দিয়ে পালানো চলে না, তেমনি বইতে যতই কষ্ট হোক, পাটকেও ফেলে দিয়ে নষ্ট করা যায় না। এই কারণেই বোধহয় 'মড়া'র সাথে পাটের বোঝার তুলনা করা হয়।

যাইহোক, এখন আমরা বর্তমান বাজার দরে প্রতি একর, অর্থাৎ তিন বিঘা জমিতে পাট চাষের খরচ-খরচার একটি খসড়া হিসাব পেশ করব।

১। জমি তৈরির জন্য লাঙল ঃ ৯ × ১০০ টাকা = ৯০০.০০ টাকা।
(কমপক্ষে তিনবার চাষ দিতে হয়, প্রতি চাষে লাগে তিনটি
করে লাঙল। লাঙলের দর বিঘা প্রতি ১০০ টাকা)
২। বীজ (প্রতি কেজি ৫০ টাকা হিসেবে তিন কেজি) ঃ ৩ × ৫০ টাকা = ১৫০.০০ টাকা।
৩। বীজ শোধন ওষুধ ঃ আনুমানিক = ৭৫.০০ টাকা।
৪। সার, সব রকম মিলিয়ে ঃ আনুমানিক = ৫০০.০০ টাকা।
(নাইট্রোজেন ১৬ কেজি, ফসফেট ৮ কেজি, পটাশ ৮ কেজি,
সালফার ২ কেজি এবং কিছু গোবর সার বা খোল)
৫। কীটনাশক (ছড়ানোর পারিশ্রমিক সহ) ঃ আনুমানিক = ৩০০.০০ টাকা।
৬। সেচ (স্যালোতে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টার জল লাগবে।
ঘণ্টা প্রতি ৫০ টাকা হিসেবে) ঃ ১২ × ৫০ টাকা = ৬০০.০০ টাকা।
(পাট বোনার ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টি না হলে আরও একবার সেচ লাগবে।
খরচ কমানোর জন্য ধরেই নেওয়া হলো, বৃষ্টি হবে।
তবে যাদের নিজস্ব স্যালো-পাম্প আছে তাদের ক্ষেত্রে খরচটা কিছুটা কম হবে।)
৭। মজুরি ('ক' থেকে 'জ' পর্যন্ত) মোট = ৬৯৯০.০০ টাকা।

ক) প্রথম নিড়ানি	১২ জন × ৩৫ টাকা =	৪২০.০০ টাকা
খ) দ্বিতীয় নিড়ানি	২৪ জন × ৪০ টাকা =	৯৬০.০০ টাকা
গ) তৃতীয় নিড়ানি	১৮ জন × ৫০ টাকা =	৯০০.০০ টাকা
ঘ) চতুর্থ নিড়ানি	১২ জন × ৫০ টাকা =	৬০০.০০ টাকা
ঙ) কাটা ও মাদা দেওয়া	১৮ জন × ৬০ টাকা =	১০৮০.০০ টাকা
চ) বহা ও জাগ দেওয়া	২৪ জন × ৭০ টাকা =	১৬৮০.০০ টাকা
ছ) পাট ছাড়ানো ও বাড়ি আনা	২৪ জন × ৫০ টাকা =	১২০০.০০ টাকা
জ) শুকানো ও বাণ্ডিল বাঁধা	৩ জন × ৫০ টাকা =	১৫০.০০ টাকা
মোট	মজুর ১৩৫ জন =	৬৯৯০.০০ টাকা

সর্বমোট ৯৫১৫.০০ টাকা

উপরের ১ নং থেকে ৫ নং দফা পর্যন্ত হিসেব জেলা কৃষি দপ্তরের এক পদস্থ সরকারি আধিকারিকের নিকট থেকে প্রাপ্ত। ৬ নং দফায় তিনি সেচ বাবদ ধরেছিলেন ৫০০.০০ টাকা। সরকারি সেচের হিসেবে হয়ত ওটাই ঠিক, কিন্তু আমাদের রাজ্যে তথা জেলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে বসানো স্যালোগুলিই সেচের ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন। তাই এই ক্ষেত্রে তাঁর সেচ বাবদ ধরা ৫০০ টাকার সাথে সহমত হওয়া গেল না। অন্যদিকে ৭ নং বা শেষ দফায় তিনি মজুরি বাবদ মোটের উপর ৪০০০.০০ টাকা ধরেছিলেন। তাঁর হিসেবে, "পাট চাষে প্রতি একরে ৬৬ জন মজুরের প্রয়োজন।" সরকার নির্ধারিত ৬২.০০ টাকা হিসেবে ৬৬ জনের মজুরি হয় ৪০৯২.০০ টাকা। সেটাকেই তিনি হয়ত রাউণ্ড ফিগারে চার হাজার ধরেছেন। আমরা এক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে মজুর-সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বিভাজন করতে গিয়ে দেখছি, খুব কম করে ধরেও শুধুমাত্র নিড়ানিতেই ৬৬ জন মজুর লাগছে। যাইহোক, সব মিলিয়ে এক একরে মজুর লাগছে ১৩৫ জন। বিভিন্ন সময়ের প্রচলিত মজুরির হার ধরতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র পাট বহা ও জাগ দেওয়ার ক্ষেত্রেই সরকার নির্দ্ধারিত ৬২·০০ টাকার চেয়ে ৮ টাকা বেশি মজুরি

লাগছে। যে সমস্ত কারণে বা যুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ের মজুর-সংখ্যা ও মজুরির হার ধরা হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করা যাক।

ক) প্রথম নিড়ানিতে জমিতে ঘাস খুব কম থাকে এবং ছোট আকারে থাকে। শুধুমাত্র দাউলির ঠোকা দিয়ে চলে গেলেই ঘাস মরে যায়। সেজন্য এই নিড়ানিকে 'ফুল ঠুকা' বলা হয়। এতে মজুর লাগে কম। এই সময় মজুরদের হাতে কাজ কম থাকে বলে মজুরির হারও কম হয়। এলাকা বিশেষে ৫/১০ টাকা কম-বেশি হয়। এখানে সাধারণভাবে ৩৫ টাকা ধরা হয়েছে।

খ) দ্বিতীয় নিড়ানির সময় পাট কিছুটা বড় এবং সতেজ হয়, যাকে বলে 'ফনফন' করে। ঘাসের সংখ্যাও বেশি হয় এবং পাটের মতই সতেজ থাকে। লোকে বলে, 'ঘাসে-পাটে সুমান হয়্যাচে।' ঘাস এবং অতিরিক্ত পাট তুলে ফলতে মজুর লাগে বেশি। মজুরির হারও একটু বাড়ে। মজুরি ধরা হয়েছে ৪০ টাকা।

গ) আগের নিড়ানিতেই বাড়তি পাটের চারা তুলে ফেলে জমিতে পাটকে 'সারানো' বা পাটগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় ফাঁক তৈরি করা হয়েছে। তার উপর পাট অনেকটা বড় হয়ে যাওয়ায় ঘাসও এবার কম হয়। ফলে মজুর লাগে কম। তবে মজুরের দর আরও একটু বেশি হয়। এখানে ধরা হয়েছে ৫০ টাকা।

ঘ) চতুর্থ বা শেষ নিড়ানিকে অনেকে 'শেষবারের পাট টানা' বলে। কারণ, এই সময় ঘাস প্রায় থাকেই না। যে পাটগুলো খুব সরু সরু এবং ছোট হয়ে থাকে, (লোকের কথায় 'তলছানি') সেগুলো জমির খাদ্য-রস খেয়ে অন্যদের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করবে। এই 'পাট টানার' কাজে মজুর লাগবে আগের চেয়ে কম, তবে মজুরির হার আগের মতই ৫০ টাকা ধরা হলো।

ঙ) নিড়ানির পর্ব শেষ হওয়ার ২/৩ মাস পর পাট কাটাকাটি শুরু হয়। এই সময় লেগে যায় ধান লাগানোরও তোড়জোড়। ফলে পাট কেটে মাদা দেওয়ার মজুরি আর একটু বাড়ে। প্রায় ৬০ টাকা হয়। প্রসঙ্গত, মাদা ব্যাপারটা বলা যাক। পাট কাটার পর ৫/৬ দিনের জন্য গাদা মেরে রাখতে হয়। এই গাদা মারাকেই মাদা দেওয়া বলে। পরে ঝেড়ে ঝেড়ে পাতাগুলো ফেলে দেওয়া হয়। পাতা না ঝরিয়ে জাগ দিলে পাটের 'আগা জ্বলে যায়'। ছাড়ানোর সময় সমস্যা হয় এবং পাটের মান কমে গিয়ে দামও কমে যায়।

চ) জাগ দেওয়ার জন্য খাল-বিল-নদী নালায় পাট বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে যাওয়ার দূরত্ব অনুযায়ী পরিশ্রম এবং পারিশ্রমিক কম-বেশি হয়। তবে কাদা-জল ভেঙে পাট বহার যে কি কঠিন কষ্ট, তা কেবল যারা বহেন তারাই বোঝেন। ৭০/৮০ টাকার কমে কেউ এই কাজে যেতে চায় না।

ছ) সারাদিন জলের ধারে বসে, কাপড় ভিজিয়ে, হাত-পাকে হাজা-পাঁকুইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে পাট ছাড়ানোর কষ্টও কম নয়। তবু বিনা পয়সায় এক বোঝা পাটকাঠি ও বোঝা বাঁধার ছোট্ হিসেবে দু'হাবল পাট পাওয়ার সুযোগ থাকায় কম মজুরিতেই এই কাজ মজুরেরা করেন। মজুরি ৫০/৬০ টাকা।

জ) পাট শুকোতে গিয়ে গায়ের রক্ত শুকায়। তবু এতে ৫০ টাকার বেশি মজুরি ধরা হয়নি।

এখন, বিঘা প্রতি সাড়ে আট মণ হিসেবে ফলন ধরলে এক একর বা তিন বিঘা জমিতে পাটের মোট ফলন হবে সাড়ে ২৫ মণ বা ১০.২ কুইন্টাল। পাটের দর কুইন্টাল প্রতি ৮০০.০০ টাকা ধরা হলে ১০.২ কুইন্টালের দাম হবে ৮,১৬০.০০ টাকা, অর্থাৎ তিন বিঘা পাট চাষ করে নিট ক্ষতি (৯৯১৫-৮১৬০) টাকা = ১৩৫৫ টাকা। দর ৮০০ টাকার যত নিচে নামবে এবং ফলন যত কম হবে, ক্ষতির পরিমাণও তত বাড়বে।

লাভ কেবল খাটনিটুকুন, আর ওই পাটকাঠিটা

এইভাবে বিনা লাভে, এমনকি অনির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও চাষীরা বছরের পর বছর পাট চাষ করেন। না করে তাদের উপায়ই বা কী? রাজ্যের পাটচাষীদের শতকরা ৮০ জনই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী। নিজের জমিতে ছাড়া তাদের শ্রম দেওয়ার বিশেষ জায়গাই নাই। ফলে নিজের শ্রমে ফসল ফলিয়ে ফসলের দামের সাথে তারা শ্রমের দামটা পেতে চায়। যেমন ধরুন, উপরের হিসেব অনুযায়ী এক একর পাট চাষে মজুরি বাবদ ব্যয় হচ্ছে ৬৯৯০ টাকা। প্রান্তিক চাষীদের ক্ষেত্রে ওই টাকাটা নগদে ব্যয় হয় না, তারা নিজেরাই ওই মূল্যের শ্রম ফসলের সাথে মিশিয়ে দেয়। ক্ষুদ্রচাষীরা নিজেরা সব সময় নিজের পুরো কাজ তুলতে পারে না, কিছু লেবার ভাড়া করতে হয়। সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ শ্রম নিজে দিচ্ছে তার দাম তারা ধরে পাচ্ছে ফসলের সাথে। এদের ক্ষেত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মজুরির নগদ টাকাটা সব সময় ফসলের দামের দ্বারা উশুল হয় না। মোটের উপর ক্ষতি হয়। কিন্তু কি করবে? কোনও চাষেই এখন আর লাভের নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়ত, পাট চাষ করেও সেই জমিতে ধান, আলু, অন্যান্য সব্জি বা রবিশস্যের চাষ করা যায়। এমন কিছু জমি আছে, যাতে পাটের চাষ না করলে চাষীকে অন্য আর একটি মাত্র ফসল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। জমি ফেলে রেখে হাত-পা গুটিয়ে অলসভাবে বাড়িতে বসে থাকতে চাষী কখনই পারেন না। তাই শেষ পর্যন্ত 'লাভ নাই' জেনেও তারা জমিতে পাটের বীজ ছড়ায়। স্বপ্ন বোনে দু'চোখে। আশায় আশায় থাকে, আবার যদি কখনও ধাঁ করে দাম বেড়ে যায়! — "সেই যে, ইন্দিরা গান্ধী মারা যাওয়ার বার (১৯৮৪) ম্যামুন পাটের বাজার হাজার টাকায় উঠেছিল!" পাটের বাজার যদি নাও উঠে, লাভ যদি না-ও



'টাঁড়' বা 'ডাঁপ'-এ পাট শুকিয়ে ঘরে তোলার তোড়জোড়, বৃষ্টিতে ভিজে যাবার ভয়।

হয়, যদি কোনও রকমে খরচটা উঠে আসে, তাহলেও পাট চাষের সপক্ষে চাষীদের একটা গুরুতর কৈফিয়ত রয়েছে। —"কিছু না হোক, খাটনিটুকুন, আর ওই পাটকাঠিটা তো লাভ হবে। সারা বছরে জ্বালান-ই কি কম লাগে!" হ্যাঁ, এই জ্বালানির যুক্তি উপেক্ষা করে পালানোর কোনও পথ নাই। জেলার তাবৎ বাগড়ি এলাকায় জ্বালানি হিসেবে পাটকাঠির কোনও বিকল্প নাই। পল্লীবাসী সমস্ত চাষী পরিবার সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় পাটকাঠি গাদা মেরে জমিয়ে রাখে। পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ঘেরা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের ঘরের পাশেও দেখা যায় ছোটখাটো পাটকাঠির গাদা। তারা পাট ছাড়াতে গিয়ে প্রথমেই 'দু'মুঠি' বা 'দু'ঝুঁটি' পাটকাঠি রোদে শুকোতে দেয়। মুঠি দুটির স্বাস্থ্য এতটাই ভাল করা হয় যে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় 'শুক্ন্যা খট্‌খট্যা' অবস্থায়ও 'কষ্যা এক বুঝা' হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মুঠি দুটো বাঁধার নামে এক হাবল, আর বোঝা বাঁধার জন্য 'ছোট্' হিসেবে আরও এক হাবল, মোট দু'হাবল পাটও সঙ্গে যায়। দু'হাবল পাটের ওজন প্রায় ৪০০ গ্রাম। 'পাটের সিজিনে' পাটকাঠি আর পাটের লোভে অনেক মজুর অন্য কাজে যেতেই চায় না। তবে বছর পঁচিশেক আগে থেকে অবস্থা পাল্টাতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে পাটকাঠির 'চালানি ব্যবসা'। গ্রাম থেকে লরি ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে ভিন জেলায় বা ভিন রাজ্যে পানের বরজ, কাগজের কল বা কাঠবোর্ডের কলগুলিতে। ফলে পাটকাঠি থেকেও কিছু কাঁচা পয়সা উঠে আসছে। কমে যাচ্ছে পাটকাঠির দান-খয়রাত। গ্রামের দুঃস্থ অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আর আগের মত 'চেয়েচিন্তে সম্ বচ্ছরের জ্বালান' যোগাড় করতে পারছেন না।

পাটের ফলন

সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার এবং পরিচর্যার পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলে পাটের ফলন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২৬ সালের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ওই বছর এই জেলায় ৪১,০০০ একর জমিতে পাটের চাষ করে মোট পাট পাওয়া গিয়েছিল ৮১,৮০০ গাঁট, অর্থাৎ একর প্রতি ২.২ গাঁট বা তিন বিঘায় ১১ মণ মাত্র। (এখন কোনও কোনও চাষী এক বিঘাতেই প্রায় ওই পরিমাণ পাট ফলিয়ে থাকেন।) পরের বছর (১৯২৭) ওই ফলন-হার ছিল সামান্য বেশি, একরে ২.৬ গাঁট। ওই সময় রাজ্যের গড় ফলন-হার ছিল একরে ৩.২ গাঁট বা ১৬ মণ, অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৫ মণ ১৩ কেজি। রাজ্যের গড়ের চেয়ে এই জেলার গড় ফলন তখন অনেকখানি কম ছিল। ওই সময়ের (১৯২৬) তুলনায় বর্তমানে (২০০২-০৩) জেলার ফলন-হার বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি, একর প্রতি ৫.৩ গাঁট বা সাড়ে ছাব্বিশ মণ, অর্থাৎ বিঘা প্রতি ফলন ৮ মণ ৩৩ কোজি। বর্তমানে জেলার গড় ফলন হার রাজ্যের গড়ের চেয়েও বেশি। অন্তত ১৯৯১-৯৪ সালের হিসেব তাই বলছে। ওই সময় এই জেলায় এবং রাজ্যে হেক্টর প্রতি ফলন ছিল যথাক্রমে ২৩০০ কেজি ও ২০১৭ কেজি। জেলায় পাটের এই ফলন বৃদ্ধির পিছনে অন্যান্য কারণের সাথে পাট পরিচর্যার পদ্ধতিতে আগত পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং পরিচর্যার বিষয়টি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করা যাক।

পাটের পরিচর্যায় পরিবর্তন

আগেকার দিনে সমস্ত রকম ফসলই ছিল পুরোপুরি বৃষ্টি-নির্ভর। পাটও তার ব্যতিক্রম ছিল না। চৈত্র মাস থেকে আকাশ-পানে চাতকের চোখে তাকিয়ে থাকতো পাট-চাষীরা। যতদিন না

পর্যাপ্ত বৃষ্টি বা 'বাতাল' হতো ততদিন তারা পাটবীজ বুনতে পারতো না। বীজ বোনার পরের দিন বা তার পরের দিন ফের বৃষ্টি বা 'পিঠবাতাল' না হলেই মুস্কিল হতো। সদ্য বোনা বীজের অধিকাংশই অঙ্কুরিত হতো না। আবার যেগুলো হতো সেগুলোও সারা জমিতে সমহারে হতো না। অপেক্ষাকৃত রসসিক্ত জায়গায় গাদাগুচ্ছের চারা বেরুতো, অন্যদিকে 'টান' জায়গায় চারা প্রায় বেরুতোই না। চাষীদের ভাষায় এই ঘটনাকে বলা হতো 'খেলে-ডুবরা'। খেলে-ডুবরা ছাড়াও আরও একটা ব্যাপার প্রায়শই ঘটতো। তা হ'ল জমিতে পাটের চারাগুলো একসাথে বেরুতো না। আগে-পিছে বেরুতো। ফলে পাটের গাছও হতো ছোট-বড়। একে বলা হতো 'গাই-বাছ্‌রে'। বীজ বেরুনোর অনিশ্চয়তা হেতু চাষীরা বেশি পরিমাণে বীজ জমিতে ফেলত। তাতে অনেক সময়ই 'পিঠ-বাতাল' পেয়ে চারা বেরুতো একেবারে 'হাউই' হয়ে, অর্থাৎ সব বীজ একসাথে খুব ঘন হয়ে বেরিয়ে পড়ত। এবার অতিরিক্ত চারা মেরে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো 'বিদা' বা 'নাঙলা'। ২৫/৩০ বছর আগে পর্যন্ত জেলার চাষীদের কাছে বিদা বা নাঙলা ছিল অপরিহার্য। প্রসঙ্গত, গত শতকের প্রথম ৪/৫ দশক পর্যন্ত সব জেলার পাট চাষীরাই বিদা বা নাঙলা ব্যবহার করত বলে ধরে নেওয়া যায়। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'জুট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে তৎকালীন রাজ্য কৃষি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক এন সি চৌধুরী প্রতি একর পাট চাষের খরচ-খরচার একটা তালিকা পেশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, জমিতে দু'বার বিদা চালানোর খরচ ধরা হয়েছে এক টাকা আট আনা। উল্লেখ্য, ওই সময় লাঙলের দর ছিল আট আনা/বিঘা, বীজ ছিল চার আনা সের এবং মজুরের মজুরি ছিল পাঁচ আনা মাত্র। যাইহোক, কথা হচ্ছিল নাঙলার। নাঙলা হলো, হাতে তৈরি এমন একটি কৃষি-যন্ত্র, যা দেখতে প্রায় চিরুণীর মতো। দেখতে চিরুণীর মত এবং কাজও মাটিতে আঁচড় কাটা বলে কোনও কোনও এলাকার লোকেরা একে 'আচড়া'ও বলতো। প্রায় ৪´´ X ৩´´ মাপের ৬ ফুট লম্বা এক টুকরো কাঠে ১২টি সমান মাপের (প্রায় দেড় ফুট লম্বা) সরু সরু লোহার 'খিল' সমান দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে বসানো থাকতো। দেখতে প্রায় এখনকার ট্রাকটরের লাঙলের মতো। গরু বা মোষ দিয়ে লাঙলের মতই টানানো হতো। পাটের চারা ৮/১০ ইঞ্চি লম্বা হওয়ার আগেই কয়েক দিনের ব্যবধানে, 'যো' বুঝে, দু'তিনবার জমিতে নাঙলা চালানো হতো। শুধু যে অনাবশ্যক ঘন পাটকে পাতলা করা বা 'সারানো'র জন্যই জমিতে নাঙলা চালানো হতো, তাও নয়। জমিতে পাটের চারা মোটামুটি ঠিক থাকলেও, অনেক সময় জমিতে পাটের সাথে বেরুনো অস্বাভাবিক ঘাসকে অনায়াসে মারার জন্যও নাঙলা দেওয়া হতো। এই পদ্ধতিতে পাট বা ঘাস মারতে গিয়ে অনেক সময় প্রয়োজনীয় পাটের চারাও মারা পড়তো। গরু-মোষের পায়ে পিষ্ট হয়ে নষ্ট হতো বহু দরকারি পাট। অন্যদিকে বহাল তবিয়তে রয়ে যেত অদরকারি পাটেরা। কিছু পাটের ডগা যেত ভেঙে। পরে তাতে গজিয়ে যেত ডাল-ফাংড়ি। আবার অনেক সময় জমিতে নাঙলার 'যো' হওয়ার আগে আগে মেঘের বেইমানিতে নাঙলা দেওয়ার সুযোগেই মিলত না। ফলে পাট থেকে যেত যাচ্ছেতাই ঘন। 'মুনিষ খরচ'-এর বাহুল্যের কারণেই হোক, কিম্বা এখনকার মত প্রাণে ধরে নিড়ানির সময় হাতে ধরে পাট তুলতে না পারার কারণেই হোক, জমিতে নাঙলা বা বিদা চালাতে গিয়ে মূলত হিতে বিপরীতই হতো। পরিচর্যা পর্বের এই অজ্ঞতাজনিত ত্রুটির ফলে জমিতে পাট খুব পাতলা হতো অথবা ঘন হতো। ঘন হলে পাট লম্বা হতো কম। ফলনও যেত কমে। পাতলা হলেও ফল সেই একই। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় যে, পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) বহু পূর্বেই, দেশ ভাগের সমসাময়িক সময়ে বিদাকে কৃষিক্ষেত্র থেকে বিদায় করেছে। আমরা বিদায় করেছি অনেক পরে, ধীরে ধীরে, 'পূর্ববঙ্গের রিফিউজিদের' ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে

আসার পরে। বর্তমানে আমরা জমিতে পাট-পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্মমতা অর্জন করতে পেরেছি। আধুনিক হয়ে উঠেছি অনেকখানি।

হাত দিয়ে পাট তুলে জমিতে পাট 'সারিয়ে' দেওয়ার মর্ম চাষীরা ভাল করে বুঝতে পারার আগে, গত শতাব্দীর ছয়ের দশক পর্যন্ত সময়ে, যারা এ জেলার বাগড়ি এলাকার গ্রাম জীবনের সাথে গভীরভাবে সংপৃক্ত ছিলেন, তারা আশা করি ছোটবেলাকার ছোট খোট পাট কুড়াবার সেই দুর্দান্ত স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেননি। প্রাণে ধরে হাত দিয়ে পাট তুলতে না পারার কারণে জমিতে কিছু কিছু পাট ছাঁট বা ক্যাঁট পড়ে যেত। তাকে 'তলছানি' বা 'বাছ পাট'-ও বলা হতো। পাট কাটার সময় সেই সরু সরু অনুচ্চ 'বাছ পাট' জমিতেই ফেলে রাখতো চাষিরা। চাষী ঘরের কচিকাচারা সেই পরিত্যক্ত কুচো পাট মহানন্দে কুড়িয়ে এনে বাড়ীর নিকটস্থ অগভীর নালা-খালায় জাগ দিত। জাগ দেওয়ার দু-চার দিন পর থেকে তাদের আর তর সইত না, 'তিনবেলা' দেখতে যেত জাগ হয়েছে কিনা। জাগ হয়ে গেলে নিজেরাই পাট ছাড়াতো, শুকোতো। কখনও কখনও বেশি করার জন্য শুকনো পাট জমিয়ে রাখতো, কখনও খুচরো ক্রেতার কাছে বিক্রি করে পয়সা জমাতো। জমানো আর বিক্রি করা নিয়ে দোটানায় ভুগতো। কখনও বা সরাসরি পাটের বিনিময়েই ফুলরি, ঝালবড়া, 'লেবুধ্ঞুষ', আইসক্রিম ইত্যাদি কিনতো। সেই সময় (৫/৬-এর দশকে) টিকটিকির ডিমের সাইজের 'বুলবুলি' লজেন্স পাঁচ পয়সায় দশটা, আর দশ পয়সায় তিনটে আইসক্রিম (স্রেফ স্যাকারিন দিয়ে মিষ্টি করা বরফ) পাওয়া যেত। পাঁপড় ভাজা পাওয়া যেত পাঁচ পয়সা করে। নিজের রোজগারে চানাচুর, বাদাম, পাঁপড়, আইসক্রিম খাবার স্বাদই আলাদা।

এখন আর জমিতে ছাঁট বা 'বাছ' পাট দেখাই যায় না। বরং 'হাতা' বা 'হাবল' (পাটের ছোট ছোট আটি, যাতে কম বেশি ৩০-৪০ টি পাট থাকে) বাঁধার মত 'ছোট্' পাটেরই অভাব পড়ে। এখন প্রথম নিড়ানি থেকেই পাট 'সারানো' শুরু হয়। শেষ নিড়ানিটা (জমি বিশেষে তৃতীয় বা চতুর্থ) দেওয়াই হয় শেষবারের মত 'পাট টেনে দেওয়া' বা ক্যাঁট পাট তুলে ফেলার জন্য। কারণ, ওগুলো আর বড় হবে না, অথচ জমির খাদ্য-রসে ভাগ বসাবে।



এই সেই 'বিদা', যাকে চাষীরা বিদায় করেছেন গত শতকের আটের দশকেই।

পাটের অনুন্নত জাত এবং পরিচর্যার খামতির কারণে আগেকার দিনে পাটের আনুসঙ্গিক হিসেবে ফেঁসোর (পাটের ছিন্নভিন্ন আঁশ) উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। পাটকাঠির গায়ে লেগে থাকা ফেঁসো ছাড়িয়ে গরীব ও অল্প গরীব ঘরের ছেলে-বুড়ো ও মেয়েরা দুটো পয়সা রোজগার করতো। বিশেষত নুন আনতে পান্তা ফুরোনো ঘরের মেয়েরা সকাল-সন্ধ্যা ফেঁসো ছাড়িয়ে নুনের পয়সাটা যোগাড় করতো। এক

সময় নুন এবং ফেঁসো দুইয়েরই দর ছিল ১০ পয়সা সের (সের এর মাপ তখন উঠে গেলেও লোকেরা অভ্যাসবশে কেজিকেই সের বলত)। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বড়িতে ফেঁসো কিনতে আসতো ক্রেতারা। 'ব্যাচো গো-ও ফেঁসো-ও' বলে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফেঁসো কিনতো। ফেঁসোর বোঝা মাথায় করে নিয়ে যেত নিকটবর্তী গঞ্জে। ফেঁসোর ঢাউস বোঝায় বুক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যেত ক্রেতার। গঞ্জ থেকে লরি বোঝাই হয়ে ফেঁসো চালান যেত বাইরে। শুনেছি তা থেকে সুতলি দড়ি তৈরী হতো। ফেঁসো-ছাড়ানো পরিচ্ছন্ন পাটকাঠি দিয়ে রান্না করতে মেয়েদের বিরক্ত লাগত না। এখন আর পাটকাঠিতে ফেঁসো প্রায় থাকেই না। আগেকার দিনে পাটকাঠির সাথে ফেঁসোর এই নিবিড় সখ্যতার কারণ ছিল মূলত দুটো। ১) জমিতে পাট খুব পাতলা হলে অনুন্নতজাতের পাট গাছ খুব মোটা হয়ে যেত, ডাল পালা গজাতো এবং গাছের গায়ে ছোট ছোট কাঁটা জন্মাতো। পাট ছাড়াবার সময় ডালপালা ও কাঁটায় বেধে আঁশের কিছু অংশ ফেঁসো হয়ে থেকে যেত। ২) জমিতে পাট খুব ঘন হলে পাট একদমই মোটা হতো না। খুব সরু সরু পাট ছাড়াবার সময় একটার সাথে অপরটার আঁশ জট পাকিয়ে যেত। জোর করে জট ছাড়াতে গিয়ে আঁশের কিছু অংশ ছিঁড়ে যেত। সেটাই ফেঁসো হয়ে পাটকাটির গায়ে গায়ে লেপ্টে থাকতো।

পাট ছাড়ানোর পদ্ধতিতে পরিবর্তন

দেশ ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীদের সংস্পর্শে এসে এ জেলার পাট-পরিচর্যার পদ্ধতি যেমন বদলে গেছে, তেমনি বদলে গেছে পাটের আঁশ সংগ্রহের পন্থা-পদ্ধতিও। আগেকার দিনে এখানকার মত ডাঙায় বসে বা জলের ধারে 'পাড়ন' করে বসে বসে হাত দিয়ে একটা একটা করে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়া হতো না। 'হাতা' দিয়ে 'পাট কাচা' বা 'ধোওয়া' হতো। 'হাতা' বলতে রান্নাঘরের খুন্তি-হাতা নয়, কাঠের একটা ছোট তক্তা, যা এখনকার ক্রিকেট-ব্যাটের তুল্য। কৃষিশ্রমিক কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে জাগ হওয়া পাটের এক একটা ছোট আটি বা হাবল বা হাতা টেনে নিত। হাতা বা হাবলের গোড়ার দিকে দু'চারবার 'হাতা'র আঘাত দিয়ে পাটের আঁশগুলোকে আলগা করে নিত। তারপর এক-দেড় ফুট লম্বা করে গোড়ার পাটকাঠি ভেঙে ফেলত এবং আঁশ থেকে পাটকাঠিগুলোকে আলাদা করে দিত। তারপর পাটকাঠিমুক্ত আঁশগুচ্ছের অংশটি হাতে জড়িয়ে বা শক্ত



জলের ধারে বসে চলছে পাট ছাড়ানোর পালা।

করে ধরে জলের উপর ভাসমান বাকী অংশকে সামনে-পিছনে বারকয়েক ঝাঁকানি মেরে বাকী পাটকাঠিকে আঁশের মধ্যে থেকে বের করে দেওয়া হতো। হাতে ধরা আঁশগুচ্ছকে দু'একবার জলে ধুয়ে ভাঁজ করে ছুড়ে ফেলা হতো ডাঙায়। পরে বোঝা বেঁধে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হতো। এইভাবে 'হাতায় পাট কাচা' ছাড়াও আরও একটাভাবে পাটের আঁশ সংগ্রহ করা হতো। তাতেও জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাজ করতে হতো চাষীকে। জলের মধ্যে একটা লম্বা খুঁটি পুঁতে তার কিছু অংশ জলের উপরে জাগিয়ে রাখা হতো। খুঁটির মাথায় বসানো থাকতো এক টুকরো চৌকো কাঠ। একটা হাতুড়ির বাঁট মাটিতে পুঁতে রাখলে যেমন দেখায়, অনেকটা তেমনই দেখাতো। পাটের ছোট ছোট আটি বা হাতাগুলি একের পর এক হাতে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারবার সজোরে আঘাত করা হতো হাতুড়ির মাথায়। এতে পাটকাঠিগুলো ভেঙেচুরে বেরিয়ে যেত। কিছু থেকে গেলে সেগুলো পরে পাট শুকিয়ে নিয়ে ঝেড়ে ফেলা হতো। বাড়িয়েধুড়িয়ে পাট ধোওয়া হতো বলে বোধ হয় এই পদ্ধতিকে 'বেড়্যালে ধোওয়া' বলা হতো। এই দুই পদ্ধতির কোনওটিতেই পাটের গুণমান এখনকার হাতে ছাড়ানোর মত অক্ষুণ্ণ থাকতো না। ইদানীং পাটের আঁশ ছাড়াবার যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে তা এখনও চাষীদের মধ্যে প্রসার লাভ করেনি। প্রায় কোনও চাষীই এখনও পর্যন্ত এই যন্ত্রের কথা কানেই শোনেন নি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে যন্ত্র প্রসার লাভ করবে, কিন্তু ছোট ছোট চাষীরা এর সুবিধা নিতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

পাটের বিপণন

সবচেয়ে শ্রমনিবিড় এই কৃষিজ পণ্যের বিপণনও বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। এর বিপণনের বহু পর্যায়, বহু নামের বিপণনকারী জড়িয়ে আছে এর সাথে। যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাট কেনে তাদের বলা হয় 'ফড়িয়া' বা 'দালাল'। 'দালাল' নামের ছোটখাটো পাট ব্যবসায়ীরা অনেক সময় বেশি দরে পাট কিনে কম দরে 'আড়তদার'-এর কাছে বিক্রি করে। কম দরে বিক্রি করেও তারা মোটের উপর লাভ করে। 'ঘোরী' বা চাষীর কাছ থেকে তারা নানান উপায়ে ওজন এবং 'সাট' (গ্রেড) চুরি করে। পাটটা একটু 'ঠাণ্ডা-ভিজা' থাকলে তো কথাই নাই। হাত-দাঁড়ির ওজনে বলে কয়ে বাড়তি ঝুঁকতি নেওয়া হয়। 'কাঁচা মাল' বলে একটা অনির্দিষ্ট ঝুঁকতি প্রথাগতভাবে অনুমোদিত হয়েই আছে। তার সাথে 'ঠাণ্ডা-ভেজার'র ঝুঁকতি যুক্ত হয়ে দাঁড়ি-পাল্লার ডান দিকের পাল্লা, মানে মালের পাল্লাটা, মাটি থেকে প্রায় উঠেই না। এই উপায়ে কুইন্টালে ১০ থেকে ১৫ কেজি পাট বেশি নেওয়া দালালদের পক্ষে 'এমন বেশি কিছু না'। তার সাথে গ্রেড তো আছেই। পাটের মান বা গ্রেড নির্ণয়ের বিজ্ঞান-সম্মত কোনও পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে চাষীকে দালাল, দালালকে আড়তদার, সুযাগ পেলেই ঠাকাচ্ছে। দালাল যদি চাষীর 'এস মিডিল' পাটকে 'মিডিল' বা 'বটম' পাটকে 'বি বটম' বলে রায় দেয়, তাহলে সেটাই সই। অন্যদিকে অনভিজ্ঞ দালালকে বাগে পেলে আড়তদারও ১ নম্বর পাটকে দু'নম্বর বা দু'নম্বরকে তিন নম্বর বলে চালিয়ে নিতে চাইবে। তবে আড়তদার এবং তার উপরের দিকের ব্যবসায়ী ও মিলমালিকরা এতটাই দক্ষ হয় যে তাদের মধ্যে গ্রেড চুরির প্রশ্নটা প্রায় ওঠেই না। গ্রেডের ক্ষেত্রে মাত্র এক নম্বরের পার্থক্যে অনেক সময় কুইন্টাল প্রতি দরের পার্থক্য ১০০ টাকা বা তারও বেশি হতে পারে।

দালাল বা ফড়িয়ারা আড়তদারের সাথে এবং আড়তদার মহাজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলে। মহাজনের কাছে বাজার দরের ওঠা-পড়া জেনে নিয়ে আড়তদার তার অধীনস্থ

দালালদের জানিয়ে দেয়। দালালরা সেই দর মোতাবেক 'খেতাল' (মাল পাওয়ার অকুস্থল) থেকে পাট কেনে। তবে 'ঘোরী'র কাছ থেকে বেশি পাট কেনার একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা দালালদের নিজেদের মধ্যে থাকে বলেই তারা অনেক সময় দর চড়িয়ে দেয়। আর সেই চড়ানো দর উশুল করে ঘোরীকে নানাভাবে ঠকিয়ে। ঘোরীকে ঠকানোর জাল অবশ্য আরও বহুমুখী এবং আরও বহুদূর বিস্তৃত। বহুর মধ্যে অন্যতম প্রধান জালটি হলো, দাদন প্রদান। চির অভাবী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের কাছে 'অফ সিজিনে' মহাজনের টাকা আড়তদার বা দালালের মাধ্যমে দাদন বা ঋণ হিসেবে চলে যায়। চাষী কখনও ফসল চাষের জন্য, কখনও সংসার চালানোর জন্য দালাল বা আড়তদারের কাছ থেকে দাদান নেয়। এক্ষেত্রে দাদন মানেই হচ্ছে, পাট দেওয়ার শর্তে টাকা নেওয়া। তার মানে, পাট বোনার আগেই ছোট ছোট চাষীদের পাট বিক্রি হয়ে থাকে। যাকে বলে মাথা বিকিয়ে রাখা। এরকম ক্ষেত্রে ন্যায্য দর তো দূরের কথা, বাজার-দর পাওয়াটাও বহু চাষীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আগেকার দিনে মহাজনী কারবার ছিল মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া। এখন অনেক বাঙালি হিন্দু-মুসলমানও 'মহাজন' হয়ে উঠেছেন। এই মুহূর্তে নিমতলার কেশব পাল, অঞ্জন ঘোষাল, সুধীর মণ্ডল প্রমুখ ব্যবসায়ীকে এ জেলার পাট মহল এক ডাকে চেনে। এর আগে হারু সরকার ও লক্ষণ সরকার ভ্রাতৃদ্বয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। কয়েক বছর আগে দু'জনেই প্রয়াত হয়েছেন। তবে তারা মূলত পাটের মজুতদার ছিলেন। পাট ওঠার সময় হাজার হাজার কুইন্টাল পাট মজুত করে রেখে, দর বাড়লে বিক্রি করতেন। বর্তমানে এই জেলার পাট-ব্যবসার প্রধানতম কেন্দ্র হলো কাশিমবাজার। এখান থেকেই কাঁচা পাট 'গাঁট' হয়ে কলকাতার মিলগুলিতে যায়। জেলার বাগড়ি এলাকার প্রতিটি গঞ্জেই এখন প্রচুর পাটের আড়ত দেখতে পাওয়া যায়। আড়তদাররা সাধারণত স্থানীয় বাসিন্দা এবং আর্থিকভাবে সবল। তারা মূলত ঘরে বসেই দালাল বা ব্যাপারীদের কাছ থেকে বড় কাঁটার দাঁড়িতে পাট কেনেন। দালালরা ঘোরীর কাছ থেকে পাট কিনে এক মণ করে বাণ্ডিল বা 'বস্তা' বেঁধে আড়তে নিয়ে আসে। গোটা বাণ্ডিল বা বস্তাকে তুলে দেওয়া হয় 'তক্'-এ (তক্তা দিয়ে তৈরি বড় দাঁড়িপাল্লা)। কখনও কখনও বড় চাষীর বাড়িতে এক সাথে বেশি পাটের সন্ধান পেলে আড়তদাররা চাষীর বাড়িতে 'কাঁটা' বা 'তক' নিয়ে গিয়েও পাট কেনেন। আড়তদারের আড়তে বা গো-ডাউনে মজুত পাট দু'ভাবে বিক্রি হয়। কখনও তারা নিজেরাই লরি ভর্তি করে মহাজনের কাছে পাঠিয়ে দেন, আবার কখনও বা মহাজন নিজস্ব লরিতে যাচনদার, ওজনদার, কুলি ইত্যাদি লোক-লস্কর চাপিয়ে নিয়ে হাজির হন গঞ্জের আড়তে। ব্যবসায়ীদের ভাষায় প্রধান প্রধান গঞ্জকে 'মোকাম' বলা হয়। একই সময়ে সমস্ত মোকামের পাইকারি দাম একই রকম হয় না। পাটের গুণমান, পরিবহন ব্যয়, ব্যবসায়ীদের সততা ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে পাইকারি দামও বিভিন্ন রকম হয়। বিষয়টি বোঝার জন্য নিচে একটি সারণী দেওয়া হলো।

প্রতি মণ পাটের বাজারভিত্তিক পাইকারি দাম (টাকায়)

সাল	কাশিমবাজার	বেলডাঙ্গা	জিয়াগঞ্জ	লালগোলা
১৯৬১	২০.০০	২১.০০	১৯.০০	১৬.০০
১৯৬৬	৭৫.০০	৭৫.০০	৭০.০০	৬৫.০০
১৯৭১	১২৫.০০	১২৫.০০	১২০.০০	১১০.০০
১৯৭৪	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪০.০০	১৩০.০০

সূত্র ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, ২০০৩

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, উপরোক্ত চারটি প্রধান মোকামই পাট উৎপাদক বাগড়ি এলাকায় অবস্থিত এবং রেল স্টেশন সংলগ্ন। আরও লক্ষ্যণীয়, কাশিমবাজার ও বেলডাঙ্গার বাজার দর প্রায় একই, কিন্তু কলকাতা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী জিয়াগঞ্জ ও লালগোলার দর তুলনায় বেশ কিছুটা কম।

এবারে ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পাট রপ্তানির বাৎসরিক পরিমাণ এবং কুইন্টাল প্রতি বাৎসরিক গড় মূল্য নিচের সারণী থেকে দেখে নেওয়া যাক।

সাল	বাৎসরিক পরিমাণ (কুইন্টাল)	কুইন্টাল প্রতি বাৎসরিক গড় মূল্য (টাকায়)
১৯৮০	৫,০০,০০০	২০০.০০
১৯৮১	৪,৯০,০০০	২১০.০০
১৯৮২	৪,২৫,০০০	২১৫.০০
১৯৮৩	৩,০০,০০০	২৯০.০০
১৯৮৪	৩,৫০,০০০	৮০০.০০
১৯৮৫	২,৫০,০০০	৪০০.০০
১৯৮৬	৩,০০,০০০	২২০.০০
১৯৮৭	৩,০০,০০০	২২০.০০
১৯৮৮	২,০০,০০০	৪০০,০০
১৯৮৯	২,৫০,০০০	৫২৫.০০
১৯৯০	২,৫০,০০০	৫৫০.০০
১৯৯১	৪,০০,০০০	৫৫০.০০
১৯৯২	৩,৫০,০০০	—
১৯৯৩	৩,০১,০০০	৭০০.০০
১৯৯৪	২,৯০,০০০	৭৩০.০০
১৯৯৫	২,৭৫,০০০	১,০০০.০০
১৯৯৬	২,৪০,০০০	—
১৯৯৭	—	—
১৯৯৮	৫,৫০,০০০	৬৬০.০০
১৯৯৯	৩,৮০,০০০	৮৩০.০০
২০০০	৪,২৫,০০০	৮১৫.০০

সূত্র ঃ মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার, ২০০৩

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯২৬) মাসে প্রকাশিত 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকার ৬১০ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে— ''লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি মুরশীদাবাদ জেলার প্রধান মোকাম। জঙ্গীপুর, পলাশী, পাট্‌কিয়াবাড়ী ইত্যাদি মোকামেরও নাম করা যাইতে পারে। রেলপথ ও ভাগীরথীর জলপথ এই সমস্ত পাট কলিকাতায় আনিতে সাহায্য করে।''

বর্তমানে জেলার বেলার বা মহাজনগণ কলকাতায় পাট পাঠাবার জন্য রেলপথ ও জলপথের কোনটাই ব্যবহার করেন না। কেবলমাত্র স্থলপথে ট্রাক বা লরি ভর্তি হয়ে মুর্শিদাবাদের এই প্রধান অর্থকরী কৃষিপণ্যটি প্রতিদিনই কলকাতা ছুটছে দুর্বার গতিতে। তবে মহাজনদের ব্যবসার

গতি খুব বেশি মসৃণ নয়। তারাও রীতিমত মিলমালিকদের বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ২০০১ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুট সেলার্স এ্যাসোসিয়েশনের এক প্রচারপত্রে তাই লেখা হয়েছে—''বর্তমান মিল মালিকরা পাট খরিদে কু-পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই শুরু করে তাদের নীতিহীন কর্মধারা। এই নীতিহীন কর্মধারার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ওই বছরের ১৫ জুলাই, বেলডাঙ্গা মাড়োয়ারী ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত এ্যাসোসিয়েসনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলনে। সেখানে যে সমস্ত কু-পদ্ধতির উল্লেখ করে তা নিরসনের দাবি জানানো হয়েছিল সেগুলি হলো— মিলে পাটের ওজন চুরি, ওভার বিলিং, অনাবশ্যকভাবে মালভর্তি লরি আটকে রাখা, সঠিক সময়ে পেমেন্ট না করা, সেটেলমেন্টে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বকেয়া পাওনা পরিশোধে টালবাহানা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, 'ঐতিহ্য হারানো' ক্ষয়িষ্ণু পাট ব্যবসাকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে ওই সমস্ত দাবিগুলি যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে দিয়ে সেগুলি এখনও মানিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয়নি।

বস্তুত গোটা পাটের বাজারটাই নিয়ন্ত্রণ করছে মিলমালিকরা, যারা কোনও দিনও মাঠে গিয়ে পাটগাছের চেহারা চোখেও দেখেনি। তারা নিজেরা খুবই সংগঠিত এবং সরকারি মহলে ভীষণ প্রভাবশালী। তাদের এক হাতে কৃষকের, অপর হাতে শ্রমিকের টুঁটি চেপে ধরা রয়েছে। কোন বছর কৃষককে পাটের কত দর দেওয়া হবে তা তারাই ঘরে বসে মিটিং বসিয়ে ঠিক করে। অন্যদিকে পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শোণিত কখন কী পরিমাণে নিংড়ানো হবে তা-ও ঠিক হয় মিটিংয়ে বসেই। জমিতে পাট বোনার সাথে সাথে কত জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে তার সরকারি হিসাব চলে যায় মালিকদের কাছে। তারা তৎক্ষণাৎ কম্পিউটার চালিয়ে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে ফেলেন। নির্দ্ধারণ করেন ক্রয়মূল্যও। তবে পরবর্তীকালে প্রকৃতির মতিগতি মোতাবেক উৎপাদনে কিছু হেরফের ঘটলে দরেও কিছু হেরফের ঘটানো হয়। যাইহোক, চাষী শেষ পর্যন্ত মালিকদের নির্দ্ধারিত দরেই পাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সর্বস্বান্ত হয়ে অনেক সময় চাষীকে আত্মহননের পথেও চলে যেতে দেখা যায়। যেমন কয়েক বছর আগে উত্তরবঙ্গে পাটচাষীকে আত্মহত্যা করতে দেখা গেছে। অন্যদিকে মিলমালিক তার কারখানায় কম শ্রমিকে বেশি কাজ করিয়ে নিতে চায়। তার লাভের খাঁই মেটাতে লক-আউট-ক্লোজারের কোপে পড়ে কাজ খোয়াতে হয় শ্রমিককে। কর্মচ্যুত অসহায় শ্রমিকের আত্মহত্যা এখন আর আমাদের জাতীয় মর্যাদার হানি ঘটাতে পারে না। শ্রমিক বস্তির বাতাস এখন দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত। কোনও কোনও চটকলে এখন তিন দিনের মজুরি দিয়ে সপ্তাহে ছ'দিন কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মালিকের তাঁবেদার শ্রমিক সংগঠন এবং 'শ্রমিক-দরদী' সরকারের নির্বিকার মনোভাবের দরুণই এমনটা ঘটতে পারছে। পাট শিল্পের ভাল-মন্দের সাথে পাটচাষীদের ভাল-মন্দ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে বলেই প্রসঙ্গত উপরোক্ত কথাগুলি বলা হলো।

এবার শেষের কথা

বর্তমানে পাট-শিল্পে মন্দা চলছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা নাহলে যে পাটকলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এই রাজ্যে ১০১ টি এবং সারা দেশে ১১২টিতে পৌঁছেছিল, সেই সংখ্যা কমতে কমতে রাজ্যে ৫৯টি এবং দেশে ৭৬টিতে নেমে আসত না। সাধারণভাবে পাট-শিল্পের বাজার মন্দার জন্য সস্তা সিন্থেটিকের রমরমা বাজারকে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগটি একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষিজীবী এবং আরও কয়েক লক্ষ শ্রমিকের জীবন-মরণের সাথে জড়িত পাটশিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার পরিকল্পিত উদ্যোগই বা কোথায়? পরিকল্পিত উদ্যোগ

তো দূরের কথা, এতদিন পর্যন্ত যে কয়েকটি ক্ষেত্রে চটের ব্যবহার আইনত বাধ্যতামূলক ছিল তা-ও এখন সিন্থেটিক লবির চাপে শিথিল করা হয়েছে। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সারের মোড়ক হিসেবে চটের বস্তার ব্যবহার ছিল বাধ্যতামূলক। পরবর্তীকালে তিন দফায় ওই বাধ্যবাধকতা পুরোপুরি শিথিল করা হয়েছে। ২০০১ সালের পর কোনও সার কোম্পানি আর চটের বস্তা ব্যবহারে আইনত বাধ্য নন। বাধ্য নন সিমেন্ট শিল্প থেকে শুরু করে খাদ্য দ্রব্যের সাথে যুক্ত কোনও কোম্পানিও। ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যবহার কমছে। মার খাচ্ছে চটশিল্প। বোঝাই যাচ্ছে, শিল্পমহলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সরকার শক্তিশালী সিন্থেটিক লবির পক্ষ নিয়েছে। তবে দেশের অভ্যন্তরে পাট-শিল্পের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলেও বৈদেশিক বাজারে পাটের চাহিদা যে বাড়ছে সে কথা কেন্দ্রীয় সরকারের নোটেও স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে— "পাটের প্রকৃতিজাত গুণ, ব্যবহার যোগ্যতা ও প্রকৃতিবিলীনতার জন্য এবং বিভিন্ন ধরণের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বর্তমানে পাটশিল্পের সামনে বিকাশের ক্রমবর্ধমান সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।" বস্তুত, দেশ-বিদেশ মিলিয়ে এখনও যোগানের তুলনায় পাটের চাহিদা বেশি বই কম নয়। এখনও প্রতি বছর পাট রপ্তানি করে ভারত প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করে। এজন্য ব্যবসায়ী মহলে পাটকে Golden fiber বা সুবর্ণময় তন্তু বলা হয়। ১৯৯০ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, ওই বছর পাট থেকে ভারতের আয় হয়েছিল প্রায় ১১৬ কোটি টাকা। সুতরাং সিন্থেটিকের দাপটে পাটের অবস্থা চট হয়ে পড়েছে— এরকম চটজলদি সিদ্ধান্ত টানার কোনও মানে নাই। কোনও মানে নাই এমনটা মনে করার যে, চটশিল্পে মন্দার কারণেই পাটচাষী পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। তা যদি হতো তাহলে সেই ১৯৩২ সালে, পাট শিল্পের বিকাশের যুগেও চাষীদেরকে পাটের রাশি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিতে হতো না।

দ্বিতীয়ত, চাষীরা কেবল যে পাটের ক্ষেত্রেই ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তা তো নয়। (তেমনটা হলে লোকসানজনক পাট চাষ চুকিয়ে দিয়ে লাভজনক বিকল্প চাষ খুঁজে নিতেন।) ঋণ জর্জর ধানচাষী, আলুচাষী, সব্জীচাষী সকলেরই আজ বেঁচে থাকার সমস্যা। মাঝে মাঝেই কেউ কেউ আত্মহননের মধ্য দিয়ে চাষীদের অসহায়তার কথা জানান দিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের বাইরে তাকালেও তুলাচাষী, আখচাষীসহ বিভিন্ন ধরণের চাষীদের ক্ষেত্রে একই ধরণের পরিস্থিতি চোখে পড়ে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত আকারে চাষীভাইরা এককভাবে অথবা দল বেঁধে পাটের গাদায়, গমের খেতে, সূর্যমুখী-বাদাম খেতে আগুন জ্বালিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়াবার প্রয়াস পাচ্ছেন। বর্তমান ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বা একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত আর্থ-রাজনৈতিক রাষ্ট্রকাঠামোয় চাষীদের পক্ষে প্রকৃত অর্থে ন্যায্য মূল্য পাওয়া বাস্তবিকই অসম্ভব। তবে কিছু পরিমাণে সরকারি আনুকূল্য পেলে কৃষকেরা মোটামুটিভাবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারেন। কিন্তু সেটুকুও আজ আর পাচ্ছেন না। যেমন পাটের ক্ষেত্রেই ধরুন, চটের বস্তার বাধ্যতামূলক ব্যবহারের আইন যেমন তুলে দেওয়া হলো, তেমনি ফড়ে ও মহাজনদের শোষণের হাত থেকে চাষীদের রক্ষার জন্য ১৯৭০ সালে তৈরি করা ভারতের পাট নিগম বা জে সি আইকেও ধীরে ধীরে অকার্যকরী করে ফেলা হচ্ছে। এই জে সি আই যে চাষীদের কাছ থেকে 'ন্যায্য' দরে সমস্ত পাট কিনতো তা তো নয়। তবু যেটুকু কিনতো তাতেই খোলাবাজারকে কিছুটা চাঙ্গা হতে সাহায্য করতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 'নয়া আর্থিক নীতি' গ্রহণ করার পর জে সি আইকে নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জে সি আই কখনও কখনও পাট কেনা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকছে। এমনকি, পাট খরিদের টাকা মিলমালিকদের দান-খয়রাতও করে দিচ্ছে (১৯৯৯ সালে তারা এক ছটাকও পাট না কিনে ১০ কোটি টাকা মালিকদের অনুদান

দিয়েছিল)। এবছরও (২০০৪) তারা চাষীদের কাছ থেকে পাট না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (আনন্দবাজার, ১০ অক্টোবর ২০০৪) এ তো গেল কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা।

রাজ্যের প্রায় তিন দশকের অবিসংবাদী 'জনদরদী' সরকারও আজ পর্যন্ত পাট চাষীদের জন্য কোনও রকম রক্ষাকবচেরই ব্যবস্থা করতে পারেনি। ২০০২ সালের জুন মাসে এই সরকারের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। সেই উপলক্ষে সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ'র একটি বিশেষ সংখ্যা (জুন, ২০০২) প্রকাশিত হয়েছে। ৩১২ পৃষ্ঠার ওই সুদৃশ্য-সুমুদ্রিত সংখ্যাটিতে রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অথবা নিবন্ধ লিখেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরাও নিবন্ধ লিখে রাজ্য সরকারের সাফল্য বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীমশায়গণ 'শিল্পায়নের দিকনির্দেশ', 'যথাযথ কৃষি বিপণন' থেকে শুরু করে 'সমবায়কে ছড়িয়ে' দেওয়ার অঙ্গীকারও করেছেন পাতায় পাতায়। কিন্তু ৩১২ টি পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কৃষি বিপণন মন্ত্রী ছায়া ঘোষের একটি ভিত্তিহীন দায়সারা উক্তি (''পাট শ্রেণীবিন্যাস—এই বিষয়ে ৬০,৫০০ জন চাষীভাইকে এই প্রকল্পে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।'') ছাড়া পাটচাষী বা অন্য কোনও চাষীদের সমস্যা বা দুর্দশা নিয়ে দু'একটা শব্দও খরচ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের 'নয়া অর্থিক নীতি'র অনুসারী ম্যাকিনসীয় 'কৃষিনীতি' লাগু করার তালে থাকলে সরকারের অ্যাজেণ্ডা থেকে চাষীভাইদের দুঃখ-দুর্দশা বোধ হয় দূরেই সরে যায়! অথবা তাদের দুঃখ-দুর্দশাই হয়ত বা ম্যাকিনসেদেরকে পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে ওঠার রসদ যোগায়।

পাটচাষীদের অসহায়তা দূর করার লক্ষ্যে বিগত বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই চিন্তাভাবনা



বোঝা বহাই কি সার?

শুরু হয়েছিল। চাষীদের সমবায়ের প্রয়োজন নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছিল বিস্তর। বিভিন্ন জেলার 'বিশেষজ্ঞদের' নিয়ে নদীয়া জেলার আলমডাঙ্গায় সম্মেলন হয়েছিল ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। গড়ে উঠেছিল 'কো-অপারেটিভ বিক্রয় সমিতি'। আর আজ এত বছর পরে, 'সমবায় আন্দোলন'-এর এত ঢক্কানিনাদের মধ্যেও পাটচাষীদের সমবায়ের অস্তিত্ব কোথায়? ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের (১৯২৬) ভাদ্র সংখ্যা 'আর্থিক উন্নতি'তে মোঃ আসরাফ হোসেন তাঁর নিবন্ধ শেষ করেছেন এইভাবে— ''পল্লী-হিতৈষী দরিদ্র-বন্ধু নেতৃগণকেও এ বিষয়ে (পাটচাষীদের সমবায় গড়ে তোলার) আন্দোলন আরম্ভ করিতে সাগ্রহ অনুরোধ করিতেছি।'' গভীর পরিতাপের বিষয়, আজকের 'দরিদ্র-বন্ধু' নেতৃগণ পাটের দাম কত হলে 'ভাল দাম' হয় সেটাই ভুলতে বসেছেন। যারা গত শতকের আটের দশকেই পাটের দর ৮০০ টাকা কুইন্টালের দাবি তুলেছিলেন, তারা আজ এত বছর পরেও, যখন কিনা চাষের খরচ প্রায় ৩/৪ গুণ বেড়ে গেছে, তখনও ৮০০ টাকা বা তার কম দরেও বেশ হাসিখুশী। ২০০২ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাজ্যের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদক এই জেলার প্রায় পাটবিহীন নবগ্রামে অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য সভায় রাজ্য সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সম্পন্ন দায়িত্বশীল শীর্ষ ব্যক্তিটি একটি দুর্ভাগ্যজনক উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, ''ধানচাষিরা ন্যায্য দাম না পেলেও পাটে এবার ভালই দাম পেয়েছেন।'' (আনন্দবাজার, ১৬ ডিসেম্বর ২০০২) 'দরিদ্র-বন্ধু' নেতার চোখে যদি আটশো টাকাটা 'ভাল দাম' হয়, তাহলে দরিদ্র চাষীভাইয়েরা দাঁড়াবেন কোথায়?

তথ্যসূত্র ঃ

১। Jute in Bengal– N. C. Choudhuri.
২। Principles and Practices of crop Production – P. C. Das
৩। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।
৪। গৃহস্থ, বৈশাখ— আষাঢ়, ১৩২৪।
৫। প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩২।
৬। ঢাকার ইতিহাস— যতীন্দ্রমোহন রায়।
৭। আর্থিক উন্নতি, ১৩৩৩ সনের ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩৩৪ সনের কার্তিক ও ফাল্গুন সংখ্যা।
৮। প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।
৯। শস্যোৎপাদনের মূলতত্ত্ব— রামানন্দ চক্রবর্তী ও বিজনকুমার মণ্ডল।
১০। ঝড়, সংবাদ-সাহিত্য সাপ্তাহিক, ৬ আগস্ট, ২০০১ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪।
১১। পশ্চিমবঙ্গ, জুন, ২০০২।
১২। রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কৃষিনীতি— এ আই কে কে এম এস (প.ব.রাজ্য কমিটি)

ডোমকল— কিছু জানা ও অজানা তথ্য

শিশির কুমার দাস

এক সময় মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় মধ্যদিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। গঙ্গানদীর পশ্চিমাংশ রাঢ় এবং পূর্বে পদ্মানদীর ধার পর্যন্ত বাগড়ি নামে পরিচিত। পশ্চিমদিকে আছে ময়ূরাক্ষী, বাহ্মণী, দ্বারকা প্রভৃতি নদী এবং বাগড়ী এলাকার ভৈরব, শিয়ালমারী, খড়ে বা জলঙ্গি নদী। বাগড়ী এলাকার নদীগুলির উৎস পদ্মানদী। রেনেলের প্রস্তুত মানচিত্রে যে 'কলকলি' নদীর উল্লেখ আছে তা শিয়ালমারা কিনা বোঝা যায় না। তবে নদীটির গতি পথ এবং বিভিন্ন স্থানের অবস্থান দেখে মনে হয় ওই 'কলকলি' নদী শিয়ালমারা হতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলার নবতম মহকুমা 'ডোমকল' বিগত ১৯৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর মহকুমা হিসাবে স্বীকৃত লাভ করে। ডোমকল, জলঙ্গি, রানীনগর-১, রানীনগর-২ ব্লক নিয়ে এই মহকুমা গঠিত।

অবস্থান ঃ ডোমকল এর উত্তরে রানীনগর-১ এবং রানীনগর -২ ব্লক পূর্বে জলঙ্গি ব্লক, পশ্চিমে ভৈরব দক্ষিণে নদীয়ার করিমপুর এবং মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লক।

নামকরণ ঃ বর্তমানে ডোমকল নামে পরিচিত হলেও পূর্বের সমস্ত নথিপত্রে এর পরিচিতি ছিল ডোমকুল (Doom Kool) নামে। এ নামের পিছনে নানান অভিমত আছে। কেউ কেউ বলেন মধ্যযুগের প্রারম্ভে এখানে ডোম ও কোল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের বাস ছিল। সেই থেকে ডোমকল নাম হয়েছে।

কিন্তু ডোম অর্থে নীচু। এই এলাকা ছিল নীচু ও জঙ্গলাকীর্ণ। এখানে বিপুল পরিমাণে কুলের গাছের জঙ্গলও ছিল। যা আজ থেকে ৪০ বছর আগেও ব্যাপকভাবে দেখা যেতো। আজও কিছু কিছু এলাকায় তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। ফলতঃ এলাকাটি নীচু এবং কুল গাছ সমৃদ্ধ হওয়ায় ডোমকুল নামে পরিচিত হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। এই মতবাদটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে।

ডোমকল ব্লকের সদর কার্যালয়টি ২ নং জিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবলাবোনায় অবস্থিত। এই জিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীন জিতপুর গ্রাম যা আজ মোল্লাপাড়া জিতপুর নামে পরিচিত একসময় অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী গঞ্জ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের ডোমকল আজিমগঞ্জগোলা বাজার।

বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে আজিমগঞ্জ-এ আসেন কৈলাশ প্রসাদ সিংহ। সেখান থেকে বিজয়সিংহ দুধুরিয়ার নিকট থেকে জিতপুর এলাকার পত্তনী বা বন্দোবস্ত নেন ও জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এখানে পূর্ব থেকেই একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল। শিয়ালমারী নদীর ধারে এর অবস্থান। এখান থেকে নদীপথে পদ্মাপারের নিকটবর্তী রাজশাহী এবং অন্যান্য স্থানে

সহজেই যাতায়াত করা যেত। মূলত হিন্দু মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোকজন এলাকার বাসিন্দা ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও বাস করতো তবে তারা সংখ্যায় কম ছিল। এলাকার গ্রামগুলির নাম এবং বাসিন্দার বসবাসই তার পরিচয় বহন করছে। গ্রামগুলির নাম যেমন কাশীপুর, পার রঘুনাথপুর, জোতকানাই, গোকুলচক, দাসেরচক, রাধাকান্তপুর ও ভগীরথপুর রায়পুর ইত্যাদি।

কৈলাস প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের জ্যৈষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের আমলে জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। এলাকাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালীগঞ্জে পরিণত হয়। তার বিরাট জমিদার বাড়ি ছিল। সদর গেটে সবসময় তক্‌মাধারী বরকন্দাজ পাহারা দিত। বাড়ির সদর গেটের চূড়া বহুদূর থেকে দেখা যেত। গেটের নক্সা ছিল দর্শনীয়। ছিল নহবতখানা। প্রতিদিন যথানিয়মে নহবত বসতো। তার প্রতিষ্ঠিত কালী পূজা আজও চালু আছে। এলাকার মানুষ এই পুজোকে 'রাজার কালী' নামে অভিহিত করে এবং তা বারোয়ারী পুজো হিসাবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বৈভব নাই কিন্তু ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজও অম্লান।

বর্ধমানের বড়শূলে তার শ্বশুর বাড়ি ছিল। তিনি তার দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে যাওয়ার সময় বড়শূলে যেতেন এবং তার শ্বশুর মশায় কর্তৃক তারজন্য নির্মিত পৃথক প্রাসাদে থাকতেন। পরে শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি জমিদারীর অংশ পান এবং সেখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। জিতপুরের জমিদারী তিনি তার ছোট ভাই নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহকে দেন দ্বারভাঙ্গায় তার সম্পত্তির অংশের পরিবর্তে। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে তার অনেক বিষয়ে পাল্লা হতো এবং মোকর্দ্দমাও। তার উত্তরাধিকারীরা এখনও বড়শূলের বাসিন্দা।

কৈলাস প্রসাদ সিংহের দ্বিতীয়পুত্র রাখাল সিংহ। ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি দ্বারভাঙ্গায় চলে গিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ছিলেন কৈলাস প্রসাদের তৃতীয়পুত্র। তিনি ছিলেন সন্তানহীন। ইনি জিতপুরেই ছিলেন এবং মারা যান। বহরমপুরের কাদাই অঞ্চলে তার বাড়ি ছিল। যতদূর জানা যায় 'প্রয়োজনী টেলারিং'-এর বাড়ি। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় মৃত্যুর পূর্বে সমূদয় সম্পত্তি তার স্ত্রী করুণাময়ী দেবীর নামে হস্তান্তরিত করেন। করুণাময়ী দেবী তার সমূদয় সম্পত্তি বিক্রয় করে রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। তৎপূর্বেই তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। করুণাময়ী দেবীর অনুপস্থিতির কারণে তার জমিদারীর সমস্ত সম্পত্তি দেখাশুনা এবং বিক্রয়ের ভার দেন (power of Atorny) পার্শ্ববর্তী রায়পুরের গ্রামের রোহিনী মণ্ডলকে। কিন্তু শোনা যায় যে তিনি করুণাময়ী দেবীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেন।

তারপর ক্রমেই এই পরিবারের চিহ্ন লোপ পেতে থাকে। জমিদার বাড়ি ও ক্রমে লোপ হতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে এই জমিদাররা ছিলেন বৈশ্য তাম্বুলী সম্প্রদায়ের লোক। তাদের

অন্যান্য তথ্য ঃ ডোমকলের আয়তন ৩০৪.২৭ বর্গ কিলোমিটার

গ্রামের সংখ্যা — ১৩৯ গ্রামপঞ্চায়েতের সংখ্যা — ১৩

লোক সংখ্যা — ৩,১১,৬৮৩ (২০০১ আদমসুমারী অনুযায়ী)

ক) পুরুষ — ১,৬০,৫৬২ খ) স্ত্রী — ১,৫১,১২১ গ) ঘনত্ব — ১,০২৪ প্রতি বর্গ কিলোমিটার

তপশীলি জাতি — পুরুষ ৫,০৬৩, স্ত্রী ৪,৭৫৬, তপশীলি উপজাতি — পুরুষ ৩১৭, স্ত্রী ৩০৫

পরিবার — ৪৬,০৫৪, মৌজা — ৮৭, এর মধ্যে ৬৭ মৌজার লোক বাস করে।

জুনিয়ার হাইস্কুল — ৫, হাইস্কুল — ৭, হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল — ৫, হায়ার সেকেণ্ডারী (বালিকা) — ১

হাই মাদ্রাসা — ৫, জুনিয়ার হাইস্কুল (বালিকা) — ১, কলেজ সাধারণ — ১, বিভিন্ন বিভাগে স্নাতক সহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ — ১, পলিকেটনিক — ১

প্রাথমিক শিক্ষা-শিক্ষণ কেন্দ্র — ১, প্রাণী সম্পদ বিষয়ক ট্রেনিং সেন্টার — ১

জমিদারীর শাসনকালে হুগলীর বৈঁচি বা অন্যান্য জায়গা থেকে বর্গীদের হাঙ্গামার ভয়ে এখানে অনেকে চলে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে বহরমপুর অধিবাসী ধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও আগমানন্দ সিংহ উভয়ের পিতা তারিণী সিংহ এদের পূর্বপুরুষ ও হুগলীর বৈঁচী বা তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। তারিণী সিংহ প্রতিষ্ঠিত দুর্গা মন্দির আজ পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশায় তাদের স্মৃতিবহন করছে। বর্তমানে এখানে কোনও পূজা হয়না।

এরপর থেকে ক্রমেই জিতপুরের গৌরব হ্রাস পেতে থাকে। এই জিতপুরে কালীপুজো উপলক্ষে মাসাধিককাল ধরে মেলা বসতো। কোলকাতা ও রাজশাহী থেকে অনেক ব্যবসায়ী নৌকাপথে এসে তাদের পসরা সাজিয়ে বসতেন। পাঁচ এর দশকের প্রথমদিকেও এই মেলার যথেষ্ট জোর ছিল।

যাতায়াতের অসুবিধা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা, নিরাপত্তা (বিশেষত দেশভাগের পর), কলেরা বসন্ত ইত্যাদি কারণে ক্রমেই এলাকায় ব্যক্তিরা জিতপুর প্রতিষ্ঠিত থেকে আজিমগঞ্জ বাজারের সন্নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী অমূল্যরতন সাহা (রসুলপুর) এবং ব্রজমোহন সাহা প্রমুখ। এদের নাম ডোমকল ভবতারণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯১৫ সালের চাঁদা দাতাদের নামের তালিকায় দেখা যায়। পরবর্তীকালে আরও অনেকেই ডোমকলে চলে আসেন বর্তমানে জিতপুর একটি পরিত্যক্ত জনপদ। জিতপুরে স্বর্ণকার কর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস ছিল।

সমসাময়িক সময়ে আরও এক মুসলমান জমিদার পরিবার এখানে ছিল। এরাও আজিমগঞ্জে বিজয়সিংহ দুধুরিয়ার নিকট থেকে পত্তনী নেন। এরা ছিলেন তোফেলুদ্দিন সাহেব ও তৈয়বুদ্দিন সাহেব। এরা দুইভাই। এদের পিতা মূল জমিদারী বন্দোবস্ত নেন। তোফেলুদ্দিন সাহেব ফরিদপুরে (থানা জলঙ্গি) শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি পেয়ে সেখানে চলে যান। তার পুত্র গোলাম পাঞ্জাতন (বড় মিঞা)। ইনি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এতদঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তোফেলুদ্দিন সাহেবের নিকট থেকে মেদিনীপুর জমিদারী



বহরমপুর-জলঙ্গি রোডের উপর ডোমকল কুঠির এই বিশাল বহুল ও দর্শনীয় বাংলোটি আজ আর নেই। কয়েক বছর আগে এটি ভেঙেচুরে ব্যবসয়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। চিত্র ঃ বর্ণালী স্টুডিও, ডোমকল (২০ বছর আগের তোলা)

কোম্পানির এজেন্ট এন্ড্রু ইউল কোম্পানি দরপত্তনী নেন ফরিদপুর এলাকায়। সেই কারণেই ওখানে নীলচাষ হতো। একটি এলাকা আজও কুঠির মাঠ ও গাদেরদাঁড়া নামে পরিচিত।

প্রকাশ থাকে যে জিতপুর ও মোল্লাপাড়ার এই দুই জমিদার পরিবারের মধ্যে কোনও বিবাদ ছিল না। বরং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এলাকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ছিল যথেষ্ট সদ্ভাব।

উল্লেখ্য উভয় জমিদারদের সঙ্গে মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিলনা। জিতপুর সংলগ্ন গ্রাম যথাক্রমে কাশীপুর, জোতকানাই, গোকুলচক, পাইকমারী, ধূলাউড়ি প্রভৃতি হিন্দু মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষের বাস ছিল এবং এখনও আছে।

এই এলাকার মেহেদীপাড়া গ্রাম প্রাচীন। এখানে বিভিন্ন সময় খোঁড়াখুড়ি করায় ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়। বর্তমানের বাসিন্দারা সম্ভবত, অনেকপরে এখানে এসেছে।

নবাবী শাসনের মুর্শিদাবাদ। আগেই বর্ণিত হয়েছে। গঙ্গার পশ্চিমপাড় 'রাঢ়' ও পূর্ব পাড় 'বাগড়ী' নামে পরিচিত। ভৈরব শিয়ালমারী জলঙ্গি নদী সমূহ এই বাগড়ি এলাকাকে ঘিরে ছিল। ছিল অসংখ্য খাল বিল। নদীগুলির উৎস ছিল পদ্মানদী। ফলে নদীগুলি ছিল স্রোতস্বিনী ও বেগবতী। পলিসমৃদ্ধ এলাকায় তুঁতের চাষ হতো। উৎপাদিত হতো রেশম। মুর্শিদাবাদে তখন ব্যাপকভাবে রেশম চাষ হতো।

ডাচেরা ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে বাংলায়-স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার ফরমান লাভ করে। এর অনেক পরে ১৬৫১ সালে ইংরেজরা বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে। ফলে ডাচরা এই এলাকা থেকে প্রচুর রেশম বিদেশে এবং তাদের পূর্বতন ব্যাবসাকেন্দ্র গুজরাটে চালান দিত। এর ফলে ইসলামপুর চক, গোয়াস ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় সম্রাট আকবরের আমলে তার সাম্রাজ্যে ৩২০০ টি কসবা বা ছোট বড় শহর ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ি অঞ্চলেই ছিল দু'টি। একটি ভগবানগোলার 'বাহাদুরপুর' এবং বর্তমান ইসলামপুর থানার 'গোয়াস'। এই গোয়াসের যেখানে 'রামনবমী মেলা' হয় তার পাশ দিয়ে 'গোমানী' (?) নামে একটি নদী প্রবাহিত হতো। এই নদীটি দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে ডোমকল থানার কলাবাড়িয়া গ্রামের উত্তর দিকে হতে এসে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছিল। বর্তমানে তার গতি আর নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

গোয়াস নানা কারণে তার মর্যাদা হারায়। এখানের অনেক পরিবার ডোমকলে বসবাস শুরু করে। এই এলাকা আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির থাকলেও পরে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির শাসনাধীন হয়। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির মালিক ছিলেন হৃষিকেশ লাহা। তাদের বাড়ি ছিল মেদিনীপুর। তাদের জমিদারী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ জোনের দসর ছিল 'গোদাপিয়াশাল' আর উত্তর জোনের সদর শিকারপুর কুঠি। এরা ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবের আশ্রিত পত্তনীদার। এদের ব্যবসা ছিল স্বদেশে ও বিদেশে। দেশের ব্যবসা ছিল গোলদারী। উত্তরাংশে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বৃহদংশে তাদের জমিদারী ছিল।

পলিমাটি দ্বারা গঠিত এই এলাকা। এই এলাকা নীল চাষের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ইংরেজ নীলকর সাহেবগণ নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের ব্যাপক অংশে নীল চাষ শুরু করে। এজন্য তারা চাষিদের দাদন দিত এবং জোর করে নীল চাষ করাতো। কেউ চাষ করতে অস্বীকার করলে অমানুষিত অত্যাচার করতো। এই নীল বস্ত্রশিল্পের কাজে প্রচুর পরিমানে ব্যবহার করা হতো। ফলে এটা ছিল ব্যাপক আয়ের পথ। সুতরাং কিছু অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী এবং

ইংরেজ ছোকরা বাংলা ও বিহারে একাজ শুরু করে জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে।

এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং হৃষিকেশ লাহার কাছে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকার এজেন্সী নেয় মূলত নীল চাষের জন্য। এরা এই এলাকায় নদীয়ার মেহেরপুর, আমঝুপি (বর্তমানে বাংলাদেশে), রাজশাহীর বিলবাড়িয়া (বর্তমানে বাংলাদেশ) মুর্শিদাবাদের ডোমকল, পাটিকাবাড়ি, সুজাপুর ভগবানগোলার খড়িবোনা ও নদীয়ার শিকারপুরে কুঠি স্থাপন করে। এনড্রু ইউল কোং তার জন্য লাহাদের বাৎসরিক টাকা দিত। এনড্রু ইউল কোং এর প্রধান কার্যালয় ছিল শিকারপুর কুঠি। বন্দোবস্ত নেওয়া এলাকায় তারা চাষিদের জোর করে নীল চাষ করাতো। যারা অস্বীকার করতো তাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতো। এক্ষেত্রে কোনও সরকারি আইন নয় কুঠিয়ালদের আইনই শেষ কথা ছিল। মেয়েদেরও নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হতো। এনড্রু ইউল কোং ছিল উৎপাদিত নীলের 'সোল ডিস্ট্রিবিউটর'। ডোমকল কুঠি ছিল অত্যন্ত সুদৃশ্য। এলাকা প্রায় ৫২ বিঘা। বহরমপুর থেকে জলঙ্গি থানার মূল রাস্তার উপর থেকে প্রায় দু'শত মিটার ভিতরে মূল বাংলো। মূল রাস্তা থেকে কুঠির এলাকার প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে দেবদারু এবং ঝাউগাছ। মূল রাস্তা থেকে বাংলোর গেটের সামনে পৌঁছানোর রাস্তার দু'পাশে কর্মচারীদের বাসগৃহ। বাংলোর প্রবেশ পথের দু'পাশে যথা পূর্বদিকে কাচারীবাড়ি গ্যারেজ ও গুদামঘর পশ্চিমপার্শ্বে কুঠির ম্যানেজারের অফিস যা 'ইংলিশ অফিস' নামে খ্যাত। তার পার্শ্বে ছিল ম্যানেজারের টাইপিষ্ট ও একান্ত কর্মীদের অফিস। দু'টি ঘরের রঙ ছিল লাল। এই ঘর দুটির পার্শ্বে উত্তর দক্ষিণ বরাবর ছিল টেনিস খেলার হার্ড কোর্ট। বাংলোর লনে ছিল ঘাসের কোর্ট। প্রধান সড়ক থেকে বাংলোয় আসার রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ দেবদারু গাছ। বাংলোর প্রবেশ দ্বারের দুপাশে দুটি কামান। বাংলোয় প্রবেশ দ্বারের বামপার্শ্বে পূর্ব পশ্চিম বরাবর ছিল জেনারেটর ঘর। মুরগীচাষের ঘর ও লিচু গাছ, গরু ও ঘোড়া রাখার ঘর। বাংলোর গেটের ডানদিকে প্রাচীরের গায়ে ঘেষে ছিল বোগেনভিলিয়া ও নাগলিঙ্গম গাছে। অসাধারণ ফুলের বাগান। পশ্চিমে ছিল বাঁধানো পুকুর। যা আজও আছে। পাড়ে ছিল গোলাপ বাগান। পূর্বে বাংলোর গা ঘেঁসে ছিল কাঠমল্লিকা গাছ। দক্ষিণ খোলা সবুজ লন। দক্ষিণ ও পূর্ব ছিল খোলা। কাঁটাতারের বেড়া। বাংলোর দক্ষিণে ছিল বড় বিল। পশ্চিমে অতীতের প্রবাহ বন্ধ হওয়া নদী। কুঠির বাংলোর দক্ষিণে অবস্থিত বড় বিলের সঙ্গে শিয়ালমারী ও ভৈরবের যোগাযোগ ছিল। এ পথেই নৌকা সহযোগে হয়তো কুঠির সাহেবদের যাতায়াত ছিল।

বাংলোর দক্ষিণপূর্ব কোণে ছিল বসবার জায়গা। মেঝে ছিল ঘন সবুজ রঙে অসাধারণ মোজাইক। বাংলোর ভেতরে ছিল বিলিয়ার্ড বোর্ড। ঘরের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে বিশাল নীল রঙের কাচ দিয়ে আচ্ছাদিত। শয়ন কক্ষ ছিল মোট ৬টি। প্রতিটি ঘর অত্যন্ত সুসজ্জিত। ফায়ার প্লেস ছিল। ঘর সংলগ্ন আধুনিকতম ব্যবস্থাসহ বাথরুম। নিজস্ব মোটরে উৎপাদিত বিদ্যুতে আলো জ্বলত, পাখার ব্যবস্থা, ছিল ফ্রিজ। উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত বাস ঘর ছিল। মধ্যে ছিল বসার জায়গা। খাবার ও রান্নার ঘর বাহিরে দিকে ছিল। নলবাহিত জল ব্যবস্থা ছিল। জেলাশাসকও সেইসময় এত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারতেন না এই কুঠির ম্যানেজারদের মতো।

বাংলোর পূর্বদিকে বহরমপুর জলঙ্গি রাস্তার ধার যেতে দক্ষিণে বিস্তৃত বিশাল ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। যা এক পাক দিলে ১ মাইল হতো। এই মাঠে ফুটবল খেলাও হতো। তার সামান্যই এখন অবশিষ্ট আছে কুঠির ফুটবল মাঠ নামে।

বাংলা বৎসরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ চৈত্র কুঠিতে উৎসব পালন হতো। তবে ফাল্গুন মাসের শেষ শনিবার এখানে কালীপুজো হত। এই কালীপুজো উপলক্ষে হতো ধুমধাম। বিভিন্ন কুঠির ম্যানেজারগণ এখানে অংশগ্রহণ করতো। বিপুল পরিমানে বাজি পোড়ানো হতো। কোলকাতা থেকে নাটকের দল আসতো। বাজির রোশনাই বহুদূর থেকে দেখা যেত। কর্মচারীগণ ও তাদের পরিবার থিয়েটারে অংশগ্রহণ করতো। একেবারে শেষ পর্বে এই শতকের পাঁচ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জমানবীশ ষষ্টি চৌধুরীর উদ্যোগে জেলার বিখ্যাত অভিনেতা কালীদাস সমাজদ্দারকে নাট্য পরিচালকরূপে এখানে আনেন। তাঁর পরিচালনায় 'কেরাণীর জীবন' সহ অন্যান্য নাটক অভিনীত হয়। এই কেরাণীর জীবন নাটকে শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের অসাধারণ অভিনয় অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। স্মরণীয় হয়ে আছে অমর পালের অভিনয়। এখানে 'বঙ্গে বর্গী', 'মন্ত্রশক্তি', 'কেদার' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে এসব পয়তাল্লিশ-ছিচল্লিশ বছর আগের কথা।

বর্তমানে এই সুসজ্জিত ডোমকল কুঠি শ্রীহীন। অসাধারণ বাংলোর কোনও অস্তিত্ব নেই। নেই কাচারি বাড়ি, ইংলিশ অফিস। ৫২ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এই কুঠির বিভিন্ন স্থানে গোডাউন, বিভিন্ন লোকের বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। কুঠির সমস্ত জমিই খাস তা সত্বেও কে বা কারা এই জমি বিক্রি করেছে বা করছে মানুষের কাছে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন। সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন কেন? সরকারি সম্পত্তি রক্ষার কোনও দায় কী সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নেই?

ডোমকল কুঠির উত্তর দিকে অবস্থিত বাজিতপুর ও লক্ষ্মীনাথপুর গ্রাম। এখানেই বাসছিল ডোমকল কুঠির স্বনামখ্যাত নায়েব বৈদ্যনাথ সান্যালের। তিনি ধোড়াদহের মানুষ ছিলেন। প্রথমে শিকারপুর কুঠিতে যোগদান পরে ডোমকল কুঠি। এখানে নিজবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতা তাকে নায়েব পদে আসীন হতে সাহায্য করেছিল। কুঠির সাহেবদের অধীনে চাকুরি করলেও নিজস্ব সত্তা ও মর্যাদা নিয়ে চলতেন। তাঁর পুত্র প্রমথনাথ সান্যাল ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। বাবা সাহেবদের অধীনে চাকুরি করলেও তিনি সাহেবভক্ত ছিলেন না। শোনা যায় বাড়ি ফেরার পথে কুঠির ম্যানেজারের ফিটন এবং তার ফিটন সামনাসামনি হলে রাস্তা ছাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বে সাহেব তাকে চাবুক দিয়ে মারলে তিনি তা কেড়ে নিয়ে সাহেবকেও চাবুক দিয়ে মারেন। এ ঘটনায় অনেক জল ঘোলা হয়। এক্ষেত্রে প্রমথবাবুকে সমর্থন করেন কৃষ্ণনাথ কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ হুইলার সাহেব। প্রমথবাবু ছিলেন হুইলার সাহেবের একান্ত গুণমুগ্ধজন।

বৈদ্যনাথ সান্যাল ছিলেন শিক্ষানুরাগী মানুষ। তার প্রচেষ্টা ও কুঠির ম্যানেজার এর সহযোগিতায় ডোমকল আজিমগঞ্জে একটি এম ই স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৭৯ সালের পূর্বে।

তাঁর ম্যানেজার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র পাল। তিনি হরিহরপাড়া থানার চোঁয়ার লোক ছিলেন। তার প্রথম পুত্র শরৎচন্দ্র পাল ছিলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ। তার পুত্র ইন্দুভূষণ পাল (ট্রিপল এম এস সি) ছিলেন ডোমকলে বিটি হাইস্কুলের শিক্ষক। নিরহঙ্কারী ও অসাধারণ পণ্ডিত মানুষ। ঈশ্বর পালের অপর পুত্র বল্লভ পালের পুত্র অশ্বিনী পাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং ২য় পুত্র তারিণী পাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। উভয়েই যাদবপুর বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সুধাংশু শেখর পাল ও শশাঙ্ক শেখর পাল ছিলেন 'সুভাষচন্দ্র বসু'র 'নেশন' কাগজের সঙ্গে যুক্ত। প্রখ্যাত উকিল মঙ্গলময় মৈত্রের বাড়ি বাজিতপুরে।

বহু শিক্ষিত বর্ধিষ্ণু ও ধনশালী মানুষের বাস এই গ্রামে। প্রাচীন গ্রাম গোয়াস ধ্বংসের পর অনেক পরিবার এখানে এসেছেন। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বাস এই গ্রামে। এখানে পাল সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যবসা শঙ্খ শিল্পের। এই শিল্পের এক সময় যথেষ্ট রমরমা ছিল। মাঝে

চরম বিপর্যয় হয়। বর্তমানে কিছুটা উন্নত।

ডোমকল কুঠির নায়েব শ্রীজীব লাহিড়ীও সুরেন পালের বাস ছিল লক্ষ্মীনাথপুরে। বাজিতপুর গ্রামে আছে প্রাচীন দুর্গামন্দির যা 'বুড়িমার মন্দির' নামে খ্যাত। শোনা যায় কয়েক শতবছরের পুরাতন এই পুজো। এক সময় লক্ষ্মীনাথপুরে ঘরে ঘরে কার্তিক পুজোর প্রচলন ছিল। বর্তমানে তা বন্ধ।

ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে এক সময় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল এই গ্রামদুটি। বি এল এফ সি পরিচালিত শীল্ড প্রতিযোগিতা সাড়া জাগানো ফুটবল প্রতিযোগিতা ছিল।

ডোমকল কুঠি থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে আজিমগঞ্জ গোলায় ডোমকল থানা অবস্থিত। বর্তমান থানা বাড়িটি সাবেক নীল কুঠিবাড়িতে অবস্থিত। পাশে থানার গা লাগোয়া ছিল ডাক্‌বাংলো। এটি পরে হয়েছিল ডোমকল সার্কেল এর পুলিশ ইন্সপেক্টরের অফিস। ১৯৯২ সালের পরন্ততৎকালীন ডোমকল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উদ্যোগে ভাঙা হয় এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলার জায়গা করা হয়। পূর্বোক্ত ডাক বাংলোটি নানা কারণে ঐতিহাসিক।

আজিমগঞ্জগোলা নামকরণের কারণ এখানে লবণের গোলা ছিল ব্যবসায়ীদের। এখানেই মঙ্গলবার ও শুক্রবারের হাট অত্যন্ত প্রাচীন। পুরাতন ব্লক অফিসের কাছে মসজিদের মোড় থেকে বাজারের মধ্য দিয়ে বর্তমান মিনিবাজার হয়ে নদী পার হয়ে জলঙ্গি যাবার রাস্তা ছিল। বর্তমানে রাস্তা নতুন। নদীর ওপারে রসুলপুর। ওখানে একটি কাচারিবাড়ি ছিল। এখন ওখানে সুপারমার্কেট তৈরি হয়েছে।

আজিমগঞ্জ গোলার অন্তর্গত মানিকনগর গ্রামে পূর্বে প্রচুর চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতো। এরা মূলত সব্জী চাষি। পাশের শম্ভুনগর গ্রামে অনুরূপ চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতো। বর্তমানে চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষগণ পদ্মার চর ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাজিতপুরের পার্শ্বে রমনা সেখপাড়ায় সামান্য কিছু ঘর চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ আজও বাস করেন।

ডোমকল বি টি হাইস্কুলের পিছনে চৌধুরীপাড়া। এরা 'তিয়র' সম্প্রদায়ের লোক। এদের পূর্বপুরুষগণ বিহার থেকে আগত। এদের ছিল নৌকামেরামত, মাছধরা, যাঁতা বা পাটা কোটানো। মেয়েদের গায়ে আগে উল্কি দেখা যেত। দেহাতী হিন্দি ভাষায় কথা বলতো। বিবাহ অনুষ্ঠানও বিহারীদের নিয়মে হতো। বর্তমানে এরা বাঙালি সংস্কৃতিতে মিশে গিয়েছে। তারা এখন কাঠের আসবাব তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত এরা তপশীল জাতিভূক্ত। মেয়েরা ফাল্গুন মাসে ১ মাস যাবৎ 'বসন্তবুড়ি পুজো' করতো সন্ধ্যা বেলায়।

ডোমকল বাজারের মূল ব্যবসায়ী হিসাবে রামচন্দ্র সাহার নাম জানা যায়। এদের আসল উপাধি 'সাউ'। বর্তমানে প্রয়াত নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর বাড়ির প্রবেশ পথের ডান দিকে উঁচু ভিত্তির বাড়িই ছিল রামচন্দ্র সাহার। তাদের ব্যবসা ছিল লবণের ও গোলাদারীর। পুরাতন পশু হাটের নিকট রাস্তার লাগোয়া উত্তরদিকে পেছন করা পুরাতন দোতালা বাড়িটি কালী সাহার আড়ত বাড়ির অংশ। এদের আসল বাড়ি ধোড়াদহ (নদীয়ায়)।

বাজার সংলগ্ন এলাকায় আছে বিরাট কারিকরপাড়া। এরা মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়। এই তাঁতিপাড়া অত্যন্ত প্রাচীন। এখানে এক সময় তৈরি হতো তাঁতের কাপড় মশারি, চাদর, লুঙ্গি, গামছা। লুঙ্গি ও গামছা তৈরির কাজ আজও টিকে আছে। এখানের তৈরি বস্ত্রসম্ভার একসময় রাজশাহী, পুটিয়া, নাটোর সহ পূর্ববঙ্গের কুঠিয়ার বিভিন্ন জায়গায় অতিসমাদরে বিক্রি হতো।

কারিকরপাড়ার মধ্যদিয়ে যাওয়া রাস্তাটি পুরাতন। সোজা রাস্তাটি ভাতশালার পুরাতনপাড়ার মধ্যদিয়ে বিস্তৃত ছিল। নদীর ধারের বর্তমান রাস্তাটি বাঁধের উপর দিয়ে। অবিনাশদের দোকানের

সামনে থেকে পশ্চিমদিকে বড়বিল পর্যন্ত শিবুর দাঁড়া। এখান দিয়ে বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা সহজেই ভৈরব নদীতে যাতায়াত করতো।

ভাতশালা প্রাচীন গ্রাম। এখানে বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বাড়ি ছিল আরও ভিতরে। প্রাণগোপাল অধিকারী প্রথমে রাস্তার ধারে নদী কিনারে বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মেসোপটমিয়ায় চাকরি করতেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অবসর নিয়ে পারসিয়ান তেল কোম্পানিতেও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেন। ভাতশালার বর্তমান পাকুড়গাছের নিকট শ্মশান ছিল। বর্তমানে তা সরে গিয়েছে। এখন সেখানে পৌষ কালীপূজা হয় এবং মেলা বসে। বর্তমান ভাতশালার ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষগণ দেশ বিভাগের পর এখানে আসেন।

এখানে ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রাচীন ও বিখ্যাত আখড়া। সেই কারণে ভাতশালা গোপালগঞ্জ নামে অভিহিত ছিল। প্রথম মোহান্ত বৃন্দাবনদাস বাবাজী। কথিত আছে, তিনি ছিলেন সিদ্ধ সাধক। তাঁর সমাধি এখানে আছে। তিনি বাঙালি ছিলেন না। ছিলেন পশ্চিমা বৈষ্ণব সাধক। সম্ভবত মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে এই আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধক মস্তরামের মতো এই আখড়ায় অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো কিনা জানা যায় না। তবে শিয়ালমারী নদীর পশ্চিম তীর এবং ভৈরবের সঙ্গে সংযোগকারী ছাগলখালি বিলের একেবারে সন্নিকটে ছিল আখড়ার অবস্থান। ফলে সবদিকে সহজেই জলপথে যোগাযোগ সম্ভব ছিল।

আখড়ার তিনশত বিঘা জমি ছিল। ৫২ বিঘা জমির উপর আখড়া ছিল। রথযাত্রা, জন্মাষ্টমি, দোল উৎসব সহ বিভিন্ন উৎসব এখানে সমারোহে অনুষ্ঠিত হতো। এই আখড়ার শেষ মোহন্ত,- রাধানাথ দাস মোহান্ত। জলঙ্গির নুরুলি ফকির সাহেব এখানে নিয়মিত আসতেন।

ভাতশালা আখড়ার কিছুদূরের ভাতশালার প্রত্যন্ত এলাকায় মধুপুরের পার্শ্বে ছিল রামব্রহ্ম সরকারের বাড়ি। অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত পরিবার। বাড়ি সংলগ্ন বাঁধানো পুকুর আজও বর্তমান। তিনি শিক্ষানুরাগী মানুষ ছিলেন। ডোমকল হাইস্কুলের ১৯১৫ সালের মে মাসের চাঁদা দাতার তালিকায় নাম পাওয়া যায়। এলাকাটি সমৃদ্ধশালী বর্ধিষ্ণু পরিবারের বাস ছিল।

ভাতশালা রাস্তার মোড় থেকে কুশাবেড়িয়া যাবার পাকা রাস্তার বাম পার্শ্বে যুগিন্দা সাঁওতালপাড়া পর্যন্ত রাস্তার পূর্বে নজরদিলে সহজেই বোঝা যায় কোনও নদী প্রবাহিত ছিল। বিশেষত, মধুপুরের পূর্বদিকের মাঠের মাটি তা প্রমাণ করে। রাস্তার পাশের নালার মাটি কাটতে গিয়ে নৌকার কাঠও পাওয়া গিয়েছে। পূর্বদিকের নদীটি সম্ভবত বসন্তপুর ও বাটিকামারীর অবস্থিত ছাগলখালি বিলের সঙ্গে যুক্ত ভৈরবের জলে পুষ্ট ছিল। এই নদীটি বর্তমান সাঁওতালপাড়ার পূর্বদিকে জলাভূমি হিসাবে অবস্থান করছে। এই নদীটি দুধসর বিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাহাদিয়াড় এর মধ্য দিয়ে জলঙ্গি নদীতে যুক্ত ছিল। মধুপুরের পর থেকে রাস্তার পূর্বদিকে ছিল নাটাই, মনীন্দ্রকাঁটা ও বেতের বিশাল গভীর ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলে এক সময় বাঘও থাকত। আমি স্কুলে পড়াকালে সাঁওতালদের শিকার করা বাঘ দেখেছি। বাঘের আকৃতি ছোট ছিল। স্থানীয় ভাষায় তাকে 'গুলবাঘা' বলা হতো।

যুগিন্দা রায়পাড়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এখানে প্রায় তিনশত ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতো। এখানে 'শ্যাম রায়ে'র পাট ছিল। বর্তমানে যুগিন্দা বিশ্বাসপাড়ায় যাবার রাস্তায় ধারে পুকুরপাড়ে ভগ্নপ্রায় মন্দির তার সাক্ষী। মূর্তিটি কোথায় জানা যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। যুগিন্দা বিশ্বাসপাড়া মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এখানে বাড়ি ছিল ডোমকল হাইস্কুলের প্রখ্যাত প্রধান শিক্ষক হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের। যুগিন্দা এই প্রাচীন পল্লীর নামেই বৌদ্ধ-সংস্কৃতির ইঙ্গিত আছে।

রায়পাড়া পার হয়ে সামান্য রাস্তা গেলেই আমিনাবাদ যাবার রাস্তার পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল একটি প্রাচীন মসজিদ ভাঙা অবস্থায়। তার পাশেই একটি অতি প্রাচীন বকুল গাছ যার কাণ্ড ছিল সম্পূর্ণ ফাঁপা। গাছটির কাণ্ডও ছিল যথেষ্ট মোটা। স্বাভাবিকভাবেই ধরা যায় এই এলাকায় দীর্ঘকাল আগে জনবসতি ছিল। সে সময় এই মসজিদ তারা ব্যবহার করতেন। বর্তমানে মসজিদটি মেরামত হয়েছে। উল্লেখ্য ওই মসজিদটি জনবসতি থেকে অনেক দূরে সম্পূর্ণ নির্জন স্থানে ছিল। একটু এগিয়ে রাস্তার ডানদিকে সুলতানপুর বিল। একসময় লাল পদ্মে পরিপূর্ণ থাকতো। বিলটি অম্বরপুরের কাছে জলঙ্গি নদীর সঙ্গে দাঁড়া মারফৎ যুক্ত। পশ্চিমদিকে বৃন্দাবনপুর গ্রাম। এখানের চৌধুরীরা ও বিশ্বাসরা অভিজাত ও প্রতিপত্তি সম্পন্ন মুসলিম পরিবার। বাঁধানো পুকুর সংলগ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির কারুকাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বর্তমানে একটি উচ্চবিদ্যালয় আছে।

অম্বরপুর গ্রাম জলঙ্গি নদীর পাড়ে অবস্থিত। এখানে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির সঙ্গে দীর্ঘকালের বাস। তিলি বৈদ্য ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসস্থান। বনমালী সরকারের পূর্বপুরুষগণ ২৪ পরগণার লোক ছিলেন। সেখানে জমিদারী ও লবণের ব্যবসা ছিল। 'সূর্যাস্ত' আইনের কবলে পড়ে তাদের জমিদারী যায়। ইসলামপুর ও শ্রীরামপুরে আত্মীয়তার সূত্রে এরা এসে এদেশে নবাবের কাছ থেকে পত্তনী প্রাপ্ত হয়। যুগিন্দার পর থেকে অম্বরপুর পর্যন্ত তাদের জমিদারী ছিল। জমিদারী যাওয়ার পরবর্তীকালে তাদের অধস্তন পুরুষগণ ডোমকল কুঠির কর্মচারী ছিলেন।

পাশের গ্রাম মধুরকুল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এখানে রায় ও ঘোষ পরিবার যথেষ্ট খ্যাতি সম্পন্ন। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। রায় বংশের কেদার রায় ছিলেন মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির জমানবীশ। তিনি ডোমকল কুঠিতে চাকুরি করতেন। প্রমথ রায়ও ছিলেন এখানকার কর্মচারী। দীনু রায়ও ছিলেন দেওয়ান ডোমকল কুঠির। প্রিয়নাথ রায় ছিলেন পাটিকাবাড়ি কুঠির কর্মচারি। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির কর্মচারি হওয়ার সুবাদে তারা প্রচুর জমিজমার মালিক হন। যতদূর জানা যায় কেদার রায়ের পূর্ববাসস্থান ভাগীরথপুরের কাছে শ্রীরামপুর।

বর্তমানে রায় পাড়ার বিশাল বাড়িগুলির অবস্থান প্রায় নেই। বিশেষত প্রমথনাথ রায়ের পুত্র পার্বতী রায় সবই বিক্রি করে বহরমপুর চলে যান। বাড়ি ছিল তিন মহলা। বৈঠক বাড়ি, মধ্যবাড়ি ও ভিতর বাড়ি। বাড়ি সংলগ্ন বাঁধানো পুকুর। বাড়ি সামনে দুর্গামন্দির আজ সবই বিদ্ধস্ত।

সুরেন ঘোষও কুঠির কর্মচারি ছিলেন। চণ্ডী রায়ের বাবা প্রিয়নাথ রায় ছিলেন পাটিকাবাড়ির কর্মচারি। নদীর ধারের সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ির অস্তিত্ব আজ আর নাই।

মধুরকুলে সাহা, মণ্ডল ও হালদার সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। মণ্ডলরা চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল আজও আছে। নদীতে ছিল প্রচুর মাছ। সারা দিন জেলেদের মাছ ধরা একটা অনবদ্য দৃশ্য ছিল। সাহা সম্প্রদায়ের কয়েকঘর থাকলেও অনেকে আজ বাজিতপুর ও লক্ষ্মীনাথপুরের বাসিন্দা।

মধুরকুল ও অম্বরপুরের মাঝে অবস্থিত ফুটবল মাঠ। এখানে ফুটবল খেলার প্রচলন বহুকাল থেকে। উঠে এসেছে অনেক খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়। যেমন দীনু দাস, সুভাষ ঘোষ, সহদেব মণ্ডল প্রমুখ। দীনু দাস ইস্টার্ণ রেল দলের খেলোয়াড় ছিলেন। দুর্গাপুজোর সময় থিয়েটার হতো। তাতে পাশের গ্রামের অনেকেই অংশগ্রহণ করতেন। দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীর দিন প্রবহমান নদীতে বিরাট নৌকা বাইচ হতো। অম্বরপুর, মধুরকুল, আমিনাবাদ, পিপড়াপুড়ি, বাঘডাঙ্গা, পিরোজপুর, চারুনগর প্রভৃতি গ্রামের সমস্ত প্রতিমা নৌকাযোগের নদীতে বাইচে অংশগ্রহণ করতো। সঙ্গে অসংখ্য নৌকায় থাকতো বিভিন্ন পরিবারের লোকজন এবং অনেক মহিলারাও থাকতেন নৌকা বিহারে। নদীপাড় থাকতো এখানে ভাদ্রমাসে সন্ধ্যায় নদীতে প্রদীপ ভাসানো হতো। সঙ্গে মিষ্টান্ন থাকতো।

এটা সব সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসব ছিল। বর্তমানে একটি হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল আছে। বাঘডাঙ্গ ায় ছিল কাচারিবাড়ি। এখানে হাট বসতো, আজও বসে এবং বাঘডাঙ্গা এখন উন্নয়নশীল ব্যবসাকেন্দ্র। একটু দূরে অবস্থিত পিরোজপুর। এখানে ক্ষত্রিয় রাজপূত রায় পরিবারের বাস আর চাকি পরিবারের বাস। এই রায় পরিবারের পূর্ব পুরুষগণ বোধ হয় মোগলদের বাংলা আক্রমণের সময় সঙ্গী হিসাবে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই রায় পরিবারের নরেন্দ্রনাথ রায়ের আত্মীয় সুধীর রায়রা ছিলেন ভাতশালার বাসিন্দা। এই ভাতশালায় আছেন, রাজপুত ক্ষত্রিয় যোগেন সিংহর পরিবার। ডোমকল বাজারের ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়ের পিতৃদেব ছিলেন ডোমকল কুঠির বরকন্দাজ। তাদের আদি বাড়ি ছিল হরিহরপাড়া থানার নিধিনগর গ্রামে। ইনাদের পূর্বপুরুষগণও নিশ্চয়ই মোগলদের সঙ্গে এসেছিলেন। পিরোজপুরের চাকীগণের মধ্যে কেউ কেউ মোগলদের সঙ্গে এসেছিলেন। ডোমকল কুঠিতে চাকরি করতেন। এই চাকী পরিবারের 'শচীন্দ্রনাথ চাকী' জেলার অন্যতম বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ।

কুশাবেড়িয়া, ডুবাপাড়া, জুড়ানপুর বর্ধিষ্ণু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের বাস ছিল এবং আছে। আছে একটি হাইস্কুল এবং একটি জুনিয়র হাইস্কুল (মেয়েদের)। পাশের গ্রাম প্রায় নদীর ধারে অবস্থিত চারুনগর। জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। আজ নদীটি বদ্ধ জলা হওয়ায় মাছের অভাব। জেলেদের অবস্থা বড়ই বেদনাদায়ক। কুশাবেড়িয়া গ্রামের ছেলে বামফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রী ডোমকল বিটি হাইস্কুলের শিক্ষক প্রাণ মহম্মদ আব্দুল বারি ও প্রাক্তন বিধায়ক ডা. একরামূল হক। শিয়ালমারী নদী পদ্মা থেকে উৎপন্ন হয়ে আঁকা বাঁকা। পথে আজিমগঞ্জের পাশ দিয়ে বিলাসপুর কাশীগঞ্জ অতিক্রম করে কুপিনগর নিকট ত্রিমোহিনীতে জলঙ্গি নদীতে যুক্ত হয়েছে। এখান থেকে জলঙ্গি বা খড়ে নামে পরিচিত হয়ে করিমপুরের পাশদিয়ে মধুরকুল অতিক্রম করে চারুনগর থেকে এগিয়ে ডুবাপাড়ার কাছে কালা চাঁদ খালির দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চর নবীগঞ্জের কাছে ভৈরবের সঙ্গে যুক্ত হয়। পশ্চিমে ভেলানগর। ভৈরব ও জলঙ্গির মিলন স্থলের নাম ছিল রানীতলা। একসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট গ্রাম ছিল। ডুবাপাড়া থেকে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত জলঙ্গিনদীর মোহনা রানীতলা পর্যন্ত এখন বিলুপ্ত।

জিতপুর গ্রাম এখানেই অবস্থিত। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করলেও হিন্দু পাল সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য বেশি। বিরাট গ্রাম। গ্রাম দেখলে প্রায় গঞ্জ মনে হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট উন্নত। বহু মানুষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামখ্যাত। গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় অনেক কৃতি ছাত্রের জন্ম দিয়েছে। গ্রামে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। আছে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। প্রায় ৪৫০০ পুস্তক আছে। গ্রামের পূর্বদিকে খেলার মাঠ আছে। একসময় ফুটবলেও যথেষ্ট সুনাম ছিল।

পাশের গ্রাম পারদিয়াড় ও চাঁদপুর। এখানেও বর্ধিষ্ণু মানুষের বাস। পারদিয়ার গ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয় আছে। জিতপুর তার শঙ্খ শিল্পের কাজের জন্য বিখ্যাত। একসময় এই শঙ্খ শিল্পের যথেষ্ট কদর ছিল। বর্তমানে শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা আগের মত নয়।

ডোমকলের সঙ্গে এই এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজও উন্নত নয়। ফলে কাজের জন্য ডোমকলে যাতায়াত যথেষ্ট কষ্টকর। স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছর পরও একটি পাকা রাস্তা তৈরি হল না। যাতে ওই এলাকায় মানুষ দ্রুত ডোমকলের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ করতে পারে।

ডোমকলের পূর্বদিকে শিয়ালমারী নদীর পাড় ঘেসে গড়ে ওঠা গ্রাম নওদাপাড়া, ডুমুরতলা। বিলাসপুর, আলীনগর, রাইপুর, কুপিলা শীতলনগর, বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল গ্রাম। গ্রামে বেসিক প্রাথমিক স্কুল আছে। একটি গ্রন্থাগার আছে, বর্তমান রাজ্য সরকার এর আমলে এর প্রতিষ্ঠা। খেলাধূলায় এ গ্রামে যথেষ্ট খ্যাতি আছে, বিশেষত ভলিবলে।

আলীনগর বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। রাইপুর, বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করলেও মূলত হিন্দু মাহিষ্য সম্প্রদায়ের আধিক্য বেশি। এখানে মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসও যথেষ্ট। এলাকায় মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে একটি উচ্চবিদ্যালয় আছে। একসময় এখানে ফুটবল খেলায় যথেষ্ট সুনাম ছিল। বর্তমানে ভলিবল খেলার প্রচলন আছে। কৃষি ও ব্যবসা এখানের মানুষের উপজীবিকা। কুপিলা গ্রামে একটি সিনিয়র মাদ্রাসা আছে।

ডোমকল থেকে বক্সীপুর ঘাট যাবার পাকা রাস্তা ধরে অবস্থিত কাটাকোপড়া। বর্তমানে এটি ছোট গঞ্জ। এখানে হাট ও বাজার আছে। আছে প্রাথমিক স্কুল। কাটা কোপড়ায় একসময় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির কুঠি ছিল। মূলত এখান থেকে খাজনা আদায় ও অন্যান্য কাজ চলতো। চৈত্রমাসের চড়ক পুজোর সময় এখানে মেলা বসতো। যথেষ্ট ধুম ধাম হতো। কাটাকোপড়া থেকে পশ্চিমদিকে শ্রীকৃষ্ণপুর যাবার রাস্তার পাশে বর্ধিষ্ণু মানুষের বিরাট বসতি ছিল। ব্রহ্মচারিরা তার অন্যতম। এখানের পুরাতন বাসিন্দারা অন্যত্র চলে যাওয়ায় পূর্বের অবস্থা আর নেই। কিন্তু চাষ করতে গিয়ে অনেকে প্রচুর প্রাচীন মুদ্রা পেয়েছেন। এখানেই বিগত শতাব্দীর পাঁচ-এর দশকে পেট্রোল পাওয়ার জন্য স্ট্যানডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোং খনন কার্য্য চালান। তেল পাওয়া যায় কিন্তু অর্থকরী হবে না বলে খননকার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শ্রীকৃষ্ণপুর অত্যন্ত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এক সময়ে হিন্দু প্রধান গ্রাম ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। এখানে ১৯১৪ সালেও প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বলে জানা যায়। যাতায়াত, শিক্ষা, পেশাগত কারণে এই বর্ধিষ্ণু জনপদ এখন শ্রীহীন।

হরিশংকরপুরে ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষই আদি বাসিন্দা। পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের পর অনেকে এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে একটি হাইস্কুল (দ্বাদশ শ্রেণী) আছে। বিগত শতাব্দীর ছয় দশকে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ডা. বিষ্ণুপদ দাস, গোলাম গাউস, কালীপদ মল্লিক ও লোহারাম ঘোষ প্রমুখ।

গড়াইমারি জলঙ্গি নদীর ধারে অবস্থিত গঞ্জ। এখানে বাজার আছে হাটও বসে। বর্তমানে ব্যবসাকেন্দ্র। পাশের গ্রাম হারুরপাড়া প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের গ্রাম। এখানে মজুমদারগণ অত্যন্ত ধনশালী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। এদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শেলী মজুমদার, মাদার মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। এলাকার মানুষ ও এদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'যাদবকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়' নামে বিদ্যালয়টি। পাশে অবস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সিংপাড়ার ভগবতী সিংহ প্রতিষ্ঠিত জন। সম্ভবত এঁদের পূর্বপুরুষ মোগলবাহিনীর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। হারুপাড়া বাসিন্দা ভবশংকর রায় ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। এরপর আরও কিছুদূরে অবস্থিত বৈষ্ণবপাড়া গ্রাম। শোনা যায় এই গ্রাম একসময়ে বৈষ্ণব প্রধান ছিল। পাশে জলঙ্গি নদী। ওপারে সমৃদ্ধশালী, শিক্ষিত, স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের গ্রাম 'ধোড়াদহ'।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম সারাংপুর। নামটা অদ্ভুত। নামকরণ ব্যক্তির নামে নয়। আমার মনে হয় সারাংপুরের পাশে অবস্থিত ভৈরব নদী। পদ্মা নদীই এর উৎস। এক সময়ের বেগবান ও ভৈরবরূপী ভৈরব নদী। এই নদীর ধারের গ্রামে হয়তো বাস করতো নৌকা ও বড় বড় বজরা চালনার দক্ষ মাঝি বা সারেং। হয়তো তাদের থেকেই সারেংপুর বা সারাংপুর নামের উৎপত্তি। গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার গ্রামের নামগুলিও অদ্ভুত মাদারপুর, শ্রীপতিপুর, শ্যামপুর, মোহনেরপাড়া।, কলাবাড়িয়া, বেনেখালী, পঞ্চাননপুর, জোড়গাছা, মালতীপুর, বাটিকামারী। পোস্ট অফিসের নাম গোকুলপুর

গোবিন্দপুর। যার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। একটি বিচ্ছিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। অনেক ক্ষেত্রে দুর্গমও। বাটিকামারী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গ্রাম। এখানেই ভাগীরথপুর ডোমকল পাকা রাস্তার পাশে ছাগলখালি বিলের ধারে 'অচিনগাছ'। গাছটি বট প্রজাতির, ফলও বটের মতো। ঝুরি নামে। কিন্তু এর চারা হয়না। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এসেছেন এবং দেখেছেন। বেনেখালি অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলা। বর্গীদের আক্রমণের ভয়ে গ্রামের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা গড় নির্মাণ করে আত্মগোপন করেন। পরে তারা ধরা পড়েন। অনেকে পালিয়ে খাগড়ায় আশ্রয় নেন। তাদের বংশধররা আজও অনেকে এই ব্যবসায় যুক্ত ও খাগড়াবাসী। বেনে সম্প্রদায়ের মানুষরা খালি হওয়ায় গ্রামের নাম বেনেখালি নামে পরিচিত হয় বলে জনশ্রুতি।

'জনমত' পত্রিকার সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্ত, ডোমকল বিটি হাইস্কুলে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শৈলধর গুপ্ত, সাদিখাঁড়দিয়াড় বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সকর্ষণ গুপ্ত, অধ্যাপক দিব্যেন্দু শেখর সেন প্রমুখ এখানকার মানুষ।

ভগীরথপুর জমিদারদের গ্রাম। ভারত সম্রাট আকবর সুবে বাংলা ও বিহারের মোগল শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠান। মানসিংহ রাজমহলে বাংলার রাজধানীকে স্থানান্তরিত করেন এবং তার নাম দেন 'আকবরনগর'। মানসিংহ বাংলার সুবেদারী গ্রহণের পর বাংলার বারো ভুঁইয়াদের এবং বিহারের পাঠান শাসন কর্তাদের দমনে উদ্যোগী হন। তার কার্যসমাধা করার পূর্বেই ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যু হলে তার পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তারপর কিছুদিন পর ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খাঁনকে সুবেদার করে পাঠান মানসিংহের আরদ্ধকাজ সমাপ্ত করে মুঘল শাসনকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মুঘলদের সৈন্যঘাঁটি সন্নিহিত এলাকা ছাড়া অন্যত্র বাংলার অসংখ্য ছোট বড় রাজা বা জমিদাররা ও পাঠান শাসকরা প্রায় স্বাধীনভাবেই তাদের শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। এই সময় বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রতাপাদিত্য। যমুনাও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গমস্থল 'ধূমঘাট' ছিল তার রাজধানী। প্রতাপাদিত্য শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা রাজা ছিলেন। ইসলাম খান তার বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যদল পাঠান সেই সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও সৈন্যদল পাঠান। সেই সময় বড় বড় অভিযানের সময় (স্থল অথবা নৌ) সৈন্যদের রসদ অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং জীবনধারণের উপযোগী অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করার জন্য পৃথকভাবে এক সরবরাহকারী দল থাকতো। এটাই ছিল যুদ্ধাভিযানের নিয়ম।

সুবেদার ইসলাম খাঁন যখন প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সেনাপতি মির্জানাথনের বাহিনীকে স্থল ও জলপথে প্রেরণ করেন তখন সঙ্গে পাটনাস্থিত শাহু ব্যবসায়ীদের একটি দল প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং যুদ্ধের উপযোগী অন্যান্য সরঞ্জাম সহ পৃথকভাবে কয়েকটি বজরাযোগে এই বাহিনীর অনুসারী হয়। এই দলের নেতা ছিলেন ভগীরথ শাহু। মোগল বাহিনী পদ্মা ও জলঙ্গি ইছামতি নদীতে প্রবেশ করে। এই জলপথেই ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে পৌঁছাবার সহজতম জলপথ। ঐতিহাসিকদের মতে ওই নৌবাহিনী পদ্মা দিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় সময়ে বর্তমানে ভগবানগোলার নিম্নাংশে দক্ষিণপূর্ব যে বিস্তৃত ও স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহিত ছিল সেই পথে নৌবাহিনীকে চালিত করেন। তৎকালীন ওই নদীটিই 'ভৈরব'। ওই সময় নদীটি দিয়ে হিমালয়ের বরফ গলা জল বিপুলভাবে বয়ে যেত।

মোগল সেনাপতি মির্জানাথনের নৌবাহিনী যথাসময়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় দু'একদিন পরেই ভগীরথ শাহুর নেতৃত্বে সরবরাহকারীর দল সুবেদারের বাহিনীর অনুসরণ করে এগোতে থাকেন। এই সরবরাহকারী বজরার দল ভাটির দিকে ভৈরব নদীর কয়েকটি বাঁক অতিক্রম করার পরেই শস্য শ্যামলা অতিমনোরম একটি জনপদে পৌঁছায়। ভগীরথ শাহুর এই সরবরাহকারী দল

শস্য শ্যামলা জনপদটি দেখে এতই মুগ্ধ হন যে কিছু সংখ্যক মানুষ বজরা নিয়ে কয়েকদিনের জন্য সব কিছু ভুলে ওই গ্রামে অবস্থান করে যান। এই গ্রামটিই বর্তমানের 'ভগীরথপুর'।

এরপর ভগীরথ শাহুর দলের কিছু অংশ এই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায় এবং ভগীরথপুর গ্রাম থেকেই নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য করে সমৃদ্ধ হন। সমৃদ্ধশালী যে পরিবারটি ভগীরথপুরে জমিদারীর পত্তন করেন, কি না ঠিক জানা যায় না, তবে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুর্শিদাবাদ কথা থেকে জানা যায়, একচেটিয়া লবণের কারবার করেই তারা বিপুল অর্থের অধীশ্বর হন। নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়ে তারা চন্দননগরের নিকটবর্তী 'নদমঙ্গা' নামক স্থানে নবণক্রয় করবার সনদ প্রাপ্ত হয়। মুর্শিদাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠা হবার পর নিজামতে তাঁদের প্রতিপত্তি বাড়ে। এবং লবণ ব্যবসায়ী বলদেব চৌধুরীর সময় থেকেই এরা ক্রমশ আর্থিক সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছায়। সেই অর্থ দিয়ে তারা জমিদারী ক্রয় করেন। ১১৬৮ বঙ্গাব্দের ১৭ ফাল্গুন বাড়ি নির্মাণ শেষ হয়। জমিদারী ছিল খাগজানা, কুমিরদহ, লালবাগ বর্ডার, গৌরিপুর, শিবনগর, জমিদার বংশের প্রখ্যাত জমিদারগণ নীলকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, চারুকৃষ্ণ চৌধুরী, সুব্রহ্মণ্যকৃষ্ণ চৌধুরী (বঙ্কুবাবু), শ্যামলাল চৌধুরী ও গায়ত্রী চৌধুরী। এরা বৈশ্য সাহা সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এই জমিদার বাড়িতে সংস্কৃতি চর্চাও ছিল। পরে কাচারি বাড়ি নাট মন্দির হিসাবে ব্যবহার করা হতো। 'বীণাপানি নাট্য সমাজ' নামে একটি নাট্যদল ছিল। অভিনেতা হিসাবে সরোজকুমার, কুলেন্দ্রচন্দ্র রায়, শশাঙ্কশেখর চৌধুরী (নীলুবাবু) এদের অভিনীত বিখ্যাত নাটক 'রণজিৎ সিংহ'।

'পুটিয়া ও ধুবল হাটীর' (বর্তমানে বাংলাদেশ) রাজবাড়ির সঙ্গে এদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। জমিদারগণ তাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনে ৩৬ বর্ণের লোকের বসতি স্থাপন করেন। জমিদারগণের গুরুদেবকুল করিমপুরের কাছে হরিপুরের কৃষ্ণরায়জীর সেবাইত গোস্বামীগণ। ভগীরথপুরের ঘোষ সম্প্রদায়গণও গোস্বামীদের শিষ্য। তাদের উপাধি অধিকারী। প্রাচীন নিদর্শন কালিমন্দির ও শিব মন্দির। মোল্লাদহ থেকে পাওয়া কানকাটা শিব পুটিয়ার রাজপরিবার দ্বারা প্রাপ্ত এবং লাল গ্রানাইট পাথরে তৈরি মূর্তি এখানে আছে। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া পশুপতি মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

এখানে দোল উৎসব পঞ্চম দোল নামে খ্যাত। বিগ্রহ মুরলীধর। দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর দিন মূর্তি সহ ভৈরবের বাইচ উৎসব যথেষ্ট আকর্ষণীয়। জমিদারগণ জলপথে বজরা ও স্থলপথে পালকি ব্যবহার করতেন, হাতিও ছিল।

বর্তমানে জীবন্ত মানুষের 'ঝুলন' উৎসব যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ১৮৯৬ সালে ভগীরথপুরে একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কুমার কৃষ্ণ চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের প্রথম স্থপতি। ইনি সৎ, বিদ্যানুরাগী হৃদয়বান ছিলেন। পরবর্তীতে কুমার কৃষ্ণের ভাই চারুকৃষ্ণের পুত্র অপূর্বকৃষ্ণ ও অপর ভাই কালীকৃষ্ণ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এই বংশের কালিপদ চৌধুরী ছিলেন ইসলামপুরের রেশন বস্ত্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ী চন্দ্রকান্ত ও ললিতমোহনের জামাই। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র নন্দকুমার চৌধুরী খাদি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে 'চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম ও খাদি সমিতি'। গ্রামীণ শিল্প উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

জমিদারদের পূর্বেও এখানেও একটি বংশ বাস করতো। প্রায় ১০ বিঘা জমির উপর ইন্দো মুসলিম সংস্কৃতি চিহ্ন বিশিষ্ট বাড়ি ছিল। এদের আগমনের বিষয়ে জানা যায় না। এই বংশের মোক্ষপদ সাহা ও দ্বিজপদ সাহা ধনাঢ্য লোক ছিলেন। ভগীরথপুরের কাছে গোপীনাথপুরে ভুঁইমালী সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা প্রায় ৩০০ বছরের। বর্তমানে তা বারোয়ারী। বর্তমানে ভগীরথপুর ডোমকলের সঙ্গে পাকা রাস্তা যুক্ত এবং এখানে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। এই দুই কাজের পিছনে ধরিত্রী

চৌধুরীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল।

মুর্শিদাবাদ বাস ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাত গায়ত্রী চৌধুরী। তাদের কোম্পানির নাম ছিল 'বিনাপানি বাস কোং'। ফতেপুর মূলত মুসলমান তাঁতিদের গ্রাম। শিবনগর নাম শুনলে মনে হয় একসময় হয়তো হিন্দুদের বাস ছিল। এখানে বর্ধিষ্ণু মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস। এখানে একটি হাইস্কুল ও সরকারি গ্রন্থাগার আছে। খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষত ফুটবল ও ভলিবল খেলার প্রচলন আছে। ভৈরবের তীরে অবস্থিত এই গ্রাম শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত।

কুমারপুরে সব সম্প্রদায়ের মানুষের বাস থাকলেও মূলত ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য বেশি। পাশেই অবস্থিত কুমারপুর 'দহ'। ভৈরবের জল ছাগলখালি বিল প্রবেশের মাধ্যমেই ওই দহ সৃষ্ট বলে মনে হয়। শ্রীরামপুর গ্রাম অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদ্য সম্প্রদায়ের মানুষের বাস যদিও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও বাস করেন। প্রখ্যাত অন্নদা কবিরাজের আদিবাড়ি ছিল এখানে, পরে ইনি বহরমপুর নিবাসী হন।

ডোমকল সদর যা একসময় আজিমগঞ্জ নামে পরিচিত। এখানে থানা বীজখামারের উপর গড়ে উঠেছে ডোমকল মহকুমার প্রশাসনিক ভবন। পাশে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের ট্রেনিং সেণ্টার। সরকারি অতিথি শালা। ডোমকল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রমনাবসন্তপুরে গড়ে উঠেছে উচ্চশিক্ষার এক বিরাট কেন্দ্র। প্রধান উদ্যোক্তা ওই গ্রামের ছেলে এবং আই পি এস অফিসার ড. নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলামের উদ্যোগে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় বসন্তপুর কলেজ ৭টি বিষয়ে অনার্স সহ, তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র, মডেল স্কুল, মডেল নার্সারী, পলিটেকনিক গড়ে উঠেছে। মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রচেষ্টাও চলছে। মানিকনগর গ্রামে হোমিওপ্যাথি কলেজ তৈরির কাজ চলছে। ডোমকল ভবতারণ হাইস্কুল প্রাচীন স্কুল। যদিও প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০০ সাল লেখা হয়। কিন্তু ১৮৮০ সালের আগেই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এম ই স্কুল হিসাবে। ১৮৮০ সালের এম ই স্কলারসিপ মনিলাল মুখার্জী ওই স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে পাস করেন (The Calcutta Gazette 5 January-1881)। ফরিদপুর (বাংলাদেশ) জেলার এক পল্লীগ্রাম থেকে আগত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডোমকল-আজিমগঞ্জ এর মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাইনর পরীক্ষা দেন এবং কলকাতার বাইরে প্রেসিডেন্সি জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে মাসিক ৫টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন ('রামধনু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সুসাহিত্যিক)। এই এম ই স্কুল ১৯০০ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয়।

ডোমকলে একটি মুন্সেফ কোর্ট ছিল। এইসব প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের পক্ষে জেলাসদরে যাতায়াত অসম্ভব থাকায় প্রয়োজনে আদালতে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব ছিল না। সেই জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার প্রত্যন্ত বর্ধিষ্ণু এলাকার গুরুত্ব বিবেচনা করে মুন্সেফ কোর্ট খোলেন। ফলে এলাকার কয়েকজন উকিল ছিলেন। ডোমকল থানার অদূরে মুসলমান তাঁতিদের বাস ছিল আজও আছে। জনৈক তাঁতির কুঠি থেকে ন্যায্যভাবে বন্দোবস্ত নেওয়া জমি পুনরায় দখল নিতে চেষ্টা করে কুঠির নির্দেশে অন্যজন। কুঠিতে বিচার চেয়ে ব্যর্থ হয়ে কোর্টের আশ্রয় নেন। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেন ভবতোষ বাবু(?) নামে অকুতভয় এক উকিলবাবু। যথারীতি নির্ধারিত সময়ে মামলা ওঠে এবং দেশীয় বিচারপতি কুঠির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রায় দেন। এতে কুঠির ম্যানেজার অপমান বোধ করেন এবং প্রজারা এতে উৎসাহিত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার আশংকায় কোর্ট সহ উকিলবাবুর বাড়ি পুড়িয়ে দেন। ফলে সমস্ত কাগজপত্র ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই বিষয়টি নিয়ে জেলা জজ তদন্তে আসেন এবং তাকে থানা সংলগ্ন ডাক বাংলোতে সাপ আছে এই অজুহাতে থাকতে না দেওয়ায় তিনি সব বুঝলেন। মুসেনফের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন তিনি জেলা সদরে ফিরে সরকারকে রিপোর্ট

দেন 'ঘটনাস্থলে স্থানীয় জমিদার সম্প্রদায়ের শাসন প্রণালী এরূপ কঠোর ও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এরূপ অধিক যে রাজ্যশাসন শৃঙ্খলা সেখানে অক্ষুণ্ণ রাখবার সম্ভাবনা নাই। এরূপস্থলে মুন্সেফী আদালত রাখলে আদালত স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সুতরাং পুনর্বার সেখানে নূতন করে আদালত-গৃহ নির্মাণ চৌকি রাখার কোনও আবশ্যকতা দেখা যায় না।''

এই রিপোর্টে কোর্ট উঠে গেল। নতুন পাকা বাড়ি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কোর্ট চালু করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির প্রভূত দুর্নাম হয়। এর থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট চেষ্টার ফলে স্থাপন হয় সাবরেজেস্টারি অফিস। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির কুঠির তদানীন্তন ম্যানেজার ডব্লু স্টেনহৌশ এবং নায়েব বৈদ্যনাথ সান্যালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পূর্বোক্ত এম ই স্কুল উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় ১৯০০ সালে।

স্বাধীনতা পূর্ব যুগের প্রায় সমস্ত স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহারাজা বা জমিদারদের নাম। সেদিক থেকে ব্যতিক্রম মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিকারপুর বা ডোমকল স্কুলের সঙ্গে কোম্পানির নাম যুক্ত ছিলনা। ডোমকল হাইস্কুলে ৫-এর দশকেও অনেক মেয়ে সাইকেলে চেপে বিদ্যালয়ে আসতো এবং বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে নাটক করতো যা মনে হয় জেলার একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ডোমকলে আছে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৬৫ সালে জুনিয়র হাইস্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং পরে উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়।

খেলাধূলা ঃ ডোমকল ফুটবল মাঠ তৈরি রজনীকান্ত চৌধুরী ও তৎসমকালীন ফুটবল প্রেমীদের উদ্যোগে। ১৯৪০-৪২ সাল নাগাদ তৈরি এই মাঠ ঐতিহাসিক। ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ছাড়া রাজনৈতিক নেতা সঙ্গীতশিল্পী ও নাট্যশিল্পীদের পদধূলিতে ধন্য। এই মাঠে সভা করেছেন সোরাবর্দি, ফজলুল হক, গান গেয়েছেন আব্বাস উদ্দিন, দেশবিভাগের পর জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জী, অজয় মুখার্জী, সিদ্ধার্থশংকর রায়, হরেকৃষ্ণ কোঙার, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সুবোধ ব্যানার্জী, বিনয় চৌধুরী সহ অসংখ্য নেতা। গান গেয়েছেন মোঃ আজিজ, উদিতনারায়ণ সহ অনেক শিল্পী, মোহন চ্যাটার্জী, শান্তিগোপাল, স্বপনকুমার, শেখর গাঙ্গুলী সহ অসংখ্য নাট্য ব্যক্তিত্ব অভিনয় করেছেন।

ফুটবল খেলেছেন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় অলিম্পিয়ান আমেদ হোসেন। ১৯৫৭ সালে জনকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই মাঠ জনকল্যাণ মাঠ নামে পরিচিত। ডোমকল দীর্ঘকাল যাবৎ ফুটবল খেলার ঐতিহ্যে ঐতিহ্যময়। প্রতিবছর এখানে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ফুটবল শীল্ড প্রতিযোগিতা হয়। যেখানে নদীয়া সহ কোলকাতার আশেপাশের দল অংশগ্রহণ করে।

গ্রন্থাগার ঃ ডোমকল ব্লকে ৫টি গ্রন্থাগার আছে। তার মধ্যে পুরাতন ডোমকল জনকল্যাণ সমিতি গ্রন্থাগার ও জিতপুর পাবলিক লাইব্রেরি। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণ সমিতি গ্রন্থাগারে প্রায় ৭ হাজার পুস্তক আছে। বাংলা ও ইতিহাসে অনার্স এম এ ও গবেষক ছাত্রদের তথ্য সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই এখানে আছে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক চাপ আছে কিন্তু কর্মী অভাবে পূর্ণ সেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগারটি মহকুমা গ্রন্থাগারে উন্নীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন কারণ এখানে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

সংস্কৃতি ঃ ডোমকলে দীর্ঘকাল থেকেই নাট্যচর্চা আছে। এখানে যেহেতু সরকারি কর্মচারিরা সপরিবারে এখানে থাকতেন ফলে এলাকার মানুষের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন উৎসবে বিশেযত রবীন্দ্রজয়ন্তী কালীপূজা, দুর্গাপুজোর সময় নাটকের রেওয়াজ ছিল। ৫এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে উঠেছিল 'জয় মা কালী অপেরা'। তাদের অভিনীত 'শিবাজী বাঙালি রামপ্রসাদ'

সহ বিভিন্ন যাত্রাপালা অসাধারণ সাফল্য পেয়েছিল। অভিনেতা হিসাবে হারাণ পাল, বিনয়কৃষ্ণ সাহা, হারাধন মণ্ডল, হারুণ আর রসিদ, বঙ্কিম দাস, রণজিৎ ঘোষ, তপন অধিকারী, নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৫ সালের পর বহরমপুর নিবাসী কালীদাস সমাজদার, পুষ্পেন রায় ডোমকল বিটি হাইস্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ফলে ডোমকলে নাট্যচর্চার দিগন্ত খুলে যায়। পুষ্পেন রায়ের রচনা ও নাট্যরূপ কালীবাবুর পরিচালনা ও অভিনয় নাট্যভাবনার আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। পুষ্পেন রায় কবিও ছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'অন্যগাঙ' পত্রিকা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল রাজ্যের সাহিত্য রসিকদের কাছে। তাঁর অকাল প্রয়াণ আমাদের বিরাট ক্ষতি করেছে। ডোমকল থেকে চাতক, সেবা ইত্যাদি নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তবে অনিয়মিত।

ফরেস্ট ঃ প্রায় ১১০০ বিঘার বেশি ফরেস্ট আছে মোল্লাপাড়া জিতপুরে, মুর্শিদাবাদ জেলায় এতবড় ফরেস্ট বন বিভাগের নেই। কিন্তু সেখানে 'পিকনিক স্পট' বা মানুষের আকর্ষণকারী কোনও কিছু করা হয়নি। গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যও সন্তোষজনক নয়।

বিল ঃ পাইকমারী, পেচেরপাড়া, বড়বিল, ছাগলখালি বিল, দুধসর বিল, শবদলপুর বিল, খেলাকোবরা বিল ডোমকল বালিকা বিদ্যাপীঠের পাশ দিয়ে বয়ে শিয়ালমারীর নদীতে পড়েছে। পাশে নতুনপাড়ায় পুকুর কাটতে গিয়ে নৌকা পাওয়া যায়।

মেলা ঃ

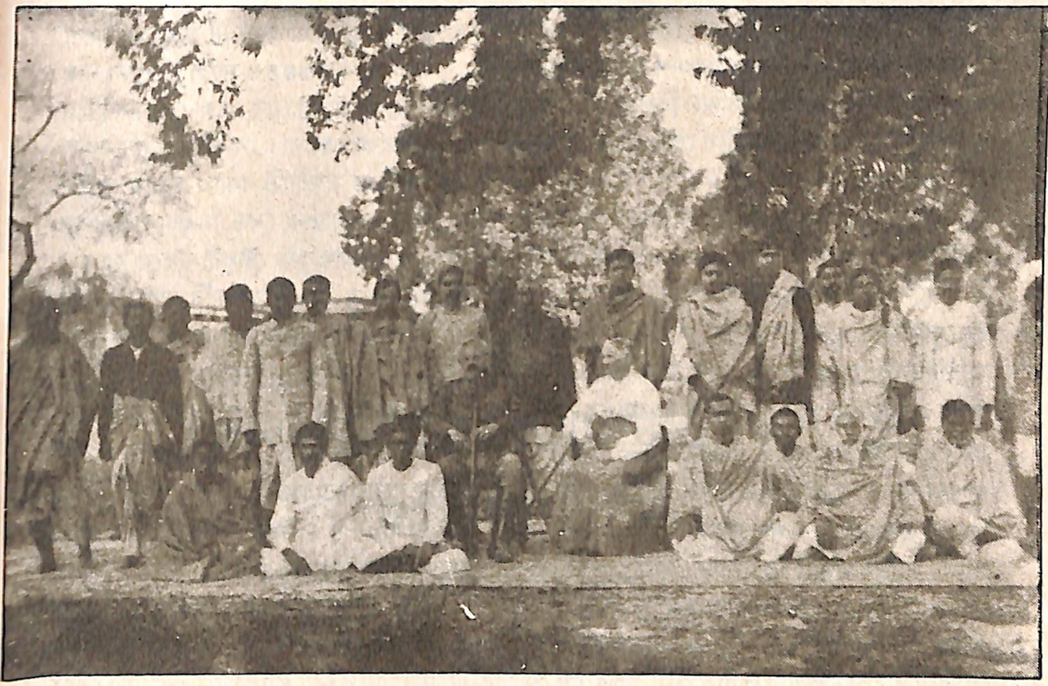
মস্তরাম ঃ বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এই মেলা হয়। মেলার স্থান ধূলাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ভাগীরথীর পূর্বতীরে সাধকবাগে মহন্ত মস্তরামের আখড়া ছিল। মোগল সম্রাট মস্তরামকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। নবাব ও অনেক ভূ-সম্পত্তি দেন। মহান্ত মস্তরামকে মুর্শিদকুলি খাঁ আউলিয়া সিদ্ধ পুরুষ উপাধি দেন। জেলার একমাত্র সাধকবাগেই সন্ন্যাসীদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো। ৫ শত সশস্ত্র বলবান সন্ন্যাসী থাকতেন। মস্তরামের শিষ্য সন্ন্যাসীরা রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন এবং প্রয়োজনে আত্মগোপনের জন্য পদ্মাপাড়ের ধূলাউড়ির বিলের নিকট আশ্রয় নিতেন। তখন বিলের সঙ্গে পদ্মার যোগাযোগ সহজ ছিল।

কুলতলা ঃ ডোমকল বাজারের ১ কিমি দূরে অবস্থিত রাস্তার ধারে কালীবাড়ি। নাটোরের রানী ভবানী প্রতিষ্ঠিত এই কালীপুজো। পুজোর জন্য জমিদান করা আছে। তার থেকে খরচ চলে। সেবাইত সুবল চন্দ্র পাল (বাজিতপুর নিবাসী)। মন্দিরের পাশ দিয়ে এক সময় ছোট নদী ছিল যা শিয়ালমারীতে সংযুক্ত ছিল। পুজোর ঘট ভরার জল ওই নীচু জায়গা খনন করে নেওয়া হয়। এখানে মেলা বসে পুজোর পরদিন দুপুর পর্যন্ত চলে।

মহরমের মেলা ঃ ডোমকল বাজার থেকে ৫০০ মিটার দূরে ডোমকল গোধনপাড়া রাস্তার পাশে মহরমের দিন মেলা বসে। এখানে একটি কোনও সময়ে তৈরি মসজিদ ছিল। আমরা সেটা ভাঙা অবস্থিত দেখেছি। ছোট বাংলা ইটের তৈরি মসজিদ। মসজিদ এর প্রবেশ দ্বার ছিল কারুকার্যময়। এই মসজিদ কতদিন আগে তৈরি বা কারা তৈরি করেছেন তাও অজানা।

হাসপাতাল ঃ ডোমকল মহকুমা স্তরে উন্নীত হওয়ায় রসুলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ঘরবাড়ি হয়েছে অনেক কিন্তু পরিকাঠামোর বড়ই অভাব।

কৃষি ঃ এলাকা সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর। অর্থকারী ফসল পাট। সবুজ বিপ্লবের স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার চাষিরা নতুন পদ্ধতিতে চাষ শুরু করে। সেচ ব্যবস্থার উন্নত হয় গভীর নলকূপ ও নদীজল সেচের মাধ্যমে। প্রথম প্রথম উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও বর্তমানে আর ভাল উৎপাদন হচ্ছে না। তাছাড়া উৎপাদিত ফসলের দামও পাচ্ছে না। অবৈজ্ঞানিকভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারও চাষের ক্ষতি



ডোমকল কুঠীর কুখ্যাত ম্যানেজার ডব্লিউ স্টেইন হাউস ও তার স্ত্রী (মাঝে), সঙ্গে উপস্থিত গ্রামবাসী। বসে বাম দিক থেকে ঃ জ্যোতিষ চন্দ্র সান্যাল, নলিনী ব্রহ্মচারী, গুরুদাস বিশ্বাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, যতীন বিশ্বাস, কাবাতুল্লা, ষষ্টিচরণ সেন। দাঁড়িয়ে বাম থেকে ঃ ষষ্টি চরণ মণ্ডল, হারাধন পাল, সত্যচরণ সেন, অজানা, অজানা, অজানা, অজানা, অজানা, জানকী চৌবে, সুরেন ঘোষ, ভবতরণ বিশ্বাস, অমিয় ব্রহ্মচারী, সুরেন পাল, ভূজঙ্গ পাল, অজানা, বৈজুনাথ চৌবে। ছবির পরিচয়দাতা বনমালী সরকার (৭৯)।

করছে। পাট বিক্রির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় এলাকায় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সংকটের সম্মুখীন। বিকল্প চাষ এখানে সেভাবে চালু হয়নি। গতানুগতিক চাষই চলছে।

রাস্তা ঃ ডোমকল থেকে ভগীরথপুর, কুশাবেড়িয়া, বক্সীপুর ও গোধনপাড়া যাওয়ার পাকা রাস্তা থাকলেও ডোমকল থেকে ধূলাউড়ি বা কাশীপুর যাবার কোনও পাকা রাস্তা না থাকায় মানুষের যাতায়াত চরম সংকটময়। বিশেষত বর্ষাকালে সংকট চরম আকার নেয়। ডোমকল থেকে জিতপুর বা পারদিয়াড় যাবার সরাসরি পাকা রাস্তা না থাকায় যোগাযোগ কষ্টকর।

দেশ বিভাগের আগে ও পরে ঃ ডোমকল ছিল মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানি শাসিত এলাকা। গ্রামগুলি ছিল জোতদার বা কুঠির সাহেবদের অনুগত লোকদের শাসিত। এখানে মানুষ জানতো না স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। নায়েব গোমস্তা ও বশংবদদের শাসন ও শোষণই ছিল শেষ কথা, মানুষের ছিলনা কোনও রাজনৈতিক চেতনা। সামন্ততান্ত্রিক শাসনই ছিল এখানকার ভিত্তিভূমি। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এলাকায় 'ডেটেনিট'দের রাখা হতো। কিছু মানুষ যারা রাজশাহী বা বহরমপুরে যাতায়াত করতেন একমাত্র তারা ছাড়া আমজনতা দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। মুসলিম

লীগের পাকিস্তানের দাবি এবং দেশ বিভাগের দাবি এলাকার কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিল। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দেশ বিভাগের পূর্বাহ্নে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে। শোনা যায় এর নেতৃত্বে ছিলেন আলাউদ্দিন বিশ্বাস। তিনি তার দলবল নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে শ্লোগান দিয়ে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেন কিন্তু এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়না। কেবলমাত্র ডোমকল বাজার সংলগ্ন কিছু মানুষ একাজে সামিল হন। এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করেন শান্তিনারায়ণ অধিকারী, গোলাম পাঞ্জাতন, (বড় মিঞা, ফরিদপুর নিবাসী), মফেজ বিশ্বাস, রমনাবসন্তপুর, ভগীরথপুরের জমিদার সুব্রহ্মণ্যকৃষ্ণ চৌধুরী ওরফে বঙ্কুবাবু ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষের মানুষ। আলাউদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কেরোসিন ও সুতোর ডিলার। সাধারণ মানুষ কন্ট্রোলের জিনিস প্রায় পেত না। বিশেষত কারিকর সম্প্রদায়ের লোক সুতো থেকে ছিল বঞ্চিত। জনৈক তাঁতি তার কাছে কন্ট্রোলের সুতো আনতে গিয়ে হেনস্থা হন তার পর তিনি বহরমপুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কোর্টের শরণাপন্ন হন। একাজে লাঞ্ছিত তাঁতিকে সাহায্য করেন মফেজুদ্দিন বিশ্বাস পিতা নৈমুদ্দিন বিশ্বাস। কোর্ট লাঞ্ছনা ও তছরূপের বিষয়ে তদন্তের জন্য ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার বড়ুয়া সাহেবকে পাঠান। আলাউদ্দিন সাহেব তার সঙ্গে কোনওরূপ সহযোগিতা করেন না উপরন্ত তাকে ভয় দেখিয়ে তদন্ত ব্যাহত করেন। বড়ুয়া সাহেব যথারীতি বিষয়টি স্থানীয় থানা সহ মহামান্য আদালতকে জানান।

ডোমকল থানার তদানীন্তন দারোগা পুলিন বিহারী গাঙ্গুলী এ বিষয়ে তদন্তে গেলে তাকে বন্দুক দিয়ে ভয় দেখানো হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর দারোগা পুলিনবাবু রাত্রে বাড়ি ঘেরাও করেন আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করার জন্য, কিন্তু সে গ্রেপ্তার এড়িয়ে সদ্য হওয়া পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তার কিছুদিন পরেই আদালতের নির্দেশে সরকারি সম্পত্তি তছরূপের দায়ে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে জানা যায়। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল ভারত রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হল। কিন্তু আরও তিন দিন ডোমকলে পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন রইল। ১৮ আগস্ট তদানীন্তন সদর মহকুমা শাসকের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে উড্ডীয়মান পাকিস্তানী পতাকা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। উড়তে শুরু করলো ভারতীয় জাতীয় পতাকা।

তথ্যসূত্র ঃ—

১। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার
২। Bengal District Gazetters, Murshidabad– L. S. S. O'Malley
৩। West Bengal Gazetters, Murshidabad– B. K. Bhattacharya
৪। Krishnath College Centenary Volume
৫। মুর্শিদাবাদের কিছু অজানা ইতিহাস— নন্দকুমার চৌধুরী
৬। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার— বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ।
৭। ডোমকল ভবতরণ উচ্চবিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন স্মরনিকা।
৮। পশ্চিমবঙ্গের পুরসম্পদ— বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। কৃষক সভার ইতিহাস— আবদুল্লাহ রসুল
১০। নায়েব মশাই— দীনেন্দ্র কুমার রায়।
১১। তপন কুমার অধিকারী (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ডোমকল জনকল্যান সমিতি গ্রন্থাগার) রইসতুল্লা (দক্ষিন নগর) বনমালী সরকার, বিশ্বনাথ লাহিড়ী, গোপীনাথ ঘোষ (ভগীরথপুর) সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।
১২। মুর্শিদাবাদ চর্চা— প্রতিভারঞ্জন মৈত্র।

মুর্শিদাবাদে উন্নয়ন-প্রশাসন ও পঞ্চায়েতী রাজের দু'দশক

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে উন্নয়নমূলক প্রশাসনের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার গুরুত্ব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মধারার প্রকৃতিরও নানা পরিবর্তনের সাক্ষর জেলা উন্নয়ন প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে।

সাতের দশকেই রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে 'মুর্শিদাবাদে উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহ রূপায়নের জন্য গঠিত হয়েছে পাঁচটি সংস্থা— জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (DRDA), জেলা পরিষদ, খরা প্রবণ এলাকা বিষয়ক সংস্থা (DPAP), জেলা সমন্বয় কমিটি (DCC), জেলা ঋণদানবিষয়ক কমিটি (DCC)। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, রাজ্যের পঞ্চায়েত ও উন্নয়ন দপ্তর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংস্থা জেলাস্তরের সংস্থাগুলির গঠন ও কার্য পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য বহু সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, এর ফলে আসল উদ্দেশ্যপূরণ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে এস আর মহেশ্বরী এবং এ আর দেশাই অভিমত ব্যক্ত করেছেন আটের দশকের প্রথমার্ধে। সংস্থাগুলির বিভিন্নতার প্রয়োজন থাকলেও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন অর্কেস্ট্রার একতানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭৫ সালে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে সমন্বয় স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র চাষী সংস্থা (SFDA) গঠিত হয় এবং ১৯৮১ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহাল ছিল। জেলাশাসকের সভাপতিত্বে জেলাস্তরের আধিকারিকগণ, মহকুমাশাসকগণ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সংস্থা মোট ১৯ টি সাধারণ সভায় বহু উন্নয়নমূলক কাজের আলোচনা ও রূপায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সংস্থার দ্বিতীয় ও নবম সভাতে জেলার ৩০ শতাংশ ক্ষুদ্র চাষী এবং ২৪ শতাংশ প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন খেতমজুরের সনাক্তকরণের বিষয়টি বিবেচিত হয়। এই প্রশ্নে যে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের বা দুর্নীতির আশঙ্কা রয়েছে তাও আলোচিত হয়। দ্বাদশ সভাতে সনাক্তকরণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত হলেও পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ সভায় স্থির হল 'যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়মিত সভায় এই কাজ

সম্পাদন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্র ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ প্রকাশ্য গ্রামসভাতে করার উপর জোর দিয়েছিল। সনাক্তকরণ সমস্যাটি সিকিশতাব্দী পরেও প্রাসঙ্গিক। ক্ষুদ্র চাষী সংস্থার মাধ্যমে জেলায় কৃষি যন্ত্রপাতির প্রচলন, গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ স্থাপন, মৎস্যচাষ ও পশুপালন-এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্কের সাহায্যে প্রদান, ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায় স্থাপন, বরোঞায় হিমঘর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কার্য্যাদি সম্পাদিত হয়েছে। এই সংস্থা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, খেতমজুর ও পাট্টাদারদের জীবনযাত্রা উন্নয়নে ব্লক ও জেলাস্তরের আধিকারিকগণ এবং ব্যাঙ্ক সমূহকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণে কিছুটা উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সংস্থায় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল না। সভাধিপতি ষষ্ঠ বিধানসভা নির্বাচন এবং ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মাত্র দুটি সভায় (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ) যোগ দিয়েছেন।

পরিবর্তিত জাতীয় গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন (IRDP), ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন, খরা প্রবণ এলাকা কর্মসূচী, বিশেষ প্রাণী সম্পদ কর্মসূচী এবং ট্রাইসেম প্রভৃতি বিষয়গুলিকে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে (DRDA) একই ছাতার তলায় নিয়ে আসা হল। ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর যাত্রারম্ভ হল মুর্শিদাবাদ সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন সংস্থা এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছে জেলাশাসককে (ডিও নং এম ১১০১২/৩০/৮০, আই আর ডি পি তাং ৪/১০/৮০)। কিন্তু রাজ্য সরকার তাতে রাজী না হয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে সভাপতি এবং জেলাশাসককে সহ সভাপতি পদে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (মেমো ১৭৭২(৩০)১৯ সি ২৭/৪০ তা ৬/৩/৮১)। কেন্দ্র ও রাজ্য এই সংস্থার মাধ্যমে ৫০:৫০ হারে ব্যয় করবে স্থির হল। দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে প্রতি বৎসর ৬০০ পরিবারকে প্রতি ব্লক থেকে তুলে আনার নীতি সম্মুখে রেখে দুঃস্থ পরিবারকে চিহ্নিত করতে কেন্দ্র ব্লক কর্মীদের দায়িত্ব দিতে চাইলেও (কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন সচিবের রাজ্য মুখ্য সচিবের নিকট পত্রে ২৭.২.৮১) এবং প্রয়োজনে সনাক্তকরণ প্রকাশ্য গ্রাম সভায় করার নীতি নির্দেশ দিলেও বাস্তবে বিপরীতভাবে পঞ্চায়েত কর্মকর্তাগণই নিজেদের বিবেচনায় সনাক্তকরণ করেছেন। এ বিষয়ে দলীয় পক্ষপাতিত্ব, স্বজন পোষণের অভিযোগ জেলার সর্বত্র এখনও যথেষ্ট শোনা যাচ্ছে। ১৯৮১-৮২ সালে আই আর ডি পি কর্মসূচীতে ৬৪৬১ টি প্রকল্পের জন্য ২১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ২৫৯১ পরিবারকে যুক্ত করা হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৩৫৬৪০টি প্রকল্পের জন্য ৩ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ২৫৫১৯ টি পরিবারকে দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে পরিকল্পনা কমিশন জেলার ১৫৬০০ পরিবারকে এই প্রকল্পের অধীনে আনার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল। জেলাশাসক প্রদীপ ভট্টাচার্যের উৎসাহে এই সংখ্যা ১৮৫৩৬ পরিবারে পৌঁছেছিল।

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব অনেক সময় উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে জেলার ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিগণ ডি আর ডি এর সভায় জানান যে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যথেষ্ট আবেদনপত্র প্রেরিত হচ্ছে না। এই শ্লথগতির জন্য কি কেবলমাত্র পঞ্চায়েতগুলিই দায়ী? ব্যাঙ্কের অতি সাবধানী দৃষ্টিভঙ্গীও কিছুটা দায়ী। ব্যাঙ্ক অনেক ঋণের আবেদন নামঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত এক দেড় বৎসর পরেও জানিয়েছে এবং নামঞ্জুরের কারণ জানায়নি। ব্যাঙ্ক কর্মীর স্বল্পতা, প্রেরিত প্রস্তাবগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে আপত্তি মঞ্জুরির বিলম্বের অন্যতম কারণ। জেলাশাসক বা অতিরিক্ত জেলা শাসককে একদিকে ব্যাঙ্কগুলিকে দ্রুত মঞ্জুরিতে উৎসাহিত করতে হয় অন্যদিকে পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের (বিডিও) ঋণ পরিশোধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে

হয়।

জেলায় উন্নয়নমূলক কাজে গতি বৃদ্ধিতে জেলাশাসকের নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি, তপশিলী জাতি ও উপজাতি নিগমের প্রবন্ধক, ডি আর ডি এর প্রকল্প আধিকারিক, মহকুমা শাসকদের নিয়ে গঠিত জেলা ঋণ বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৯ থেকে রিজার্ভব্যাঙ্ক জেলার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরিষেবা দানের এলাকা স্থির করায়য় গ্রামীণ সম্পদ ও পরিকাঠামোর ভিত্তিতে বার্ষিক ঋণ পরিকল্পনা Annual Credit Plan গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলায় কতটা ঋণ প্রয়োজন এ বিষয়ে ১৯৭৮-১৯৯০ পর্যন্ত চার বার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান করেছে। অনাদায়ী ঋণ ব্যাঙ্কশাখাগুলির বড় সমস্যা। পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি ব্যাঙ্কের ঋণ বন্টনে যতটা আগ্রহী, আদায় করার অপ্রিয় দায়িত্বপালনে ততটাই উদাসীন। এ জেলায় আদায়ীকৃত ঋণ আই আর ডি পি তে ৩৮ শতাংশ, নেহেরু রোজগার যোজনায় ২২ শতাংশ, মৎস্যজীবীদের এফ এফ ডি তে ২৪ শতাংশ মাত্র। জেলার উন্নয়নে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে জেলার ত্রাণ, কৃষি, পশুপালন এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে খরাত্রাণ কমিটি (Drought Monitoring Committee)। তা ১৯৮৩ সাল থেকে অধিক শস্য উৎপাদন, জলসেচ, গোখাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছে। জেলার মন্ত্রীগণ, সভাধিপতি ও বিভাগীয় সচিবগণ এই কমিটির সভায় যোগদান করেছেন। জেলার জন্য বরাদ্দ অর্থ জলসেচ, পুকুর সংস্কার, মৎস্যচাষ ইত্যাদি খরাত্রাণ ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যাদি পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে নির্বাহের ব্যবস্থা থাকলেও তা দ্রুত রূপায়নে অনেক সময় বিলম্ব ঘটেছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং আর্থিক বরাদ্দ সদ্ব্যবহারের নথি পেশের জন্য সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয় যাতে পরবর্তী বরাদ্দ পাওয়া যায়।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন বিধি অনুযায়ী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে অধিকতর প্রসারিত করে চলার প্রয়াসী। এর ফলশ্রুতিতে পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব ও মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে। ভূমি সংস্কারকে উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ভিত হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলি ও গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ এই কাজকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ১৯৮৭ পর্যন্ত জেলার ৩৫ হাজার একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে তাতে ৯৪৪১৬ জন উপকৃত হয়েছেন, বর্গানথিভুক্ত হয়েছেন ৭৭০৪২ জন, ১৯৮৩ সালে এই সমস্যা ছিল ২৬০২০ জন, ১০ হাজারের বেশি বাস্তুহীন পরিবার ৪ শতক করে বাস্তু জমি পেয়েছেন। গ্রাম সমাজে বঞ্চিত প্রায় দু'লক্ষ পরিবার চাষযোগ্য জমি বা বর্গাচাষের অধিকার বা বাস্তুজমি লাভ করেছেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচের ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রসার ঘটান হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে সেচ সেবিত এলাকা ছিল ৭৪,১৩৫ হেক্টর, ১৯৮৬-৮৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১,৪১,৩০৮ হেক্টরে।

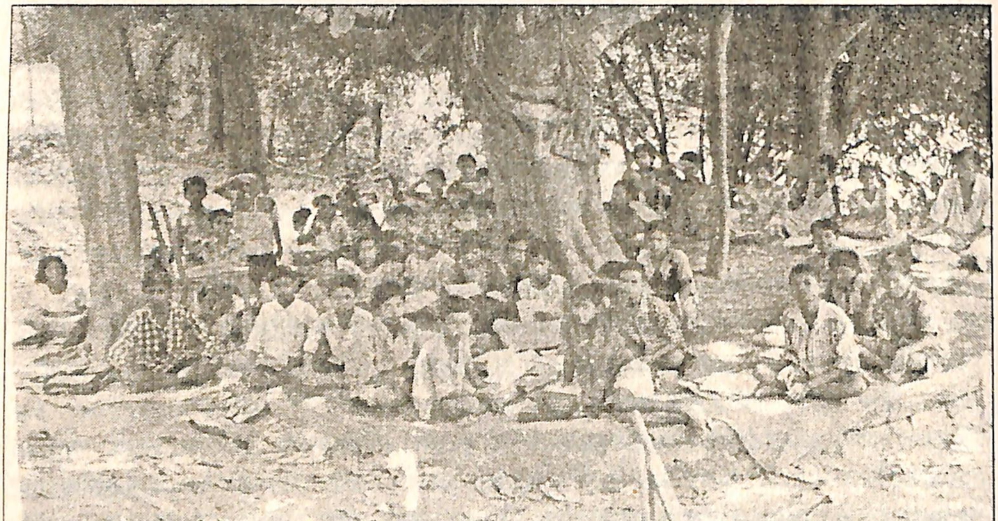
পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীতে (আই আর ডি পি) ১৯৮৫-৮৬ সালে ২৫,৫১৯ টি পরিবারকে স্বনির্ভর করে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে।

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে (এন আর ই পি) বরাদ্দকৃত মোট অর্থ ও খাদ্যের ৮০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা এবং ২০ শতাংশ জেলা পরিষদদ্বারা সরাসরি অথবা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে গিয়েছে মোট ৮১০.১৩ লক্ষ টাকা এবং ৯৬১৫ মে. টন খাদ্য, জেলা পরিষদ পেয়েছে ১০০৭.১৩ লক্ষ টাকা এবং ১১০২২.৫৯৭ মে. টন খাদ্য। প্রায় ১৫০ টি প্রকল্পের রূপায়নে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৯ লক্ষ। গ্রামীণ ভূমিহীন মজুরদের কর্মসংস্থান (আর

এল ই জি পি) প্রকল্পের ১৯৮৭ এর জুন পর্যন্ত জেলা পরিষদ পেয়েছে মোট ৪৩৪.৮৭ লক্ষ টাকা এবং ৬০৪৮.১২ মেঃ টন খাদ্য। এতে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ১০৯০১০২।

এসব প্রকল্প রূপায়নে পুকুর ও সেচের খাল খনন, পরিবহন ও রাস্তা যোগাযোগ, বন্যা নিরোধক বাঁধ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্যানিটারী পায়খানা নির্মাণ ইত্যাদি কার্যকরা সম্ভব হয়েছে। মৎস্য চাষ, পশুপালন, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি নির্মল কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ পর্যন্ত পরিষদের কাজের মূল্যায়ণ করে বলেছেন যে, 'আজ আর খেত মজুরকে আট মাস বেকার থাকতে হয় না, সব মানুষ অন্তত দু'বেলা খেতে পায়।' এরূপ ধারণা আংশিক সত্য হলেও সর্বাংশে মেনে নেওয়া কঠিন। নিদারুণ দারিদ্রে দিনাতিপাত করে এমন মানুষের সংখ্যা আজও কম নয়। সাগরদিঘি ব্লকের হুকারহাট, চোরদিঘি, পাটকেলডাঙ্গার আদিবাসীরা অভাবের জালায় গাছের লতাপাতা সিদ্ধ করে জঠরাগ্নি নিবারণের চেষ্টা করছে এবং তারা রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে ২০০৪ সালেও। এরূপ দুর্দশা জেলার অন্য অনেক আদিবাসী ও দলিত জনবসতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে পশ্চিমবঙ্গে জেলাস্তরে পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসর থেকে জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় কাউন্সিল উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেই সময় কাউন্সিলের সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল বারি মন্তব্য করেছিলেন যে পরিকল্পনা রচনায় ব্লক পরিকল্পনা কমিটিগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না। পরবর্তীকালেও তৃণমূলস্তরে পরিকল্পনা রচনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য সম্পদ সমীক্ষা, কৃষি-স্বাস্থ্য-শিক্ষার অগ্রগতির পথ-মানচিত্র তৈরি ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।



গ্রামে আজও বহু প্রাথমিক স্কুল এমনই গৃহহীন। চিত্রঃ অসীম ভাস্কর

রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মতে "সমীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে— এই রাজ্যে এমন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো নয়। সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে (বলা বাহুল্য অন্যান্য স্তরেও) পরিকল্পনা বলতে যা তৈরি করা হয় তাকে বড় জোর বরাদ্দভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা কিংবা প্রকল্পের তালিকা বলা যেতে পারে। ... এই অবস্থা চলতে থাকলে গ্রামোন্নয়নের মূল লক্ষ্য অপূর্ণই থেকে যাবে।" মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এমন কি জেলা পরিষদেও কাগজে কলমে সমীক্ষা হলেও, যথার্থ সমীক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। দারিদ্র দূরীকরণ, সার্বিক গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতরাজকে অধিকতর শক্তিশালী করার প্রয়াস নয়ের দশকে আরো প্রসারিত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে সংহত করার প্রয়াসও লক্ষণীয়। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান NREP এবং গ্রামীণ কর্মসুনিশ্চিত করণ (RLEGP) প্রকল্প দুটি একত্রিত হয়ে অভিহিত হল জওহর রোজগার যোজনা, পরবর্তীকালে তার নামকরণ হল জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা। ১৯৯৯ এর ১ এপ্রিল থেকে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন (IRDP), ট্রাইসেম, ডোকরা ইত্যাদি কর্মসূচী একত্রিত হল স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায়, যাতে ব্যক্তির পরিবর্তে উপকৃতদের গোষ্ঠিকে (Self help group) সাহায্য দানের ব্যবস্থা হল।

১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বর্ষে সংশোধিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিকল্পনায় ৪৪৬১.৪৮৬ লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে অনুমোদিত হয়েছিল; ১৯৯৯-২০০০ সালে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৩৯০.৫৪ লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নে ৩০.১১ শতাংশ, কৃষি ২৯.৪৫ শতাংশ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ৩.০৪ শতাংশ, সামাজিক পরিষেবা ২১.৪২ শতাংশ, পরিবহন ৪.২১ শতাংশ, শিল্প ৭.২৫ শতাংশ, বিশেষ এলাকা উন্নয়নে ১.৯৮ শতাংশ, বনসৃজন ০.০৪ শতাংশ এবং সাধারণ অর্থনৈতিক পরিষেবায় ২.৫০ শতাংশ।

১৯৭৮ থেকে ২০০৩ পঁচিশ বছর জেলা পরিষদ বামফ্রন্টের বিশেষত সিপিএম পার্টির দখলে ছিল। ২০০৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পালাবদল ঘটায় কংগ্রেস জেলা পরিষদের ৬০ টি আসনের মধ্যে ৩৩ টি দখল করে ক্ষমাতাসীন হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে জেলার উন্নয়নে যে বিনিয়োগ তা রাজ্য বিনিয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম রোজগার যোজনার শানা ১ ও ২ খাতে ২০০৩-০৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রের দেওয়া ৪০২ কোটি ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে অর্ধেক অর্থ ২০৮ কোটি টাকা রাজ্যে ব্যয়িত হয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণে এই প্রকল্পে (শানা-১) এই জেলার অবস্থাটাও হচ্ছে ২০০৩-০৪ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত নিম্নরূপ— বরাদ্দ অর্থ ৯৯৬ লক্ষ টাকার মধ্যে বয় ৪৯৯ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দ খাদ্যশস্য ৩৭০৪ মেট্রিক টনের মধ্যে বিলি হয়েছে ২১০৪ মে. টন। স্যানিটেশন (শৌচালয়) প্রকল্পে কেন্দ্র ৮০ শতাংশ বরাদ্দ অর্থ ২০০৪-এর মার্চের মধ্যে খরচ করার নির্দেশ দিলেও রাজ্য করেছে মাত্র ১৬ শতাংশ। যে জেলাগুলিতে সবচেয়ে কম কাজ হয়েছে মুর্শিদাবাদ তার মধ্যে অন্যতম। শুধু শৌচালয় নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, নগরায়ণ, দারিদ্র সীমার ঊর্ধ্বে মানুষের অনুপাত প্রভৃতি সূচকের নিরিখে রাজ্য সরকারের মানব উন্নয়নের ভিত্তিতে (২০০৪) যে সব জেলা সব সূচকের বিচারেই পিছিয়ে সেগুলি হল বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়া। মুর্শিদাবাদের অবস্থান নিম্নরূপ —

স্বাস্থ্য সূচক ০.৫৭, আয়সূচক ০.২৯, শিক্ষা সূচক ০.৫২, মানব উন্নয়ন সূচক ০.৪৬, উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অবস্থান —১৫। রাজ্যের পশ্চাৎপদ জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম বলে ১৯৯৩-৯৪ সালে মন্তব্য করেছিল মুর্শিদাবাদ District Credit Plan. সেই পরিস্থিতির খুব

একটা পরিবর্তন ঘটেনি।

কংগ্রেস শাসিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি অভিযোগ করেছেন যে গত এক বৎসরে বারবার রাজ্য সরকারের কাছে উন্নয়নের জন্য টাকা চেয়েও পাওয়া যায়নি। প্রকল্প ও পরিকল্পনা থাকলেও টাকা না পেলে কি করে কাজ করা যাবে। পূর্বতন জেলা পরিষদের নিকট ঠিকাদারদের পাওনা টাকা রাজ্য সরকার অবশ্য প্রদান করেছে। কিন্তু উন্নয়নের টাকা প্রদানে সরকারের অনীহার ফলে জেলার পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও অর্থক্লিষ্টতায় গতিহীন হয়ে পড়েছে। সভাধিপতি সিদ্দিকা বেগম অভিযোগ করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে না ডেকেই ২৯ জুন ২০০৪ জেলার ৩৩টি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অথচ সেচ, নদী ভাঙন, স্বাস্থ্য, শিশু শিক্ষার মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রে জেলা কমিটির শীর্ষে রয়েছেন সভাধিপতি। বিরোধীদলের সভাধিপতির প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণেই জেলায় দুই দলের সিপিএম এবং কংগ্রেসের দ্বৈরথ বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ।

রাজনৈতিক দলগুলির এরূপ তীব্র পারস্পরিক বিদ্বেষ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণ, দ্রুত গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণকে বিশেষভাবে ব্যাহত করেছে সন্দেহ নাই। জনগণ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির সততা, আন্তরিকতা এবং কুশলতা বিষয়ে সন্দিহান। পঞ্চায়েত হওয়ার কথা জনগণের। অনেকেরেই অভিযোগ গ্রামগুলির পঞ্চায়েত প্রশাসনে গ্রামীণ স্বার্থরক্ষার চেয়ে দলীয় স্বার্থবিবেচনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি সাহায্যের টাকায় সার্বিক গ্রামোন্নয়নের নামে দুর্নীতি, দলবাজি, স্বজন-পোষণ ও সন্ত্রাসের বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ৩৬৩৫টি গ্রাম সংসদের মে-জুন (২০০৪) সভাগুলির মধ্যে কোরাম সহ ৩১৭৭ টি সভা হয়েছে, গড়পরতা উপস্থিতির হার মাত্র ১১.০১ জন, পাঁচ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে মুলতুবী সভা হয়েছে ৩১৭টি। এই সর্বশেষ তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে পঞ্চায়েত কাজকর্ম বিষয়ে জনগণের আগ্রহ নেই। কারণ সব পঞ্চায়েতেই দল সবার উপরে। দলীয় নেতৃবৃন্দই নির্ধারণ করে কারা প্রকল্পের সুবিধা পাবে এবং কাদের সুবিধা দেওয়া হবে না।

এই পক্ষপাতিত্বের কারণেই বারংবার পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের বিরোধ বেধেছে। ১৯৮৩ সালে রানীনগর ব্লক-২ এর বিডিওর সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধ বাধে, ৮০০ মিনিকিট বন্টনের প্রশ্নে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি উপকৃতদের তালিকা প্রণয়নের কৃষিসেচ সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করেছিল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এড়িয়ে। কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী দলশাসিত ছিল। বিডিও এবং এ ই ও এইজন্য লাঞ্ছিত হন। জেলা শাসক পি ভট্টাচার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে গ্রেপ্তার করে জেলার শাসকদলের সব পঞ্চায়েত সমিতির নিন্দাভাজন হন, তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রীও জেলাশাসকের সমালোচনা বিধানসভায় করেছিলেন। বেলডাঙ্গার অবর ভূমি সংস্কার আধিকারিক ঋণ আদায় করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হলেও জেলাশাসক তার বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা নিয়েছেন। কোনও কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি আইন লঙ্ঘন করে ত্রাণবন্টন, উপভোক্তাদের সনাক্তকরণ ইত্যাদি কার্য চালিয়ে যাওয়ায় সরকারি আধিকারিকগণ তাতে আপত্তি জানানোই বিরোধ বাধে। দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত ব্যক্তিদের তালিকা (বি পি এল) যে হয়নি বা সঠিকভাবে হয়নি তারজন্য পঞ্চায়েতই দায়ী অথচ আধিকারিকদেরও দায়ী করতে কসুর করেন না রাজ্যের মন্ত্রীগণ।

দলগত পার্থক্যের জন্য ঊর্ধ্বতনস্তরের পঞ্চায়েতের কর্তৃপক্ষ অধস্তন স্তরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। সম্প্রতি কংগ্রেস পরিচালিত নওদা পঞ্চায়েত সমিতি বামফ্রন্ট চালিত মধুপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠন করতে টালবাহানা করাতে মধুপুরের জি এস এফ পি প্রাইমারি স্কুল অনুদানের টাকা ব্যবহার করতে পারছে না। কংগ্রেস পরিচালিত জেলা পরিষদ সিপিএম চালিত রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতিকে বন্যা ও আর্সেনিক রোধে অর্থ বরাদ্দ করেনি। একই ধরণের অভিযোগ বামফ্রন্ট পরিচালিত জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত অতীতে বহু ক্ষেত্রেই করেছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম সংসদ বা গ্রাম সভায় জনগণের দলে দলে যোগদান বা বিকল্প উন্নয়ন কৌশল নির্মাণ বা Community Convergent Action সম্ভব কি? বিশিষ্ট সাংবাদিক লিখেছেন — 'সত্য এই যে পার্টির প্রভূত্ব থেকে মুক্ত, নিরপেক্ষ শাসনের প্রত্যাশাই এ রাজ্যের মানুষ ছেড়ে দিয়েছে।' রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-কৃষক-যুব-মহিলা সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবিত। আপনি কোন দলের ছেলে জেনে স্থির হবে আপনার জন্য কী বরাদ্দ ঃ রসগোল্লা বা নিমের পাঁচন। এর ফলে এ জেলাতেও বহু মানুষ পঞ্চায়েতের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে আবার অনেকে লাভবান হয়েছে, দলীয় অবস্থান অনুযায়ী। এরই নাম গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ। দলগুলির আদর্শ যাই থাক, কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য বেলডাঙ্গার কমনগর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ সুতি, হরিহরপাড়া, ভরতপুর, নবগ্রাম, ডোমকল, রানীনগর সর্বত্র অন্তর্কলহ গ্রামোন্নয়নকে ব্যাহত করেছে। আদর্শহীনতা বা বিচ্যুতি যে একটা কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ক্রমশ স্বনির্ভর হবে এই বিশ্বাস ও আশা নিহীত রয়েছে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে। কার্যক্ষেত্রে নির্বাচনী বাধ্যবাধকতার কারণে কোনও রাজনৈতিক দলই কর, অভিকর, মাশুল ধায' করে সম্পদ সংগ্রহ করতে রাজী নয়। পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর বা মাশুল ধার্যের উপবিধি তৈরি করে জেলাশসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অনুমোদন চাইবে। সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কর আদায়ে চাপ দিতে আসরে নামছে রাজ্য সরকার। মুর্শিদাবাদে ৩২ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত বিবিধ কর আদায় শুরু করেনি। কর আদায়ের চাপ দিতে আসরে নামছে রাজ্য সরকার। মুর্শিদাবাদে ৩২ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত বিবিধ কর আদায় শুরু করেনি। কর আদায়ের হারও ১৭ শতাংশ। উন্নয়ন নেই, পরিষেবা নেই, সুতরাং কর দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ নেই মানুষের।

জেলায় পঞ্চায়েত রাজের কাজকর্ম নিয়ে যতই পরিসংখ্যান দাখিল করা হোক না কেন, জনসাধারণের বড় অংশের নীরব ক্ষোভ অস্বীকার করা যায় না। রানীনগর পঞ্চায়েত সমিতির হেরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিয়াকৎ আলির অভিযোগ 'অতীতে বাম নেতৃত্বাধীন গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদ ৫৫ টি গ্রামের মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক সোনাতলা রাস্তাটি সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। একই অবস্থা আমাদের দলেও (আর্থাৎ কংগ্রেস)। মানুষের কল্যাণের চাইতে ক্ষমতা দখল করা নিয়েই দুই দল বেশি উৎসাহী।' সুতির বিধায়ক জানে আলম খেদ প্রকাশ করেছেন যে তার বিধানসভা এলাকার কুড়িটিগ্রামে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় কিছুই নেই। হারুয়া থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএম সদস্য অসিত সরকারের মতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়ন সে তো খাতায় কলমে! কান্দি মহকুমার হিজল এলাকা প্রায় বছরই প্লাবিত হয়। ২০০০ সালের বন্যায় ৭০ জন মারা গেছেন, অসংখ্য গবাদি পশু, জমি বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। জেলার উন্নয়ন প্রশাসন ও পঞ্চায়েত রাজ এ বিষয়ে নির্বিকার। কংগ্রেসের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জালালউদ্দিনের অভিযোগ বন্যায় গ্রাম ভেসে যায়, আর টাকা ঢোকে নেতাদের পকেটে।

প্রচুর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উল্লেখ্য যে, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম যোজনায় জেলায় প্রায় ৩৫০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে এবং জেলা পরিষদের ডি আর ডি সেল এসব গোষ্ঠীর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং ঋণ পরিশোধের দিকে নজর রাখছে। দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভর হবার এরূপ প্রচেষ্টাকে অনেকে এক চিলতে রুপোলী রেখা বলে মনে করেছেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ঋণ নিয়ে ইসলামপুর থানার হুদা হেরামপুর অগ্রণী সমিতির চারশো জন শিল্পী পাট দিয়ে সৌখিন দৃষ্টিনন্দন সামগ্রী তৈরি করে দেশবিদেশে বিপনণ করে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে জেলার অনেক মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

জেলা পরিকল্পনার বরাদ্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাতে কিছু কাজ হলেও সরকারি আর্থিক সংস্থান না থাকায় পঞ্চায়েতের সব স্তরেই কাজের গতি মন্দীভূত। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় জেলা পরিষদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য পূর্ববর্তী বর্ষে এই যোজনায় মাত্র ৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে; বর্তমান পরিষদ ৩০ কোটি টাকায় ১৪ টি সড়ক প্রকল্প সম্পাদন করেছে এবং আগামী বৎসর ১৫০ কোটি টাকার জন্য প্রকল্পের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানালেন। এর মাধ্যমে প্রচুর শ্রমদিবস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি জেলার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে।

সরকারের আর্থিক যোগান কম থাকায় রাজ্যের অন্যতম পশচাৎপদ এই জেলার অবস্থা শোচনীয়। খরার সময় জলসেচের ব্যবস্থা অপ্রতুল। জেলায় ৮টি রিভার পাম্প ও ২১টি ডিপ ডিউবওয়েল গত তিন চার বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে (এই সংখ্যা বাস্তবে আরও বেশি হতে রারে)। অচলকে সচল করতে অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। বিভিন্ন আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা রাজ্যে গঠিত হলেও মুর্শিদাবাদ বিশেষ উন্নয়ন এলাকা হিসেবে বিবেচিত না হওয়া গভীর পরিতাপের বিষয়।

সূত্র

১। মুর্শিদাবাদ ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থার পরিচালন সংস্থার কার্যবিবরণী।

২। মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালন সংস্থার কার্যাবিরণী।

৩। জেলা খরা বিষয়ক কমিটির কার্য বিবরণী।

৪। পঞ্চায়েতীরাজ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৭) রাজ্য তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ পৃ: ৩২-৩৪।

৫। গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা-পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ১৯৯৮, পৃ: ৬৫।

৬। মুর্শিদাবাদ ডি পি সি সি সভার কার্য্যবিবরণী ২১ জুন, ১৯৮৮।

৯। Murshidabad District Annual Action Plan 1999-2000.

১০। 'বর্তমান' দৈনিক পত্রিকা ১৩ জুন ২০০৪, ৬ জুলাই ২০০৪, ২ আগস্ট ২০০৪।

১১। Murshidabad Disrict Credit Plan 93-94, P.3.

১২। আনন্দবাজার পত্রিকা 8 আগস্ট, ২০০৪, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

১৩। গণকণ্ঠ ১৪ আগস্ট ১৯৮৪, ইদানীং ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩।

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা

শমীক বর্মণ রায়

বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বিদেশী শক্তির প্রভাব সুদুর অতীতকাল থেকেই। গুপ্ত, মৌর্য, সুলতানী, মোঘল, নবাবী তথা দেশীয় শক্তিগুলোর সাথে সাথে পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি সংস্কৃতির বর্ণময় মিলন ঘটেছে বাঙালির রক্তে। দ্রাবিড়, নর্ডিক, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, মুসলিম, মনিপুরী, বৈষ্ণব ইত্যাদি রীতি ও জীবনচর্চার নানান আধ্যাত্মিক ভাব ও ভঙ্গির অনুপম মেলবন্ধন ঘটেছে।

ড. অতুল সুর বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন গ্রন্থে দেখিয়েছেন মৌর্যসম্রাট চন্দ্র গুপ্ত'র আমল থেকে স্বাধীনতা হারানো বাঙালি মিশ্রজাতি। বাঙলার আদিম অধিবাসীরা প্রাক-দ্রাবিড় যুগের। অষ্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ।

বাঙালির সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতক থেকে বাঙালির জীবনধারা ও সংস্কৃতির রং পাল্টাতে শুরু করে। তা শুরু হয় পাশচাত্য ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। তার পূর্বে অর্থাৎ সুপ্রাচীন কাল থেকে নবাবী আমল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় উপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামোয় তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের ভূমিকা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। রক্ষী, দাসদাসী ও আজ্ঞাবহন ব্যতীত অন্য কোনও ভূমিকায় 'জনগণ'-এর প্রবেশাধিকার ছিল না। একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বিবর্তিত হয়েছিল কোনও রাজপরিবার বা নবাব বা সম্রাটদের বীরগাথায় কিংবা যুদ্ধ ইত্যাদিতে। বংশ পরম্পরায় শাসন ও শাসকদের খেয়াল-মর্জির ভিতের উপর ভোগের ইমরাত গড়ে ছিল রাজানুগত এক শক্তিশালী সুবিধাভোগী সামরিক বেসামরিক রাষ্ট্রীয় অভিজাত শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা। জনগণের দুঃখ-যন্ত্রণা হতাশা বা চাহিদার উপর ঐতিহাসিকরা বেশি আলোকপাত করতে অপারগ হন। সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ব্রাত্য করে রাখা জনসাধারণকে ব্যস্ত রাখা হত ধর্মমাহাত্ম্যের গুণকীর্তনে। জাগতিক ঘটনাবলী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে পারলৌকিক মাহাত্ম্যের উপর জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হত। ধর্মীয় ভাবাবেগ ও অনুশাসনের আবর্তে নিজেদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখত। এমন ব্যবস্থায় গণশিক্ষা বা গণগ্রন্থাগার কোনওটারই অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না, তা বলা যায়।

পাশচাত্য শক্তির মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম এদেশে পদার্পণ করেন। অবশ্য চাঁদ সওদাগরেরা

সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে বহির্বাণিজ্যে যেত, একথা মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায়। পর্তুগালের রাজা প্রথম ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এসে পৌঁছলে সেখানে এক গুজরাটি মুসলমান নাবিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ওই গুজরাটি নাবিকের প্রদর্শিত পথে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাসকো-ডা-গামা কালিকটে এসে পৌঁছান। পরবর্তীকালে গোয়ার বন্দরে পর্তুগীজরা বাঙলার পণ্যসামগ্রীর সাথে পরিচিত হন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে (তৎকালীন বাংলাদেশের সেরা বাণিজ্যবন্দর) আসেন যোয়াও কোহেল হো নামে এক নাবিক। তবে তিনি বাণিজ্যের অভিলাষ নিয়ে আসেন নি। বাণিজ্যের টানে বাঙলায় পর্তুগীজ জাহাজ নিয়ে প্রথম আসেন যোয়াও দ্য সিলভার। অবশ্য পর্তুগীজরা বাংলায় আসত বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে। ফলে বাংলার রাজনীতি ও সমাজে তাদের প্রভাব ছিল যৎসামান্য। যদিও সেই শুরু। তারপর বণিকের মানদণ্ড কিভাবে রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল— সে ইতিহাস সবার জানা।

মুর্শিদাবাদে নবাবী আমল মোট ৫৩ বছরের (১৭০৪-১৭৫৭ পর্যন্ত)। এর মধ্যে ১৭১৭ থেকে নবাব নাজিম হওয়ায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানীতে পরিণত হয় মুর্শিদাবাদ। 'নবাবী আমল হিংসা-দ্বেষ-সন্দেহ-চক্রান্ত-গুপ্তখুন-হানাহানিতে পূর্ণ।' ভোগবিলাসে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন নবাবরা। প্রজা মঙ্গলের সময় এবং মানসিকতা কোনওটাই তাদের ছিল না। বিভিন্ন কারণে তারা বারংবার রাজধানী পরিবর্তন করতেন। ঘন ঘন রাজধানী পরিবর্তন তথা শাসক গোষ্ঠীর চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈচিত্র থাকায় চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রাচীর ভাঙতে শুরু করে। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও বিভাজনকে কেন্দ্র করে ছোটবড় ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হতে শুরু করে। পাশাপাশি নগরায়ণ পদ্ধতি ও যোগাযোগের মাধ্যম সুগঠিত হতে থাকে। সামাজিক পরিকাঠামোর এই বিপুল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে প্রভাবিত করে নাগরিক জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীকে। উনিশ শতকের গোড়ায় যা প্রকট হয়ে ওঠে।

গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা — দেশে দেশে কালে কালে

গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে ইউরোপের মধ্যযুগের ঘূর্ণায়মান রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও তার পরবর্তী সময়ে একাধিক ঘটনায় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। কনস্টানটিনোপলের পতনের পর সারা ইউরোপ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছিল। তিনটি মহান বিপ্লব (আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব ও ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব) আমাদের চেতনা ও ভাবের জগতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। মানুষের অধিকার বোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা সাম্য, মৈত্রীর সঞ্জীবন মন্ত্রে সৃষ্টি হয়েছিল গণতান্ত্রিক ভাবধারার। একই সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নবনব ক্ষেত্র উন্মোচন মানুষের জানবার ইচ্ছাকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে লাগল। গুটেনবার্গের ছাপাখানা ওই চাহিদাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল।

১৮৫০ সালে বৃটেনে লাইব্রেরি অ্যাক্ট চালু হয়। নরউইচ পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে বৃটেনে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারের হদিস মেলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে। মূলত যাজক ও ধর্মপ্রচারকদের ওই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেখা যেত। পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত গ্রন্থাগার দ্বয় মিশে যায় এবং নতুন নাম হয় নরউইচ সিটি লাইব্রেরি। ওই লাইব্রেরির তালিকাবদ্ধ ১৭৭২ টি বই প্রাচীনতম সংগ্রহ হিসাবে গণ্য হয়।

তবে পাঠকের গ্রন্থাগারে বসে বই পাঠের অভ্যাস থেকে মুক্তি দেয় ক্যান্টরবেরি পৌরসভা।

তাদের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে (১৮৪৭) সর্বপ্রথম পাঠকদের অর্থ জমা রেখে বাড়িতে বই নিয়ে যাবার অধিকার দেয়। তবে বিনা জামিনে পাঠকদের বাড়িতে বই নিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয় ম্যাঞ্চেস্টার ফ্রি লাইব্রেরি। ১৮৫২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এটি তৈরি হয়েছিল। আর পাঠকের নিজেদের পছন্দসই বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়ায় পথিকৃৎ হচ্ছেন জেমস ডাফ ব্রাউন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নওয়েল লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিক পদ অলংকৃত করার সময়ে তিনি ওই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তবে সবেতনে পুরো সময়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয় ম্যাঞ্চেষ্টার লাইব্রেরিতে। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। বস্ত্র ব্যবসায়ী হামফ্রে চেথামের দানে ১৬৫৩ তে ওই লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। প্রায় ২০,০০০ বই বিশিষ্ট ওই লাইব্রেরিতে ইতিহাস, ভ্রমণ, আইন, ভেষজ, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের বিপুল সংগ্রহ ছিল। সেসময়ই দৈনিক গড় ইস্যু ছিল ২৫ টি।

গ্রন্থাগার কেবল মাত্র মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রহশালা হবে তা ঠিক নয়। জ্ঞান ও তথ্য সমৃদ্ধ নানান অ-বই (Non-Book Material) দ্রব্যাদি নিয়েও গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। সে ব্যাপারে পথিকৃৎ যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট পল সিটি লাইব্রেরি। ১৯১৪ সালে স্থাপিত ওই লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত হত রেকর্ড।

১৯০৩ সালের আগে শিশু বা কিশোরদের জন্য গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। বিংহাম লাইব্রেরি ফর চিলড্রেণ ৯-১৬ বছরের শিশুদের জন্য গ্রন্থাগারে বসে বই পাঠের সুযোগ করে দেন। নটিংহাম পাবলিক লাইব্রেরি শিশুদের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ করে বাড়িতে বই নিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার যাথার্থতা সামাজিকভাবে স্বীকৃত হওয়ার প্রেক্ষাপট ৩০০-৪০০ বছরের বেশি পুরাতন নয়। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় বৃটেনে ১৮৫০ সালের আইনের মাধ্যমে। জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স বা শুল্ক আদায় করে গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারকে প্রায় বাধ্যতামূলক করা হয়। অবশ্য 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ' গ্রন্থে ফজলে রাব্বি মন্তব্য করেছেন যে, 'মুসলিম-স্পেনে সর্বপ্রথম গণগ্রন্থাগারের বিস্তারিত ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল।' প্রাচ্যের দেশ জাপানে অষ্টম শতাব্দী থেকে গ্রন্থাগার স্থাপনের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য মেলে। ১৮৭২ সালে জাপানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ঘটে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৮৯২ সালে জাপানের সম্রাটের আদেশে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুইডেনে ১৮৪২ সালে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। সাথে সাথে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠারও বিধান থাকে।

গণগ্রন্থাগার ভাবনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসকন্যা হলেও গ্রন্থসংরক্ষণ তথা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বরং বলা যায়, অতীত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা রক্ষার অসামান্য ভূমিকা সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই গ্রন্থাগার পালন করে আসছে। মহামতি লেনিন বলেছিলেন, একটা জাতি ও দেশ কতটা উন্নত তা সে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে পরিমাপ করা যায়। প্রাচীন সভ্যতার ধারক দেশসমূহে যেমন রোম, গ্রীস, চীন, এমনকি আসিরিয়া সভ্যতায় গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল। আসিরিয়া শেষ সম্রাট আসুর বানি পাল তার রাজপ্রসাদে ২৫ হাজার মৃত্তিকা ফলক (Tablet) সংরক্ষণ করিয়েছিলেন। তবে বলাবাহুল্য যে, ওই সকল গ্রন্থাগার ছিল প্রকৃতপক্ষে মহাফেজখানা জাতীয়। সেখানে দলিল, দস্তাবেজ, শাসনকার্যের সহায়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হতো। পাশাপাশি উক্ত রাজকীয় গ্রন্থাগারগুলোতে সম্রাট বা নৃপতিদের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাবার জন্য সাধারণ বইও সংগৃহীত ছিল। আমাদের দেশেও হিন্দু বৌদ্ধ সংস্কৃতির যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে গ্রন্থাগার ছিল।

নালন্দা, তক্ষশীলা সহ তৎকালীন বিদগ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব মেলে। হিউ-য়েন-সাঙ-এর বিবরণ থেকে দেখা যায়, শশাঙ্কের রাজধানী থাকাকালীন মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ শহরটি ছিল সমৃদ্ধ ও ঘনবসতিপূর্ণ। জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ছিল জ্ঞানচর্চায়। সেসময় ১৩টি বৌদ্ধবিহার (সংঘারাম)-এর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু (বৌদ্ধ শ্রমণ) থাকত। বৌদ্ধ মঠগুলোতে জ্ঞান ও পুঁথির বিপুল সমারোহ ছিল। এমনকি, গুপ্তরাজাদের আমলে নালন্দার অগ্রবর্তী চতুর্থ শতাব্দীতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব মেলে প্রাচীন মুর্শিদাবাদের মাটিতে। বিদ্যায়তনিক গ্রন্থাগার ও রাজকীয় গ্রন্থাগার-এর পাশাপাশ ছিল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য কিংবা শাহাজাহান ঔরঙ্গজেব প্রমুখের সাহিত্যপ্রীতি শিল্পবোধ থেকে সহজেই অনুমেয় যে সাহিত্যসংগ্রহে তারা পিছিয়ে ছিলেন না। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সুবৃহৎ গ্রন্থাগার (যা পরে আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল) এবং মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের সাহিত্যপ্রীতি আমাদের জানা। হুমায়ুন তো গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পরে মারা যান বলে কথিত আছে।

উনবিংশ শতক ও গণশিক্ষা

ইউরোপীয় বণিক ও মিশনারীদের হাত ধরে এদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিত গঠিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, শত শত বছরের অতি প্রাচীন যে দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশের মাটিতে লালিত হয়েছিল, তার উৎকর্ষতা ও প্রয়োজনীয়তার মূল্য মিশনারী ও কোম্পানীর নব্য সিভিলিয়ানদের জানা ছিল না। এ প্রসঙ্গে লর্ড মেকলের একটি দাম্ভিক মন্তব্য জানা প্রয়োজন। ''ভারতবর্ষ ও আরবের সমস্ত দেশীয় সাহিত্যের যা মূল্য, ইউরোপীয় কোনও ভাল গ্রন্থাগারের একটিমাত্র সেলফে সেই সাহিত্যসম্পদ আছে।'' প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগে ও তার পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় শিক্ষার বুনিয়াদ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। 'ইংরেজরা তার উপর নতুন শিক্ষা-সৌধ নির্মাণ করেছিল।'

হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিজাত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবাহ সে সময় ব্যাহত হয়েছিল কিন্তু স্তব্ধ হয়নি। বরং ওই শিক্ষাব্যবস্থা এবং তৎপরবর্তীকালে মুসলিম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গড়ে ওঠা শিক্ষারীতি — দুটো ধারাই সমভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানি সে সময় দেশশাসন করলেও শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে খোদ ইংলণ্ডে ওই উদাসীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এর সুফল পাওয়া যায় ১৮১৩ সালের সনদ আইনে। ৪৩ নং ধারায় ভারতের জনগণের শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল।

১৭৬৫ সালের পর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থারও গুণগত পরিবর্তন আনে। ওই সময় কোম্পানি শাসনকে রক্ষা করার জন্য একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালিত করা হতে থাকে। ১৭৮১ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা এবং ১৭৯২ সালে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ। নবাব-রাজা-জমিদার ইত্যাদি বনেদি পরিবারের সদস্যরাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল পেতে থাকে। তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণের সাথে সাথে 'পরিস্রবণ নীতি' (Downward Filtration theory)-র ভিত্তিতে সর্বসাধারণের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার হয়ে যাবে। ১৮৫৪ সালের উড সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত (উড্‌স এড্যুকেশন ডেসপ্যাচ) গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ঊষালগ্নে অন্যতম বিতর্ক ছিল শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? টমাস মেকলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সেই বিখ্যাত 'মিনিট'-এ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার

মাধ্যমে শাসনকার্যের জন্য মূল কাঠামো প্রস্তুত করা হবে। সেই মোতাবেক, ১৮৩৭ সাল থেকে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে সব সরকারি কাজকর্ম এবং আইন আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করা হয়। মুর্শিদাবাদে শিক্ষার প্রসার বিষয়ে বিস্তারিত লেখা এই সংকলনের প্রথম ভাগে আছে। সুতরাং গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে আসা যাক।

বড়লাট হার্ডিঞ্জের আমল থেকে সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হতে থাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়। সৈদাবাদ, জঙ্গিপুর, কান্দি প্রভৃতিস্থানে বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৮৪৫ সালে স্থাপিত হয় খাগড়া ইংরাজি বিদ্যালয়। উড সাহেবের প্রতিবেদনের পর ওই গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পায়। বহরমপুর, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, লালবাগ, কাশিমবাজার, পাঁচথুপি রাজারামপুর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষাপ্রীতি তথা বই পাঠের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রামদাস সেন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, আজিমগঞ্জের ধনপৎ সিং, রানী স্বর্ণময়ী, মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি ব্যক্তিত্বরা জেলার শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া ইসলামপুরের জমিদার, পাঁচথুপির জমিদার, নাহার পরিবার, দুধোরিয়া পরিবার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বহন করেন। এদের মধ্যে রামদাস সেনের (জেলার প্রথম 'ডক্টরেট' উপাধিধারী) ব্যক্তিগত সংগ্রহ তথা সাহিত্যকীর্তি সুবিদিত। এ প্রসঙ্গে একটি ছড়া উপস্থাপন করছিঃ 'নিজামত প্রাসাদ (হাজারদুয়ারী), লছমীপতবাবুর বাগানবাড়ি আর ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরি'। বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারে রামদাস সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ রক্ষিত আছে। দুধোরিয়া পরিবারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির একাংশ তাঁরা জেলা গ্রন্থাগারকে দান করেছেন। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মনীষ ঘটক, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ ব্যক্তিগণ সংগ্রহের একাংশ বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

দেশে গণগ্রন্থাগার সম্প্রসারণ — প্রথম যুগ

পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার প্রভাবিত ক্ষেত্র হিসাবে গ্রন্থাগারগুলি এ রাজ্যে স্থাপিত হতে থাকে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আগ্রহ এবং স্থানীয় জমিদারবর্গের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দান করা জমিতে বা বাড়িতে গ্রন্থাগারগুলি চলতে থাকে। মফঃস্বল ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোতে বিদ্বোৎসাহী ও সমাজসেবী জমিদাররা সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যম গ্রন্থাগার গঠন, লালন ও সমৃদ্ধির দায়দায়িত্ব বহন করত। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গণগ্রন্থাগার বিপ্লবী কার্যক্রম তথা বিপ্লবীদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছিল।

হিকির গেজেটের বর্ণনা অনুযায়ী কলকাতায় ইংরেজদের পুরাতন কুঠিতে জনৈক জন অ্যান্ড্রুজ নামে এক ভদ্রলোক 'সার্কুলেটিং লাইব্রেরি' গড়ে তোলেন। এর কিছুদিন পর ১৭৭০ সালে ওই কুঠিতে একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় অল্প কিছুদিনের জন্য দুটি সার্কুলেটিং লাইব্রেরির অস্তিত্ব জানা যায়। মালিক ছিল মেসার্স ম্যাকডোনাল্ড এণ্ড আর্নট। পরবর্তীকালে ওই দুটি মিলে গিয়ে হয় বিশালাকার 'ক্যালকাটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরি'। ১৭৯২ পর্যন্ত সেটি চালু ছিল। ১৭৯৮ সালে 'Bengal Hurkara' নামে উল্লেযোগ্য সংগ্রযুক্ত একটি লাইব্রেরির অস্তিত্ব জানা যায়। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা লাইব্রেরি সোসাইটি।

১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও তার গ্রন্থাগারে এশিয় ও ভারততত্ত্বের বিপুল সংগ্রহাবলী বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তাদের গ্রন্থাগারটিতে কলকাতার নাগরিকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার সুযোগ দেওয়া হত। ১৮৩০ সালে ওই কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

সে সময়কালে বেশ কিছু বিদ্যায়তনিক গ্রন্থাগারের কথা আমরা জানি যেখানে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ হিন্দু কলেজ (১৮১৭), (বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজ), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮), ওরিয়েন্টাল মেসিনারী (১৮২৩), জেনারেল অ্যাসেম্বলি (১৮৩০) (বর্তমানে স্কটিশচার্চ কলেজ), সেন্ট জেভিয়ার কলেজ (১৮৩৫), হুগলি মহসিন কলেজ (১৮৩৬)। ১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল।

এছাড়া বেশ কিছু সমৃদ্ধ বিশেষ গ্রন্থাগার (Specialisted library)র মধ্যে রয়েছে—বোটানিকাল গার্ডেন লাইব্রেরি (১৭৮৭), ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরি (১৮৩৫), জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি (১৮৫১), বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং লাইব্রেরি (১৮৫৬), ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেসন অব সায়েন্স লাইব্রেরি (১৮৭৬)।

বঙ্গে গণগ্রন্থাগার পত্তনের মাইলস্টোন হচ্ছে ১৮৩৬ সালের ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরি গঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন বাঙালি বিদ্বোৎসাহী সমাজ। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাজা সত্যচন্দ্র ঘোষাল, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসময় দত্ত, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ড. মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখরা ছিলেন। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল। পরবর্তীকালে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি (রাজকার্যে স্থাপিত ১৮৯১ সালে)র সঙ্গে ১৯০৩ সালে যুক্ত করা হল। স্বাধীনতার পর ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা পায়।

অবিভক্ত বঙ্গদেশে সম্পূর্ণভাবে বাঙালির নেতৃত্বে গণগ্রন্থাগার স্থাপনের পথিকৃৎ ছিলেন তৎকালীন মেদিনীপুরের প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Bayley Hall Library (বর্তমান নাম ঃ রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার)।

অবিভক্ত বঙ্গে গণগ্রন্থাগার'র কালানুক্রমিক বিস্তৃতি

১৮৫১	উইলিয়াম কেরি গ্রন্থাগার
১৮৫৪	যশোর পাবলিক লাইব্রেরি, বগুড়া উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরি। রঙপুর পাবলিক লাইব্রেরি, হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি।
১৮৫৬	কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি।
১৮৫৭	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৫৮	কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি (হুগলি)।
১৮৫৯	উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি। (বর্তমান নাম উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি)
১৮৬০	জনাই পাবলিক লাইব্রেরি।
১৮৬৯	মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরি (হুগলি), বান্ধব লাইব্রেরি (জয়নগর)
১৮৭০	চন্দননগর পাবলিক লাইব্রেরি (হুগলী), আড়িয়াদহ পাবলিক লাইব্রেরি (২৪ পরগণা)
১৮৭১	শ্রীবাসপুর পাবলিক লাইব্রেরি। বারাসত এ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরি। বোরাল প্রিয়নাথ লাইব্রেরি (দঃ ২৪ পরগণা)।
১৮৭২	কালনা মেয়ো পাবলিক লাইব্রেরি। ইউনাইটেড রিডিং রুম, চিৎপুর, কলকাতা।

১৮৭৩ চন্দন নগর পুস্তকাগার, হুগলী।

১৮৭৪ শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া।

১৮৭৬ শশীপদ ইন্সটিটিউশন, কাশীপুর, কলকাতা। বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরি, ২৪ পরগণা। মুদিয়ালী পাবলিক লাইব্রেরি, কলকাতা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরি, কলকাতা। রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, বর্ধমান।

১৮৭০-৭৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও ইণ্ডিয়ান মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরি।

১৮৭৭ রাজপুর পাবলিক লাইব্রেরি (দ. ২৪ পরগণা)।

১৮৭৯ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি, কলকাতা। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরি এ্যাণ্ড রিডিংক্লাব।

১৮৮২ নর্থব্রুক লাইব্রেরি, ঢাকা। তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি, কলকাতা।

১৮৮৩ বাগবাজার রিডিং রুম লাইব্রেরি, কলকাতা বাসপুর পিপলস্ লাইব্রেরি, হাওড়া। প্রগতি পাঠাগার, ঘাটাল।

১৮৮৪ রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরি। কুমারটুলি ইন্সটিটিউশন লাইব্রেরি। রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরি। ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া।

১৮৮৫ কুমিল্লা পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ। বাণী পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া।

১৮৮৬ আন্দুল মহিয়ারী পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া।

১৮৮৮ যুগ কল্যাণ পল্লীভারতী গ্রন্থাগার, হাওড়া।

১৮৮৯ চৈতন্য লাইব্রেরি, কলকাতা। কালীঘাট লাইব্রেরি এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম। স্পোর্টিং ক্লাব লাইব্রেরি, হাওড়া।

১৮৯০ পাবনা পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ। ভারতী পরিষদ লাইব্রেরি।

১৮৯১ বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি, হুগলী। আগরপাড়া পাঠাগার, উ. ২৪ পরগণা। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউশন লাইব্রেরি, কলকাতা। সুহৃদ লাইব্রেরি, কলকাতা আশুতোষ লাইব্রেরি।

১৮৯২ মহাবোধি সোসাইটি লাইব্রেরি, কলকাতা।

১৮৯৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি।

১৮৯৪ শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি লাইব্রেরি (হুগলী)। জীমগ্রাম নঙ্গী সাধারণ পাঠাগার মওলাই পাবলিক লাইব্রেরি।

১৮৯৫ বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি। ওয়াই এম সি এ লাইব্রেরি, কলকাতা।

১৮৯৭ নোয়াখালি টাউন হল এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরি। উমেনশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি, খুলনা। বেনিয়াপুকুর পাবলিক লাইব্রেরি এণ্ড রিডিং ক্লাব, কলকাতা। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ জেলার গণগ্রন্থাগার

মুর্শিদাবাদ জেলার গণগ্রন্থাগার বিবর্তনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সালে। শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া এই গ্রন্থাগারটি এখনো রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৫৪০ জন, এরমধ্যে ২৬৮ জন শিশু সদস্য ও ২৫ জন নবসাক্ষর সদস্য। স্বামী অখণ্ডানন্দ-র নিজের হাতে

তৈরি এই পাঠাগারটির প্রথম দিককার বইগুলোর মধ্যে এখনো অক্ষত আছে রাজপুত জাতির ইতিহাস (ক্রমিক নং ৩৭৪৩); জে পি বেস্ট-এর রেপার্টরি ও মেটিরিয়া মেডিকা। বইগুলোতে স্ট্যাম্প মারা আছে 'রামকৃষ্ণ মিশন আরফানেজ' নামে। জানা গেল বহু বই বেলুড় মঠ আশ্রম হবার পর এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অর্দ্ধশত বৎসরের বেশি প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১৯০৫ বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরি, গোরাবাজার।

১৯১৩ লালগোলা এম এন অ্যাকডেমি পাবলিক লাইব্রেরি।

১৯১৯ লালবাগ বান্ধব সমিতি লাইব্রেরি। পাঁচথুপি বানী মন্দির। পাশলা বসন্তপুর মেমোরিয়াল লাইব্রেরি।

১৯২০ বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার মেমোরিয়াল লাইব্রেরি।

১৯৩৭ রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার, কান্দি।

স্বাধীনতার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলো যা আজও সরকার পোষিত অবস্থায় চালু আছে, সেগুলি হল ঃ রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), খড়গ্রাম বান্ধব পাঠাগার (১৯৪৪), নবীপুর আর এন ক্লাব লাইব্রেরি (১৯৪৫), নবগ্রাম থানা ইউনিয়ন লাইব্রেরি (১৯৩৮), নেতাজী আশ্রম চক্র সংঘ পাঠাগার (১৯৪৬), বহড়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার (১৯২৮), গোকর্ণ শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতি মন্দির (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), আহিরণ শ্যামলী পাঠাগার (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), জিৎপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৯৪৪), ভাবতা হিন্দ লাইব্রেরি (১৯৪৬)।

১৯৭৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন কার্যকরী হয়। দেশের পঞ্চম রাজ্য হিসেবে এই রাজ্যে সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সরকারি প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। গঠিত হয় পৃথক মন্ত্রক, গ্রামে গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার। অন্যান্য জেলার মত আমাদের জেলাতেও গঠিত হয় লোকাল লাইব্রেরি অথিরিটি। গ্রন্থাগার প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর। রাজ্য স্তরে গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের (এস এল সি) মাধ্যমে এবং গ্রন্থাগার অধিকর্তার মাধ্যমে জেলাস্থিত এল এস এ গুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সুসংবদ্ধতা আনার প্রচেষ্টা করা হয়। গ্রন্থাগার স্থাপন, কর্মী নিয়োগ, বইমেলা সংগঠন, গ্রন্থাগারগুলির নির্বাচিত পরিচালন সমিতি গঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার পরিষেবা দানা বাঁধতে থাকে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে তথ্য ও শিক্ষায় পরিপূরক শক্তি হিসেবে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা ও কার্যকারিতা প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে এবং সামাজিকভাবে ব্যাপক স্বীকৃতি পেতে থাকে।

আমাদের জেলায় তথ্য ঘাঁটলে দেখা যায়, গ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯) হবার পূর্বে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশটি। অথচ ১৯৮১ সালের মধ্যে মোট ১৬৩টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ৩টি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পরিপোষণ নীতি বাতিল করা হয়।

বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দেওয়া তথ্য হিসেবে জেলায় সরকার পোষিত মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৫৯টি। এর মধ্যে সক্রিয় ১৪৩টি। বিভিন্ন কারণে বন্ধ বা নিষ্ক্রিয় ১৬টি। সারা জেলায় ৭৫,১৭৬ জন ব্যক্তি কোনও না কোনও গ্রন্থাগারের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। বাংলাভাষী পাঠক ৭২,০০০, ইংরাজি ভাষী পাঠক ৬০০ জন, হিন্দি ভাষী ৩৮০ জন। অন্যান্য ভাষাভাষীর পাঠক সংখ্যা ২,২৯৬ জন। লিঙ্গগত বিভাজনে পুরুষ সদস্য ৪৪,২২০ জন, মহিলা ৩০,৯৫০ জন। তপ. জাতি, তপ. উপজাতি ও অনগ্রসর অংশের পাঠক যথাক্রমে ৫,৯০৭ জন, ২,১২৭ জন ও ৮,২৪৩ জন। ২০০২-০৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারগুলির

বাৎসরিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২,৪০,৫৩৬ জন, এদের মধ্যে বাড়িতে বই নিয়ে গেছেন ১১,৪৩,৬৪০ জন। মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গলে স্পনসর্ড ব্যবস্থার বাইরে ৩৫টি নথিভুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব এ জেলায় রয়েছে।

জেলার কয়েকটি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার

লালগোলা এম এন অ্যাকাডেমি (পাবলিক) টাউন লাইব্রেরি।

জেলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী গ্রন্থাগার। লালগোলার মহারাজের দানলব্ধ এই গ্রন্থাগার যে পরিবেশে বিরাজ করে তাতে মুগ্ধ হতে হয়। গ্রন্থাগারটি অবস্থিত লালগোলা এম এন আকাডেমির পার্শ্বে। সামনে প্রাথমিক ও গার্লস স্কুল। দ্বিতল এই গ্রন্থাগারের (১৩ টি কক্ষ) প্রতিটি কক্ষেই অনুভূত হয় নানা স্মৃতি ও গাম্ভীর্য।

বহু প্রাচীন পত্রপত্রিকা ও দুষ্প্রাপ্য তথ্য সমৃদ্ধ 'ক্যালকাটা গেজেট' নষ্ট হচ্ছে অনাদরে— যার সংরক্ষণ এখুনি প্রয়োজন। উদ্যমী গ্রন্থাগাররীক দীপক মিশ্র জানালেন তার আপ্রাণ চেষ্টার কথা। গ্রন্থাগার দেখে বেরিয়ে আসার পথে পরিচয় হল বর্তমান ডাইরেক্টর পলক সান্যালের সঙ্গে। পেশায় বিদ্যালয় শিক্ষক, সদালাপী। প্রথম পরিচয়েই জানালেন 'প্রশাসনের মৌখিক আশ্বাসে ছাদ ও দেওয়াল সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলাম। আর্থিক সাহায্য না আসায় বিপদে পড়ে গেছি। ডাইরেক্টর মহাশয়ের আশঙ্কার বাস্তবতা লক্ষ্য করা গেল।

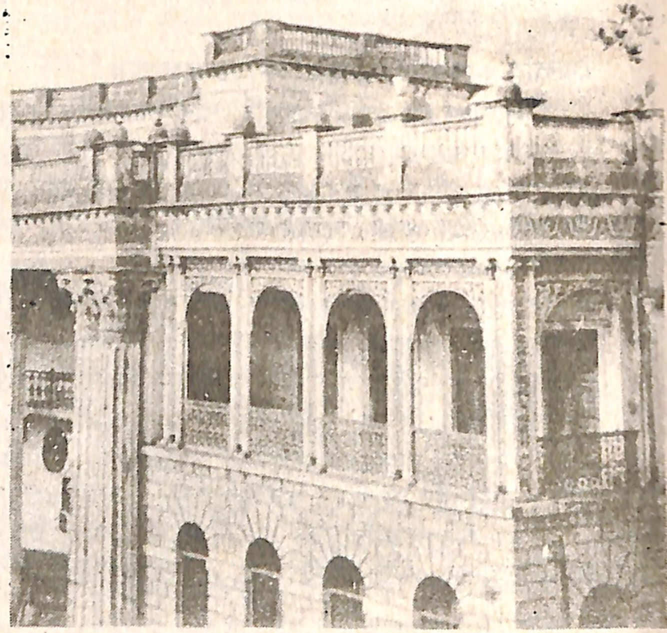
১৮৯০ সালের চ্যারিটেবল এন্ডাওমেণ্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় রাও মহেশ নারায়ণ রায় চ্যারিটেবল এনডাওমেণ্ট। ওই এনডাওমেণ্টের ৩ নং অনুচ্ছেদের বয়ান অনুযায়ী স্কুল



লালগোলা এম এন অ্যাকাডেমী (পাবলিক) টাউন লাইব্রেরী। জেলার প্রত্যন্তে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।

লাইব্রেরি স্থাপনের সুযোগ থাকে। অ্যাক্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহেশ নারায়ণ অ্যাকাডেমির অন্তর্গত এই গ্রন্থাগার। ১৯১৩ সালে তৎকালীন রাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 'লালাগোলা পাবলিক লাইব্রেরি' নামে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার খোলেন, যা ১৯২০ সালে জনগণের ব্যবহারের জন্য তিনি স্কুল কমিটির অধীনে দান করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৬,০০০ টাকায় জি পি নোট্‌স প্রদান করেন।

স্কুল কর্তৃপক্ষের অধীনে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা অর্পিত হলেও রাজার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল লালগোলার সাধারণ জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করা। তৎকালীন জেলা সমাহর্তা ও এম এন আকাডেমির সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে লেখা রাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পত্র (১৭ জুলাই, ১৯২০) পাঠ করে বোঝা যায়। অথচ দুঃখের হলেও সত্যিই যে গ্রন্থাগারে নির্বাচিত পরিচালন সমিতি নাই। অথচ ১৯৫৭ সালের ৭ মে তারিখে লিখিত তৎকালীন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের নির্দেশপত্রে ২নং অনুচ্ছেদে সত্বর পরিচালন সমিতি গঠনের আদেশ দেওয়া আছে। এমনকি ৬৪/১(২০০)/এল এস তাং ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭র পত্রে তৎকালীন উপ অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, পঃবঃ লাইব্রেরির শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হবার শর্ত হিসেবে পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার আইনের (১৯৭৯) আয়ত্তাধীন বিষয় সমূহ পালন করার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে— নির্বাচিত পরিচালন সমিতি গঠন যার অন্যতম শর্ত।



কাশিমবাজার পরিবারের সৈদাবাদে স্থিত প্রাসাদের এখানেই
এক সময় এখানেই ছিল জেলা গ্রন্থাগার। বর্তমানে শহর গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগারটি নাম নিয়েও যথেষ্ট জটিলতা চোখে পড়ল। বিভিন্ন সরকারি চিঠি চাপাটিতে কোথাও 'লালগোলা পাবলিক লাইব্রেরি', কোথাও বা 'লালগোলা এম এন লাইব্রেরি', কোনও কোনও স্থানে 'লালগোলা এম এন রুর‍্যাল লাইব্রেরি' অন্যত্র আবার 'লালগোলা এম এন আকাডেমি লাইব্রেরি'। এই নানাবিধ নামের পিছনে কোন যুক্তি জানা নেই বলে জানালেন গ্রন্থাগারের কর্মীরা।

১৯৮৭ সালে লাইব্রেরিটি শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হলেও কর্মী সংখ্যা এখনো মাত্র দুই জন। লাইব্রেরিটির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বিচার করে অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ করা প্রয়োজন।

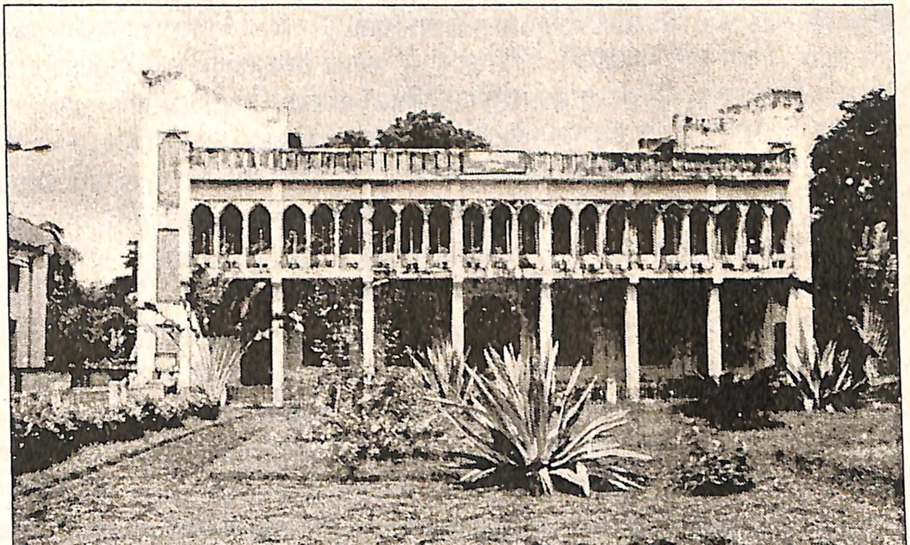
গ্রন্থাগারের পুরাতন নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রখ্যাত সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার

গ্রন্থাগারিক পদে কর্মরত ছিলেন এবং ১৯২০ সালের অক্টোবর সালের বেতন বাবদ ২৫ টাকা গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৭ থেকে ২০০২ পর্যন্ত গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন বিমল মুখার্জী। জীবন চক্রবর্তী ১৯৮০ সাল থেকে কর্মরত আছেন।

বর্তমান পুনর্নবীকরণযোগ্য সাধারণ সদস্য ৩১৭ জন। শিশু সদস্য ৩৩৬ জন। বৃত্তি সহায়তা কেন্দ্রে ৬১ জন সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত, বলা যায় এম এন আকাডেমির শিক্ষক সদস্যপদ নিতে চাইলে বিনা চাঁদায় তা গ্রহণ করতে পারেন। এমনকি সদস্যপদ গ্রহণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট আবেদন পত্র লাগে না।

লালগোলা এম এন অ্যাকাডেমি (পাবলিক) টাউন লাইব্রেরির সদস্য সংখ্যা ও পুস্তক বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ —

সাল	পুস্তক সংখ্যা	রেজিঃ সদস্য	নবীকরণ
১৯৮০	৯১৩৭ টি	১২৬৬ জন	জানা নেই
১৯৮৫	৯৭২৩ টি	১৬২১ জন	৪০৭ জন।
১৯৯০	১১১৩৪ টি	১৮২০ জন	২৮১ জন
১৯৯৫	১১৮০২ টি	১৯২৫ জন	২৫৬ জন
২০০০	১২৬৮২ টি	২০২৩ জন	২৬৩ জন
২০০৪ (আগস্ট)	১৩৩৮০ টি	—	—



বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগার।

উল্লেখযোগ্য যে পত্রিকাগুলো সংরক্ষিত আছ

অর্চ্চনা, অনাথবন্ধু, অনুসন্ধান, অন্তঃপুর, আগমণী, আর্থিক উন্নতি, আদরিণী, আর্যাবর্ত, উদ্বোধন, উৎসব, উপাসনা, ঐতিহাসিক চিত্র, কল্পদ্রুম, গৃহস্থ, গৌরাঙ্গ সেবক, জন্মভূমি, জাহ্নবী, তত্ত্ববোধিনী, তত্ত্বমঞ্জরি, ধর্ম প্রচারক, নবজীবন, নব্যভারত, নারায়ণ, প্রতিভা, প্রবর্ত্তক, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, বঙ্গবাসী, বসুমতী, বিচিত্রা, শিল্প ও সাহিত্য, শিশু ভারতী, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সন্দেশ, সবুজপত্র, সাহিত্য, দেশ ইত্যাদি।

জেলা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ

১৯৫৫ সালের ২৬ জুন কাশিমবাজার রাজপরিবারের দানে সৈদাবাদ-এ গঠিত হয়। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের গ্রন্থাগার। তবে নানা কারণে বহু তথ্য ও নথি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সৈদাবাদ রাজবাড়িতে প্রথমে স্থাপিত হলেও বর্তমানে ব্যারাক স্কোয়ারের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ১৯৯৫ সালের ২৬ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে নব নির্মিত ভবনে শুরু হয়। বর্তমানে শিশুবিভাগ, বৃত্তিসহায়তাকেন্দ্র সহ নানান ধরণের তথ্যভিত্তিক পরিষেবা প্রদান করা হয়। বহু গবেষক-পাঠক এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। এছাড়া বইমেলা ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে এই গ্রন্থাগার। কর্মী সংখ্যা অর্ধেকেরও কম থাকায় বর্তমানে কর্মীদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়।

বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রস্তুতির কাউন্সেলিং যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। ২০০৩-০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩০০০ সাধারণ সদস্য, ২৫০ জন শিশু সদস্য। বৃত্তি সহায়তা বিভাগের সদস্য সংখ্যা ১০৮৬ জন। বাৎসরিক বই ইস্যু প্রায় ১৫,০০০। পুস্তক সংখ্যা ৩৫ হাজারের কিছু বেশি।

সমাজ উন্নয়ন সমিতি রুরাল লাইব্রেরি, গ্রাম বেলিয়াশ্যামপুর ডাক-দিয়াড়শ্যামপুর।

ভগবানগোলা রেলস্টেশন থেকে দেড় কিমি দূরে হাবাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রন্থাগারটি গড়ে ওঠে ১৯৬৯ সালে এলাকার মানুষের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৯৬৮ সালে গ্রামে একটি ক্লাব বা সমিতি গড়ে ওঠে — সমাজ উন্নয়ন সমিতি। দেহচর্চা, হাডুডু, ফুটবল প্রভৃতি খেলাধূলার সাথে সাথে বাড়ি বাড়ি বইসংগ্রহের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে গ্রন্থাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসেবে সরকারি অনুমোদন মেলে ১৯৮২ সালে। ১৯৮৩ সাল থেকে গ্রন্থাগারিক পদে কর্মরত আছেন মহঃ আইউব হোসেন। বর্তমানে যে স্থানে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত তা স্থানীয় নজরুল ইসালামের (গ্রন্থাগারের সম্পাদক) দান করা জমিতে। প্রথমে কাঁচা বাড়ি থাকলেও এম পি ল্যাড, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রন্থাগার বিভাগ প্রভৃতির সহায়তায় ১০০০ বর্গ ফুটের একটি সুন্দর পাকা বাড়িতে গ্রন্থাগার চলছে।

বর্তমান পাঠক সংখ্যা ৩৭৬ জন এবং পুস্তক সংখ্যা তিন হাজার প্রায়। পাঠাগারটি খোলা থাকে বেলা ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। বাংলা সাহিত্য ও অন্যান্য বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র আছে তাতে গ্রন্থাগারিক ও পরিচালন সমিতির মনোভঙ্গি ধরা পড়ে। ২০০২ সালে জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার হিসেবে পুরষ্কৃত হয়। ১৯৭৬ সালে মহকুমাস্তরে উন্নীত হবার সময় পাঁচ কাঠা জমি দান করেন কালাচাঁদ ঘোষ।

বর্তমানে গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য আছে। গ্রন্থাগার সহকারী জয়া সরকার সহ মোট তিনজন কর্মী আছেন। এর মধ্যে একজন নৈশপ্রহরী। দোতলায় বইলোন বিভাগ এবং একতলায় পাঠ

গ্রহণ কেন্দ্র চালু আছে। মুর্শিদাবাদ চর্চা সংক্রান্ত বই-এর মধ্যে 'মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি— কমল বন্দ্যোপাধ্যায়', 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী— নিখিল নাথ রায়', 'প্রাচীন মুর্শিদাবাদ— কর্ণসুবর্ণ ও মহীপাল— বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত— সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত', 'মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা, ১৯২৫-১৯৭৫', 'সিপাহী বিদ্রোহে বহরমপুর', 'মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য— পুলকেন্দু সিংহ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দাদাঠাকুর সম্পর্কিত 'সাংবাদিক দাদাঠাকুর— কৃশাণু ভট্টাচার্য', 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর— নির্মল রঞ্জন মিত্র' বইগুলো উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারটির ৮৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা'তে রঘুনাথগঞ্জ শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিবর্তনমূলক ইতিহাস চর্চিত হয়েছে।

পুরাতন নথি থেকে জানা যাচ্ছে গ্রন্থাগারটির সদস্য ও বই বৃদ্ধির চিত্র নিম্নরূপ—

সাল	বই সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা (নবীকরণের ভিত্তিতে)
১৯৮৫	৬,৯৯৫	৬০৯
১৯৯০	৯,৮০০	৪২৭
১৯৯৫	১১,১৩৩	২৬৯
২০০০	১৪,৩২৬	৪৬৮
২০০৪ (আগস্ট)	১৫,৭৫২	৭০৪

ধুলিয়ান টাউন লাইব্রেরি

১৯৮০ সালে শহর গ্রন্থাগার হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পেলেও, ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসেবে সরকারি পরিপোষণ পেয়ে আসছে।

গ্রন্থাগারিক বন্দনা সেনগুপ্ত জানালেন ধুলিয়ানগঞ্জের পাশেই ছিল কাঞ্চনতলা নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, যা বর্তমানে গঙ্গাগর্ভে। ওই গ্রামের জমিদারদের দানকার্যের ফলে স্কুল, হাসপাতাল, মন্দির গড়ে ওঠে। পল্লী গঠনের সেই মহান ব্রতের ফলস্বরূপ ১৯৫৭ সালে গড়ে ওঠে পল্লীকল্যাণ গান্ধী আশ্রম লাইব্রেরি— শহর গ্রন্থাগার হিসেবে উন্নীত হবার আগে পর্যন্ত এ নামেই গ্রন্থাগারটির পরিচয় ছিল।

বর্তমানে লাইব্রেরিতে ৮,০০০ কিছু বেশি বই আছে। গ্রন্থাগার কর্মী নন্দবাবু পুরোনো রেজিষ্ট্রার ঘেঁটে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারটিতে সদস্য ও বইবৃদ্ধির হার নিম্নরূপ—

সাল	বই	সদস্য
১৯৬২-৬৮পর্যন্ত	১০৮১	১২৩
১৯৬৯-৭৯	২২৮৭	৭০২
১৯৮০-৯০	৪৩৪২	১২৯৩
১৯৯১-২০০০	৭০৪৮	১৮০৮
১২.৮.২০০৪	৮৫৫৮	১৯৭৮

অবশ্য ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের তাগিদে ধুলিয়ান শহরটিতে বহু অবাঙ্গালি পরিবার (মূলত হিন্দিভাষী) বসবাস করেন। দুঃখের হলেও সত্যি, গ্রন্থাগারটিতে তাদের চাহিদা পূরণের মতো বই-এর সংগ্রহ নেই। বর্তমানের নবগঠিত পরিচালক সমিতি হিন্দি সাহিত্য সংগ্রহের উপর জোর দেবেন বলে জানিয়েছেন। এরই সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ধুলিয়ান শহরে কোন কলেজ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরীর বিভিন্ন রেফারেন্স বই ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করছে। ভবিষ্যতে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ সেদিকে নজর দেবেন

বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশবন্ধু যতীন দাস পাঠাগার; রঘুনাথগঞ্জ

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ারে লিপিবদ্ধ আছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, অমৃতলাল বসু, কালিদাস রায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় দের পাদস্পর্শে ধন্য এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে বহু মানুষের আগ্রহ ও দান। যতদূর জানা যায়, অবনী কুমার রায়, সাকেত রঞ্জন ব্রহ্ম, বিষ্ণুপদ রায় প্রমুখ যুবক বৃন্দের প্রচেষ্ঠায় গ্রন্থাগারটির পথ চলা শুরু। অবশ্য তখন নাম ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পাঠাগার। পরবর্তীকালে কাঞ্চনতলার জমিদার বিভূতিভূষণ দাস ও শ্রীপতিভূষণ দাস মহাশয়রা নির্মান করেন 'রামলাল ফ্রি রিডিং রুম' এবং একই ভাবে দফরপুরের জমিদার পঙ্কজ কুমার দাস মহাশয় নির্মান করেছেন 'দ্বিজপদ রিক্রিয়েশন ক্লাব। এছাড়াও জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্যামাপদ সরকার প্রমুখরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় পেনিবাবুর (প্রদ্যোৎ কুমার বাবু) উদ্যোগে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ দিয়ে শুরু হয় 'যতীনদাস ছাত্র পাঠাগার।' পরবর্তীকালে (সম্ভবতঃ ১৯৫০ সালে) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পাঠাগার এবং যতীনদাস ছাত্র পাঠাগার এক হয়ে যায়। দুটি পাঠাগার মিলনের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে ছিলেন ফেলুবাবু (বৃন্দাবন বিহারী দত্ত), ছানুবাবু (সুভাষ সেনগুপ্ত) প্রমুখ।

বেলডাঙ্গা প্রসন্ন কুমার মেমোরিয়াল (শহর গ্রন্থাগার)

এই মুহুর্তে জেলার সবচেয়ে ব্যস্ত গ্রন্থাগার। জুলাই ২০০৪-এ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে সাধারন বিভাগে দৈনিক বই ইস্যু হচ্ছে ১৬০ টি পাঠকক্ষে বসেন দৈনিক গড়ে ৫৩ জন। বৃত্তি সহায়তা কেন্দ্রে গড়ে ১৪ জন আসেন। সদস্য সংখ্যা সাধারণ ৫৭০ জন, শিশু ৯৯ জন, বৃত্তিসহায়তা বিভাগে সদস্যসংখ্যা ১০৮ জন। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে কর্মীরা আন্তরিকতা দিয়ে পরিষেবা প্রদান করে থাকেন। গ্রন্থাগারিক জানালেন তারা কর্মীদের মধ্যে আশু প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলেছেন। গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 'অনির্বান' নামে দেওয়াল পত্রিকা বের হয়। বাৎসরিক সংখ্যাও প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে সাথে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনেক সময় গ্রন্থাগারের কর্মীরা পুরষ্কার মূল্য নিজেরা বহন করেন। এই অনন্য কৃত্তিত্বের জন্য পরিচালক মণ্ডলীও প্রশংসার দাবী রাখেন। পরিচালন সমিতির বর্তমান সভাপতি জানালেন যে বেলডাঙ্গায় বই পাঠের আগ্রহ অতীতেও লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৮২ সালে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হবার আগেও দৈনিক ৩০/৪০ জন বই পড়ুয়া গ্রন্থাগারে আসতেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল স্বাস্থ্যশ্রী ব্যায়াম সমিতি, হিন্দ লাইব্রেরী, কিশোর সমিতি পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছিল যারা সেবা ও কৃষ্টি মূলক কাজে নিয়োজত ছিল। এদেরই সার্থক রূপ আজকের বেলডাঙ্গা পি.কে. এস শহর গ্রন্থাগার।

বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী

পরাধীন ভারতে কৃষ্ণনাথ কলেজের কতিপয় অগ্রণী ছাত্র ও স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় গোরাবাজার অঞ্চলে ১৯০৫ সালে (১৩১২ ব.) গড়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থাগারের জন্ম। তৎকালিন সময়ে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্ফূরণ ও বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র ছিল

বহরমপুর শহর তথা মুর্শিদাবাদ জেলা। " ১৮৬৯সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বহরমপুর শহরে বিভিন্ন কারণে বসবাস করেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র,দীনবন্ধু মিত্র,রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রামদাস সেন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ।" এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বর্ণময় উপস্থিতির সাথে সাথে কৃষ্ণনাথ কলেজে যে সব শিক্ষবিদ সে সময় যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে রবার্টহ্যাণ্ড, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বলার অপেক্ষা রাখে না, এক বিশেষ কৃষ্টির বাতাবরন তৈরী হয়েছিল সে সময়।

কৃষ্ণনাথ কলেজের দক্ষিণপ্রান্তে অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে এই গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয়। তারপর ওল্ড থানা রোড, রুটিমহল, চুঁয়াপুর প্রভৃতি স্থানে গ্রন্থাগারের ঠিকানা বদল হয়। বর্তমানে গোরাবাজার নিমতলার কাছে ২নং মহেন্দ্র মুখার্জী রোডে অবস্থিত।

বর্তমানে গ্রন্থাগারটির শতবর্ষ উদযাপন চলছে। গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান হয় ১৯৫৫ সালের ২৬ শে জুন। সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ, প্রফুল্ল গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। গ্রন্থাগারের তৎকালীন সভাপতি ছিলেন ডঃ রেজাউল করিম সাহেব। বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক কমলাক্ষ দাশগুপ্ত, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রামচন্দ্র দুবে, সুধাময় গুহ, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, বিজয় কুমার গুপ্ত, রাজনীতিবিদ বিজয় কুমার ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

স্থাপিত হবার প্রায় ৭৭ বছর পর সরকারী পরিপোষন ভুক্ত হয় এই গ্রন্থাগার। সেই ১৯৮২ সাল থেকে বেলা ১২ থেকে ৭ পর্যন্ত পাঠক পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। যদিও কর্মি ও স্থানাভাবে অনেক উদ্যমের তাল কেটে যায়। তবে শতবর্ষের পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ২০০5 সালের মধ্যে নিজস্ব দ্বিতল ভবনের (১৬ নং ওল্ড থানা রোড) কাজ সম্পন্ন করার অঙ্গিকার করেছেন পরিচালন বর্গ। অন্যান্য গ্রন্থাগারের তুলনায় এই পাঠাগারের পরিচালন সমিতির উদ্যোগ ও মানসিক ,া প্রশংসার দাবী রাখে।

বর্তমানে গ্রন্থাগা.রের পুস্তক সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজারের কিছু বেশি। সাধারণ সদস্য চারশোর কাছাকাছি। শিশুসভ্য দেড় শতাধিক। বই ইস্যুর দৈনিক গড় ৩৫/৪০ টি। তবে অবিলম্বে 'কেরিয়ার গাইডেন্স' বিভাগ চালু, ভ্রাম্যমান পরিষেবা চালু সহ জেলার প্রাচীন তথ্যাদির সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে আগ্রহী এই পাঠাগারের পরিচালন সমিতি। গ্রন্থাগারের সদস্য/পৃষ্টপোষক, কর্মী তথা গ্রন্থাগারিককে সামনে রেখে তারা সফল হবেন, এই বিশ্বাস রাখি।

সরকারি পরিপোষণের গণ্ডী ছাড়িয়ে যে সমস্ত গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদান করছেন

বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরীর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত'র 'পাঠাগার আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন মহকুমার গ্রন্থাগারগুলির তালিকা পাওয়া যায়। শ্রীগুপ্ত মহাশয় জেলার গ্রন্থাগার গুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন; ১) প্রাইভেট লাইব্রেরীঃ রাজা, মহারাজা, জমিদার, নবাব বা গুনীজনদের নিজস্ব জ্ঞানাজর্নে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার। যেমন নবাব বাহাদুরের নিজামত লাইব্রেরী, কাশিমবাজার রাজার লাইব্রেরী, ডঃ রামদাস সেনের লাইব্রেরী, ধনপৎ সিং বাহাদুরের জৈন মন্দিরের পাঠাগার, জাফরাগঞ্জের বড় আখরার গোপাল দাস মহান্তর পাঠাগার, নসীপুর রাজার পাঠাগার। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংযোজন আইনজীবি ও সাংবাদিক শ্যামল দাসের 'ইতিহাস পরিক্রমা'।

সাধারন পাঠাগার

ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ ও অর্থসাহায্য সৃষ্ট এ জাতীয় পাঠাগার গুলির মধ্যে গ্র্যান্টহল রাধারঘাট মোহিত মোহন মহিলা পাঠাগার, হিন্দুস্থান সেবা সমিতি, স্বর্গধাম সেবক সংঘ, আমাদের দল, সেবা মিলনী, রামকৃষ্ণ পাঠাগার, বলরামপুর (বহরমপুর মহকুমাস্থিত); বানীমন্দির/ আজিমগঞ্জ, আর.এন.ক্লাব/ নসীপুর, তরুণ সুভাষ ইভনিং ক্লাব/ ইসলামপুর, হিন্দ পাঠাগার/ ইটোর প্রভৃতি (লালবাগ মহকুমাস্থিত); জয়হিন্দ পাঠাগার/কান্দী, ফাল্গুনী সমিতি/কান্দী, নিচু আটগ্রাম স্বরাজ লাইব্রেরী, টেঁয়া ইয়ংম্যান এসোসিয়েশন, মাসলা সোসাল এডুকেশন লাইব্রেরি, মালিহাটী ছাত্র সমাজ ইত্যাদি (কান্দী মহকুমাস্থিত); মহারাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ভৈরব পাবলিক লাইব্রেরী/নূরপুর ইত্যাদি (জিয়াগঞ্জ মহকুমাস্থিত)। তবে বর্তমানে উপরোল্লিখিত গ্রন্থাগার সমূহ কি অবস্থায় আছে বা তাঁদের কার্যাবলী কোন পর্যায়ে আছে তা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছি। অনেক গ্রন্থাগারের তালা হয়ত খোলে না। তবুও ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রয়োজনে উল্লেখ রাখলাম। সময় ও সুযোগ থাকলে ভবিষ্যতে যে কেউই এই বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করতে পারেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গ্রান্টহল লাইব্রেরী/যার পোশাকী নাম যোগেন্দ্রনারায়াণ মিলনী গ্রন্থাগার। ছোটলাট পিটার গ্রান্টএর নাম স্মরণীয় করতে ১৮৬৬তে এই বাড়িটি কেনা হয়। ১৮৯৭ এর ভূমিকম্পে পূর্ববর্তী ভবনটি ধ্বংস হয়ে গেলে অনেক পরে ১৯১১তে বর্তমান ভবনটি নির্মিত হয়। ১৯৪৮ এর মার্চে পূর্ববর্তী এডোয়ার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব-এই নাম বদলে রাখা হয় বর্তমান নাম। ১৯৩৩ সালে ক্লাবের গ্রন্থাগারটি সাজানোর ব্যপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই গ্রন্থাগারে মোট ১১৫০০ মত বই আছে, যার মধ্যে কিছু দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। এছাড়া বর্তমানে বহরমপুর শহরে ক্ষুদিরাম পাঠাগার ও টাউন ক্লাবের লাইব্রেরি আছে বলে খোঁজ পেয়েছি। অবশ্য ক্ষুদিরাম পাঠাগার অন্যান্য জনহিতকর কাজে বেশি মনোযোগী। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করে বিতরণের মত কাজে তারা যুক্ত।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই হাজারদুয়ারী প্যালেস মিউজিয়াম এর অন্তর্গত গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে। আমরা সবাই জানি, নবাব নাজিম হুমায়ুন জার আমলে ১৮২৯ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে হাজারদুয়ারীর বর্তমান চিত্তাকর্ষক প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল। এই অনুপম স্থাপত্য কীর্তির অভ্যন্তরে নানান প্রাচীন নিদর্শন যেমন আছে তেমনি আছে ডাচ, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ ও ইতালিয়ান শিল্পকীর্তি। দূর দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকবাহিনী মজা, আড্ডা, পিকনিকের মেজাজে এসে অবাক বিস্ময়ে দেখে ফিরে যান। অথচ এর ভিতরেই আছে ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের কত প্রামান্য দলিল ও দস্তাবেজ। তার খবর কে রাখে? হাজার দুয়ারীর গ্রন্থাগারে তিন হাজার পাণ্ডুলিপি আছে পার্শী ও উর্দু ভাষায় লেখা, ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় ছয় হাজারের বেশী বই সংগৃহীত আছে যা ভারততত্ত্ব বা এশীয়তত্ত্বকে জানতে সাহায্য করবে। বর্তমান গ্রন্থাগারিক এ.আর মোল্লা সাহেব সদালাপী ও তার আথিত্যগুনে মুগ্ধ হতে হয়। তিনি জানালেন, সচেতন পাঠক ও গবেষকদের জন্য তার দ্বার সব সময় উন্মুক্ত। এই অবসরে একটা নিবেদন রাখছি। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের কাছে। উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের দল বেঁধে যদি ঐ গ্রন্থাগার ঘোরাবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে মুর্শিদাবাদ তথা তৎকালীন সময় ও সমাজ সম্পর্কে আজকের ছাত্র সমাজ সম্যক ধারণা পেতে পারে। এরকমই সরকারী তথ্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ অপর গ্রন্থাগারটি হচ্ছে কালেকটরেট লাইব্রেরী। হাজারদুয়ারী লাইব্রেরী ও কালেকটরেট লাইব্রেরী তথ্য ও সম্পদ তালিকা যদি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার গুলোতে রাখার ব্যবস্থা হয় তাহলে

উৎসাহী ও অনুসন্ধানী পাঠক উপকৃত হয়।

তিনটি উদ্যোগ ঃ তিনটি গর্ব

উদ্যোগ ১ ঃ নীলিমা চক্রবর্তী। বয়স ৫৯ বৎসর। পেশা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষিকা। বাড়ী লালবাগ। আমার আগ্রহে সহকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মী আন্দোলনের নেতা রাধামাধব সরকার একদিন অপরাহ্নে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জানালেন 'মিনি' দি বলেই পরিচিত। এই মিলিদিদিদের উদ্যমে গড়ে উঠেছিল পঙ্কজিনী স্মৃতি পাঠাগার, ১৯৫৭ সালে ২০০ টি মতন বই নিয়ে। সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত এই গ্রন্থাগার-এ বর্তমানে ২০০০-৩০০০ মত বই আছে। ইদানীং উৎসাহে ভাটা পড়লেও এর অতীত গৌরব মনে রাখার মতো। বর্তমান সভানেত্রী নন্দীতা মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হল না। মিলিদি আক্ষেপ করলেন, আজকাল অধিকাংশ মায়েরা টিভিতে রান্নার রেসিপি শিখছেন, সিরিয়াল দেখছেন— তাদের মেলা মেশার সময় কোথায়। স্থানীয় পৌরসভা থেকে ৫০০ টাকা করে বাৎসরিক অনুদান পেত পাঠাগার, ২/৩ বৎসর তাও বন্ধ। এখন কি সাহায্য প্রত্যাশা করেন? এই প্রশ্ন মাথা নামিয়ে বললেন, বই, আসবাব আর কিছু অর্থ। আর কিছু না। অনেক মহান খরচ হ্রাস করে ঐসব উদ্যোগীদের পিছনে এটুকু ব্যবস্থা করা যায় না কি?

উদ্যোগ ২ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের শিকড় সন্ধান করা ভাবা যত সহজ, কাজে করে দেখানো তত সহজ নয়। তথ্যের বৈচিত্রতা ও দুষ্প্রাপ্যতা নিরন্তর বাধা সৃষ্টি করে। অবশ্য অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখার মধ্যে আলাদা এক তৃপ্তি নিয়ে আসে। আইনজীবি ও সাংবাদিক শ্যামল কুমার দাসের দীর্ঘ ইচ্ছা ও উৎসাহের ফল হিসেবে গড়ে উঠেছে 'ইতিহাস পরিক্রমা'। ৪৫/২, দৈহাট্টা রোড, খাগড়া, বহরমপুর। শুধুমাত্র শ্রম, অর্থ নয়, বহু যত্নের ছাপ আছে তাঁর কাজে— ইতিহাস পরিক্রমার দপ্তরে গেলে তা অনুভূত হয়। শ্যামলবাবুর উদ্যোগ আরো সার্থক হোক।

উদ্যোগ ৩ ঃ

"একেবারে প্রথম থেকে বললে, ঘটনাটি দাঁড়ায় এইরকম— আমাদের দেশের (গ্রামের) বাড়ীতে দাদুর সংগৃহীত প্রচুর বই ছিল। তবে আজ থেকে প্রায় ১৬-১৭ বছর আগে গ্রামের এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে তার বেশির ভাগই পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়; আর যেগুলোও বা ভালো ছিল তাও তো অযত্নে, অবহেলায়, অগোছানো মানে রীতিমতন হ-য-ব-র-ল অবস্থায়। তারপর হঠাৎ-ই কেন জানি না মনে হল— এই সব হারানো বইগুলো যদি শহরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে বাঁধিয়ে রাখি— তাহলে ব্যাপারটা তো মন্দ নয়।" কথাগুলো বললেন মোহাম্মদ ফয়েজল বাকী। তরুণ যুবক। বেকারত্ব যার এখনো সম্বল।

সেই শুরু। তারপর পয়সা জমিয়ে বই সংগ্রহ। এখানেই শেষ নয়। নিজের বাড়িতে শুরু করেছেন 'খালেদ স্মৃতি পাঠাগার'। বাংলা ১৪০৯-র অগ্রহায়ণ মাস থেকে। অকপটে স্বীকার করলেন লাইব্রেরী গড়ার প্রেরণা পেয়েছেন বঙ্কিম লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী স্বপন দেবনাথের কাছ থেকে।

খালেদ স্মৃতি পাঠাগার (গোরাবাজার, বহরমপুর)-এর বর্তমান বই সংখ্যায় ৫৬৫ টি। সদস্যরা সকলেই প্রায় প্রতিবেশী। বাৎসরিক চাঁদা ২৫ টাকা।

পাঠাগার স্থাপনের এই সদিচ্ছা দীর্ঘজীবি হোক। যুব-সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত হোক মোহাম্মদ ফয়েজাল বাকীর প্রচেষ্টা।

ব্যর্থ হয়ে যাওয়া দুটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

নেতাজী পার্ক বেলডাঙ্গা বাসীর কাছে এক অত্যন্ত পরিচিত নাম। এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতিক চর্চার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা ও সমাজ কল্যানমূলক কাজের পরিধিকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিল এই সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। নানাবিধ উদ্যোগের সাথে চালু হয়েছিল নেতাজী লাইব্রেরী। বই পিপাসু মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ২০০০ সালের মারাত্মক বন্যার পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কর্মকর্তা হীরালাল বাবু জানালেন ২০০০ সালের সেপ্টম্বরের বন্যার প্রথম দিনও গ্রন্থাগার চালু ছিল। কিন্তু তারপর পুরো ঘরে জল জমে যায়। লাইব্রেরি ঘুরে দেখলাম আয়োজন ভালই ছিল। বই রাখার শেল্ফ, ইস্যু কাউন্টার সর্বত্রই আজ কালোঝুল আর ময়লা। নতুন করে শুরু করা যায় না? — আমার এ প্রশ্নে হীরালালবাবু দেখিয়েছিলেন টিভি রাখার ফাঁকা স্থান, আর বললেন— ''এই টিভি-ই সব শেষ করল।'' বই পাঠের অনাগ্রহে টিভির ভূমিকা মেনে নিয়েও বলি, নতুন নতুন উদ্যোগ নিচ্ছেন যেভাবে পাঠাগারের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণ করুন। অনেক উৎসাহী মুখকেই কাছে পেয়ে যাবেন।

চন্দ্রদ্বীপ লাইব্রেরি

'৯২-এ সমাজবিরোধী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল হরিহরপাড়া এলাকা। শহীদ হন ৭ জন পরবর্তীকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হরিহরপাড়ার চোঁয়াগ্রামে অবস্থিত হরিহরপাড়া থানা ঘোষিত হয় আদর্শ থানা হিসেবে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপে দৈনিক শিরণামে আসা এই থানা এখন কতটা 'আদর্শ' সে নিয়ে প্রশ্ন আছে। প্রধান সংগঠক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন পুলিশকর্তা সোমেন মিত্র। এলাকাবাসীর উদ্যোগে প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনার্থে গড়ে ওঠে শিশুদের খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি। সাথে শিশুদের জন্য পাঠাগার। ভারি সুন্দর পরিকাঠামো। অথচ আজ তা সম্পূর্ণ স্তব্ধ। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একটু উদ্যোগ নিলে এই ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান আবার বেঁচে উঠতে পারে।

একটি বিতর্ক ঃ কিছু প্রস্তাব

একবিংশ শতাব্দীর এই ডিজিটাল যুগে গল্পের বই পড়া আর কি সম্ভব? সনাতনী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি টিকে থাকবে? গ্রন্থাগারগুলো পাঠক শূন্যতায় ভুগছে কেন? সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই স্বল্পমাত্রায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন? — এ জাতীয় নানা মন্তব্য ও বিতর্ক আজ শোনা যাচ্ছে। ভোগবাদী সমাজ, বিশ্বায়ণের মারণ টান, পড়াশুনায় ইঁদুর-দৌড় প্রভৃতি নানা কারণ তুলে ধরা যায়। এই বিতর্ক নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপট এটা নয়। তবে একটা সুনির্দিষ্ট দিকে আলোকপাত করার জন্য বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলোর উত্থাপন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মানুষ আবার বইমুখী হচ্ছেন। আমাদের জেলাতেও একই সাক্ষ্য বহন করছে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে জানালেন যে বিগত চার বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখছেন গড়ে এ গ্রন্থাগারে জেলায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কর্মসংস্কৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠক সংখ্যা ও ইস্যু বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্নখাতে সরকারি অর্থের ব্যয়ের পরিমাণ ২,২৪,৭৪,৯০১ টাকা (২০০২-০৩) বছরে। এছাড়া বিশেষ পুস্তক ক্রয় সাহায্য, আর আই ডি এফ খাতে ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় উল্লেখযোগ্য। জেলায় ২৬ টি সি এল আই সি লাইব্রেরি গঠিত হয়েছে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ পোষিত গ্রন্থাগার নেই।

তবুও প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে। রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের রজতজয়ন্তী বর্ষ পূর্তির গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দরকার ফিরে দেখা। পুণর্মূল্যায়ণ প্রয়োজন। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর সহ নানা সরকারি বিভাগগুলোর সঙ্গে গণগ্রন্থাগারগুলির সার্থক সমন্বয় দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সম্পাদক রাধামাধব সরকার জানান, পরিকাঠামো উন্নয়ন যতই হোক, চাই শূন্যপদ পূরণ। গ্রন্থাগার কর্মীরা না থাকলে পরিষেবা দেবে কে? রাজ্যে ৫০০০ গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে ১০০০ পদ শূন্য। এছাড়া তিনি জোর দেন ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়কে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করার উপর ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের যৌথ স্রোতেই গ্রন্থাগারের মরা গাঙে জোয়ার আসবে।

উপসংহার

গ্রন্থাগার ছিল, আছে, থাকবে। গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে। যুগের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। এই মহানযজ্ঞে সকলকেই দরকার। 'আমাদের নানান মতে নানা দলে দলাদলি/ কেউবা ধর্মী বিধর্মী কেউ / কেউ বা চলি ডাইনে কেউ বাঁয়ে চলি/ কিন্তু যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি ... / আমরা জবাব দিই / সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি।'

গ্রন্থাগার সৃষ্টিশীল প্রতিষ্ঠান। সমাজ ও সংস্কৃতির মহান সৃষ্টি যজ্ঞে আমরা সামিল হই।

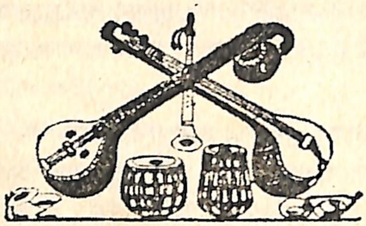
ঋণস্বীকার

১। মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার, ১৯৭৯ ও ২০০৪
২। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন —: ড. অতুল সুর
৩। এই বাংলার শতায়ু গ্রন্থাগার— অরুণ মুখোপাধ্যায়
৪। যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা — রণজিৎ ঘোষ
৫। বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ ১৭-৪-১৯৭১ ঃ তৃতীয় পর্ব/ সম্পাদনা সিরাজুল ইসলাম
৬। স্মরণিকা ঃ বঙ্গিমচন্দ্র লাইব্রেরীর ঃ শতবর্ষে প্রকাশিত
৭। Library Movement of India – Ed by R. Saha, BLA

কুহরণ সঙ্গীতালয়

(উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান)

স্থাপিত— ৮ নভেম্বর ১৯৯৮



৫২/১০/১, এ সি রোড ❋ নবনগর

পোঃ খাগড়া ❋ মুর্শিদাবাদ

পরিচালনায় - বিশ্বনাথ মণ্ডল

(প্রয়াত উস্তাদ আবু দাউদের ছাত্র)

সংগ্রহে রাখুন

জগন্নাথ বিশ্বাস-এর

কাব্যগ্রন্থ

সেই মুখ ২৫

নন্দিনী ৫০

গল্পগ্রন্থ

শীতের রোদ্দুর ৭০

পাওয়া যাবে

চালতিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ফোন ঃ ০৩৪৮২-২৫৩৬৬০

এছাড়া বিশ্বাস বুক স্টল (সমবায়িকার পার্শ্বে)।

রাজ্যের প্রথম বইমেলা মুর্শিদাবাদে

হরিলাল দাস

১৯৬৩ সালে রবীন্দ্রভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— "As directed by you I send in Bengali a message for your proposed Jangipur Grantha mela."

"আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে জঙ্গীপুর গ্রন্থমেলার ব্যবস্থা হয়েছে জেনে খুশী হয়েছি। পরিকল্পনাটি অভিনব এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ যাহা কিছু ব্যবহার করে তাই নিয়েই মেলা হয়। মানুষের মনের পুষ্টি জোগাতে বই-এর প্রয়োজন আছে কিন্তু তার জন্য সাধারণত মেলার ব্যবস্থা হয় না। জঙ্গীপুরবাসী এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে একটি সুন্দর অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছেন দেখে তাই ভারি আনন্দ পেয়েছি। তাঁদের এই চেষ্টা সর্বোতভাবে সফল হোক।" চিঠিটি আসে মেলা কমিটির সভাপতি মহাশয়ের দপ্তরে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি— "গত ৩রা মার্চ জঙ্গীপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্কে মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সমাবেশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠানের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্থির হয় যে আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেঞ্জি পার্কে



নলিনী বাগচীর জন্মভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ। স্বাধীনতা সংগ্রামী জিতেশ লাহিড়ী ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তি উপস্থিত ছিলেন। ছবি ঃ লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সপ্তাহব্যাপী এই গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্তকে সভাপতি ও শ্রীবরুণ রায়কে কর্মসচিব করিয়া মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া এক শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।''

লক্ষ্মণীয় এই কমিটি গঠনে মহকুমার সব প্রান্ত থেকে লোকজনকে সামিল করার চেষ্টা। তুলনীয়, এখন জেলা বইমেলা মানে একটা সংকুচিত অনুদার আত্মপ্রচার মূলক সরকারি মদতমত্ত বাৎসরিক অনুষ্ঠান। এমন করে কী জেলার গৌরব প্রসারিত হয়?

বিফলতাই নাকি সফলতার স্তম্ভ। এই কথা মনে রেখে, প্রথমে কিছু প্রাপ্ত চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিচ্ছি। বহরমপুর থেকে ১৯৬৩ সালের ১৫ মার্চ জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী মশাই লিখেছেন— ''আপনাদের উদ্যোগে যে জঙ্গীপুরে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এটা খুবই আনন্দের কথা। এই সাধু প্রচেষ্টায় আমাদের সকলেরই সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা কর্তব্য। দুঃখের বিষয় আমি আজ ২ বৎসর যাবত অসুস্থ। তার উপর ... যা জানতে চেয়েছেন সে সব তথ্যও আমার জানা নাই। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ী নলিনী বাগচী সম্বন্ধে কিছু জানি।'' প্রসঙ্গত জানাই, কাঞ্চনতলায় নলিনী বাগচীর জন্মভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা দিবসে জিতেশ লাহিড়ী ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই গ্রুপ ফটো আমরা সংগ্রহ করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করি।

আমাদের অনুরোধ লিপির উত্তরে লালদিঘি, বহরমপুর থেকে ২৯ মার্চ ১৯৬৩ তারিখে মনীশ ঘটক লিখেছেন— ''আমি ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ডবল প্লুরিসি রোগে শয্যাশায়ী। জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠবার ক্ষমতা নাই। ... যেতে পারলে অবশ্যই যাব। স্মারক গ্রন্থে প্রকাশের জন্য সময়োপযোগী কবিতা পাঠানোর চেষ্টা করছি। দুর্বল শরীরে মাথায় কিছু আসছে না।'' শেষ পর্যন্ত তিনি কবিতাও পাঠাতে পারেন নি। এখানে বলা দরকার, গ্রন্থমেলা স্মারকগ্রন্থ ছাপানো হয়েছিল শ্রীআর্ট প্রেস /৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে। মুদ্রাকর ছিলেন শ্রী হরিলাল গোস্বামী। রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতা যাতায়াতে কোনও দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা তখন ছিল না। ফলে প্রেসের জন্যে সব পাণ্ডুলিপি, ফটো, বিজ্ঞাপন এককালীন গুছিয়ে নিয়ে যেতে সময়ের বেশ টানাটানি পড়ে। তার উপর সে সময় কতক ভীরু পায়ে লোডশেডিং আসতে শুরু করেছে। মুদ্রণে অনেক ত্রুটি থাকার এই সব নানা কারণ মেনে নিতে হয়েছিল। এবং অনেক উপাদান তথ্য হাতে এলেও সময়াভাবে সেসব ছাপানো সম্ভব হয়নি। টাকার অভাবও ছিল।

প্রচুরখ্যাতি, নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিভূষণ, আশি বছর বয়স্ক যে মানুষটিকে কলিকাতা পৌরসংস্থা সম্প্রতি 'কলকাতা রত্ন' উপাধিতে সম্মানিত করলেন; যিনি ব্যক্ত করেছেন যে, জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে এই পুরস্কার আপন জনের থেকে পাওয়া স্বীকৃতি সেই তপন সিংহ এ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার হিলোড়া গ্রামের সুসন্তান বলে আমরা গর্ব করে থাকি। মেলা কমিটিকে শ্রীতপন সিংহ লিখেছিলেন ''... আগামী ১৯শে এপ্রিল (১৯৬৩) সাঁওতাল পরগণার গ্রাম পরিক্রমায় বেরুচ্ছি Location shooting-এর জন্য। প্রায় দিন দশেকের প্রোগ্রাম এবং সেই প্রোগ্রাম ৩/৪ মাস আগে থেকেই করতে হয়েছে। সুতরাং ... ইচ্ছে থাকলেও জঙ্গীপুর যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। ... আপনাদের প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আর কিভাবে আমার সহযোগিতা চান জানালে বাধিত হব।'' স্মারক গ্রন্থের গুণীজন পরিচিতি অধ্যায়ে তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছে।

ড. ত্রিগুণা সেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, ১৯৬৩ সালের ১৩ মার্চ লিখেছিলেন— ''আপনাদের এই পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত হইবে সে বিষয়ে আমার এতোটুকু সন্দেহ

নাই। আশান্বিত হইলাম এই জন্য যে, আমাদের দেশের চল্‌তি সংস্কৃতি-আন্দোলনের মোড় যদি আপনাদের প্রচেষ্টার ফলে ফিরে, যাহারা দেশকে ভালবাসেন, প্রত্যেকই সুখী হইবেন। ... দিল্লী থাকিতে হইবে। আপনাদের মেলায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না।''

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি জানিয়েও শারীরিক কারণে আসতে পারেন নি। রঘুনাথগঞ্জে তাঁর এক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে ওঠার ব্যবস্থা ছিল। বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ যাদের এখানে আনার চেষ্টা হয়েছিল তাঁরা সুন্দর যে সব চিঠি দিয়েছিলেন তা সযত্নে রাখা আছে। এপ্রিল মাসের গরম আর দূর মফস্বলে আসার তখন অনেক প্রতিবন্ধক ছিল। এখনকার দিনে কতখানি সম্ভব হতে পারে তাও ভাববার।

তখন দৈনিক বসুমতী পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর একান্ত সচিব রামেন্দু মুৎসুদ্দির চিঠি থেকে— ''আগামী এপ্রিলের গোড়ায় জঙ্গীপুর গ্রন্থমেলার 'সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র অনুবাদ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য দিবসে'র অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা প্রধান সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সময়াভাবে প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শ্রীমুখোপাধ্যায় আপনাদের স্মারকগ্রন্থের জন্যে 'সংবাদপত্র সাংবাদিকতা জনকল্যাণ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখতে সমর্থ হলেন না।'' বিবেকানন্দবাবু এসেছিলেন! মনে আছে তিনি জানা কথার মধ্যে চট্‌জলদি সংবাদ পরিবেশনের এক মজার ঘটনা শুনিয়েছিলেন। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা যাবার আগেই তাঁর শোকসংবাদ রচনা করে রাখা হয় এবং মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র তাতে কেবল সময়টা বসিয়ে নিয়ে ছেপে দেয়া হয়। এ যেন না-মরতেই মরণায়ন রচনা। উল্লেখ্য এবছর তাঁর জন্মশতবর্ষ।

রবীন্দ্রদিবসে যোগদেন ড. উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। তাঁর আলোচনা অনেকাংশেই আজ স্মরণ শিথিল। তখন যদি শব্দলিখন ফিতে-যন্ত্র থাকত! তবু সেই বক্তব্যে চিত্ত ভরে নি, মনে হয়েছিল 'হেথা নয় হেথা নয় ...'।

নাট্য দিবসে আসেন এ জেলার মানুষ নট-নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ের পিছনে তাঁর আস্তানায় গেছি। রঘুনাথগঞ্জ থেকে আসছি শুনে প্রথম সম্ভাষণে বলে উঠলেন ''তুই তো আমাড় দ্যাশের লোক, আয়, ব্যোস, দুট্যা মুনের কথা বুলি।'' সে কণ্ঠ আজও রণিত

হয় অবকাশক্ষণে।

তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন পথের পাঁচালি চলচ্চিত্রে হরিহর খ্যাত কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বল্পবাক, কিছুটা লাজুক তিনি; কেবল তাঁকে সশরীরে দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

'ইস্পাতের স্বাক্ষর' 'অ্যালবার্ট হল' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এসেছিলেন কথা সাহিত্য দিবসে। তিনি তাঁর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন সরস আলোচনায়। প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরীও এসেছিলেন। প্রফুল্ল গুপ্ত লিখছেন (৮ মার্চ'৬৩)— "বাজপেয়ীদা অত্যন্ত অসুস্থ বলেই জানি। তাঁর সম্মতিসূচক পত্র এর মধ্যে পেয়েছেন কি?" ১৯/১ টেমারলেন, কলকাতায় তিনি তখন থাকতেন। আমাদের স্মারকগ্রন্থে লিখেছেন বগলাদা— বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য, মানে বিধায়ক ভট্টাচার্য "আমার জীবনে এলেন ... মুর্শিদাবাদের গৌরব, বিখ্যাত কবি ও সাংবাদিক জগদানন্দ বাজপেয়ী। ওঁদের একটা থিয়েটার পার্টি ছিল— তার নাম বান্ধব সমিতি। সেখানে ওঁরা আমাকে টেনে নিলেন। জীবনে আবার নাটক তো এলোই— নাটকীয়তাও এল।" জানা যায় তিনি অভিনয়ও করতেন। তাঁর লেখা "সংস্কৃতির বিকার", যাতে লেখক, 'বিকৃত, বিপন্ন ও বিপর্যস্তপ্রায় সংস্কৃতির আশু সমুদ্ধারের আবেদন নিয়ে ছাত্র ও যুব সমাজের দ্বারস্থ।' উৎস ওই স্মারকগ্রন্থ।

"আজকের থিয়েটার ব্যবসায়িক থিয়েটার। মাসের একটা নির্দিষ্ট তারিখে আপনার টাকা আপনি পাবেনই। আগের থেকে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। হয়নি শুধু টাকার অঙ্কটার। নাটক লিখে বিশেষ করে পেশাদার মঞ্চের জন্য নাটক লিখে— যত বাহবা আর ফুলের মালা পাওয়া যায়, উপন্যাস লিখে কখনই তা পাওয়া যায় না। আবার উপন্যাস লিখে যে টাকা পাওয়া যায়— নাট্যকার তার সিকির সিকিও পান না। তাই বাংলাদেশের নাট্যকারকে নাটক লেখার পাশাপাশি আর একটা কিছু করতেই হবে। হয় অফিসে চাকরী, নয় সাংবাদিকতা, নয় কোন ব্যবসা, নইলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।" এই অনুভব বিধায়ক ভট্টাচার্যের ১৯৬৩ সালের গ্রন্থমেলা স্মারকগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। একচল্লিশ বছর পর আজ বাংলা থিয়েটার এবং নাট্যকার জীবনের কী দশা হয়েছে?

সাংবাদিক প্রফুল্ল গুপ্ত বেশ সহযোগিতা করেছিলেন। আপনাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আলোচনা চক্রে বিশেষ করে বিবেকানন্দ দিবসে যদি সম্ভব হয় এবং শরীর ভাল থাকে তাহলে যোগদান করার ইচ্ছা রইল। কারণ এ বছর স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ উৎসব, দেশের এবং জাতির রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ বিশেষ একটা তাৎপর্য এবং কথা নিয়ে এসেছে আমাদের সম্মুখে।" তিনি স্মারক গ্রন্থে লেখা দিয়েছিলেন 'জঙ্গীপুরের কথা'। মুর্শিদাবাদ সমাচার পত্রিকার জেলা সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়— "গ্রন্থমেলার মত একটা প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য নিশ্চয় করেন। স্মারকগ্রন্থের জন্যে একটা লেখা দিব।" শিরোনাম— 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে জঙ্গীপুর' মুদ্রিত হয়েছে।

পণ্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রম থেকে নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন— "ফটো পাঠালাম ৪/৫ বছর আগে তোলা ছবি। এই সঙ্গে আমার সামান্য জীবনের মোটামুটি ঘটনাগুলো লিখে পাঠালাম। নিজের কথা সাত কাহন ক'রে বলতে প্রবৃত্তি হয় না। হয় এটাই ছেপে দিয়ো, নয় এর থেকে তোমরা কিছু একটা গড়ে নিয়ো। আমার স্কুল-কলেজের বিদ্যা আদৌ নাই। তাই, ও সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব হলো না। ... আমি জঙ্গিপুর অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করছি। খুব সম্ভব, শনিবার নাগাদ পাঠাতে পারবো। সেই সঙ্গে আমার একটা হাসির গানও পাঠিয়ে দেবো।" ১৯৬৩ সালে এই চিঠি যখন লিখছেন তখন তাঁর বয়স

চুয়াত্তর বছর। নির্ভুল পরিচ্ছন্ন মুক্তাক্ষর হাতের লেখা।

"আমার কাছে যে লেখা চেয়েছ, সে সম্বন্ধে জানিয়েছ 'মহকুমার প্রকৃতি রং-না-চড়ানো ইতিহাস (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কার্যকলাপ, ১৯২১, ১৯৩০-৩১, ১৯৪২ ও তার পরবর্তী আন্দোলন) স্মারকগ্রন্থে প্রকাশের কথা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও অনুশীলন দল সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু যুগান্তর দলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার যোগাযোগ ছিল না এবং ১৯২১, ১৯৩০-৩১, ১৯৪২ ও পরবর্তী আন্দোলন সম্বন্ধেও আমি সম্পর্কহীন। ১৯২০ সালের শেষভাগ থেকেই আমি কার্যব্যপদেশে কলকাতায় চ'লে আসি এবং তারপর নিমতিতায় তথা জঙ্গিপুর অঞ্চলে খুব কমই গেছি।" নলিনীকান্তের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেবার উদ্দেশ্য গ্রন্থমেলা স্মারকগ্রন্থের বৈচিত্র্য ও পরিধিটা কেমন ছিল, সেটা রচনায় আমাদের কতখানি নিষ্ঠা আর পরিশ্রম ছিল, তার কিছু পরিচয় তুলে ধরা।

"অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে যাঁদের নাম ভবিষ্যতের এদেশীয় শিল্প ইতিহাসে পুরোভাগে লেখা থাকবে তাঁদের মধ্যে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম নিশ্চয় উল্লিখিত থাকবে। মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা গ্রাম থেকে ঘটনার বিবর্তনে তিনি কলিকাতায় এসে অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিল্পে শিক্ষালাভ করে আপন শিল্প প্রতিভায় অল্প বয়সেই যশোলাভ করেছিলেন। ... কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট এর সম্পদের দিনে তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করেছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর যাবৎ এবং সেখানে তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল।" গ্রন্থমেলা স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত

জঙ্গীপুর গ্রন্থমেলা—১৯৬৩

সভাপতি—অমলকৃষ্ণ গুপ্ত
সহ-সভাপতি—গঙ্গাধর সিংহ রায়
কালীপদ ঘোষ
অমিত মুখার্জী

কর্মসচিব—বরুণ রায়
সহ-কর্মসচিব সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়
হরিলাল দাস
কোষাধ্যক্ষ কিরীটি চৌধুরী

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ
রেল ষ্টেশন—জঙ্গীপুর রোড
(ই আর)

কার্যাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২১শে এপ্রিল হইতে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত জঙ্গীপুরে সপ্তাহব্যাপী এক গ্রন্থমেলা হইবে। এই সম্পর্কে আপনাকে পূর্বে একটি পত্র দেওয়া হইয়াছিল। সংবাদপত্রেও জঙ্গীপুর গ্রন্থমেলার খবর দেখিয়া থাকিবেন।

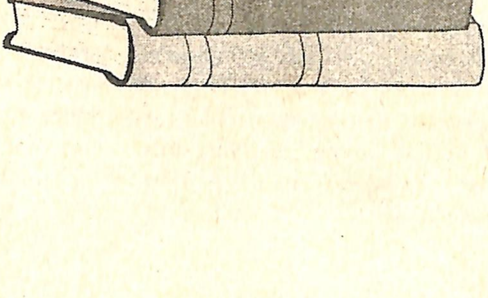
এই গ্রন্থমেলা উপলক্ষে জঙ্গীপুরে বহু বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক ও গুণীজনের সমাবেশ হইবে। বিভিন্ন দিনে আমরা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের বই প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে চাই। বাংলা বই সম্পর্কে যাহাতে লোকের আগ্রহ বাড়ে এবং কেনার অভ্যাস যাহাতে বাড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই গ্রন্থমেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজেই ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা আপনাদের সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি।

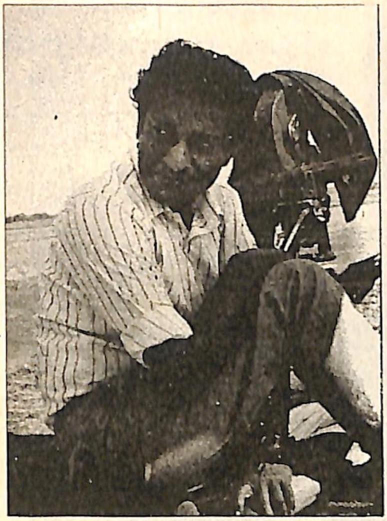
শিল্পীভাস্কর চিন্তামণি করের লেখা থেকে এই উদ্ধৃতি গুলো। "ক্ষিতীন্দ্রনাথকে এ দুর্ভাগা দেশ থেকে কোন যোগ্য সম্মান বা অভিনন্দন দেওয়া হয়নি। কালে এদেশের শিল্প ঐতিহাসিকগণ এ যুগের শিল্প ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুযোগ্য সম্মান দিয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথের নাম কৃতিশিল্পীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করবেন নিশ্চয়ই।" এই আশা সত্যই কী আজ ফলবতী?

সপ্তাহব্যাপী বই মেলাতে প্রতি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। মহকুমার নানা নাট্যদলের ও নিমতিতার থিয়েটার আর লোক সংগীতের আসর হয়েছে। এই মহকুমার দুই প্রখ্যাত লোকশিল্পী যাঁদের খ্যাতি জেলা ও রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আলকাপ সম্রাট ঝাকসু ওরফে ধনঞ্জয় মণ্ডল এবং ডাকসাইটে লোককবি গুমাণি দেওয়ান সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন। তাঁদের দু'জনেরই সংক্ষিপ্ত জীবন কথা স্মারকগ্রন্থে ছাপা হয়েছে। পালা কীর্তন ও অন্যান্য সান্ধ্য আসরে উপস্থিত থাকতেন কবি বিষ্ণু সরস্বতী। কবি গানে গুমানি দেওয়ানের সঙ্গে পাল্লাদার ছিলেন লম্বোদর চক্রবর্তী। আলকাপ গানে ঝাকসু ওস্তাদের বিপরীতে কোন দলের গান ছিল তা মনে করতে পারছি নে।

মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর সমীপে যেসব লিখিত ও মুদ্রিত তথ্য উপস্থিত করলাম তা সমগ্রের অংশমাত্র। ১৩৭০/১৯৬৩ সনে সেই বইমেলা অনেকখানি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল বহু মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং তন্নিষ্ঠ অংশগ্রহণের কারণে। মহকুমাবাসীর ব্যাপক সাড়া ছিল বলেই এই প্রথম উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাস বড় অনুদার। মঞ্চাসীন বক্তাদের ব্যক্তিদের নামগুলো সংরক্ষণ করে ইতিহাস; কিন্তু সমস্ত মঞ্চনির্মাণকারী কর্মীদের নাম অজানাই থেকে যায়। আমি কিছুই ফেলে দিতে পারি নি। আরও অনেক উল্লেখযোগ্য নাম লেখা সম্ভব হল না। তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কাতর ত্রুটি স্বীকার করছি।

শেষ কথা বলে কিছু নেই। কেবল বিনীত অনুরোধ, জেলার কথা নিয়ে চর্চাকারী গবেষকগণ এই প্রবন্ধ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারবেন এই বইমেলা সবদিক থেকেই প্রথম।





'জলসা ঘর'-এর বাড়ি 'নিমতিতা ভবন' একাল সেকাল

জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

হাতি শালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কাছারি-বাড়ি, কর্মচারী, পেয়াদা বরকন্দাজ, নহবতখানা, সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যান, অতিথিশালা, দোল দুর্গোৎসব, সাধুসন্ত আপ্যায়ন, কোলকাতার যাত্রা-থিয়েটার, বারো মাসে তেরো পার্বণে আনন্দ উৎসবে, আত্মীয়-পরিজন, অতিথি-অভ্যাগতে, একদিন যে প্রাসাদ সর্বদা গমগম করত,- সেই নিমতিতা জমিদার বাড়ি,' নিমতিতা ভবনটি' আজ দুঃসহ নিস্তব্ধতার মধ্যে কালের সাক্ষী হয়ে স্মৃতিভারে পড়ে আছে, সর্বাঙ্গে ক্ষত আর ফাটল নিয়ে, নিশ্চিত ধ্বংসের ভবিতব্য সম্বল করে। 'সেই রামের সঙ্গে সেই অযোধ্যাও' হারিয়ে গেছে কবে। কালের গ্রাসে সেদিনের বর্তমান, সবই আজ অতীতের ইতিহাস মাত্র।

দেড় শতাধিক বছর আগে জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী এবং তার খুড়তুতো ভাই দ্বারকানাথ চৌধুরীর ইচ্ছা, পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে এই প্রাসাদটি তৈরি হয়। আজ অতি-বিশাল, ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদটির পরিচয়, লোকমুখে কখনও 'ভাঙা জমিদার-বাড়ি', কখনও 'জলসাঘরের বাড়ি', কখনও 'সত্যজিতের শূটিং স্পট', অতি কদাচিৎ 'নিমতিতা ভবন'— যে রাজপ্রাসাদটি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলো, পাঁচ-উঠোন ও দেড়শত কক্ষ সমন্বিত। পৌত্র রাধাগোবিন্দ চৌধুরীর অকাল প্রয়াণের পর গৌরসুন্দরের বংশ লোপ পায়। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই দু'জনকে ঘিরেই শুরু হয় নিমতিতার সুবর্ণযুগ। শিল্প-সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধূলা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অখ্যাত পল্লীপ্রান্তটি জেলা তথা রাজ্যস্তরেও শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে। বিত্ত-বৈভবে নয়, বিত্ত-মাধুর্যই পরিবারটিকে উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে ভালোবেসে, আপন বাসভূমিকে সর্বতোভাবে সুন্দর-শোভন এবং সমৃদ্ধ করে তুলতে।

পল্লীপ্রকৃতির অপার ও অপরূপ সৌন্দর্যসম্ভার ও শিক্ষা-সংস্কৃতি-চর্চার বিশিষ্ট আকর্ষণে খ্যাতনামা নট-নাট্যকার, নাট্যসমালোচক এবং নানা ক্ষেত্রের নানা গুণিজন বারবার ছুটে এসেছেন



নাট্যপ্রাণ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

জমিদারবাবুদের আমন্ত্রণে। এসেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মন্মথ মোহন বসু, ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মতো দিকপালেরা। শুভাগমন ঘটেছে কাজী নজরুল ইসলাম, অন্নদাশংকর রায়, লীলা রায়, দাদাঠাকুর, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, পুরাশৈলী বিশেষজ্ঞ ডেভিড ম্যাকাচ্চন, হেমন্ত বসু প্রমুখ কতো বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণি ব্যক্তি। ১৯৬৯ সালে ইন্দো-পাক্ চুক্তির সময় এই বাড়িতেই কমিশনের বৈঠক বসে।

নাট্যপ্রাণ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত নিমতিতা 'হিন্দু থিয়েটারের' রঙ্গমঞ্চটি ছিলো বিজলীবাতি সমৃদ্ধ ও ত্রিতল-উচ্চতা-বিশিষ্ট। সঙ্গে ছিল 'ব্যালকনি' সমন্বিত এক সুরম্য প্রেক্ষাগৃহ। এই মঞ্চে একদিন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি নিমতিতার নাট্যগোষ্ঠী অভিনীত 'আলমগীর' নাটকে অতিথি অভিনেতারূপে সানন্দে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাট্যপ্রাণ মহেন্দ্রনারায়ণের আকস্মিক প্রয়াণের পর কোলকাতার 'নাচঘর' পত্রিকা লিখেছিল— "বাংলাদেশে মহেন্দ্রনারায়ণের মতো নাট্যপ্রিয় ও নাট্যশালার পরমবন্ধু কেউ ছিলো না। তিনি সহায় না হলে শিশিরকুমার ভাদুড়ির পক্ষে 'নাট্যমন্দির' স্থাপন, কোনও দিনও সম্ভব হতো না। ...।" (ফাল্গুন সংখ্যা ১৩৩২)।

অথ জলসাঘর কথা

'নিমতিতা ভবনে' বা জমিদার বাড়িতে শেষ ও সবিশেষ সম্মানিত অতিথি— বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'জলসাঘর' চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ প্রায় সম্পূর্ণটাই ১৯৫৭ সালে নিমতিতা ভবনে, নিমতিতার মাটিতেই তোলা হয়। এই প্রসঙ্গে চিত্র গ্রহণের স্থান নির্বাচন— তার প্রেক্ষাপট ও বাড়তি কিছু তথ্য আমরা জেনেছি সুখ্যাত সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারের আত্মজীবনী মূলক 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' নামক গ্রন্থে। তা নিম্নরূপ—

"চিত্রগ্রহণের স্থান নির্বাচনের জন্য সত্যজিৎবাবু প্রথমে গেলেন লালগোলার রাজবাড়িটি দেখতে। কিন্তু পছন্দ না হওয়ায় দেখতে যান কাঞ্চনতলার জমিদারবাড়ি। অবশেষে নিমতিতার জমিদার বাড়ি দেখেই পছন্দ হলো তাঁর। বাড়িটি গঙ্গার তীরে— পছন্দ হওয়ার অন্যতম কারণ এই। শোনা যায়— কোলকাতায় ফিরে গিয়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই নিমতিতা জমিদার বাড়ির কথা বলতেই তারাশংকর বিস্মিত হয়ে বলেন, নিমতিতার জমিদার বড়ি নিয়েই তো গল্প দুটি (রায়বাড়ি ও জলসাঘর) লেখা। তাঁর জলসাঘর এই বাড়িরই জলসাঘর।"

এবার শোনা যাক সেই নিমতিতা জমিদার বাড়ির নিজস্ব জলসাঘর সম্পর্কে— "*গৌরসুন্দর চৌধুরীর কনিষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ ওরফে কালীবাবু ছিলেন অপরূপ সুন্দর, কন্দর্পকান্তি পুরুষ। চালচলন, আচার ব্যবহার, বেশভূষা ও বিলাস-বৈচিত্র্যে জমিদার সুলভ আভিজাত্যের আধারস্বরূপ ছিলেন তিনি ...।*"

নলিনীকান্ত আরও লিখেছেন— "*এই জমিদার ভবনের দোতলায় দুর্গামন্দিরের বিপরীতে একতলার কাছারির কক্ষের ঠিক উপরেই ছিলো মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত একটি প্রকোষ্ঠ। আমরা বলতাম, 'পেইন্টিং হল'। চারিদিকের দেওয়াল নয়নাভিরাম রঙে রঞ্জিত ও সুরুচি সম্মত চিত্রাংকনে সুশোভিত। পারস্যদেশীয় গালিচা বিছানো কক্ষতল, বেলোয়ারি কাচের একাধিক মূল্যবান ঝাড়লণ্ঠন। খানদানি আভিজাত্যপূর্ণ বাতাবরণ। ... এই হলঘরটিই তারাশংকরের 'জলসাঘর'। কাহিনীটি কাল্পনিক হলেও, নিমতিতার জমিদার বাড়ির মূল মাটির তলায় প্রচ্ছন্ন রেখে, তারাশংকর তাঁর 'রায়বাড়ি' ও 'জলসাঘরের' শাখা প্রশাখা সমন্বিত রূপসৃষ্টি করেছেন।*"



সেদিনের স্মৃতি চারণায় সপ্রতিভ সবিতা চৌধুরী

প্রায় মাসখানেক ধরে জলসাঘরের সুটিং-এর কাজ চলে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি নাগাদ শূটিং-এর সাইট নির্বাচন করেন। চিত্রগ্রহণ শুরু হয় ১৯৫৭-র এপ্রিল থেকে। ১৯৫৯ সালের নভেম্বরে শুরু হয় দেবীর চিত্রগ্রহণ। ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে যথাক্রমে 'দেবী' ও 'তিনকন্যা'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়; চিত্রগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিমতিতা ও নিমতিতা ভবনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয় কলাকুশলীদের। ছবি তিনখানিতে অভিনয়ের জন্য আগত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস, তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, গঙ্গাপদ বসু, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর ও অপর্ণা সেন দিনের পর দিন, তাঁদের পরিচালকও অন্যান্যদের সঙ্গে নিমতিতা ভবনেই বাস করতেন। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায় ও পুত্র সন্দীপ রায়ও এসেছিলেন। প্রধান ফটোগ্রাফাররা ছিলেন সুব্রত মিত্র, সহকারী কিশোর সৌমেন্দু রায় ও শিল্প নির্দেশক ছিলেন বংশী গুপ্ত।

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, সানন্দে ও নিঃশর্তভাবে শুধুমাত্র বাড়িটি ব্যবহার করতে দেওয়াই নয়, নবাগত অতিথিদের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং দলটির কাজকর্মের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেও যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখতেন জমিদার পরিবারের সদস্যরা। 'জলসাঘরের' চিত্রগ্রহণ সূত্রে পরিচালক সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত— পরিবর্তিত

পরিস্থিতিতেও উভয় পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সেই সৌজন্য ও মধুর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে আজও। শূটিং পর্বে অভিনেতা-অভিনেত্রী, সহায়ক-শিল্পী কুশলী, হাতি-ঘোড়া, রথ, নদীচর, কাশবন, মাটির দেবী প্রতিমা, ফোয়ারা, হাজারো রকমের টুকিটাকি, কৌতূহলী দর্শক সব মিলিয়ে নিমতিতা জুড়ে সে সময়টায় কী এক বিরাট আলোড়ন, হৈ হৈ এলাহি ব্যাপার! এই সময়ের কিছু ঘটনা জানা যায়, দ্বারকানাথ চৌধুরীর নাতবৌ ৮২ বছরের বৃদ্ধা বিধবা সবিতা চৌধুরীর কাছে। তিনি স্মৃতি চারণে জানান— সুটিং চলার পর্বে ছবি বিশ্বাসের 'ঘোড়াকে আজর করার দৃশ্যটি'ই ৩ বার নেওয়ার পর 'ও কে' হয়। এই সময় ছবি বিশ্বাস কপালের ঘাম মুছছেন দেখে দলেরই একজন জিজ্ঞেস করেন— কষ্ট হচ্ছে কিনা। ছবি বিশ্বাস রসিকতা করে উত্তর দিলেন— ''মাথা-কপালের ঘাম ফেলেই তো আমাদের রোজগার।'

এই বাড়ির মন্দিরের আদলেই দেবীর সেট তৈরি হয়েছিলো। সুটিং এর প্রয়োজনে শর্মিলা ঠাকুরের জন্য কোলকাতা থেকে ইমিটেশন গহনাপত্র আনা হয়েছিল। কিন্তু 'কানপাশা' (সোনার একপ্রকার গয়না) আনতে ভুল হওয়ায়, অনুরোধক্রমে এই বাড়ির সিন্দুক থেকেই প্রাচীন কালের ওই গহনাটি শর্মিলাকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। ইমিটেশন নয় তো, অভিনেত্রীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, তাই সদাসতর্ক ছিলেন শর্মিলা। অভিনয়ের ফাঁকে মাঝে মাঝেই শর্মিলা কানে হাত দিয়ে দেখে নিতেন সেটা যথাস্থানে আছে তো, বললেন অশীতিপর বার্দ্ধক্য নিয়েই সে দিনের স্মৃতিতে সপ্রতিভ সবিতা চৌধুরী। কতদিন আগের কথা! তবু আমাদের মতো বর্ষীয়ান ও প্রত্যক্ষদর্শী নিমতিতাবাসীর স্মৃতিতে সবই অম্লান আজও। পরিচালক, কুশলী, কলাকুশীলবদের অনেকেই আজ লোকান্তরিত। তবু সকলের স্পর্শ ও সান্নিধ্য স্মৃতিকে বুকে করে আজও দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসপ্রায় নিমতিতা ভবনের বহির্বাটী। সত্যজিৎ-অনুষঙ্গে নিমতিতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নিমতিতা ভবনটি আজ যেন তীর্থের নবমহিমায় অভিস্নাত— অধিষ্ঠিত। তবু সেদিনের জলসাঘর, তথা সমগ্র রাজপ্রাসাদ ঘিরে আছে শুধু ভাঙনের গান।

'শতাব্দীকালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ও স্মৃতির স্বর্ণভাণ্ডার 'নিমতিতা ভবনকে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবন রূপে (Heritage Building) গ্রহণ ক'রে, তার সংস্কার এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক', সরকারের কাছে এই দাবি ও প্রত্যাশা আমাদের, অসংগত কি?

পরিস্থিতিতেও উভয় পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সেই সৌজন্য ও মধুর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে আজও। শূটিং পর্বে অভিনেতা-অভিনেত্রী, সহায়ক-শিল্পী কুশলী, হাতি-ঘোড়া, রথ, নদীচর, কাশবন, মাটির দেবী প্রতিমা, ফোয়ারা, হাজারো রকমের টুকিটাকি, কৌতূহলী দর্শক সব মিলিয়ে নিমতিতা জুড়ে সে সময়টায় কী এক বিরাট আলোড়ন, হৈ হৈ এলাহি ব্যাপার! এই সময়ের কিছু ঘটনা জানা যায়, দ্বারকানাথ চৌধুরীর নাতবৌ ৮২ বছরের বৃদ্ধা বিধবা সবিতা চৌধুরীর কাছে। তিনি স্মৃতি চারণে জানান— সুটিং চলার পর্বে ছবি বিশ্বাসের 'ঘোড়াকে আজর করার দৃশ্যটি'ই ৩ বার নেওয়ার পর 'ও কে' হয়। এই সময় ছবি বিশ্বাস কপালের ঘাম মুছছেন দেখে দলেরই একজন জিজ্ঞেস করেন— কষ্ট হচ্ছে কিনা। ছবি বিশ্বাস রসিকতা করে উত্তর দিলেন— ''মাথা-কপালের ঘাম ফেলেই তো আমাদের রোজগার।'

এই বাড়ির মন্দিরের আদলেই দেবীর সেট তৈরি হয়েছিলো। সুটিং এর প্রয়োজনে শর্মিলা ঠাকুরের জন্য কোলকাতা থেকে ইমিটেশন গহনাপত্র আনা হয়েছিল। কিন্তু 'কানপাশা' (সোনার একপ্রকার গয়না) আনতে ভুল হওয়ায়, অনুরোধক্রমে এই বাড়ির সিন্দুক থেকেই প্রাচীন কালের ওই গহনাটি শর্মিলাকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। ইমিটেশন নয় তো, অভিনেত্রীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, তাই সদাসতর্ক ছিলেন শর্মিলা। অভিনয়ের ফাঁকে মাঝে মাঝেই শর্মিলা কানে হাত দিয়ে দেখে নিতেন সেটা যথাস্থানে আছে তো, বললেন অশীতিপর বার্দ্ধক্য নিয়েই সে দিনের স্মৃতিতে সপ্রতিভ সবিতা চৌধুরী। কতদিন আগের কথা! তবু আমাদের মতো বর্ষীয়ান ও প্রত্যক্ষদর্শী নিমতিতাবাসীর স্মৃতিতে সবই অম্লান আজও। পরিচালক, কুশলী, কলাকুশীলবদের অনেকেই আজ লোকান্তরিত। তবু সকলের স্পর্শ ও সান্নিধ্য স্মৃতিকে বুকে করে আজও দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসপ্রায় নিমতিতা ভবনের বহির্বাটী। সত্যজিৎ-অনুষঙ্গে নিমতিতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নিমতিতা ভবনটি আজ যেন তীর্থের নবমহিমায় অভিস্নাত— অধিষ্ঠিত। তবু সেদিনের জলসাঘর, তথা সমগ্র রাজপ্রাসাদ ঘিরে আছে শুধু ভাঙনের গান।

'শতাব্দীকালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ও স্মৃতির স্বর্ণভাণ্ডার 'নিমতিতা ভবনকে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবন রূপে (Heritage Building) গ্রহণ ক'রে, তার সংস্কার এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক', সরকারের কাছে এই দাবি ও প্রত্যাশা আমাদের, অসংগত কি?

F-30

F-31





"দেখাইয়া দিব, চিনাইয়া দিব সব লোভী রাক্ষসে
বেপরোয়া মার মারিতে বলিব যাহারা রক্ত শোষে।"

— নজরুল ইসলাম

নিউ মিতালী সিনেমা

বেলডাঙ্গা ❑ মুর্শিদাবাদ

"...ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। ... চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য, নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত ও রাজকার্য মুসলমানের আমলে ইহার কোনটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কর্মের সাগর

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্রব্যমূল্য বেতন ও মজুরীর চিত্র *

দেবাশিস সাহা

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাজারদর ও দ্রব্যমূল্যের আলোচনা এটি নয়। শুধু এই সংকলনে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইতিহাসের বিভিন্নকাল পর্বকে যেভাবে স্পর্শ করে যাওয়া হয়েছে তাতে অধিকাংশ পাঠকের কখনও কখনও কৌতূহল হতে পারে যে কত ছিল সে সময়ের দৈনিক মজুরী? নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কেমন ছিল? গবেষকদের প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে এখানে তা সংকলন করা হয়েছে মাত্র।

১৭০০-১৯০০কে চারটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে— ১ম পর্বে (১৭০০-১৮৩৭), ২য় পর্ব (১৭৩৭-৬৯) ৩য় পর্ব (১৭৩৯-১৮০০) এবং ১৮০০-১৯০০।

১ম পর্ব অর্থাৎ (১৭০০-৩৭) সাল পর্যন্ত সময়ের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট লিখছেন যে, "আর্থিক অবস্থা সহজ, ব্যয় সীমিত, দেশ স্বাধীন, রাজ্য দুশ্চিন্তা ও ব্যয়মুক্ত। কৃষি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে অধিবাসীরা শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করে।" হ্যারি ভেরেলস্ট লিখেছেন যে, ওই যুগে বাণিজ্য বিস্তৃত, সমৃদ্ধ ও মুক্ত ছিল। নবাবরা আন্তর্বাণিজ্য শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করতেন। কোনও বিশেষ বণিক বা গোষ্ঠি একচেটিয়া বা জবরদস্তি বাণিজ্য করার সুযোগ পেত না। তবে নবাবরা রাজস্বের বিনিময়ে কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে বাণিজ্যাধিকার বিশেষ ব্যক্তিকে দান করতেন। লবণ, সুপারি, তামাক, আফিম, চুন প্রভৃতি পণ্যে বিশেষ বাণিজ্য-অধিকার ছিল।

এই সময়ে আভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্য কম ছিল। দ্রব্যমূল্য কম থাকার একটি কারণ হলো বাজারে টাকার জোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম। অর্থনীতির একটি মূলসূত্র হলো লোকসংখ্যা, আর্থিক কাজকর্ম, বাণিজ্যের পরিমান ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে বাজারে মুদ্রার যোগান। এ সময়ে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পরিমানও অবস্থা যথেষ্ট ভালো ছিল। এগুলি পরিচালনার জন্য যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন তা বাজারে সরবরাহ ছিল না। এর অর্থনৈতিক কারণ প্রধানত দুটি— প্রথমত, ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক কোটি রৌপ্য মুদ্রা সিক্কা রাজস্ব হিসাবে দিল্লীতে পাঠানো হতো। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদকুলী তাঁর সঞ্চিত টাকার মণিমুক্তো কিনে গোপনস্থানে রেখে দিতেন। মুর্শিদকুলীর আমলে জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিলো। মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা ছিল এই যুগের বিশাল বাজার। এখানে পাইকারি দরে শস্য, তেল, ঘি প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রি হতো। মুর্শিদকুলী মুর্শিদাবাদের বাজারদর ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের প্রতি

---

* কোনও মৌলিক রচনা নয়। একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন মাত্র।

লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তার কর্মচারীদের দিয়ে মূল্য তালিকা প্রস্তুত করে বাজার মূল্যের সঙ্গে মেলাতেন। ওজন ও দামে গরিব খরিদ্দারকে কোনও দোকানদার ঠকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গাধার পিঠে চাপিয়ে ঠকদের সারা শহরে ঘোরানো হতো।

তৎকালীন সময় 'বিরাশি ওজন' সরকারিভাবে স্বীকৃত ওজন। কিন্তু উৎপাদক ও গরিব খরিদ্দারদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সেই ওজন মানতেন না ফলে সারা দেশে একই ওজন ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। খুচরো কেনাবেচার ক্ষেত্রে কড়ি ব্যবহার হতো।

মুর্শিদকুলীর সময়ে এক টাকায় চার-পাঁচ মণ মোটা চাল পাওয়া যেত। এই সময় দিন মজুরের দৈনিক আয় ছিল এক পণ বারোগোণ্ডা কড়ি। দাম সস্তা থাকায় একজন লোক এক টাকা ব্যয় করে সারা মাস কালিয়া পোলাও খেত। গরিবেরা স্বস্তিতে ছিলো। খাদ্যশস্য ছাড়া সুতীবস্ত্র ও রেশমবস্ত্রের দাম খুব সস্তা ছিলো। ভারত ও এশিয়ার বাজারে তা সরবরাহ করা হতো। বাংলার চিনি জাভার চিনির চেয়ে কম দামে ভারতের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ হতো।

দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৭৩৭-৬৯ সাল পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম চড়া ছিলো। কার্পাস, নীল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে প্রায় চারগুণ। বস্ত্রের দাম বেড়েছিল ৩০ শতাংশ চাল টাকায় চার-পাঁচ মণ থেকে দাঁড়ালো টাকায় এক মণ তিরিশ সের, তেল ১টাকা মণ, ময়দা ১ টাকা মণ, চিনি ১৬ টাকা মণ, লবণ ১ টাকা মণ। জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে কর্মচারীদের মজুরীও বেড়েছিল।

এই সময়ে দিনমজুরের আয় ছিল দৈনিক ২ পন ১২ গণ্ডা, শ্রমিক বা কুলী মাসিক ২ টাকা, মাঝির মাসিক ৩ টাকা পিওন ও দারোয়ানে মাসিক ২ টাকা, মহিলা শ্রমিক ১ টাকা, রাজমিস্ত্রি ৩ টাকা, রাধুনি ৫ টাকা, দাসী ৫ টাকা হলেও তেমনভাবে শিল্পী ও কারিগরদের বেতন বাড়েনি। ১৭৪২-৫১ সাল পর্যন্ত বাংলায় চলেছিল মারাঠা বর্গি আক্রমন। ফলে কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। খাদ্যশস্যের অভাব ও মজুরী বৃদ্ধি ঘটে। বাঙালী কবি গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরানে মারাঠা আক্রমনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তাতে জানা যায় এ আক্রমন প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কুফল এনেছিল। এর পরপর-ই '৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রবল বৃষ্টি বন্যার আকার ধারণ করে। দেশের নিচু অঞ্চল ডুবে যায়, শস্য হানি ঘটে। দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এই সময়ে বাজারে টাকার যোগান বেড়েছিল ফলে আর্থিক জীবনের উন্নত হয়ে ছিলো। দেশে বেকারত্ব ছিলো না। ১৭৫৭ সালে ফোর্ট উইলিয়াম নির্মানে প্রচুর লোক কাজ পায়। কোম্পানী নেগ্রাইতে শ্রমিক পাঠাতে চাইলে তারা রাজী হয়নি। রাজমিস্ত্রি ও কুলী যেতে রাজী হলেও তারা মজুরী দ্বিগুন ও তার সঙ্গে চাল ডাল ঘি লবন ভাতা হিসেবে চেয়েছিল।

এই পর্বের শেষ সময়ে (১৭৬৮-৬৯) প্রচণ্ড খরায় শস্যহানি ঘটে। তার উপর কোম্পানী দেওয়ান রেজাখাঁর জোরকরে কর আদায় দেশে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। একটি সমকালীন ছড়ায় ওই সময়ের অবস্থার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়ঃ

নদ নদী খাল বিল শুকাইল
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে
দেশ ছরখার হলো রেজা খাঁর তরে
এক চেটে ব্যবসা দাম খরতর
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর॥

শেষ পর্বে (১৭৬৯-১৮০০) বাংলার বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমাগত

বাড়তে থাকে। এই সময় এক টাকায় চাল ১৬ সের, এক মন লবন ২.৫০ থেকে ৩ টাকা এবং গরুর দাম ৫ টাকা। জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে মজুরী ও বেতনও বাড়তে থাকে। জেলা কালেক্টরীতে মাসের বেতন হিসেবে নায়েব ১০০ টাকা, কেরানী ১০ টাকা, পিওন ৪ টাকা , দপ্তরী ৩.৫০ টাকা পেতেন। মাসিক আয় হিসেবে এই সময়ে তাঁতী ২.৫০ থেকে ৭.৫০ টাকা,সুতো কাটনি ১ টাকা ৬ আনা, ধোপা ৪ টাকা ৬ আনা, দরজী ৩ টাকা ৬ আনা, নাপিত ৫.৫০ টাকা,রাধুনী ৮-১৫ টাকা রোজকার করতো।

এই সময়ে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুস এক টাকায় প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কিনে জীবন ধারণ করতে পারতেন।

কোম্পানি তার রাজনৈতীক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁতীদের দিয়ে অল্প পারিশ্রমিকে প্রয়োজনীয় রপ্তানী বস্ত্র বানিয়ে নিতো। তাঁতীদের পারিশ্রমিক থেকে একাংশ গোমস্তারা অবৈধভাব আত্মসাৎ করতো। লবন শ্রমিক মলঙ্গিদের মজুরী আগের তুলনায় একদম বাড়ানো হত না।

পাঠকের সুবিধার্থে জিনিসপত্রের দ্রব্যমূল্য, বেতন ও মজুরী পর্ব অনুযায়ী দেওয়া হোল—

প্রথম পর্বের দ্রব্যমূল্য (১৭০১-৩৭)

	জিনিস	পরিমাণ		মূল্য		
		মণ	সের	টাকা	আনা	পই
সময় ১৭০১-২২	চাল (ভাল)	২	—	১		
	চাল (মোটা)	৪/৫	—	১		
	চিনি	১ (বেল =২ মণ ১৩ সের)		৯/১০		
	মাখন	১	—	৪/৫		
	তেল	১	—	১-১২ আনা / ২ টাকা		
	ব্রড ক্লথ (বিদেশী)		১ গজ	২		
সময় ১৭২৯	বাঁশফুল ভাল চাল ১ নং	১	১০	১		
	চাল ২ নং:	১	২৩	১		
	চাল ৩নং	১	৩৫	১		
	দেশীয় চাল মোটা	৪	১৫	১		
	গম ১ নং	৩	—	১		
	যব	৮	—	১		
	তেল ১ নং	—	২১	১		
	তেল ২ নং	—	২৪	১		
	ঘি ১ নং		১০.৫	১		

প্রথম পর্বের বেতন ও মজুরী

পদ	মাসিক	দৈনিক	টাকা	আনা	পয়সা	কড়ি
কেরানি	,,		৪	৬		
পুলিশ দারোগা	,,		৪	৬		
রাজস্ব আদায়কারী	,,		১	১৩		
পুলিশ কনস্টেবল	,,		১	৮		
তাঁতি	,,		১	৮		
সাধারণ মজুর/কুলি		,,			১ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি	
রাজমিস্ত্রি		,,			২ পণ ১ গণ্ডা কড়ি	
কুশলী কারিগর					১০	

দ্বিতীয় পর্বের দ্রব্যমূল্য (১৭৩৭-৬৯)

সময়	জিনিস	পরিমাণ		মূল্য		
		মন	সের	টাকা	আনা	পই
১৭৩৮	চাল	২.২০ সের/	৩ মণ	১	—	
	কার্পাস	১		১	—	
১৭৫১-৫২	চাল	১-৩২ সের/১.১৬ সের		১	—	
	গম	১-৩২ সের/ ১-৬ সের		১	—	
	ময়দা	১-৩ সের/ ১ মণ		১	—	
	তেল	১		৫	—	
	নীল	১		২২	—	
	কাশিমবাজার রেশম	০	১	৫	৮	
	সোরা	১		৪	৮	
	জ্বালানি কাঠ	১০	—	১	—	
	ইট	১ হাজার		৩	১০	
	চুণ	১০০ মণ		৩৯	—	
	মিস্টি	০	১			১ কাহন কড়ি
	পান	দু পণ				২০ গণ্ডা কড়ি
সময় ১৭৫৯	লবঙ্গ	—	১	১৬	—	
	জৈত্রি	—	১	১২	২	
	জায়ফল	—	১	৬	—	
	লংকা	১	—	২৫	—	
	দারুচিনি	—	১	৫	—	
	বাদাম	১	—	২৫	—	
	শুকনো কিসমিস	১	—	৬০	—	
	চিনি	১	—	১৬	—	
	ইউরোপের লোহা	১	—	৯	৮	
	ইস্পাত	১	—	১৫	—	
সময় ১৭৬০	চাল	২	২০	১ আর্কট টাকা		
	তেল	১	—	২	৮	
	তুলো	—	১		৪/৫ পণ কড়ি	
	রেশম	—	১	৬/১০ টাকা		—

দ্বিতীয় পর্বের বেতন ও মজুরী (১৭৩৭-৬৯)

	পদ	মাসিক	টাকা	আনা	পয়সা
সময় ১৭৩৯	ইটমিস্ত্রি	,,	৩	—	
	ছুতোর	,,	২	১৫	—
	মহিলা শ্রমিক	,,	১	—	
	কুলি/মজুর	,,	২	—	
	নৌকামাঝি	,,	৩	—	
	পিওন	,,	২	৮	—
	দারোয়ান	,,	২	৮	—
	ধোপা	,,	১০	—	
	নাপিত	,,	৩	—	
	মশালচি	,,	২	—	

	পদ	মাসিক	টাকা	আনা	পয়সা
সময় ১৭৫৯	চোপদার	,,	৫	—	
	প্রধান রাঁধুনি	,,	৫	—	
	কোচম্যান	,,	৫	—	
	প্রধান দাসী	,,	৫	—	
	জমাদার	,,	৪	—	
	খিতমতগার	,,	৩	—	
	রাঁধুনির প্রধান সহায়ক	,,	৩	—	
	পিওন	,,	২	—	
	পারিবারিক ধোপা	,,	৩	—	
	একজনের ধোপা	,,	১	৮	—
	ঘাসুড়ে	,,	১	—	
	নার্স	,,	৪	—	
	সারেঙ্গ	,,	১০	—	
সময় ১৭৬০	তাঁতি	,,	১	৮	—
সময় ১৭৬৭	কুলি	,,	২-১২/৩ টা.		

তৃতীয় পর্বের দ্রব্যমূল্য (১৭৩৭-৬৯)

	জিনিস	পরিমাণ		মূল্য			
		মন	সের	টাকা	আনা	পয়সা	কড়ি
সময় ১৭৭৬	বাঁশফুল চাল ১নং		১৬	১	—		
	বাঁশফুল চাল ২নং		১৮	১	—		
	বাঁশফুল চাল ৩নং		২১	১	—		
	দেশনা চাল (মোটা)		৩২	১	—		
	পুর্বী চাল (মোটা)		৩৭	১	—		
	গম ১ নং		৩২	১	—		
	গম ২ নং		৩৫	১	—		
	যব ১ নং		১৩	১	—		
	ভেনট (ঘোড়ার খাদ্য)		২০/২২	১	—		
	তেল ১ নং		৬ ১/২	১	—		
	তেল ২ নং		৬ ৩/৪	১	—		
	ঘি ১ নং		৩	১	—		
	ঘি ২ নং		৪	১	—		
সময় ১৭৯৫	চাল, গম, যব	১	—	—	১২	—	
	ঘি	—	১	—	৩	—	
	গরু ১টি			৫	—		
সময় ১৮০০	চাল	—	২০	১ আর্কটা			
	তেল	১	—	৪ সিক্কা			
	তুলো	—	১		৯ পণ কড়ি		
	লবণ	১		২২/৩/৩—			
	নীল		১	—	৫.৮	—	
	আফিম (১ চেস্ট)			৩২০	—		
	রেশম	—	১	৮/৯			
	ইফরোপীয় পদ্ধতিতে তৈরি রেশম		১	১২/১৪	—		
	সোরা	১	—	২/২-৮			

তৃতীয় পর্বের বেতন ও মজুরী (১৭৩৭-৬৯)

	পদ	মাসিক	আর্কটটাকা	আনা
সময় ১৭৭২	দারোগা	,,	৩০০	—
	ফৌজদার	,,	২০০	—
	মুফ্‌তি	,,	১৫০	—
	নায়েব ফৌজদার	,,	১০০	—
	মুন্সি	,,	৬০	—
	ভকিল	,,	৫০	—
	মোহরার	,,	২০	—
		(খালসা বিভাগ)		
	মোহরার	,,	১৫	৫
	পোদ্দার	,,	১৫	৫
	পিওন	,,	৪	—
	জমাদার	,,	১০	—
	ফরাস	,,	৫	—
	মির্ধা	,,	২৫	—
	মশালচি	,,	৩	—
	ঝাড়েওয়ালা	,,	২	—
	দপ্তরি	,,	৭	—
		(জেলা কালেক্টরিতে কর্মীদের বেতন)		
সময় ১৭৭৩	নায়েব	,,	১০০	—
	পেশকার	,,	৫০	—
	সেরিস্তাদার	,,	২৫	—
	কেরানি	,,	১০	—
	মুন্সি	,,	১০	—
	খাজাঞ্চি	,,	২৫	—
	খাজাঞ্চির কেরানি	,,	১০	—
	পোদ্দার	,,	৫	—
	ভকিল	,,	৩০	—
	জমাদার (হেড পিওন)	,,	১০	—
	পিওন	,,	৪	—
	দপ্তরি	,,	৩	৮
	ফরাস	,,	৫	—
সময় ১৭৭৪	খানসামা	,,	৮	১৫
	বাটলার	,,	৫	৮
	খিতমতগার	,,	৪	৬
	রাঁধুনি	,,	৮	১৫
	ঐ সহকারী	,,	৩	৬
	মশালচি	,,	৩	—
	বেলিয়ান	,,	২	৩
	পিওন ও হরকরা	,,	৩	৪
	একাধিক ব্যক্তির নাপিত	,,	২	—
	পরিবারের নাপিত	,,	৫	৮

পদ	মাসিক	টাকা	আনা	পয়সা
হেড বেয়ারা	,,	৫		—
অন্য বেয়ারা	,,	৩		—
দাঁড়িকাটা নাপিত	,,	২		—
ঐ পরিবারের	,,	৪		—
হরকরা	,,	৫		—
কোচম্যান	,,	৬		৮
সহিস	,,	৩		৪
ঘাসুড়ে	,,	২		—
একজনের ধোপা	,,	২		—
পরিবারের ধোপা	,,	৪		৬
পরিবারের দরজি	,,	৩		৬
তাঁতি	,,	২/৭		—
সুতো কাটুনি	,,	১ ২ ১/৪ / ১ ১/২ ১/২		—

চতুর্থ পর্ব।

১৮০০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দ্রুত পরিবর্তনশীল উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভাঙা-গড়ার কাল। বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক বাজারগুলি ভেঙে পড়েছে। ক্ষুদ্র ও ঐতিহ্যশালী কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটির শিল্পের পরিবর্ত শিল্প যেমন গড়ে ওঠেনি তেমনি মধ্যযুগীয় যোগাযোগ ব্যবস্থারও বিশেষ পরিবর্তন না হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রপ্তানি সহজ না থাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্যের দান নিম্নমুখী রাখতে সাহায্য করে। কৃষিপণ্যের মধ্যে কেবল পাটের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান ছিল অত্যন্ত সাদামাটা, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জীবনযাপন মান ছিল অত্যন্ত সাদামাটা, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বস্ত্রও থাকতো না। বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী) গ্রন্থে সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, "শতকের শুরুতে একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক রোজগার দু পয়সা। ওই সময় দু পয়সায় বাজারে এক সের চাল পাওয়া যেত। ১৮২৯ সালে ওই কৃষি শ্রমিকের রোজগার বেড়ে দাঁড়ায় ৪ আনা অর্থাৎ তিরিশ বছরে আয় বাড়ে আট গুণ। ওই সময় চার আনায় সে দশকের চাল কিনতে পারত। ...

সাধারণভাবে তিরিশের দশক থেকে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে ক্রমশ বাড়তে থাকে। ওই সময় 'সমাচার দর্পণে' জনৈক পত্রলেখক সাংসারিক জীবনে ব্যয়াধিকের কথা উল্লেখ করেন। পত্রলেখকের মতে ব্যয়াধিক্যের কারণগুলি হল ঃ (ক) নানা ঘটনায় ও নানাপথে এদেশ থেকে অনেক টাকা বিদেশে চলে যাওয়া, (খ) জমিদারদের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য ভূমিকর বৃদ্ধি (গ) দেশের উৎপন্ন শস্য পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমানে বিদেশে রপ্তানি করার ফলে এদেশে শস্য ও অন্যান্য পণ্যের দামবৃদ্ধি ও (ঘ) আগের থেকে লোকের সুখেচ্ছা অধিক সেজন্য ব্যয়ও অধিক অথচ এ যুগে মানুষের আয় অল্প থাকায় দুঃখ বাড়ে।"

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের দ্রব্যমূল্য

	জিনিস	পরিমাণ		মূল্য		
		মন	সের	টাকা	আনা	পয়সা কড়ি
সময় ১৮০৩-০৪	মোটা চাল		৩৫	১		
	তেল		৫	১		
	ঘি		২	১		
	গুড়		১৩	১		
সময় ১৮০৯-১০	মোটা চাল	১	৩	১		
	তেল		৫-৪ ছটাক	১		
	ঘি		২	১		
	গুড়		১৫	১		
সময় ১৮১২-১৩	মোটা চাল		৩১	১		
	তেল		৫-১২ ছটাক	১		
	ঘি		২	১		
	গুড়		১২	১		

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাধারণ চালের দাম

বৎসর	প্রতি টাকায়	সের	ছটাক
১৮৩৬-৩৭	,,	৪৪	০
১৮৩৭-৩৮	,,	৩৮	৭
১৮৪২-৪৩	,,	৩৯	৯
১৮৪৬-৪৭	,,	৪০	২
১৮৪৭-৪৮	,,	২৯	৫
১৮৪৮-৪৯	,,	৩৬	১০
১৮৪৯-৫০	,,	৪৯	৭

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে

	জিনিস	পরিমাণ		মূল্য		
		মন	সের	টাকা	আনা	পয়সা কড়ি
সময় ১৮৫৫	বালাম চাল	১		১	২	
	সলুই চাল	১		১	—	২
	আতপ চাল	১		২	৬	
	সোনা মুগ	১		২	১১	
	বুটের ডাল	১		২	১৪	
	মুসুরি	১		২		
	কালী কলাই	১		১		
	সরিষার তেল	১		৮		
	নারিকেল তেল	১		১২		
সময় ১৮৭৯	সাধারণ চাল	১		৩	১২	
	ময়দা		১		৩	৬
	তেল		১		৭	৬
	জ্বালনি কাঠ	৩		১		

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেতন ও মজুরী

পদ	মাসিক	দৈনিক	টাকা	আনা	পয়সা	কড়ি
কৃষিশ্রমিক		,,		৬ পাই		
শহর মজুর (১৮১৯-২০)	,,		২			
শহর মজুর (১৮২৯-৩০)	,,		৮			
ছুতোর (১৮১৯-২০)	,,		৮			
ছুতোর (১৮২৯-৩০)	,,		১৬ থেকে ২০			
কৃষি শ্রমিক (১৮২৯)		,,		৪		
মজুর / কুলি (১৮৩৭)	,,		৩	১২		
ইটমিস্ত্রি (১৮৩৭)	,,		৪			
পাল্কিবাহক (১৮৩৯)	,,		২			
কৃষি মজুর (১৮৫০)	,,		৩	১২		
কামার (১৮৫০)	,,		৪ (দৈনিক ২ আনা)			
কুলি (১৮৭৮)		,,		৩		
ইটমিস্ত্রি (১৮৭৮)		,,		৫		
ছুতোর ও কর্মকার (১৮৭৮)		,,		৮		
বয়ন কারিগর (১৮৭৮)		,,		৫		

সূত্র ঃ

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলার আর্থিক ইতিহাস নামক গ্রন্থ থেকেই সংকলিত। গ্রন্থকার যে সমস্ত সূত্র থেকে সারণিগুলি প্রস্তুত করেচেন, সংক্ষেপে সেই মূল সূত্রগুলিও তুলে দেওয়া হল।

১. পি জে মার্শাল ঐ পৃ ১১১।

২. সলিমুল্লাহ, তারিখ-ই-বাঙ্গালা, ইং অনু. ফ্রান্সিস গ্র্যাডউইন, পৃ: ৪৮।

৩. যদুনা সম্পা, হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পরিচ্ছদ একুশ।

৪. জেমস্ রেনেল, দ্য জার্নালস্, পৃ: ৮৩।

৫. বিজয়রাম সেনবিশারদ, তীর্থমঙ্গল, পৃ: ৩৯-৪০।

৬. কোর্টের চিঠি, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৬।

৭. বিরাশি সিক্কায় এক সের।

৮. সারণী-১ দ্রষ্টব্য।

৯. সারণী-২ দ্রষ্টব্য।

১০. গোলাম হোসেন সলিম, রিয়াজ, পৃ: ২৮০-৮১।

১১. সারণী-৩ দ্রষ্টব্য।

১২. সারণী-৪ দ্রষ্টব্য।

১৩. কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃ: ৯৯-১০৮।

১৪. গোবিন্দ মিত্র কলকাতায় কোম্পানির রাজস্বের ম্যানেজার ছিলেন।

১৫. জে. জেড. হলওয়েল, ইন্টারস্টেং হিস্টোরিকাল ইভেন্টস, পৃ: ১৫১।

১৬. কনসালটেশন, ১১ ডিসেম্বর, ১৭৫২।

১৭. কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি রেকডর্স ৫ম খণ্ড, ১৭৩৯, ১৭৫৯ কলকাতার জমিদার বীচের, ফ্যাক্টল্যাণ্ড ও হলওয়েল প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বেতনহার সুপারিশ করেন।

মুর্শিদাবাদে মদনমোহন

রবীন বিশ্বাস

প্রভাত বর্ণন

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল ॥
গগণে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন ॥
শীতল বাতাস বয় যুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির ॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ ॥*

'পাখী সব করে রব'— প্রভাতের এই ছবিটি ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশু শিক্ষা ১ম ভাগের শেষতম এই পাঠটি মধ্যবয়স অতিক্রান্ত অভিভাবকদের হারান শৈশবকে এক লহমায় পরপর সাজিয়ে দিতে পারে চলমান ছবির মতো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যযুগের রাত পোহানো প্রথম আলো এসে পড়েছে বাংলার মাটিতে। সেই নব্য প্রভাত যাঁদের কলরবে মুখর হয়ে উঠেছিল, নিঃসন্দেহে মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠি বন্ধু ও বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডের সহযোগী মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০-এর নভেম্বরে কোলকাতার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৫০ টাকা মাসিক বেতনে জজ পণ্ডিতের চাকরী নিয়ে চলে আসেন মুর্শিদাবাদে। সরকারিভাবে এদের বলা হত 'নেটিভ ল অফিসার'। কোনও মামলার

* *বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে, যেমন লক্ষ্যণীয় 'যুড়ায়'।*

রায় দানের বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার জজ পণ্ডিতের থাকতো না। আদালতের কাছে হিন্দু আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করাই ছিল এঁদের কাজ। সুগভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে হত এই কাজে। তখন অত্যন্ত যোগ্যতম ব্যক্তিকেই এই কাজে নিয়োগ করা হত। ১৮৬৩ সালে 'হিন্দু ও মুসলিম আইনী অফিসার বিলোপন বিল' আনা হয় এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আদালত থেকে পণ্ডিত পদের অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। তবে ততদিনে জজ পণ্ডিত মদনমোহন জীবিত ছিলেন না।

এ জেলায় আসার আগেই মদনমোহন খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। মদনমোহনের জন্ম নদীয়ার বিল্বগ্রামে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক পণ্ডিত পরিবারে। এর প্রায় তিন বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম —১৮২০-এর ২০ সেপ্টেম্বর। পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় কলকাতার সংস্কৃত কলেজের একজন লিপিকর ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র মদনমোহন প্রথমে কবিরত্ন ও পরে তর্কালঙ্কার উপাধি পান। ১৮৩৭-এ তিনি স্মৃতি শ্রেণীতে ভর্তি হন। স্মৃতি শ্রেণীতে পড়বার সময় বিদ্যাসাগর ১৮০ টাকা পারিতোষিক পেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের সহপাঠি মদনমোহন পেয়েছিলেন ১০০ টাকা। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র থাকাকালীন মাত্র ২০ বছর বয়সে সংস্কৃত কাব্য 'বাসবদত্তা' অবলম্বনে 'রসতরঙ্গিণী' নামে বাংলায় একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। তৎকালীন সময়ে সমালোচকঁরা একে, 'অতি সরল প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষার চমৎকার নমুনা' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই শতকের প্রথমে রামমোহনের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা ভাষা বিকাশের যে সূচনা হয়েছিল, সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার কষ্টকর প্রয়াস যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। শুরুতে তাঁর সহপাঠী মদনমোহন ছিলেন অন্যতম সহযোগী। ১৮৪১ সালে তিনি জজ পণ্ডিতের সার্টিফিকেট অর্জন করবার জন্য হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দেন। ১৮৪২-এ পাঠ্য জীবন সমাপ্ত করে কলকাতার বঙ্গবিদ্যালয়ে দুই মাস শিক্ষকতা করেন। বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে তিনি এরপর ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬-এ মদনমোহন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপক হন। এই বছরই সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরকে ৯০ টাকা বেতনে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিদ্যাসাগর নিজের পরিবর্তে ওই পদে মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। এই সময়কালে শিক্ষা বিস্তার ও বাংলা ভাষা সাহিত্য বিকাশের উদ্যোগে মনপ্রাণ নিয়োগ করে বিদ্যাসাগর তার কর্মধারাকে প্রসারিত করে চলেছন। বাংলা শিক্ষা প্রসারের পথে তখন প্রধান অন্তরায় ছিল উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব। অনুভব করেন সমাজে কুসংস্কারের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে গেলে পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী জাতিকেও শিক্ষাক্ষেত্রে সামিল করতে হবে। ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের অন্যতম সহযোগী হিসেবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হলেন বিদ্যাসাগর। সহযোগী মদনমোহন। বেথুন সাহেব ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল নামে বালিকা বিদ্যলয় স্থাপন করলেন। ১৮৪৯-এর ৭ মে। প্রথম ক্লাসে ১১ জন ছাত্রী নিয়ে এই বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। ওই ১১ জনের মধ্যে ছিলেন মদনমোহনের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা, তখন এই কাজ খুব সহজ ছিল না। এই সময় 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'য় স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে স্ত্রী শিক্ষায় সমাজকে আগ্রহী করার চেষ্টা করেন। তিনি লেখেন, "স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র উদঘাটন করিয়া সকলের সমক্ষে দেখাইতে পারি "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাই" এমত প্রমাণ কেহ একটাও দেখাইতে

পারিবেন না, বরং পুত্রের মত কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিধানই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। ... বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তরপ্রদান।" দীর্ঘ প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষা বিরোধীদের সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছেন, যারা শিক্ষিত হয়েও স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন তাদের প্রতি খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, "... ভাবিয়াছিলাম সভ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূর পরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন। এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যাভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না।" এ মনোভাবের মধ্যেই একটা যুগের সর্বব্যাপী আলোড়নের অনেকখানি নিহীত আছে। নিজের দুই কন্যাকে বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ফলে ক্ষিপ্ত পণ্ডিতকূল তাকে সমাজচ্যুত করার চেষ্টা করে। পথে ঘাটে দুই পণ্ডিতের দেখা হলে মদনমোহনের নামে বিদ্রুপ করে তারা বলতো, "ওরে মদনা করলে কি"। মদনমোহন বন্ধু বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ না হলেও, শিক্ষাপ্রসার ও সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার সংকল্প তিনিও গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর 'স্ত্রী শিক্ষা' নামক দীর্ঘ এ প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। একথা ঠিক সে সময় যে সমস্ত দিকপালরা এমন করে ভেবেছিলেন তাদের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন যুগ ভাবনার সামগ্রিক ও সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের মধ্যেই।

বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন আধুনিক যুগের সূচনাকালে মুদ্রণযন্ত্রের কি অপরিসিম গুরুত্ব। কিন্তু ছাপাখানা করতে অর্থের প্রয়োজন। একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তিনি ও মদনমোহন যুক্তভাবে এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, "যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়।" পুরাতন প্রসঙ্গ নামক গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্মৃতি চারণে জানাচ্ছেন, "আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি (বিদ্যাসাগর) অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ পূর্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাহার ছাপাখানার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।" স্বাধীনভাবে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের অধিকারী বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন ছিল এমন একটি বৃত্তি গ্রহণ যা তাঁর ব্রতের পরিপূরক। বিদগ্ধ ব্যক্তিরা বলেছেন, "তাঁর লক্ষ্য ছিল, জীবনের স্বাধীন বৃত্তিকে জীবনের ব্রতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তোলা। আর্থিক আত্মনির্ভরতা তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল না।"

১৮৪৯-এ বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে মদনমোহন নিজের দুই কন্যাকে পাঠান এবং অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে ওই স্কুলে শিশু কন্যাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে অনুভব করেন, শিশু শিক্ষা'র জন্য পাঠ্যগ্রন্থের অভাব। তিনি সে অভাব পূরণের জন্য এই বছরই রচনা করলেন, 'শিশু শিক্ষা' ১ম ভাগ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ রচনা করেন ১৮৫০-এ। ছাপা হয় ওই 'সংস্কৃত প্রেস'-এ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহনের শিশু শিক্ষা বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়। প্রখ্যাত গবেষক ড. আশীষ খাস্তগীর তাঁর সম্পাদিত 'শিশু শিক্ষা' গ্রন্থের ভূমিকায়, শিশুদের বর্ণপরিচয় সংক্রান্ত গ্রন্থের পর্যালোচনা করে বলেছেন, " ... প্রচলিত প্রথা ভেঙে মদনমোহন প্রথমে স্বরধ্বনি ও পরে ব্যঞ্জনধ্বনি স্থাপন করেছেন। ... দু'প্রকার ধ্বনি আকৃতিসাম্য অনুসারে সজ্জা আছে। প্রথম ভাগে রয়েছে অসংযুক্ত ধ্বনির উদাহরণ, দ্বিতীয়ভাগে সংযুক্ত ধ্বনির উদাহরণ।

প্রথমভাগের অবিস্মরণীয় কবিতা আজও আমাদের মুখে মুখে ফেরে— 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।' আর ফেরে দুটি কলি— 'লেখাপড়া করে যেই।/ গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' ড. খান্তগীর লিখেছেন, "১৮৫৫ সাল তেমনি আর একটি মাইলস্টোন। মদনমোহন বাংলা ধ্বনির সজ্জা ও উদাহরণের মধ্যে যে কাব্যরেশ ছড়িয়েছিলেন, তাকে বর্জন করে আরও নির্মেদ, আরও যুক্তিশীল ও সুঠাম গদ্যের ভঙ্গিতে দেখা দিল বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর ২ টি খণ্ড। ... বিশেষত 'শিশু শিক্ষা'কে আরও পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে বৈজ্ঞানিক কাঠামোয় বিদ্যাসাগর যেভাবে বাংলা বর্ণকে সংস্থাপন করেছেন, তাকে অতিক্রম করা আজও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।" শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ব্রত উদযাপনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন বন্ধু বিদ্যাসাগর। সামাজিক আলোড়নের সেই সন্ধিক্ষণেই জজ পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে মদনমোহন মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। তৎকালে এই কাজে সম্মান ছিল, বেতনও বেশি ছিল।

জজ পণ্ডিত হিসেবে মুর্শিদাবাদ কোর্টে নিযুক্ত হওয়ার পরে তিনি মুর্শিদাবাদে কিছু জনহিতকর কাজে সক্রিয় হন। তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখছেন, "... তর্কালঙ্কার ১২৫৭ সালে মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার সুবিখ্যাত নাম মুরশিদাবাদের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়া চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি, মধুর বচন ও গভীর বুদ্ধি আবালবৃদ্ধ সকলের নিকট তাঁহাকে প্রিয় করিয়াছিল। জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তদ্দত্ত ব্যবস্থা কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না। তর্কালঙ্কারের বক্তৃতা শক্তি মুরশিদাবাদে প্রথম বিকশিত হয়। তিনি মুরশিদাবাদে বহুল সভা সংস্থাপনপূর্বক স্বয়ং বক্তৃতা করিয়া দেশের হিতার্থে লোকের মন বিনত করিতেন। বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য মুরশিদাবাদে এক দাতব্য সভা সংস্থাপন করেন। ... তিনি মুরশিদাবাদে একটি অতিথি শালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় কানা খঞ্জ প্রভৃতিরা অন্নাচ্ছাদিত প্রাপ্ত হইত।"

কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবন থেকে দূরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কোর্টে মর্যাদাপূর্ণ চাকরী নিয়ে এসে তিনি অচিরেই উপলব্ধি করলেন, এখানে তিনি ম্লান ও স্ফূর্তিহীন হয়ে পড়ছেন। আদালতে 'হিন্দু ব্যবহার বিষয়িনী' কোন বিতর্ক দেখা দিলে তবেই তার ডাক পড়ত, না হলে অধিকাংশ সময়েই কর্মহীনভাবে পারিবারিক গন্ডির মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হত। তখনও মফঃস্বল বাংলার নাগরিক জীবনের বড় অংশই মধ্যযুগের আচ্ছন্নতা ও শ্লথগতি জীবন যাপনে অভ্যস্ত। স্বাতন্ত্রবোধের অধিকারী বিচক্ষণ ব্যক্তির সতর্ক ও উদ্যোগী পদক্ষেপ ছাড়া সমাজকে স্পর্শ করা যায় না। আবার একেবারেই প্রতিকূল পরিবেশ তাও বলা যাবে না।

মদনমোহন যখন জজ পণ্ডিত হয়ে আসেন, তার অন্তত কুড়ি বছর আগেই নবীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র ক'রে মুর্শিদাবাদে নব্যচিন্তার উন্মেষ হতে থাকে, যার কেন্দ্র বহরমপুর। বহরমপুর অর্থে আজকের বহরমপুর নয়। অতীত বৈভব হারানো সৈদাবাদ, খাগড়া, ব্যারাক সংলগ্ন ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ও গোরা সৈন্যদের গঞ্জ এলাকা হিসেবে গড়ে ওঠা গোরাবাজার, এই বিচ্ছিন্ন গঞ্জগুলি নিয়ে নব নগরায়ণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত জনপদকেই। বহরমপুর নামটাও খুব উচ্চারিত ছিল না। মুর্শিদাবাদ সদর বলতে বোঝাত এই জনপদকে। জীবিকার সন্ধানে এ শহরে আসা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার চর্চা স্থান পেল। টোল, মাদ্রাসা, সংস্কৃতে স্কুলগুলির পাশাপাশি মিশনারীদের স্থাপিত ইংরাজি স্কুলগুলিও গুরুত্ব পায়, ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে। শিক্ষার পুরাতন বিষয় অপসৃত হতে থাকে। রক্ষণশীল রাজপরিবারগুলিও, ইংরাজ

শাসকদের ছত্রছায়ায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মোঘল আমলে রাজকার্যের ভাষা ছিল ফার্সি, তাই ফার্সি শিখতে হত। ইংরাজ শাসনের আমলে ফার্সি অপসৃত হয়ে রাজকার্যের ভাষা হল ইংরাজি। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪-এ ঘোষণা করেন, ইংরাজি জানলে সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার মিলবে।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর পৌত্র রাজা বাহাদুর হরিনাথ-এর আমলে (১৮১৮-৩২) ইংরাজ শাসন জাঁকিয়ে বসেছে। হরিনাথ ইংরাজি জানতেন। কলকাতায় হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) প্রতিষ্ঠাকালে ১৫ হাজার টাকা দান করেন। সৈদাবাদেও ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। স্কুল নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার অগেই নাবালক পুত্র কৃষ্ণনাথকে রেখে তিনি মারা যান। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে বালক কৃষ্ণনাথ সেই স্কুলের দ্বারোদঘাটন করেন ১৮৩৭-এ।

জলপানি বাবদ প্রাপ্ত ২০০০ টাকা তিনি ওই স্কুলের উন্নতিকল্পে দান করে দেন। ১৮৩৭-এ কৃষ্ণনাথের পোষকতায় প্রকাশিত হয় ইংরাজি পত্রিকা 'মুর্শিদাবাদ নিউজ'। ১৮৪০-এ তাঁর উদ্যোগেই কলকাতার বাইরে মফঃস্বল বাংলার প্রথম সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' প্রকাশিত হয়। রাজরোষে তা বন্ধও হয়ে যায়। প্রথমে ১৮৪১ এবং পরে ১৮৪৪-এ মাত্র ২২ বৎসর বয়সে এই বিদ্যোৎসাহী দুর্দান্ত প্রকৃতির রাজার ট্রাজিক মৃত্যুর আগের মুহূর্তে করা তাঁর উইল-এ শিক্ষা চিন্তার যে রূপ প্রকাশ পায় তাতে বাংলার নবজাগরণের উন্মেষপর্বের সময়োচিত অগ্রসর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল। দুটি উইলের মিশ্রিত সারমর্ম হল, তাঁর স্থাপর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি ক'রে সমুদয় অর্থ একটি ট্রাস্টিবোর্ডে জমা করা হবে। সেই অর্থে বানজেটিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে, যেখানে দেশ বিদেশের ছাত্রদের ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা, ঔষধবিদ্যা, আইন, ল্যাটিন, ইংরাজি, আরবী, সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী প্রভৃতি শেখানো হবে। শিক্ষক হবেন ইউরোপীয় শিক্ষায় সুপণ্ডিতগণ এবং দেশীয় উপযুক্ত মানের শিক্ষক। প্রয়োজনে মোটা বেতন দিয়ে ইউরোপ থেকে শিক্ষকদের আনতে হবে। নিয়োগের নিয়ম কানুন বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল ওই উইলে।

এ হেন অগ্রসর চিন্তার অধিকারী কৃষ্ণনাথের সঙ্গে রক্ষণশীল মা-ঠাকুমার মতানৈক্য ঘটেছিল। বিরোধ এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে নাবালক রাজাকে মাত্র দু'হাজার টাকা মাসোহারা নিয়ে বানজেটিয়া প্রাসাদে পৃথক থাকতে হত। 'এই দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যে রামমোহন রায়ের পারিবারিক দ্বন্দ্বের ট্রাজেডির যেন ছায়াপাত ঘটেছিল।'*

১৮৪৪ সালে কৃষ্ণনাথের জীবনাবসানে তাঁর স্বপ্ন পূরণ ব্যহত হলেও, যুগ প্রবাহ ও কৃষ্ণনাথের বিধবা মহীয়সী রাণী স্বর্ণময়ীর বিচক্ষণতা ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের আকুতি তাতে ছেদ পড়তে দেয়নি। ১৮৪৪-এ কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর ষোল বছরের বিধবা স্বর্ণময়ী আকস্মিক বিহ্বলতা কাটিয়েই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আক্রমণকে বুদ্ধি সংযম ও দৃঢ়তা দিয়ে প্রতিহত করেন। রাণী স্বর্ণময়ীকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে, রক্ষণশীল পরিবারকেই সহায়তা করতে এগিয়ে আসে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত সংঘাত, দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করে ১৮৪৭-এ আদালতের রায়ে তিনি জয়যুক্ত হন। এই সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন শিক্ষাই তাঁর অস্ত্র। মাত্র তিন বৎসরে নিরক্ষর স্বর্ণময়ী বাংলা, ইংরাজি ও ফার্সি শিখে নেন। শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করে যিনি নিজেকে শিক্ষিত করার কষ্টসাধ্য সংগ্রাম করেছিলেন, তিনি যে নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নারী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান তাকে প্রাতস্মরণীয় করেছে। বিধবা নারী হিসাবে সামাজিক পারিবারিক প্রতিকূলতার

* ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ (বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪)— স্বপন ঘোষাল।

বিরুদ্ধে তাঁর একক সংগ্রামই তাঁর বিদ্যোৎসাহী দুর্দান্ত প্রকৃতির স্বামীকেও চিনতে সহায়তা করে থাকবে। সমাজিক ক্ষেত্রেই বা তাঁর করণীয় কি তাও তিনি নিশ্চয় স্থির করে নেন, না হলে সেকালে বিত্তশালী বিধবা নারীর করণীয় কাজ বলতে পূর্বসূরীরা যে উদাহরণ রেখে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণসেবা এবং শেষ জীবনে কাশীবাস তাই করতেন। কিন্তু স্বর্ণময়ী কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নি, করেছেন বিদ্যা মন্দির। শিক্ষা বিস্তারে সর্বাপেক্ষা বেশি দান করেছেন এবং আমৃত্যু (১৮৯৭) সেই কাজেই ব্রতী ছিলেন। এ হেন নারীর শিক্ষিত মন বিদ্যাসাগরকেও চিনতে সহায়তা করেছিল। বিদ্যাসাগরও পরম শ্রদ্ধায় তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন একাধিকবার। এমন কি মহারাণী স্বর্ণময়ীর একটি চিঠির প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর অকুণ্ঠিত প্রশংসায় স্বর্ণময়ীকে লেখেন,

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি. আই. মহাদয়া সমীপেষু
বিনয়বহুমানশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং নিবেদনম্।

শ্রীমতীর অনুগ্রহপত্রে রাজধানীর মঙ্গল সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আমি পরিবারবর্গের সহিত কায়িক ভাল আছি। শ্রীমতির পত্রে লিখিত হইয়াছে, "মৎপ্রতি শ্রদ্ধা বিচলিত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।" এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দয়া এবং পরোপকার প্রবৃত্তি সর্ব্ববাদিসম্মত প্রশংসনীয় গুণ। এই দুই গুণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু শ্রীমতীর কার্য্য পরম্পরা নিরন্তর এই দুই প্রশংসনীয় গুণের সবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতেছে। এমন স্থলে শ্রীমতীর প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা না জন্মিবেক, অথবা শ্রদ্ধা বিচলিত হইবেক, তিনি নিতান্ত পামর, কিমধিকমিত, ৮ই ফাল্গুন, ১২৮৯ সাল।

নিয়তগুণকীর্ত্তনশুভানুচিন্তনকর্ম্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

রাণী স্বর্ণময়ীর কালেই মদনমোহন মুর্শিদাবাদে এসে উপস্থিত হন। এ সময় কালকে মুর্শিদাবাদে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের স্বর্ণযুগ বলা যায়। নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ নিয়ে তখন কলকাতার আলোড়ন বঙ্গদেশে প্রত্যন্ত জেলায় জেলায় পৌঁছেছে। আলোকপ্রাপ্ত প্রগতি মনস্কদের সঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ ও টুলো পণ্ডিতদের বাকযুদ্ধ চলছে। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

১৮৫৩-এর ১০ আগস্ট লোকাল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশান-এর উদ্যোগে মুর্শিদাবাদে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বহরমপুরে ডি. জে. মনির বাড়িতে সভা ডাকা হয়। জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নবাব রাজা ও জমিদারগণ সেই সভায় এসে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। ঐতিহাসিক রামদাস সেন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহায়তা দেন মদনমোহন। সর্বোচ্চ পরিমান টাকা দেন রাণী স্বর্ণময়ী।

বহরমপুরে যখন কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় তখনও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়নি। কোলকাতায় স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা নিয়ে তুমুল বিতর্ক উঠেছে। মদনমোহন বহরমপুরে বসে সে সবের আভাস পেলেও এখানে পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এদিকে মদনমোহন বহরমপুরে আসার পরে পরেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়। প্রেস ও প্রকাশিত বই-এর স্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মদনমোহনের আত্মীয়রা এমন কিছু দোষারোপ করেন যে,

বিদ্যাসাগর মদনমোহনের সঙ্গে সংস্রব না রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এমনকি বিদ্যাসাগর পরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে অধিকার করেছেন এমন কথা শোনার পর তিনি এর কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হন। এক সময়ে সর্বসমক্ষে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ জরুরী হয়ে পড়লে 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' নামে স্বিয় বক্তব্য মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। দৃঢ়চেতা, সমস্ত অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্যাসাগর একবার কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহন করলে তাতে তিনি অনড় থাকতেন। মদনমোহনের সঙ্গে সংস্রব না রাখার সিদ্ধান্তেও তিনি অনড় ছিলেন। সমসামীয়ক বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতি চারণে ১৮৫০ সাল থেকে মদনমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনমালিন্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে লিখেছেন, 'মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনমালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে; তবে লেখকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।' বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মদনমোহনের বিকাশ ব্যহত হয়। স্বার্থান্ধ আত্মীয়স্বজনের প্রতি অনুরাগ, মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ হয়ে তাঁর চারিত্রিক ঐশ্চর্যকে নিষ্প্রভ করতে থাকে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মদনমোহনের সম্পর্কে এক সময়ে স্বখেদে বলেছেন, 'স্কুলে যতদিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য জিনিস।' মদনমোহনের প্রতিভায় বিস্মিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এমনও মনে করেছেন যে, ডেপুটিগিরি না করতে গিয়ে সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত থাকলে বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের যে 'প্রশংসার শ্রদ্ধাঞ্জলি' তার অর্ধেক পেতেন মদনমোহন। কৃষ্ণকমল এমনও বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতি লাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে Character (চরিত্র) কহে অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতভয়তা এসকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুজনেই বোধহয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসমান জমিন প্রভেদ।'

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি এবং বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন জায়গায় এসে মদনমোহন সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তখন বহরমপুরে রক্ষণশীল সমাজ কিন্তু চুপ করে বসেছিল না। সৈদাবাদ অঞ্চলে তখন বসবাস করেন গঙ্গাধর কবিরাজ। পণ্ডিত এবং ধন্বন্তরী কবিরাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাধর সেন তখন রক্ষণশীলদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ শুরু হলে এর বিরুদ্ধে মতামত সংগঠিত করতে থাকেন কবিরাজ। মদনমোহন এসময় নিঃশ্চুপ থাকতে পারেন নি। তিনিও বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টার সপক্ষে— হয়ত সন্তর্পণে কাজ শুরু করেন, যদিও আগের উদ্যম নিজের মধ্যে আর ফিরে পাননি, পরে তিনি তা অকপটে স্বীকার করেন।

১৮৫৫ সালে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ খালি হলে, মদনমোহন সেই পদের জন্য আবেদন করেন এবং ১৮৫৫- ডিসেম্বরে তিনি সেই পদে নিযুক্ত হন। মদনমোহন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ায় জজ পণ্ডিত পদটি শূন্য হয়। ওই পদে নিযুক্ত হন সংস্কৃত কলেজের কৃতি ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। শ্রীশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ ও অনুরাগী। এই সময় বঙ্গদেশ জুড়ে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে প্রগতি মনস্কদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের যে বাদানুবাদ তাকে উপেক্ষা করে চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ। মুর্শিদাবাদে মদনমোহন এই উদ্যোগে সামিল হন। বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের স্বপক্ষে কলকাতা শহরের ৬৮৫ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত পত্রে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর

করেন। বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া থেকেও স্বাক্ষর পৌঁছেছে কলকাতায়। বারাসতের ৩১৬ জন, হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্র চর্চার অন্যতম পীঠস্থান শান্তিপুর থেকেও বিধবা-বিবাহ প্রচলনের স্বপক্ষে ৫৩১ জন স্বাক্ষর করেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা নদীয়ার কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় সহ ২৬ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এব কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১২৯ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। মুর্শিদাবাদ থেকেও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, সুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্বে গৃহীত স্বাক্ষরপত্র কলকাতায় পৌঁছে যায়। ওই স্বাক্ষরপত্রের তারিখ ছিল ১৮৫৬-এর ২১ ফেব্রুয়ারি। রাণী স্বর্ণময়ী ওই পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন বলে জানা যায়। "অবশেষে বহু বাদানুবাদ আবেদন, নিবেদন এবং ব্যবস্থাপক সভায় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৫৬'র ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়।"*

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হিসেবে বিদ্যাসাগর যাকে গ্রহণ করেছেন, এবার তাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে এগিয়ে এলেন। বিধবা বিবাহের প্রথম পাত্র সংস্কৃত কলেজের কৃতি ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি তো তখন জজ পণ্ডিত হিসেবে মুর্শিদাবাদে নিযুক্ত। পাত্রী বর্ধমানের পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমাতা দেবী। এই পর্বে মুর্শিদাবাদে বসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। "তিনিই প্রথম পরিনীতা বিধবা বালিকার সংযোজন কর্তা। ওই বিধবাবালা, মাতার সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্বশুরালয়ে সততই গমনাগমন করিত। তাঁহারই বিশেষ প্রযত্নে মাতা ও কন্যা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথমে কন্যা সম্প্রদান ও প্রথম বিধবা বিবাহে সাহায্য করায়, স্বদেশীয় লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।"[১] ১৮৫৬'র ৭ ডিসেম্বর এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই ডিসেম্বর মাস থেকেই তিনি কান্দির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

মদনমোহন যখন কান্দিতে আসেন তখন কান্দির নগরায়ণ পর্ব শুরু হয়নি, কিন্তু কান্দিতে মহকুমা স্থাপন ও মদনমোহনকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগের মধ্য দিয়ে তার সূচনা হয়। সামন্ত শাসিত কান্দির সেকাল অস্তমিত। 'সেকাল' অর্থাৎ এই কান্দিতেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের (১৭৩৯-১৭৯৯) মাতৃশ্রাদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। বৃটিশ শাসকদের অনুগত অলস সামন্ত পরিবারগুলির একাধিপত্য ও বৈভব রাজা ও জমিদার বাড়িগুলির মতই জীর্ণ হতে শুরু করেছে। রাস্তা-ঘাট নেই, বিদ্যালয় নেই, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে বদ্ধ আবহাওয়ায়, বঞ্চিত দরিদ্র নাগরিকরা বুঝেই পায়না তাদের করণীয় আদৌ কিছু আছে কিনা। ইংরেজ শাসক রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টায় বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনকে ঢেলে সাজাচ্ছেন নগরায়ণের সূচনার সেই কালে মদনমোহন এলেন কান্দির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হলেন। এক কালে বিদ্যাসাগরের সহযোগী, স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব কান্দিতে এসেও যে সে কাজই করবেন তা স্বাভাবিক। তিনি দরিদ্র মানুষের সহায়তার জন্য কিছু দাতব্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শুনলেন সামন্ত যুগের কিছু বর্বর প্রথা এতদ অঞ্চলে আজও চালু আছে। মাখালতোড় গ্রামে বহুকাল যাবৎ প্রতাপশালী মুসলমান জমিদাররা বিশেষ পর্বে কৃত্রিম যুদ্ধ করে। কৃত্রিম যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত লোকক্ষয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। শান্তি বিঘ্নিত হয়। শুনলেন, ইতিপূর্বে এই কুপ্রথা বন্ধের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মদনমোহন শুভানুধ্যায়ীদের বাধা সত্বেও, কৃত্রিম যুদ্ধের নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা

* বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, বিনয় ঘোষ।

১. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রচিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত মূলগ্রন্থ-শিশু শিক্ষা, সম্পাদনা, ড. আশিস খাস্তগির।

করেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষনের রচনা থেকে জানা যায় সেবার যুদ্ধ ব্যাপকভাবে সংঘটিত না হলেও মদনমোহন আঘাত পান। তিনি অনুভব করেন, বৃটিশ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকা সত্বেও যখন এই লড়াই নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়নি তখন এদের দৌরাত্মে সাধারণ মানুষের অবস্থা কতটা শোচনীয়। তিনি সুস্থ হওয়ার পর ওই হাঙ্গামায় যুক্ত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সমর্পণ করেন, কিন্তু সাক্ষ্য সগ্রহ করতে পারলেন না। অভিযুক্ত জমিদার মুক্ত হওয়ায়, মদনমোহন অত্যন্ত হতাশ হন। উচ্চ আদালতের রায় জমিদারদের পক্ষে যাওয়াতে তাঁর মনে হল, যে আদালত যখন তাদের উৎসাহিত করল তখন, তাকেও প্রাণে মারতে এরা দ্বিধা করবে না। তিনি বলেছিলেন, ''আজ আমার অর্দ্ধ মৃত্যু হইল''। এ ঘটনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের ক্ষমতা সম্পর্কেও তার আশা ভঙ্গ হয়। মানসিক ভাবেও তিনি আহত হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন কলকাতায় শ্যামাচরণ দে-কে মদনমোহন যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে, বিদ্যাসাগরের মত বন্ধুর সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি কেমন ছিলেন তাঁর মানসিক চিত্রটি পাওয়া যাবে, ''ভ্রাতঃ। ক্রমশঃ পদোন্নতি ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটী পদ প্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনই ইস্তফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিৎ হয়। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব, আমি এই সাবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহাসাপরাধীর ন্যায় ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীন চিত্তে কর্ম্মকাজ করিতেছি, অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথামুণ্ডু জানাইব, আমার বাল্য সহচর এক হৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি।'' রুগ্ন মদনমোহন এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, 'স্নান-ভোজনাদিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কঠিন অসুখে পড়েন।' কান্দিতে তখন ভাল চিকিৎসক ছিলো না। সুচিকিৎসার অভাবে, ১৮৫৮ সালের ৯ মার্চ অকালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৫ এপ্রিল 'অরুণোদয়' পত্রিকা লেখে, ''আমরা দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া সমাচার দিতেছি যে বিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুর্শিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল, এবং যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র ২ বাঙ্গলা পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতে অস্মদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গ অবগত আছেন।'' ❑



YOGA IS BEST MEDICINE IN WORLD

Dr. Manas Banerjee
Psychologist & Physiotharapist
Yoga Chria. Regd. No. 13745
NTPC/FH. 1/204. Phone : 251839
Farakka, Murshidabad, West Bengal

যোগাসন নীরোগ ও সবল দেহ, রূপ, যৌবন,
আয়ু প্রভৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে,
যোগাসন করলে রক্তে অক্সিজেন মাত্রা অধিক পরিমানে
বৃদ্ধি পায় বলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

কুঠিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ রামপুর, মুর্শিদাবাদ

আর্থিক অনটনের মধ্যেও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ এবং ন্যস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত। গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ঃ (১) দেড় কিলোমিটার মোড়াম রাস্তা ও দুটি গ্রামের সংযোগকারী পোনে এক কিমি কাঁচা রাস্তা নির্মাণ। (২) সার্বি স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীতে প্রায় ৪০০ টি (চার শত) সুলভ শৌচাগার নির্মাণ। (৩) একশ জনের মধ্যে ১০ একর খাস জমির পাট্টা বিতরণ, (৪) আই এ ওয়াই প্রকল্পে (২০০৩-০৪) ১২ জনের গৃহ নির্মাণ ছাড়াও ৬০ জন উপভোক্তার জন্য এন এস এ পি প্রকল্পে বার্ধক্য ভাতা প্রদান ইত্যাদি।
উপরোক্ত উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি প্রচুর সমস্যাও রয়েছে। যেমন, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, জল নিষ্কাশন, বিদ্যালয় গৃহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা ইত্যাদি।

ধানুয়ারা বিবি
উপ-প্রধান

মোঃ আসগার হোসেন
প্রধান

সংশোধনী

ঝড় সাহিত্যপত্র বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদের ফেব্রুয়ারি-২০০৪-এ প্রকাশিত সংখ্যায় কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকেছে, বর্তমান সংকলনে তারই সংশোধন কিছু উল্লেখ করা হলো।

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে	পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২৩	শেষ	বিদ্যোৎ	বিদ্যুৎ	১৩৫	৩১	disolved	dissolved
২৮	১৯	ট্র্যাজেডিক	ট্রাজিক	১৩৬	৫	brofound	profound
৫৩	৩	বিগতকালে	সর্বনাশে সমুৎপন্নে	১৩৬	৫	burgeois	bourgeois
		সমূৎ-পণ্যে —অর্ধেক	অর্দ্ধং ত্যজতি	১৩৬	৭	defnders	defenders
		ত্যাজোতি পণ্ডিতঃ	পণ্ডিত	১৩৭	৬	Transcauesia	Trancaucasia
৫৫	৫	আনাগোড়া	আনাগোনা	১৩৭	৩৪	stulfs	stuffs
৫৯	২০	পার হয়ে	কিছুই হবে না	১৩৮	৬	companym	company
৬০	৩৩	অঞ্জলী	অঞ্জলি	১৩৮	৯	competetion	competition
৬৪	৩১	শ্রদ্ধালাভাতেঃ	শ্রদ্ধাবানলভতে	১৩৯	১৪	desit	desist
		জ্ঞানমঃ	জ্ঞানম্	১৩৯	২৪	distingeuishing	distinguishes
৮১	৩৩	সম্ভবেনায়	সম্ভাবনা	১৪০	২৭	রেনেসার	রেনেশাঁস
৮৩	১,২	অধীনস্ত	অধীনস্থ	১৪০	৩৫	ভারতপথি	ভারতপথিক
৮৩	১১	একর	লোক	১৪১	১	রেঁনেসাঁর	রেনেশাঁস
৮৩	১৫	অধীনস্ত	অধীনস্থ	১৪১	৭	সুতী[illegible]	সূতিকাগার
৮৬	১৮	এই	হবে না	১৪৩	৩৩	পুত্রে	পুত্র
৮৭	১	অস্যার্থ	অর্থ	১৪৪	১৬	ফ্রি[illegible]	ফ্রিগেট
৮৭	২৯	সুষ্টভাবে	সুষ্ঠুভাবে	১৪৪	১৯	নৌবাহ	নৌবহর
৯১	২৮	কায়ক্লেসে	কায়ক্লেশে	১৪৫	৪	বদসাক	বসাক
৯৬	৩০	Purniew	Purview	১৪৭	১৮	জমিজারদের	জমিদারদের
১০৩	২৪	ভূসম্পত্তি	ভূসম্পত্তির	১৪৭	২৬	বন্দ্যোবস্ত	বন্দোবস্ত
১০৮	৭	শ্রেনীর	শ্রেণীর	১৪৭	২৭	সামন্ত্রীরাষ্টের	সামন্তরাষ্ট্রের
১০৮	৯	তারা	তাঁরা	১৪৭	৩৩	অভ্যুদ্বয়	অভ্যুদয়
১০৯	৪	বেধে	বেঁধে	১৫১	২১	রূপে	রূপে
১০৯	২৯	অলঙ্ঘ্যণীয়	অলঙ্ঘণীয়	১৫৪	১৮	সংস্কৃতি	সংস্কৃত
১০৯	৩৪	একাদিক্রমে	একাধিকক্রমে	১৫৪	১৯	সুপণ্ডিতগন	সুপণ্ডিতগণ
১১১	৬	তারা	তাঁরা	ঐ	ঐ	শিক্ষকগন	শিক্ষকগণ
১২২	৩১	ভোঁসলকে	ভোঁসলেকে	১৫৪	৩৩	রাজমোহন	রামমোহন
১২২	৩২	ভোঁসলা	ভোঁসলে	১৭০	৩৪	ট্রাসডিড	ট্রাস্টিডিড
১২৪	৩৪	বরিষাল	বরিশাল	১৭১	৯	স্বাগ্রহে	সাগ্রহে
১২৬	১৮	ব্যবসা	ব্যবসায়	১৭১	১১	জাগরুক	জাগরূক
১৩০	২১	নুব্জ	ন্যুব্জ	১৭৩	১০	বিরোধীত্রার	বিরোধিতার
১৩২	২২	ভ্যাস্সি	ভ্যাস্সিটার্চ	১৭৬	১২	knight hood	knighthood
১৩৫	২৯	disoppearing	disappearing	১৭৮	১১	রাধাপ্রদ	রাধাপদ

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে	পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১৭৮	২৫	শীর	শির	২৫২	৩১	রামগতির	রামগতি
১৮৫	১৪	প্রজ্বল	প্রোজ্জ্বল	২৫৩	২৯	অধ্যক্ষত্বার	অধ্যক্ষতায়
১৮৯	৪	মরুকুমার-ই	মরুকুমারই	২৫৩	শেষ	রাজ্যাভিষেকের	রাজ্যাভিষেক
১৮৯	১৬	জীবনাবাসান	জীবনাবসান	২৫৪	৩	প্রামাণিকে	প্রামাণিকের
১৯৭	৬	আকাশে	আকাশের	২৫৬	১৪	চিরন্তর	চিরন্তন
২৪২	১১	উভ	উভয়	২৫৮	২৪	হিসাবী	হিসাবে
২৫০	৫	সমাজব্যবস্থার	সমাজব্যবস্থায়	২৬৮	৩০	বোঝায়	বোঝাই
২৫২	২৩	ভারতবর্শর্ষ	ভারতবর্ষ	২৬৮	৩৪	চায়	চাই
২৫২	২৬	থ্রামব্রিক	ল্যামব্রিক	২৮৮	৬	formarly	formerly
২৫২	২৯,৩১	বিদ্বোৎসমাজ	বিদ্বৎসমাজ	২৮৯	৩১	throus	throws

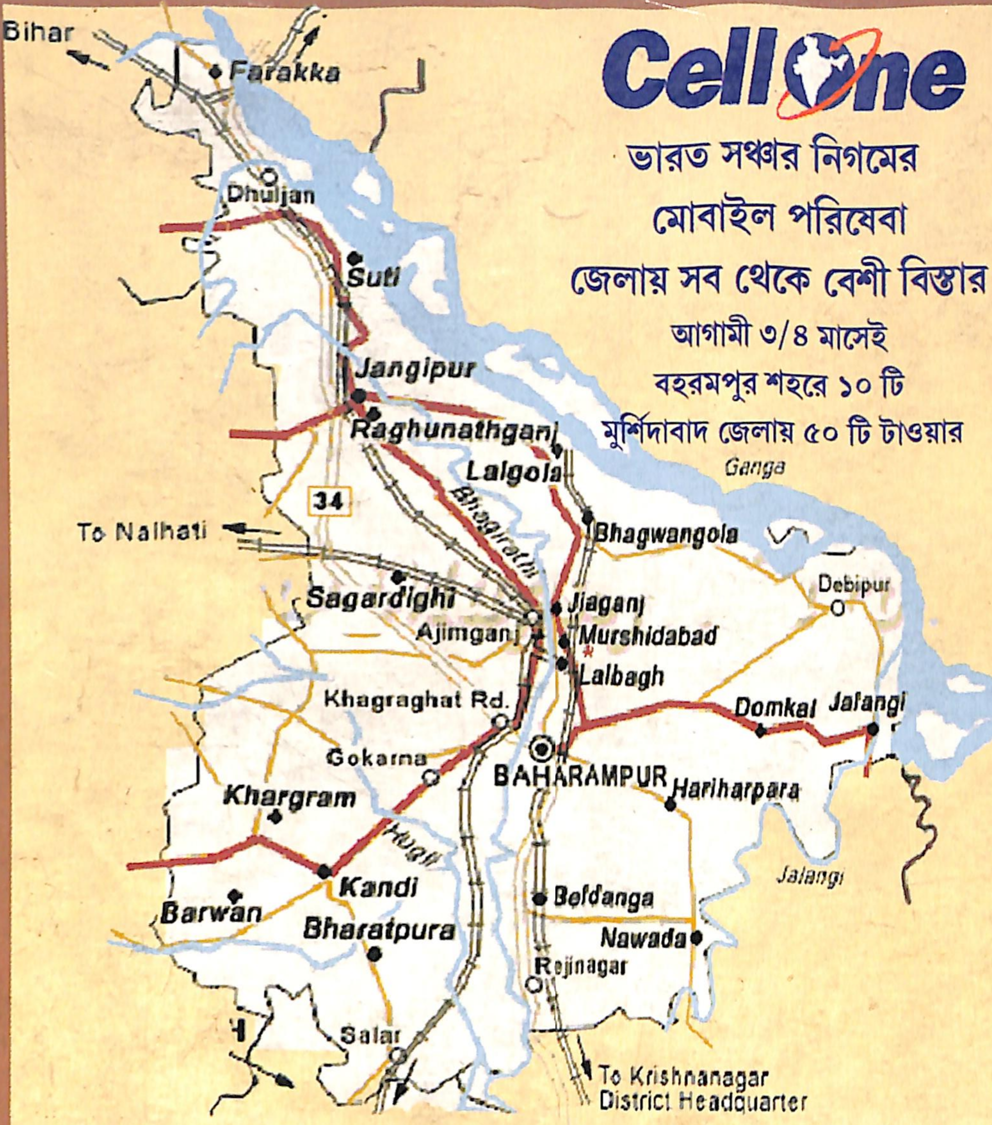
কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভ্রম সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছে। ছোটখাট আরও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল।

বিষয় ঃ মুর্শিদাবাদ

ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ প্রকাশিত প্রথম সংকলনে বিষয় সূচি

সংখ্যাটি নিঃশেষিত। পূনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা চলছে।

বর্তমান সংখ্যাটির প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনাথ কলেজের।
আলোকচিত্র ঃ সঞ্জীব প্রামাণিক। গ্রাফিক্স ঃ রাজু গুইন ও অংশুমান রায়।



CellOne

ভারত সঞ্চার নিগমের

মোবাইল পরিষেবা

জেলায় সব থেকে বেশী বিস্তার

আগামী ৩/৪ মাসেই

বহরমপুর শহরে ১০ টি

মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫০ টি টাওয়ার

জেলার প্রত্যন্ত থেকে রাজ্যে এবং দেশের সর্বত্র যোগাযোগের নেটওয়ার্ক — যার সমকক্ষ নেই

সব থেকে কম খরচে পোষ্ট পেইড - ৪০ পয়সা ☐ প্রি পেইড - ৯০ পয়সা প্রতি মিনিট

প্রতি পালস্ ঃ পোষ্ট পেইড - ১০ পয়সা।

অর্থাৎ একটি মোবাইল কল করতে আপনার সর্বনিম্ন খরচ ১০ পয়সা।

তৎসহ SMS, Closed User Group, Friend & family র আকর্ষণীয় প্যাকেজ

আমাদের মূল শক্তি ☐ গ্রাহকদের অটুট আস্থা ☐ বিল-এর স্বচ্ছতা ☐ জনগ্রাহী পরিষেবা

BSNL *Connecting India*

West Bengal Telecom Circle
Berhampore Telecom District

Editor, Publisher, Printer : Achintya Singha. Khagra, Murshidabad, Ph : 03482-261428
Printed from Gitanjali Printing Press, Berhampore, (& Bhaswati Press, Kolkata)

মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস

নুরুল আমিন বিশ্বাস

এক

বাংলায় তথা মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের পত্তন ও বিকাশ

বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছরের এই মধ্যবর্তী কালে বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। ইখতিয়ার উদ্দিনই প্রথম বাংলায় মুসলিম ভাবানুষঙ্গে -র বিস্তার ঘটনা।[১] মুসলমান সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন প্রায় পাঁচশত বছর। মাঝখানে রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮), রাজাটোডরমল (১৫৮০-১৫৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-১৫৯৬) বাংলাদেশ রাজত্ব করেন। স্বাধীন সুলতান আমলেই সমগ্র বাংলাদেশের নাম হয়েছিল বাঙলা। বাংলায় রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিগত সময়সীমা বিভাজন করা হয়েছে এইভাবে ঃ ১২০৪-১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৩৩৮-১৫৩৮ (স্বাধীন রাজ্য); ১৫৩৮-১৫৭৬ (আফগান কর্তৃত্ব); ১৫৭৬-১৭১৭ (মুঘল সুবা); ১৭১৭-১৭৬৫ (স্বাধীন নবাব)। এরপরেই 'Islam as a political force was supplanted by the rule of the British in Bengal.'[২]

সাত শতকের প্রথমার্ধে আরব ভূমিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩৩)। এর পরেই ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য প্রসারে আরবেরা ছড়িয়ে পড়েন ভারতের ভূমধ্যসাগরে, পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূল ভূমিতে। বাংলায় তুর্কী ক্ষমতা প্রসারের আগেই চট্টগ্রামে আরব বণিকদের আগমন ঘটে। চট্টগ্রাম শহরে এখনও 'আরব কলোনী'র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই বণিকদের জাহাজেই ইসলাম প্রচারে বহু সুফী, দরবেশ, পীর আওলিয়া

১। The Oxford History of India (3rd Edition)– V.Smith.

২। Islam In Bengal – Jagadish Narayan Sarkar, 1972.

এদেশে এসে আস্তানা গেড়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। পৌরাণিক যুগের বর্ণভেদের কড়াকড়িতে নিম্নবর্ণের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন— বর্ণভেদ প্রথা, দাসপ্রথা, অস্পৃশ্যপ্রথার কারণে নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক ও মানবাধিকার ছিল না।[৩] যবন দোষে দুষ্ট অনেক হিন্দুই মধ্যযুগে জাতিচ্যুত হয়েছিলেন।[৪] এইসময়েই পীরদরবেশদের মানবসেবা, পরহিতব্রত এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামে দীক্ষিত হন। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীবিজয়ের ফলে একদিকে যেমন পীরদরবেশদের সংখ্যা বাড়ার সাথে ধর্মান্তরকরণ ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে তেমনি উচ্চপদলাভ, ব্যবসায় সুবিধা, সামাজিক মর্যাদার লোভ এবং অনেকাংশে তরবারির ভয়েও অনেকে মুসলমান হতে থাকেন।[৫] এর শেষ দিকে মারাঠা, আমেঠি, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালিদের দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার সন্ধানে একটি জনস্রোত বাংলায় এসে স্থানীয় নারীপুরুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৬]

ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে অমর্ত্য সেন বলেছেন ঃ "প্রাক মুসলিম ভারতও নিছক হিন্দু ভারত ছিল না। বস্তুত সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য বিষয় দিয়েই শুরু করা যেতে পারে, প্রাক মুসলিম পর্বের মহত্তম ভারতীয় সম্রাট ছিলেন একজন বৌদ্ধ, অশোক এবং রাজা হর্ষসহ সেখানে ছিলেন অপরাপর মহান অহিন্দু সম্রাট। এমনকি যখন গজনির সুলতান মাহমুদ ভারতে আক্রমণ পরিচালনা করেছেন, পূর্ব ভারতে তখন বৌদ্ধ পাল রাজারা দৃঢ়ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বস্তুত বাংলা খুব দ্রুতই বৌদ্ধ শাসন থেকে মুসলিম শাসনে রূপান্তরিত হয়, মাঝখানে ছিল স্বল্প সময়ের হিন্দু রাজত্ব— ভাগ্য বিড়ম্বিত সেন রাজাদের শাসন। ... বস্তুত সপ্তম শতাব্দীতে ব্রিটেনে খ্রীষ্টধর্ম যখন ভিত্তি অর্জন করতে শুরু করেছিল, তখন অন্তত তিনশত বছর ধরে নিশ্চিন্তভাবেই— চতুর্থ শতক থেকে ভারত ছিল বসতিস্থাপনকারী বড়ো আকারের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। ইহুদীরাও ভারতে বসতি গড়েছিল সত্যিকারভাবে জেরুজালেমের পতনের পর থেকেই। এবং স্মরণাতীত দীর্ঘকাল ধরে ভারতে গভীরভাবে শেকড় প্রোথিত করেছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। মুসলিম আগমণ এই বর্ণচ্ছটাকে বিস্তৃত করেছে মাত্র। আরেকটি দিক উল্লেখ্য, ভারতে ব্রিটিশ শাসন, যেখানে শাসকরা শাসিত থেকে ছিল আলাদা, তা থেকে ভিন্নতরভাবে মুসলিম শাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানদের উপস্থিতি। দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ বরণ করে ইসলামকে, সেটা এতটাই বড়ো যে সমসাময়িক বিশ্বের চারটি বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর তিনটেই উপমহাদেশে অবস্থিত, ভারত, পাকিস্তান

৩। সংস্কৃতির রূপান্তর— গোপাল হালদার— ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী কলিকাতা, ১৯৬৫ "বৈদিক যুগে বর্ণভেদের বাড়াবাড়ি ছিল না। পৌরাণিক যুগে বর্ণভেদের উপর কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। 'মনুসংহিতায়' শুদ্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা অবজ্ঞা এমনকি যুদ্ধ করার কথা বহুজায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' আছে যে, প্রভু অবাধ্য দাশশুদ্রকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারেন। নিম্নবর্ণের লোকের এবং বৌদ্ধশ্রমণের দর্শনে, স্পর্শে পাপ-একথা প্রচার করা হত।"

৪। হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য—ডঃ অতুল সুর-সাহিত্যলোক, ১৯৮১। "মধ্যযুগের সমাজে যবন দোষের জন্য অনেকে জাত হারান। যারা যবনদের সংস্পর্শে আসত, তাদেরইযবনদোষ ঘটত। যবনদোষ তখনই ঘটত যখন হিন্দু নারী মুসলমান, মগ ও পোর্তুগীজদের কর্তৃক ধর্ষিতা হত, বা পুরুষ রা তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত। গোড়ার দিকে সমাজের বিধানকর্তারা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে যবনদোষদুষ্ট পরিবারদের জাতিচ্যুত করত।"

৫। History of Bengal – Jadunath Sarkar University of Dacca.

৬। Social and Caltural History of Bengal – Vol. 1, 1200-1576.

আর বাংলাদেশ।"[৭]

বাংলায় মুসলমানদের কুলপরিচিতি ও বংশবৃদ্ধি প্রসঙ্গে গ্রিয়ার্সন, হান্টার, ডান্টল, উইলিয়ম কুক, জেমস ওয়াইজ, হাবার্ট, রিজলি, জেমস লঙ প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেসব মত পোষণ করেছেন তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতার কারণে ও পীর দরবেশদের প্রভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন।[৮] কিন্তু মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর 'হাকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালাই' (১৮৯১)তে একথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর লোক।[৯] ফজলে রাব্বির এই অভিমত সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। মুহম্মদ আবদুর রহিম অবশ্য বলেছেন যে বাংলায় আগত বিদেশী মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা বেশি।[১০] ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলাভিত্তিক লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ঢাকা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা রঙপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাটনা, যশোর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের হার অনেক বেশি।[১১] অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির তীব্র দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে বেশ কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ নেপাল-তিব্বতে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।[১২] ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়াতে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে টমাস ওয়াকার আরনল্ড

Vol. II, 1576-1757)– Muhammad Abdur Rahim, Karachi, 1961.

৭। বহুপ্রভাবের মিলিত ফসল—অমর্ত্য সেন (মুসলিম সমাজ এবং এই সময়—প্রথম খণ্ড—সম্পাদনা—মইনুল হাসান) ৮। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা— ড. ওয়াফিল আহমেদ।

i) Languistic Survey of India (5 vols)– Grierson, ii) Annals of Rural Bengal (1868). The Indian Musalman Hunter, iii) Descriptive Ethnology of Bengal (1872).

iv) The Races, castes and Tribes of Eastern Bengal (1883)– Wise.

v) The Popular Religion and Folklore of Northern India(1893)– Crooke.

৯। The origin of the Musalmans of Bengal– Khon. Fuzli Rubbee. (Calcutta-1895). খোন্দকার ফজলে রাব্বির যুক্তি গুলি ছিল এরূপ ঃ— ১) বাংলা বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল। ২) মুসলমান শাসকগণ অন্য অঞ্চলের স্বধর্মীদের আহ্বান করেছেন; সৈয়দ, মোঘল, পাঠানদের চাকুরী দিয়েছেন শিক্ষিত, ধার্মিক, নিঃস্ব ব্যক্তিদের করমুক্ত, ভূমি দিয়েছেন বসবাস করার জন্য। গিয়াসুদ্দিন (১২১৪-২৭), নাসিরুদ্দিন (১৪২৬-৫৭), হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫২১) সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বাংলায় আসতে এবং বসতি করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ৩) বাংলার শাসকগনের সৈন্যবাহিনী বাইরের মুসলমান দ্বারা গঠিত; তাদের অধিকাংশ এদেশে থেকে গেছে। ৪) উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাস্তুত্যাগী ও পলাতকদের আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ। বিশেষ করে, স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছর রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৫৭৬) এ ধরনের রাজনৈতিক আশ্রয় অনেক ছিল। (ঘোরী বংশের রাজত্বকালে এবং মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পরিবার বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের রাজত্বকালেও অনেক ধর্মীয় নেতা বাংলায় প্রেরিত হয়েছেন। ৫) অনেক ব্যক্তি বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য ও ভূমির উর্বরতায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে।

১০। Social and cultural History of Bengal (vol.I, 1200-1576), vol. II (1576-1757)– Murshidabad Abdur Rahim Karachi, 1961.

১১। Report on the Sensus of Bengal– 1872

১২। বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজ মত জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫)।